গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী—১১

বর্ত্তমান জগৎ

চতুর্থ ভাগ

ইয়াঙ্কিস্থান
বা
অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ

প্রথম সংস্করণ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ,

ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ, কলিকাতা

ফাল্গুন, ১৩২৯

গৃহস্থ পাব্‌লিসিং হাউস

২৪, মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা

[মূল্য ৬৲ ছয় টাকা

প্রকাশক
শ্রীরামরাখাল ঘোষ
স্বত্বাধিকারী
গৃহস্থ পাব্‌লিসিং হাউস
২৪, মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা।

প্রিণ্টার
শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে
ইণ্ডিয়া প্রেস
২৪, মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা।

নিবেদন

১৯১৪ সালের নভেম্বরে নিউইয়র্কে পৌঁছি, ১৯১৫ সালের মে মাসে ইয়াঙ্কিস্থানের জের হাওয়াই দ্বীপ ছাড়ি। এই ছয় মাসের বৃত্তান্ত প্রথম এগারো অধ্যায়ে লেখা আছে। তখনও যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপীয় লড়াইয়ে মাতে নাই।

১৯১৬ সালের নভেম্বরে আবার আমেরিকায় আসি। তাহার কয়েক মাস পরে মার্কিনের নরনারী জার্ম্মাণের বিরুদ্ধে লড়িতে সুরু করে। দ্বিতীয়বারের আমেরিকা-প্রবাস দ্বাদশ অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিবৃত রহিয়াছে।

দুইবারকার আমেরিকা-দেখার মধ্যে কাটিয়াছে চীনজাপানে পর্য্যটনের কাল। এই অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ," "উত্তর চীন" এবং "নবীন এশিয়ার জন্মদাতা,—জাপান" এই তিন গ্রন্থে। এই আওতায়ই ইংরাজিতে লেখা হয় "হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম্ম" (শাংহাই, ১৯১৬) এবং "ভারতবর্ষের প্রেম-সাহিত্য" (তোকিও, ১৯১৬)।

দ্বিতীয় বার আমেরিকায় কাটে পূরাপুরি প্রায় চার বৎসর। এই চার বৎসরের কাহিনীতে প্রথমবারকার রচনা-প্রণালী অবলম্বন করা হয় নাই। কতকগুলা মোটা কথা আলোচনা করা গিয়াছে মাত্র। প্রথমবার রোজনামার বহু দিকেই খুঁটিনাটির চর্চ্চা করা গিয়াছিল।

এই চারি বৎসরের ভিতর ইংরাজিতে প্রকাশিত হইয়াছে "হিন্দুজাতির বিজ্ঞান-সম্পদ" (নিউইয়র্ক ১৯১৮) এবং এক কবিতা-গ্রন্থ (বষ্টন ১৯১৮)। সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে কতকগুলা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।

"বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন কেতাবে কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তথ্য আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা "ইংরাজের জন্মভূমি" পড়িয়াছেন তাঁহারা "ইয়াঙ্কিস্থান" দেখিলে সহজেই পার্থক্যটা ধরিতে পারিবেন।

কোন লেখকের কোন মতই তথাকথিত বেদবাক্যস্বরূপ চিরকাল শিরোধার্য্য নয়। এইরূপ চিন্তা ভারতে দেখা দিয়াছে। কাজেই আশা করা যায়, "বর্ত্তমান জগৎ"-প্রণেতাকে কথায় কথায় জবাবদিহি হইতে হইবে না। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান গ্রন্থকার নিজের মত এবং ব্যাখ্যা বেশী দিন পুষিয়া রাখিতে অভ্যস্ত নন।

তথ্যগুলা সম্বন্ধে গোঁজামিল বোধ হয় রাখি নাই। যথা সম্ভব নির্ভুল ভাবে বস্তু ও ঘটনা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই গুলা নিরেট সত্য আজও, কিন্তু সেই গুলার ব্যাখ্যা করিতে বসিলে আজ অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত নয়া কথা বলিতে হইবে। অর্থাৎ গ্রন্থের ভিতরকার অনেক মতের সঙ্গেই গ্রন্থকারের এখনকার মতের মিল নাই।

এই অমিলে এবং মতভেদেই দুনিয়া বাড়িয়া চলিতেছে। আর, অনৈক্য এবং বহুত্ব ভারতীয় জীবনের সকল বিভাগেই দেখা যাইতেছে বলিয়া বর্ত্তমান জগতে যুবক ভারতের দাবী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

"গৃহস্থ," "প্রবাসী," "উপাসনা," "ভারতবর্ষ" ইত্যাদি মাসিকপত্রে প্রথম এগারো অধ্যায় বাহির হইয়াছিল। "ভারতী" কার্য্যালয় হইতে দশম অধ্যায়ের খানিকটা পাণ্ডুলিপি হারাইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্যানফ্র্যান্‌সিস্কোর বিশ্বমেলার সচিত্র বিবরণ ছিল। ইতি

বার্লিন, অক্টোবর ১৯২২। শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিলাতে ছয় মাস

জাহাজে জীবন

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোটা কথা

পরিষৎ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

জাতিসমস্যা ও অন্নসংস্থান

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিংশশতাব্দীর চিত্রশিল্প

চীনের ভাষা ও সাহিত্য

ওলন্দাজ সাহিত্যের সেক্সপীয়ার

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ইয়াঙ্কি রমণী

পরজাতি-বিদ্বেষ ও নৃতত্ত্ব

অধ্যাপক বোয়াজ

আমেরিকায় স্পেন ও পর্ত্তুগাল

নিগ্রোনায়ক ডুবয়েস্

যুক্তরাষ্ট্রে ধন-বিজ্ঞান-চর্চ্চা

তৃতীয় অধ্যায়

নায়াগ্রাঝোরা

লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্‌

চতুর্থ অধ্যায়

প্রদেশ-রাষ্ট্রের কেন্দ্র

অষ্টম অধ্যায়

মধ্যপশ্চিম প্রদেশ

নবম অধ্যায়

আরও পশ্চিম

দশম অধ্যায়

দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর

একাদশ অধ্যায়

ইয়াঙ্কিস্থানের "জের"

১। ইয়াঙ্কিরাষ্ট্রের জন্মদাতা জর্জ ওয়াশিংটন

বর্ত্তমান জগৎ

চতুর্থ ভাগ

ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ

প্রথম অধ্যায়

আট্লাণ্টিক-বক্ষে

বিলাতে ছয় মাস

প্রাকৃতিক দৃশ্য

ইংরাজ-স্থানে অর্দ্ধ বৎসর কাটিল। পৌঁছিয়াছিলাম গ্রীষ্মে। তখন কলিকাতায় ব্যবহারোপযোগী সাধারণ রেশমী কাপড়ের সুট্ পরিলেও এক প্রকার চলিয়া যাইত। দিনের বেলায় বেশ গরম লাগিত। ছাড়িতেছি শীতের আরম্ভে। ইতিমধ্যে রাস্তায় দুএকদিন বরফ পড়িয়াছে। গরমের সময়ে এদেশের সর্ব্বত্র সবুজ তৃণপত্রের শোভা দেখিয়াছি। ক্রমশঃ শীতের প্রকোপে তরুরাজি বিকট আকার ধারণ করিতেছে। লণ্ডনের কোন গাছেই আর পাতা দেখিবার যো নাই। শ্মশানঘাটের আধ পোড়া কাঠের মত গাছগুলি ন্যাড়া ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোক-জনের রং যেরূপ সাদা, গাছগুলি এই ঋতুতে তেমনি কাল!

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিকেরই দৃশ্য দেখিলাম। বিলাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য প্রায়ই এক ধরণের। মোটের উপর একটা কুয়াসাবৃত ধোঁঘাটে রংয়ের সবুজ উপত্যকা ও সমতলভূমি এদেশের বিশেষত্ব। একটা গূঢ় রহস্যময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জনপদের ভিতর বাস করিতেছি মনে হয়। অন্ধকার ও নীরবতা যেন দেশটাকে খানিকটা রহস্যময় ও অতি প্রাকৃত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রকৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশাল বিরাট ও বৈচিত্র্যময়। সেই সৌন্দর্য্যে গরিমা, উদারতা, মহত্ব ও বিভীষিকার পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতের মাঠঘাট নদীপর্ব্বত দেখিলে সে ভাব মনে জাগে না। ইংরাজীতে যাহাকে "প্রেটি" বা চটকদার বলে বিলাতের প্রকৃতি সেইরূপ—"সাব্লিমিটি" বা হৃদয় বাড়ান গাম্ভীর্য্য এখানে নাই বলা চলিতে পারে। আবার ফরাসীদেশের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যতটা মুগ্ধ হওয়া যায় বিলাতের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া ততটা হওয়া যায় না। ফ্রান্সে স্বাভাবিক সুষমাকে মানুষের চেষ্টায় শতগুণ বৰ্দ্ধিত করা হইয়াছে। সমস্ত দেশটা একখানা বাগান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বিলাতে মানুষের সাহায্যে প্রকৃতির লাবণ্য বাড়ান হয় নাই। এখানে কৃষিকর্ম্মের প্রভাব বেশী দেখিলাম না।

বিলাতে মাত্র তিনমাস কাটাইবার ইচ্ছা ছিল। বিলাত ছাড়িয়া "ইয়োরোপের বিক্রমপুর" স্বরূপ হল্যাণ্ড দেখিবার উদ্যোগ করিতে ছিলাম। সেখান হইতে "নিশীথ সূর্য্যের দেশ", নরওয়ে যাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অকস্মাৎ ইয়োরোপ বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইল। কাজেই নেপোলিয়ানের কর্ম্মক্ষেত্র, ফিক্টে-বিস্মার্কের জন্মভূমি, এবং ম্যাজিনির "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ" ইত্যাদিও আর দেখা হইল না।

বিলাতেই এক প্রকার যেন "ইণ্টার্ণড্"বা আবদ্ধ হইয়া থাকা সঙ্গত বিবেচনা করিলাম।

বিগত দশ বৎসর

বিলাতে পদার্পণ করিয়া অবধি বুঝিয়াছি যে, ইংরাজ-সমাজে গত দশ বৎসরের ভিতর সকল দিকে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে বিংশশতাব্দীর বিগত দশ বৎসর ইয়োরোপ ও এশিয়ার সকল দেশেই একটা বিপ্লব আনিয়াছে। ইংরাজেরা নানা আন্দোলনের সাহায্যে নানাবিধ সংস্কার সুরু করিয়াছেন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, রাষ্ট্র-শাসন, আইন ব্যবস্থা, শিক্ষা-বিস্তার, লোক-সেবা, সেনাবিভাগ ইত্যাদি প্রত্যেক দিকেই পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তন চলিতেছে। তিন মাস কাল বিলাতে ঘুরিয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। সম্প্রতি যে লড়াই সুরু হইল তাহার প্রভাবে এই ব্যাপক সংস্কারান্দোলন আরও বাড়িয়া চলিবে। যুদ্ধের পর ইংরাজের আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, পারিবারিক এবং নৈতিক অবস্থা বিশেষ রূপেই বদলাইয়া যাইবে। বিলাতে একটা যুগান্তর আসিবে বলা যাইতে পারে। এইরূপ এক বিপ্লব প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে সাধিত হইয়াছিল।

মানব জাতির ঐক্য

দূর হইতে একটা নূতন লোক বা জাতিকে যেরূপ দেখায় কাছে আসিলে সেরূপ দেখায় না। এইজন্য বর্ত্তমান কালে প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন ও ভারতের জনসাধারণকে সত্যভাবে বুঝিতে পারা কঠিন। যত দূরে থাকিব ততই বুঝিতে কষ্ট পাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই জন্যই এক জাতি অপর জাতিকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস, সন্দেহ, নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া

থাকে। এইরূপ কুসংস্কার মানুষ ও জাতি মাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। এই সকল ভুল ধারণা কোন দিন জগৎ হইতে দূরীভূত হইবে কিনা সন্দেহ। পরস্পর পরস্পরের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করিবার সুবিস্তৃত সুযোগ সৃষ্ট না হইলে জাতিগত সংস্কার বা ধারণার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব।

ভিন্ন ভিন্ন ধরণের লোক যত বেশী দেখিতেছি ততই মনে হইতেছে যে, মানব-সমাজে বৈচিত্র্য অপেক্ষা ঐক্যই বেশী। রং ও ভাষা এই দুই বিষয়ে পার্থক্য বোধ হয় এক এক মাইল পরেই লক্ষ্য করিতে পারি। মানুষের চিত্ত সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। বর্ত্তমান কালে যে সকল জাতি দেখিতেছি তাহাদের হৃদয় অনুসন্ধান করিলে বুঝিব যে, তাহারা সকলেই একই অবস্থায় হাসে-কাঁদে। আবার অতীতে যে সকল জাতি জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জীবন-নিদর্শনগুলি আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারি যে, আমাদেরই মত তাহারা রক্ত মাংসের মানুষ ছিল, আমাদের সুখ-দুঃখের মত তাহাদেরও সুখ-দুঃখ ছিল। মানব-হৃদয় সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা একরূপ। তথাপি জগতে আমরা বৈচিত্র্যগুলি লইয়াই এত মজিয়া রহিয়াছি কেন? আর এই বিভিন্নতার ওজর করিয়া পরস্পর ধ্বংস সাধনে ব্যাপৃত কেন?

ভারতবাসী ইংরাজের দাস—সুতরাং ইংরাজেরা ভারতবাসীকে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর জীব বিবেচনা করিতে বাধ্য। ইহা একটা কুসংস্কার বটে—কিন্তু ইহা স্বাভাবিক। আবার ভারতবাসীও এই কারণেই ইংরাজকে সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। ইহাও একটা কুসংস্কার—এই কুসংস্কারও স্বাভাবিক। পরাধীন মানবের চিত্ত এইরূপ সম্মোহিত হইয়াই থাকে।

কুসংস্কার ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলে বর্ত্তমান ইংরাজকে কিরূপ মনে হয়? ছয় মাসে একটা জাতিকে বুঝা নিতান্তই দুরূহ। কিন্তু যেরূপ ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে বোধ হয়, ইহারা স্থির, ধীর ও গম্ভীর জাতি। নড়ন-চড়ন, গতিবিধি, পরিবর্ত্তন, বিপ্লব ইত্যাদি পছন্দ করে না—বরং এগুলি যথাসম্ভব বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে। এমন কি, কোন সময়ে যদি একটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াই যায় তথাপি ইহারা যেন পুরাতন অবস্থাতেই রহিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করিতে ভালবাসে। ইহাদের ভিতর উগ্রস্বভাব বা প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। জাতিটা নিতান্তই শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ প্রকৃতি। ইহারা কথা খুব কম বলে—নীরব থাকিতে বেশী ভালবাসে—এবং আস্তে আস্তে কাজ করিতে করিতে জীবন-পথে অগ্রসর হয়।

ইংরাজ চরিত্র

বর্ত্তমান ইংরাজসমাজে কোন অসাধারণ চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বা কর্ম্মবীর আছেন কি না কে বলিতে পারে? অদ্ভুত ক্ষমতাবিশিষ্ট নরনারী দেখিবার জন্য বিলাতে আসিলে হয়ত হতাশ হইতে হইবে। অবশ্য, দুনিয়ার কোথাও গণ্ডায় গণ্ডায় অসাধারণ লোক দেখা যায় না। আর, প্রত্যেক যুগেই এরূপ লোকের উদ্ভবও হয় না। মাঝারি গোছের ক্ষমতাওয়ালা লোকের সংখ্যায়ই কোন দেশকে ছোট বলা উচিত—কোন দেশকে বড় বলা উচিত। সাধারণতঃ মানুষের যে সকল গুণ আশা করা যায় ইংরাজের ভিতর তাহা অপেক্ষা বিশেষ বা বেশী কিছু নাই। তবে ভারতবর্ষে যদি একশত লোকের মধ্যে সেই সকল গুণ থাকে তাহা হইলে বোধ হয় দশ হাজার ইংরাজের সেই সকল গুণ দেখিতে পাইব। কেবল সংখ্যার প্রভেদ—দুই জাতিতে উচ্চশ্রেণীর গুণী লোক সম্বন্ধে আর কোন প্রভেদ নাই।

ইংরাজজাতি ভাবুকতাময় একেবারেই নয়। ইহারা একটা দূর ভবিষ্যতের স্বপ্নরাজ্যে বাস করে না—অথবা অতীন্দ্রিয় জগতের ধার ধারে না। দুইজন চারি জন লোক হয়ত "আইডিয়েলিজম্‌", রহস্যবাদ, "মিষ্টিসিজম্‌", ধ্যানতত্ত্ব ইত্যাদির চর্চ্চা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ উচ্চশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজে এরূপ কল্পনা-প্রবণতা ও আদর্শ-প্রিয়তার সম্পূর্ণ অভাব। ইহারা বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত থাকিতে চাহে। হাতের সম্মুখে, চোখের সম্মুখে যে কাজ বা কর্ত্তব্য উপস্থিত তাহাই সমাধা করিবার জন্য উৎসুক। বেশী দূর ভবিষ্যতের লক্ষ্য ইহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে না। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইহারা সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকে। কাজেই কোনরূপ আবেগ, উদ্বেগ, হুজুগ, উন্মাদনা, উত্তেজনা বা অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা বিলাতী সমাজে বিরল। কার্য্যকরী বুদ্ধিমত্তা ইহাদের জাতীয় গুণ স্বরূপ।

বিলাতেও "জাতিভেদ" যথেষ্ট। টাকা-পয়সা হিসাবে এদেশে উচ্চ-নীচ বিভাগ হইয়া থাকে, একথা সকলেই জানে। কিন্তু আমাদের অনেকের বিশ্বাস যে,—"ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে ছোট অবস্থা হইতে বড় অবস্থায় উঠিতে পারে ; কাজেই বিলাতী জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা হইতে স্বতন্ত্র ও উন্নত ধরণের।" কিন্তু বিলাতে আসিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখানকার কুলী, মজুর, গাড়োয়ান, দ্বারবান, ঝি-চাকর, সৈন্য, খালাশী ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষক, কেরাণী, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোকের বিবাহ-সম্বন্ধ এবং বৈষয়িক ক্রমোন্নতির উপায় আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? অনুসন্ধানে জানা যায় যে, নিম্ন হইতে উচ্চ স্তরে উঠিবার দৃষ্টান্ত এ সমাজে অনেক আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মোটের উপর

শ্রেণীগুলি নিতান্তই আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। গাড়োয়ানের বংশধরেরা কোন উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করিবার সুযোগ অতি সামান্তই পাইয়া থাকে। ভারতীয় জাতিভেদের নিয়মে উঠানামা যেরূপ সহজ বা যেরূপ কঠিন বিলাতী জাতিবিভাগের ব্যবস্থায়ও প্রায় তদ্রূপ। এ বিষয়টা বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিতে হইলে দুই দেশের প্রত্যেক "জাতির" লোক-সংখ্যা গণনা করিয়া তুলনা করা আবশ্যক।

উচ্চ জাতিস্থ লোকেরা ভারতবর্ষে তাহাদের নিম্নশ্রেণীর নরনারীকে সামাজিক হিসাবে যতটা অবজ্ঞা করিয়া থাকে, ইংরাজেরা তাহাদের ছোট জাতিকে তাহা অপেক্ষা কম অবজ্ঞা করে না। কিন্তু বিদেশীয়ের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ভারতবাসীর চোখে বিলাতী সমাজের রীতি-নীতিগুলির যথার্থ মূল্য ধরা পড়া সহজ নয়। এদেশে অস্পৃশ্যতা বা "জলচল" ইত্যাদি ধারণা নাই। এজন্য অবজ্ঞা বা ঘৃণার ভাব বুঝিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষে "আন্‌টাচেবল্‌" সমস্যা অর্থাৎ "ছুঁৎ" জ্ঞান না থাকিলে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রতিবাদ লুপ্ত হইয়া যাইবে।

বিলাতী জাতিভেদ না বুঝিতে পারিবার আর একটি কারণ আছে। এদেশে "কম্‌পাল্‌সারী এডুকেশন" বা বাধ্যতামূলক শিক্ষা-প্রথা প্রচলিত। কাজেই ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক-বালিকা লেখা-পড়া শিখিতে বাধ্য। এই শিক্ষার ফলে আর কিছু লাভ হউক বা না হউক, সংবাদ-পত্র এবং উপন্যাস পাঠ করিবার ক্ষমতা জন্মে। ইহাতে উপকারও হয় অনেক। কিন্তু এই শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক বা আর্থিক উন্নতির সুযোগ বেশী কিছু সৃষ্ট হয় না। গাড়োয়ানের পুত্র প্রায়ই গাড়োয়ান এবং ঝির কন্যা প্রায়ই ঝি থাকিয়া যায়। ফলতঃ, বংশগত জাতিভেদ বিলাতে নাই এ কথা বলা চলিতে পারে না।

বিলাতে দারিদ্র্য-সমস্যা, শ্রমজীবি-সমস্যা, মহাজন-মজুর-বিরোধ, ধর্ম্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইংরাজ সমাজের দ্বিতীয় সমস্যা সামাজিক ও পারিবারিক। এখানকার স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, বিবাহ-সমস্যা, রমণীজাতির অবস্থা, যৌনবিভ্রাট ইত্যাদি ভারতবাসীর নিকট বড়ই বিচিত্র। এদেশের স্ত্রীস্বাধীনতা ভারতবর্ষে নাই। কিন্তু ভারতীয় রমণীর দুরবস্থা বেশী, কি ইংরাজ রমণীর দুরবস্থা বেশী, তাহা মীমাংসা করা কঠিন। বিলাতী স্ত্রী-সমাজে দুঃখের সামা নাই মনে হইয়াছে। দরিদ্র রমণীদিগকে খাটিয়া খাইতে হয়। ইহাদের কর্ম্মস্থানে নানা প্রকার কষ্ট বর্ত্তমান। ইহারা কোন প্রকার শান্তি বা সুখ পায় না। অধিকন্তু রমণীসমাজের জন্য মজুরীর যেরূপ হার নির্দ্ধারিত তাহার দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের অশনবসনের ব্যয় কুলাইতে পারে না। কাজেই অনেক সময়ে অসদুপায়ে অন্নসংস্থানের আবশ্যক হয়।

এদিকে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধনী ইত্যাদি সকল সমাজেই বিবাহিত জীবন বিরল হইতে চলিয়াছে। পারিবারিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রায় লোকেই অনিচ্ছুক। আবার বিবাহ হইলেও যাহাতে একাধিক সন্তান না জন্মে তাহার জন্য স্ত্রী-স্বামী উভয়েই নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করে। বলা বাহুল্য, এই সকল কারণে দেশের ভিতর দুর্নীতি স্থায়ী ঘর করিয়া বসিতেছে।

সার্ব্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা পাশ্চাত্য জগতে অল্প দিন হইল মাত্র দেখা দিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে "কম্পাল্সারী এডুকেশন" বা বাধ্যতামূলক শিক্ষা শব্দটা কোন ভাষায়ই সুপ্রচলিত ছিল না। ইহা ঊনবিংশশতাব্দীর শেষার্দ্ধের আবিষ্কার। কাজেই হিন্দু-সমাজের ভিতর এই প্রথার অভাব দেখিয়াই হিন্দু জীবনকে তিরস্কার করা যায় না। যে যুগ পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা স্বচেষ্টায় স্বকার্য্য সাধন করিত তত দিন

পর্য্যন্ত ইয়োরোপের কুত্রাপি এই সার্ব্বজনীন লোক-শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই।

আজ কাল বিলাতে অবশ্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা-নীতি প্রবর্ত্তিত। তাহার সুফল সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে দেখা দিয়াছে কি না বিচার করিবার সুযোগ পাই নাই। দিয়াছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আর্থিক হিসাবে এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে এই লোকশিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্বাধীন চিন্তা, কর্ত্তব্য-বোধ, দায়িত্ব-জ্ঞান ইত্যাদি ইংরাজ জনসাধারণের ভিতর অত্যধিক নাই। দুই-চারি-দশজন বড়লোক দেশের শিল্প ও রাষ্ট্রকে যেরূপ চালাইতেছেন দেশ সেইরূপ চলিতেছে। বর্ত্তমান লড়াইয়ের কর্ম্মকর্ত্তা গ্রে এবং কিচ্‌নার।

জাহাজে জীবন

শীতকালে ভারতমহাসাগর যেমন শান্ত আটলাণ্টিকমহাসাগর তেমনি ভয়ঙ্কর। লিভারপুল হইতে নিউইয়র্ক পৌছিতে সাত দিন মাত্র লাগে। এই সাত দিন বিছানায় শুইয়া কাটাইতে হইয়াছে। মাথা তুলিবার শক্তি ছিল না। কামরার ভিতর দুর্গন্ধের জন্য বেশীক্ষণ থাকা অসম্ভব। রাত্রিকালে ৬।৭ ঘণ্টা মাত্র কামরার মধ্যে থাকিতাম। দিবারাত্রের অবশিষ্ট সময় ডেকের উপর চেয়ারে লম্বা হইয়া পড়িতে হইত। ডেকের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে উদ্গার বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু বাতাস এত ঠাণ্ডা ও প্রবল যে, ডেকে বসিয়া সময় কাটানও যার পর নাই কষ্টকর। কাজেই আমেরিকা-যাত্রা বহুকাল মনে থাকিবে।

যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে আমেরিকাযাত্রীর সংখ্যা অভাবনীয়রূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। গত তিন মাসের ভিতর যত জাহাজ বিলাত হইতে আমেরিকা রওনা হইয়াছে তাহাতে লোকের ভিড় অত্যধিক ছিল। বহু কষ্টে এত দিনে টিকেট পাওয়া গিয়াছে।

জাহাজখানা আমেরিকান কোম্পানীর—অর্থাৎবর্ত্তমান যুদ্ধের হিসাবে উদাসীনরাষ্ট্রীয়। এই জাহাজে আসিবার জন্য সকলেই লালায়িত। কেন না শত্রুপক্ষীয় কোন রণতরী ইহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। ইংরাজ-কোম্পানীর জাহাজে জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান যাত্রীর চলাফেরা করা অসম্ভব। কিন্তু "উদাসীন" জাহাজে ইংরাজ ও জার্ম্মাণ এক সঙ্গে বাস করিতে পারে। আমেরিকান কোম্পানী এই উপায়ে ব্যাঘ্রে বৃষভে সমন্বয় ঘটাইয়াছে বলিতে পারি।

বাইবেল-প্রসিদ্ধ একটা "নোয়ার জাহাজে" রহিয়াছি মনে হইতেছে। এশিয়া, ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানাজাতীয় লোক সহযাত্রী। এক

সঙ্গে নানা ভাষায় কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কোনস্থানে বসিলে বা দাঁড়াইলে বাইবেল-বর্ণিত "ব্যাবেল অব্ টাঙস্" বা একটা ভাষাবিভ্রাটের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য প্রায় সকলেই কমবেশী ইংরাজীও বলিতে পারে।

এই জাহাজে সস্ত্রীক সশিষ্য অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু আছেন। আমেরিকার ৪।৫টা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানসভা ইহাঁকে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এতদিন ইনি ইয়োরোপের নানা কেন্দ্রে নিজ গবেষণার বিবরণ দিতেছিলেন। প্যারি, ভিয়েনা, অক্সফোর্ড, লণ্ডন, কেম্ব্রিজ ইত্যাদি নগরের বিভিন্ন বিদ্বৎপরিষদে ইহাঁর বক্তৃতা হইয়াছে। এই সকল বক্তৃতা যথেষ্ট সমাদৃতও হইয়াছে।

সহযাত্রী

সহযাত্রীদিগের মধ্যে জাপানী, টার্ক, রুশ, হাঙ্গারিয়ান, অষ্ট্রিয়ান, বেলজিয়ান, জার্ম্মাণ, ফরাসী, অষ্ট্রেলিয়ান, ক্যানাডিয়ান, ইয়াঙ্কি ও ইংরাজ ইত্যাদি সকল জাতীয় দু'একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। অষ্ট্রিয়ান, হাঙ্গারিয়ান ও জার্ম্মাণদিগের এক্ষণে ইংলণ্ডে বাস করা কঠিন। প্রায় সকলকে বন্দীভাবে থাকিতে হয়। এইজন্য কেহ কেহ নানা কৌশলে ইংরাজের কৃপাপাত্র হইয়া আমেরিকায় আসিবার অনুমতি-পত্র পাই-য়াছে। এইরূপ অনুমতি-প্রাপ্ত পলাতক জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান জাহাজে অনেক দেখিলাম।

একজন হাঙ্গারিয়ান যুবক হাঙ্গারী দেশীয় কোন জাহাজকোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিত। যুবক ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে কোম্পানীর কাজ এক প্রকার বন্ধ রহিয়াছে। লণ্ডনে ইহাদের একটি প্রধান কেন্দ্র। যুবক লণ্ডনের আফিসে কর্ম্মচারী ছিল। যুদ্ধের হিড়িকে ইংরাজেরা ইংলণ্ড-প্রবাসী প্রত্যেক অষ্ট্রিয়ান, হাঙ্গারিয়ান ও জার্ম্মাণ নরনারীকে গুপ্তচর জ্ঞানে কারারুদ্ধ করিতেছেন।

এই উপায়ে প্রায় ১০,০০০ লোক এক্ষণে বন্দী হইয়াছে। হাঙ্গারিয়ান যুবক ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাইয়া সপ্রমাণ করিয়াছে যে, তাহার শরীর অসুস্থ, সুতরাং যুদ্ধকর্ম্মের জন্য অপটু। এইজন্য ইংরাজ-সরকার ইহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন। যুবক নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া কোন ব্যাঙ্কে চাকরী খুঁজিবে।

আর দুই জন পলাতকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইহাঁরা অল্পবয়স্কা কুমারী। একজন অষ্ট্রীয়ান, অপরটি তুরস্কের প্রজা—ইহুদি কন্যা। সঙ্গে অভিভাবক কেহই নাই এবং নিউইয়র্কে জাহাজ লাগিবার সময়ে যে ১৫০৲ দেখাইতে হইবে তাহাও সঙ্গে নাই। এমন কি জাহাজের টিকেট কিনিবার পর হাতে মাত্র ২।৪৲ টাকা আছে। কিন্তু দুই জনেই নির্ভীক হৃদয়ে সাহসের সহিত চলা-ফেরা করিতেছে। কোন রূপ উদ্বেগ বা আশঙ্কা নাই। উভয়েই জার্ম্মাণ ছাড়া ফরাসী ও ইংরাজী কিছু কিছু জানে।

পলাতক কুমারী-দ্বয়

শুনিলাম, ইহারা আমেরিকায় পৌঁছিয়া চাকরী করিবে—সেই চাকরীর আশায়ই এতদূর আসিতেছে। ইহুদি-কন্যা শিক্ষয়িত্রী—স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোর কোন বিদ্যালয়ে কর্ম্ম পাইবার আশা করিতেছে। অষ্ট্রীয়ান-কন্যা ইতিমধ্যে বিলাতে থাকিতে থাকিতে নিজের অন্নসংস্থান করিয়া দেশে মাতার নিকট অর্থ সাহায্য পাঠাইয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পর লণ্ডনে থাকা কঠিন হয়, অথচ কর্ম্মাভাব এবং অন্নাভাব। কিন্তু দেশ হইতে টাকা আনাইবার পথও বন্ধ। কাজেই আমেরিকাবাসী কোন দূর আত্মীয়ের অর্থ সাহায্যে তাঁহার গৃহে আসিতেছে। এই খানে নাকি কোন চাকরী পাওয়া যাইবে। এই দুই জনেরই নিজে খাটিয়া অন্নসংস্থান করিবার ইচ্ছা বলবতী। পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে কেহই চাহে না।

এক ইয়াঙ্কির সঙ্গে আলাপ হইল। ইহাঁর লম্বাচৌড়া আস্ফালন দেখিয়া হাস্যসংবরণ করা কঠিন। প্রথমেই ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা; তাহার পর ব্যবসায়ের কথা। ইনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আর কি, মহাশয়? দেখিতেছেন কি? যুদ্ধের ফলে জগতে কি হইবে জানেন? দুনিয়ার বাজারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া উঠিবে। ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি আমরা কিনিয়া ফেলিয়াছি! ইংরাজের বাণিজ্যও সবই ইয়াঙ্কিদের হস্তগত হইতে চলিল। ইয়োরোপের এই সংগ্রামে আমেরিকাবাসীর ষোলআনা লাভ।" তারপর যুদ্ধসম্বন্ধে কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে কি হইবে?" ইনি বলিলেন, "আমরা কি বেকুব যে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইব? আর যুদ্ধ বাধিলেই বা ভয় কি? আমাদের বিজ্ঞানবীরেরা এরূপ অদ্ভুত বারুদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যে, ২০০ মাইল দূরের জাহাজ পলকের মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অবশ্য আমাদের শত্রুপক্ষীয় কোন লোকই এখনও সেকথা জানে না। যুদ্ধ বাধিলেই মজা দেখাইব।" আমেরিকা অত্যুক্তির দেশ বলিয়া জানিতাম। এই বাক্যবীর ইয়াঙ্কিকে দেখিয়া খাঁটি আমেরিকান "ব্লাফের" পরিচয় পাইলাম।

ইনি সহযাত্রীদিগকে জাহাজের নানা স্থানে লইয়া গিয়া নানা জিনিষ দেখাইতেছেন, নানা বক্তৃতা করিতেছেন। সকলকে বুঝান হইতেছে, "এই যে কলটা দেখিতেছেন ইহা আর কোন জাহাজে পাইবেন না— ইহা ইয়াঙ্কিদের খাস। অমুক সুবিধা, অমুক ব্যবস্থা, অমুক নিয়ম ফরাসী, জার্ম্মাণ বা ইংরাজ জাহাজকোম্পানীরা করিতে পারেন না। এই সকল নূতন নূতন যাহা কিছু দেখিতেছেন সবই আমরা আবিষ্কার করিয়াছি।" ইত্যাদি।

তিনজন জাপানী অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হইল। একজন তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা এবং তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ইনি ২০ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি বলেন, "বৌদ্ধ প্রভাবে বহু সংস্কৃত শব্দ জাপানী ভাষার অন্তর্গত হইয়াছে। প্রাচীন এশিয়ায় জাতিসংমিশ্রণ এবং ধর্ম্ম-বিনিময় কিরূপে সাধিত হইয়াছিল, ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে তাহা নূতন উপায়ে স্পষ্ট হইতে পারে। এশিয়ার প্রাচীন ও নবীন ভাষাগুলি সম্বন্ধে এই কারণে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা আরম্ভ করা আবশ্যক।"

জাপানী পর্য্যটক

অধ্যাপক মহাশয় রুশিয়া হইতে জার্ম্মাণি ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ দেখিয়া ঘরে ফিরিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়া এবং পরে ইংলণ্ড এই দুই দেশমাত্র ঘুরিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে আমেরিকা দেখিয়া জাপানে যাইবেন।

দ্বিতীয় জাপানী ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। ইনি ১৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার ইয়োরোপ ঘুরিয়া গিয়াছেন। ইতি মধ্যে পাশ্চাত্য জগতে কোন্ কোন্ বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য ইনি দ্বিতীয়বার আসিয়াছেন। ইনি বলেন, "আমি যখন প্রথম বিলাতে আসি তখন ওদেশে ইলেকট্রিক্যাল কারখানা অতি সামান্য ধরণের ছিল। এখনও ইংলণ্ড হইতে এবিষয়ে জাপানের কিছু শিখিবার নাই।" ইনি সুইজর্ল্যাণ্ড এবং জার্ম্মাণির প্রশংসা করিলেন।

তিনজন জাপানীই গবর্মেণ্টের খরচে প্রেরিত হইয়াছেন। কোথায় কোন্ জিনিষ নূতন এবং জাপানে প্রবর্ত্তনযোগ্য বিশেষভাবে এই অনুসন্ধানই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। কাজেই ইঁহারা কেহই নিতান্ত নাবালক নহেন। দেশে কাজকর্ম্ম করিয়া যাঁহারা পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারাই

বিদেশের তথ্য সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যাপক জাপানের কোন প্রাদেশিক শিক্ষক-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। শিক্ষা-বিজ্ঞান ইহাঁর আলোচ্য বিষয়। ইনি জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবৎসর কাটাইয়া দেশে ফিরিতেছেন। শুনিলাম, যুদ্ধ বাধিবার পর জার্ম্মাণি হইতে পলাইবার সময়ে ইহাঁর বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল।

জাহাজে সমাজ

জাহাজে সদসৎ নানা প্রকার নরনারীই যাওয়া আশা করে। অভিভাবকবিহীন রমণীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে কোম্পানীর সন্দেহ। বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনে ইয়োরোপ হইতে বেশ্যা আমদানীর বিরুদ্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। এজন্য স্বাধীন রমণীদিগের উপর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি কিছু বেশী। জাহাজ লাগিবামাত্র প্রত্যেকের ঠিকানা ভাল করিয়া দেখা হয়। কেহ অসচ্চরিত্রা প্রমাণিত হইলে, তাহাকে বন্দরে নামিতেই দেওয়া হয় না। যদি কেহ বলে, "আমার সঙ্গে কোন অভিভাবক নাই বটে কিন্তু আমি আমার আত্মীয়ের গৃহেই যাইতেছি," তাহা হইলে তাহার কথানুসারে কোম্পানীর লোক রেলওয়েষ্টেসন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া টিকেট কিনিয়া দেয় অথবা তাহার আত্মীয়ের নিকট তারে সংবাদ লইয়া কর্ত্তব্য স্থির করে। এ যাত্রায় বুঝিলাম, অষ্ট্রীয়ান-কন্যা ও ইহুদি-কন্যাকে একজন রমণী কর্ম্মচারীর অধীনে রেলে বসাইয়া দেওয়া হইবে।

এত কড়া নিয়ম সত্ত্বেও দুর্নীতির অব্যাহত গতি। জাহাজে দুষ্ট চরিত্র স্ত্রীপুরুষেরা যথেচ্ছ আচরণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। তাহা ছাড়া ভদ্রঘরের যুবকযুবতীরাও জাহাজে প্রণয়পাশে বদ্ধ হইবার সুযোগ পায়। জাহাজে জীবন যাপন অনেক স্থলে বিবাহ-বন্ধনের উপায় স্বরূপ হইয়া উঠে। শুনিলাম, আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনের বিবাহের পাকা কথা হইয়া গেল।

পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহ বড়ই বিরল হইতে চলিয়াছে। বিশেষতঃ পুরুষেরা কোন এক জন রমণীর নিকট চির-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে না। কাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি সম্বন্ধে বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিতেছে। পুরুষের প্রতিজ্ঞা বা ভালবাসার কথা শুনিয়া পাশ্চাত্য রমণীরা আর ভুলে না। অথচ অন্নবস্ত্রের জন্য স্বামি-সংগ্রহও আবশ্যক। কাজেই পাশ্চাত্য জগতের রমণীসমাজ বড়ই দুঃখনৈরাশ্যময় জীবন যাপন করে।

২। নিউইয়র্কের আকাশস্পর্শী ব্যবসায়-সৌধ

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকাশস্পর্শী প্রাসাদের নগর

মোটাকথা

তিন হাজার মাইলব্যাপী মহাসাগর পার হইয়া লণ্ডন হইতে নিউ-ইয়র্কে আসিয়াছি। কিন্তু একটা নূতন দেশে উপস্থিত হইয়াছি, এ ধারণা যেন শীঘ্র হওয়া কঠিন। নিউইয়র্কের নরনারী, নিউইয়র্কের হোটেল-কাফিগৃহ, থিয়েটার-নৃত্যভবন, নিউইয়র্কের ট্রাম, রেল, ব্যাঙ্ক, গুদাম ইত্যাদি দেখিলে লণ্ডন সমাজেরই চিত্র সহজে মনে পড়ে। ইংরাজ জীবনে ও ইয়াঙ্কি-জীবনে প্রভেদ এক প্রকার নাই বোধ হই-তেছে। প্রাচ্যের চোখে গোটা পাশ্চাত্য মুল্লুকই যেন একরূপ।

নিউইয়র্কে লোকজনের চলাফেরা বেশী কি লণ্ডনে লোকজনের চলাফেরা বেশী সহজে এ বিষয়ে বিচার করা অসম্ভব। ব্যবসায়-বাণিজ্যের কোলাহল এবং নরনারীর গতিবিধি দুই মহানগরীতেই প্রায় একরূপ। আমেরিকায় বিলাত অপেক্ষা ক্ষিপ্রতা বা "তাড়াহুড়া" বেশী এরূপ বিশ্বাস করিবার বোধ হয় কোন কারণ নাই। অবশ্য "আমে-রিকান হারি" (American hurry) নামক একটা প্রবাদ বহুকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি।

লণ্ডনের ভূগর্ভে রেলপথ আছে—নিউইয়র্কেও তাহা দেখিলাম।

রাস্তাঘাট

নিউইয়র্কে যাতায়াতের উপায় সম্বন্ধে একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেছি। কতকগুলি রাস্তার ঊর্দ্ধভাগে উচ্চ

সেতু প্রস্তুত করা হইয়াছে; সেই সেতুর উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত। তাহা ছাড়া সাধারণ রাস্তায় ট্রাম-পথ ত আছেই। ফলতঃ নিউইয়র্কের কোন কোন পাড়ায় একই স্থানে তিনটি পথ একই দিকে বিস্তৃত। প্রথমতঃ সাধারণ মাটির উপর পথ। এই পথে আমাদের পরিচিত ট্রামগাড়ী চলে। দ্বিতীয়তঃ আকাশে সেতুর উপর রেলপথ। তৃতীয়তঃ মাটির নীচে ভূগর্ভস্থিত রেলপথ।

লণ্ডনে বাস্‌গাড়ী ও মোটরকারের সংখ্যা যত বেশী নিউইয়র্কে তত নয়। কিন্তু মোটের উপর দুই স্থানেই জীবন-প্রবাহ এবং নরনারীর গতিবিধি এক ধরণের। এই হিসাবে লণ্ডন ছাড়িয়া নূতন নগরে আসিয়াছি মনে হয় না।

বিলাতে শীতের প্রারম্ভে কুয়াশা ও বর্ষা দেখিয়াছি। নিউইয়র্কের আব্‌হাওয়া অন্যরূপ। এখানে বাতাস অতিশয় শুক্‌না এবং আকাশ সর্ব্বদা পরিষ্কার। প্রকৃতির রূপ-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া নূতন জনপদের ধারণা জন্মিতেছে।

তাহা ছাড়া নগরের বহির্দৃশ্য সম্বন্ধে নূতনত্ব লক্ষ্য করা নিতান্তই সহজ। এখানকার পথ-সমাবেশ এবং গৃহ-নির্ম্মাণ-রীতি দেখিবামাত্র অভিনব দেশের ধারণা জন্মে। বিলাতের কোন নগরে এরূপ সতরঞ্চির ঘরকাটার মত রাস্তা বসান দেখি নাই, অথবা পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ চতুষ্কোণ অট্টালিকাশ্রেণীও চোখে পড়ে নাই। সমান্তরাল পথরাজি এবং অভ্রভেদী প্রাসাদ ("স্কাই-স্ক্রেপার") এই দুই বস্তু নিউইয়র্কের বিশেষত্ব।

উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত রাস্তাগুলির নাম এ্যাভিনিউ। পূর্ব্বে পশ্চিমে বিস্তৃত রাস্তাগুলির কোন বিশেষ নাম নাই। প্রায় সকল রাস্তাই ১, ২, ৩, ৪, ৫, ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হয়। কাজেই

বিদেশীয় পর্য্যটকেরাও অতি সহজে রাস্তা খুজিয়া বাহির করিতে পারে। পথ ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য কতকগুলি রাস্তার নাম প্রসিদ্ধ লোকের নাম অনুসারে দেওয়া হইয়াছে।

এরূপ পথ-সন্নিবেশ একটা নূতন মহাদেশেই সম্ভব। যেখানে অনন্ত খোলা মাঠ পড়িয়া রহিয়াছে সেখানে নূতন ধরণে কোন কল্পিত আদর্শ অনুসারে নগর বসান যাইতে পারে। ইয়োরোপে ও এশিয়ায় এ ভাবে কোন নগর গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ঐ সকল জনসমাজ যুগে যুগে নানা সুবিধা-অসুবিধার ভিতর জীবন ধারণ করিয়াছে। কোন এক ছাঁচ মনে রাখিয়া তাহারা তাহাদের বসতি নির্ম্মাণ করিবার সুযোগ পায় নাই। কাজেই নানাপ্রকার জটিল অলিগলি প্রাচীন জগতের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। কিন্তু আমেরিকা মাত্র ৪০০ বৎসরের আবিষ্কৃত দেশ। এই মহা ভূখণ্ডের অধিকাংশই অব্যবহৃতরূপে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। নিউইয়র্কে ৪০০ বৎসর হইতেই বসতি নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম ৩০০ বৎসর ইহা অতি নগণ্য নগরমাত্র ছিল। আজ যাহা কিছু দেখিতেছি সবই বিগত ১০০ বৎসরের সৃষ্টি—এমন কি মাত্র ৫০।৬০ বৎসরের বস্তু। পূর্ব্বে যেখানে খোলা জমি বন জঙ্গল ছিল আজ সেখানে প্রশস্ত রাজপথ এবং অত্যুচ্চ হর্ম্ম্যশ্রেণী বিরাজিত। নিউইয়র্কের অধিবাসীরা প্রাচীন ইয়োরোপের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কাজে নামিয়াছিল। কাজেই ইয়োরোপীয় নগরসমূহের অসুবিধাগুলি তাহারা দূর করিতে পারিয়াছে। নিউইয়র্কের সরল সমান্তরাল পথ-সমাবেশ এই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিতেছে।

লণ্ডনে ৭।৮ তলার বেশী উচ্চ গৃহ দেখি নাই। নিউইয়র্কে ৮।১০ তলার গৃহই সাধারণ। ২৫।৩০ তলা অট্টালিকা যে কত আছে তাহার সংখ্যা নাই। রাস্তায় দাঁড়াইয়া

বাড়ীঘর

কোন অট্টালিকার তলগুলি গণনা করিতে গেলে ঘাড়ে ব্যথা পাওয়া যায়। অনেক সময়ে গণনা করিতে ভুলও হইয়া পড়ে।

অধিকাংশ গৃহই প্রস্তরে ও লৌহে নির্ম্মিত। কাঠের কাজ অনেক গৃহেই নাই। আগুন লাগার ভয়ে কাঠ ব্যবহার করা হয় না।

কোন কোন অট্টালিকার ভিতর এতগুলি কুঠুরী আছে যে, সর্ব্বসমেত ১৬,০০০ স্বতন্ত্র আঁফিস্ তাহার ভিতর অবস্থিত। বলা বাহুল্য, কোটি কোটি টাকায় এক একটা অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। নিউ ইয়র্কের অট্টালিকাগুলি দেখিলেই এখানকার ধন সম্পদ বুঝিতে পারা যায়। এখানে যতগুলি প্রসিদ্ধ শিল্প-ভবন, ব্যাঙ্ক-ভবন ও ব্যবসায়-ভবন আছে সবই এইরূপ প্রাসাদতুল্য পর্ব্বতাকার অট্টালিকা।

এইরূপ কতকগুলি অট্টালিকা দেখিবার পর জগতের সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা দেখিলাম। উহার নাম উলওয়ার্থ টাওয়ার। ইহাকে এখানকার তাজমহল বলা যাইতে পারে। যথাসম্ভব সৌন্দর্য্যময় ও কারুকার্য্য-শোভিত এরূপ ব্যবসায়-ভবন আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। সর্ব্বসমেত ৬০ তল। এটা প্রায় ৮০০ ফিট উচ্চ—অর্থাৎ বাড়ীটা আড়াইটা কুতুব মিনারের সমান। তড়িত-চালিত সিড়ির উপর দাঁড়াইয়া ২।৩ মিনিটে উচ্চতম তলে উঠিলাম। সেখান হইতে নগরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দেখা গেল।

নিউইয়র্কে প্রথমে ওলন্দাজদেশীয় জনগণ উপনিবেশ স্থাপন করে। ষোড়শ-শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা অন্যান্য ইয়োরোপীয়গণের ন্যায় দুনিয়ার সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিত। তাহার চিহ্ন এখনও যবদ্বীপ। ভারতবর্ষেও সেই সময়ে তাহাদের ফ্যাক্টরী এবং প্রভাব ছিল। তখন নিউইয়র্কের নাম ছিল নিউ আমষ্টার্ডাম। মাতৃভূমির প্রসিদ্ধ নগর অনুসারে ওলন্দাজেরা নূতন জনপদের নাম দিয়া ছিল। নূতন জন-
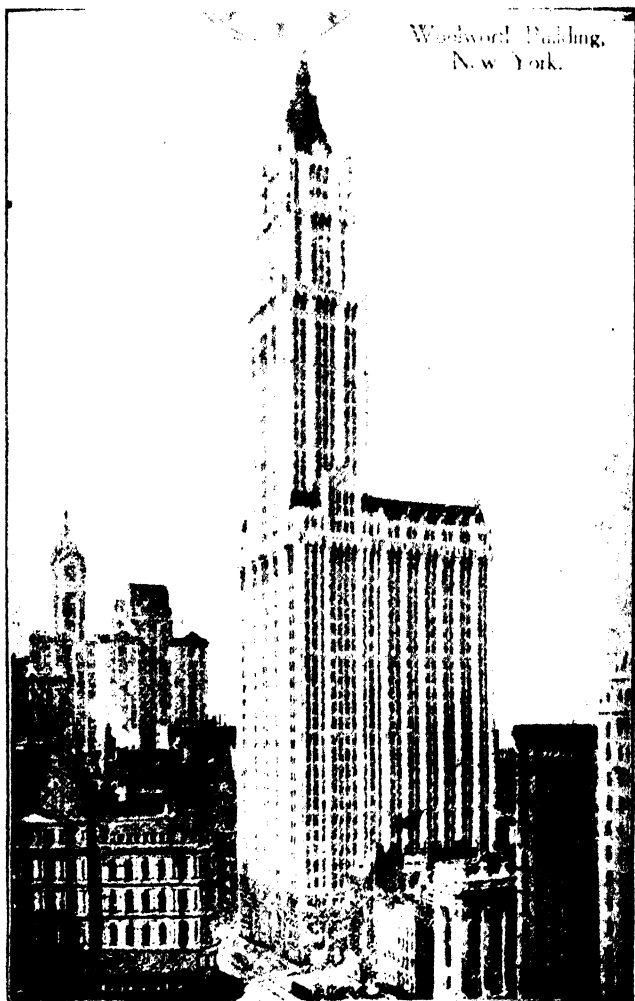
৩। যুক্তরাষ্ট্রের তাজমহল

পদের নাম করণ সম্বন্ধে হিন্দু ঔপনিবেশিকেরাও এই নিয়ম অনুসরণ করিত। শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি দেশে ভারতীয় নগরের নাম এখনও দেখিতে পাই।

সপ্তদশ-শতাব্দীতে ওলন্দাজরাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিতে থাকে। তাহার ফলে ওলন্দাজ উপনিবেশগুলি অন্যান্য জাতির হস্তগত হয়। নিউ আমষ্টার্ডাম ইংরাজের অধীনে আসে। সেই সময়ে দ্বিতীয় চার্লস রাজা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অব্ ইয়র্ক এই নগর দখল করেন। তাঁহার নামে নগর নিউইয়র্ক বলিয়া পরিচিত। এই ডিউক পরে দ্বিতীয় জেম্‌স নামে বিলাতে রাজা হন।

জাতীয় উৎসব

২৫ নবেম্বর আমেরিকাবাসীদিগের জাতীয় উৎসব-তিথি। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে ইয়োরোপের বিতাড়িত নর-নারীগণ আমেরিকায় পদার্পণ করে। পদার্পণ করিবামাত্র তাহারা ভগবানের কৃপাভিক্ষা করিয়াছিল এবং নিরাপদে পৌঁছিবার জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়াছিল। সেই কৃপা-ভিক্ষা, প্রার্থনা ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন এখনও প্রতি বৎসর ঐ দিবস করা হইয়া থাকে। তিথির নাম "থ্যাঙ্কস্ গিভিং ডে।"

নিউইয়র্কে পৌঁছিবার কয়েক দিনের ভিতরেই এই তিথি আসিল। আজকাল এই উপলক্ষে ধর্ম্মঘটিত কোন প্রকার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য নাই মনে হইতেছে। ভাল খাওয়াপরা, নাচগান, সংসাজা, মুখোসপরা ইত্যাদিই এই উৎসবের আনুষঙ্গিক কার্য্যকলাপ। একখানা সংবাদ-পত্রে লিখিত হইয়াছে, "গত বৎসর আমেরিকায় ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হয় নাই এবং আগামী বৎসরও ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। সুতরাং ভগবানকে ধন্যবাদ জানাইবার ইহাই প্রশস্ত সময়।"

আমেরিকার জনগণ কোন্ বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী এই রচনা হইতে বেশ বুঝা যায়। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"There are substantial reasons why the national day for acknowledgment of blessings should be celebrated with enthusiasm by the people of America. That peace prevails here while the other side of the world is in the grip of a devastating war, is in itself a cause for thanksgiving. That the tide of adversity has been checked and turned is another reason. But the grounds for satisfaction are not merely negative. It is not that conditions are not as bad as they might be, but that the outlook is full of promise. This is the thought for Thanksgiving Day.

Business is on the upward trend. Industry is speeding up. Men are going back to work after long idleness. Production is on the increase. The volume of tradeis enlarging with each day. The country is headed toward prosperity. These are the facts to flavour the feast, to key the hearts of a hundred million people, and to tune their voices to the anthem of the day of thanksgiving.

A great people marching on to better times, with sure tread, with heads held high, with spirit undaunted, with the world seeking our merchandise, with bright

৯। নিউইয়র্কের ব্যবসায়-পাড়া
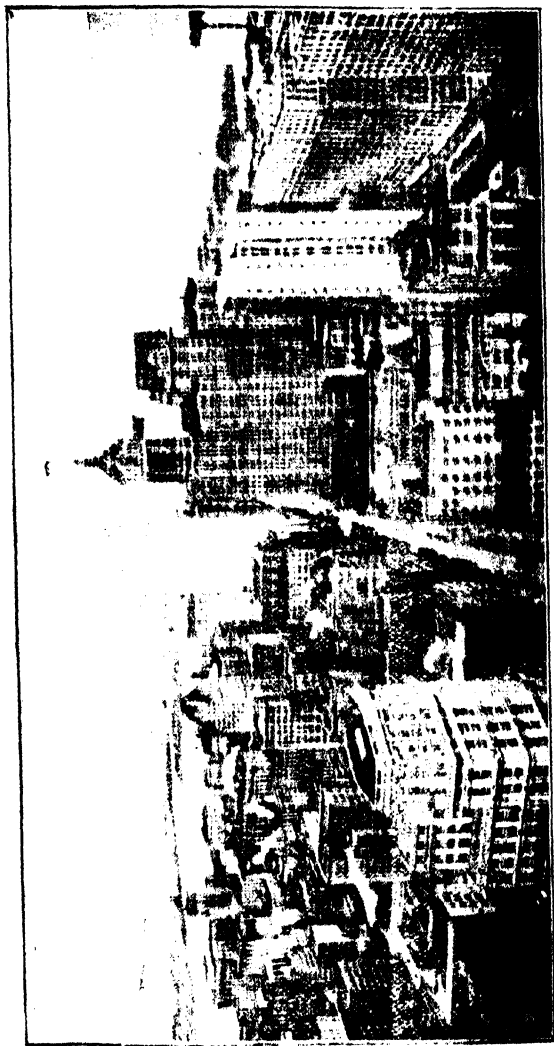
days not merely promised but assured—This is the spectacle that America presents this Thanksgiving day." অর্থাৎ "এই বৎসর ভগবানের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার বিশেষ কারণও আছে। দুনিয়ার লোকেরা লড়ালড়ি করিয়া মরিতেছে; আমরা শান্তিতে বসবাস করিতেছি। টাকা পয়সার বাজারে দুর্য্যোগ ছিল—সে দুর্য্যোগ আর নাই। এদিকে সকল ক্ষেত্রেই উন্নতি হুহু করিয়া বাড়িতেছে। ব্যবসায়ের গতি উর্দ্ধদিকে—শিল্পের সংসারও বেশ সন্তোষজনক। ধর্ম্মঘট ইত্যাদির প্রকোপ নাই। কারখানায় মাল উৎপাদনের জোড় বাড়িয়াই চলিয়াছে। কাজেই দশকোটি লোক সমস্বরে আজ ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিবে না কেন?

এত বড় জাতি—সম্মুখে সুখের সময় দেখা যাইতেছে—এই অদম্য উৎসাহ ও সাহস—সকলেই শির খাড়া করিয়া চলিতেছে। তাহার উপর, দুনিয়ার লোকে আমাদের বাজারে মাল কিনিবার ফরমায়েস দিতেছে। আজকার দিনে এই দৃশ্য—কাজেই শুভতিথির উপযুক্ত শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সকলের পক্ষেই অতি স্বাভাবিক।"

ইয়াঙ্কিরা দোকানদার জাতি। জাতীয় উৎসবের দিনে ব্যবসায়ে লক্ষ্মী লাভের চিন্তা ছাড়া ইহাদের অন্য কথা মনে আসে না।

পরিষৎ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক নগরেই নানাপ্রকার বিজ্ঞান-পরিষৎ, সাহিত্য-পরিষৎ, শিল্প-পরিষৎ, কলাভবন, চিত্রালয়, মিউজিয়াম, অনুসন্ধান-গৃহ, পরীক্ষা-মন্দির ইত্যাদি থাকে। নিউইয়র্কে এইরূপ চিন্তা-কেন্দ্র ও কর্ম্ম-কেন্দ্রের সংখ্যা করা অসম্ভব। সকল দেশেই সুধী-সমিতিসমূহের কার্য্যপ্রণালী এবং উদ্দেশ্য এক প্রকার। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তথ্য বিশেষরূপে সংগৃহীত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হয়। এক দেশে যে বস্তুর চর্চ্চা বেশী, অন্য দেশে তাহার চর্চ্চা কম। কাজেই কোন দেশে ভ্রমণ করিতে আসিলে একবার তাহার অন্তর্গত সভা-সমিতি, পরিষৎ, সম্মিলন, মিউ-জিয়াম, এ্যাকাডেমী ইত্যাদির ভিতর যাওয়া আবশ্যক। "লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখিয়াছি, সুতরাং দুনিয়ার সকল জিনিষই দেখা হইয়াছে" এরূপ চিন্তা করা উচিত নয়।

নিউইয়র্কের কয়েকটা প্রতিষ্ঠান দেখা গেল। বলা বাহুল্য, কোনটাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া বুঝিবার অবসর নাই। প্রধানতঃ গাইড্-বুকের সাহায্যে বিষয়টা আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। কোন কোন কেন্দ্রে দুই একজন কর্ম্মচারী অথবা তত্ত্বাবধায়ক কিম্বা গবেষণা-কারী পণ্ডিতের সাহায্য পাইয়াছিলাম। এইরূপ সাহায্য পাইলেই অল্প সময়ে বেশী শিক্ষা লাভ করা যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যথাকালে সাহায্যকারী বন্ধু জুটিয়া উঠে না।

আমেরিকাবাসী ভূগোলবেত্তারা প্রধানতঃ দুইটি পরিষদের সভ্য। ইহাঁরা মুখ্যভাবে নূতন মহাদেশের সকল প্রকার ভৌগোলিক তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকেন। গৌণভাবে এসিয়া, ইয়োরোপ ও আফ্রিকার ভূতত্ত্বও ইহাঁদের আলোচ্য-বিষয়। অধিকন্তু কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য এবং রাষ্ট্র ইত্যাদির উপর নদ নদী জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা করা ইহাঁদের উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত।

ভূগোল-পরিষৎ

একজন ধনী ইয়াঙ্কি স্পেন ও পর্ত্তুগাল বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিলে খেয়াল হইল যে, আমেরিকায় স্পেন ও পর্ত্তুগাল সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধানালয় এবং মিউজিয়াম স্থাপন করিবেন। তৎক্ষণাৎ অর্থব্যয়—গৃহপ্রতিষ্ঠা এবং লাইব্রেরী স্থাপন হইয়া গেল। নানা চিত্র, কারুকার্য্য, প্রাচীন পুঁথি, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের হস্তলিপি, পুরাতন মানচিত্র, আদিম গোলক, সন্ধিপত্র, কাচ, চীনমাটীর কাজ, মখমল ইত্যাদি নানাবিধ প্রদর্শনীয় বস্তু এই মিউজিয়াম-ভবনে সংগৃহীত হইয়াছে। স্পেন ও পর্ত্তুগাল সম্বন্ধে একটা গোটা সংগ্রহালয় ইয়োরোপ ও আমেরিকার আর কোন নগরে নাই।

স্পেন-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা

এই সভার অধিবেশন কখনও হয় নাই। ইহার সভ্য-সংখ্যা অতি অল্প। জার্ম্মাণ, রুষ, ফরাসী, ইংরাজ, ইয়াঙ্কি, স্পেনীশ, পর্ত্তুগীজ ইত্যাদি নানা জাতীয় পণ্ডিতগণের দুই চারিজন করিয়া এই সভায় যোগ দান করিয়াছেন। ইহাঁরা কেহ ইংরাজিতে, কেহ ফরাসীতে, কেহ জার্ম্মাণে, কেহ স্পেনিষ ভাষায় স্পেন-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া থাকেন। এই গবেষণাগুলি সভার ত্রৈমাসিক পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ কয়েকখানা মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনাও করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত পরিষদ্‌দ্বয়ের সংলগ্ন মুদ্রাতত্ত্বপরিষদের গৃহ। সকল গৃহই অতিশয় রমণীয়—যথেষ্ট অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত। মুদ্রাতত্ত্ব আলোচনার সুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্য এই পরিষৎ জগতের প্রাচীন নবীন সকল প্রকার মুদ্রা, ব্যাঙ্কনোট, চেক্ ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কি, বর্ত্তমান বর্ষে ইয়োরোপীয় সংগ্রামের ফলে প্রত্যেক দেশে যে সকল "নোট" বাহির করা হইয়াছে তাহার নমুনাও দেখিলাম।

মুদ্রা-তত্ত্ব সমিতি

আমেরিকার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা লেখা পড়া শেষ করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে চেষ্টা করে। এই জন্য তাহারা যে যেখানে কর্ম্ম করে সেখানে তাহাদের মাতৃস্থানীয় বিদ্যামন্দিরের নামে একটি করিয়া ক্লাব স্থাপন করিয়া থাকে। নিউইয়র্কে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে এইরূপ কতকগুলি সমিতি আছে। তাহাদের মধ্যে হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ ছাত্রেরা যে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাই বিখ্যাত। পৃথিবীর সকল স্থানেই হার্ভার্ড-ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে—কারণ সর্ব্বত্রই হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা জীবনযাপন করিতেছে। নিউইয়র্কের হার্ভার্ড-ক্লাব অন্যান্য হার্ভার্ড-ক্লাব অপেক্ষা বেশী প্রতাপশালী।

হার্ভার্ড ক্লাব

এই সকল ক্লাবে সাধারণতঃ আলাপ-পরিচয়, বন্ধুত্ব, সৌভ্রাত্র, মিলন, সভা, বৈঠক, সাহিত্যালোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ সুধীব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করা হয়। পণ্ডিত-মহলে ভাবের আদান-প্রদান এবং কর্ম্মবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি অন্যান্য ক্লাবের ন্যায় হার্ভার্ড-ক্লাবেরও উদ্দেশ্য। ক্লাবে বাস করিবার নিয়ম আছে। খরচ কিছু বেশী।

হার্ভার্ড-ক্লাবের ভবন দেখিবার জিনিষ। এখানকার লাইব্রেরী

মন্দ নয়। ক্লাবে প্রবেশ করার অথবা বাস করার অধিকার সকলেই পায় না। হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ অথবা ক্লাবের কোন সভ্য অনুমোদন না করিলে কোন ব্যক্তি ক্লাবের সুযোগগুলি ভোগ করিতে পারেন না। নিউইয়র্কের একজন প্রসিদ্ধ এ্যাটর্ণী এবং হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ অধ্যাপকের অনুরোধে ক্লাবের গৃহ-ব্যবস্থাপক সমিতি এখানে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

জাহাজের কারখানা

যুক্ত-রাষ্ট্রের রণতরী-বিভাগের বিরাট কারখানা দেখিলাম। গ্লাসগো বন্দরে ক্লাইডনদীর ধারে জাহাজ তৈয়ারী দেখিয়াছিলাম। এখানেও তাহা দেখিবার সুযোগ পাওয়া গেল। কিন্তু গ্লাসগোর তুলনায় নিউইয়র্কের কারখানা খেলানার সামগ্রী মাত্র। নানা প্রকার রণতরী, মাইন, টর্পেডো ইত্যাদি দেখিয়া কারখানা-গৃহগুলির সাজ-সরঞ্জাম দেখিয়া লইলাম। প্রাচীন অর্ণবযান-সম্পর্কিত নানা বস্তু কারখানার বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই সকল বস্তু একটা মিউজিয়ামে রক্ষিত হইত। এক্ষণে মিউজিয়াম নাই। সর্ব্বসমেত ২।৩ হাজার মাত্র কারিগর এই কারখানায় কাজ করে।

কুপার-ইউনিয়ন

বলা বাহুল্য, নিউইয়র্কে বহু দরিদ্র নরনারীর বাস। ইহারা বিনা পয়সায় নিম্ন-শিক্ষা লাভ করিবার পর কোন উপায়ে জীবন ধারণ করিতেছে। এই সকল লোকের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য রাত্রিকালে নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। কুপার-ইউনিয়ন তাহাদের অন্যতম। কুপার নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা একটি বিরাট শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রগণকে নানা প্রকার শিল্প, ব্যবসায়, ও বিজ্ঞান

বিনা বেতনে শিখান হইতেছে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে যে পরিমাণ জ্ঞান বিতরিত হইয়া থাকে, কুপার-ইউনিয়নেও প্রায় সেই পরিমাণ জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলতঃ শ্রমজীবিরা সহজেই অত্যুচ্চ বিদ্যালাভের সুযোগ পাইতে পারে। চিত্র-বিদ্যাবিষয়ক ব্যবস্থা দেখিবার সময় ছিল মাত্র।

ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন, গৃহনির্ম্মাণ, টাইপরাইটিং ইত্যাদি ব্যতীত ধন-বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিক্ষাপ্রণালী, নগরশাসন এবং সমাজ-বিষয়ক অন্যান্য তত্ত্বও ইউনিয়নে আলোচিত হইয়া থাকে। নিম্নে কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে:—ঐতিহাসিক তথ্যের সমালোচনা ও ব্যাখ্যা, শুল্ক-নীতি, জুরীর বিচার, মূল্য বৃদ্ধি দক্ষিণ আমেরিকার কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবর্মেণ্টের শাসন, সেক্স্‌পীয়ারের নাটক, রঙ্গমঞ্চে চরিত্র-গঠন, আদর্শ নগর-প্রতিষ্ঠা, জার্ম্মাণগবর্মেণ্টের জনসেবা।

সাত কোটী টাকায় বিরাট গ্রন্থালয়ের ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে।

পাব্‌লিক লাইব্রেরী

কলিকাতার ত্রিশটা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী একত্র করিলে বোধ হয় নিউইয়র্কের পাব্‌লিক লাইব্রেরীর ধারণা করা যায়। তাহা ছাড়া নগরের নানা স্থানে এই গ্রন্থালয়ের ৪০।৫০টা শাখা স্থাপিত হইয়াছে। লাইব্রেরী হইতে অতি সহজে গ্রন্থ বাহির করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। কেবলমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থ-তালিকার উপর নির্ভর করিতে হয় না! প্রত্যেক গ্রন্থের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এক একটা কার্ডে লিখিত হইয়াছে। এই কার্ডগুলি বর্ণমালানুসারে এক প্রকোষ্ঠে সাজান রহিয়াছে। সুতরাং ক্যাটালগ বলিলে একটা ঘর বুঝিতে হইবে। গ্রন্থকারের নাম অথবা গ্রন্থের নাম মনে থাকিলে কার্ড দেখিয়া গ্রন্থ বাহির করিতে পারা যায়। এই ধরণের লাইব্রেরী সাজান ইয়াঙ্কিদের খাস আবিষ্কার।

২৯ পৃষ্ঠা
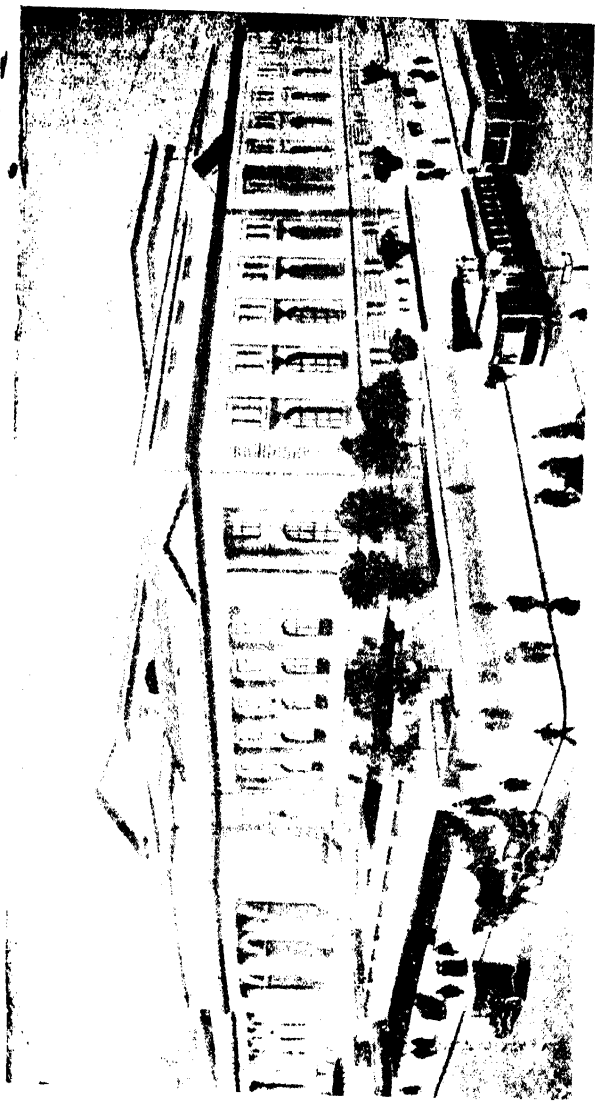
৫। নিউইয়র্কের বিরাট গ্রন্থশালা

লাইব্রেরীর ভিতর চিত্রসংগ্রহালয়ও দেখিলাম। একটা বিশেষ কথা এই যে, এই বিরাট কারবারের ভিতর অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাদের উপযোগী পুস্তকের ঘর আলাদা।

জীবতত্ত্ববিষয়ক সংগ্রহালয়

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জীবতত্ত্ববিভাগ অপেক্ষা এখানকার ন্যাচার্যাল হিষ্টরি মিউজিয়াম ক্ষুদ্রতর বোধ হইল। এখানে নৃতত্ত্ব বিষয়ক কতকগুলি বস্তুও সংগৃহীত হওয়া উচিত ছিল। এই বস্তুসমূহ দেখিয়া আমেরিকার আদিমনিবাসিদিগের জীবন-যাত্রা-প্রণালী বুঝিতে পারা যায়। মেক্সিকো, পেরু, মধ্য আমেরিকা ইত্যাদি জনপদের প্রাচীন সভ্যতা এবং লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান জাতিপুঞ্জের কৃষি, শিল্প, গৃহনির্ম্মাণ, পোষাক, খাদ্যদ্রব্য, বিবাহ, ইত্যাদি নানা বিষয় এই সমুদয়ের দ্বারা প্রচারিত হইতেছে। পূর্ব্বে কখনও এই দিকে বিশেষরূপে আমার দৃষ্টি পড়ে নাই। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে জগতের আদিম জাতিপুঞ্জ অথবা বর্ত্তমান কালের অসভ্য মানব সমাজ সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্যই সংগৃহীত আছে। কিন্তু ঐ বিশাল তথ্যসাগরের ভিতর আমেরিকার প্রাচীন নরসমাজবিষয়ক বস্তু অন্বেষণ করিবার অবসর ঘটে নাই। সেইরূপ লণ্ডনে কেল্টিক সভ্যতার নিদর্শনও চোখে পড়ে নাই। বিরাট প্রতিষ্ঠানে দুই চারিবার মাত্র প্রবেশ করিলে কোন বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করা অসম্ভব।

কাজেই ডাব্লিনের মিউজিয়ামে প্রাচীন কেল্টের জীবনযাত্রা বুঝিতে চেষ্টা করা গিয়াছিল। সম্প্রতি নিউইয়র্কে আমেরিকার আদিম অধিবাসিদিগের কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারিলাম। এই সম্বন্ধে কয়েকখানা গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলি সঙ্গে লইয়া মিউজিয়ামে ঘুরিলে স্থায়ী ফললাভ হইতে পারে।

এথ্‌নলজি, এ্যান্থ্‌পলজি ইত্যাদি নরনারীদিগের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে মানবাত্মার ঐক্য দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। সর্ব্ব প্রাচীন মানবসমাজে এবং নূতনতম জাতিতে শেষ পর্য্যন্ত কোন গভীর প্রভেদ পাওয়া যায় না। যাহাদিগকে অসভ্য বা বর্ব্বর বলিয়া জানি, সেই সকল জাতির সঙ্গে তথাকথিত সুসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য মানব জাতির তুলনা করিলে 'অসভ্য'কেও অনেক বিষয়ে সুসভ্য বলা আবশ্যক হইবে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র এবং সকল কালে মানবহৃদয় প্রায় একই ধরণে স্পন্দিত হইয়াছে।

নিউইয়র্কের মিউজিয়ামে বিশদ-ব্যাখ্যা-সমন্বিত কার্ড প্রত্যেক বস্তুর সম্মুখে ঝুলান আছে। লণ্ডনেও এইরূপ দেখিয়াছি। কোন প্রদর্শক অথবা গ্রন্থের সাহায্য না লইয়াও সহজেই বিষয়টা বুঝা যায়। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা যাহাতে মিউজিয়ামকে শিক্ষালয়-রূপে ব্যবহার করিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেখিলাম, কোন কোন স্থানে ছাত্রছাত্রীরা বস্তুগুলি দেখিয়া চিত্র অঙ্কন করিতেছে।

সুকুমার কলাভবন

নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম আধুনিক যুগের চিত্র ও ভাস্কর্য্যের বিশিষ্ট সংগ্রহালয়। এখানে প্রাচীন গ্রীসের স্থাপত্য অথবা মধ্য যুগের চিত্র-কলার নিদর্শন সংগ্রহ করিবার জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা সচেষ্ট নন বুঝিতে পারা গেল। আধুনিক ভাস্কর ও চিত্রকরগণের ভিতর ইঁহারা ফরাসী শিল্পীদিগকেই বিশেষ স্থান দিয়াছেন। ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের হৃদ্যতা বেশী। প্রাকৃতিক দৃশ্য বিষয়ক চিত্রাঙ্কনের প্রবর্ত্তক কোরো (Corot) এবং ডবিনি (Daubigny) দুই জনেই ফরাসী। ইঁহাদের কতকগুলি স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র এখানে দেখিলাম। তাহা ছাড়া, ফরাসী Frere এবং Gerome

মুসলমানী সমাজ সম্বন্ধে যে সকল চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তাহারও কতকগুলি এখানে আছে। আধুনিক ফরাসী স্থাপত্যের মৌলিক নিদর্শন এই সংগ্রহালয়ে একটিও নাই। সেই সমুদয়ের নকল মাত্র সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে।

এই কলাভবনে প্রাচীন জগতের কাচনির্ম্মিত বস্তুসমূহ প্রদর্শিত হইতেছে। খৃষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত সাইপ্রাস দ্বীপ, ইতালী, জার্ম্মাণি, ককেসাস পর্ব্বত ইত্যাদি নানা স্থানে কাচের ব্যবহার ছিল। তাহার নিদর্শন দেখিলাম। প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্যের অধীনে এবং প্রাচীন গ্রীক আমলেও কাচ অপরিচিত ছিল না। তাহার প্রমাণ এই সংগ্রহালয়ে পাওয়া গেল। এমন কি প্রাচীন মিশরীয় যুগেও কাচের প্রচলন ছিল। তবে মিশরের কাচব্যবসায়ী ফু দিয়া কাচের বস্তু তৈয়ারী করিতে পারিত না। তাহারা হাতে পিটাইয়া ধাতুজ পদার্থের মত কাচের জিনিষ প্রস্তুত করিত। এক সঙ্গে কাচের ব্যবহার বিষয়ক এতগুলি দ্রব্য দেখিবার সুযোগ এই প্রথম।

একটা ঘরে দেখিলাম কোন মূর্ত্তির নীচে লেখা আছে:—

"And they shall beat their swords into ploughshares,
And the lion shall lie down with the lamb."

অর্থাৎ "তলোয়ারে তৈরি হবে হালের ফাল,
আর সিংহের সহচর হবে ভেড়ার পাল।"

"ব্যাঘ্রে-বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়" কথাটা দেখিতেছি ভাস্কর্য্যেও স্থান পাইয়াছে!

এক সৈনিক পুরুষ তাহার তরবারি ভাঙ্গিয়া লাঙ্গল তৈয়ারী করিতেছে এবং তাহার পদতলে সিংহ ও মেষশাবক ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে শুইয়া

আছে। স্থপতি সিংহ ও মেষের প্রেমালিঙ্গন অতিশয় মনোরমভাবে দেখাইতে পারিয়াছেন।

শিল্পী বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া এই রচনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইনি একজন ইহুদিধর্ম্মাবলম্বী পোল।

কলাভবনে প্রাচ্য ভূখণ্ডের নিদর্শন বেশী নাই। যাহা কিছু আছে তাহা চীন সম্বন্ধীয়। নানাপ্রকার চীনা এনামেল এখানে দেখিলাম। এই গুলি সম্বন্ধে একখানা গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। নাম Catalogue of the Morgan Collection of Chinese Porcelains লেখক Stephen W. Bushell এবং William W. Lffoan. এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক অধ্যায় ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের বিশেষ আবশ্যক।

জীবন্ত পশুসংগ্রহালয় দুইটি। একটায় জলজন্তু রক্ষিত হইতেছে।

চিড়িয়াখানা

তাহাকে "একোয়ারিয়াম" বলে। পূর্ব্বে এই ভবনে সেনানিবেশ ছিল। নদীর ধারে বন্দরের উপর ইহা অবস্থিত। অপরটি বাগান—সাধারণ জুঅলজিক্যাল পার্ক। নগরের উত্তর সীমায় অবস্থিত। এই বাগানের বিবরণ একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থ সচিত্র, বিবরণগুলি সহজ ও নাতিবিস্তৃত। সাধারণ নিম্ন-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এই পুস্তক পাঠ করিলে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটা জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ দেখিলাম। তাহার ভিতর আমেরিকার

এঞ্জিনিয়ারিং পরিষৎ

তিনটি প্রসিদ্ধ পরিষদের সম্মিলন, বৈঠক, বক্তৃতা এবং সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আমেরিকার ভিতর নানা প্রদেশে যত মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার আছেন তাঁহারা একটা পরিষৎ স্থাপন করিয়াছেন।

সেইরূপ আকর-বিষয়ক এঞ্জিনিয়ারদিগের ও তড়িৎ-বিষয়ক এঞ্জিনিয়ার-দিগেরও এক একটা বিরাট পরিষৎ আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য এঞ্জিনিয়ারদিগেরও কয়েকটা পরিষৎ গঠিত হইয়াছে। প্রথম তিনটি পরিষদের কার্য্য এক ভবনে পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, কর্ণেল, পার্ডু, ইয়েল, বষ্টন টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি আমেরিকার প্রধান প্রধান শিল্প-কলেজের গ্র্যাজুয়েটেরা তাঁহাদের "এঞ্জিনীয়ারিং সমিতির" কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এই ভবন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান জগৎ এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার প্রভাবে চালিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই বিদ্যার উৎকর্ষ অত্যধিক। সুতরাং নিউইয়র্কের এই ভবনে বর্ত্তমান বিশ্বের সর্ব্বপ্রধান শক্তিকেন্দ্র দেখিতে পাইলাম, বলিতে হইবে। প্রত্যেক পরিষদের স্বতন্ত্র মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয় আছে এবং প্রদর্শনা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তিন পরিষদ একত্র হইয়া একটি গ্রন্থশালা স্থাপন করিয়াছেন। এত বড় এঞ্জিনীয়ারিং-লাইব্রেরী জগতে বেশী আছে কি না সন্দেহ।

ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং পরিষদের একটি প্রকোষ্ঠে একজন বিখ্যাত তড়িৎ বিজ্ঞানবিদের সঙ্গে আলাপ হইল। নাম হ্যামার। ইনি আমেরিকার বিজ্ঞানবীর এডিসনের সহযোগীরূপে ৪০ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন। এডিসন ইলেক্‌ট্রিক আলোকের আবিষ্কার-কর্ত্তা। ১৮৮০ সালে ইনি এই দীপ প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তাহার পর জগতের নানা স্থানে ইহার উন্নতির জন্য নানা পরীক্ষা চলিতে থাকে। এই ৩৪ বৎসরের ভিতর জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, রুশিয়া, আমেরিকা ইত্যাদি সকল দেশে যত নূতন ধরণের ইলেক্‌ট্রিক দীপ উদ্ভাবিত হই-য়াছে, হ্যামার সাহেব সকলগুলির ২১৪টা নমুনা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া-ছেন। এই সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে দেশে বিদেশে ঘুরিতে হইয়াছে।

ইনি এই সংগৃহীত দীপগুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। বর্ত্তমান জগতের একটা প্রধানতম আবিষ্কারের ধারাবাহিক ইতিহাস সহজে বুঝিতে পারা গেল।

হ্যামার বলিলেন, "এডিসন কার্ব্বনতারের দীপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই দীপে আলোকের সঙ্গে তাপও সৃষ্ট হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে তাপ ব্যতিরেকে কেবল আলোক সৃষ্ট হইতে পারে তাহার জন্য নব্য বৈজ্ঞানিকেরা ব্রতবদ্ধ হইয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত সুফল পাওয়া যায় নাই। দুই একটা পরীক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছে, কিন্তু বাজারে চালাইয়া লাভবান্ হইবার উপায় এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই।" হ্যামার এই নূতন ধরণের কয়েকটা দীপের নিদর্শন দেখাইয়া বলিলেন, "এইগুলি ফস্‌ফোরেসেণ্ট অর্থাৎ জোনাকি পোকার মত আলোক বিকীরণ করে। আলোক সৃষ্ট হয় অথচ কোন উত্তাপ নাই। দীপের ভিতর যে পদার্থ আছে তাহা কার্ব্বনের মত জ্বলে না। এ জন্যই তাপ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং শক্তির (এনার্জি) ব্যয়ও অল্প হয়।

হ্যামার ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স ও আমেরিকা—চারি দেশেই কয়েকটা প্রধান প্রধান ইলেক্‌ট্রিক কারখানা ও প্রদর্শনীতে পরিচালকের কর্ম্ম করিয়াছেন।

বোটানিক্যাল উদ্যান

এখানকার একজন উকিল বন্ধু বলিলেন, "সুপ্রসিদ্ধ ওলন্দাজ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানবিৎ ডি ভ্রীজের মতে নিউইয়র্কের বোটানিক্যাল উদ্যান জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" বিশেষজ্ঞ মহাশয় কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহাকে 'দুনিয়ার এক' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা বুঝা অসম্ভব।

মামুলি চোখে গরম গৃহগুলি দেখিলাম। গরম দেশের নানা প্রকার উদ্ভিদ রক্ষিত হইতেছে। ঘরগুলির ভিতর ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের

উত্তাপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উদ্ভিদ হিসাবে এবং উদ্ভিদের জন্মস্থান হিসাবে তাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। একটা প্রকোষ্ঠে দেখিলাম, বিক্রমপুরের "রামপালী" কলা ফলিয়া রহিয়াছে।

উদ্যানের ভিতর উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞান বিষয়ক একটি সুবৃহৎ মিউজিয়াম আছে। প্রধাণতঃ তিন ভাগে এই সংগ্রহালয় বিভক্ত :—(১) কৃষিশিল্প ব্যবসায় বিষয়ক উদ্ভিজ্জ (২) উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ (৩) প্রাচীন কালের উদ্ভিদ্‌সমূহের প্রস্তরীভূত নিদর্শন।

দ্বিতীয় বিভাগে বেশীক্ষণ কাটাইলাম। উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগ অতি সুন্দর রূপে বুঝান হইয়াছে। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে যে সমুদয় নিম্নজাতীয় উদ্ভিদ্ এবং যে গুলিকে দেখিলে উদ্ভিদ্ বিবেচনা করা কঠিন সেই দিকেই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া গেল। এতদিন যতটুকু এ বিষয়ে চর্চ্চা করিয়াছি, তাহাতে কেবলমাত্র পুথিগত বিদ্যা হইয়াছিল। Thallophyta, Bryophyta, pteridophyta ইত্যাদির অন্তর্গত algæ, fungis mosses, lichens, ferns চোখে দেখিবার বিশেষ সুযোগ ঘটে নাই। ঘটিলেও নজর পড়ে নাই। এই সংগ্রহালয়ে তাহার সুযোগ পাওয়া গেল। প্রত্যেক প্রদর্শিত দ্রব্যের সম্মুখে সুবিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর উদ্ভিদের কোন কোন অঙ্গ রক্ষিত হইয়াছে, এবং কতকগুলি চিত্রের সাহায্যে নানা কথা বুঝান রহিয়াছে। কাজেই সহজে জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত।

বোটানিক্যাল উদ্যানের ভিতর আর একটা অতি ক্ষুদ্র সংগ্রহালয় আছে। ইহার ভিতর উদ্ভিদের কোন নিদর্শন নাই। ১০০।১৫০ বৎসর পূর্ব্বে নিউইয়র্কের সন্নিহিত জনপদের লোকজন, বাড়ী-ঘর, কৃষিশিল্প, আদবকায়দা ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য যৎসামান্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেখিয়া বিশেষ কিছু লাভ হয় না।

পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু দ্রব্যের আবিষ্কার হইয়াছে। সকল গুলির উদ্দেশ্যই মানুষকে সুখী করা, মানুষের জীবন হইতে দুঃখ দারিদ্র্য দূরীভূত করা। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, যন্ত্র, কল-কব্জা ইত্যাদি যাহা কিছু দেখি সবই এই উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, প্রত্যেক সুখ বৃদ্ধির আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা দুইটা বা ততোধিক দুঃখ সৃষ্টির কারণও বর্ত্তমান। প্রত্যেক শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটা করিয়া ব্যাধির উৎপত্তি হয়। কোনটাতে হাত কাটিবার সম্ভাবনা, কোনটাতে চোখ কাণা হইয়া যায়। কোন ব্যবসায়ে বহুকাল কার্য্য করিবার ফলে ক্ষুধানাশ হয়—কোন কর্ম্মের প্রভাবে হস্তপদ অবশ হইয়া আসে ইত্যাদি। তাহা ছাড়া, দৈবমৃত্যু, আকস্মিক উৎপাত ইত্যাদির ত কথাই নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমানযুগে কলকারখানার প্রভাবে জীবন-নাশের আশঙ্কা প্রতি মুহূর্ত্তেই রহিয়াছে। তাড়াহুড়া করিয়া কাজ সারিবার আয়োজন, সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকা, কলের দাস হইয়া নির্জ্জীবভাবে কাজ করা, চিত্তের স্বাধীনতা হারান ইত্যাদির ফলে মানসিক ও নৈতিক অবসাদ উৎপন্ন হয়। আর শারীরিক ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বিপদ বর্ত্তমান কলকারখানা-নিয়ন্ত্রিত মানবের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

জীবনরক্ষক মিউজিয়াম

এইজন্য যাঁহারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হইতেছেন তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সেই আবিষ্কার-প্রসূত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার কলও উদ্ভাবন করিতেছেন। নিউইয়র্কে এইরূপ জীবন-রক্ষক দ্রব্যনিচয়ের একটা সংগ্রহালয় (Museum of Safety) শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। কতকগুলি বস্তু সম্প্রতি এঞ্জিনিয়ারিং পরিষদের বিরাট ভবনে দেখিতে পাইলাম। কোন্ কোন্ শিল্পে ও ব্যবসায়ে কিরূপ ব্যাধি সাধারণতঃ হইবার সম্ভাবনা এবং কোন কোন কার্য্যে দৈব

দুর্ব্বিপাক এবং হঠাৎ জীবনসংশয় ঘটিতে পারে তাহা বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে। এই সকল বিষয় ফ্যাক্টরীর তালিকা অনুসারে ঐতিহাসিক সত্যরূপে বিবৃত দেখিলাম। কেবল কাগজে কলমে বুঝান নয়—যত উপায়ে এইগুলি হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহার পরিচয়ও প্রদত্ত হইয়াছে। কারখানার মালিকেরা এইগুলি ব্যবহার করিলে কর্ম্মীদিগের জীবনরক্ষার সুযোগ বাড়িয়া যাইবে।

জাতি-সমস্যা ও অন্ন-সংস্থান

বিলাতের লোকেরা সাদা চামড়া ও কাল চামড়ার প্রভেদে নরনারী-গণকে দুই জাতিতে বিভক্ত করিবার সুযোগ বেশী পায় না। ইংলণ্ডে কৃষ্ণকায় লোকজনের বসবাস অতি অল্প। বিদেশ হইতে যে সকল কালচামড়ার লোক ওখানে যায়, তাহাদিগকে দেখিয়া ইংরাজ জনসাধারণ কথঞ্চিৎ বিস্মিত হয় মাত্র; তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার তীব্র মনোভাব পোষণ করে না। কিন্তু ইয়াঙ্কিস্থানে বর্ণ ভেদের বিষময় ফল দেখিতেছি। এখানে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদিগের সংখ্যা বড় কম নয়। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা—ইয়াঙ্কিস্থান, কি নিগ্রোস্থান, তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা কঠিন। কাজেই কৃষ্ণসমস্যা বা নিগ্রোসমস্যা, যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড় সমস্যা। বিশেষতঃ নিগ্রোসমস্যাটা কেবলমাত্র রঙের সমস্যা নয়। নিগ্রোরা ইয়াঙ্কিদের ক্রীতদাস ছিল। গত ৫০ বৎসরের ভিতর ইহারা স্বাধীন জীব হইয়াছে। সুতরাং আইনের চোখে ইহারা শ্বেতাঙ্গ-গণের সমকক্ষ। কিন্তু যাহাদিগকে বহুকাল পর্য্যন্ত কেনা গোলামরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বত্র একপংক্তিতে বসা কি রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য?

মানবজাতির বারইয়ারিতলা

নিগ্রোসমস্যার কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জাতি-সমস্যা এখানেই চুকিয়া গেল না। ইয়াঙ্কিদের শ্বেতাঙ্গসমস্যাও অত্যধিক। ইয়াঙ্কিস্থানে দুনিয়ার শ্বেতাঙ্গ নরনারী আসিয়া বসবাস করিতেছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের সকল জাতিই

আমেরিকায় উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের রক্ত, তাহাদের ভাষা, তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের রীতিনীতি—সবই এই উপনিবেশে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কাজেই আমেরিকাভূখণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র রুশিয়া, ক্ষুদ্র ফ্রান্স, ক্ষুদ্র ইংলণ্ড, ক্ষুদ্র হলাণ্ড, ক্ষুদ্র স্পেন ইত্যাদি স্থাপিত। আমেরিকার অন্যান্য অংশ ছাড়িয়া কেবল যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরা যাউক।—এখানে ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালীয়, ইহুদি, ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ বাস করিতে আসিতেছে। ইয়োরোপ হইতে ঔপনিবেশিকগণের আমদানী কোনদিনই বন্ধ হইয়া যায় নাই। উপনিবেশস্থাপনের ধারা এখনও চলিতেছে। ৩০০।৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপের লোকেরা ধর্ম্ম-কলহের দৌরাত্ম্যে নবীনজগতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আজকাল অন্নসংস্থানের জন্য ইয়োরোপীয়েরা দলে দলে এদিকে আসিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, বহু পোল, আইরিশ ও রুশ স্বদেশসেবকগণ যুক্তরাষ্ট্রে বসতিস্থাপন করিয়াছে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রে মানবজাতির একটা বিরাট মিউজিয়াম বা চিড়িয়াখানা সৃষ্টি হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে আমাদের ভারতের সঙ্গে এদেশের তুলনা করা চলে।

এক নিউ-ইয়র্কনগরের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৮০ জন লোক বিদেশী। ইহারা নিজ মাতৃভাষায় কথা কহে, নিজ নিজ ধর্ম্মমত মানিয়া চলে, নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র প্রচার করে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের বহুবিধ আইন সত্ত্বেও নিজ নিজ মাতৃভূমির প্রতিই চিরকাল আসক্ত থাকে। এইরূপ দেশীয় শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে বর্ত্তমানে আইরিশ, জার্ম্মাণ ও পোলজাতীয় নরনারীই প্রধান। ত্রিধাবিভক্ত পোলাণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্র অখণ্ডদেশে পরিণত করিবার জন্য, পোল স্বদেশ-সেবকেরা আমেরিকায় বসিয়া আন্দোলন চালাইয়া থাকেন। সেইরূপ

স্বদেশ-সেবকেরাও আমেরিকায় আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার ভিত্তিস্থাপন করিতে প্রয়াসী। ইয়োরোপের বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রব্যাপারেও দেখিতেছি, জার্ম্মাণেরা যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র নিজ মাতৃভূমির জন্য আন্দোলনে ব্যস্ত। এইরূপ কর্ম্ম-প্রণালী ইতালীয়েরাও অনুসরণ করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ইতালীয়দিগের উপনিবেশ অল্পকাল হইল আরব্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি এই আন্দোলনসম্বন্ধে একজন ইতালীয় পররাষ্ট্রসচিবের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের নাম 'Italy's Colonial and Foreign Policy' —(Smith Elder & Co., London). গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইতালীয়েরা আমেরিকায় টাকা রোজগার করিতে আসিয়াছে মাত্র; কিন্তু ইতালীকেই "জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" বিবেচনা করিবে।

বলা বাহুল্য, শ্বেতাঙ্গসমস্যা ইয়াঙ্কিস্থানের একটা প্রধানতম সমস্যা।

অনৈক্য নিবারণের উপায়

ধর্ম্ম, ভাষা, সমাজ ও রাষ্ট্র—সকলদিক হইতেই প্রশ্নটা অতি জটিল। ইহার মীমাংসা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে একটিমাত্র পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই। এসম্বন্ধে গণ্যমান্য নানাধুরন্ধর ও জননায়কের সঙ্গে আলোচনা করিলাম। ফেডারেল কংগ্রেসের প্রসিদ্ধ সভ্য হইতে আরম্ভ করিয়া উকীল, অধ্যাপক, জজ, সংবাদপত্রের সম্পাদক পর্য্যন্ত সকলেই এক উত্তর দিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন, "আমাদের বিদ্যালয়-গুলিই এই জাতিসমস্যার একমাত্র সমাধানক্ষেত্র। সকলগুলিকে মিলাইয়া খিঁচুড়ি পাকাইবার ব্যবস্থা আমাদের আর দ্বিতীয় নাই। বর্ণসংমিশ্রণ, রক্তসংমিশ্রণ, ভাবসমীকরণ, রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিধান ইত্যাদি—সকলই আমরা এই সকল শিক্ষাকেন্দ্র হইতে আশা করিতেছি।"

কাজেই শিক্ষাপ্রচার যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যরূপে

পরিগণিত হইতেছে। বিলাত, জার্ম্মাণি অথবা ইয়োরোপের অন্যান্য স্বাধীনদেশ হইতে ইয়াঙ্কিস্থানের শিক্ষাসমস্যা এই হিসাবে যথেষ্ট বিভিন্ন। কারণ, এদেশের জাতিসমস্যা ঐসকল দেশে নাই। কাজেই, ঐ সকল স্থানে শিক্ষাসমস্যা কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র প্রণালীতে আলোচিত হইয়া থাকে।

নিউ-ইয়র্কের অনেকগুলি ছোট-মাঝারি-বড় বিদ্যালয় দেখিলাম। দিবাবিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, চিত্রবিদ্যালয়, ব্যবসায়বিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, বালিকাবিদ্যালয়, ইত্যাদি বহুবিধ পাঠাগার দেখা গেল। এক কথায় বলিতে গেলে, আমাদের দেশে সাধারণতঃ কলেজসমূহে যেরূপ আসবাব্-পত্র, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারী ইত্যাদি থাকে, এখানে মামুলি মধ্যবিদ্যালয়ে তাহা অপেক্ষা বেশী বা প্রায় তাহার সমান। আমরা মধ্য-বিদ্যালয়ে যে সমুদায় শিক্ষার উপকরণ দেখিয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা বেশী জিনিষ এখানকার নিম্নতম বিদ্যালয়ে দেখিলাম; অধিকন্তু, বলিয়া রাখা উচিত যে, এখানে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিষয়ক শিক্ষার সাজ-সরঞ্জাম ক্ষুদ্রতম এবং নিম্নতম পাঠশালায়ও আছে। কিন্তু এই সমুদয় পদার্থ আমাদের মধ্য-বিদ্যালয়েও নাই। তাহা ছাড়া, বাড়ীঘর প্রায়ই প্রাসাদ-তুল্য; টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চ আলমারী ইত্যাদি—সবই উচ্চ অঙ্গের।

মানবজাতির এই বারইয়ারিতলায় শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে জগন্নাথক্ষেত্রে পরিণত করিবার প্রয়াস অতি স্বাভাবিক। বিনামূল্যে বিদ্যাবিতরণের আয়োজন করা, এখানে সর্ব্বপ্রধান নীতির মধ্যে পরিগণিত। নানা-জাতির বালক-বালিকাকে এককারখানার মধ্যে ফেলিয়া একছাঁচে ঢালাই করা অন্য কোন উপায়ে সম্ভবপর নহে।—রাষ্ট্রপরিচালকেরা ইহা বেশ বুঝিয়াছেন। এজন্য এদেশের নিম্নবিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, বিশ্ব-বিদ্যালয় সবই অবৈতনিক। এমন কি ছাত্রদের মধ্যাহ্ণ ভোজনের ব্যবস্থাও কর্ত্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন। এই সকল সুযোগ না থাকিলে

ইহুদি, খৃষ্টান, পোল, জার্ম্মাণ, হাঙ্গারিয়ান্, আইরিশ, ইতালীয়ান ইত্যাদি বিচিত্র সমাজের অন্তর্গত শিশুগণ একাকাররূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না। এত চেষ্টাস্বত্ত্বেও যথার্থ ঐক্য স্থাপিত হইতে পারিবে, কি না, সন্দেহ হয়।

অসংখ্য বিভিন্নতা ঘুচাইয়া, ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা নিউ-ইয়র্কের সকল বিদ্যালয়েই দেখিতে পাইলাম। একটা বিদ্যালয়ে দেখি, ৬০০০ বালিকা ও যুবতী লেখা-পড়া শিখিতেছে। চিত্রাঙ্কন, কাপড় সেলাই, রন্ধনকার্য্য, মূর্ত্তিগঠন, ইত্যাদি অভ্যাস করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন কামরায় প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম; বুঝিলাম, প্রত্যেক গৃহই মানবজাতির একএকটী মিউজিয়াম—বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট, বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্নভাষাভাষী রমণীদিগের আবেষ্টন। পৃথিবীর কোন বিদ্যালয়ে এরূপ সমাবেশ, বোধ হয়, আর নাই। তাহা ছাড়া, জগতের কোন বালিকা-বিদ্যালয়ে ৬০০০ ছাত্রী আছে, কি না, জানি না! নিউইয়র্কে এত বড় স্ত্রীশিক্ষার কেন্দ্র আর নাই—যুক্তরাষ্ট্রে ইহা অদ্বিতীয়।

কতকগুলি শিল্পবিদ্যালয়, ব্যবসায়বিদ্যালয় এবং চিত্রবিদ্যালয়েও এইরূপ বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যনাশের উপায় লক্ষ্য করিলাম। প্রকৃত পক্ষে, যে নগরে শতকরা ৮০ জন লোক বিদেশীয় তাহার প্রত্যেক বিদ্যালয়ই যে গোটা দুনিয়ার একটা ছোট চুম্বক বা ক্ষুদ্র সংস্করণ হইবে এবং 'Babel of tongues' বা ভাষাবিভ্রাটের আকর হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

প্রায় সকল বিদ্যালয়েই ছাত্র ও ছাত্রী একসঙ্গে লেখাপড়া করে। শিক্ষকেরাও কোনস্থলে রমণী, কোনস্থলে পুরুষ।

বিদ্যালয়গুলি প্রায় সবই, ছাত্রগণকে হাতেকলমে কাজ শিখাইবার জন্য গঠিত। জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় দেখাইয়া দেওয়া, শিক্ষাপ্রণালীর

মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা গেল। দেশের ভিতর যে সকল ব্যবসায় চলিতেছে, ঠিক সেই সমুদয় ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া বালক ও বালিকাদিগকে বিদ্যালয় হইতে বাহির করা হয়। স্থানীয় শিল্প-কারখানায় লোক যোগাইবার জন্যও শিক্ষা-ধুরন্ধরেরা বিদ্যালয় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। অন্নসংস্থানের জন্য কোন যুবক বা যুবতীকে ভাবিতে না হয়—বিদ্যাশিক্ষার পরেই যাহাতে প্রত্যেকে কোন না কোন কাজে লাগিয়া যাইতে পারে, তাহার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি।

জীবিকা ও শিক্ষা-প্রণালী

এই জন্য যে সকল বিদ্যালয়ে কোনরূপ ব্যবসায় বা কারখানার কার্য্য শিখান হয় না, সেই সমুদয়েও কিছু কিছু কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। চিত্রাঙ্কন, সূত্রধরের কাজ, রসায়ন, যন্ত্রব্যবহার ইত্যাদি বিষয় আজকাল প্রত্যেক ক্ষুদ্রবৃহৎ সাংসারিক ও বৈষয়িক অনুষ্ঠানে অত্যাবশ্যক। কাজেই, সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীরা এই সকল বিষয় শিখিয়া থাকে। ভবিষ্যতে ইচ্ছা করিলে, তাহারা খাঁটি শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। সেই শিক্ষার ফলে, শিল্পজগতে কর্ম্ম পাওয়া অতি সহজ হয়। অথবা তাহারা উচ্চতর সাধারণ বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। তখন ঐ কার্য্যকরী শিক্ষার সুফল সর্ব্বদা কাজে লাগে। প্রত্যেকেই করিত-কর্ম্মা লোক হয়।

বিশেষভাবে শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষাদিবার জন্য যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের অধ্যাপকগণের সঙ্গে আলোচনা হইল। একজন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিক্ষা দিতেছেন। একজন কাদামাটির কাজ শিখাইতেছেন। ইঁহারা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক নন—উভয়েই সহরের ভিতর বড় বড় স্থাপত্য-ভবনে কর্ম্ম করেন। ব্যবসায়-মহলে যে সকল দোকানের নাম আছে, সেই সকল দোকানে যাঁহারা

মূর্ত্তিগঠন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন। কাজেই, ছাত্রদিগের শিক্ষা অতিশয় পটু ব্যক্তিবর্গের হস্তে ন্যস্ত। এইরূপে গৃহনির্ম্মাণ-বিদ্যা শিখাইবার জন্য পাকামিস্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং শিখাইবার জন্য সহরের প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ারিং কারখানার কারিগর নিযুক্ত। একটি নৈশ-বিদ্যালয়ে দেখিলাম, এক গৃহে চিত্রাঙ্কণ শিখান হইতেছে। ২৫।৩০ জন যুবক ও যুবতী ছবি আঁকিতেছে। সম্মুখে একজন উলঙ্গ রমণী কোন নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গিতে বসিয়া আছে। অধ্যাপক প্রত্যেক ছাত্রের নিকট যাইয়া তাহার রচনা সংশোধন করিয়া দিতেছেন। ছাত্রেরা নানাস্থানে বসিয়াছে, সুতরাং একই বস্তুর চিত্র বিভিন্ন ধরণের হইতেছে। এই উপায়ে শরীরের মাংশপেশীগুলির বিভিন্ন গঠন ছাত্রেরা বুঝিয়া লইতেছে। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল চিত্রশিক্ষকের নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, "ইনি য়্যানাটমি বা অস্থিবিদ্যার অধ্যাপক—সহরের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক।" অস্থিবিদ্যায় পারদর্শী না হইলে, মানুষের মূর্ত্তি-চিত্রন অশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

জীবন্ত মানুষ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রাঙ্কন বা মূর্ত্তি খোদাই করিতে হয়, তাহা গ্লাস্‌গো নগরের চিত্রভবনে প্রথম শুনিয়াছিলাম; এই প্রথম দেখা হইল। ইতঃপূর্ব্বে নিউইয়র্কের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, জীবন্ত মাছ, ফড়িং, ব্যাঙ, কাঁকড়া এবং গাছ, পাতা, লতা, ফুল, ফল ইত্যাদি অবলম্বনে চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা দেখিয়াছি। কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তি বা কল্পনা, বা বোর্ডে আঁকা, কিংবা মাটির পুতুল হইতে নক্‌সা করান চিত্রশিক্ষকগণ পছন্দ করেন না। চিত্রগুলি ঠিক যেন জীবিত ও সচেতন দেখায়, প্রত্যেক চিত্রকরের এই লক্ষ্য থাকে। আবার, বাজারেও এই ধরণের জীবন্তপ্রায় ছবি ভিন্ন অন্য প্রকার চিত্রের কাটতি

হয় না। কাজেই, চিত্রবিদ্যালয়ে এই বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থায় সচেতন পদার্থের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ভাব-ভঙ্গীর সহিত শিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করান হয়।

বিজ্ঞাপন-প্রচার

ব্যবসাদারী কাহাকে বলে, আমাদের দেশে এখনও তাহা বেশী লোকে জানে না। কাজেই ব্যবসাদারীর দেশে শিক্ষার বিষয় কত প্রকার থাকিতে পারে, তাহা আমরা ধারণা করিতে অসমর্থ। বিজ্ঞাপন-প্রচারের কথা ধরা যাউক। ইহা যে একটা বিদ্যাবিশেষ, তাহা ভারতবাসীর কল্পনায়ও আসিতে পারে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র অসংখ্য— ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধে একথা খাটে। এই সকল কেন্দ্রের জন্য বিজ্ঞাপন-প্রচার অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞাপন-প্রচার নানা উপায়ে হইতে পারে। এই উপায়গুলির সংখ্যা ও প্রকারভেদ এত বেশী যে, এইগুলি বুঝিবার জন্য এবং শিখিবার জন্য ১৭।১৮ বৎসর-বয়স্ক উচ্চ-শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীর অন্ততঃ চারি বৎসর লাগে। নিউ-ইয়র্কের প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়েই দেখিলাম, বিজ্ঞাপন-প্রচার শিখাইবার জন্য ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা আয়োজন রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয়। কাজেই এই বিদ্যা শিখাইবার নানাপ্রণালী অবলম্বিত। সাধারণতঃ এইরূপ বুঝিলাম যে, চিত্রবিদ্যা বিজ্ঞাপন-প্রচারের অতি মুখ্য সহায়। ব্যবসায়-মণ্ডলে এই সুকুমার কলার অত্যধিক প্রয়োগ হইতেছে। ছবি আঁকা, রং ফলান, ভাব ফুটান ইত্যাদি বিষয় ছাত্রদিগের বিশেষ সতর্কতার সহিত শিখিতে হয়। চিত্রাঙ্কনের টেক্‌নিক্ বা বাহ্যরীতি সম্বন্ধে ছাত্রেরা ওস্তাদ হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই—কিন্তু যে সকল বস্তু অঙ্কন করিতে শিখান হয়, তাহা অতি জঘন্য শ্রেণীর অন্তর্গত। অথচ এইরূপ

বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচারিত চিত্রাবলী দুনিয়ার সর্ব্বত্র হাটে, মাটে, ঘাটে, বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই সমুদয় নিকৃষ্ট চিত্র দেখিয়াই আজকালকার জনসাধারণ চিত্রকলার ধারণা করে। ফলতঃ, প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধ এবং উচ্চ অঙ্গের শিল্পকলা জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে চলিয়াছে। যে দুই চারিখানা উৎকৃষ্ট নিদর্শন বাহির হয়, সেগুলি জনসাধারণের সম্মুখে পৌঁছে না—চিত্রকরের গৃহে, অথবা চিত্র বা দর্পনালয়, আর্ট-গ্যালারি কিম্বা মিউজিয়ামের অল্পসংখ্যক দর্শকগণের চক্ষুগোচর হয়। এদিকে বাজারের ব্যবসাদারী চিত্রাবলীই লোকরুচি গঠন করিতেছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কোন জাতির চরিত্র বুঝিতে পারা বিশেষ কষ্টকল্পনাসাধ্য। নিউ-ইয়র্কে দুই মাস কাটিতে চলিল—উকীল, জজ, হাকিম, কেরাণী, দোকানদার, ব্যবসাদার, শিক্ষক, অধ্যাপক, সম্পাদক ইত্যাদি বহুবিধ লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইল। তথাপি ইয়াঙ্কিদের বিশেষত্ব কোথায়, ইংরাজে ইয়াঙ্কিতে প্রভেদ কি, তাহা ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কি? এমন কি ভারতবাসীতে ও ইয়াঙ্কিতে প্রভেদ কি, তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইলেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইবে। মোটের উপর, জাতিতে জাতিতে সত্যসত্যই কোন গভীরতর পার্থক্য আছে কিনা সেই বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

পর্য্যটন-সাহিত্য

অবশ্য ইংরাজ ইয়াঙ্কি সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করেন তাহা জানা আছে। ইংরাজ পর্য্যটকগণের আমেরিকা-ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। জার্ম্মানেরা আমেরিকানকে কি চোখে দেখেন তাহাও জানা আছে। সেইরূপ ইয়াঙ্কিরা ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে কিরূপ বিবেচনা করেন তাহাও ইয়াঙ্কি সাহিত্যে সুপরিচিত। এই সকল পর্য্যটন-কাহিনী এবং জাতীয়-চরিত্র-বিশ্লেষণ অধিকাংশ স্থলেই অতিশয় কুসংস্কারপূর্ণ ও যুক্তিহীন। প্রায় সকল গ্রন্থেই মামুলি ও ভাসাভাসা কথার সরস বিবরণ পাওয়া যায় মাত্র। গ্রন্থকারেরা নানা মুদ্রিত পুস্তিকা, তালিকা ও সংবাদপত্র হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এক একটা বই খাড়া করিয়া থাকেন। দুই তিন সপ্তাহ

কোন ব্যক্তির গৃহে নিমন্ত্রিত হওয়া। রোজ রোজ ত পরের অন্ন ধ্বংস করা চলে না—চক্ষুলজ্জার খাতিরে মাঝে মাঝে এই সকল বিদেশীয় বন্ধুবর্গকে ডাকিয়া খাওয়ানও আবশ্যক। ফলতঃ, এই খরচ না করিতে পারিলে বিদেশে আসিয়া বেশী কিছু জানিতে পারা অসম্ভব। একথাটা আমাদের সকলেরই বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখা উচিত।

ছাত্রভাবে বিদেশে আসা এবং পর্য্যটকভাবে বিদেশে আসা এক শ্রেণীর বিদেশ ভ্রমণ নয়। ছাত্রের খরচ অপেক্ষা পর্য্যটকের খরচ অন্ততঃ ৫ গুণ বেশী ধরিয়া রাখিতে হইবে।

শিশু সভ্যতা

বিলাত হইতে আমেরিকায় আসিলে প্রথমেই মনে হয়, এদেশের লোকেরা বড় চোয়াড় ও অভদ্র। ইয়াঙ্কিরা কখনও "থ্যাঙ্কস্" অথবা "প্লীজ" কিম্বা "কাইণ্ডলি" ইত্যাদি বিনয়সূচক শব্দ ব্যবহার করে না। পরস্পর পরস্পরকে সমান বিবেচনা করে। বিলাতের লোকেরা এ সম্বন্ধে বিশেষরূপেই উল্টা—তাহারা উচ্চ-নীচ-ভেদ বজায় রাখিয়া চলে। তাহা ছাড়া, উহাদের স্বভাবের ভিতর একটা মিষ্টতা ও কমনীয়তা আছে। আমেরিকার এই বাহ্য-রূঢ়তা বা অভদ্রতা কি প্রজাতন্ত্র-শাসন ও স্বরাজ ব্যবস্থার (ডিমক্রেসির) ফল এবং ইংরাজের মধুরতা ও সামাজিক শ্লীলতা কি রাজতন্ত্র-শাসন ও ধন-তন্ত্রের ফল? সাধারণতঃ এইরূপই বিবেচনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা কথাও ভাবা আবশ্যক—ইয়াঙ্কিরা নাবালক শিশু জাতি, ইংরাজ ইহাদের তুলনায় বনিয়াদি ও পুরাতন জাতি। কোন সমাজের বহুদিনকার প্রতিপত্তিশালী পরিবারে এবং হঠাৎ-বড় ভুঁইফোঁড় পরিবারে যে প্রভেদ, ইংরাজে ও ইয়াঙ্কিতে বিস্তৃত ক্ষেত্রে সেই প্রভেদ। নূতন জাতির চাল-চলন

কায়দা-কানুন রীতিনীতি সবই নিত্য নূতন গজিতেছে ও বিকশিত হইতেছে। ইয়াঙ্কিকে এখনও ঘসিয়া মাজিয়া পালিশ করা আবশ্যক। বিশেষতঃ, প্রত্যহ ইয়োরোপ হইতে অসংখ্য নূতন ধরণের লোক আসিয়া আমেরিকায় বাস্তু স্থাপন করিতেছে। শীঘ্রই সকলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা মুখের কথা নয়। ইংরাজের সমাজ বিলাতে বহুদিন হইতে আড্ডা গাড়িয়া রহিয়াছে। হঠাৎ কোন নূতন ঘটনা ওখানে ঘটিবার নয়। নূতন কোন চাল শিখিতেও ইংরাজেরা বেশী সময় লইয়া থাকে। বহু দিন এক স্থানে বসবাসের ফলে বিলাতের সমাজে স্তর-ভেদ, জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে। বনিয়াদি ঘরে এইরূপই ঘটে। বনিয়াদি কায়দার ও ভুঁইফোড়ের কায়দার প্রভেদ ভারতবর্ষের সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সোজা হিসাবে নিউইয়র্কের নরনারীগণ সকলেই ইয়াঙ্কি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রায় সকলেই বিদেশী। রাস্তায়, ট্রামে, আফিসে, বিদ্যালয়ে, কারখানায়, বিচারালয়ে যত লোকজনের সঙ্গে দেখা হয় তাহাদের অধিকাংশই খাঁটি আমেরিকান নয়। কেহ ৮।১০।১২ বৎসর, কেহ এক পুরুষ, কেহ দুই পুরুষ এদেশের অধিবাসী। ইতিমধ্যে যে কয়জন লোকের সঙ্গে দেখা হইল তাঁহাদের মধ্যে খাঁটি আমেরিকান মাত্র ২।৩ জন। একজন বিচারপতি আইরিশ, কয়েকজন শিক্ষক পোল ও ইহুদি, উকীল বন্ধুগণ আইরিশ, অধ্যাপকেরা জার্ম্মাণ, রুশ, ওলন্দাজ বা ইংরাজ। তাহা ছাড়া, ২।৩ বৎসরের জন্য প্রবাসীভাবে কোন কোন ইতালীয়ান বা ফরাসীও বাস করিতেছেন। মোটের উপর এখানে কোন লোকের সঙ্গে দেখা হইবার সময়েই তাঁহার জন্ম-বৃত্তান্ত, বংশ-পরিচয় এবং স্বদেশ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা সর্ব্বপ্রথমেই করিয়া থাকি। বিলাতে এরূপ আবশ্যক হইত না।

আমেরিকার গণ্য মান্য বিশিষ্ট লোকেরাও ইয়োরোপের কাজ-কর্ম্ম এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি ভাল রকম জানেন না।

ইয়াঙ্কি জাতির ঔদাসীন্য

বর্ত্তমান লড়াই সম্বন্ধে প্রায় সকলেই এক বাক্যে ইংরাজের স্বপক্ষে এবং জার্ম্মানির বিপক্ষে মত দিয়া আসিতেছেন বুঝিতেছি। কিন্তু সাধারণতঃ ইয়োরোপীয় ঘটনাপুঞ্জ সম্বন্ধে নিতান্তই উদাসীন ও নিরপেক্ষ থাকিয়া আমেরিকানেরা জীবন যাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্র এত বড় দেশ যে, নিউইয়র্কের লোকেরা শিকাগোর প্রকৃত অবস্থাও সম্যক বুঝিতে পারে না—চেষ্টাও করে না। ইয়োরোপত আরও দূরে—এশিয়াতে কথাই নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সংগ্রামের পর জাপান ও ইংলণ্ড এবং জাপান ও আমেরিকার সম্বন্ধ নূতন আকার গ্রহণ করিবে। এ দিকে মেক্সিকো, ব্রেজিল, পেরু, চিলি, আরজেণ্টিন ইত্যাদি দেশে পীতজাতি এবং ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের প্রভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আমেরিকা ক্ষেত্রেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। এই কারণে ইয়াঙ্কিদের ঔদাসীন্য এবং নিরপেক্ষতা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখনও ইঁহারা ইয়োরোপ ও এশিয়ার বেশী সংবাদ রাখেন না। কেবল জাপান এবং চীন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের যুগ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান নামে কোন নর-নারী জগতে বাস করে এ তথ্য ইয়াঙ্কিদের মাথায় প্রবেশ করিতে বিলম্ব লাগিবে। ভারতবর্ষে ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের "স্বার্থ" এখন পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্রও নাই। কাজেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা ইয়াঙ্কি-সমাজে আদৌ হয় না। কদাচিৎ দুই চারিজন অধ্যাপক, লেখক, সম্পাদক, চিত্রকর বা কবি ও দার্শনিক ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন—তাহাতে জনগণের কোন গভীর বা বিস্তৃত ধরণের ঔৎসুক্য

জাগে না, মামুলি একঘেয়ে জীবনে একটা সাময়িক বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয় মাত্র।

এখানে জজ, উকীল, এ্যাটর্নী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেই রাষ্ট্র-কর্ম্মে লিপ্ত। আমাদের দেশেও আইন-ব্যবসায়িরাই প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কর্ণধার। দুই দেশেই আলোচনার রীতি একরূপ। তবে এক স্থানে নিস্ফল আন্দোলন, আর অপর স্থানে আলোচনার প্রভাবে শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণ সংস্কার ও শোধন। এই প্রভেদ। প্রভেদের ফলে রাষ্ট্রীয়-পাণ্ডাগণের দায়িত্ব-বোধ এবং চিন্তা-শক্তির তারতম্য সাধিত হয়। আমাদের দেশের লোকেরা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র করিতে শিখেন—এখানে রাজনীতিতে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করা অত্যাবশ্যক। অবশ্য নিরর্থক গলাবাজী এবং দায়িত্ববিহীন বাগাড়ম্বরও এখানে যথেষ্টই আছে। তবে "একো হি দোষো গুণ সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ"।

এখানে উকীল ও আইন ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশের তুলনায় বেশী টাকা রোজগার করেন কিনা জানি না। শুনিতে পাই, অন্যান্য ব্যবসায়ের তুলনায় আইন-ব্যবসায়ে এদেশে অর্থলাভ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এখানে যাহাকে দারিদ্র্য বলা হয় তাহা আমাদের বিবেচনায় স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য্য। কয়েকজন উচ্চ স্তরের আইন-ব্যবসায়ীর গৃহে যাওয়া আসা করিয়া ইঁহাদের চাল-চলন বুঝা গেল। উকালতী করিবার জন্য যে সমুদয় গ্রন্থ আবশ্যক তাহা ছাড়া সাধারণ সাহিত্য-দর্শন-কলা, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ সকলের গৃহেই কম বেশী দেখিতে পাইলাম। কোন কোন বিষয়ে কেহ কেহ সর্ব্বদা নূতন চিন্তার হিসাব রাখিয়া চলিতে অভ্যস্ত। এই ধরণের উকীল বা এ্যাটর্নী ভারতবর্ষে বেশী নাই।

পয়সা রোজগারের পথ এখানে বহুবিধ। অসংখ্য দেশী ও বিদেশী ছাত্র খাটিয়া অন্ন-সংস্থান করে—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অথবা ব্যবসায়-বিদ্যালয়ে অথবা ফ্যাক্টরীতে বিদ্যাশিক্ষাও করে। হার্ভার্ড-ক্লাবে এইরূপ দশজন ছাত্র চাকরী করে—৫ জন ফিলিপিন দ্বীপবাসী, ৫ জন জাপানী। ইহারা ঘর পরিষ্কার করা, জুতা ঝাড়া, পায়খানা পরিষ্কার করা ইত্যাদি সকল প্রকার কাজই করিতেছে। একজন জাপানী ছাত্র-ভৃত্যের সঙ্গে আলাপ হইল। সে কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা করে—তাহার জন্য বার্ষিক ৭০০৲ বেতন দিতে হয়। এই টাকা সে হার্ভার্ড-ক্লাবে চাকরী করিয়া রোজগার করে—এজন্য এখানে ৭ ঘণ্টা রোজ খাটিতে হয়।

স্বাবলম্বী বিদেশীয় ছাত্র ও প্রচারক

বিদেশ হইতে বহু লোক এদেশে বেড়াইতে আসেন। তাঁহারা যদি কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন তাহা হইলে প্রবন্ধ লিখিয়া অথবা বক্তৃতা করিয়া এখানে থাকিবার খরচ তুলিয়া লইতে পারেন। এখানকার ধর্ম্মমন্দিরের পরিচালকেরা, বিজ্ঞান-সমিতি ও শিক্ষা-পরিষৎ-সমূহের কর্ম্ম-কর্ত্তারা এইরূপ বিদেশীয় বিশেষজ্ঞদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য উদগ্রীব। তবে গণ্ডায় গণ্ডায় রোজ রোজই এইরূপ লোক নিয়োগ অসম্ভব।

একজন রুশ-রমণীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি এ্যানিবেশান্তের গোঁড়া ভক্ত থিয়জফিষ্ট। ভারতবর্ষকে ইনি স্বর্গ বিবেচনা করেন—ভারতবর্ষের নামে পাগল ও অধীর হইয়া পড়েন। আজকাল এইরূপ ব্যক্তি অনেক দেখা যায়। ইনি এইজন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, বলিলেন। সম্প্রতি নিউইয়র্কে থাকিয়া স্বদেশীয়গণের মধ্যে থিয়জফি প্রচার করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার খরচ চলে কি

উপায়ে ?” ইনি বলিলেন—“তাহার জন্ম আমাকে চাকরী করিতে হয়। আমি রুশ, ইংরাজী ও লিথুয়েনিয়ান ভাষা জানি। এই নগরের রাষ্ট্র-শাসন বিভাগে আমি কিছুকাল অনুবাদকের কার্য্য করিয়াছি। সম্প্রতি একজন ইয়াঙ্কি-রমণীকে রুশ-ভাষা শিখাইতেছি। ইনি একজন ধনীর কন্যা—রুশিয়ার এক ধন-কুবেরের সঙ্গে বিবাহ স্থির হইয়াছে। এইজন্য ইনি রুশ-ভাষা শিখিতেছেন। আর একজন ইয়াঙ্কি-ব্যবসায়ী আমার নিকট লিথুয়েনিয়ান-ভাষা শিখিতেছেন—তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যব-সায়ের ক্ষেত্রবৃদ্ধি।”

বক্তৃতা করিয়া খাওয়া এখানে জীবিকার্জ্জনের বেশ প্রশস্ত উপায়। তবে কপালের উপর নির্ভর করিতে হয়। সাণ্ডার্লণ্ডের নাম ভারত-বর্ষের অনেকেই জানেন। ইনি, চীন, জাপান ও ভারতবর্ষ বেড়াইয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে নিউইয়র্কে বসিয়া নানা কেন্দ্রে বক্তৃতা দিবেন—এই মর্ম্মে একখানা বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছেন। অবশ্য বক্তৃতা শুনিবার জন্য মূল্য দিতে হইবে। কয়েকটা আলোচ্য বিষয়ের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

১। দুনিয়ার সভ্যতায় এশিয়াবাসীর দান।

২। চীনের রাষ্ট্র-সমস্যা—“স্বরাজে”র ভবিষ্যৎ।

৩। জাপানের বর্ত্তমান অবস্থা। জাপান হইতে আমেরিকার বিপৎ আশঙ্কা করা উচিত কিনা? জাপানীদের ভবিষ্যৎ।

৪। ফিলিপিনোদিগের অবস্থা। তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত কিনা? দিলে, কখন?

৫। ভারত-রাষ্ট্রীয় আন্দোলন। ভারতে বৃটিশ শাসনে উপকার হইতেছে কি? বৃটিশ শাসন টিকিবে কি?

৬। ভারতের ঐতিহাসিক চিত্র।

৭। হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ।

৮। ভারতের মুসলমান।

৯। ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের ভবিষ্যৎ।

বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত "বেদান্ত সোসাইটি" এখন পর্য্যন্ত নিউইয়র্কের ইয়াঙ্কিদের অর্থেই চলিতেছে। ইহারা পয়সা খরচ করিয়া বেদান্ত ও হিন্দুত্ব সম্বন্ধে স্বামীদিগের বক্তৃতা শুনিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষিত কোন কোন ব্যক্তিও বক্তৃতা প্রদান করিয়া এবং প্রবন্ধ লিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। সেদিন একজন ভারতীয় পর্য্যটক এখানকার এক ধর্ম্ম-মন্দিরে এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া ১৫০৲ টাকা পাইলেন। তবে এইরূপ বক্তৃতার উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজের লোক জীবন ধারণ করিতে পারেন না।

নানা প্রকার প্রদর্শনী এখানে লাগিয়াই আছে। সেদিন এক স্থানে মধ্যযুগের চীনা-চিত্র প্রদর্শিত হইতেছিল। সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ চিত্র-গুলির তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। চীনকে বুঝিবার জন্য ইয়াঙ্কিরা সচেষ্ট হইয়াছেন। আর একটা প্রদর্শনী দেখিলাম। প্রত্যেক বৎসরই ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নিউইয়র্ক নগরের ভিতর এক বৎসরে যে সকল নূতন নূতন আবিষ্কার হয় সেই গুলি এক স্থানে দেখান হয়। লোহা-লকড়, কল-কব্জা ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া জামার বোতাম পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই "একটা নূতন কিছু" দেখিতে পাইলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই এদেশে শিল্প-মহলে কোন না কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে —ইহারা বসিয়া নাই—সর্ব্বদাই দৌড়াইতেছে—ইহাদের তুলনায় ভারতবাসী শুইয়া আছে।

বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুণো মায়ার আয়র্লাণ্ডের প্রাচীন

অধ্যাপক কুণো মায়ার

কেল্টিক সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। ইনি হার্ভার্ড ও কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আমেরিকায় আসিয়াছেন। সেদিন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঁহার বক্তৃতা হইয়াছে। ইতিমধ্যে ইনি আমেরিকাপ্রবাসী আইরিশ দলের ভিতর প্রবেশ করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। আয়র্ল্যাণ্ডকে জার্ম্মানির স্বপক্ষে টানিয়া আনা ইঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় মায়ারকে জানাইয়াছেন—"এরূপ ইংরাজবিদ্বেষী হইলে আপনার বক্তৃতা আমাদের আসরে হইতে পারিবে না। আপনার নিমন্ত্রণ খারিজ করা হইল।"

প্রচার-কার্য্য

নিউইয়র্ক নগরের শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি এবং তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারীরা সকলেই অবৈতনিক কর্ম্ম করেন। অন্ন-সংস্থানের জন্য ইঁহারা কেহ উকীল, কেহ ব্যবসায়ী ইত্যাদি। সভাপতির সঙ্গে কয়েক বার নানাবিধ আলোচনা হইল। ইঁহার সাহায্যে কতকগুলি স্কুল দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। এসকল দেশে প্রতিষ্ঠানসমূহের উপকারিতা লোকজনকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আমাকে মোটরকারে করিয়া নানা স্থানে লইয়া যাইবার জন্য শিক্ষাবিভাগ একদিনে প্রায় ৬০৲ খরচ করিলেন। ম্যাঞ্চেষ্টারেও দেখিয়াছি, মিউনিসিপ্যালিটি নিজেদের কর্ম্ম-প্রণালী বুঝাইবার জন্য দর্শকগণকে নিজ ব্যয়ে মোটরকার দিয়া থাকেন।

এখানে মধ্য-বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পরিচালক ইত্যাদি সকলেই উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি। ইঁহাদের মধ্যে পি, এইচ, ডি, ডি, এস্, সিও দেখিলাম। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে প্রতিভা বা কোনরূপ তীক্ষ্ণ মনীষার পরিচয় পাইলাম না। এদেশে জ্ঞানের বিস্তার যত হয় উচ্চতা ও

গভীরতা তত হয় কিনা সন্দেহ। কতক পরিমাণ মোটা জ্ঞান বহু লোকের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে সত্য—কিন্তু সরস সজীব চিন্তা-শক্তি ও মৌলিকতা প্রায়ই দেখা যায় না।

অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে দুই একবার আলাপ হইয়াছিল। ইনি বলেন—"এদেশে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে অত্যধিক সাহায্য করা হয়। অর্থ-সাহায্য, পুস্তক-সাহায্য, অন্ন-সাহায্য, অবৈতনিক বিদ্যালয়, অবৈতনিক বিজ্ঞান-গৃহ ও লাইব্রেরী ইত্যাদির দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন অত্যন্ত সস্তা করা হইয়াছে। কাজেই শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে ভাবিবার, কষ্ট করিবার বা দায়িত্ব গ্রহণ করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। সকল পদার্থই বিনা আয়াসে তাহারা পাইয়া থাকে। এজন্য এখানে জ্ঞানের গভীরতা বা উচ্চতা অতি বিরল। বিদ্যার রাস্তা কিছু কণ্টকময় থাকা মন্দ নয়।"

শিক্ষা-পরিষৎ, সেবা-সমিতি, মিউজিয়াম, লাইব্রেরী ইত্যাদি বিদ্যা-মন্দিরের সর্ব্বত্র রমণী-সংখ্যা পুরুষ-সংখ্যা অপেক্ষা বেশী। শুনিতে পাই, আমেরিকার স্ত্রীলোকেরাই অধিক শিক্ষিত। পুরুষেরা ব্যবসায় ও রাষ্ট্র-কর্ম্ম চালায়—মেয়েরা শিক্ষা-বিভাগ, সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত, সমাজ-সেবা ইত্যাদি সকল প্রকার জাতীয় উৎকর্ষের ভার গ্রহণ করে। নিউইয়র্কের বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের মধ্যে স্ত্রীলোক অনেক দেখিয়াছি। এখানকার প্রত্যেক গণ্যমান্য ব্যক্তির গৃহে অথবা কার্য্যালয়ে টাইপরাইটিং করিবার জন্য দুই একজন রমণী নিযুক্ত দেখিতে পাই। আমরা প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য বলিলে যাহা বুঝি সেই ধরণের কার্য্য এখানে মেয়েরা করে দেখিতেছি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্যাপকগণের সেক্রেটারী প্রায় সবই স্ত্রীলোক। হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুন্‌ষ্টারবার্গ আমেরিকার

রমণী-প্রাধান্য

জ্ঞানরাজ্যে নারী জাতির প্রাধান্য দেখিয়া তাঁহার "American Traits" বা "ইয়াঙ্কি চরিত্র" নামক গ্রন্থে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতের ভিতর বেশ নূতনত্ব আছে; নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"Under the ordinary conditions, the material opening and settling of a country move parallel with the development of the inner cultures and the man is thus able to meet the requirements of this two fold task; he gives his energies to the material and political necessities so long as the mental and spiritual culture is low, and in proportion as he is freed from the rudimentary needs that pertain to the support of the nation, he turns to the inner culture that of education and art and so on, while the woman at every stage cares for the private life of the family. In America this normal course was changed, because the material opening of the country, the unfolding of its natural resources, coincided with the possession of a most complex inner culture brought over from Europe readymade, not grown of the soil. Hence a new division of labour had to be discovered to meet those material exigencies which demanded man's full energy and man's side-function, the work of the higher culture, also. The side-function had to be assumed by the woman; she had to care for the inner culture of the nations that the arms

of the man might be free for the immediate work, the settling of the continent the political organisation and the development of national wealth."

অর্থাৎ "পুরুষেরা জীবিকা অর্জ্জন ও রাষ্ট্র-শাসনের কর্ম্ম করে এবং স্ত্রীলোকেরা ঘরকন্না করে। ইহাই জগতের সর্ব্বত্র দস্তুর। খাওয়া পরার উপায় খানিকটা সহজ হইয়া আসিলে পর সমাজে শিক্ষা-বিস্তার, ধর্ম্ম-বিস্তার ইত্যাদি উচ্চ সভ্যতার অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়। এই সকল কাজও সাধারণতঃ পুরুষেরাই করিয়া থাকে—স্ত্রীলোকেরা পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন করে মাত্র। কিন্তু আমেরিকার সমাজ সাধারণ নিয়মে গড়িয়া উঠে নাই। ইয়োরোপের লোকেরা যখন আমেরিকায় প্রথম বসতি স্থাপন করে তখনই তাহাদের উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা ছিল। তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, শিল্প-জ্ঞান, সাহিত্য-বোধ, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ইত্যাদি কিছুই কম ছিল না। তাহারা ইয়োরোপ হইতে এই ষোল কলায় পূর্ণ সভ্যতা সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকায় পদার্পণ করিবার পর তাহাদের প্রথম সমস্যা হইল—চাষ-আবাদ, দেশ-গঠন, নগর-স্থাপন ও রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা। এই সকল কাজ পুরুষের কাজ—পুরুষেরা এদিকে লাগিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের ইয়োরোপ হইতে আমদানী সভ্যতা কাহার হাতে থাকিবে? কাজেই স্ত্রীলোকেরা ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পুষ্টি সাধনের ভার লইতে বাধ্য হইল। তাহা না হইলে আমেরিকায় ইয়োরোপীয় সভ্যতা টিকিত কিনা সন্দেহ—হয়ত সমস্ত সমাজ অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য আদিমবাসিদিগের অনুরূপ হইয়া পড়িত। কিন্তু নারী জাতির আশ্রয়ে এখানে ইয়োরোপীয় সভ্যতা বাঁচিয়া গিয়াছে। ফলতঃ, অনুশীলনের প্রভাবে আজ পর্য্যন্ত জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে ইয়াঙ্কিস্থানে রমণীরাই অগ্রণী।"

বিংশ শতাব্দীর চিত্রশিল্প

নব্য চিন্তাপদ্ধতি

জগতের চিন্তামণ্ডলে একটা নূতন আদর্শ ও লক্ষ্য বিগত দশ বার বৎসরের ভিতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফ্রান্সে মধ্যযুগের রোমান ক্যাথলিক জীবন আদৃত হইতেছে। ধর্ম্মসংস্কারের আন্দোলনে মস্তিষ্কের কচকচানি বেশী—হৃদয়ের স্থান অল্প ছিল—ফরাসীরা এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন। কাজেই সনাতন পূজাপাঠ ব্রতানুষ্ঠান ইত্যাদির পুনঃ প্রবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। আয়র্লণ্ডে গেলিক আন্দোলনের দ্বারা প্রাচীন কেল্টিক রীতিনীতি এবং চিন্তাপ্রবাহ নূতন আকারে দেখা দিতেছে। এদিকে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণ ইত্যাদি দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের চরম উন্নতির আনুষঙ্গিক কুফলসমূহের প্রতিবাদস্বরূপ নানা প্রকার বৈষয়িক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ও আলোচনা আরব্ধ হইয়াছে। বড় বড় ফ্যাক্টরী, "ট্রাষ্ট", সাম্রাজ্য-নীতি, শ্রমজীবি-দলন, স্ত্রী-নির্য্যাতন, পরিবার-সঙ্কট, নীতি-বিভ্রাট, চরিত্রহানি ও মনুষ্যত্বলোপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আজকাল সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিষৎ বা প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। মানুষ উনবিংশশতাব্দীর শেষার্দ্ধে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। সমগ্র মানবসভ্যতাকে নির্জ্জীব কলের নিয়মে পরিচালিত করা হইয়াছে। এক্ষণে সরস প্রাণবান্ মানবকে যথার্থ সজীব পদার্থের ন্যায় বিবেচনা করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বিজ্ঞান মহলেও খানিকটা এইভাব দেখিতেছি। আমাদের অধ্যাপক বসু মহাশয় ধাতু ও উদ্ভিদের জীবনে মানবপ্রাণের অনুরূপ লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আবিষ্কারসমূহ

দুনিয়ার সকল বড় বিশ্ববিদ্যালয়েই আলোচিতও হইতেছে। কোথায় সমগ্র মানবসমাজকে জীবন-হীন যন্ত্রের ন্যায় বিবেচনা করা হইতেছিল— আর কোথায় তথাকথিত অচেতন বস্তুসমূহই সচেতন প্রমাণিত হইতেছে। হার্ব্বাট স্পেন্সার, ডারুইন, হাক্‌স্‌লে, হিকেল, কম্‌তে ইত্যাদির "একান্ত পত্রং জগতঃ প্রভুত্বং" আর থাকিতেছে না। বার্গসেঁা দর্শনে জড়বাদের স্থানে Doctrine of *Elan* বা প্রাণবাদ প্রচার করিতেছেন। কাব্যে মেটারলিঙ্ক অদৃশ্য জগতের বার্ত্তা আনিতেছেন। টলষ্টয়ের সাহিত্যে এখনও ইয়োরোপের বহু নরনারী শান্তি পাইয়া থাকে। ধর্ম্মতত্ত্বে অয়কেন অতি প্রাকৃতের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। বেদান্ত, গীতা, উপনিষৎ, বিবেকানন্দ-প্রভাব, থিয়জফি-সমাদর, "গীতাঞ্জলি", "Sadhana", "Songs of Kabir" ইত্যাদিও এই নব্য চিন্তামণ্ডলের বিশেষ লক্ষণ। প্রথমতঃ, এই উপায়ে 'ভারতপ্রভাব ছড়াইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয়তঃ, নূতন চোখে নূতন ধরণে জগতের সমস্যা মীমাংসিত হইতেছে। নীট্‌শে ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে কার্লাইলের তিরস্কার তীব্রভাবে প্রয়োগ করিতেছিলেন। তিনি জগৎকে নূতন আদর্শে গড়িতে চাহিয়াছিলেন। দেখিতেছি, সত্য সত্যই বিংশশতাব্দীতে তাঁহার মতানুযায়ী Transvaluation of values বা "নবযুগোপযোগী নবজীবনে"র সূত্রপাত হইতেছে।

নব্য জগতের সুকুমার-শিল্পমহলেও এই নূতন দৃষ্টি, নূতন তত্ত্ব দেখিতেছি। কি চিত্রকর, কি চিত্র-সমালোচক উভয়েই ঊনবিংশশতাব্দীর শেষার্দ্ধের শিল্প-পদ্ধতি বর্জ্জন করিতেছেন। চিত্রাঙ্কনের বাহ্যরীতি, টেক্‌নিক, রংফলান ইত্যাদি মাত্রই আজকাল লোকের আদরণীয় বস্তু নয়। সর্ব্বত্রই "Expression" শিল্পকর্ম্মের অন্তঃকরণ, চিত্রের প্রাণ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাহিরের আবরণ ছাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার

প্রয়াসই আদৃত হইতে চলিয়াছে। যন্ত্রের পরিবর্ত্তে জীবন, বাহ্যের পরিবর্ত্তে অন্তর, দেহের পরিবর্ত্তে আত্মা,—ইহাই নব্য শিল্পের লক্ষ্য। বার্গসোঁর Intuition বা "অন্তর্দৃষ্টি"-তত্ত্ব এবং অয়কেনের Life's Basis বা অধ্যাত্মতত্ত্ব সুকুমার শিল্পের গঠনেও আজকাল প্রভাপশালী।

আদিম শিল্পের গৌরবপ্রচার

সমালোচক এবং ঐতিহাসিকেরা এক্ষণে প্রাচীন ও আদিম শিল্প-কর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। মিশর, চীন, জাপান এবং ভারতবর্ষ এই চারি দেশের পুরাতন চিত্রসম্পদ ও ভাস্কর্য্যগুলি সৌন্দর্য্যের খনি বলিয়া প্রশংসিত হইতেছে। এমন কি, যাহা যত প্রাচীন তাহাই যেন তত সরস সুন্দর ও সজীবরূপে প্রমাণিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই গুলি অনুকরণ করিবার প্রয়াসও শিল্পিমহলে দেখিতে পাইতেছি। যে সমুদয় বস্তু বাহ্য টেকনিকের নিয়মে কদাকার, কুৎসিত বা বীভৎস পরিগণিত ছিল সেই-গুলিই অন্তঃসৌন্দর্য্য সজীবতা এবং সহৃদয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিবেচিত হইতেছে। প্রাচীন কেল্টিক আদর্শের পুনঃ প্রবর্ত্তন, নবীন ভারতবর্ষে অতীত জীবনের মর্য্যাদা কীর্ত্তন, ফ্রান্সের Catholic Revival ইত্যাদি যেরূপ, বর্ত্তমান শিল্পজগতে Primitive Artএর গুণ-সমাদরও সেইরূপ। বাঁধাবাঁধি ছাড়াইয়া যন্ত্র-চালিত জীবনযাপন ত্যাগ করিয়া, কলের দাসত্ব এবং মাপজোকের দাসত্ব ছাড়াইয়া শিল্পীরা স্বাধীন গতিবিধির আবহাওয়ায় আসিতে চাহিতেছেন। এই জন্যই অকৃত্রিম আদিম নরনারীর হৃদয়প্রসূত সাহিত্য ও কলা বিংশশতাব্দীতে আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

চিত্রশিল্পে ভাবুকতা

প্রাচীন কলাপদ্ধতি অবশ্য এই নবযুগে সেই মিশরীয় বা ভারতীয় কায়দাই অনুসৃত হইতেছে না। বিংশশতাব্দী পর্য্যন্ত জ্ঞানভাণ্ডারে যে সমুদয় বস্তু সঞ্চিত হইয়াছে সেগুলি বর্জ্জিত হইতেছে না বরং দুনিয়ার সকল সম্পদই

যথাসম্ভব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমুদয়ের সাহায্যেই প্রাচীন ধরণে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন দেখিতে পাই। সমালোচকেরা বলিতেছেন—"ভাব ফুটাইবার জন্য বাহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিতান্ত প্রাকৃতিক জীবজন্তুর অনুকরণে আঁকিবার বা গড়িবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা আঁকিতেছ তাহা তোমার চিত্তে যেরূপ ভাব উৎপন্ন করে তুমি সেইরূপ আঁকিবে। ফটোগ্রাফে ছবি তুলিলে উদ্ভিদ্, জীবজন্তু, নরনারী, বাড়ীঘর ইত্যাদি যেরূপ দেখায়, চিত্রকরের শিল্পে অথবা স্থপতির কার্য্যেও এই সমুদয় বস্তু সেইরূপই দেখাইবে কি? কখনই না। যদি দেখায় তবে বুঝিতে হইবে—এখানে পাকা ওস্তাদের হাত নাই। বস্তুগুলি দেখিবার পর শিল্পীর চিত্তে যে ধারণা থাকে সেই ধারণা ফুটাইতে পারাই প্রকৃত কারিগরী। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর হাতে একই গৃহ, একই ব্যক্তি, একই উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন দেখাইবে।" ইহার নাম Post Impressionism অর্থাৎ "বস্তু দেখিবার (Impression) পর (Post) ধারণাগুলি চিত্রে বা স্থাপত্যে স্থায়ী করিবার রীতি।" ইহা ভাববাদ বা আদর্শবাদ। যেরূপ দেখিতেছি সেইরূপই আঁকিতেছি—এই নিয়মকে Impressionism অর্থাৎ "দেখা অনুসারে আঁকা" বলে। ইহা জড়বাদ—naturalism বা materialism. আমাদের নবীন জগতে Post-Impressionismএর প্রভাব চলিতেছে। প্রাচীন ও আদিম শিল্পের সৌন্দর্য্য সমালোচনা করিলে আধুনিক Post-Impressionism-তত্ত্বের কোন কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে এইজন্য আজকালকার শিল্পীদের যাঁহারা Post-Impressionist তাঁহারা প্রাচীন শিল্পের সমাদরকর্ত্তা। বলা বাহুল্য, এই Post-Impressionist বা Symbolist দলকে "ভাবুক" বা Idealist দল বলা চলিতে পারে। এই হিসাবে নব্য-ভারতের অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত শিল্পিসম্প্রদায় নবীন জগতের অন্যান্য

সম্প্রদায়ের সহোদর। ফ্রান্সে এবং ইংলাণ্ডে "ভাবুক" শিল্পীরাই যুবক ভারতের চিত্রাবলী সমাদর করিতেছেন। ইহাঁরাই আবার প্রাচীন ভারত ও মিশরের সুকুমার শিল্পের কীর্ত্তি গাহিয়া থাকেন। দেখা যাইতেছে, জগতের নূতনতম চিন্তাপদ্ধতি শেষ পর্য্যন্ত প্রাচীনতম চিন্তাপদ্ধতিরই ধারা বহন করিবে। এইজন্যই কি সর্ব্বত্র ঘরে ফের, ঘরে ফের (Back to the land, Back to the village, Back to the family) রব উঠিয়াছে?

জার্ম্মাণ চিত্রকর ক্যাণ্ডিনস্কি

মিউনিকের জার্ম্মাণ চিত্রকর ক্যাণ্ডিনস্কি (Kandinski) এইরূপ ভাবুক দলের অন্তর্গত। তিনি এই দলের আদর্শও এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদও The Art of spiritual Harmony প্রচারিত হইয়াছে। অনুবাদের ভূমিকায় অনুবাদক বলিতেছেন :—

The tradition of which true Post-Impressionism is the modern expression has been kept alive down the ages of European art by the scattered and until lately neglected painters. But not since the time of the so-called Byrantines, not since the period of which Giotto and his school were the final splendid blossoming, has the "Symbolist" ideal in art held general sway over the "Naturalist." The Primitive Italians like their predecessors the primitive Greeks, and in turn, their predecessors the Egyptians, sought to express the inner feeling rather than the outer reality.

This ideal tended to be lost in the naturalistic

revival of the renaissance which derived its inspiration solely from those periods of Greek and Roman art which were preoccupied with the expression of external reality. Although the all-embracing genius of Michæl Angelo kept the "Symbolist" tradition alive it is the work of Erl Greco that merits the complete title of "Symbolist." From Greco springs Goya and the Spanish influence on Daumier and Manet. When it is remembered that in the meantime Rembrandt and his contemporaries, notably Bronwer left their mark on French art in the work of Delacroix, Decamps and Courbet, the way will be seen clearly open to Cezanne and Ganginn."—ইয়োরোপীয় শিল্পযুগসমূহের মধ্য দিয়া যে শিল্প-ধারা (tradition of art) নব যুগের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞাত, 'উপেক্ষিত চিত্রকরগণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত ভাবে রক্ষিত হইয়াছে 'পোষ্ট ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম' তাহারই বর্ত্তমান স্বরূপ। তথাকথিত বাইরান্‌টাইনের দল বা গিয়োটোর সম্প্রদায়ের সময় হইতেই যে ভাব-শিল্পীরা (Symbolist) বস্তু-বাদীদের (Naturalist) উপর প্রভুত্ব করিয়াছে এমন নহে। আদিম ইতালীয় চিত্রকরেরা তাহাদের গুরু গ্রীকদের মত এবং গ্রীকেরা তাহাদের গুরু মিশরীয় দিগের ন্যায় বাস্তব সত্য অপেক্ষা অনুভূতিকেই শিল্পে প্রতি-ফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। গ্রীক ও রোমীয় শিল্পযুগের যে ভাগে বাহিরের দিকে বেশী নজর পড়িয়াছিল রেনেসাঁ বা নবাভ্যুদয়ের যুগে ইয়োরোপীয় শিল্পীরা সেই সকল যুগের শিল্পাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। যদিও মাইকেল এঞ্জেলো ভাবাত্মক শিল্প-ধারা

Symbolist tradition) জীবিত রাখিয়াছিলেন এর্‌ল গ্রেকো কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ অধিকার দান করেন। গোয়া গ্রেকোর শিষ্য। স্পেন-দেশেও তাঁহার দুই জন শিষ্যের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা—ডমিয়ার ও ম্যানেট্। ফরাসী দেশেও রেমব্রাণ্ট, ব্রনার প্রভৃতি একদল ভাব-শিল্পীর আবির্ভাব হয়। সিজানী ও গগিনের ইহাঁরাই অগ্রদূত।

"সিজানি" এবং "গগিন" এই দুইজন ফরাসী শিল্পী নব্য ভাবুক দলের প্রবর্ত্তক। জার্ম্মাণ ক্যান্‌ডিন্‌স্কি স্পেনের পিকাস্‌সো (Picasso) এবং ফ্রান্সের মাটিসি (Matisse) ইহাঁদের শিষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের সকলের সম্বন্ধে, The Art of spiritual Harmony-গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দলের অন্তর্গত এক চিত্রকর নিজেদের আদর্শ প্রচার করিতেছেন। কাজেই এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, নব্য শিল্পাদর্শ সহজে বুঝা যায়। সূচীপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ক। সাধারণ সৌন্দর্য্য-জ্ঞান।

১। ভূমিকা।

২। ত্রিভুজের movement বা গতি।

৩। আধ্যাত্মিক বিপ্লব।

৪। পিরামিড।

খ। চিত্র।

১। মনস্তত্ত্বের উপর রংএর কাজ বা psychological working of colour.

২। অবয়ব ও রংএর ভাষা।

৩। তত্ত্ব।

৪। শিল্প ও শিল্পীকুল।

৫। সিদ্ধান্ত।

রুশ চিত্রকর ম্যাক্স ওয়েবার

নিউ-ইয়র্কের এক সাহিত্য-বৈঠকে কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী শিল্পী, কবি, গায়ক ইত্যাদির সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহাদের মধ্যে একজন মেক্সিকোর অধিবাসী। ইনি প্রাচীন মেক্সিকোর ভাস্কর্য্যের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকার্য্যের তুলনা করিয়া উভয়েরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইনি পোষ্ট-ইম্‌প্রেসানিজিম্ বা ভাবুকতার পক্ষপাতী। ইনি ভারতের নবীন চিত্রাবলী দেখেন নাই—প্রাচীন বস্তুসমূহ দেখিয়াছেন। ইঁহার বিবেচনায় সেই সমুদয়ে কারিগরদিগের যথার্থ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই আদর্শেই বর্ত্তমান কালেও চিত্রাঙ্কন ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা উচিত। প্রাচীন মেক্সিকোর সুকুমার শিল্পও এইরূপ ভাবময়। মানবজাতির শৈশবাবস্থাই কি উন্নত শিল্পের যুগ? As Civilisation advances poetry almost always necessarily declines—সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই কবিত্বের তিরোধান হয়—মেকলের এই কথায় খানিকটা সত্য আছে কি?

এই মেক্সিকোবাসী চিত্রসমালোচক ব্যতীত একজন রুশ যুবকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি বাল্যকালাবধি আমেরিকায় বাস করিতেছেন—একজন দরিদ্র তন্তুবায়ের পুত্র। সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা বেশী ঘটে নাই। কিন্তু নিজে টাকা রোজগার করিয়া তাহার দ্বারা চিত্রবিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়াছেন। পরে ৩।৪ বৎসর ফ্রান্সে থাকিয়া নব্য ভাবুকমহলের আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। ইনি মাটিসির অন্যতম প্রধান শিষ্য। সুতরাং ইঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া নব্য চিত্রশিল্পের মূল প্রস্রবনের সন্ধান পাইলাম।

রুশ চিত্রকরের নাম ম্যাক্স ওয়েবার। ইঁহার স্বহস্তে রচিত

৬। উদীয়মান চিত্রশিল্পী ম্যাকস্‌ ওয়েবার

কার্য্যাবলী দেখিবার সুযোগ ঘটিল। সাধারণ অঙ্কনপদ্ধতি এবং নবীন-দলের রচনারীতির পার্থক্য বুঝিয়া লইলাম। The Art of Spiritual Harmony গ্রন্থের ভূমিকায় অনুবাদক নব্য শিল্পপদ্ধতির প্রবর্ত্তকদ্বয়ের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :—

"The ultimate and internal significance of what they painted counted for more than the significance which is momentary and external.

Cezanne saw in a tree, a heap of apples, a human face, a group of bathing men or women, something more abiding than either photography or impressionist painting could present. He painted the treeness of the tree. * * * He did not scruple to sacrifice accuracy of form to the inner need.

* * * Gangin also sacrifices conventional form to inner expression, but his art tends ever towards the spiritual towards that profounder emphasis which cannot be expressed in natural objects nor in words. * * *. He was much nearer a complete rejection of representation than was Cezanne."

তাঁহারা যাহা চিত্রিত করিয়াছেন তাহার শেষ এবং আভ্যন্তরিক অর্থ ক্ষণস্থায়ী বা বাহিরের ভুয়া জিনিস নয়।

সিজানি একটি গাছের মধ্যে দেখিলেন, এক রাশি আতা, একটা মানুষের মুখাবয়ব, এক দল স্নানরত নরনারী—ফটোগ্রাফে এমন চিত্র তোলা যায় না, ইম্প্রেশনিষ্ট চিত্রকর এমন ছবি আঁকিতে পারেন না।

তিনি বৃক্ষের বৃক্ষত্বকে রূপ দিয়াছিলেন। * * * তিনি আত্মিক বিকাশের খাতিরে বাহিরের বাস্তব গঠনের দিকে নজর দেন নাই।

গগিনও ঠিক তাই করেন তবে তাঁহার শিল্পের ঝোঁক আধ্যাত্মিকতার দিকে। সে আধ্যাত্মিকতা বাহিরের বস্তু বা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সিজানি অপেক্ষা তিনি বাহিরকে আরও বেশী অস্বীকার করিয়াছেন।

আমাদের দেশে অবনীন্দ্রনাথও এই মত প্রচার করিতেছেন এবং এই আদর্শে চিত্র আঁকিতেছেন। এই রীতিকে ভারতীয় অথবা প্রাচ্য অথবা হিন্দুরীতি বলা চলে না—কারণ সমগ্র জগতেই ভাবুকমহলে এই রীতি অনুসৃত হইতেছে। প্রাচীন কালের ভারতীয়, মিশরীয়, চীনীয়, গ্রীক ইত্যাদিকে জাতিগত শিল্পপদ্ধতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান-কালে ভাববিনিময় এত সত্বর ও দ্রুত সাধিত হইতেছে যে, "জাতীয়" শব্দ সাহিত্যে এবং শিল্পে প্রয়োগ করা নিতান্তই কঠিন। আজকাল দুনিয়ার সকল ভাবুকই এক গোত্রের অন্তর্গত—ইহাঁদিগকে ভারতীয়, জার্ম্মাণ বা জাপানীরূপে বর্ণনা করা অসম্ভব এবং নিষ্প্রয়োজন।

ভাবুকতাময় শিল্পের পরিচয়

ম্যাক্স ওয়েবার একজন চূড়ান্ত ভাবুক। ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মনে করুন, আপনাকে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র আঁকিতে হইবে। আপনি কি বাড়ীঘরগুলি আঁকিবেন না?" ইনি বলিলেন—"সে কথা এখন আমি বলিব কি করিয়া? যখন ছবি আঁকিতে বসিব তখন আমার মাথায় কোন্ ভাব আসিবে তাহা কি আমি বলিতে পারি? আচ্ছা বাড়ীঘর আঁকার একটা নিদর্শন দেখাইতেছি।" এই বলিয়া রুশ ভাবুক আমার হাতে একটা চিত্র দিলেন। দেখিলাম, কতকগুলি অপরিষ্কার অন্ধকারময় ঘেঁশাঘেঁশি গৃহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গৃহগুলিকে স্পষ্টরূপে চিনিতে পারা যায় না। মনে হইল যেন,

৭০ পৃষ্ঠা

৭। ওয়েবারের চিত্রাঙ্কন

ভূমিকম্পে নগর ধ্বংশ হইয়া গেলে পর অট্টালিকাসমূহ যেরূপ দেখায় সেইরূপই ধ্বংসস্তূপ দেখিতেছি। একটার উপর যেন আর একটা চাপিয়া পড়িয়াছে—সবই অস্পষ্ট—ধোঁয়াটে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, —"ইহা কি ?" চিত্রকর বলিলেন—"ইহাই আমার নিউইয়র্ক। এই মহানগরীকে আমি Over-crowdingএর নরক বিবেচনা করি। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, লোকজনের ভিড় ইত্যাদির প্রভাবে এখানে ফাঁকা হাওয়া, স্বচ্ছন্দ গতিবিধি, স্বাস্থ্য, আনন্দ, স্বাধীনতা ইত্যাদি কিছুই পাইবেন না। কিন্তু ইম্প্রেসনিষ্ট দলের চিত্রকর হইলে ২৫ তলা প্রাসাদ দেখিতাম, মোটরকার দেখিতাম, অজস্র জনতাপ্রবাহ দেখিতাম। আপনিও ফটোগ্রাফের ছবিতে যেরূপ নগরদৃশ্য দেখিয়াছেন আমার এই রচনায়ও তাহাই দেখিতেন। কিন্তু আমি আইডিয়ালিষ্ট—আমি ভাবের খেলায় মগ্ন—আমার নিকট ইট কাঠ লোহা লকড় অতিশয় নগণ্য। আমি নগরের ইনার মিনিং বা জীবন ও গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহি।"

ইহাঁর ব্যাখ্যা শুনিবামাত্র আমি রবীন্দ্রনাথের—

"হায়রে রাজধানী পাষাণকায়া
বিরাট মুঠিতলে ঝাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া !"

ইত্যাদি বিবরণ ইংরাজীতে আওড়াইয়া দিলাম। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া ইনি "গীতাঞ্জলি" দেখাইলেন এবং বলিলেন, "আমার একজন ইংরাজ বন্ধু এই বড়দিনের উপলক্ষ্যে গ্রন্থখানি উপহার পাঠাইয়াছেন। যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার আনুকূল্যেই বিলাতে এবং আমেরিকায় আমার কিছু প্রতিপত্তিও জন্মিয়াছে।" এই বন্ধু কর্তৃক প্রকাশিত Men of Mark নামক গ্রন্থে আধুনিক ইংরাজী ভাষাভাষী ২৫।৩০ জন

চিন্তাবীরের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বার্ণার্ডশ, য়ীট্‌স্‌, ওয়েল্‌স্‌ ইত্যাদির সঙ্গে যুবক ওয়েবার স্থান পাইয়াছেন।

ওয়েবার কবিতা রচনা করেন—কতকগুলি পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

ওয়েবারের সাহিত্যসেবা

রচনারীতি এবং আলোচিত বিষয় উভয়ই নূতন ধরণের। কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ইংরাজ বন্ধুই কিউবিষ্ট পোয়েমস্‌ নাম দিয়া এইগুলি বিলাতে ছাপাইয়া দিয়াছেন। প্রকাশক ভূমিকায় লিখিতেছেন—

"He came in touch with Matisse, and became one of his first pupils. Erl Greco, Cezanne, Henri Rousseau, and Picasso, are the painters with whose work he is most in sympathy ; but best of all he likes to study the art of primitive peoples, the sculptures of Egypt and Assyria, the great simple things that have come down to us in store from the past".—তিনি ম্যাটিস্‌সির সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। গ্রেকো, সিজানি, হেনরীরুসো এবং পিকাসো প্রভৃতি শিল্পীদের প্রতি তিনি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন; কিন্তু আদিম জাতির শিল্প, মিসরীয় ও আসীরিয় ভাস্কর্য্য প্রভৃতি অতীতের সহজ সরল শিল্প-নিদর্শন তাঁহার সবচেয়ে আদরের সামগ্রী।

মেক্সিকোবাসী চিত্র-সমালোচকের ন্যায় রুশ ওয়েবারও প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইনিও যুবক ভারতের চিত্রাবলী দেখেন নাই। ইনি বলিলেন, "ফ্রান্সে Musee Guiment নামক মিউজিয়ামে অসংখ্য ভারতীয় মূর্ত্তি দেখিয়াছি। সেগুলির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। নটরাজ,

অবলোকিতেশ্বর, কিন্নর, যক্ষ, বুদ্ধ ইত্যাদি গড়িতে অসাধারণ ক্ষমতা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা সকলেই idealist, symbolist or post-impressionist. তাঁহারা লম্বা আঙুল, বা বড় চোখ অথবা প্রশস্ত হাত গড়িতে লজ্জা বোধ করিতেন না। Anatomyএর নিয়ম মানিলেই কি উৎকৃষ্ট কারিগর হওয়া যায়? আমি যেখানে কোন ব্যক্তির আবেগময় দৃষ্টি বুঝাইতে চাহি সেখানে তাহার অন্যান্য সকল অঙ্গ ভুলিয়া চোখের আকৃতিতেই সকল যত্ন প্রয়োগ করিব। সাধারণ লোকের চোখের যে মাপ, আমার চিত্রে অঙ্কিত ব্যক্তির চোখে হয়ত সে মাপ দেখিতে পাইবেন না। এইরূপ অস্বাভাবিকতাই অনেক সময়ে যথার্থ স্বাভাবিকতা নহে কি?"

ওয়েবার গদ্য রচনাও করিয়াছেন। দশ বারটা প্রবন্ধ ইনি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। সকলগুলি স্কুমার শিল্পবিষয়ক। ইংরাজী ভাষায় লিখিত। রবীন্দ্রনাথের "সাধনা" গ্রন্থের যে সুর এই প্রবন্ধাবলীর সুরও সেইরূপ। ইংরাজি সাহিত্যে এইরূপ ভাবুকতার্ময় প্রবন্ধ অতি বিরল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে চিত্র-সমালোচনা-বিষয়ক সাহিত্যে ইহা একটা নবযুগ আনিবে। আধুনিক চিন্তামণ্ডলেও একটা নবীন শক্তির আবির্ভাব হইবে। লেখকের চিন্তাশক্তি অতি গভীর—এরূপ সূক্ষ্মদর্শীর রচনায় নব্য দর্শনবাদের উদ্ভব হয়। লিখিবার কৌশল, ভাষা-প্রয়োগ, শব্দ-পারিপাট্য সবই নিজস্ব—মামুলি কথার চর্ব্বিত চর্ব্বন একটুকুও নাই। বাস্তবিক পক্ষে ওয়েবার পুঁথিগত বিদ্যার ধারই ধারেন না। তাহার উপর ইহাঁর মাতৃভাষা রুশ—জীবনে কখনও ইংরাজী সাহিত্য আলোচনা করিবার অবসর হয় নাই। বয়স ৩২ বৎসর মাত্র। কাজেই নিজ হৃদয়ের উৎস হইতে ভাবার উৎপত্তি হইয়াছে।

ওয়েবারের ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হয় তাহা দেখিবার আগ্রহ থাকিয়া গেল। ইঁহার একজন আমেরিকান বন্ধুর নিকট লিখিলাম :—

"In him I have found a genious—a thinker of the first grade who is sure to conquer. * * * Altogether I am disposed to think that I have come across a man who is likely to be hailed in the next half a generation as one of the prophets and seers of the 20th century. He has a distinctive message of his own which will revolutionise western philosophy of life and make him a kindred spirit to the Hindu." অর্থাৎ তাঁহাতে আমি এক জন প্রতিভাশালী উচ্চদরের ভাবুকের সন্ধান পাইয়াছি। তিনি নিশ্চয় দিগ্বিজয়ী হইবেন। আমি ভাবি, পরবর্ত্তী কালে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাঁহাকে বিংশশতাব্দীর এক জন প্রবর্ত্তক ঋষি বলিয়া গণনা করিবে। তাঁহার যে বিশেষ বাণী সঙ্গে আনিয়াছেন তাহাতে পাশ্চাত্য দর্শনের জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতামত সম্পূর্ণ আলোড়িত হইবে। এই বাণীর জন্য তিনি হিন্দুর নিকট আত্মীয় হইয়া উঠিবেন।

ওয়েবারের গদ্যরচনার পাণ্ডুলিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

The fourth Dimension from a plastic point of view.

In plastic art, I believe, there is a fourth dimension, which may be described as the conciousness of a great and overwhelming sense of space—magnitude in all directions at one time and is brought into existence

through the three known measurements. It is not a physical entity or a mathematical hypothesis nor an optical illusion. It is real and can be perceived and felt. It exists outside and in the presence of objects, and is the space that envelopes a tree, a tower, a mountain or any solid ; or the intervals between objects or volume of matter if receptively beheld. It is somewhat similar to colour and depth in musical sound. It arouses imagination and stirs emotion. It is the immensity of all things. It is the ideal measurement, and therefore as great as the ideal, preceptive or imaginative faculties of the creator, architect, sculptor, or painter.

Two objects may be of like measurements, yet not appear to be of the same size, not because of some optical illusion but because of a greater or less perception of this so-called fourth dimension, the dimension of infinity. Archaic and the best Assyrian, Egyptian or Greek sculpture as well as paintings by Erl Greco and Cezanne and other masters are splendid examples of plastic art possessing this rare quality. * * * A form at its extremity still continues reaching out into space if it is imbued with intensity or energy. The ideal dimension is dependent for its existence upon the three material dimensions and is created entirely through

plastic means coloured and constructed matter in space and light. Life and its visions can only be realised and made possible through matter. The ideal is thus embodied in and revealed through the real."—গঠন শিল্পে পরিমাপের যে শুধু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিনটি দিক আছে তা নয়। আমার বিশ্বাস, একটি চতুর্থ দিক বা পরিসরও আছে। আমি ইহাকে বলি, চারিদিকের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে একটা সম্যক্ জ্ঞান। ইহা তথাকথিত তিনটি পরিসরের পরিমাপের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ইহার বাস্তব সত্ত্বা বা গণিত শাস্ত্রানুযায়ী একটা আনুমানিক সত্ত্বা নাই। কিম্বা ইহা কেবল যে একটা চোখের ধাঁধা তাও নয়। ইহা সত্য বস্তু, ধারণাগম্য এবং অনুভূতির জিনিষ। ইহা জিনিষের সত্ত্বায় এবং বাহিরে বিরাজ করে। একটা গাছ, একটা দুর্গ, একটা পাহাড় অথবা যে কোন একটা নিরেট জিনিষ যে ব্যাপ্তির মধ্যে থাকিতে পারে সেই সমগ্র ব্যাপ্তিই এই চতুর্থ পরিসর। ইহা কতকটা বাদ্যধ্বনির গভীরতার মত কল্পনাকে জাগাইয়া তোলে, ভাবকে আন্দোলিত করে। সমস্ত জিনিষের বিশালতাই ইহা। ইহাই আদর্শ পরিমাপ সুতরাং আদর্শেরই মত বিশাল,—স্রষ্টা, নির্ম্মাতা, ভাস্কর বা চিত্রকরের কল্পনা বা উপলব্ধি।

গঠন শিল্পে চতুর্থ পরিসর

দুইটা জিনিসের বাহিরের মাপ হয়ত এক; কিন্তু একই আকারের বলিয়া মনে হয় না। ইহা চোখের ভ্রম নয়; ঐ চতুর্থ পরিসরের, বস্তুটির বিশালতা-বোধক ব্যাপ্তির ধারণা হইতেই এই অনুভূতি জাগে। আসীরিয়, মিশরীয় ও গ্রীক ভাস্কর্য্য এবং গ্রেকো, সিজানি প্রভৃতির চিত্র এতদ্ গুণ বিশিষ্ট গঠন-শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কোন জিনিষের চিত্র বা মূর্ত্তির আকার যে তাহার সীমা রেখাতেই শেষ হয় এমন নয়,

যদি উহার ভিতর ভাবের আতিশয্য এবং গভীরতা থাকে তবে উহা সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরের ব্যাপ্তির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই চতুর্থ পরিসর সুপরিচিত পরিসরত্রয়ের উপরই মূলতঃ নির্ভর করে এবং ব্যাপ্তি, আলোক, রংফলান ও নির্ম্মাণ কৌশলের সাহায্যে সৃষ্ট হয়। জীবন এবং তার স্বপ্ন এইরূপে বাস্তবতার মধ্য দিয়াই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

কিছুকাল হইল ওয়েবারের কতকগুলি চিত্র জার্ম্মাণশিল্পী ক্যান্-ডিন্‌স্কির কার্য্যের সঙ্গে লণ্ডনের এক চিত্রকর-সমিতির উদ্যোগে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সম্প্রতি নিউইয়র্কে ইহাঁর চিত্রাবলীর প্রদর্শনী খোলা হইবে। এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ওয়েবার একটা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাঁহার এই ভূমিকা পাঠ শুনিয়াই বিশেষত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলাম। Art-consciousness নামক এক প্রবন্ধের ইহা কিয়দংশ। নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

To claim that there is anything new in art would be a very assuming and vain task. It is the alternation of genuine art epochs and principles and the juxtaposition thereof, that makes for a newness of the old. Inherence, the nonbeginning and the non-ending of the allness of all, contains in its incessant evolution, the new, and the new of the old. What we find makes for quality in the works of the ancient, that generations after us, will look for in what we may be chosen or gifted to create. Spirituality knows no art movements or cults or means, nor can manifestoes and

harangue satisfy the crave of the spirit. Spiritual truth or logic, is most severe and virile and infinitely more comprehensive and satisfying than merely products of intellectual and metaphysical vagaries.

It is expression of the essence of spirituality, of joy of revelation, brought to earth, brought to the senses by means of fitting concrete art forms that we find nourish the human spirit and ornate human aesthetic fancy. It is plastic proof of spiritual aesthetic belief and personal research. Expression it must be as it always was of the essence of spiritual tactility and inspiration. Art can not come through means of conscious frozen sophistication. To calculate is to bar infinity. To intellectualize is to smother the breath of fancy, of hope, of the more found only in the infinite as revealed through contemplation and expression thereof.

The art consciousness in us is the balmy whisper of the gods that stir in us emotion and ardor. With such emotion Giotto painted and built, with such emotion Bach wrote his concertos, with such emotion Pagannini played. With such emotion the human spirit creates out of a chaos of matter, organised forms consistent and balanced that teem with spiritual conviction of, and for all time.

Calculation and vaunted manifestœs arrive at their own nothingness and futility. A true art consciousness and the expression thereof binds infinity afore with infinity after. It has inestimable spiritual worth. It rages not, it boasts not, it invites not futile controversy. It is an indescribable inner placid vision and light that urges and guides true creation. It is the life spell between breath and breath, between pulse and pluse, between age and age.

There are other Parthenons, other Ravenna mosaics, other ancient Hindu Sculpture, other Persian rugs and tiles, and Chinese Kakemonos and other Yukatan sculpture images to come. But they will be born as in the great past, only of the poetry, of healthy purposeful human spirit.

MAX WEBER.

ওয়েবারের কবিতা রচনার একটা নিদর্শন প্রদত্ত হইতেছে :—

THE DOME

What a dome silence makes,
What music, what words are in it.
For what it echoes is not all of now.
All the music and all the words are there,
For when I speak or when I sing
My own and other echoes blended I hear.

With the sound and color of my voice,
Time to time I bind ;
Strange is the echo, but real is the echo,
And why fright at one's own echoself?
Though I call not and the spacedome silent be.
My echo, my tone-self, is there—
In space beyond with infinite echos it waits.
With whatever word or vision silence I imprint,
That my echo-self sends back to me.
My echo here
Is myself of everywhere—
My echo everywhere.
ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

---

* From Art Consciousness—one of a Series of Essays on Art recently written by Mr. Weber.

চীনের ভাষা ও সাহিত্য

বিলাতে থাকিতে চীনের নাম শুনি নাই। লণ্ডনে চীনা ছাত্র বেশী নাই। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রাচীন চীনের নিদর্শন কিছু কিছু দেখিয়াছি। এডিনবারার মিউজিয়ামে চীনা চিত্রশিল্পের একটা প্রদর্শনী হইতেছিল। সাধারণতঃ ইংরাজেরা চীনের সংবাদ বেশী রাখেন না।

কিন্তু নিউইয়র্কে আমাদের কলিকাতার চীনাবাজারের মত একটা চীনাটোলা আছে। পাড়ার নাম 'চীনাটাউন'। অবশ্য এই চীনাবাজার দেখিয়া চীনের আসল আদব কায়দা সমাজ সভ্যতা বুঝা যায় না। কিন্তু বিদেশীয় লোকেরা নিউইয়র্কের চীনামহাল্লা দেখিয়া চীন দেখার সাধ মিটাইয়া থাকেন!

নিউইয়র্কে বিদেশীয় ছাত্রসমাজের অধিকাংশই চীনদেশীয়। জাপানী ও ফিলিপিনোর সংখ্যা বেশী নয়। ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যা অত্যল্প। কাজেই এশিয়াবাসী ছাত্রের কথা উঠিলে নিউইয়র্কের লোকেরা চীনা ছাত্রের মূর্ত্তি স্মরণ করে।

আমেরিকার চীন-তত্ত্ব

এখানকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সভ্যতা শিক্ষা দিবার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। যতদূর জানি জার্ম্মাণি ছাড়া চীন-তত্ত্ব বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখান হয় না। অবশ্য চীন জাপানের গুরু—সুতরাং জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন-তত্ত্ব-বিভাগ বিশেষরূপেই গঠিত হইয়া থাকে।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা-বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ শিখান হয়,—

(১) লিখিত ভাষা, (২) কথিত ভাষা, (৩) চীন-প্রসঙ্গ। তৃতীয় বিষয় বৎসর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ চীনের সহিত ইয়োরোপের সম্বন্ধ, চীনের বাণিজ্য-ইতিহাস, সামাজিক জীবন ও শিল্প-কলা, চীনের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও মানব গাথা, চীনা সাহিত্যে লিখিত এসিয়ার জাতিসমূহের বিবরণ ইত্যাদি।

যাহারা চিনের ভাষা ও সাহিত্য পাঠ করিতে অনিচ্ছুক তাহারা এই উপায়ে প্রাচীন ও বর্ত্তমান চীনের সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম্ম, শিল্প, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সকলই শিখিতে পারে।

এই সকল বিষয় দুই স্তরে শিখান হয়। প্রাথমিক স্তরে মোটা জ্ঞান প্রদান করা হইয়া থাকে। পরে উচ্চ অঙ্গের গবেষণা সুরু হয়। প্রকৃত মৌলিক অনুসন্ধানে প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ ইত্যাদি কার্য্যে যাঁহারা লিপ্ত হইতে চাহেন তাঁহাদের জন্য এই বিভাগ। আমেরিকার সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রাথমিক বিভাগের পর একটা "অনুসন্ধান"-বিভাগ বা "পর্য্যালোচনাবিভাগ" আছে। সাধারণতঃ বি, এ, উপাধি পাইবার পর ছাত্রেরা এই বিভাগে স্বাধীন গবেষণায় অভ্যস্ত হয়। এই বিভাগকে সেমিনার বলে।

চীনতত্ত্বের "সেমিনার"-বিভাগে তিন প্রকার বিষয় আলোচিত হয়।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রশাসন বিষয়ক। মৌলিক চীনা সাহিত্যে ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের পুরাতন ও নূতন কাগজ পত্রে আলোচিত বিষয়সমূহ।

দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক সাহিত্য-বিষয়ক। পুরাতন ও মধ্য যুগের চীনের ইতিহাস বা মধ্য-এসিয়ার ইতিহাস সাহায্যে এই আলোচনা হয়।

৮৩ পৃষ্ঠা

৮। অধ্যাপক হার্থ

তৃতীয়তঃ, সাধারণ সভ্যতা-বিষয়ক। ব্রোঞ্জ, প্রস্তর, ভাস্কর্য্য, চীনা-মাটির শিল্প, বস্তুভাষা (Hieroglyphics), ক্যালিগ্রাফি, চিত্র-শিল্প ও দৈনন্দিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের আলোচনা হয়। ইহাতে চীনা সাহিত্য ও অন্যান্য দেশীয় সাহিত্যের সাহায্য লওয়া হয়।

জার্ম্মাণ অধ্যাপক ফ্রেডরিক হার্থ (Hirth) এই বিভাগের কর্ত্তা।

অধ্যাপক হার্থ

ইনি ২৫ বৎসর চীনের নানা বিভাগে কর্ম্ম করিয়াছেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়স ৭৫ বৎসর। বৃদ্ধের গৃহে চীনা বস্তুসমূহের একটা নাতি ক্ষুদ্র মিউজিয়াম দেখিলাম। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বহুচিত্র ইহাঁর সংগ্রহের অন্তর্গত। কতকগুলি ইনি কোন কোন গ্রন্থে প্রকাশও করিয়াছেন—এখনও বহু চিত্র অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, চীনাভাষায় রচিত প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ এবং রুশ, ফরাসী ও জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের লিখিত চীন-বিষয়ক নানা গ্রন্থ একত্র দেখিতে পাইলাম।

আজকাল ইহাঁর ছাত্রসংখ্যা বেশী নয়—সর্ব্বসমেত ১০।১২ জন মাত্র। ইনি বলিলেন, "ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহ বা দর্শনালোচনার জন্য কোন ছাত্র এখন পর্য্যন্ত চীনা-বিভাগে প্রবেশ করিল না। যে কয়জন ইয়াঙ্কি ছাত্র পাইয়াছি তাহারা হয় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক অথবা ব্যবসাদারের পুত্র। চীনা ছাত্র এখানে প্রায়ই আসে না। জাপানী ছাত্র দুই একজন পাইয়াছি। একজন জাপানী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ল্যানম্যানের নিকট সংস্কৃত শিখিয়া আমার নিকট চীনা শিখিতে আসে। এক্ষণে সে জাপানের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে। বর্ত্তমানে একজন জাপানী ছাত্র পি, এইচ, ডি উপাধির জন্য চীনের দর্শন-তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বাধীন গবেষণা করিতেছে। তাহার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—পরীক্ষা করিতেছি। পি, এইচ, ডি উপাধির জন্য একজন

চীনা ছাত্র চেষ্টা করিতেছে। চীনের শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহার আলোচ্য বিষয়।"

চীনের ইতিহাস সম্বন্ধে আধুনিক কালে ইয়োরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার পণ্ডিতগণ যে সমুদয় তথ্য উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন সেগুলি এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

হার্থ বলিলেন—"এ সম্বন্ধে একখানা তালিকা-গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে চীন সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র আছে। ইহা ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত। নাম Bibliotheca Sinica (Second Edition) up to 1908, Edited by Henry Cordier. আর একখানা গ্রন্থ ইংরাজিতে লিখিত। নাম Notes on Chinese Literature, লেখক Alexander Wylie. ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে চীনের সম্রাট সমগ্র সাম্রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলি সুশৃঙ্খলরূপে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল প্রকার চীনা-গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত হয়। এই ইংরাজী গ্রন্থে সেই তালিকা হইতে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এই ফরাসী ও ইংরাজী গ্রন্থদ্বয় হাতে রাখিলে চীনের প্রাচীন ও আধুনিক সকল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে মালমসলা পাইবার সুযোগ ঘটিবে।"

মূল্যবান চীনাগ্রন্থ

বলা বাহুল্য, হার্থ নানা গ্রন্থ প্রবন্ধ-পুস্তিকা লিখিয়াছেন। কিন্তু যত লিখিতে পারেন তাহার তুলনায় এখনও কিছুই বাহির হয় নাই বলিতে পারি। একখানা গ্রন্থ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। আমাদের মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বহু মূল্যবান্ উপকরণ পাওয়া যাইবে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবের মুসলমান জাতির সঙ্গে চীনের ব্যবসায় বাণিজ্য কিরূপ চলিত তাহার একটি সুবিস্তৃত সমসাময়িক গ্রন্থ আছে। গ্রন্থের

নাম Chu-fan-chi or Description of Barbarous peoples, or Records of foreign nations অর্থাৎ বিদেশ-প্রসঙ্গ। গ্রন্থের লেখক Chau Ju Kua। চীন সাম্রাজ্যের এক বন্দরে বাণিজ্য-সচিবের কর্ম্ম করিতেন। তিনি সওদাগরদিগের নিকট বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য পাইয়াছিলেন সেইগুলি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া Chau Ju Kua এই "বিদেশ-প্রসঙ্গ" গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই মূল্যবান্ গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করিয়া অধ্যাপক হার্থ এবং সুপণ্ডিত রক্‌হিল অনুবাদ, টীকা ও ভূমিকাসহ প্রকাশিত করিয়াছেন। পেট্রোগ্র্যাড নগরের Imperial Academy of Sciences হইতে গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম ভাগে বাণিজ্যসচিব নিম্নলিখিত দেশসমূহের ভৌগোলিক, সামাজিক ও আর্থিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। (১) টং কিং, (২) আনাম, (৩) পান্‌রাং, (৪) কাম্বোজ, (৫) মালয় উপদ্বীপ, (৬) ব্রহ্মদেশ, (৭) পূর্ব্ব সুমাত্রা, (৮) পশ্চিম যবদ্বীপ, (৯) সিংহল, (১০) যবদ্বীপ, (১১) মালাবার, (১২) গুজরাত, (১৩) মালব, (১৪) বোলরাষ্ট্র, (১৫) বাগদাদ, (১৬) আরব, (১৭) মক্কা, (১৮) জাঞ্জিবার, (১৯) বর্ব্বর, (২০) সোহর (?), (২১) সোমালিদেশ, (২২) ওমান, (২৩) কিশদ্বীপ, (২৪) বাস্‌রা, (২৫) গজনী, (২৬) মোজল, (২৭) এশিয়া মাইনার, (২৮) দক্ষিণ স্পেন, (২৯) মিশর, (৩০) আলেকজাণ্ড্রিয়া, (৩১) বোর্ণিও, (৩২) ফিলিপাইন দ্বীপ, (৩৩) ফর্ম্মোসা, (৩৪) কোরিয়া, (৩৫) জাপান ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগে কর্পূর, গোলাপ জল, চন্দন, লবঙ্গ, জায়ফল, কস্তুরী, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল, এলাচি, মুক্তা, গণ্ডারশৃঙ্গ, শুকপক্ষী ইত্যাদি বিবিধ পণ্যদ্রব্যের বিবরণ আছে।

ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় হার্থ বলিতেছেন :—

Such as it is, Chau Ju Kua's work must be regarded as a most valuable source of information on the ethnology of the nations and tribes known through the sea-trade carried on by the Chinese and Mahomedan traders in the Far East about the period at which it was written.

His notes to a certain extent are second hand information, but notwithstanding this, he has placed on record much original matters fact and information of great interest. The large percentage of clear and simple matter of fact data we find in his work, as compared with the improbable and incredible admixtures in all oriental authors of his time, gives him a prominent place among the medioeval authors on the ethnography of his time, a period particularly interesting to us, as it proceeds by about a century Marco Polo, and fills a gap in our knowledge of China's relations with the outside world extending from the Arab writers of the ninth and tenth centuries to the days of the great Venetian traveller."

মেগাস্থিনীস, মার্কোপোলো, বার্ণিয়ার, ট্যাভার্ণিয়ার ইত্যাদি ইয়োরোপীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ন্যায় এই চীনা ভৌগোলিক গ্রন্থ হইতে এশিয়ার ইতিহাস সঙ্কলনে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে।

হার্থের অনুমতি পাইয়া তাঁহার "অনুসন্ধান-বিভাগে" ছাত্র হইলাম। সর্ব্বসমেত ৭।৮ ঘণ্টা মাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করা হইল। ভারতীয় ছাত্রেরা এক্ষণে জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা শিখিতেছে—ক্রমশঃ রুশ ও স্পেনিশ ধরিবে। তাহা না হইলে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে ভারতবাসী প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত অল্পকালের ভিতরেই আমাদের পণ্ডিতমহলে পার্শী, চিনা ও জাপানী ভাষা শিখিবার আগ্রহও জন্মিবে। ইতিমধ্যে পার্শীভাষাজ্ঞ কেহ কেহ আমাদের দেশে দেখা দিয়াছেন। জাপানী জানা লোকও দুই চারিজন আছেন। কিন্তু চীনা ভাষাভিজ্ঞ ভারতবাসী নিতান্তই নগণ্য। আশা করা যায়, আগামী দশ বৎসরের ভিতর এসিয়ার এই সমুদয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া বহু লেখক সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইবেন।

এসিয়ার চীনা-সাহিত্য

চীনা-সাহিত্য জানা না থাকিলে এশিয়ার ইতিহাস বুঝা এক প্রকার অসম্ভব। হার্থ বলেন—"চীনা-সাহিত্য একমাত্র চীন-দেশের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নরনারীর সাহিত্য নয়। ইহা জাপান, আনাম, মোগল দেশ ইত্যাদি এশিয়ার নানা প্রদেশের সাহিত্য—প্রকৃত প্রস্তাবে অর্দ্ধ এশিয়ায় ইহার প্রভাব। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য ইয়োরোপের যে স্থান অধিকার করে চীনা-সাহিত্য তাহা অপেক্ষা বিস্তৃততর স্থান অধিকার করে।"

চীনা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ চীনা ভাষায় নাই। কিন্তু প্রাচীনকাল হইতেই চীনা গ্রন্থনিচয়ের তালিকা ও সূচীপত্র প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। চীনের লোকেরা গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে ভালবাসেন। অতি প্রাচীন যুগেও মধ্যবিত্ত এবং ধনী ব্যক্তিরা অবস্থানুসারে ক্ষুদ্র বৃহৎ লাইব্রেরী স্থাপন করিতেন।

সম্রাটেরাও রাষ্ট্রকেন্দ্রে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই সকল গ্রন্থশালার অন্তর্গত পুস্তকসমূহের নাম ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইত। এইরূপ তালিকা অনেক পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর একখানা তালিকা-গ্রন্থে চীনা-সাহিত্যের নিম্নলিখিত বিভাগ ও শাখা বিবৃত হইয়াছে :—

(১) কন্‌ফিউসিয়াস এবং লেওট্‌জ এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী দার্শনিকগণের চিন্তা-পদ্ধতি।

(২) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক।

(৩) দার্শনিক—কন্‌ফিউসিয়াস এবং লেওট্‌জ—এই দুইজনের মতবাদের বহির্ভূত চিন্তাপদ্ধতি। এতদ্ব্যতীত কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, সমর ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্যাসংক্রান্ত সাহিত্য এই শাখার অন্তর্গত।

(৪) কাব্য এবং অন্যান্য রচনা।

খৃষ্টীয় একাদশশতাব্দীর একখানা তালিকা-গ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা ৬৬ খণ্ডে বিভক্ত। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে পিকিংএর দরবার হইতে উহা প্রকাশ করা হইয়াছে। ত্রয়োদশশতাব্দীর একখানা তালিকা-গ্রন্থে চাউ জু কুয়া (Chau Ju Kua) প্রণীত 'বিদেশ-বৃত্তান্ত' উল্লিখিত হইয়াছে। চীনা-সাহিত্য সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তালিকাগ্রন্থ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কিউনলাবএর আমলে সঙ্কলিত হয়।

অধ্যাপক হার্থ একদিন খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশশতাব্দীর চীনা সভ্যতার বিবরণ প্রদান করিলেন। সেই সময়ে চাউ (Chau) রাজবংশের সূত্রপাত হয়। এই বংশ খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করে। তখনও চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনের সমাজে প্রবেশ করে। হার্থের মতে, "চাউ রাজবংশের আমলে চীনের লোকেরা চীনের বাহিরে আসিত না—বহির্ব্বাণিজ্য বলিয়া কোন ব্যাপার ঘটিত

না। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চীনের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না সন্দেহ।”

এই আমলের একখানা চীনা গ্রন্থের পরিচয় পাইলাম। নাম চেউলি (Cheouli). প্রবাদ এই যে, প্রথম সম্রাট খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে চীন রাষ্ট্রের শাসনবিধি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এই গ্রন্থ রচনা করান। তাহা হইলে দেখিতেছি, জগতের রাষ্ট্র-নীতি-বিষয়ক সাহিত্যে এই চীনা গ্রন্থই সর্ব্বপ্রাচীন। আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। এই গ্রন্থে নাকি রাষ্ট্রীয় তথ্য ছাড়া বৈষয়িক ও শিল্পবিষয়ক নানা কথার আলোচনা আছে। ইহাতে ধাতু-সংমিশ্রণ, অলঙ্কার-গঠন ইত্যাদি কার্য্য সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতি, আইনি আকবরী ইত্যাদি গ্রন্থের সঙ্গে এই হিসাবে ইহার তুলনা হইতে পারে। গ্রন্থখানা ফরাসী পণ্ডিত পাইয়ট (Piot) কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছে।

চীনাজাতির বিদেশ গমন

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি বিবেচনা করেন যে, খৃষ্টীয় যুগের পূর্ব্বে চীনারা অন্যান্য এশিয়াবাসীর সঙ্গে আদৌ মিশিত না? ইহাদের লোক-সাহিত্য, দর্শনবাদ, শিল্প, কারুকার্য্য ইত্যাদিতে পারস্য বা ভারতবর্ষের কোন প্রভাব পড়ে নাই?” ইনি বলিলেন—“না। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৮ সালে চাং কিউ (Chang Kieu) নামক একব্যক্তি মধ্য এশিয়ায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ইনি ব্যাক্ট্রিয়া, পার্থিয়া, তুর্কীস্থান ইত্যাদি দেশ দেখিয়া যান। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি চীনের বাহিরে আসিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। ইনি স্বদেশে ফিরিবার সময় কৃষি ও শিল্পের উপযোগী নানাবিধ নূতন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী চীনা-সাহিত্যে তাহার পরিচয় আছে।”

হার্থ বলেন, "জাতিতে জাতিতে ভাব-বিনিময় ও কর্ম্ম-বিনিময় সপ্রমাণ করা বড় কঠিন। মনে করুন, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থশতাব্দী হইতেও প্রাচীন চীনা-সাহিত্যে চন্দ্রের ভিতর শশকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোক-কল্পনার পরিচয় পাই। ইহা আবার খাঁটি সংস্কৃত সাহিত্যেও দেখিতে পাই। চীনারা হিন্দুদের নিকট এই ধারণা গ্রহণ করিয়াছিল, না হিন্দুরা চীনাদের নিকট এই সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল? অথচ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চীন ও ভারতের কোন বিষয়ে আদান-প্রদানের কোনরূপ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় না। এই জন্যই বিশ্বাস করিতে হয়—এই সংস্কার চীনে ও হিন্দুস্থানে স্বতন্ত্রভাবে জন্মিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, কোন বিষয়ে সাম্য দেখিলেই দুই দেশের বা সমাজের ভিতর লেন-দেন ছিল, বুঝা উচিত নয়।"

কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষা

চীনা ভাষা শিখা বড় কঠিন। প্রথমতঃ, কথিত ভাষায় এবং লিখিত ভাষায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। চীনারা কথা বলিবার সময়ে যে ভাষা ব্যবহার করে গ্রন্থ লিখিবার সময়ে সেইভাষা ব্যবহার করে না। চীনের লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষাকে দুইটী স্বতন্ত্র ভাষা বিবেচনা করা উচিত। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Desultory Notes on the Government and people of China নামক গ্রন্থে ইংরাজ লেখক মেডোস (Meadows) বলিতেছেন :—"When we learn French, in learning to speak it we at the same time learn to read it; but learning the best spoken Chinese and learning to read the written language, is like to speak the Parisian French and learning to read Latin. This is one cause of the great difficulty of learning the Chinese."

কলিকাতায় কথিত বাঙ্গলা ভাষা আয়ত্ত করিয়া যেমন কোন লোক মান্দ্রাজের তেলুগু ভাষায় লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে না, সেইরূপ চীনের মহাশুদ্ধ কথিত ভাষা আয়ত্ত করিয়াও কোন লোক চীনা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে না। তাহাকে লিখিত ও কথিত দুইটী ভাষা দুইবার দুই প্রয়াসে শিখিতে হয়।

গোলমাল এইখানেই চুকিয়া গেল না। লিখিতভাষার আবার নানা রীতি আছে। প্রত্যেক রীতি স্বতন্ত্র—এত স্বতন্ত্র ও পৃথক্ যে, চীনা ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রীতিকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বিবেচনা করা উচিত। চীনের লিখিত ভাষায় প্রধানতঃ চারিটী রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং চীনে চারিটি লিখিত ভাষা আছে বলিতে হইবে। তাহা ছাড়া, প্রদেশ হিসাবে ভাষার তারতম্য, উচ্চারণের তারতম্য ইত্যাদি আরও বহু প্রকার তারতম্য আছে। চীনাভাষার রীতিগুলি নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

(১) প্রাচীন রীতি—কন্‌ফিউসিয়াস এবং অন্যান্য দার্শনিকগণের ভাষায় এই রীতি অবলম্বিত। বিনা টীকায় ইহা বুঝা অসাধ্য। নিতান্ত সূত্রাকারে অল্প কথায় বক্তব্য সারিয়া দিবার চেষ্টা এই রীতির লক্ষণ।

(২) পণ্ডিতি রীতি—ছাত্রেরা পরীক্ষার সময়ে যে ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বোক্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার নাম পণ্ডিতি রীতি (Wen-chang or literary style.)

(৩) ব্যবসায়ী রীতি—সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যথাসম্ভব সরল ও সহজরূপে লিখিত হয়। রাষ্ট্রশাসন, বিচার, আইন, দলিল-পত্র ইত্যাদি এই ভাষায় লেখা হইয়া থাকে।

(৪) পরিচিত রীতি—সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সহজ। নভেল নাটক ইত্যাদি এই ভাষায় লিখিত হয়।

বলা বাহুল্য, শিক্ষার্থী নিজের মতলব বুঝিয়া এই চারি রীতির মধ্যে এক বা একাধিক বাছিয়া লইবেন। প্রথমেই জানিয়া রাখা উচিত, এক রীতিতে সুদক্ষ হইলে অপর রীতি সম্বন্ধে কোন সাহায্য হইবে না। মেডোস তাঁহার ইংরাজ পাঠকগণকে যাহা বলিতেছেন তাহা হইতে ভারতীয় পাঠকেরাও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন :—

"Missionaries may possibly find it useful to study ancient style in order to acquaint themselves with Chinese ethics in the original language. But every moment that the Government servant or the merchant spends in the study of the ancient style is altogether misemployed.

মনুসংহিতা, রামায়ণ বা রঘুবংশ পাঠ করিয়া যেরূপ বৈদিক ভাষায় প্রবেশ করা যায় না, সেইরূপ চীনের ব্যবসায়ী ভাষা শিখিয়া কন্‌ফিউ-সিয়াসের ভাষা দখল করা যায় না। আবার বৈদিক ভাষায় অধিকার থাকিলে কালীদাসী ভাষা আয়ত্ত হয় না। সেইরূপ কন্‌ফিউসিয়াসের ভাষা বুঝা থাকিলে রাষ্ট্রীয় ভাষা বুঝা যাইবে না। সুতরাং

"The first business of the foreign Government agent or merchant, who inteds studying the Chinese is to speak, which can be best done by reading some work in the *familiar style* as a play or novel, with a good teacher, paying however still more attention to the language the uses in the conversation than to that contained in the books. When the student is able to converse with some degree of ease, and can under-

stand the explanations of his teacher he should commence reading the more easy compositions in the business style, as the proclamation of the Mandarins, contracts &c."

অধ্যাপক হার্থও এই কথা বলেন। ইঁহার প্রণীত Chinese Documentary style নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ওলন্দাজ-সাহিত্যের সেক্সপীয়ার

আজ যেখানে নিউইয়র্কনগর পূর্ব্বে সেখানে নিউআমষ্টার্ডম্-নগর ছিল। আমেরিকার এই অঞ্চলে ওলন্দাজ-জাতির উপনিবেশ ও প্রাধান্য ছিল। সে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। তখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র—ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ খোলা হইয়াছে মাত্র। সেই যুগে আমেরিকা ও ভারতবর্ষ—দুই দেশকেই ইণ্ডিয়া বলা হইত। আমেরিকার নাম ছিল—পাশ্চাত্য ইণ্ডিয়া, ভারতবর্ষের নাম রাখা হইল—প্রাচ্য ইণ্ডিয়া। ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করিতে যাইয়াই পর্ত্তুগীজ নাবিকেরা একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলে। সুতরাং ভুলক্রমে তাহারা এই জগৎকেই ইণ্ডিয়া বিবেচনা করিত। এইজন্য এখনও আমেরিকার আদিমবাসী-দিগকে ইণ্ডিয়ান বলা হইয়া থাকে। যথার্থ ইণ্ডিয়া বা ভারতবর্ষের লোকেরা—হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক বা খ্রীষ্টান হউক—আমেরিকায় হিন্দু বা হিন্দুস্থানী বা "ইষ্ট"-ইণ্ডিয়ান (পূর্ব্বভারতীয়) নামে পরিচিত। কোন ভারতীয় পর্য্যটক যদি কোন ইয়াঙ্কিকে নিজ পরিচয় দিবার সময়ে বলেন—"আমি ইণ্ডিয়ান," তাহা হইলে ইয়াঙ্কি বিবেচনা করিবেন, ইনি আমেরিকার আদিম-নিবাসী কোন ব্যক্তি।

যাহা হউক, সেই নব ভূখণ্ড এবং নব বাণিজ্য-পথ আবিষ্কারের যুগ ইয়োরোপের ইতিহাসে অতি স্মরণীয় কাল। রাষ্ট্রশক্তি এবং ব্যবসায়-শক্তি নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল। জ্ঞানের গতিও নূতন দিকে ধাবিত হইয়াছিল। সেই যুগকে ইয়োরোপে "রেনাস্যাঁস" বা নবাভ্যুদয়ের যুগ বলা হয়।

সেই যুগের রাষ্ট্রমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ছিলেন স্পেন ও পর্ত্তুগাল; তাহার পর ওলন্দাজ-জাতির ক্ষমতা প্রকটিত হয়। কি বাণিজ্য, কি সাম্রাজ্য—কোন বিষয়েই তখনও ইংরাজ বা ফরাসী, ওলন্দাজদিগের সমকক্ষ ছিলেন না। ওলন্দাজ-প্রতিভা, এশিয়া ও ইয়োরোপ, উভয় খণ্ডেই নানারূপে দেখা দিয়াছিল।

ওলন্দাজ জাতির গৌরব যুগ

এই যুগের ওলন্দাজ চিত্রশিল্পে ভ্যান্‌ডিক, রুবেন্স, রেম্‌ব্র্যাণ্ড ইত্যাদি কারিগরগণ জগৎপ্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। এই যুগে দর্শন-ক্ষেত্রে ওলন্দাজ-জাতীয় স্পিনোজো ইয়োরোপের একমেবাদ্বিতীয়ং গুরুরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। "ইণ্টারন্যাশন্যাল ল" বা আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্মদাতা হিউগো গ্রোসিয়াস্‌ও এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ওলন্দাজ-চিন্তাশক্তির সাক্ষ্য দিতেছিলেন। এই যুগেই আবার ওলন্দাজসাহিত্যের সেক্সপীয়ার স্বরূপ ভণ্ডেল (Vondel) তাঁহার নানাবিষয়িণী সাহিত্য-সেবার দ্বারা ইয়োরোপে ওলন্দাজ-প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন।

ভণ্ডেলের নাম ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ সুপরিচিত নয়। কিন্তু তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "লুসিফার" (Lucifer) হইতে ইংরাজ-কবি মিল্টন তাঁহার "প্যারাডাইজ লষ্টে"র (Paradise Lost) বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এমন কি, ওলন্দাজ কাব্যের নানা পদ ও বাক্য মিল্টনের রচনায় রহিয়া গিয়াছে। মিল্টন ওলন্দাজ-সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন—কাজেই মৌলিক গ্রন্থ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

কবিবর ভণ্ডেলের লুসিফার

"লুসিফার" গ্রন্থ এতদিন অন্য কোন ভাষায় অনূদিত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর পর ওলন্দাজ-জাতি রাষ্ট্রীয় হিসাবে ইয়োরোপে নগণ্য হইয়া পড়ে; কাজেই তাহাদের গুণিব্যক্তিগণের বিশ্বব্যাপী সমাদর

ঘটিয়া উঠে নাই। পরবর্ত্তী যুগে ফরাসী ও ইংরাজ জগতে মাথা তুলিতেছিলেন এবং অবশেষে ইংরাজই জগতের এক প্রকার "হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা" হইয়া পড়েন। কাজেই ইংরাজ সেক্সপীয়ার দেশে দেশে প্রচারিত হইয়াছে। এমন কি, জার্ম্মাণিতে সেক্সপীয়ার-প্রচারের প্রভাবেই সাহিত্যে একটা নবযুগ আসিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মাণ সাহিত্যের নবাভ্যুদয় সেক্সপীয়ার-আলোচনায় বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। ফলতঃ ওলন্দাজদিগের কালিদাস, বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার অবসর পাইলেন না। বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোন জাতি প্রবল না হইলে, তাহার আদর্শ চিন্তা, শিল্প বা ধর্ম্ম জগতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এই জন্যই আমাদের কবি হিন্দু-কালিদাস সম্বন্ধে গাহিতে বাধ্য হইয়াছেন—"জগতের সেক্সপীয়ার, ভারতের তুমি।" কিন্তু ভারত-প্রভাব যদি বিশ্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে ভারতীয় ভাষাই বিশ্বের ভাষা হইত, ভারতের কালিদাসই জগতের কবি বলিয়া বিবেচিত হইতেন। আজকাল জগতের সর্ব্বত্র ইংরাজীভাষার প্রচলন দেখিতে পাই; অথচ জার্ম্মান বা ফরাসী তত দূর বিস্তৃত নয়—তাহার কারণ আর কিছুই নয়, ইংরাজের বিশ্বসাম্রাজ্য এবং বিশ্ব-বাণিজ্যের নিকট উদীয়মান জার্ম্মাণ বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য নাবালক মাত্র—এবং ফরাসী-প্রভাব হতপ্রভ।

ওলন্দাজ-সাহিত্য-প্রচারক

সম্প্রতি একজন ইয়াঙ্কি সাহিত্যসেবী ভণ্ডেলের লুসিফার কাব্য ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি কাব্য হিসাবে মন্দ নয়। অনুবাদক স্বয়ং একজন কবি। নাম—ভ্যান নোপেন (Van Noppen)। ইনি স্বয়ং ওলন্দাজ। কিন্তু অল্পবয়স হইতে আমেরিকায় বাস করিতেছেন—এক্ষণে হল্যাণ্ডের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু

দেশে কিছুকাল বাস করিয়া, প্রাচীন ও আধুনিক ওলন্দাজ-সাহিত্য ও ভাষা শিখিয়াছেন। এক্ষণে ওলন্দাজ-সভ্যতার প্রচার করা ইনি জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর হল্যাণ্ডের রাণী, ভ্যান নোপেনকে জগতে ওলন্দাজ-কীর্ত্তি-প্রচারের জন্য নিযুক্ত করেন। ইহার মধ্যে ইঁহার আন্দোলনে আমেরিকার ১৫।২০টী বিশ্ববিদ্যালয় ওলন্দাজ-সাহিত্য-আলোচনার জন্য ব্যবস্থা করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। ইনি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া বক্তৃতা করিবেন। সম্প্রতি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকালের জন্য স্থায়িভাবে শিক্ষকতা করিতেছেন।

কলাম্বিয়ায় ইনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখাইয়া থাকেন :—

১। ওলন্দাজ ভাষা—ব্যাকরণ, ওলন্দাজ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সাহিত্য পাঠ।

২। আধুনিক ওলন্দাজ-সাহিত্য।

৩। "রেণাসাঁ্যাস" (Renaissance) বা নবাভ্যুদয়ের যুগের ওলন্দাজ-সাহিত্য। কবিবর ভণ্ডেলের কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা।

৪। ষোড়শ শতাব্দীর ওলন্দাজ-সভ্যতা—আমেরিকায় ওলন্দাজ-প্রভাব।

যবদ্বীপের ওলন্দাজ সাম্রাজ্য হইতেও ভ্যান নোপেন নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। দুই এক বৎসরের ভিতর তিনি এসিয়ায় আসিবেন। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষও দেখিয়া যাইবেন বলিতেছেন।

ভ্যান নোপেন বেশ মিশুক লোক। ইঁহার গৃহে নানা দেশীয় লোকজনের সমাগম প্রায়ই দেখিতে পাই। বিভিন্ন জাতীয় নরনারী ইঁহার বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত। সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ইত্যাদি বিদ্যাসংক্রান্ত লোকজনের বৈঠকে ইঁহার সবিশেষ আনন্দ বুঝিতে

পারিলাম। কেহ নব্য পারস্তের ধর্ম্মপ্রচারক বাহা-প্রবর্ত্তিত মতবাদের চাঁই—কেহ আইরিশ-গেলিক আন্দোলনের পাণ্ডা—কেহ থিয়জফিষ্ট, কেহ বা বিবেকানন্দ-ভক্ত। তাহার উপর আজকালকার সাহিত্যের বাজারে 'গীতাঞ্জলী' পূজা এবং হিন্দু সুকুমারশিল্প, ফিউচারিজম্ (Futurism) বা ভবিষ্যবাদ, ইত্যাদি ত একটা ফ্যাশন আছেই। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য সম্বন্ধে "জ্ঞান-পিপাসু" কবি, চিত্রকর, দার্শনিক এবং গ্র্যাজুয়েট রমণীও দুই চারি জনকে দেখিলাম।

একজন আজীবন সাহিত্যসেবীর সঙ্গে ভ্যান নোপেনের গৃহে আলাপ হইল। ইনি ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। বহুকাল ফ্রান্সে ছিলেন—ফরাসীতে লিখিবার ক্ষমতাও আছে। বিংশশতাব্দীর নব্য ভাবুকতা ইঁহার দ্বারা ইয়াঙ্কিস্থানে প্রচারিত হইতেছে, মনে করি। গল্প ও প্রবন্ধ এবং সমালোচনা ইত্যাদি নানা শ্রেণীর গদ্যে ইঁহার হাত পাকা। সকল দিক হইতে অনাদ্যন্তের প্রতি একটা স্পৃহা-জাগান ইঁহার রচনার অন্যতম বিশেষ লক্ষণ। "The Celtic Temperament" এবং "Modern Mysticism" এই হিসাবে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইঁহার সম্বন্ধে একজন অধ্যাপক "Trend" নামক পত্রে লিখিয়াছেন :—

সাহিত্যসঙ্গীত-সেবক গ্রীয়ার্সন

"The element of wonder which enters so largely into his work is derived from his own life. * * *

Mr. Grierson does not place his trust in reason or science, but in that upwelling of intuition and emotion from the unconscious depths which have always been the source of the greatest art and religion."

আজকাল যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে সকল ক্ষেত্রেই একটা প্রতিবাদ

উঠিয়াছে। তাহার নাম Re-action against Intellectualism. লণ্ডনে থাকিতে আমাদের চিত্র-সমালোচক ডাক্তার কুমারস্বামীর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি সুকুমার শিল্প-বিভাগে এই আন্দোলনের পরিচয় দিয়া, কোন কোন পরিষদে বক্তৃতা করিতেছিলেন। ফ্র্যান্সিস গ্রিয়ার্সনও আমেরিকায় এই ভাবুকতা প্রচার করিতেছেন।

আর একজন উদীয়মান কবির সঙ্গে আলাপ হইল। ইনিও এইরূপ ভাব-প্রবণতা প্রচার করিতেছেন। ইঁহার ভাবুকতার মূল-প্রস্রবণ 'বাহা'-প্রতিষ্ঠিত নব্যধর্ম্ম। ইনি বাহাতত্ত্ব-প্রচারকের এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের সংস্পর্শে আসিয়া অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, অনন্ত, অসীম, আত্মা ইত্যাদির সন্ধান পাইয়াছেন। নাম হোরেস হোলি।

বিংশশতাব্দীর "ফৌষ্ট" কাব্য

ভ্যান নোপেন তাঁহার স্বরচিত বিরাট কাব্য গ্রন্থের কিয়দংশ স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। শুনিতে শুনিতে মনে হইল, আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এই ধরণেরই বিশ্বশক্তিমূলক বিপুল কাব্যের রচনায় ব্রতী রহিয়াছেন। ভ্যান নোপেনের "আর্ম্মাগেডন"-কাব্য (ARMAGEDDON) বিংশশতাব্দীর "ফৌষ্ট" (FAUST) রূপে বিবেচিত হইবে, বিশ্বাস হইতেছে।

গ্রন্থের নামের অর্থ "কুরুক্ষেত্র"। ভ্যান্ নোপেন এই নাম দিয়া বিগত দশ বৎসর কাল গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু ঠিক যে সময়ে ইয়োরোপে আর্ম্মাগেডন বা বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র চলিতেছে সেই সময়েই তাঁহার গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল। ভ্যান্ নোপেন বলিলেন—"আমি বোধ হয় অন্ততঃ ত্রিশ বার ইহার সংশোধন করিয়াছি। যখন এই বই আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিত তখন অনেক সময়ে সমস্ত রাত্রিই কাটাইয়া ফেলিয়াছি।" ফিন্‌ল্যাণ্ড এবং রুশিয়ার দুইজন সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ নাটকের

গীতগুলির সুর ঠিক করিয়া দিয়াছেন, শুনিলাম। ভ্যান্ নোপেনের স্ত্রী দুঃখের সহিত বলিলেন—"এত পরিশ্রমে বই লেখা হইল। কিন্তু কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক নিউইয়র্কে জুটিতেছে না। কতদিন যে পাণ্ডুলিপি ঘরে পচিবে কে জানে? বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীতে কোন উপায়ে অন্নসংস্থান হয় মাত্র। এত বড় বই ছাপিবার খরচ কুলান যায় কি?"

কবি গদ্যে একটা ভূমিকা দিয়াছেন। তাহাতে এই সংগ্রাম-মূলক গীতি-নাট্যের আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ভ্যান্ নোপেনের কল্পনা শক্তি এই বিবরণেই যথেষ্ট বুঝা যায়।

ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"Armageddon means a battle of the eternal now. We live in Eternity and act in Time. I have intended to rivet the 'To Come' and the 'Gone Before' in the socket of Today. It should depict the eternal battle between the individual and the Universal forces, between the material and the spiritual nature of man. Although the drama takes place in ancient Egypt, Palestine and Philistia, yet the reader will easily imagine he is seeing the conditions and the life of modern America. In the parade grounds of Eternity we humans are the marionets of a dreamer of unimaginable dreams. History repeats itself, and the characters repeat themselves in new settings and under new names, but fundamentally they are the same as they were hundreds of thousands of years ago."

মানবের জীবনের সনাতন সংগ্রাম লইয়া কবি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গল্পাংশ প্রাচীন মিশর ও প্যালেষ্টিনের কাহিনীতে গঠিত। কিন্তু বর্ত্তমান আমেরিকার নবীনতম সমাজের সমস্যাই যেন আলোচিত হইতেছে—গ্রন্থপাঠে এইরূপ বুঝা যাইবে। রূপ ও অরূপ, সান্ত ও অনন্ত—মানবের এই দুই দিক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ছিল—এখনও আছে। কাজেই জীবনের সাধনায় প্রত্যেক যুগের মানবই মোটের উপর এক পথে চলিতে বাধ্য। "কুরুক্ষেত্রে" ভ্যান্ নোপেন যে দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও বিপ্লব দেখাইয়াছেন তাহা বিশ্বজনীন ও সার্ব্বকালিক। কবিবর গেটে প্রণীত জার্ম্মাণ কাব্য "ফৌষ্টের" কথা এই জন্যই এক্ষেত্রে মনে হইতেছে।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞানরাজ্যে বিশেষ নামজাদা হইয়া উঠিতে পারে নাই। হার্ভার্ড ও ইয়েল এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আমেরিকায় জগৎ প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আর নাই। অথচ এদেশে সর্ব্বসমেত শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়নামধারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। অধ্যাপকগণের কীর্ত্তিতেই জগতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি রটিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ ইয়াঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ উচ্চ অঙ্গের মৌলিক গবেষণা ও স্বাধীন চিন্তামূলক অনুসন্ধান বেশী করেন নাই। এজন্য ইয়োরোপীয় প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ কোন বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকায় নাই। ইয়োরোপীয়গণ বার্লিন, হয়ডেলবার্গ, প্যারি, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ইত্যাদির সঙ্গে আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা সাধন করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। খুব জোর ইঁহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্ব্বনিম্নে হার্ভার্ড-ইয়েলের স্থান দিলেও দিতে পারেন। আমরাও ভারতবর্ষে বসিয়া হার্ভার্ড-ইয়েলেরই খ্যাতি শুনিয়াছি—অবশ্য ভারতীয় ছাত্রসংখ্যা এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতান্তই নগণ্য।

আমেরিকায় জ্ঞান প্রচারের যেরূপ ব্যবস্থা আছে জ্ঞান বাড়াইবার ব্যবস্থা তত আছে কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ জ্ঞানের সীমা ও পরিধি ইয়াঙ্কি-পণ্ডিতগণের প্রয়াসে বেশী বাড়ে নাই বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ইঁহারা অন্যের আবিষ্কৃত চিন্তাগুলি নব নব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সুফল দেখাইয়াছেন—অথবা সেইগুলিকে নূতন আকার দিয়াছেন। বোধ হয় খাঁটি নূতন সত্য আমেরিকায় বেশী আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু

বিদ্যারাজ্যের কোথায় কোন্ সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে বা হইয়াছে ইয়াঙ্কিরা তাঁহার সন্ধান রাখেন। সেই সকল সংবাদ নানা উপায়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করিতে ইঁহাদের বিশেষ প্রয়াস দেখা যায়। বক্তৃতা, প্রবন্ধ, বিবরণী, তালিকা, রিপোর্ট, বুলেটিন, ইত্যাদির দ্বারা আমেরিকার পণ্ডিতমহলে, অর্দ্ধশিক্ষিত মহলে, মহিলামহলে, শ্রমজীবি-মহলে, দুনিয়ার নূতন নূতন জ্ঞান বিজ্ঞান বিকীর্ণ করা হয়। বিদ্যা-বিকিরণের এরূপ বিপুল আয়োজন অন্য কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ। যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাজ বা ডিমক্রেসী ব্যবস্থা ইহার কারণও বটে আবার অন্যতম সুফলও বটে।

ইয়াঙ্কিস্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এইরূপ জ্ঞান-বিকিরণের কেন্দ্র-স্বরূপ। মৌলিক অনুসন্ধান, স্বাধীন চিন্তা, সেমিনার, "থীসিস" রচনা ইত্যাদি প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে সত্য—কিন্তু এগুলিতে সাধারণতঃ বিশেষ গভীর বা উচ্চ অঙ্গের আলোচনা প্রায়ই হয় না। এক প্রকার চলনসই মাঝারি গোছের বিদ্যা-প্রচারই এই সকল কেন্দ্রে হইয়া থাকে। অবশ্য উচ্চতম ইয়োরোপীয় মাপ কাঠিতে এই কথা বলা হইতেছে। ভারতবাসীর তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতা এক প্রকার নাই।

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সবই অতি নূতন। ৫০।৭৫ বৎসরের পুরাতন শিক্ষা-কেন্দ্র ইয়াঙ্কি-স্থানে বেশী নাই। বলিতে কি, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশ-রাষ্ট্রগুলিই ৫০।৭৫ বৎসরের মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই, ৮০০ বৎসরের প্রাচীন প্যারি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ৭০০ বৎসরের প্রাচীন অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির গৌরব, গভীরতা ও প্রতি-পত্তি এখানে আশা করাই অন্যায়। বয়স হিসাবে হার্ভার্ড আমেরিকার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। কার্য্যতও হার্ভার্ডই উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনার গুণে জগতে প্রতিপত্তিশালী হইতে পারিয়াছে।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে ম্যাঞ্চেষ্টার লীড্‌স্ ইত্যাদি বিলাতের নব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রের তুলনা চলিতে পারে।

হার্ভার্ড-ইয়েলের নাম ছাড়িয়া দিলে নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সবই নূতন ধরণের—ইয়োরোপীয় ছাঁচে একটাও ঢালা নয়। শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা, শিক্ষাপ্রণালী, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুই অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের অনুরূপ নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনাও ইয়াঙ্কি-স্থানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিয়মে হয়। রেসি-ডেন্‌শ্যাল নামক শিক্ষাকেন্দ্র আমেরিকায় একটাও নাই।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ভারতবর্ষের বেশী লোক জানেন কিনা সন্দেহ। নিউইয়র্কে থাকা খাওয়ার খরচ বেশী—অধিকন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক ছাত্র-বেতন ৭৫০৲। ভারতীয় ছাত্রেরা প্রায়ই গরীব—এই জন্য কলাম্বিয়ায় আমাদের ছাত্র বেশী আসিতে পারে না। কিন্তু চীনা ছাত্র এই বৎসর এখানে প্রায় ১০০ দেখিলাম। ইহাদের অধিকাংশই চীনের গবর্মেণ্ট হইতে প্রায় ৩০০৲ মাসিক বৃত্তি পায়।

ভারতীয় অধ্যাপকমহলে কলাম্বিয়ার নাম পরিচিত থাকার কথা।

সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান-বিভাগ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বিভাগ হইতে প্রথমাবধি নানাবিধ আলোচনা, প্রবন্ধ, গ্রন্থ, পুস্তিকা ও অনুসন্ধান প্রকাশিত হইয়াছে। এই ধারাবাহিক প্রচারের ফলে কলাম্বিয়া জগতের শিক্ষা-মণ্ডলে নাম করিতে পারিয়াছে। আলোচনা-গুলির মূল্য যাহাই হউক, এই সমুদয় দীর্ঘকাল চলিতেছে এবং ব্যাপক-ভাবে পরিচালিত হইয়াছে। কাজেই সমাজ-বিজ্ঞান-বিষয়ক তথ্য সম্বন্ধে এই রচনাগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প,

রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যিনিই কিছু গবেষণা করিতে চাহেন তিনিই একবার কলাম্বিয়া-প্রকাশিত সমাজ-বিজ্ঞান-সাহিত্য ঘাঁটিয়া দেখেন।

আমেরিকার প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান শিখান হইয়া থাকে। যুক্ত-রাষ্ট্রে আর্থিক-সমস্যা, জাতি-সমস্যা, শাসন-সমস্যা, নগর-সমস্যা ইত্যাদিই বিশেষরূপে দেখা দিয়াছে। কাজেই, এই সকল সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য যত্ন আমেরিকায় অতি প্রবল। ফলতঃ, সমাজ-বিজ্ঞান অর্থাৎ নরনারীর জীবন-যাপন-বিষয়ক নানা বিদ্যা ইয়াঙ্কিদিগের নিজস্ব বলা যাইতে পারে। ইয়োরোপের কোন দেশে 'সমাজ-বিজ্ঞান' শব্দটা অথবা ইহার অন্তর্গত প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ এত বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হয় না।

ইয়াঙ্কিদের এই খাঁটি স্বদেশী বিদ্যা কলাম্বিয়াই বেশী আলোচিত হইয়াছে। এজন্য ভারতবর্ষের যাঁহারা ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চ্চা করেন তাঁহারা কলাম্বিয়ার নাম না শুনিয়া পারেন নাই।

এই বিদ্যা শিখিবার জন্য ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সকল প্রকার সুযোগ ত পায়ই। অধিকন্তু তাহারা নিউইয়র্ক নগরের ভিতর নানা প্রকার সাহিত্যপরিষৎ, মিউজিয়াম, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-সমিতি ইত্যাদির সংস্পর্শে আসিয়া কর্ম্ম করিতে পারে।

সাহিত্য সমালোচনা

কলাম্বিয়ার "কম্পারেটিভ লিটরেচার" বা তুলনামূলক সাহিত্য-সমালোচনা-বিভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের রসবোধ জাগাইবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা নাই। জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজী এই তিন ভাষায় রচিত কাব্য, নাট্য, গদ্য, গীত, ইত্যাদি সকল প্রকার সাহিত্যই কলাম্বিয়ায় শিখান হইয়া থাকে। কেবলমাত্র ভাষাজ্ঞান,

ব্যাকরণ, ফিললজি ইত্যাদির প্রতিই লক্ষ্য থাকে না, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রীয় অবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ বুঝাইবারও বিশেষ চেষ্টা হয়। অধিকন্তু মানবাত্মার সাহিত্যের আকারে বিকাশ বিষয়েও যথোচিত গবেষণা করা হয়।

কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। মধ্যযুগের সাহিত্য—উপন্যাস, বিশেষভাবে ফরাসী উপন্যাস এবং ইংরাজী সাহিত্যে তাহার প্রভাব এই আলোচনার বিষয়।

২। দান্তের প্রভাব।

৩। মধ্যযুগের গীতি-সাহিত্য।

৪। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাটক-সাহিত্য।

কলাম্বিয়া-প্রকাশিত কয়েকখানা সমালোচনা-গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে :—

1. Studies in New England Transcendentalism —Goddard.

2. The Oriental Tale in England in the 18th Century—Conant.

3. Ossian in Germany—Tombo.

4. Influence of India and Persia on the Poetry of Germany—Pemy.

5. Hebbels' Niebelungen : its sources, methods, and style—Periam.

6. The Nature-Sense in the writings of Ludary Tieck—Danton.

7. Grillparzer as a poet of Nature—Walsh.

8. Development of Stage Decoration in France in the Middle Ages—Stuart.

এই সকল গ্রন্থ পি, এইচ, ডি উপাধির জন্য লিখিত হইয়াছিল। এই সমুদয় হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিলে বঙ্গ ভাষায় নিম্নলিখিত বিষয়ে সাহিত্য রচিত হইতে পারে—

১। জার্ম্মাণির লোক-সাহিত্য।

২। ইয়োরোপের প্রকৃতি-সাহিত্য।

৩। জার্ম্মাণ সাহিত্যে প্রাচ্য প্রভাব।

৪। সাহিত্য-মণ্ডলে বিনিময়।

৫। আমেরিকায় অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদি।

বিদেশীয় অধ্যাপক

নিউইয়র্কে যেমন রাস্তায় হাঁটিতে গেলে একজন জার্ম্মাণ, একজন রুশ, একজন ইহুদি, একজন পোল, একজন চীনা, একজন ইংরাজ, একজন ফরাসী ইত্যাদি নানা ভাষা-ভাষী নানা দেশীয় লোকের সঙ্গে দেখা হয়, কলাম্বিয়ার অধ্যাপক-মহলেও ঠিক সেইরূপ। এখানকার অধ্যাপকগণ সকলেই ইংরাজী বলেন বটে, এবং প্রায় সকলেই হয় ত ইয়াঙ্কি-স্থানেরই "সিটিজেন" বা আইন-সম্মত "বাসিন্দা"। কিন্তু ইহাঁদের অনেকেরই মাতৃভাষা ফরাসী, জার্ম্মাণ বা রুশ এবং কেহ কেহ সম্প্রতি ইয়াঙ্কি হইলেও রক্তের টানে ইয়োরোপীয়। ফরাসী, ওলন্দাজ, জার্ম্মাণ ইত্যাদি ভাষা শিখাইবার জন্য এইরূপ বিদেশীয় লোক আবশ্যক হইবারই কথা। কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপকগণও কেহ রুশ, কেহ জার্ম্মাণ, কেহ ফরাসী, কেহ ইংরাজ ইত্যাদি। কলাম্বিয়া আগাগোড়া তুলনামূলক, ব্যাপক ও বিশ্বগ্রাসী। এই আবহাওয়ায় দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইংলাণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে

এরূপ সার্ব্বজনীনতা বা বিশ্বমুখীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অক্সফোর্ডে, ম্যাঞ্চেষ্টারে সকল জিনিষই বিলাতী চোখে দেখা হইয়া থাকে। কলাম্বিয়ায় প্রত্যেক বস্তুই নানা চোখে দেখা হইবার সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে। কলাম্বিয়ার ইহা একটা প্রধানতম বিশেষত্ব।

পত্রিকা-সম্পাদকের দায়িত্ব

সংবাদপত্র শিক্ষা-প্রচারের শ্রেষ্ঠ উপায়। স্বরাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির রাষ্ট্র-শাসনে অধিকার থাকে। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন রাষ্ট্রীয় ঘটনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ থাকিতে চেষ্টা করে। অন্ততঃ তাহাকে এইরূপ অভিজ্ঞ করিয়া তোলা রাষ্ট্র-বীরগণের কর্ত্তব্য। কাজেই সংবাদপত্রের প্রচলন অত্যধিক করা ধুরন্ধরগণের লক্ষ্য। লোকমত গঠন করিবার অন্য কোন পন্থা নাই। এই জন্য স্বরাজাবলম্বী স্বাধীন দেশে সংবাদপত্রের কাটতি এত বেশী। কাজেই পত্রিকা-সম্পাদন সম্বন্ধে শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া সমাজে একটা সমস্যা। ভারতবর্ষে একথা বুঝা কঠিন।

আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্রিকা-সম্পাদন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিষয়ে বি, এ, এম্ এ, পি, এইচ্ ডি, উপাধি পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। কলাম্বিয়ায়ও এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

কিছুকাল হইল এক ব্যক্তি পত্রিকা-সম্পাদন ("জার্ন্যালিজম") বিভাগ খুলিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে কিছু অর্থ প্রদান করেন। সেই সময়ে তিনি দানপত্রে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছিলেন—

"But while it is a great pleasure to feel that a large number of young men will be helped to a better start in life by means of this College, this is not my primary object. Neither is the elevation of the profession which I have so much and regard so highly. In all my

planning the chief end I had in view was the Welfare of the Re-public. It will be the object of the College to make better journalists, who will make better newspapers which will better serve the public. It will impart knowledge not for its own sake, but to be used for the public service. It will try to develop character, but even that will be only a means to the one supreme end—the public good."

পত্রিকা-সম্পাদন স্বদেশ-সেবার এক প্রধান অঙ্গ ও উপায়। কাজেই স্বদেশ-সেবকের সকল দায়িত্বই পত্রিকা-সম্পাদকগণের বহন করিতে হয়। এজন্য কাগজ চালাইতে হইলে কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বিশেষরূপে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে স্বদেশ-সেবকগণ স্বকীয় দায়িত্ব এখন পর্য্যন্ত গভীর ও বিস্তৃতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। সামান্য মাত্র জ্ঞান লইয়াই আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। স্বদেশ-সেবা সম্বন্ধে এখনও আমরা ভক্তির যুগে রহিয়াছি, দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। কিন্তু জ্ঞানের যুগে এখনও আসি নাই—যাহাকে ভালবাসি তাহার জন্য কখন কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা ভাবিতে শিখি নাই—তাহার জন্য কিরূপ প্রস্তুত হইতে হইবে তাহাও বিশেষরূপে আলোচনা করি নাই। এবিষয়ে আমাদের স্বদেশভক্তগণ অনেকটা হাতুড়ে সন্দেহ নাই। আশা করা যায়, হাতুড়ে অবস্থা আমাদের শীঘ্রই চলিয়া যাইবে।

পত্রিকা-সম্পাদন

স্বদেশ-সেবার "জ্ঞানযোগ" সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা পত্রিকা-সম্পাদন-বিভাগের শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে। জার্ন্যালিজম্ বিভাগের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

প্রথম বৎসর

১। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি পদার্থ-বিজ্ঞানের মোটামোটি জ্ঞান। এই সকল বিদ্যার ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা। নৃতত্ত্ব, প্রাণবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যাও এই সঙ্গে আলোচ্য।

২। ভাষা ও সাহিত্য—ইংরাজী, ফরাসী ও জার্ম্মাণ। ইংলাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি এই কয়দেশের রাষ্ট্র-শাসন, জন-সমাজ, সাহিত্য এবং সাময়িক বা দৈনিক পত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান। মুদ্রাযন্ত্র এবং পত্রিকা-সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা।

৩। ইতিহাস—প্রাচীন যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ কোন্ দিকে হইয়াছিল তাহা জানা আবশ্যক। মধ্য যুগের ইয়োরোপে কোন্ কোন্ জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা হইত তাহা জ্ঞাতব্য। বর্ত্তমান কালে ইয়োরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা কি আকার ধারণ করিয়াছে তাহার বিশ্লেষণ।

৪। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান—আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রীয় (ফেডারাল), প্রদেশ-রাষ্ট্রীয় (ষ্টেট) এবং নগরশাসন বিষয়ক (মিউনিসিপ্যাল) আইনকাণুন ও কার্য্য-প্রণালী শিক্ষণীয়। দেশের ভিতর যত প্রকার রাষ্ট্রীয় দল (পার্টি অর্গ্যানিজেশন) আছে তাহাদের উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম-তালিকা বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

৫। দর্শন—পৃথিবীতে যুগে যুগে যে সকল দার্শনিক মতবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে সেগুলির সহিত পরিচয় আবশ্যক। দর্শন চর্চ্চার প্রভাব সমাজে, রাষ্ট্রে, শিল্পে, বৈষয়িক জীবনে কখন কিরূপ হইয়াছে তাহাও বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় বৎসর

১। পত্রিকা-সম্পাদন—সংবাদপত্রের জন্য নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ

প্রবন্ধ, গল্প, সমালোচনা, টিপ্পনী ইত্যাদি লিখিতে অভ্যাস করা আবশ্যক। রচনা-প্রণালীর বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা শিক্ষা করিতে হইবে। কোন রচনা ব্যক্তি-বিষয়ক কোনটা ঘটনা-বিষয়ক ইত্যাদি।

২। ইংরাজী ও আমেরিকান সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা।

৩। ধন-বিজ্ঞান।

৪। বর্ত্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই যুগের বিচিত্র আন্দোলনসমূহের বিবরণ, সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি এবং কার্য্য-পরিচালনা সম্বন্ধে জ্ঞান।

৫। পত্রিকা-সম্পাদন-বিষয়ক "ল্যাবরেটরী"তে বা অনুসন্ধানালয়ে বসিয়া শিক্ষালাভ। এজন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা পাঠ এবং সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা অভ্যাস করা আবশ্যক।

তৃতীয় বৎসর

১। পত্রিকা-সম্পাদন—এক্ষণে উচ্চ অঙ্গের কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্ব্ব বৎসর সাধারণ প্রবন্ধ লিখিতে অভ্যাস করা হইয়াছে। এই বৎসর দায়িত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্য, সমালোচনা, টিপ্পনী বা প্রবন্ধ রচনা করা অভ্যাস করিতে হইবে। ছাত্রগণকে ব্যাঙ্কপাড়ায়, টাকার বাজারে, দালালের আড্ডায়, বড় বড় আড়তে এবং ফ্যাক্টরিতে পাঠান হইবে। এইরূপে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ কেন্দ্রে যাতায়াত করিয়া ছাত্রগণ তথ্যসংগ্রহ করিবে এবং সেই সমুদয় ব্যবহার করিয়া জনসাধারণের কর্ত্তব্য, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, ব্যবসায়ীদিগের কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে উপদেষ্টা হইতে চেষ্টা করিবে।

২। পত্রিকা-সম্পাদন—এই কার্য্যের বাহ্য অঙ্গগুলি জানা আবশ্যক—ভাষাপ্রয়োগ, সংবাদের সত্যাসত্য বিশ্লেষণ, নির্ব্বাচন, বর্জ্জন ইত্যাদি। কোন সভার বিবরণ কিরূপে লিখিতে হয়; ছোট গল্প কিরূপে চিত্তাকর্ষক করা যায়, ইত্যাদি বিষয় শিখান হইবে।

৩। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক তথ্য-তালিকা। এই বিষয়, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও ধন-বিজ্ঞান ইত্যাদির অন্তর্গত।

৪। ইতিহাস—আধুনিক ইংরাজ জাতির বৈষয়িক অবস্থা। ইংলাণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভাবে ইয়োরোপে কিরূপ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ সমাজেও কিরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা।

দারিদ্র্য, ব্যাধি, শ্রমজীবি-সমস্যা, নারী-সমস্যা, স্বাস্থ্যোন্নতি ইত্যাদি নানা আন্দোলন বিশেষরূপে আলোচ্য।

৫। যুক্তরাষ্ট্রের দল-বিভাগ (পার্টি গবর্ণমেণ্ট)। বিলাত, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি রাষ্ট্রের ন্যায় আমেরিকায়ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জনগণের নানামত আছে। এক একটা মত লইয়া এক একটা দল গঠিত হয়। কেহ বলেন, 'নিগ্রোকে স্বাধীন না করিলে যুক্তরাষ্ট্র উন্নত হইত না'। কেহ বলেন, "নিগ্রোকে স্বাধীনতা দেওয়া ভাল হয় নাই।" কেহ বলেন, "রূপার টাকা চালান উচিত।" কেহ বলেন, "রূপার টাকা বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।" কেহ বলেন, "আমেরিকায় শিল্প-সংরক্ষণ-নীতি (প্রোটেকশন) বহুকাল চলিয়াছে—এক্ষণে ইহা বর্জ্জন করা আবশ্যক।" কেহ বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে অবাধ-বাণিজ্য (ফ্রী ট্রেড্) নীতি কোন দিনই উপকারী হইবে না। চিরকালই আমাদের প্রোটেকশানিষ্ট থাকা আবশ্যক হইবে।" ইত্যাদি। এই সকল দলের প্রাধান্য অনুসারে এ দেশে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বলা

বাহুল্য, এই দলাদলির ইতিবৃত্ত এবং নিত্য নূতন পরিবর্ত্তনগুলির সহিত সম্পাদকগণের বিশেষরূপেই পরিচিত থাকা কর্ত্তব্য।

৬। নগর-বিজ্ঞান। নগর-শাসন বিষয়ক এবং নগর-জীবন বিষয়ক সকল প্রকার আলোচনা রাস্তাঘাট, আলো, ট্রাম, নর্দ্দমা, গৃহ-রচনা ইত্যাদি।

৭। আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্য—বর্ত্তমান যুগে ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও ইতালীতে যে সকল উপন্যাস ও নাটক ইত্যাদি রচিত হইয়াছে সেই সমুদয়ের আলোচনা।

৮। ইংরাজী সাহিত্যে—বাইবেল এবং সেক্সপীয়ারীয় নাটক।

চতুর্থ বৎসর

১। পত্রিকা-সম্পাদন—সংবাদ সংগ্রহ, সংবাদ বিশ্লেষণ, সংবাদ প্রচারের কৌশল। রচনাসমূহের শিরোনামা স্থিরীকরণ ইত্যাদি।

২। পত্রিকা-সম্পাদনের ইতিহাস। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পূর্ব্বে কিরূপ লিখিত হইত, বর্ত্তমানে কিরূপ লিখিত হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা। আধুনিক সংবাদ-পত্রে গ্রন্থ সমালোচনা, চিত্র সমালোচনা, নাটক সমালোচনা, সঙ্গীত সমালোচনা ইত্যাদির স্থান বিষয়ে জ্ঞান প্রচার। কোন নাটকের প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে কিরূপ বিবরণ প্রদান করা উচিত, কোন প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন উপলক্ষে কিরূপ প্রবন্ধ লেখা উচিত ইত্যাদ সম্বন্ধেও শিক্ষা প্রচার আবশ্যক।

৩। আইন—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। এই উপদেশ প্রচারিত হইবে।

৪। ধন-বিজ্ঞান।

৫। আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান। বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ কি, কি কারণে আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে সেই

সমুদয়ের আলোচনা। সম্প্রতি রাষ্ট্র-মণ্ডলের শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষ কিরূপ গঠিত রহিয়াছে তাহার পরিচয়।

সমাজ-বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে নিউইয়র্কের নানা মিউজিয়াম ও পরিষদে লইয়া যান। সেইরূপ পত্রিকা-সম্পাদন-বিভাগের কর্ত্তারাও নগরের সংবাদপত্রগুলিকে ছাত্রগণের ল্যাবরেটরী বিবেচনা করেন। সংবাদপত্রের কাজকর্ম্ম ছাত্রেরা যাহাতে কলেজে পড়িবার সময়েই খানিকটা শিখিতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয় নগরের নানাশ্রেণীর লোকজন এবং অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে।

পত্রিকা-সম্পাদন সম্বন্ধে ছাত্রেরা "হাতে কলমে" কাজ শিখিবার সুযোগও পায়। তাহাদিগকে সহরের নানা সংবাদপত্রের আফিসে কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এই জন্য "নকরি" ঢুঁড়িয়া দিতে প্রস্তুত। আফিসে যে অভিজ্ঞতালাভ হয় সেই অভিজ্ঞতা অনুসারে ছাত্রেরা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ নিম্ন স্থান অধিকার করে। আফিসের কাজ এইরূপে বিদ্যালয়ের অঙ্গ বিবেচিত হইয়া থাকে।

বিরাট কাণ্ড

কলাম্বিয়ায় আজকাল সর্ব্বসমেত ১০,০০০ ছাত্র। গ্রীষ্মাবকাশের সময় আলগা ছাত্র ৪০০০ আসে। শিক্ষক, কেরাণী, অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ইত্যাদির সংখ্যা ৮০০ সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিকে একটা রাষ্ট্র-শাসকের কর্ম্ম করিতে হয় বলিতে পারি। এক বিভাগের অধ্যাপকেরা অন্য বিভাগের অধ্যাপকগণকে চিনিবার সুযোগ পান না। বলাই বাহুল্য, সভাপতি মহাশয়ও সকল কর্ম্মচারীকে চিনিবার সময় পান না। একজন অধ্যাপক-পত্নী বলিলেন—"অধ্যাপকদিগের পত্নীরা অনেক সময়ে অধ্যাপকে অধ্যাপকে মনোমালিন্য ঘটাইয়া থাকেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

"সে কি রকম ?" ইনি বলিলেন, "মনে করুন কোন দিন সভাপতি মহাশয় আমার স্বামীর সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলিলেন। অমনি সেই সংবাদ অন্য এক অধ্যাপক-পত্নীর কানে উঠিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার হিংসা হয় পাছে আমার স্বামী সভাপতির প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর উন্নতি হয়ত স্থগিত থাকিবে। স্ত্রীরা এইরূপ জটলা করিতে করিতে স্বামীতে স্বামীতে ঝগড়া বাধাইয়া দেন!" মজার কথা সন্দেহ নাই। একজন অধ্যাপক বলিলেন, "এই ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা বেশী বলিয়া আজকালকার সভাপতি মহাশয় কোন অধ্যাপকের সঙ্গেই কথা বলেন না। নিতান্ত আফিসী কাজের প্রয়োজন হইলে দু এক মিনিটের জন্য দেখা করেন মাত্র। তখনও ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া পত্রপাঠ বিদায় দিবার ব্যবস্থা করেন।" বৃহৎ কার্য্যে নিরপেক্ষতা এবং পক্ষপাতশূন্যতা বজায় রাখা বড়ই কঠিন।

ইয়াঙ্কি রমণী

রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে সকলপ্রকার অধিকার লাভ করিবার জন্য আজকাল পাশ্চাত্য রমণীগণ বিশেষ ব্যস্ত। মহিলাসমাজের এই আন্দোলন বিলাতেও দেখা গিয়াছে—আমেরিকাতেও দেখিতেছি। "প্রদেশশাসন, নগরশাসন, বিচারকার্য্য, রাষ্ট্রপরিচালনা, খাজনা-আদায় এবং আইন-সমালোচনা ইত্যাদি একমাত্র পুরুষজাতিরই কার্য্য নয়। স্ত্রীজাতিও এই সকলকর্ম্ম করিতে পারগ—তাহাদিগকেও এই সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রমণ্ডলে পুং-স্ত্রীভেদ বাঞ্ছনীয় নয়।" এইরূপ চিন্তা ইয়োরোপ ও আমেরিকার রমণী-সমাজে বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে।

বিংশশতাব্দীর নারীসমস্যা

অনেক রমণী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"মহাশয় ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকেরা রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভের জন্য কি করিতেছে? তাহারা ইয়োরোপ ও আমেরিকার রমণী-রাষ্ট্র-পরিষদের সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিতে ব্রতী হইবে কি?" বলা বাহুল্য, ভারতীয় পুরুষজাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার কতখানি, এই সকল প্রশ্নকর্ত্তাদের তাহাই জানা নাই!

ভারতবাসীরও এই সকল প্রশ্ন শুনিবামাত্র থতমত খাইবার কথা। কোন সদুত্তর দেওয়া ত কঠিনই—বরং প্রশ্নটা বুঝিয়া উঠাই অনেকটা দুরূহ। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—"ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপ" অথবা "ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির সম্পত্তি-বিষয়ক আইন-কানুন কিরূপ" তাহা হইলে প্রশ্নগুলি আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত বোধ হইবে না। কিন্তু রাষ্ট্রমণ্ডলে স্ত্রীজাতির স্থান সম্বন্ধে আমরা

কেহ কখনও ভাবিয়াছি কি? এই সমস্যা আমাদের সমাজে একেবারেই উপস্থিত হয় নাই। অথচ পাশ্চাত্য দেশে এই সমস্যাই মহিলাসমাজের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—এমন কি এই সমস্যার মীমাংসা না হইলে ইহাদের উদ্ধার নাই। কাজেই এখানকার স্ত্রীলোকেরা অন্য কোন দেশের রমণীসমাজের অবস্থা জানিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমেই তাহাদের রাষ্ট্রীয়-ক্ষমতার কথা জিজ্ঞাসা করে।

কোন কোন রমণীকে বলিয়াছি—"দেখুন, আপনাদের সমাজে স্ত্রী-সমস্যা এই আকারে দেখা দিবার যথেষ্ট কারণ আছে। নানা ঘটনাচক্রে আপনাদের পারিবারিক জীবন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র শ্রমজীবী কোন স্তরেই যথার্থ পরিবার আর নাই। গৃহস্থালি, ঘরকন্না, বাস্তুভিটা ইত্যাদি বলিলে যে সকল ভাব মনে আসে সে সমুদয় পাশ্চাত্যচিত্ত হইতে তিরোহিত হইয়াছে। অবশ্য আপনাদের কোন নগরে দু-চার-দশ ঘর নরনারী পারিবারিক আদর্শে জীবনযাপন করিতেছেন না—এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। কিন্তু সমগ্র সমাজের আধুনিক ঝোঁক ও গতি বর্ণনা করিতে হইলে, বিশেষতঃ নগর-জীবনের একটা সত্য চিত্র আঁকিতে হইলে, বলিব যে, পাশ্চাত্যজগতে পারিবারিক বন্ধন নিতান্তই দুর্ব্বল ও শিথিল। ইহা ক্রমশই আরও দুর্ব্বল ও শিথিল হইবে। পরিবার ভাঙ্গিয়া গেল—থাকিল কি? ব্যক্তি, "সিটিজেন" বা রাষ্ট্রীয় জীব। আপনাদের দেশে আজকাল কোন ব্যক্তি পিতা বা মাতা, কিম্বা ভাই বা বোন, অথবা স্ত্রী বা স্বামী ইত্যাদি রূপে বিবৃত হয় না। আপনারা বিবেচনা করিতেছেন যে রমণী রমণী মাত্র। তাহাকে অন্য কোন লোকের মাতা বা ভগ্নী বা স্ত্রীরূপে বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সেইরূপ আপনাদের পুরুষেরাও কতকগুলি ব্যক্তিমাত্র। তাহাদিগকে অন্য কোন পুরুষ বা রমণীর বাপ বা দাদা বা স্বামী ইত্যাদি-

রূপে বিবেচনা করা হয় না। কাজেই রাষ্ট্রমণ্ডলে পরিবারহীন ব্যক্তির অধিকার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব ইত্যাদিই একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? পুরুষেরাও যেরূপ মানুষ, স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপই মানুষ। মানুষ দুই প্রকার বা দুই জাতীয়—স্ত্রী ও পুরুষ। কাজেই রাষ্ট্রের পরিচালনায় দুই প্রকার মানুষেরই অধিকার না থাকিলে অন্যায় অত্যাচার অবিচার ঘটিতে বাধ্য। কিন্তু পারিবারিক জীবনের আদর্শ যদি ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে চলিয়া না যাইত তাহা হইলে স্ত্রী-সমস্যা বর্ত্তমান আকারে দেখা দিত না। ভারতবর্ষে পরিবার এবং পারিবারিক আদর্শ এখনও বর্ত্তমান—কাজেই আমাদের স্ত্রী-সমস্যা অন্যবিধ।"

আধুনিক পাশ্চাত্য পরিবার

পাশ্চাত্য সমাজের বর্ত্তমান লক্ষণ সম্বন্ধে মেঙ্কেন (Mencken) তাঁহার The Philosophy of Friedrich Nietzsche নামক গ্রন্থের "নারীজাতি ও বিবাহ" অধ্যায়ে নিম্ন-লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন—

"We see about us that women are becoming more independent and self-sufficient, and that as individuals, they have less and less need to seek and retain the good will and protection of individual men,......this tendency is fast undermining the ancient theory that the family is a necessary and impeccable institution and that without it progress would be impossible."

পারিবারিক-জীবনপ্রথা যে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বিলুপ্ত হইতেছে তাহার সাক্ষ্য এইরূপ অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যদেশের যে কোন নগরের কোন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের

জীবনযাত্রা-প্রণালী লক্ষ্য করিলেই বিষয়টা বেশ বুঝিতে পারি। লণ্ডন, ম্যাঞ্চেষ্টার, নিউইয়র্ক ইত্যাদি স্থানের নরনারীগণ সাধারণতঃ কি উপায়ে ২৪ ঘণ্টা কাটাইয়া থাকে তার আলোচনা করিলে সমাজের চিত্র স্পষ্ট হইবে। একটা "টাইপ" বা ছাঁচের পরিচয় দিতেছি—ব্যক্তি ও পরিবার বিশেষের যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ এই সকল লোকজনকে "গৃহস্থ" কোন মতেই বলা চলে না। ইহাদের কাহারও 'গৃহ'ও নাই—এবং কেহই বেশীক্ষণ কোন গৃহে 'থাকে'ও না। নিউইয়র্কের একএকটা প্রকাণ্ড ব্যারাকের মধ্যে অন্ততঃ দুইশত নরনারী বাস করে—এক-একজন একএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী ভাড়া করিয়া লয়। ভাড়াটিয়ার সঙ্গে কুঠরীর সম্বন্ধ অতি সামান্য মাত্র। রাত্রিকালে শয়ন-গৃহস্বরূপ কুঠরীগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ইহাদের আর কোন ব্যবহার নাই। দিবাভাগের সমস্ত সময় এবং রাত্রিকালের ⅓ অংশ পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই কুঠরীর বাহিরে কাটায়। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রমজীবী উভয়েরই নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি প্রায় এইরূপ। কেবল প্রভেদ এই যে, মধ্যবিত্ত নরনারীগণ কিছু উচ্চ অঙ্গের কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকে এবং শিক্ষিত মহলে ও সভ্যভব্য কর্ম্মকেন্দ্রে ঘুরাফিরা করে, আর শ্রমজীবী নরনারীরা কথঞ্চিৎ নিম্নস্তরের আবহাওয়ায় জীবিকা অর্জ্জন করে এবং চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়।

প্রায় গৃহেই রন্ধনের ব্যবস্থা থাকে না। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে ঘরে জল গরম করিয়া চা কিম্বা কাফি প্রস্তুত করা হয়। স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই নিদ্রাভঙ্গের পর যার যার কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া যায়। সকাল বেলার খাওয়া এবং মধ্যাহ্নভোজন দুইই কর্ম্মক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী কোন হোটেলে নিষ্পন্ন হয়। সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরিবার কথা—তখন কোন কোন স্থলে গৃহে ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে—অবশ্য অধিকাংশ দ্রব্যই

নিকটবর্ত্তী কোন হোটেল হইতে কিনিয়া আনা হয়—সময়ে সময়ে কুঠুরীতে মাংস সিদ্ধ বা দগ্ধ করিয়া লওয়া হয় মাত্র।

হোটেলে খাওয়ায় লাভ মন্দ নয়। কারণ সেখানে একসঙ্গে বহু লোকের জন্য খাবার প্রস্তুত করা হয়—বহুপ্রকার দ্রব্যও সর্ব্বদা তৈয়ারী থাকে। লোকেরা পছন্দসই জিনিষ পায়। হোটেলওয়ালারাও বহু খরিদ্দার পায় বলিয়া খাদ্যদ্রব্য সস্তায় দিতে পারে। এইজন্য গৃহস্থেরা ইচ্ছা করিয়াই হোটেলে খাইতে আসে। অধিকন্তু রন্ধনশালার কাজকর্ম্ম হইতে নারীজাতি অব্যাহতি পায়।

গৃহকর্ম্ম, গৃহস্থালি, রান্নাবাড়া, ঘরঝাড়া, বাসনমাজা ইত্যাদি কোন কাজই রমণীগণকে করিতে হয় না। এইসকল বিষয়ে দায়িত্ব বা বন্ধন ইহাদের কিছুমাত্র জন্মে না। কিন্তু মানুষের সময় ত কম নয়—চিত্ত ত ক্ষুদ্র নয়। কাজেই পাশ্চাত্য মহানগরীসমূহে সময় কাটাইবার এবং মনকে কর্ম্মঠ রাখিবার জন্য নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। আফিস বা কর্ম্মক্ষেত্রের কাজ শেষ হইবামাত্র নরনারীরা সেই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে যায়। নানাপ্রকার সভাসমিতি, নাচগৃহ, চিত্রগৃহ, থিয়েটার, লাইব্রেরী, গ্রন্থশালা, প্রদর্শনী ইত্যাদি সময় কাটাইবার কতকগুলি প্রধান সুযোগ। এই সকল লোকসমাগমের কেন্দ্রে নিত্য নূতন বস্তুর সংস্পর্শে আসা যায়—নিত্য নূতনধরণের নরনারীসম্বন্ধে গল্প-গুজব আলোচনা বা হাসিঠাট্টা চলিতে পারে। মোটের উপর প্রতিদিন ৫।৬ ঘণ্টা করিয়া এই উপায়ে অতি সহজেই কাটিতে পারে।

তাহার পর রাত্রি ১১।১২ টার সময়ে স্ত্রীপুরুষ নিজ নিজ আড্ডা হইতে কুঠুরীতে ফিরিতে থাকে। স্ত্রী তাহার নিজ বন্ধুবান্ধব ইত্যাদির চিন্তায় মগ্ন—স্বামীও তাহার নিজ নিজ সঙ্গীসহকারীদিগের কথা ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন। এ দিকে পরদিন প্রত্যুষেই দুইজনকে আবার ছুটিতে

হইবে। যে পরিবারে দুই একটি শিশুসন্তান আছে তাহার ঘরকন্নাও প্রায় এইরূপ। শিশুর লালনপালনের ভার মাতা গ্রহণ করিতে অনেক সময়েই অসমর্থ—কেননা তাহাকেও পিতার ন্যায় খাটিয়া খাইতে হয়। আলগা কোন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহার হাতে শিশুকে সমর্পণ না করিলে কাজ চলিতেই পারে না।

পরিবার ও নব্য দর্শন

গৃহস্থালির কোন অনুষ্ঠানই পাশ্চাত্য রমণীর নাই—না গৃহরক্ষা না সন্তান রক্ষা। যাহারা অবিবাহিত তাহাদের জীবন যাপনও এইরূপ। বিবাহিত এবং অবিবাহিত নরনারীতে পাশ্চাত্য দেশে কোন প্রভেদ আছে কি না সন্দেহ। প্রভেদ এই যে, বিবাহিত জীবনে কতকগুলি অনর্থক দায়িত্ব আসিয়া জুটে। অবিবাহিতগণ সেই সমুদয় দায়িত্ব এড়াইতে পারে। কাজেই বিবাহ-প্রথা উঠিয়া গেলে সমাজের কোন ক্ষতি হয় না—এইরূপ চিন্তা আজকাল বেশ প্রবল হইতেছে। প্রায় স্ত্রীপুরুষই বিবাহের বিরোধী। স্ত্রীস্বামীর সম্বন্ধ কেহই পছন্দ করিতেছে না—সকলেই পুরুষ ও রমনীতে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্দ্যের সম্বন্ধ মাত্র চাহে। কোন আফিসের পুরুষকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যেরূপ ভ্রাতৃত্ব বা সখ্যভাব আছে, সমাজের সকল পুরুষে রমনীতে সেইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াই সকলে বাঞ্ছনীয় মনে করে। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী, উকীল কেরানী, অধ্যাপক, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই এই মত পোষণ করিতেছে। যাহারা প্রকাশ্যভাবে মত প্রচার করে না তাহারাও হৃদয়ে হৃদয়ে এই মতেরই পক্ষপাতী। ফলতঃ সমাজে রমনীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে নূতন ধারণা সৃষ্ট হইতেছে—ইহাই বর্ত্তমান রমণীসমস্যা।

নরওয়ের জগৎপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন, জার্ম্মানির পোল দার্শনিক নীট্‌শে এবং বিলাতের সমসাময়িক কবি বার্ণার্ডশ এই পরিবার-ভঙ্গ-

বিষয়ক নীতির নামজাদা প্রচারক। ইহাঁরা দার্শনিকভাবে বুঝাইয়াছেন —পারিবারিক জীবনই মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবন নয়;—আবার সমাজের আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থাও আলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে—পারিবারিক আদর্শ সংসারে আর টিকিতে পারে না, একটা সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। মোটের উপর নূতন ধরনের সমাজগঠন ইহাঁরা কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পনার প্রভাব আজকালকার পাশ্চাত্য সমাজে নিতান্ত কম নয়। এতদিন ঘটনাচক্রে "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল-রিভলিউসন" বা "বৈষয়িক-বিপ্লবে"র ফলে পরিবার ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি জাগিতেছিল। এক্ষণে এই সকল চিন্তাবীরগণের উপদেশ মাথায় লইয়া, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত সকলেই পরিবার-ভঙ্গ-নীতি, বিবাহ-বর্জ্জন-নীতি ইত্যাদি মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া বেড়াইতেছে। বৈষয়িক বিপ্লবের চরমফল এতদিনে দেখা দিয়াছে। এতদিনে যাহারা কিছু সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল তাহারা এক্ষণে জোরের সহিত প্রচার করিতেছে যে, "বিবাহপ্রথা উঠিয়া গেলে সমাজের কোন ক্ষতি হইবে না—পরিবার ভাঙ্গিয়া গেলে রাষ্ট্র অবনত হইবে না—"ডাইভোর্স" বা স্ত্রীবর্জ্জন ও স্বামীবর্জ্জন ইত্যাদি সুপ্রচলিত হইলে মানব দুর্নীতিপরায়ণ হইবে না। বরং এইরূপ না হইলেই সমাজে দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতা, কপটতা ও প্রবঞ্চনা স্থায়ী ঘর করিয়া বসিবে। বার্নার্ডশ প্রণীত The Quintessence of Ibsenism গ্রন্থ এই সামাজিক নববিধানের শাস্ত্রস্বরূপ। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার "Subjection of Women" (নারী জাতির গোলামী) গ্রন্থে যে সকল বিষয় ভাবিতে পারেন নাই তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের একজন সমাজতন্ত্রবাদী সেই-সকল তত্ত্ব অতি সহজে সাহসের সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নারীজাতির অধিকার এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার বাইবেলস্বরূপ এই গ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে।

আমেরিকায় ইবসেন, নীট্‌শে অথবা বার্ণার্ড্‌শ ইত্যাদির ন্যায় কোন ধুরন্ধর চিন্তাবীর এই নব্যনীতির প্রচারক হন নাই। কিন্তু এই দেশে ঐ নীতি কার্য্যতঃ বেশী সুপ্রচলিত। পরিবারভঙ্গের দৃষ্টান্ত, স্ত্রীবর্জ্জন, স্বামীবর্জ্জন ইত্যাদির পরিচয়, বিবাহ-প্রতিরোধের সাক্ষ্য এখানকার সমাজে ইয়োরোপের সমাজ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে রমণীজাতির স্বাধীনতা, স্ত্রী-নায়কতা, মহিলাপ্রাধান্য আমেরিকায় যত দেখিতে পাই বিলাতে তত দেখিতে পাই নাই—ইয়োরোপের অন্য কোথাও বোধ হয় এত আছে কিনা সন্দেহ। নিউইয়র্কের অনেক বড় বড় আন্দোলনের কর্ত্তা স্ত্রীলোকেরা। শিল্পকর্ম্মে, সাহিত্য-সেবায়, ধনবিজ্ঞানের আলোচনায়, পরোপকার এবং লোকহিতকর অনুষ্ঠানে, শিক্ষাপ্রচারে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে কর্ম্মীগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

একদিন এখানকার একজন মহিলা-ধুরন্ধরের সঙ্গে আলাপ করিলাম।

বিশ্ব-নারী-পরিষদের ধুরন্ধর

ইনি জগতের সকল দেশের মহিলা-রাষ্ট্র-সম্মিলনীর সভাপতি। এই সম্মিলনীর নাম "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল উওম্যান সাফ্রেজ এলায়্যান্স"। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, চীন, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফিন্‌ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, গ্রেটব্রিটেন, হাঙ্গারী, আইস্‌ল্যাণ্ড, ইতালী, হলাণ্ড, নরওয়ে, পর্ত্তুগাল, রুমেনিয়া, রুশিয়া, সার্ভিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন, সুইজর্ল্যাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রিয়া, বোহিমিয়া ও গ্যালিশিয়া, এই সকল দেশে রমণী-সম্মিলনী আছে। এই পরিষৎগুলি বিশ্ব-নারী-পরিষদের অধীনে ও নায়কতায় দেশে দেশে কর্ম্ম করিয়া থাকে। কোন স্থানে শাখা-পরিষদের নাম "নারী জাতির অধিকার রক্ষক", কোন স্থানে নারীজাতির স্বাধীনতা প্রবর্ত্তক", কোন স্থানে "নারী-রাষ্ট্র-পরিষৎ",

কোন স্থানে "নারী জাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রবর্ত্তক" ইত্যাদি। স্ত্রীজাতির-রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য এই সকল সম্মিলনী নানা-প্রকার আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে।

নিউইয়র্কে যাহার সঙ্গে দেখা হইল তিনি এই সমিতির বর্ত্তমান পরিচালক, নাম শ্রীমতী ক্যাট (Mrs. catt)। ইনি সম্প্রতি একবার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ভারতবর্ষেও গিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী মিত্রের নাম করিলেন। নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীনায়কতা ইত্যাদির পরিচয় ত যথেষ্টই আছে। কিন্তু এই সমুদয়ের প্রচারক বা পাণ্ডা বেশী আছে কি? নামজাদা লেখক কিম্বা বক্তারা এই সকল বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া ত মনে হয় না। আমেরিকায় জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, ইবসেন, বা বার্নার্ড্ শ ইত্যাদির ন্যায় কোন সাহিত্য ধুরন্ধর এই সকল প্রশ্ন আলোচনা করিয়া থাকেন কি?"

ক্যাট বলিলেন, "মহাশয়, যে দেশে কোন বিষয়ে কথা প্রথম উঠে সেই দেশেই তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা, আন্দোলন বা লেখালেখি চলিতে থাকে। আমেরিকায় স্ত্রী-স্বাধীনতা বা রমণীর উচ্চ মর্য্যাদা সম্বন্ধে নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আর নাই। আমাদের আবালবৃদ্ধবনিতা এই ধারণা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। এজন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা ঐ সকল বিষয়ে লোকমত প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। কিন্তু ইংলাণ্ড বা জার্ম্মানি ইত্যাদি দেশে রমণী জাতির অধিকার অনেকটা কম। ইংরাজ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় নরনারী রমণীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে এখনও উচ্চধারণা পোষণ করে না। কাজেই ঐ-সকল দেশে গলাবাজি, লেখালেখি, প্রচারকার্য্য, আন্দোলন ইত্যাদির আবশ্যকতা আছে। এইজন্য প্রতিভাবান্ লেখকেরা এই বিষয়ে মাথা

খাটান আবশ্যক বোধ করেন। কিন্তু আমাদের গাড়োয়ান এবং কুলীরাও এই সকল তত্ত্ব নিঃশ্বাসের সহিত প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রহণ করে। কাজেই আমাদের সাহিত্যে "নারীজাতির গোলামী" নামক গ্রন্থ অথবা বার্ণার্ড শ'র ন্যায় বিপ্লববাদী সমাজনায়কের উদ্ভব হয় নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমেরিকা ত মাত্র ২০০। ৩০০ বৎসরের দেশ। ইতিমধ্যে এইরূপ সমাজ গড়িয়া উঠিল কিরূপে? ইয়োরোপের নানা দেশ হইতে নরনারী আসিয়াই ত এখানকার সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ ঐ সকল দেশ অপেক্ষা এই নূতন দেশে রমণী-স্বাধীনতা, রমণী-প্রাধান্য, রমণী-নায়কতা ইত্যাদি বেশী কেন?" ক্যাট বলিলেন—"ব্যাপার আর কিছুই নয়। আমেরিকায় দেশগঠন, সমাজগঠন, রাষ্ট্রগঠন ইত্যাদি কার্য্যে পুরুষের ন্যায় রমণীরাও যথেষ্ট কষ্টস্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছে। আমেরিকার বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসতি-স্থাপন, উপনিবেশস্থাপন, পল্লীস্থাপন, নগরস্থাপন ইত্যাদি কার্য্য করিতে ইয়োরোপীয় নরনারীদিগের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইয়াছিল। সেই কঠোর পরিশ্রমে রমণীজাতির সাহায্য যথেষ্টই ছিল। শারীরিক কষ্ট, নৈতিক বল, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি কোন বিষয়েই রমণী পুরুষের পশ্চাতে ছিল না। বরং সর্ব্বত্র সকল বিভাগে রমণীর সাহায্য এবং আনুকূল্য পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই আমেরিকায় প্রতিকূল শক্তি-সমূহের ভিতর একটা প্রবল সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। তাহা না হইলে আমেরিকায় ঔপনিবেশিকগণের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। তাহা না হইলে আটলাণ্টিকের অপর পারে একটা উচ্চ অঙ্গের উৎকর্ষপূর্ণ মানবজীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইত না। রমণীজাতি পুরুষের সঙ্গে একত্রযোগে সমানভাবে আমেরিকাসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। কাজেই প্রথম হইতে স্ত্রী ও পুরুষ আমেরিকায় বন্ধু ও সুহৃৎ—

প্রথম হইতেই কোন বিষয়ে অনৈক্য এখানে নাই। প্রথম উপনিবেশিক-দিগের সন্তানসন্ততিরা চক্ষু উন্মীলন করিয়াই দেখিল—তাহাদের আবেষ্টনে রমণীর মর্য্যাদা অতি উচ্চ। এক্ষণে বংশপরম্পরা-ক্রমে আমেরিকায় রমণী-স্বাধীনতা এবং রমণী-প্রাধান্য নিতান্তই স্বাভাবিক বোধ হয়। ইয়োরোপে ইহা এত সহজ ও নৈসর্গিক নয়।"

আমেরিকার রমণীসমাজ

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি চার্লস্ এলিয়ট তাঁহার American Contributions to Civilisation নামক গ্রন্থের এক প্রবন্ধে ফ্রান্স, ইংলাণ্ড, আমেরিকা এবং মধ্যযুগের স্ত্রীস্বত্ববিষয়ক আইন আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থায় রমণী-স্বাধীনতা বেশী। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে:—

Under the Feudal system it was almost necessary to the life of that social organisation that, when the father died, the real estate should go to the eldest son over the head of the mother.........The son, not the wife, was the husband's heir. In France to-day, if a man dies leaving a wife and children, a large share of his property must go to his children. He is not free, under any circumstances, to give it all to his wife. ....The children are his children, and the wife is not recognised as an equal owner.........Again we see in public law an assertion of the lower place of the woman. But how is it in our own country? In the first place, we have happily adopted a valuable English

measure, the right of dower; but this measure, though good so far as it goes, gives not equality but a certain protection. Happily American law goes farther, and the wife may inherit from the husband the whole of his property.........On the other hand, the wife, if she has property, may give the whole of it to the husband. Here is established in the law of inheritance a relation of equality between husband and wife."

বাস্তবিকপক্ষে সামান্য মাত্র পর্য্যালোচনা করিলেই ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রধানতঃ দুই বিষয়ে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ রমণীপ্রাধান্য এবং স্ত্রীনায়কতা। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকায় জাতিভেদ নাই—ইংলণ্ডে জাতিভেদ বিশেষ পরিমাণেই আছে। দরিদ্রের সামাজিক উন্নতি লাভ করা আমেরিকায় বেশী কঠিন নয় কিন্তু ইংলণ্ডে নিতান্তই কঠিন। এলিয়টের গ্রন্থ হইতে পুনরায় কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Nothing can be more striking than the contrast between the mental condition of an average American belonging to the laborious classes, but conscious that he can rise to the top of the social scale, and that of a European mechanic, peasant or tradesman who knows that he cannot rise out of his class, and is content with his hereditary profession."

আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে স্বচক্ষে যাহা দেখিতেছি ক্যাট এবং এলিয়টের কথায়ও তাহারই প্রমাণ পাইলাম। গৃহস্থালি

উঠিয়া যাইতেছে—সন্তানপালন উঠিয়া যাইতেছে—সন্তানপ্রসবও বর্জ্জনীয় বিবেচিত হইতেছে—বিবাহের দায়িত্ব দুর্ব্বহ বোধ হইতেছে—স্ত্রী-পুরুষের সমকক্ষ হইতেছে—রমণী স্বাধীন হইতেছে—স্ত্রীলোকেরা ব্যক্তি মাত্রে পরিণত হইতেছে—মোটের উপর পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত ৪০ বৎসরের ভিতর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১,২৭৪,৩৪১ ক্ষেত্রে স্ত্রী-বর্জ্জন অথবা স্বামী-বর্জ্জন ঘটিয়াছে। এই ডাইভোর্স ব্যাপারগুলি বিচারালয়ে মীমাংসিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিনা আইনের সাহায্যে বর্জ্জনব্যাপার কত ঘটিয়াছে তাহার প্রমাণ নাই। এই সকল তথ্য আলোচনা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল দরবার দুইখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন—গ্রন্থদ্বয়ের নাম Report on Marriage and Divorce (1867-1906)। এই রচনা পাঠ করিলে পরিবারভঙ্গ এবং স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ সাক্ষ্যই পাওয়া যাইবে। কয়েক বৎসর হইল কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Divorce : A Study on Social Causation নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেও রমণী-স্বাধীনতা এবং গৃহস্থালি-বর্জ্জন ইত্যাদির বিস্তৃত আলোচনা আছে। লেখক ইব্‌সেন, নীট্‌শে এবং বার্ণার্ডশ ইত্যাদির কথাই নূতনভাবে বলিতেছেন।

"There is no necessity for concluding that the increasing divorce rate is due to degeneracy and a decline in social morality. On the contrary, the divorce movement in certain of its aspects is the sign of a healthy discontent with present moral conditions and marks the struggle toward a higher ethical conciousness in regard to external relations."

এই নব্যনীতি যে যে সমাজে প্রচলিত হইবে সেই সেই সমাজে রমণীজাতির রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভ সম্বন্ধে আন্দোলন প্রবল হইবে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে এই নীতি এখনও প্রচলিত হয় নাই—কাজেই সাফ্রেজিট আন্দোলন ভারতবর্ষে এখনও দেখা দেয় নাই। যাহা কিছু দেখা দিয়াছে তাহা পাশ্চাত্যের ভাসা ভাসা অনুকরণ মাত্র—কোন গভীর বেদনার অভিব্যক্তি নয়। ভারতবর্ষে পারিবারিক জীবন এখনও ভাঙ্গিল না কেন? ইয়োরোপে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভলিউশন" বা শিল্পবিপ্লব সাধিত হইয়াছিল। তাহার ফলে ফ্যাক্টরীপ্রতিষ্ঠা, ব্যারাকজীবন, স্ত্রীনিয়োগ, কুলীনির্য্যাতন, ধর্ম্মঘট, শ্রমজীবি-সমস্যা ইত্যাদি পাশ্চাত্য সমাজে দেখা দিয়াছে। তাহারই এক ফল বা লক্ষণ রমণীর বৈষয়িক স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু ভারতবর্ষে সেইরূপ ফ্যাক্টরী-চালিত শিল্প, যোজনব্যাপী বিরাট কারখানা, মহাজন-শ্রমজীবী-সংঘর্ষ, ব্যারাক-জীবন ইত্যাদি এখনও পৌঁছে নাই। কাজেই স্ত্রীসমস্যা এখনও ভারতবর্ষে অন্যপ্রকার—কাজেই ইব্‌সেন, বার্ণার্ডশ, ইত্যাদির উৎপত্তি এখানে এখনও আশা করা যায় না।

প্রায় একশত বৎসর হইল পাশ্চাত্যজগতে শিল্পবিপ্লবের প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়। তাহার পূর্ব্বে এবং সেই সময়েও ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমাজজীবন কিরূপ ছিল?

"At the beginning of the modern economic era the family was the economic unit of society. It was an institution of expediency. It was usually large and lived close to the soil. It was an economic necessity. Its function involved not only the essential elements of race-maintenance and individual well-being, but of

economic life as well. Children were reared in the home. Their education and training were accomplished there. This had reference not only to the intellectual, moral and religious development, but to the training for a gainful occupation, and usually included a start in life. Production, necessary to family maintenance, to which each member of the family contributed according to his ability, was carried on within the household. Food was produced from the soil and came direct from garden and field to the table. Flax, cotton and wool were transformed into family clothing through the dexterity of the housewife. Shoes were cobbled and furniture was made by the husband on rainy days. If these occupations were a tax on physical strength they were carried on with a minimum of nervous expenditure. Women were of economic necessity home-keepers. Their time and skill were required to the utmost. If there existed incompatibility between husband and wife, the care of children and the economic necessities of the family afforded the strongest possible incentive for adjusting or suffering the difficulties."

ভারতীয় রমণীর ভবিষ্যৎ

দেখা যাইতেছে যে, পল্লীসভ্যতা, পারিবারিক জীবন, যৌথপরিবার ইত্যাদি ভারতবর্ষেরই নিজস্ব নয়। বাষ্পচালিত এঞ্জিন আবিষ্কারের পূর্ব্বপর্য্যন্ত পাশ্চাত্যজগতেও এই

সমুদয়ই বৈষয়িক এবং সামাজিক জীবনের লক্ষণ ছিল। তখন বর্ত্তমান যুগের স্ত্রীসমস্যা উপস্থিত হয় নাই। ভারতবর্ষ এখনও শিল্প সম্বন্ধে সেই অবস্থায় আছে—এবং ভারতের ভাবুক সমাজ-ধুরন্ধরেরা অনেকটা সেই বৈষয়িক আদর্শই বজায় রাখিতে চাহেন। কিন্তু সেই অবস্থা অথবা সেই আদর্শ জগতে আর থাকিতে পারিবে কি না তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। "বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি গ্রহণ করিব অথচ সেই পল্লীসভ্যতা যৌথপরিবার ইত্যাদিও রক্ষা করিব"—ইহাই নব্য ভারতের আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যা অতি দুরূহ। যাহা হউক, যদি সেই অবস্থা এবং সেই আদর্শ না থাকে তাহা হইলে পাশ্চাত্য সমাজের পরিবারভঙ্গ, স্ত্রীবর্জ্জন, স্বামীবর্জ্জন, গৃহস্থালি-বর্জ্জন, বিবাহ-বর্জ্জন, সন্তান-পালন-বর্জ্জন, সন্তান-প্রসব-বর্জ্জন, ব্যারাকজীবন, হোটেল, রেস্তরাঁ, কাফে, "ব্যাচিলার এপার্টমেণ্ট" (বা আইবুড়োদের হোটেল), ইব্‌সেন-তত্ত্ব, বার্ণার্ড্‌শ, সাফ্রেজিট আন্দোলন, রমণীপ্রাধান্য ইত্যাদি সবই ভারতবর্ষে দেখা দিবে।

সেই সময়কার ভারতসমাজ কিরূপ দেখাইবে? বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে জার্ম্মান পণ্ডিত August Bebel যে চিত্র আঁকিয়াছেন ভারতবাসীরও সেই চিত্র হইবে। বেবেলের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"Both husband and wife go to work. The children are left to themselves or to the care of older brothers and sisters who themselves need care and education. At noon hour the luncheon is eaten in a great hurry, provided that the parent have at all time to hasten home, which in thousands of cases is not possible on

account of the shortness of the recess and the distance of the place of work from home. Weary and exhausted they return home at night. Instead of a friendly and agreeable habitation, they find a small unhealthful dwelling, often devoid of light and air and most of the necessary comforts. The increasing tenement house problem with the revolting improprieties that grow therefrom, constitutes one of the darkest sides of our social order, which leads to countless evils, to vices and crimes."

এই হইবে ভারতীয় দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থা। মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র কিরূপ হইবে Howard প্রণীত History of Matrimonial Institutions হইতে তাহার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদত্ত হইতেছে :—

"With them marriage tends to become a species of purchase-contract in which the woman barters her sex-capital to the man in exchange for life support."

আমেরিকায় রমণী-স্বাধীনতা এবং রমণী-প্রাধান্যের পরিচয় বেশী দিবার প্রয়োজন নাই; জীবনের এমন কোন কার্য্য নাই যাহাতে ইয়াঙ্কি রমণীর স্থান নাই দেখিতেছি। কোন কোন কর্ম্মক্ষেত্রে তাহারা পূর্ব্বে প্রবেশ করিতে পারিত না। এক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল রাষ্ট্রমণ্ডলে পুরাপুরি অধিকার পাইলেই রমণী-স্বাধীনতা ষোল কলায় পূর্ণ হয়। আমেরিকায় বোধ হয় তাহা না হইয়া যাইবে না। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র এক্ষণেই অনেকটা রমণী-প্রধান। কিছুকাল পরে ইহা একটা রমণীশাসিত স্বরাজে পরিণত হইবে। ইতিমধ্যে স্ত্রীবর্জ্জন, বিবাহবর্জ্জন ইত্যাদিও প্রবল বেগেই চলিতে থাকিবে।

ক্যাটকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহার পর কি হইবে ?" ক্যাট বলিলেন, —"ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উত্তর দেওয়া কঠিন। বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য করিয়া চলিতেছি, দেখা যাউক কোথায় গিয়া ঠেকি।"

ব্যক্তিত্ববাদের পুরোহিত, স্বরাজাত্মার বাণীমূর্ত্তি কবিবর হুইটম্যান তাঁহার Leaves of Grass কাব্যে নবভূখণ্ডের অনুরূপ নবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ এবং নবশক্তিসম্পন্ন রমণী গড়িতে চাহিয়াছিলেন। আয়র্ল্যাণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ডাউডেনের নিকট লিখিত এক পত্রে হুইটম্যান তাঁহার আদর্শ বিবৃত করিয়াছেন :—

হুইট্‌ম্যানের আদর্শ

"I would say that (as you of course see) the spine or vertebra principle of my book is a model or ideal (for the service of the new world and to be gradually absorbed in it) of a complete healthy, heroic, practical modern *Man*—emotional, moral, spiritual, patriotic—a grander better son, brother, husband, father, citizen than any yet—formed and shaped in consonance with modern science, with American Democracy, and with requirements of current industrial and professional life—model of a *Woman* also, equally modern and heroic—a better daughter, wife, mother, citizen also, than any yet. I seek to typify a living Human personality immensely animal with immense passions, immense amativeness, immense adhesiveness—in the woman immense maternity—and

then, in both, immenser for a moral conscience, and in always realising the direct and indirect control of the divine laws through all and over all forever."

আমেরিকার এই বৈচিত্র্য, বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব ও বিপুলতার আদর্শ বাঙ্গালী কবিও চিত্রিত করিয়াছেন :—

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়
পৃথিবী শাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

সম্প্রতি ইয়াঙ্কিস্থানের নরনারীগণ "সিটিজেন" ও ব্যক্তিমাত্রে পরিণত হইতেছে। এই পরিবারহীন বিবাহবিরোধী পুরুষ-রমণী লইয়া কিরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়া হয় জগদ্বাসী তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। ইয়োরোপ এই "এক্স্‌পেরিমেণ্টে"র দৃশ্য দূর হইতে দেখিতেছে এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। ভারতবর্ষ এই নূতন ধরণের ভাঙ্গা-গড়া এখন বুঝিতে পারিবে না।

পরজাতিবিদ্বেষ ও নৃতত্ত্ব

মানবের স্বাভাবিক কুসংস্কার।

শ্বেতাঙ্গ লোকেরা কৃষ্ণাঙ্গদিগকে ঘৃণা করে। আবার কৃষ্ণাঙ্গেরাও শ্বেতাঙ্গদিগকে কম ঘৃণা করে না। সাদাচামড়া-ওয়ালা নরনারীগণকে কাল-চামড়াওয়ালা লোকেরা খোসা-ছাড়ান জীব অথবা ভূত প্রেত পিশাচ ইত্যাদি মনে করে। ভাল মন্দ, সুন্দর অসুন্দর ইত্যাদির মাপকাঠি জগতে একটা মাত্র নয়—অনেক। জাতিগত সংস্কার বহুবিধ—দেশহিসাবে, ধর্ম্মহিসাবে, বর্ণহিসাবে, ভাষাহিসাবে পৃথক্। এই সংস্কারগুলি ছাড়াইয়া উঠা এক-প্রকার অসম্ভব। দুনিয়ার নরনারীকে কাল সাদা লাল পীত অথবা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান অথবা চীনা ভারতবাসী ইংরাজ নিগ্রো ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া হস্ত-পদ-চিত্ত-মস্তিষ্কবিশিষ্ট মানবমাত্র বিবেচনা করা সাধারণতঃ সম্ভবপর হয় না। আমি আমার নিজের পরিচিত এবং নিজের অভ্যস্ত স্বভাব ও ধারণাগুলির বাহিরে যাহা কিছু দেখি শুনি তাহা পছন্দ করি না। তুমিও তোমার জানা শুনা রীতি নীতি কায়দা কানুন ছাড়া যাহা কিছু দেখ তাহা পছন্দ কর না। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। কেবল তাহাই নয়—অপরিচিত অজানা বস্তুমাত্রই ঘৃণা, নিন্দা ও অবজ্ঞার পদার্থ। পরজাতিবিদ্বেষ মানুষের স্বধর্ম্ম। আমার জ্ঞান গণ্ডী ও সংস্কারের বাহিরে সবই "বারবেরিয়ান" বা "ম্লেচ্ছ" বা "কাফের" বা "পেগান" বা "নিগার" ইত্যাদি পদবাচ্য। পাঁচ হাজার বৎসরের মানবেতিহাস এই কুসংস্কারের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

১৯১১ সালে লণ্ডনে "ইউনিভারসাল রেসেস কংগ্রেস" বা "বিশ্বমানব-পরিষদের" প্রথম সভা আহুত হয়। সেই সভায় পশ্চিম-আফ্রিকাবাসী

ডাক্তার আগ্‌বেবি শেতাঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণ আফ্রিকাবাসীর ঘৃণা বিবৃত করিয়াছিলেন—

"The unsophisticated African entertains aversion to white people, and when on accidentally or unexpectedly meeting a white man he turns or takes to his heels, it is because he feels that he has come upon some unusual or unearthly creature, some hobgoblin, ghost or sprite, and when he does not look straight in a white man's face, it is because he believes in the 'evil eye', and that an aquiline nose, scant lips and cat-like eyes affect him. The Touriba word for a European means a peeled man and to many an African the white man exudes some rancid-odour not agreeable to his olfactory nerves."

অর্থাৎ—অজ্ঞ আফ্রিকাবাসীরা শেতাঙ্গ লোকদিগকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না। হঠাৎ কোন আফ্রিকাবাসী শেতাঙ্গের সম্মুখে পড়িয়া গেলে তাহাকে গায়ের চামড়া-ছাড়ান ভূত প্রেত পিশাচ দৈত্য দানা মনে করিয়া ও তাহার চোক নাখ, পাতলা ঠোঁট ও কটা চোখ অপার্থিব মনে করিয়া নজর লাগিবার ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া যায়। তাহারা শেতাঙ্গের গায়ের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না।

শেতাঙ্গ ইয়োরোপীয়দিগের গায়ের দুর্গন্ধ কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকাবাসী সহ্য করিতে পারে না। চীনাম্যানেরাও নাকি ইয়োরোপীয় নরনারী দেখিলে নাক বন্ধ করিয়া চলে। কেম্ব্রিজবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যাডন এইরূপ জাতিগত সংস্কার ও ধারণা সম্বন্ধে বলেন :—

"Practically all peoples look upon their own physical characters as constituting the normal type and consequently regard those that differ from them as being strange and even repulsive."

অর্থাৎ জগতের প্রত্যেক জাতিই নিজেদের শারীরিক সৌষ্ঠবকেই সঙ্গত মনে করিয়া অপরের শরীরে সেই আদর্শের ব্যতিক্রম দেখিলেই তাহাকে অদ্ভুত ও উপহাস্য, এমন কি বর্জ্জনীয় মনে করে।

এই ত গেল শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য্যের কথা। মস্তিষ্কের বিকাশ, চরিত্রবল, নৈতিক উৎকর্ষ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ইত্যাদি লইয়াও জাতিতে জাতিতে বিবাদ ও মনোমালিন্য কম নয়। প্রত্যেকেই নিজের মাপকাঠিতে নিজকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে এবং অপরকে ৵০, ।০, ।৵০, ॥৵০ ইত্যাদি রকমের সভ্য বিবেচনা করে। কোন জাতিই অপর কোন জাতিকে ষোল-আনা সভ্যতার অধিকারী ভাবিতেই পারে না। তাহার পর আবার সভ্যতার আদর্শ লইয়া কলহ। প্রত্যেক সমাজই বিবেচনা করে যে, তাহার উদ্ভাবিত আদর্শ সর্ব্বোচ্চ। বিলাতের Sociological Review পত্রে একটি প্রবন্ধের প্রারম্ভে Spiller লিখিতেছেন :—

"If we ask a Chinese, an Indian, a Negro, or an American Indian, whether he admits the white man's claim to superiority, we must invariably receive as a reply a good-natured smile, as if the proposition were too absurd to be seriously entertained. In other words, each race or division of mankind appears to regard itself as at least the equal of all others, and accordingly it would presume an unscientific attitude of mind to

accept the dictum of the white, or any other, man's superiority without cool and thorough investigation."

চীনা, হিন্দুস্থানী, নিগ্রো, লাল-আমেরিক যাহাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক কেহই শেতাঙ্গকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে না; প্রত্যেক জাতি নিজেকে অপরের অপেক্ষা হীন ত নয়ই সমান-সমান মনে করে। সুতরাং শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী প্রমান ব্যতীত মানিয়া লইলে অবৈজ্ঞানিকের কাজ করা হইবে।

লণ্ডনের বিগত বিশ্বমানব-পরিষদের সভায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ হইতে বক্তা আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহই নিজ জাতির হীনতা স্বীকার করেন নাই—সকলেই নিজ নিজ মহত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। সাদা-চামড়ার ও রাঙ্গা-চামড়ার ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জের ভিতরও সভ্যতার আদর্শ লইয়া এইরূপ কলহ দেখা যায়। জার্ম্মান-অদর্শ বড় কি ইংরাজ আদর্শ বড়, আমেরিকার সভ্যতা উচ্চতর কি ইংরাজ-সভ্যতা উচ্চতর, রুশিয়ার সমাজকে ইয়োরোপীয় বিবেচনা করা উচিত কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক এবং পণ্ডিত মহলে আলোচিত হইয়া থাকে। ফরাসীরা বিবেচনা করেন, তাঁহারাই ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ জাতি, আবার জার্ম্মানেরা প্রচার করেন যে, জগতে সভ্যতা বিস্তারের জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব ইত্যাদি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি এলিয়ট প্রচার করিলেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জগৎকে পাঁচটা নূতন সত্য দান করিয়াছে। অমনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ম্মান-জাতীয় অধ্যাপক মুন্‌ষ্টারবার্গ তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থ লিখিলেন, "ঐ পাঁচটি সত্য আমেরিকাবাসীর আবিষ্কৃত নিজস্ব দান নয়—জার্ম্মান জাতিও ঐ-সকল গুণে ভূষিত। মানবজাতি জার্ম্মানের নিকটও এই সম্বন্ধে ঋণী।" এদিকে ওলন্দাজ জাতির মহিমা

কীর্ত্তন এবং জার্ম্মানির নিন্দা প্রচার করিয়া আর-একজন অধ্যাপক বলিতেছেন—

"The Dutch mind cannot conceive of a military system like Germany's. In Holland you will find a quintessential love of liberty. * * * In Germany the people are trained to act like one gigantic machine. * * * The Germans are not inventive nor creative. * * * It was a native of Holland that invented the window glass, the microscope, the mariner's compass ect. Why, even Edison and Walt Whitman are of Dutch descent."

ওলন্দাজের মন জার্ম্মানির মতন অমন সমর-তন্ত্র নহে। হল্যাণ্ডে স্বাধীনতা-প্রিয়তার চরম পরিচয় পাওয়া যায়। জার্ম্মান লোকগুলাকে একটা দানবীয় কলের অংশ করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। তাহারা না গঠন করিতে না উদ্ভাবন করিতে পারে। ওলন্দাজেরা শার্সি, অণুবীক্ষণ, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, আবিষ্কার করে। এমন কি এডিসন ও ওাল্ট হুইটম্যানও ওলন্দাজ বংশীয়।

এইরূপ পরজাতিবিদ্বেষ প্রাচীন এবং মধ্যযুগেও ছিল। তবে তখন বিদ্বেষ ও কলহের ক্ষেত্র অনেকটা সংকীর্ণ ছিল, এবং বিদ্বেষ ও কলহের ফল বেশী বিষময় হইত না। উনবিংশ শতাব্দীতে এই জাতিগত কুসংস্কার এবং পরজাতি-বিদ্বেষ বিস্তৃত ক্ষেত্রে এবং নূতন আকারে দেখা দিয়াছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, ইয়োরোপের এবং ইয়োরোপীয় উপনিবেশ-সমূহের নরনারী বর্ত্তমান কালে জগতের অন্যান্য সকল

বর্ত্তমানযুগের কুসংস্কার

ধর্ম্মাবলম্বী এবং ভাষাভাষী নরনারীদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে। ইয়োরোপীয় রক্তমাংসবিশিষ্ট যে কোন লোক এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার স্বদেশী লোকজনকে সকল বিষয়ে অবনত ও নিন্দনীয় জ্ঞান করে। "বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতাই জগতে একমাত্র সভ্যতাপদবাচ্য বস্তু, —অন্যান্য স্থানের লোকেরা অসভ্য, অথবা অর্দ্ধসভ্য। তাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অধীনে না আসিলে কখনও উন্নত হইবে না"—এই ধারণাই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পরজাতিবিদ্বেষের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। খ্রীষ্টানে খ্রীষ্টানে এখনও লড়াই চলে, ইংরাজ ও ফরাসীতে যথার্থ বন্ধুত্ব এখনও হয় নাই, রুশ এবং ইংরাজ চিরশত্রু সন্দেহ নাই। তথাপি গত শতাব্দীর চিন্তা ও সাহিত্যের ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইয়োরোপীয় লোকেরা দুনিয়ার অন্যান্য লোককে মানুষ জ্ঞান করে না, ইহাদের বিবেচনায় মুসলমান, চীনা, জাপানী, নিগ্রো, আমেরিকান ইত্যাদি অর্দ্ধমানব মাত্র।

এইরূপ কুসংস্কারের কারণ খুঁজিতে বেশীদূর যাইতে হইবে না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জ জগতের নানাস্থানে স্বকীয় সাম্রাজ্য ও ও বাণিজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে। যে জাতি মনিব হয় সে কখনও তাহার গোলাম জাতিকে সম্মান করে না। কাজেই বিশ্বসাম্রাজ্য ও বিশ্ববাণিজ্যের অধিকারী জাতিরা অধীনস্থ নরনারীগণকে কুকুর বিড়ালের ন্যায় বিবেচনা করিতে শিখিয়াছে। সফলতার উন্মাদনা বড় বেশী। সফলতাপ্রাপ্ত জাতি শীঘ্রই তাহার অতীত ভুলিয়া যায়। ১৮১৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহা উনবিংশ শতাব্দীর কোন শ্বেতাঙ্গ মনে রাখে নাই। মনে রাখিলে ইহারা সহজেই বুঝিত যে, এশিয়ায় ও ইউরোপে, অথবা কৃষ্ণাঙ্গে ও শ্বেতাঙ্গে, অথবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জাতিগত এবং সভ্যতা-গত তারতম্য এবং

উচ্চনীচ বিচার করা অসম্ভব; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত কোন ইয়োরোপীয় জাতিই প্রাচ্যদেশীয় জাতিপুঞ্জ হইতে উন্নত ছিল না। কিন্তু বিজয়ের গৌরব ও গর্ব্ব মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখে। কাজেই আজ জগতে ইয়োরোপীয় সভ্যতার আস্ফালন এবং হিন্দু, মুসলমান, চীনা জাপানীর নির্য্যাতন চলিতেছে। অথচ ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল পর্ত্তুগীজ, ইতালীয়, ফরাসী ও ইংরাজ পর্য্যটক এশিয়ায় বেড়াইতে আসিতেন তাঁহারা এশিয়ার কিরূপ চিত্র আঁকিয়াছেন? তখন তাঁহারা এশিয়াবাসীকে অর্দ্ধসভ্য, অর্দ্ধমানব, অসভ্য, বর্ব্বর বা "এ্যারেষ্টেড্ ডেভেলপ্‌মেণ্টের" (বাধাপ্রাপ্ত বিকাশের) দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবেচনা করিতেন কি? কখনই না। তখন তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধকে ভয়, সম্মান ও পূজা করিয়া চলিতেন,—অন্ততঃ সমানে সমানে কথাবার্ত্তা চলিত। তখনও এশিয়ায়, ইয়োরোপের এক্সপ্যান্‌শন্ বা বিস্তার যথার্থভাবে সাধিত হয় নাই। তখনও প্রাচ্য তাহার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। কাজেই ইয়োরোপীয় শ্বেতাঙ্গেরা জুতা টুপি না খুলিয়া এবং "কুর্নিশ" না করিয়া এশিয়াবাসীর সঙ্গে কথা বলিতে পারিত না। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।" মাত্র ১০০ বৎসরে এই পরিবর্ত্তন!

রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক আধিপত্যের প্রভাবে চিন্তার ধারা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানও বিকৃত হইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা অধিকাংশই পাশ্চাত্য। ফলতঃ এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য আধিপত্যের আবহাওয়ায় বাস করিয়া সমাজ-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য আদর্শেরই মহত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন—অন্যান্য আদর্শের মহত্ত্ব স্বীকার ত দূরের কথা, তাহা বুঝিতেও বেশী চেষ্টা করেন নাই। এই যুগে ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ এশিয়ায় ও আফ্রিকায় যে সমুদয় নূতন তথ্য দেখিয়াছেন

সেইগুলি নিজেদের পরিচিত মাপ-কাঠিতে বিচার করিয়াছেন মাত্র। কাজেই বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন হৃদয়কথা বুঝিতে পারেন নাই। অথবা নিজেদের উৎকর্ষ প্রচারের জন্যই এই গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য কুসংস্কার নিবারণের উপায়

এদিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইয়োরোপীয়দের ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ স্থাপিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ নূতন নূতন জাতির সঙ্গে আদান-প্রদান এবং ভাববিনিময় ও কর্ম্মবিনিময় চলিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন নরনারীপুঞ্জের জন্য তাহাদের মনোমত পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার প্রয়াস আরব্ধ হইল। দুনিয়ার অলিগলিতে ইয়োরোপের বাজার সৃষ্ট হইতে থাকিল। ফলতঃ, নব নব মানব-চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া ইয়োরোপীয়েরা মানবাত্মার বিরাট রূপ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিল। তাহার ফলে চিন্তারাজ্যে "তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালী" বা কম্পারেটিভ মেথডের সূত্রপাত হইল। ইতিমধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারুইন ও হার্বার্ট স্পেন্সার আবির্ভূত হইয়া জড়জগৎ ও জীবজগতের বৈচিত্র্যময় তথ্যসমূহের মধ্যে "নিয়ম", ঐক্য, শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিলেন। তাহার প্রভাবেও বিশ্বের বৈচিত্র্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা-সমূহের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু বৈচিত্র্যের মর্য্যাদা রক্ষা অথবা সম্মান করিবার কথা ইয়োরোপে শীঘ্র উঠে নাই। তথা-কথিত অবনত জাতিপুঞ্জ হইতে ধাক্কা খাইবার পূর্ব্বে ইহারা নিজেদের মাপকাঠি বদলাইতে শিখে নাই—অথবা নূতন নূতন মাপকাঠির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিতরেই এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইয়োরোপীয়েরা জগতের নানা স্থানে কথঞ্চিৎ ধাক্কা খাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণাঙ্গ, লোহিতাঙ্গ, বর্ব্বর, নিগ্রো, অর্দ্ধ সভ্য ও অসভ্য ইত্যাদি সমাজের ভাগবাটোয়ারা লইয়া ইয়োরোপীয় শ্বেতাঙ্গ-মহলে নানা বিসম্বাদ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার

ফলে এই সকল অবনত জাতি অনেকটা মাথা তুলিতে পারিয়াছে। পরে ১৯০৫ সালে জাপান যেদিন প্রবল রুশকে পদানত করিল সেইদিন ইয়োরোপের চেতনা আসিল। পাশ্চাত্য বুঝিতে শিখিল—"প্রাচ্য জগতেও সভ্য জাতি আছে।" তখন হইতে তুলনাত্মক প্রণালীর অবলম্বন পণ্ডিতমহলে বেশী হইতেছে। অপরিচিত বস্তুও যে সম্মানার্হ এই ধারণা সুধী-জগতে প্রচারিত হইতেছে। "সমাজবিজ্ঞানের" গতি নূতন দিকে চলিয়াছে। নৃতত্ত্বের আলোচনায় একটা রিফর্মেশন বা সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

মধ্যযুগে ইয়োরোপের লোকেরা ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে রোমীয় পোপের অধীনতায় জীবন যাপন করিত। পোপ খৃষ্টানমাত্রের গুরু পুরোহিত ও দেবতাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বিচার অগ্রাহ্য বা বর্জ্জন করিবার অধিকার কোন ব্যক্তিরই ছিল না। পোপের বিবেচনা যে কখনও ভ্রমাত্মক হইতে পারে, পোপ যে রক্তমাংসবিশিষ্ট সাধারণ মানুষের ন্যায় কোন স্থানে ভুল বা অন্যায় আচরণ করিতে পারে, এরূপ সন্দেহ করিলে পর্য্যন্ত লোকেরা নির্য্যাতিত হইত। বিনাবাক্যে অবনত মস্তকে পোপের আজ্ঞা পালন করা খৃষ্টানমাত্রের ধর্ম্ম বিবেচিত হইত। লোকেরা পোপের এই ক্ষমতা ও অধিকারকে "ইন্‌ফলিবিলিটি" বা চরম পরিপূর্ণতা বলিয়া জানিত। এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে ক্রমে মানবচিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। অবশেষে ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তি এবং স্বাধীন ধর্ম্মজ্ঞান ইয়োরোপীয় মানবকে পোপের অত্যাচার হইতে মুক্তিদানকরে। এই মুক্তির নাম পাশ্চাত্য ইতিহাসে "রিফর্ম্মেশন" বা ধর্ম্মসংস্কার।

এশিয়া এবং ইয়োরোপের (অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের) পরস্পর সম্বন্ধও উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপই ছিল। প্রাচ্য ভক্ষ্য এবং প্রতীচ্য ভক্ষক—এশিয়া ইয়োরোপের বাজার, এশিয়া ইউরোপীয়দিগের

উপনিবেশক্ষেত্র—এই ধারণা পাশ্চাত্য জনসমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দী জগতের ইতিহাসে "এক্‌সপ্যান্‌শন্‌ অব্‌ ইয়োরোপ" বা ইয়োরোপ-বিস্তারের যুগ—এশিয়ায় এবং সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ-সমাজের উপর ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদিগের প্রভাব বিস্তারের যুগ। এই যুগে ইয়োরোপের ক্ষমতা ও অধিকার এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-বল সবই পরিপূর্ণতার চরমসীমায় অবস্থিত বলিয়া মানবসংসারে প্রচারিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের পোপের ন্যায় উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপ সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে "অভ্রান্ত" বিবেচিত হইত। ইয়োরোপীয়দিগের সমাজ, সভ্যতা, আদর্শ, চিত্রকলা, সাহিত্য, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, ইত্যাদিই জগতের এই সকল বস্তুর মধ্যে সেরা—ইয়োরোপের মাপকাঠিই জগতের চিন্তারাজ্যে একমাত্র মাপ-কাঠি—এই ধারণা কেহই ছাড়াইয়া উঠিতে পারিত না। ক্রমশঃ মানবাত্মার বৈচিত্র্য, মানবচিন্তার স্বাধীনতা, মাপ-কাঠির বিভিন্নতা ইত্যাদি এই ইয়োরোপীয় অভ্রান্ততার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জাপানের রাষ্ট্রীয় জয়লাভে ইয়োরোপের সিংহাসন টলিয়াছে। এক্ষনে ইয়োরোপীয়েরাই জগতের চিন্তামণ্ডলে একমাত্র পোপ বা বিচারক বা হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা স্থানে পূজিত হয় না। "Interest in the East" বা প্রাচ্য জগৎকে বুঝিবার ইচ্ছা নূতন ভাবে আরব্ধ হইয়াছে। মধ্যযুগের ধর্ম্মসংস্কার ইয়োরোপীয় মানবের চিন্তাশক্তিকে মুক্তি দান করিয়াছিল। বিংশশতাব্দীর এই বিপ্লব বা সংস্কার সমগ্র মানব-মণ্ডলকে স্বাধীন করিতে চলিয়াছে। ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার আওতা ছাড়াইয়া দুনিয়ার মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান আলোচনা করিতেছে। ইয়োরোপের পণ্ডিত-মহলেও পুরাতন বুলি আওড়ান বন্ধ হইতেছে।

আজকাল নৃতত্ত্বের (এ্যান্থ্রপলজি) আলোচনা ইয়োরোপে অনেক

হয়। এই আলোচনাগুলির সুর নূতন ধরণের। সেদিন লণ্ডনে "বিশ্বমানব পরিষদে"র আহ্বান হইল। ইহা এই "রিফর্মেশনে"র প্রধান লক্ষণ ও ফল। সকল দেশের রাষ্ট্র-নীতিজ্ঞেরাই বুঝিয়াছেন যে, ধরাকে সরা জ্ঞান করিলে আর চলিবে না—তথাকথিত অবনত জাতিপুঞ্জ জাগিয়াছে—তাহাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, সম্মান করাও কর্ত্তব্য। আজকালকার আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র-মণ্ডলে এই নূতন লক্ষণ বেশ দেখা যায়। অধিকন্তু যাঁহারা বৈজ্ঞানিক মাত্র তাঁহারাও ক্রমশঃ নূতন ধরণের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেছেন। জার্ম্মানির লুশান, ইংলণ্ডের হ্যাডন, আমেরিকান জর্ম্মান পণ্ডিত বোয়াজ নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতেছেন তাহা নবযুগের কথা। বোয়াজ-প্রণীত Mind of Primitive Man (আদিম মানবের চিত্ত) এই হিসাবে নৃতত্ত্বে একটা বিপ্লবের প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

নৃতত্ত্বে নূতন সুর

অধ্যাপক বোয়াজ

অধ্যাপক বোয়াজ জগৎপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ। এক্ষণে ইহাঁর বয়স প্রায় আশী বৎসর। ইনি সর্ব্বসমেত কয়শত প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইনি পি-এইচ ডি উপাধি লাভের পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিলে জগতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় মিলিত হইয়া ইহাঁকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। সেই উপলক্ষে ইহাঁর রচনাবলীর একটা নির্ঘণ্ট-পত্র প্রস্তুত হয় নাম Bibliography of Frank Boas। সেই সঙ্গে কতিপয় প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ নৃতত্ত্বসম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ রচনা করিয়া বোয়াজ-সম্বর্দ্ধনা-উৎসবে যোগদান করেন।

নৃতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ

নৃতত্ত্ব নামটা আমাদের দেশে ও সাহিত্যে বোধ হয় সুপরিচিত নয়। ভারতবর্ষের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিদ্যা-সংক্রান্ত কোন গ্রন্থ পাঠ্যতালিকায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে আমাদের সুধীগণ এই বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। মানবের শারীরিক গঠন, বসতিস্থাপন, শিল্পকর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞান, রীতিনীতি, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সংস্কার, অভ্যাস ইত্যাদি এই বিদ্যার অন্তর্গত আলোচ্য বিষয়। বিশেষতঃ প্রাচীন কালের মানবসম্বন্ধে এই বিষয়ক জ্ঞান এ্যান্থ্রপলজি বিজ্ঞানের অঙ্গস্বরূপ বিবেচিত হয়। অধিকন্তু বর্ত্তমান কালে যে সমুদয় জাতি অবনত, অনুন্নত, সুতরাং বর্ত্তমান সভ্যতার মাপকাঠি অনুসারে অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য, তাহাদের জীবন-যাপন-প্রণালী আলোচনা করাও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের উদ্দেশ্য। মোটের উপর, মানুষ সম্বন্ধে অতীত ও বর্ত্তমান, যে কোন তথ্যই "এ্যান্থ্রপলজি" (মানববিজ্ঞান) বা নৃতত্ত্বের অধীন।

১৪৬ পৃষ্ঠা

৯। অধ্যাপক বোয়াজ

বলা বাহুল্য, এই হিসাবে ভারতবর্ষে একাধিক নৃতত্ত্ববিৎ আছেন। রাঁচির শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মুণ্ডা এবং ওরাঁও জাতিদ্বয়ের নানাবিধ তথ্য সঙ্কলন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সেইরূপ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ চাকমাজাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের 'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থও নৃতত্ত্ববিষয়ক সাহিত্যের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার সাময়িক পত্রে লোকসাহিত্য, প্রবাদ, প্রবচন, সংস্কার, ধর্ম্মকর্ম্ম, জাতিতত্ত্ব, বংশতত্ত্ব, কুলুজীগ্রন্থ, পূজাপাঠ ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। বাঙ্গালার বাহিরেও ভারতবাসীরা এইরূপ নৃতত্ত্ব-বিষয়ক বহুবিধ তথ্য সঙ্কলন করিতেছেন।

বিদেশীয় পণ্ডিতদের লিখিত কয়েকখানা ইংরাজী গ্রন্থের তালিকা দিতেছি। পুস্তকের নাম হইতেই নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়-সমূহ কথঞ্চিৎ স্পষ্টতর হইবে :—

1. History of Human Marriage.
2. The Magic Art and the Evolution of Kings.
3. Taboo and the Perils of the Soul.
4. Totemism and Exogamy.
5. The Kacharis.
6. The Naga Tribes of Manipur.
7. The Todas.
8. The Religious and Political System of the Toraba.
9. Life, Legends and Religion of the Blackfeet Indians.

এই তালিকার অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের আলোচনা-প্রণালী অনুসারে আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণা সাধারণতঃ চলিয়া থাকে। কিন্তু নৃতত্ত্বের একটা বড় বিভাগে আমরা এখনও হাত দিই নাই। অস্থি-বিদ্যা (এ্যানাটমি) এবং প্রাণ-বিজ্ঞান (বায়লজি) এই দুই বিদ্যার সাহায্যে মানবের শরীর এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া "জাতি", "বংশ", "শ্রেণী", "সম্প্রদায়" ইত্যাদি স্থির করা এই বিভাগের কার্য্য। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ বা লোহিতাঙ্গ, অথবা "ককেশিয়ান", "মাঙ্গোলিয়ান", "আর্য্য" অথবা "অনার্য্য" ইত্যাদি জাতি-ভেদ এই বিভাগের আলোচনায় সিদ্ধ হয়। অধ্যাপক বোয়াজ এই বিভাগেই বিশেষ সিদ্ধহস্ত। ইনি মাথা মাপিয়া জাতি নির্ণয় করিয়া থাকেন। জল বায়ু খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনের প্রভাবে নরনারীর শারীরিক গঠন কিরূপ হয়, বিশেষতঃ মস্তকের আকৃতি কোন্ আকার ধারণ করে, তাহার আলোচনা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।

এ্যান্থ্রপলজির এই বিভাগের আলোচ্য বিষয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে;—

1. A Racial Peculiarity in the Brain of the Negro.

2. Several Anatomical Characters of the Human Brain said to vary according to race and sex.

3. The Skull of the Australian Aboriginal.

4. The relationship of Intelligence to size and shape of head and to other physical and mental characters.

5. Head growth in students at Cambridge.

6. Physical characters and Morbid proclivities.

7. Changes in the bodily form of Descendants of Immigrants.

8. The Cephalic Index.

9. Heredity of Eye-colour in man.

10. Heredity of Hair-form in man.

11, Relation of Race-crossing to Sex-ratio.

12. Geographical Distribution of the chief modification of mankind.

এই রচনা-সমূহ সবই প্রাণ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। ভারতবর্ষে এখনও এই বিদ্যার আলোচনা অল্প মাত্র। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মাঝে মাঝে আমাদের মাথা মাপিয়া জাতি স্থির করিবার সঙ্কেত দিয়া থাকেন। অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বমানব-পরিষদের সভায় সভাপতির আসন হইতে "Definition of Race, Tribe and Nation" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ এই তালিকার অন্তর্গত করা যাইতে পারে। এই তালিকা পারিভাষিক শব্দ অনুসারে Anthropometry বিষয়ক।

প্রাচীন ও আদিম এবং "অসভ্য" সমাজের বিবরণও নৃতত্ত্বের অন্তর্গত। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এইরূপে বুঝা যায়। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রেরা এই জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখিয়া থাকে :—

1. Primitive Man and his physical environment.

2. Technology and Primitive Art: (i) A study of industries—pottery, weaving, basketry, wood-carvings, work in skins, etc; division of labour; industry and sex; industry and physical environment: (ii) A study

of designs, realistic and geometrical conventionalisation ; symbolism ; relation of art to industries ; theories of evolution of art.

3. Types of Primitive Religion and Mythology ; A study of animism, magic, taboo, totemism, ancestor-worship, animal and plant worship ; myths, religion and social organisation, theories of religion and evolution.

4. Types of Primitive Social Organisation.

5. Primitive Institution—Paganism and Christianity.

6. Social Evolution : Civilisation, Ethnic and Civil origins.

7. Social Evolution : Civilisation, Liberty and Democracy.

8. Historical Type of Society, Ancient : The Theory of Progress.

এই সকল বিষয় নিম্নলিখিত রচনায় আলোচিত হইয়াছে :—

Primitive Culture—Researches into the Early History of Mankind—Taylor.

2. The principles of Sociology—Spencer.

3. Basketry Designs of the Indians of Northern California.

4. Introduction of Maize into Eastern Asia.

5. Introduction of Tobacco into Eastern Asia.

6. The Origins of Invention—Mason.

7. The Beginning of Zoo-culture.

8. Polynesian Ornament a Mythology.

9. The Origin and Sacred character of certain Ornaments of the S. E. Pacific.

10. The Decorative Art of British New Guinea.

11. Conventionalism in Ancient American Art.

12. The Meaning of Ornamental, or its Archæology and Psychology.

13. The Origin and Development of Moral Ideas—Westermarck.

এই ধরণের রচনা ভারতবর্ষে অপ্রচলিত নয়। প্রকৃত পক্ষে Anthropometry বিভাগীয় নৃতত্ত্ব আমাদের দেশে নাই।

অধ্যাপক বোয়াজ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ইঁহার "সেমিনার" বিভাগে ছাত্র হইবার অনুমতি পাইলাম। কোন দিন প্রাচীন আমেরিকার লোহিতাঙ্গ নরনারীদিগের ভাষা এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। কোন দিন রুশিয়ার বর্ত্তমান সমাজের চিত্র প্রদত্ত হইল। কোন দিন মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকার জনগণ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা করিলেন। একদিন জার্ম্মানির প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক লুশান (Von Luschan) তাঁহার নূতন অনুসন্ধানের ফল বিবৃত করিলেন।

অধ্যাপক লুশান

লুশান সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছেন। এবার গ্রীষ্মাবকাশে ইয়োরোপের নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অষ্ট্রেলিয়ায় এক কংগ্রেস করিয়াছিলেন। সেই সভায় কেম্ব্রিজের অধ্যাপক

হ্যাডন এবং অক্স্‌ফোর্ডের ম্যারেটও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

লুশানের পত্নীও সঙ্গে আছেন। ইনিও নৃতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন। শুনিলাম, ১৫০০০ মৃত নরনারীর মাথা ইঁহারা দুইজনে সংগ্রহ করিয়াছেন। তুরস্ক এবং পাশ্চাত্য এসিয়ার নরসমাজেই ইঁহারা বেশী সময় কাটাইয়াছেন। আমাদের অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথের ইঁহারা সুখ্যাতি করিলেন।

সস্ত্রীক লুশান এক্ষণে আমেরিকার নিগ্রো-মহলে নৃতত্ত্ব বিষয়ক অনুসন্ধানে লিপ্ত রহিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নানাপ্রদেশে যাইয়া খাঁটি নিগ্রো নরনারীর সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। ইনি বলেন—"নিগ্রো-সমাজ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য কিছুমাত্র সংগৃহীত হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে তাহা বৈজ্ঞানিকের পাতে দেওয়া যায় না। সবই ভাসা-ভাসা, খানিকটা অলীক এবং কল্পনামূলক—অধিকাংশই উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার জন্য ব্যবহৃত হইবার যোগ্য—বিজ্ঞানসেবীর গ্রহণীয় নয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি উপায়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের সূত্রপাত করিবেন?" ইনি বলিলেন—"আমি ও আমার স্ত্রী অন্ততঃ ১০০ নিগ্রো পরিবারের জন্মবৃত্তান্ত এবং বংশবৃত্তান্ত ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া যাইব। এইটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট। বেশী কার্য্য করিতে চাহি না।" কেম্ব্রিজের হ্যাডনও এইরূপ "ইনটেনসিভ ষ্টাডি" বা সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে গভীর অনুসন্ধানের পক্ষপাতী। আজকাল দেখিতেছি, পণ্ডিতেরা মানব বিষয়ক সকল বিজ্ঞানেই এইরূপে ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র করিয়া তাহার ভিতরকার সকল কথা বিশ্লেষণ করা পছন্দ করেন। এতদিন বিস্তৃত ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা এবং অগভীর আলোচনা চলিত। ফ্রেজার প্রণীত The Golden Bough গ্রন্থ নৃতত্ত্ব বিষয়ক

বিশ্ব-কোষ-স্বরূপ। কিন্তু হ্যাডন বলিয়াছিলেন—"এই গ্রন্থ আমাদের নূতন আলোচনা-প্রণালী অনুসারে টিকিবে না।" লুশান তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী। তথ্যসমূহ যথাযথ সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে তুলনা-মূলক আলোচনা-প্রণালীর অবলম্বন এবং বিজ্ঞান রচনার প্রলোভন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। পুরাতন আলোচনা-প্রণালীর অসম্পূর্ণতা এক্ষণে ধরা পড়িতেছে। কাজেই আলোচনা-প্রণালীর সংস্কার সুরু হইয়াছে।

প্রথমেই একটা সুবিস্তৃতক্ষেত্র সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিলে অতি সহজে ভুল হইবার সম্ভাবনা। অনুসন্ধানকারী সহিষ্ণুতার সহিত গভীরভাবে কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে সময় পান না। তাঁহার জানা এবং বুঝা সত্যগুলি তাঁহাকে কুসংস্কারপূর্ণ করিয়া রাখে। দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে যে সমুদয় নূতন বস্তু তিনি দেখিতেছেন সেগুলি নিজের পরিচিত বস্তুসমূহের সঙ্গে তুলনা করিতে শীঘ্রই তিনি প্রবৃত্ত হন। যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না তাহাও অনেক সময়ে কল্পনা দ্বারা তিনি সৃষ্টি করিয়া লইতে প্রলুব্ধ হন। মোটের উপর একটা স্বকপোলকল্পিত "সাধারণ-নিয়ম"-বিশিষ্ট "বিজ্ঞান" খাড়া হইয়া উঠে। এইরূপ ভাসা-ভাসা অগভীর আলোচনার ফলেই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য মানবসমাজকে জগতের আদর্শ সমাজ বিবেচনা করিয়াছেন। এই সমাজ-কেই মাপ-কাঠি জানিয়া জগতের অন্যান্য প্রাচীন ও নবীন সকল সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে প্রচুর তথ্য সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা না করিয়া পণ্ডিতেরা নানা বিজ্ঞান গড়িয়া বসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সকল বিদ্যা পক্ষপাত-দোষশূন্য "বিজ্ঞান" নামে প্রচারিত হইতেছে—কিন্তু কোন পণ্ডিতই নিজের স্বজাতীয় গৌরবপ্রচার বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ফলতঃ নানা দিক হইতে ইয়োরোপের একশত-বর্ষ-ব্যাপী সমাজ-জীবন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে।

একে ইয়োরোপীয় বিস্তার এবং আধিপত্যের যুগ—তাহার প্রভাবে কোন পণ্ডিতই মাথা ঠিক রাখিয়া অন্য জাতীয় মানবজীবন সম্যক্ বুঝিতে অসমর্থ। অধিকন্তু, বিস্তৃত ক্ষেত্রে আলোচনা। তাহার ফলে অল্পমাত্র তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া মত প্রচার এবং জাতীয় চরিত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ বিষয়ক যে সকল গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই বর্জ্জনীয়। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা এক্ষণে তাঁহাদের ভুলগুলি সংশোধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় "ইণ্টেনসিভ" প্রণালীর অবলম্বন এবং নূতন তথ্য সংগ্রহের প্রয়াস এই সংশোধন ও সংস্কারের লক্ষণ ও ফল।

নৃতত্ত্ববিদের নূতন সিদ্ধান্ত

অধ্যাপক বোয়াজ আজীবন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবন পূর্ব্বোক্ত "ইণ্টেনসিভ ষ্টাডির" জলন্ত দৃষ্টান্ত। ২।৩ বৎসর হইল তিনি বষ্টন নগরের "লোয়েল ইনষ্টিটিউটে" বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। সেই সমুদয় বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের নাম The Mind of Primitive Man। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সমাজ-বিজ্ঞানে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে বলিতে পারি। সভ্যতা এবং অসভ্যতা, উচ্চ জাতি এবং নিম্ন জাতি ইত্যাদি বিষয়ক মামুলি সকল মতই ইহার প্রভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে।

উপসংহার হইতে সামান্য মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"First of all we tried to understand the reasons for our belief in the existence of gifted races and of others less favourably endowed, and found that it was based essentially on the assumption that higher achievement

is necessarily associated with higher mental faculty, and that therefore the features of those races that in our judgment have accomplished most are characteristics of mental superiority. We subjected these assumptions to a critical study, and discovered little evidence to support them. So many other causes were found to influence the progress of civilisation, accelerating or retarding it, and similar processes were active in so many different races, that on the whole, hereditary traits, more particularly hereditary higher gifts, were at best a possible, but not a necessary element determining the degree of advancement of a race.

The second part of the fundamental assumption seemed even less likely. Hardly any evidence could be adduced to show that the anatomical characteristics of the races possessing the highest civilisation were phylogenetically more advanced than those on lower grades of culture. The various races differ in this respect; the specifically human characteristics being most highly developed, some in one race, some in another. Furthermore, it appeared that a direct relation between physical habitus and mental endowment does not exist."

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে বিশ্বাস আছে যে, যে জাতির মনন-শক্তি

বেশী সেই বেশী রকমের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে, এবং তাহা-দেরই মুখসৌষ্ঠব সুন্দর হইয়া মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়া থাকে, তাহার সত্যতা বিচার করিয়া দেখা গেল যে, তাহার সপক্ষে প্রমাণের অভাব। সভ্যতার উন্নতি বা অবনতি এত রকম বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে যে, মোটের উপর বলিতে হয় বংশগত প্রকৃতি—বিশেষ করিয়া সদ্‌গুণ—হয়ত জাতির উন্নতির সম্ভবপর কারণ বলা যাইতে পারে—কিন্তু তাহাই এক মাত্র বা প্রয়োজনীয় কারণ নহে। কোনও জাতির শরীর-সংস্থান ও অস্থি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, জাতির প্রাচীনতাই উন্নত সভ্যতা লাভের কারণ নয়। অধিকন্তু বাহ্য অবস্থানের সহিত মানসিক পরিণতির কোন সম্পর্ক নাই; মানবীয় ধর্ম্ম কোনটা কোন জতিতে স্ফূর্ত্তি পায়, কোন জাতিতে সুপ্ত থাকে।

সুতরাং কোন বিশেষ গুণ বা সভ্যতার কোন বিশেষ অবস্থা কোন জাতির নিজস্ব বা বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে না। যাহার আছে তাহার গর্ব্ব করা সাজে না, কারণ একদিন তাহাকে তাহা হারাইতে হইবে; এবং যাহার নাই তাহার হতাশ হওয়া উচিত নয়, কারণ কোন গুণ বা সভ্যতার কোন বিশেষ অবস্থা কোন জাতিতে চিরকালই থাকিতে দেখা যায় না এবং অপরে যাহা অর্জ্জন করিয়াছে সেও তাহা ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেই অর্জ্জন করিতে পারিবে।

ভারতে নৃতত্ত্ব

বোয়াজকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভারতবর্ষে এ্যানথ্রপমেট্রি বিদ্যার প্রবর্ত্তন কি উপায়ে হইতে পারে?" ইনি বলিলেন—ভারতবর্ষে প্রাণ-বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা-প্রদান নিশ্চয়ই হয়। এই দুই বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি-গণকে ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা মিউজিয়ামে (সংগ্রহালয়ে) পাঠান আবশ্যক। ইহাঁদিগকে এই সকল কেন্দ্রে কার্য্য করিবার চেষ্টা

করিতে হইবে। পরে অথবা আনুষঙ্গিক ভাবে কোন প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগে ইহাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে এই বিদ্যা নূতন প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এইরূপ কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। অবশ্য সাধারণভাবে নৃতত্ত্ব শিখিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় এ্যান্থ্রপলজি বিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে একজন পথপ্রবর্ত্তক বা অগ্রণী হইবার যোগ্যতা জন্মিবে না।

আমেরিকায় স্পেন ও পর্ত্তুগাল

স্পেনের কথা ভারতবাসীর শুনা নাই—কিন্তু পর্ত্তুগাল সম্বন্ধে আমাদের কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকিবার কথা। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। পর্ত্তুগীজেরাই এই প্রাচ্যপ্রতীচ্য সম্মিলনের প্রবর্ত্তক। আজকালকার ব্রিটিশ ভারতের ন্যায় কিছুদিন একটা পর্ত্তুগীজ ভারতও ছিল। সেই পর্ত্তুগীজ প্রভাব মহারাষ্ট্রদেশে এবং বাঙ্গালায় এখনও দেখা যায়। মুসলমানী আমলে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্ত্তুগীজ বণিকগণের কথঞ্চিৎ হাত ছিল। আমাদের কবিরাজী শাস্ত্রে একটা নূতন রোগের উল্লেখ এই সময়ে দেখিতে পাই। তাহার নাম "ফিরিঙ্গি" রোগ। পর্ত্তুগীজদিগকে ফিরিঙ্গি বলা হইত। আজকাল ফিরিঙ্গি বলিলে আমরা যে কোন ইয়োরোপবাসীকে বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এই শব্দ যখন প্রথম সৃষ্ট হয় তখন একমাত্র পর্ত্তুগীজদিগকেই নির্দ্দিষ্ট করা হইত। আমাদের ধর্ম্মজীবনেও পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানেরা কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। সেই সময়কার পর্ত্তুগীজ সাহিত্য সমালোচনা করিলে হিন্দুগণকে খৃষ্টান করিবার জন্য অত্যাচার ও নিপীড়ন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এখন পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ শাসনের অধীন ভারত সেই ধর্ম্মপ্রচারের সাক্ষী। সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় নরনারীগণের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান বেশ চলিত। তাহার ফলে রক্তসংমিশ্রণ এবং জাতিসঙ্কর ঘটিয়াছিল। তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি পর্ত্তুগীজ শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। কিছুদিন

ভারতে পর্ত্তুগীজ

হইল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার The Feringis of Chatgaon নামক পুস্তিকায় প্রাচ্যভারতে পর্ত্তুগীজ প্রভাব আলোচনা করিয়াছেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পর্ত্তুগাল এবং পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ভারতবাসী মাত্রের জানা আবশ্যক। এইজন্য পর্ত্তুগীজ ভাষা এবং সাহিত্য পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে আমরা আমাদের বর্ত্তমান ভারতের—অর্থাৎ প্রাচ্যপ্রতীচ্য-সমন্বয়-বিশিষ্ট ভারত-সমাজের—গোড়ার কথা ধরিতে পারিব না। তাহা হইলে আমরা ইয়োরোপীয় সভ্যতাকেও এক নূতন চোখে দেখিতে শিখিব।

পর্ত্তুগীজেরা যখন ভারতে পদার্পণ করিয়া নূতন পথে প্রাচ্য জগৎ এবং প্রতীচ্য জগতে সংযোগ বিধান করিল সেই সময়ে ইয়োরোপ ভরিয়াই জগতের চারিদিকে উপনিবেশ-স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস চলিতেছিল। তাহার ফলে একটা নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হইল—তাহার নাম আমেরিকা। এই আবিষ্কারে অগ্রণী ছিল স্পেন ও পর্ত্তুগাল। তাহার পর ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরাজ ইয়োরোপের বিস্তারসাধনে এবং দুনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনে কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। প্রকৃতপক্ষে সেটা প্রধানতঃ স্পেনের গৌরব যুগ। আজ ইংরাজ যতবড় রাজ্যের অধীশ্বর, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেন তদপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিল। বিশ্বসাম্রাজ্য এবং বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রবর্ত্তনে স্পেনই অগ্রণী। স্পেনই জগতে এমন এক বিশাল রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিল যাহার উপর সূর্য্য কখনও অস্ত যাইত না। অর্থাৎ পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধ উভয় খণ্ডেই স্পেনের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল—পর্ত্তুগালও এই যশ ভোগ করিত।

স্পেনের সেই সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য আজ বিলুপ্ত হইয়াছে—

পর্ত্তু-গালের সেই গৌরবও আজ অস্তমিত। ইয়োরোপের রাষ্ট্রমণ্ডলেই কেহ স্পেন ও পর্ত্তুগালের নাম করে না—ইয়োরোপের বাহিরে ইহাঁদের মর্য্যাদা থাকিবে কোথা হইতে? চিরদিন কখনও কাহার সমান যায় না। বিশ্বসাম্রাজ্য ও বিশ্ব-বাণিজ্য জগতের ইতিহাসে চিরকাল কোন নরসমাজের একচেটিয়া নাই। রাষ্ট্রমণ্ডলের ভারকেন্দ্র নিরন্তর স্থানান্তরিত হইতেছে।

ল্যাটিন আমেরিকার স্বরাজপুঞ্জ

ঊনবিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে নিপোলিয়ানী কুরুক্ষেত্রের সুযোগে আমেরিকা ভূখণ্ডের স্পেনিষ ও পর্ত্তুগীজ উপনিবেশগুলি একে একে স্বাধীন হইতে থাকে। স্বাধীনতালাভের পর ক্রমশঃ এই সমুদয় রাষ্ট্রে স্বরাজ ডিমক্রেসী বা রিপাব্লিক নামক প্রজাতন্ত্র-শাসনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এইরূপ ২০টি স্বরাজ স্বাধীনভাবে বিরাজমান। তন্মধ্যে উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেন্টিন, ব্রেজিল এবং চিলি সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। শেষোক্ত তিনটি রাষ্ট্রকে ইংরাজী নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে A. B. C. States বলা হয়।

ভারতবর্ষে এই স্বরাজগুলির নাম পর্য্যন্ত শুনা আছে কি না সন্দেহ। আমাদের নদীয়াবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশ বিশ্বাস ব্রেজিল রাষ্ট্রের সেনাবিভাগে অতি উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ব্রেজিল সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানে না। ইতালীর স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক সেনাপতি গ্যারিবল্ডি তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের কিয়দংশ ব্রেজিলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভারতের শিক্ষিত লোকেরা অবশ্য এই তথ্যটুকু জানেন। তাহা ছাড়া সম্প্রতি মেক্সিকোতে বিপ্লব চলিতেছে। এই বিপ্লব লইয়া যুক্তরাষ্ট্রে এবং মেক্সিকোতে গণ্ডগোল বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। সংবাদপত্রের সাহায্যে এই সম্বন্ধে খানিকটা উড়ু খবর ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু

মোটের উপর আমরা উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার এই বিস্তৃত জনপদের অধিবাসী, রাষ্ট্রমণ্ডল এবং সাধারণ সভ্যতা সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। এমন কি, ইয়োরোপের লোকেরাও এই স্বরাজ-সমূহের প্রকৃত অবস্থা জানে না।

আমেরিকা বলিলে লোকেরা সাধারণতঃ উত্তর আমেরিকা মাত্র বুঝিয়া থাকে—বস্তুতঃ উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডা মাত্র বুঝিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, উনবিংশশতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র জগতের সকল প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং ক্যানাডা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হওয়ায় দুনিয়ার নজরে থাকিতে পারিয়াছে। এই দুই জনপদে ইংরাজী ভাষার প্রাধান্য—বিভিন্ন ভাষাভাষী নরনারী ইয়োরোপ হইতে আসিয়া এই দুই দেশের সমাজ সৃষ্টি করিতেছে সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভাষা এই দুই সমাজেই ইংরাজী—এবং ইংরাজের রক্তই সমাজের ভিতর প্রবল। এই জন্য আমেরিকার এই অংশকে য়্যাংগ্লো-স্যাক্সন (Anglo Saxon) আমেরিকা অথবা টিউটনিক (Teutonic) আমেরিকা বলা হয়। ইয়োরোপের জার্ম্মাণ, ওলন্দাজ, ইংরাজ ইত্যাদি জাতিসমূহ টিউটনিক গোত্রের অন্তর্গত। ইহাদের ভাষাসমূহ এক মূল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।

আমেরিকার এই দুই রাষ্ট্র ছাড়িয়া দিলে উত্তরে ও দক্ষিণে যে বিশাল জনপদ অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম ল্যাটিন (Latin) আমেরিকা অথবা রোমান্স (Romance) আমেরিকা। এই জনপদের আধুনিক স্বরাজ-সমূহ স্পেন ও পর্ত্তুগালের ভাষাভাষী নরনারীর রক্তে গঠিত হইয়াছে। এই সকল লোকের ভাষা প্রাচীন রোমের ল্যাটিন ভাষা হইতে নিঃসৃত। ফরাসী ভাষাও এই হিসাবে রোমান্স ও ল্যাটিন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ভূখণ্ডে ল্যাটীন জাতীয় সমাজের উপনিবেশ ছিল।

কাজেই তাহাদের ভাষা, সাহিত্য, কায়দা ও রীতি-নীতি সবই এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই জনপদের লোকেরা স্পেনিষ ও পর্ত্তুগীজ ভাষাই ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে—এবং স্পেন ও পর্ত্তুগালের সাহায্যেই ইয়োরোপের সঙ্গে আদান-প্রদান চালাইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এখানকার কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণ স্পেন, পর্ত্তুগাল ও ফ্রান্স হইতেই তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সমুদয় রাষ্ট্রের ভিতর একমাত্র ব্রেজিলে পর্ত্তুগালের সাম্রাজ্য ছিল। কাজেই ব্রেজিলের বর্ত্তমান দুইকোটি লোক পর্ত্তুগীজ ভাষায় কথা বলে—ইহারা পর্ত্তুগালকে বেশী চিনে। হাইটি (Haiti) স্বাজামরাষ্ট্র ফরাসীসম্ভূত। অপর ১৮টী রাষ্ট্র স্পেনের অধীন ছিল—এই সমুদয়ে স্পেনিষ ভাষাই জনগণের মাতৃভাষা। ইহাদের লোক সংখ্যা সাড়ে পাঁচ কোটি।

এই সাড়ে সাত কোটি লোক বিশটী রাষ্ট্রের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে মেক্সিকো ব্রেজিল এবং A. B. C. States বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। কাজেই য়্যাংলো স্যাক্সন আমেরিকা, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্র ইহাদের ভয়ে সর্ব্বদা আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত। তাহার উপর, জাপানের লোক জন ইতিমধ্যে ল্যাটিন রাষ্ট্রসমূহের ভিতর বসতি স্থাপন করিতেছে এবং ইয়োরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জ উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে হীনবল করিবার অভিপ্রায়ে ল্যাটিন রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, রাজস্ব ইত্যাদি বিভাগে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়া থাকে। মোটের উপর দেখা যাইতেছে, আগামী ত্রিশবৎসরের ভিতর ল্যাটিন আমেরিকাই জগতের একটা প্রবল ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত হইবে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই জনপদের ভবিষ্যৎ লইয়া জাপানে, যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইয়োরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জে ঘোরতর জটিলতা পুষ্ট হইবে। ইতিমধ্যেই

তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা গিয়াছে। এক্ষণেই বুঝিতে পারা যায় যে, ল্যাটিন-আমেরিকা-সমস্যাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা। প্যানামা খাল কাটা হইবার ফলে জাপান ও ইয়োরোপের প্রভাব আমেরিকা খণ্ডে আরও বাড়িয়া যাইবে। ফলতঃ ল্যাটিনসমস্যা ঘনাইয়া আসিবে।

কাজেই নিউইয়র্কে হান্টিংটন Hispanic Society বা "স্পেনতত্ত্ব প্রচারিণী সভা"র প্রতিষ্ঠা নিতান্তই স্বাভাবিক। স্পেন, পর্ত্তুগাল এবং ফ্রান্স অর্থাৎ ইয়োরোপের ল্যাটিন সমাজকে না বুঝিলে য়্যাংলোস্যাক্‌সন আমেরিকা ঘর সাম্‌লাইতে পারিবেন না।

এই সোসাইটির প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত হান্টিংটনের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হইয়াছে। ইনি স্পেন ও পর্ত্তুগালের ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার এক বার ভারতবর্ষে আসিবার সখ খুব বেশী। সম্ভবতঃ ভারতে পর্ত্তুগীজ প্রভাবের পরিচয় পাওয়াই ইঁহার উদ্দেশ্য। তাহা ছাড়া, দেশ দেখা ত আছেই। ইনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আমি যদি ইচ্ছা করি—তাহা হইলে মোটরকারে বসিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসিতে পারি কি? ভাল ভাল পাকা রাস্তা আছে ত?" বুঝিলাম—ইহার নাম 'আমেরিকান টুরিষ্ট।" ইঁহার পয়সার অভাব নাই। আমি বলিলাম—"স্পেন পর্ত্তুগাল ভ্রমন করিয়া স্পেনতত্ত্ব-প্রচারিণী সভা স্থাপন করিয়াছেন। আশা করি, আপনার ভারতভ্রমণের ফলে নিউইয়র্কে একটি ভারত-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভাও স্থাপিত হইবে।" ইনি উত্তর করিলেন—"ইচ্ছা আছে। দেখা যাউক কতদূর কি হয়। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদের দেশবাসী সাহায্য করিবেন কি?"

শ্রীযুক্ত হান্টিংটন

একদিন "হার্ভার্ড ক্লাবে" আর্জ্জেন্টিন সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। বক্তা

আমেরিকান ভূগোল-পরিষদের সভ্য। ইনি আর্জ্জেণ্টিনের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, জলবায়ু, রাস্তা ঘাট, ধাতু, খনি ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ল্যাণ্টার্ণ স্লাইডের চিত্র দেখাইয়া ইনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে আর্জ্জেণ্টিনের ক্রমিক উন্নতি বুঝাইয়া দিলেন।

ল্যাটিন আমেরিকা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ হইল।

অধ্যাপক শেপার্ড

ইনি বহুবার মেক্সিকো হইতে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ সীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। দুই এক বৎসর হইল ইনি ভারতবর্ষও দেখিয়া আসিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দী হইতে জগতে ইয়োরোপের বিস্তার সুরু হয়। বর্ত্তমান ভারত এবং বর্ত্তমান আমেরিকা খণ্ড সেই Expansion of Europeএর নিদর্শন। কাজেই ইয়োরোপের উপনিবেশগুলি বুঝিবার সময়ে বিগত ৩০০ বৎসরের ভারতেতিহাসও পণ্ডিতগণের জানা কর্ত্তব্য। এই বুঝিয়া ল্যাটিন আমেরিকায় বিশেষজ্ঞ মহাশয় ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। ইঁহার নাম শেপার্ড (Shepherd)। ইনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Colonial Historyর অধ্যাপক। ইনি বলিলেন—"মহাশয় আমি তাড়াহুড়া করিয়া গ্রন্থ-প্রকাশের পক্ষপাতী নহি। আমার বন্ধুগণ দুই তিন মাস মাত্র চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, পারস্য ইত্যাদি দেশে বাস করিয়া ৭০০। ১০০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী গ্রন্থ লিখিয়া বসেন। কিন্তু আমি এতদিনে দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে একখানাও গ্রন্থ লিখিতে পারিলাম না। এই সেদিন Home University Library গ্রন্থমালায় "Latin America" নাম দিয়া একটি পুস্তিকা লিখিয়াছি মাত্র।"

ইঁহার মতে ইয়োরোপের জাতিপুঞ্জ বিভিন্ন সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া নানা ভাবে নব নব ধারণা গ্রহণ করিয়াছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং

আমেরিকা ইয়োরোপের নিকট অনেক বিষয়ে নূতন জ্ঞানলাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইয়োরোপও এই সমুদয় জনপদের অধিবাসীদিগের নিকট কম ঋণী নয়। ইয়োরোপীয় সভ্যতার উপর এই সমুদয় সমাজের প্রভাব এখনও সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত হয় নাই। তাহা হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষ ইয়োরোপকে কোন্ কোন্ বস্তু দান করিয়াছে তাহার সংবাদ ইংরাজী সাহিত্যে পাওয়া যায় না। কোন কোন জার্ম্মাণ, ফরাসী ও রুশ পণ্ডিত এই বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু যথোচিত আলোচনা এখনও হয় নাই। ভারতবাসীরা যদি তাঁহাদের বিগত তিন শতাব্দীর ইতিহাস ইয়োরোপের সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে মিলাইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে এই কার্য্য সহজে সিদ্ধ হইতে পারে।

শেপার্ড বলিলেন—"ল্যাটিন আমেরিকা সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়ান এবং ইয়াঙ্কিদিগের ভুল ধারণা আছে। ইহারা মনে করে যে, এই বিস্তৃত ভূখণ্ড কেবলমাত্র টাকা রোজগারের জায়গা। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, কৃষি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি চালাইবার জন্য লোকেরা আসিয়া থাকে। পর্য্যটকগণ এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরাও এই চোখেই ল্যাটিন আমেরিকা দেখিতেছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ল্যাটিন আমেরিকা এইরূপ জনপদ নয়। উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করিলেও ল্যাটিন আমেরিকা আমাদের ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ য়্যাংগ্লোস্যাক্সন আমেরিকার নীচে পড়িবে না। সাহিত্যসেবা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, চিত্রকলা, শিক্ষা-বিস্তার, পরোপকার ইত্যাদি বিষয়ক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ল্যাটিন আমেরিকায় কম নয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এই ল্যাটিন রাষ্ট্রসমূহ নানাবিধ উৎকর্ষের অধিকারী হইয়াছে। এ সত্য বেশী দিন চাপা থাকিবে না।"

শেপার্ডের মতে ভারতীয় সমাজে এবং ল্যাটিন আমেরিকার সমাজে খানিকটা সাদৃশ্য আছে। ভারতবর্ষের ন্যায় এখানেও অসংখ্য স্ব স্ব প্রধান রাষ্ট্র বিদ্যমান। ইহাদের নরনারীরা পরস্পর ভাববিনিময় ও কর্ম্ম-বিনিময় বেশী করে না; কিন্তু সকলেই ল্যাটিন সভ্যতার অধিকারী বলিয়া গৌরববোধ করে এবং ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যপাশে বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করে। ইহাদের অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস যে, ইহাদের অভ্যন্তরে একটা সূক্ষ্ম একতাধারা প্রবাহিত। তাহার ফলে ইহারা য়্যাংগ্লোস্যাক্সন আমেরিকা হইতে কথঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন।

ল্যাটিন আমেরিকা ও ভারতবর্ষ

শেপার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভারতবর্ষেও এইরূপ নয় কি? আপনাদের তেলেগু বা তামিল ভাষাভাষী নরনারীরা লাহোর অথবা কলিকাতার সমাজ সম্বন্ধে কোন কথা জানে কি? বোধ হয় সামান্য মাত্র জ্ঞানও নাই। আধুনিক ইংরাজীনবীশ শিক্ষিতেরা কথঞ্চিৎ ভাববিনিময় করিয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাচীন হিন্দুত্বের প্রভাবে সমগ্র ভারতই ঐক্যবদ্ধ একথা অস্বীকার করিবার জো নাই। আপনার দেশের এক গ্রন্থকার The Fundamental Unity of India নামক পুস্তকে যে সত্য বিবৃত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। একজন আর একজনকে জানে না শুনে না—পরস্পরের স্বার্থ হয় ত প্রচুর পরিমানেই বিভিন্ন—তথাপি ইহারা প্রাণে প্রাণে ঐক্য ও সামঞ্জস্য বোধ করে। এরূপ মনোভাব ল্যাটিন আমেরিকায় দেখিয়াছি আর ভারতবর্ষে পাইয়াছি।"

আর এক বিষয়ে শেপার্ড ভারত ও ল্যাটিন আমেরিকার সাদৃশ্য দেখাইলেন। ইনি বলিলেন, "আমি একদিন দিল্লীতে Supreme Legislative Councilএর সভায় উপস্থিত ছিলাম। Press Actএর

সমালোচনা হইতেছিল। আপনাদের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। দেখিলাম, ভাষার ছটা, বক্তার ওজস্বিতা, আবেগ-ময়ী উদ্দীপনা। পুলকিত হইলাম, কিন্তু কাজের কথা একটাও পাইলাম না। বক্তা মানবজাতির অধিকার, স্বাধীনতার আবশ্যকতা ইত্যাদি সবই বুঝাইলেন, কিন্তু এক দুই তিন চারি করিয়া বর্ত্তমান ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনের অসম্পূর্ণতা দেখাইতে পারিলেন না। ল্যাটিন আমেরিকায়ও এইরূপ emotional, imaginative, কবিত্বময়, আবেগ-ময় রাষ্ট্রবীর অনেক।”

নিগ্রোনায়ক ডুবয়েস্

পঞ্চাশ বৎসর হইল যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোসমাজ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। এই পঞ্চাশ বৎসরে তাহাদের লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। এক্ষণে এককোটি নিগ্রো নরনারী যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজের লোকসংখ্যা নয় কোটি মাত্র।

স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রোসমাজ

স্বাধীন হইবার পর নিগ্রোরা সকল দিকে উন্নত হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসরে এরূপ উন্নতি আর কোন স্বাধীন জাতি দেখাইতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

নিউইয়র্কে নিগ্রো বেশী চোখে পড়ে না। শুনিতে পাই, নিগ্রোদের মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসা-ব্যবসায়ে, আইন-ব্যবসায়ে এবং অন্যান্য উচ্চ-শিক্ষা-সুলভ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। ধর্ম্মযাজকের কর্ম্ম অবশ্য বহুকাল হইতেই নিগ্রোরা করিয়া আসিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর নূতন নূতন উচ্চস্তরের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে।

তথাপি নিগ্রোদের অবস্থা এক্ষণে নিতান্তই শোচনীয়। গোলামীর আমলে ইহাদের যত কষ্ট ও বেদনা ছিল এক্ষণে বোধ হয় তাহা অপেক্ষা বেশী। পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিমহলে নিগ্রোজীবন সম্বন্ধে কতকগুলি উড়ু উড়ু কল্পনা-প্রসূত ধারণা ছিল মাত্র। Uncle Tom's Cabin বা "টম কাকার কুটির" পাঠ করিয়া প্রশস্তহৃদয় জনগণ দয়ার্দ্র হইত। ক্রমশঃ ভাবুকতার বন্যায় গোলাম্ জাতি স্বাধীন হইল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর নিগ্রোরা যুক্তরাষ্ট্রের সত্য সত্যই একটা "সমস্যা" হইয়া

১০। নিগ্রোনায়ক ডুবয়েস

দাঁড়াইয়াছে। শ্বেতাঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গে আজকাল যেরূপ বিদ্বেষভাব বিরাজ করিতেছে, গোলামীর যুগে এরূপ বোধ হয় ছিল না।

ল্যাটিন জাতীয় লোকেরা সাদা কাল চামড়ার ভেদ গ্রাহ্য করে না। ইহারা সামাজিক ভাবে যে কোন নরনারীর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে সঙ্কুচিত হয় না। তাহার ফলে পর্ত্তুগীজ ও স্পেনিস রক্ত সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রো রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। মেক্সিকো হইতে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ সীমা পর্য্যন্ত কোথাও রক্তসংমিশ্রণ এবং জাতিসঙ্করের অভাব নাই—বরং বর্ণভেদ এবং জাতিভেদ পাওয়াই কঠিন। সর্ব্বত্রই সাদায় লালে এবং কালায় মিশিয়া এক বিচিত্র সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু টিউটনিক এবং য়্যাংগ্লোস্যাক্সন জাতীয় লোকেরা বর্ণভেদ অত্যধিক স্বীকার করে। ইহারা, কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো অথবা লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ পাতাইতে কখনই প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে আদিম ইণ্ডিয়ান্ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে—এবং এককোটি কৃষ্ণাঙ্গ নরনারী আলগাভাবে শ্বেতাঙ্গ সমাজের পার্শ্বে জীবন যাপন করিতেছে। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ এক রাষ্ট্রে দুই স্বতন্ত্র জগতে বাস করে। ইহারা কখনই মিশিবে না।

কৃষ্ণাঙ্গ এক্ষণে কাগজে কলমে আর গোলাম নাই বটে—কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার অবস্থা গোলামী হইতে সুখকর নয়। নিউইয়র্কে নিগ্রো ইয়াঙ্কি উভয় জাতীয় বালক বালিকা একই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পায় দেখিয়াছি। অথচ আফিসে, ব্যাঙ্কে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, যৌথকারবারে কৃষ্ণাঙ্গ চোখে পড়ে না। নিউইয়র্কের কোন হোটেলে কৃষ্ণাঙ্গকে বসিতে না দিলে হোটেলস্বামী আইনে শাস্তি পান। অথচ কোন হোটেলে একটি নিগ্রোকেও দেখিতে পাই না। এমন কি, কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীও কোন হোটেলে প্রবেশ করিলে হোটেলের কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাহাকে

জিজ্ঞাসা করে—"মহাশয় আপনার বাড়ী কোথায়?" অনেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়াই আগন্তুককে বলিয়া ফেলে—"ভায়া সর্ব্ব পশ্চাদ্ভাগের চেয়ারে বসিবে কি?" হোটেলের খরিদদারেরা নিগ্রোদের সঙ্গে বসিয়া আহারাদি করিতে চাহে না অথচ আইনের প্রভাবে হোটেল হইতে নিগ্রোকে তাড়ান হইতে পারে না। কাজেই পশ্চাতে বসাইবার ব্যবস্থা। নিগ্রোরাও আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য সাধারণতঃ কোন শ্বেতাঙ্গ হোটেলে প্রবেশ করে না। এইজন্য শ্বেতাঙ্গ হোটেলে যদি কোন নূতন কৃষ্ণাঙ্গ সাহসপূর্ব্বক প্রবেশ করে এবং শ্বেতাঙ্গ পুরুষ রমণী-গণের মধ্যে বসিয়া পড়ে তাহা হইলে লোকেরা বিবেচনা করে—"এই ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ দেখিতেছি—কিন্তু নিগ্রো কখনই নয়। নিশ্চয় বিদেশীয় লোক—হয়ত কিউবাদ্বীপবাসী, হয়ত ভারতবাসী, হয়ত বা স্পেনিষ ইত্যাদি।"

হোটেলের খান্সামা ও বাবুরচি, ইলেকট্রিসিটিচালিত উত্তোলন যন্ত্রের পরিচালক এবং ঘর বাড়ীর পরিদর্শক অথবা পেয়াদা ও ভৃত্য—ইত্যাদির অধিকাংশই নিউইয়র্কে নিগ্রো। নিগ্রোদিগকে কোন উচ্চতর কর্ম্মে দেখি নাই—তাহাদের সংখ্যা এত বিরল।

অভিংটনের নিগ্রোসেবা

গত দশ বৎসর ধরিয়া ইয়াঙ্কি কুমারী অভিংটন নিগ্রো সমাজের জন্য সেবাকার্য্যে ব্রতী আছেন। ইঁহার বিবেচনায়, বর্ণ-ভেদের প্রধান কুফল একটি। নিগ্রোরা খানিক-দূর পর্য্যন্ত সকল দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়। কিন্তু তাহার পর ইহাদের পথ রুদ্ধ। অভিংটনের সঙ্গে কয়েকবার আলাপ হইল। ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বিবেচনা করেন যে, নিগ্রো-সমস্যা এক্ষণে আর বর্ণ-সমস্যা নয়, ইহা সাধারণ দারিদ্র্য-সমস্যার এক বিভাগ মাত্র? দরিদ্র ইতালীয়ান ও স্পেনের

যে দুরবস্থা নিগ্রোদেরও কি সেই দুরবস্থা?" অভিংটন বলিলেন—"আমি সেইরূপই বিবেচনা করি। অবশ্য আমাদের একটা জাতিগত কুসংস্কার মজ্জাগত আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি নিগ্রোরা বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি করিবার সুযোগ ও অবসর পায় তাহা হইলে নিগ্রো-সমস্যা সহজ হইয়া যাইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, শ্বেতাঙ্গে এবং কৃষ্ণাঙ্গে মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই? উভয়েই এক প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ? দুই সমাজেই উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা সমানভাবে বিকশিত হইতে পারে?" ইনি বলিলেন—"এইরূপই আমার ধারণা। কেবল আমার নয়—আজ কালকার নৃতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরাও এই কথাই বলিতেছেন। ইঁহারা সভ্যতা বিস্তারে কোন জাতিবিশেষের একচেটিয়া অধিকার ও যোগ্যতা স্বীকার করেন না। আমার বিশ্বাস, নিগ্রোরা যুক্তরাষ্ট্রে অর্দ্ধ মানব মাত্র বিবেচিত হয়। এজন্য এখানে নিগ্রো-প্রতিভার বিকাশ হয় না। দুই তিন বৎসর হইল আমি 'Half a Man' অর্থাৎ "আধখানা মানুষ" নাম দিয়া নিগ্রোজাতির বৈষয়িক দুরবস্থার চিত্র প্রদান করিয়াছি। তাহার ভূমিকায় নৃতত্ত্ববিৎ বোয়াজ (Boas) আমার সিদ্ধান্তই বৈজ্ঞানিকের সমর্থনযোগ্য স্বীকার করিয়াছেন।"

বোয়াজ লিখিয়াছেন—

"Many students of anthropology recognise that no proof can be given of any material inferiority of the Negro race; that without doubt the bulk of the individuals composing the race are equal in mental aptitude to the bulk of our own people; that although their hereditary aptitudes may be in slightly different

directions, it is very improbable that the majority of individuals composing the white race should possess greater ability than the Negro race."

বোয়াজের মতে কৃষ্ণাঙ্গে শ্বেতাঙ্গে মস্তিষ্কগত পার্থক্য নাই। যেটুকু প্রভেদ দেখা যায় তাহাতে নিগ্রোকে একটা আলাদা "জাতির" অন্তর্গত করা চলে না; বরং অনেক বিষয়েই নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গের সমান।

কুমারী অভিংটনের এই গ্রন্থে নিউইয়র্কের নিগ্রোসমাজ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। নিগ্রোদের আবাসস্থান ও কর্ম্মস্থান, তাহাদের শিশু-জীবন ও নারীজীবন, তাহাদের ধনাগমের উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে চিত্তা-কর্ষক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে ইহুদিদিগের যেরূপ দুরবস্থা ছিল বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোসমাজ তদপেক্ষা বেশী দুর্য্যোগ সহ্য করিতেছে।

অভিংটন নিগ্রোবালকবালিকাদিগের জন্য একখানা সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি বলেন—সাধারণ বিদ্যালয়ে যে সকল পাঠ্য পুস্তক ব্যবহৃত হয় তাহাতে শ্বেতাঙ্গ ইয়াঙ্কিদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন চিত্রিত থাকে। নিগ্রো ছাত্র-ছাত্রীরা এই সকল গ্রন্থে নিজেদের আবেষ্টন দেখিতে পায় না—কাজেই ইহাদের শিক্ষালাভ সরস হয় না। এই বুঝিয়া অভিংটন নিগ্রোসমাজের রীতিনীতি, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানা লিখিয়াছেন।

অভিংটনের সঙ্গে আলাপে জানা গেল, আজকাল নিগ্রোসমাজে কয়েকজন কবি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। নিগ্রোরা চিরকালই সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী। উচ্চ অঙ্গের কবিতা রচনায়ও ইহারা ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ করিতেছে। ব্রেথ্‌ওয়েটের Lyrics of Life and Love সম্বন্ধে এক সম্পাদক লিখিয়াছেন :—

"We have in this maker of sweet verses the true poetic spirit and the work has that grace of form that distinguishes the work of the poet from that of the poetaster. * * * why is praise begrudged the poet? Why do those critics of the North who have so long been on the lookout for some one to wear the bays that rest but lightly on the head of Bliss Carmen pause before giving to the new-come singer the award that is his due? * * * He is one who is by the present volume proving himself to be what ninehundred and ninetynine of the thousand and one verse makers of this country are not—a poet. * * * Can you tell why he is not hailed with praise?—He is a Negro."

শ্বেতাঙ্গ সমালোচক বলিতেছেন, "ব্রেথওয়েট একজন যথার্থ কবি। এরূপ কবি ইয়াঙ্কিস্থানের শ্বেতাঙ্গ মহলে আজ কাল বেশী নাই। এমন শক্তিসম্পন্ন ক্ষমতাবান্ গুণী ব্যক্তির সম্মান আমেরিকায় হইতেছে না কেন? উত্তর—ব্রেথওয়েট কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো!"

সমাজতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ডুবয়েস্

একদিন সন্ধ্যাকালে নিগ্রোদের একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলাম। সঙ্গীত চর্চ্চা হইল—এবং নিগ্রোজাতির অন্যতম জননায়ক অধ্যাপক ডুবয়েস্ বক্তৃতা করিলেন। ইনি Krehbiel প্রণীত Afro-American Folksongs নামক নিগ্রো-সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ইহাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে গান গীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইনি এই সমুদয়ের ব্যাখ্যা ও টিপ্পণী দিতে লাগিলেন। ডুবয়েস্

(Du Bois) নিগ্রোজাতীয় লোকসাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহা The Souls of Black folk অর্থাৎ "কৃষ্ণাঙ্গের আত্মা" নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। এই প্রবন্ধ এবং সমস্ত গ্রন্থই সকলের পাঠ করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মবীর বুকার ওয়াশিংটন প্রণীত Up from Slavery অর্থাৎ গোলামীর পর নবজীবন নামক আত্মজীবনচরিত গ্রন্থের সঙ্গে অধ্যাপক ডুবয়েস্ প্রণীত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সমগ্র নিগ্রোসমাজের সকল কথা অবগত হওয়া যায়। ডুবয়েসের রচনা সাহিত্যহিসাবেও অতি উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত।

ডুবয়েস্ বলিলেন—"আপনারা এই গানগুলি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এই গীত শুনিয়া মুগ্ধ হয় না এমন লোক জগতে আছে কিনা জানি না। কিন্তু আপনারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন কি যে, এই সমুদয় গীত নিগ্রো জনসাধারনের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল? আপনারা নিগ্রোজাতি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অতি নীচ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। এই অন্ধ কুসংস্কারের ফলে আপনারা কোন মতেই ভাবিতে পারেন না যে, জগতের কতকগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীত এই কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম জাতির কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। আমাদিগকে আপনারা জঘন্য নীচ প্রকৃতি পশুস্বভাব ও হৃদয়হীন নরনারী বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। কাজেই আমাদের মুখে যদি কোন ভাল কথা আপনারা শুনিতে পান আপনারা স্বভাবতই ভাবিয়া থাকেন যে, ঐ সমুদয় বচন আমরা কতকগুলি পরকীয় বুলির ন্যায় আওড়াইতে শিখিয়াছি মাত্র। উচ্চ ধারণা, মহান্ ভাব, গভীর চিন্তা যে নিগ্রোহৃদয়ে জাগিতে পারে ইহা আপনাদের কল্পনার অতীত।

আজ শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গগণকে এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ চোখে দেখিতেছেন। কিন্তু মধ্যযুগে এবং প্রাচীনকালে কৃষ্ণাঙ্গ সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গের

এইরূপ অন্যায় ধারণা ছিল কি? ইতিহাস আলোচনা করুন—দেখিবেন প্রাচীন কালে শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিত। কৃষ্ণাঙ্গেরা অর্দ্ধমানব বিবেচিত হইত না। ধর্ম্মকর্ম্মে, শিল্পকর্ম্মে, সাহিত্য চর্চ্চায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন চিত্রালয় ও আর্ট গ্যালারী যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, প্রাচীন শিল্পীরা খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সভ্যতা বিষয়ক চিত্রের ভিতর কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয় নরনারীর ভক্তি, সেবা, দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌর্য্যবীর্য্য এবং নানাবিধ উৎকর্ষ্যের পরিচয় দিতেন। ইয়োরোপের অন্যান্য লোকেরা যেরূপ মানুষ এই সকল চিত্রকরগণের ধারণায় এশিয়া ও আফ্রিকার নর-নারীগণও সেইরূপ মানুষ বিবেচিত হইত। কিন্তু আজ তিনশত বৎসরের গোলামীর ফলে নিগ্রোকে আপনারা পশুর সমান বিবেচনা করিতে শিখিয়াছেন। নিগ্রোরা যদি কখনও গোলমা না করিত তাহা হইলে আপনারা এখনও তাহাদিগের চিন্তাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ধর্ম্মজ্ঞান এবং সভ্যতা সম্মান করিয়া চলিতেন।”

ডুবয়েস্ আটলাণ্টা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই বিশ্ব-বিদ্যালয় আগাগোড়া নিগ্রো। এক্ষণে ইনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া মাসিকপত্রের সম্পাদক হইয়াছেন। কাগজের নাম ক্রাইসিস (Crisis)—বর্ত্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ৩০,০০০। ডুবয়েস খাঁটি নিগ্রো নহেন বুকার ওয়াশিংটনের ন্যায় ইঁহার শরীরে শ্বেতাঙ্গ রক্ত প্রবাহিত। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ভিতর ফরাসী জন্মদাতা ছিল। ডুবয়েস্ ইয়োরোপের জাতিসমূহের মধ্যে ফরাসীকেই বেশী ভালবাসেন। মধ্যযুগের শ্বেতাঙ্গ চিত্র-শিল্পে কৃষ্ণাঙ্গদিগের মর্য্যাদা সম্বন্ধে ডুবয়েস্ ক্রাইসিস পত্রে লিখিয়াছেন :—

“The reproduction of the ‘Adoration of the kings’

by Ian Gossart is one of a number of noted paintings which make the figure of the adoring flock king one of prominence. The Antwerp Museum houses the 'Adoration of the Magi' by Rubens, in which the Nubian slaves are grouped by the side of the worshipping camels and the African King is pictured parading in the centre of the picture. In the Lonvre is seen, painted, three years after, a second picture by the same master, commissioned for the church of the sisters of the Anunciation in which the black king is placed as the central figure.

In Bourne—Jones, 'The star of Bethelhem' the adoring Negro prince is the third figure on the right. A painting of an unlike subject, exhibited in the Vienna Gallery 'The Four Quarters of the Globe' by Rubens, symbolises the quarters of the globe by one of the great rivers—the Danube, the Nile, the Ganges and the Amazon. The rivers are in turn symbolised by four male figures with their beautiful female companions. Of 'bronze-hued' loveliness are the man and the maid that represent the Nile."

"এই সকল প্রসিদ্ধ চিত্রকর আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদিগের ধর্ম্মভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কোন কোন চিত্রে এমন কি কেন্দ্রস্থলে কৃষ্ণাঙ্গের মূর্ত্তি দেখিতে পাই। কৃষ্ণাঙ্গ নরজাতি, এবং কৃষ্ণাঙ্গ দাসদাসীরাও যে

শ্বেতাঙ্গদিগের ন্যায় মানুষ, জগতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পে তাহা বুঝান হইয়াছে। বড় বড় চিত্রশালায় এই সমুদয় সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।"

নিগ্রোদিগের জাতীয় সঙ্গীত ও লোকসাহিত্য সম্বন্ধে ডুবয়েস্ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের "Of the Sorrow Songs" অর্থাৎ "বিষাদের গান" অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন। এই সাহিত্যে বর্ত্তমানের কষ্টদৈন্য অথচ ভবিষ্যতের আশা অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গোলামের জাতিই গাহিয়া থাকে—"ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা আহ্লাদে।"

লোক-সাহিত্যে নিগ্রোজাতি।

ডুবয়েস্ বলিতেছেন—

"They are the music of an unhappy people—of the children of disappointment, they tell of death and suffering and unvoiced longing towards a truer world."

অর্থাৎ "এই গীতাবলীতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির হৃদয় দেখিতে পাই। নৈরাশ্য, বিফলতা, মৃত্যু ও যাতনা এই সমুদয়ের ধুয়া। একটা উজ্জ্বলতর সুখময় জগতের অধিবাসী হইবার জন্য অস্ফুট বেদনা ও ক্রন্দন এবং নীরব হাহাকার এই সকল গানে বুঝিতে পারা যায়।"

ইহজগতে যাহারা কিছু কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারিল না তাহারা পরকাল, অধ্যাত্মতত্ত্ব, স্বর্গ, ইত্যাদির স্বপ্ন দেখে। পদদলিত জাতির যীশুখ্রীষ্ট এইজন্যই প্রচার করিতেন—"My Kingdom is not of this world." অর্থাৎ আমি ইহজগতের কথা বলিতেছি না—পর জগতের তত্ত্বই প্রচার করিয়া থাকি। নিগ্রো গাহিতেছেন—

"You may bury me in the East,
You may bury me in the West,
But I will hear the trumpet sound in that morning."

অর্থাৎ "আমাকে পূর্ব্ব দিকেই কবর দাও, আর পশ্চিম দিকেই কবর দাও—তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। কারণ সকল স্থান হইতেই সেই গৌরবময় প্রভাতে আমি স্বর্গীয় ভেরি-নিনাদ শুনিতে পাইব।"

রবীন্দ্রনাথের আশা-তত্ত্বও কি এইরূপ নয়?—

"তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ
ছাড়ি নাই! এত যে হীনতা, এত লাজ
তবু ছাড়ি নাই আশা! * * *
আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে,
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হয়ে
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ
আমি ছাড়ি নাই আশা, ওগো মহারাজ!"

নিগ্রোদিগের গীতাবলী অধিকাংশই আধ্যাত্মিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক। সাংসারিক, বৈষয়িক ও পারিবারিক চিত্র এই সঙ্গীতে প্রায়ই পাওয়া যায় না। না পাইবারই কথা।

"Purely secular songs are few in number. * * * tell in word and music of trouble and exile, of strife and hiding; they grope toward some unseen power and sigh for rest in the End."

এই সাহিত্যে বুঝিতে পারি যে, নিগ্রোরা আজ বনে জঙ্গলে দুঃখের জীবন কাটাইতেছে—কাল হয়ত প্রভুভয়ে পলাইয়া যাইতেছে। বনবাস, গুপ্তবাস, পলায়ন, আশঙ্কা, উদ্বেগ, হাহুতাশ যে জীবনের চিরসহচর তাহাতে কি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বিষয়ক সঙ্গীত উত্থিত হয়?

নিগ্রোরা সংসারে সুখ পায় নাই। কাজেই হয় স্বর্গের কথা গাহিয়াছে অথবা প্রকৃতির ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে।

"My Lord calls me
He calls me by the thunder
The trumpet sounds it in my soul."

নিগ্রোসাহিত্যে মাতার উল্লেখ আছে কিন্তু জন্মদাতার উল্লেখ নাই। বিবাহ, প্রেম, ভালবাসা, দাম্পত্য-সম্বন্ধ ইত্যাদির পরিচয় গোলামী যুগের রচনায় পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে গোলামজাতির যথার্থ পারিবারিক জীবন ছিল কিনা সন্দেহ।

ডুবয়েস্ লিখিয়াছেন :—

"Mother and child are sung, but seldom father; fugitive and weary wanderer calls for pity and affection, but there is little of wooing and wedding, the rocks and mountains are well known, but home is unknown."

নিগ্রোসঙ্গীতের আর এক লক্ষণ এই যে, ইহাতে মৃত্যু ভয় নাই।

"Of death the Negro showed little fear, but talked of it familiarly and even fondly as simply a crossing of the waters, perhaps—who knows?—back to his ancient forests again."

মৃত্যু যেন নিগ্রোদের নিকট খেলার সাথী—অতি পরিচিত ও প্রিয়বস্তু। মৃত্যুর পর পারেই যেন নিগ্রোদের আসল দেশ ও ঘর!

ইহাই কি "গীতা"রও বাণী নয়?

ডুবয়েসের গ্রন্থ হইতে আর এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Through all the sorrow of the sorrow songs there breathes a hope—a faith in the ultimate justice of things. The minor cadences of despair change often to triumph and calm confidence. Sometimes it is faith in life, sometimes a faith in death, sometimes assurance of boundless justice in some fair world beyond. But whichever it is, the meaning is always clear; that sometime, somewhere men will judge men by their souls and not by their skins."

অর্থাৎ "গভীরতম বিষাদের চিত্রেও নিগ্রোর ভবিষ্যতে জলন্ত বিশ্বাস দেখিতে পাই। একদিন না একদিন জগতে সুবিচার হইবে—একদিন না একদিন বিধাতা পতিত জাতির উদ্ধার করিবেন—একদিন না একদিন পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় ঘোষিত হইবে। এই আশা ও বিশ্বাস নিগ্রোসঙ্গীতের চিরন্তন ধুয়া। এ জগতে, এ জীবনে যদিই বা ন্যায়ের মূর্ত্তি দেখা না যায়, পরকালে, পরজীবনে অন্ততঃ তাহা দেখা যাইবে। মানুষের হৃদয় ও আত্মাই বড়, শরীর ও চামড়া কিছুই নয়। এই তত্ত্ব একদিন না একদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।"

এইরূপ ভাবুকতা, এইরূপ স্বপ্ন, এইরূপ আশা লইয়াই নির্য্যাতিত জাতিরা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

ক্রেহবিল তাঁহার Afro-American Folksongs গ্রন্থে নিগ্রোদিগের লোকসাহিত্য আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে রুশ, জার্ম্মাণ, ফিনিস, কেল্টিক ইত্যাদি নানা জাতীয় গীতাবলীর অবতারণা করিয়াছেন। এই জন্য এই গ্রন্থে নানা জাতির হৃদয়কথা বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত লেখক গীত-সাহিত্যের আলোচনায় বেশী

মনোযোগ না দিয়া সঙ্গীত-কলা বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস নিগ্রোজাতির নিজস্ব কোন সঙ্গীত-কলা ছিল না—তাহারা আমেরিকায় আসিয়া শ্বেতাঙ্গদের বিদ্যা অনুকরণ করিয়াছে। এই জন্য লেখককে আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদিগের সঙ্গীত-কলা এবং গীতসাহিত্য আলোচনা করিয়া মামুলি মত খণ্ডন করিতে হইয়াছে। ইঁহার মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"Some of the melodies have peculiarities of scale and structure which could not possibly have been copied from the music which the blacks were privileged to hear on the plantations or anywhere else during the period of slavery. Correspondence will be disclosed, however, between these peculiarities and elements observed by travellers in African countries."

অর্থাৎ "নিগ্রোরা গোলামাবাদে যে সকল শ্বেতাঙ্গ গীত শুনিতে পাইত তাহার সঙ্গে খাঁটি নিগ্রো-সঙ্গীতের অনেক বিষয়ে মিল নাই। অথচ আফ্রিকার নিগ্রোরা এখনও যে ধরণে গীত চর্চ্চা করে সেই ধরণ ইয়াঙ্কি স্থানের নিগ্রো-সঙ্গীতেও পাই। কাজেই নিগ্রো-সঙ্গীত শ্বেতাঙ্গের অনুকরণ নয়।"

ক্রাইসিস্ আফিসে অধ্যাপক ডুবয়েসের সঙ্গে দেখা হইল। ইনি একখানা গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিতেছিলেন। এই গ্রন্থ হোম ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী (Home University Library) গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। নাম "নিগ্রো" ("The Negro"). ইহাতে ডুবয়েস্ নিগ্রো সমাজের প্রাচীন সভ্যতা বিবৃত করিয়াছেন। সাধারণতঃ লোকের

প্রাচীন মিশরে নিগ্রোসভ্যতা

ধারণা এই যে, নিগ্রোরা অতি শিশুজাতি—কয়েক শত বৎসর হইল শ্বেতাঙ্গ সমাজের অধীনে আসিয়া সভ্যতার অ আ ক খ লাভ করিতেছে। সুতরাং ইহাদের উন্নতি এখন বহুকাল সাপেক্ষ। এই প্রচলিত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অধ্যাপক মুন্‌ষ্টারবার্গ তাঁহার "Americans" নামক গ্রন্থের "জাতি সমস্যা" অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :—

"It must be left to anthropology to find out whether the Negro race is actually capable of such complete development as the Caucasian race has come to after thousands of years of steady labour and progress. The student of social politics need not go into such speculations ; he faces the fact that the African Negro has not had the thousands of years of such training and therefore, although he might be theoretically capable of the highest culture, yet practically he is still unprepared for the higher duties of civilisation."

অর্থাৎ "শ্বেতাঙ্গের মাথায় আর কৃষ্ণাঙ্গের মাথায় কোন প্রভেদ আছে কিনা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ আলোচনা করিতে থাকুন। বর্ত্তমানে দেখিতেছি, শ্বেতাঙ্গেরা বহুবর্ষব্যাপী কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে। কৃষ্ণাঙ্গেরা সভ্যতা ক্ষেত্রে সবেমাত্র কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই এক্ষণে সাম্য অসম্ভব।"

ডুবয়েস্ বলিতে লাগিলেন—"এইরূপ মতবাদ পণ্ডিতমহলে এবং সাধারণ শ্বেতাঙ্গ সমাজে প্রচলিত হইল কেন জানেন? আমরা ২০০ বৎসর কাল ইহাদের গোলামী করিয়াছি বলিয়া। আমাদের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা কেহই আবশ্যক বোধ করেন নাই। আমরা ত গ্রীক

দার্শনিক য়্যারিষ্টটলের হিসাবে "জীবন্ত যন্ত্র" মাত্র। আমাদের কি আত্মা আছে? না চিত্ত আছে? কাজেই আমাদের অতীত, আমাদের বংশ মর্য্যাদা, আমাদের গৌরব কথা আবার কোথায়? পণ্ডিত মহাশয়-গণ যদি বর্ত্তমানের কুসংস্কার এবং সাময়িক আবেষ্টন ছাড়াইয়া উঠিয়া "রাগদ্বেষবহিষ্কৃত" ভাবে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে নিগ্রোজাতির অতীত গৌরব কাহিনী বাণীর সন্ধান পাইতেন। প্রাচীনতম যুগের উৎকর্ষও বিবৃত হইতে পারিত এবং মধ্য-যুগের "মিসিং লিঙ্কস্" ("Missing links") অর্থাৎ "লুপ্ত প্রমাণ" বা ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়া যাইত। আপনি বোধ হয় জানেন যে, প্রাচীন মিশরীয় ফ্যারাও সম্রাটদিগের আদিম বাসস্থান এবং জাতিতত্ত্ব এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু সেই যুগের মূর্ত্তি ও চিত্র আজকাল কে না দেখিয়াছে? সেগুলি দেখিয়া আধুনিক নিগ্রো নরনারীর কথা মনে না হওয়া অত্যন্ত বিস্ময়জনক। মিশরীয় নরপতিগণের রং, কেশবিন্যাস, আকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই নিগ্রোজাতীয় বিবেচনা করিলে কোন অন্যায় হইবে না। নৃতত্ত্ববিদেরা তাহা জানেন। ঐতিহাসিকেরাও তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু ইঁহারা এতই অন্ধ ও গতানুগতিক যে সেই বিরাট সভ্যতার প্রবর্ত্তকগণকে আধুনিক অবনত নিগ্রোদিগের পূর্ব্ব পুরুষ বিবেচনা করিতে দ্বিধা করিতেছেন। যাহারা কোন কালে জগতের শীর্ষস্থানে ছিল তাহারা কি ঘটনাচক্রে নিতান্ত নিকৃষ্ট সমাজে পরিণত হইতে পারে না? হইতে পারে। পণ্ডিতেরা তাহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু নিগ্রোদের অতীত অতটা গৌরবসূচক সপ্রমাণ করা ইঁহারা পছন্দ করেন না। কারণ নিগ্রো যে বর্ত্তমানকালে শ্বেতাঙ্গদিগের গোলাম!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এই সকল কথা প্রমাণসহ বিবৃত করিয়াছেন কি?"

ডুবয়েস্ বলিলেন—"মহাশয়—'হোম ইউনিভার্সিটি গ্রন্থমালা'র কর্ম্মকর্ত্তারা আমাকে এইজন্য বিশেষ খাটিতে বলিয়াছেন। আমাকে তিনবার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বদলাইতে হইয়াছে। একটা বিস্তৃত বিব্লিওগ্রাফি বা প্রমাণ-পঞ্জী গ্রন্থের ভিতর দিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার এই কার্য্যে সঙ্গী কতজন পাইয়াছেন ?" ইনি বলিলেন—"এখন পর্য্যন্ত একাকী চলিতেছি।" কিন্তু শীঘ্রই একটা পরিষৎ গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে। 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া আফ্রিকানা' নাম দিয়া একটা বিশ্বকোষ বাহির করা হইবে। তাহাতে আফ্রিকা বিষয়ক প্রাচীন ও নবীন সকল প্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ হইবে। আমার এই 'নিগ্রো' গ্রন্থ সেই বিরাট ব্যাপারের এক প্রকার ভূমিকা স্বরূপ।"

ডুবয়েস্ কয়েকখানা গ্রন্থের নাম করিলেন। এই গুলির লেখক নিগ্রো। প্রাচীন ও নবীন নিগ্রো সমাজবিষয়ক তথ্য এই সমুদয়ের আলোচ্য বিষয়। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

1. Negro-Culture in West Africa—Ellis.
2. Gold Coast Native institutions—Hayford.
3. Out of the House of Bondage—Miller.
4. Facts of Reconstruction—Lynch.
5. The Negro in American History—Cromwell.
6. African Abroad—Ferris.
7. Haitian Revolution—Steward.

কৃষ্ণাঙ্গ বিভীষিকা

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আফ্রিকার বর্ত্তমান নিগ্রোসমাজের সঙ্গে আমেরিকার নিগ্রোদিগের ভাব-বিনিময় এবং কর্ম্ম-বিনিময় হইয়া থাকে কি ?" ইনি বলিলেন—"ধর্ম্ম-

বিষয়ে আদান প্রদান কথঞ্চিৎ হয়। আমরা জগতে সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোকে এক স্বতন্ত্র খৃষ্টান সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে চাহি। এই আন্দোলনে শ্বেতাঙ্গেরা ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার নাম ইঁহারা ইথিয়োপিয়ান মুভমেণ্ট (Ethiopian Movement) দিয়া থাকেন। এখনও অবশ্য আন্দোলন বিশেষ প্রলয় নয়। কিন্তু নিগ্রোদের হাতে কিছু টাকা হইলে যখন আফ্রিকার ও আমেরিকার নিগ্রো ভ্রাতাদের ভিতর ব্যবসার সম্বন্ধ এবং বৈষয়িক আদান প্রদান প্রবর্ত্তিত হইবে তখন শ্বেতাঙ্গেরা একটা কৃষ্ণাঙ্গ-বিভীষিকা (ব্ল্যাকপেরিল) দেখিতে থাকিবেন সন্দেহ নাই! শ্বেতাঙ্গেরা প্রায়ই বিভীষিকা দেখিয়া থাকেন। আজ কাল আমেরিকায় 'ইয়েলো পেরিল' বা পীতাঙ্গ-বিভীষিকা এবং ইয়োরোপে মুসলমান-বিভীষিকা (প্যান-ইস্লাম) প্রবল। হয়ত আগামী ৩০ বৎসরের ভিতর কৃষ্ণাঙ্গ-বিভীষিকাও গজাইয়া উঠিবে!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আফ্রিকার বহু নিগ্রো ত এখনও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে কি?" ডুবয়েস্ বলেন —"মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করা নিগ্রোদের পক্ষে মঙ্গলকর নয়। আফ্রিকার মুসলমান নিগ্রোরা খৃষ্টান হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রকৃত পক্ষে, আমার বিশ্বাস, খৃষ্টান সভ্যতার আওতায় নিগ্রোসমাজ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শেই নিগ্রোজাতি অধিকতর উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। ব্লাইডেন (Blyden) প্রণীত 'Christianity, Islam and the Negro Race' গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা পাইবেন।"

বুকার ওয়াশিংটন ও ডুবয়েস্

শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোসমাজের নরম দলের নেতা। অধ্যাপক ডুবয়েস্ গরম অর্থাৎ চরমপন্থীদলের নেতা। এই দুই জনই আমেরিকায় সুপ্রসিদ্ধ। আমেরিকার বাহিরে যাঁহারা নিগ্রোসমাজের সংবাদ রাখেন তাঁহারা

এই দুই জনকেই জানেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয় আপনাতে এবং ওয়াশিংটনে মতভেদ কোন্ কোন্ বিষয়ে বেশী ?" ইনি বলিলেন—"আমার সঙ্গে ওয়াশিংটনের আকাশ পাতাল পার্থক্য। আমি ইহাঁর চরিত্রবত্তা এবং অকপট স্বজাতিসেবা যার-পর-নাই সম্মান করিয়া থাকি। এরূপ কর্ম্মবীর জগতে বেশী নাই—এইরূপ আমার বিশ্বাস। কিন্তু ইহাঁর মতের সঙ্গে আমি কোন দিনই মত মিলাইতে পারিলাম না। ইনি এত বেশী ঢিল দিয়াছেন যে, সমগ্র নিগ্রোজাতি আমেরিকার রাষ্ট্রমণ্ডলে খানিকটা নামিয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক—ইনি last of the submissionists অর্থাৎ নরম দলের শেষ পাণ্ডা; ইহাঁর পরে আর কেহ বোধ হয় ইহাঁর প্রচারিত সহিষ্ণুতা-নীতি অবলম্বন করিবে না।"

বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোজাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না এবং নিগ্রোদিগকেও বলিতে দেন না। তাহার ফলে ইয়াঙ্কিরা বুঝিয়াছে যে, নিগ্রোরা রাষ্ট্রমণ্ডলে উচ্চ অধিকার না পাইলেও শান্ত থাকিবে। ওয়াশিংটন নিগ্রো ও শেতাঙ্গকে দুই ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় জগতে বাস করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইনি কেবলমাত্র শিল্পের আন্দোলন, শিল্পশিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির পুষ্টিসাধনে সমগ্র নিগ্রো-সমাজকে ব্রতী করিতে চাহেন। আমাদের দেশে এইরূপ আন্দোলনকে "নুন চিনির বা জুতাকাপড়ের স্বদেশী" বলা হয়। বুকারের মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"In all things purely social we can be as separate as the five fingers and yet one as the hand in all things essential to mutual progress."

অর্থাৎ "নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ সামাজিক লেনদেনে ও খাওয়া পরায় পাঁচ আঙুলের মত স্বতন্ত্র থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু এই দুই সমাজ

যুক্ত রাষ্ট্রের জাতীয় মঙ্গলের জন্য আমার এই বাহুর মত ঐক্য বিশিষ্ট।"

ডুবয়েস্ বলেন—"এই কথায় ওয়াশিংটন সমগ্র নিগ্রোজাতিকে ইয়াঙ্কিদের নিকট বেচিয়া ফেলিয়াছেন, বলিতে পারি। কাজেই ইয়াঙ্কিরা ওয়াশিংটনকে বড়ই খাতির করিয়া চলেন। ইনি সর্ব্বত্রই ইহাঁর টাস্কেজী শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন। ইয়াঙ্কিয়া বুঝে যে, যদি এইরূপ সর্ব্বজনমান্য স্বার্থত্যাগী কর্ম্মবীর তাঁহার স্বজাতির জন্য বৈষয়িক উন্নতি মাত্রে সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে আমেরিকা অনেকটা নিরাপদ হইবে—নিগ্রোসমস্যা আর থাকিবে না। এই বুঝিয়া ব্যবসায়-প্রধান ইয়াঙ্কি-সমাজ ওয়াশিংটনকে যথেষ্ট আদর করেন। কিন্তু নিগ্রো-জাতি এই মতবাদের ফলে ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছে। আজ নিগ্রো আমেরিকার রাষ্ট্রমণ্ডলে গোলামেরও অধম।"

ডুবয়েস্ বলেন—"আমরা রাষ্ট্রমণ্ডলে উচ্চ অধিকার আকাজ্ক্ষা করি। কেবলমাত্র টাকা পয়সার আন্দোলনে যোগ দিলেই নিগ্রো-জাতির চরম উন্নতি হইবে না। আমরা সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি সভ্যতার সকল অঙ্গেরই বিকাশসাধন করিতে চাহি। অধিকন্তু কেবল মাত্র কতকগুলি শিল্প-বিদ্যালয় অথবা নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীর সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই নিগ্রোদের শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা হইবে না। আমরা নিগ্রোদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য-পরিষৎ, বিজ্ঞান-পরিষৎ ইত্যাদি সকল প্রকার উচ্চ প্রতিষ্ঠান গড়িতে চাহি। কিন্তু ওয়াশিংটন এরূপ ব্যাপক ও গভীর ভাবে নিগ্রোজাতির ভবিষ্যৎ চিত্র কল্পনা করিতে পারেন না।"

"Of our spiritual strivings" অর্থাৎ "আমাদের লক্ষ্য ও সাধনা" নামক প্রবন্ধে ডুবয়েস্ আমেরিকাবাসী নিগ্রোর জাতীয় আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন—

"He would not Africanise America, for America has too much to teach the World and Africa. He would not bleach his Negro soul in a flood of white Americanism; for he knows that Negro blood has a message for the world. He simply wishes to make it possible for a man to be both a Negro and an American, without being cursed and spit upon by his fellows, without having the doors of opportunity closed rightly in his face."

অর্থাৎ "আমরা আমেরিকাকে আফ্রিকায় পরিণত করিতে চাহি না। আমরা জানি, আমেরিকা বহু বিষয়ে আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের শিক্ষক হইবার যোগ্য। অথচ আমরা আমাদের নিগ্রোচিত্তকেও ইয়াঙ্কিময় করিতে চাহি না। কারণ নিগ্রো-হৃদয়ের একটা বিশেষত্ব আছে। সুতরাং নিগ্রোবাণী প্রচারিত না হইলে দুনিয়া কথঞ্চিৎ দরিদ্র থাকিয়া যাইবে। আমরা একসঙ্গে ইয়াঙ্কি ও নিগ্রো গড়িয়া উঠিতে চাহি। আমেরিকার সুযোগে নিগ্রো চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটাইতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।"

অধ্যাপক ডুবয়েস্ নিগ্রো ভাবুকতার প্রতিমূর্ত্তি। আধুনিক ইতিহাসের নজির দেখাইতে হইলে বলিব ডুবয়েস্ ম্যাজিনি এবং ওয়াশিংটন কাভুর। একজন স্বপ্ন ও আদর্শ প্রচার করিতেছেন—আর একজন অবস্থা বুঝিয়া যথাসম্ভব কর্ত্তব্য বলিতেছেন।

ডুবয়েস্ আমাদের দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কথা উল্লেখ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে লণ্ডনের বিশ্ব-মানব-পরিষদের সম্মিলনে (Universal Races Congress) দেখা হইয়াছিল।

ধন-বিজ্ঞান-চর্চ্চা

হুইটম্যানের "Leaves of Grass" (তৃণ-পত্র) আমেরিকার সর্ব্বপ্রথম "খাঁটি স্বদেশী" কাব্য গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে আমেরিকার বিশেষত্ব কোন কাব্যে চিত্রিত হয় নাই। সাহিত্যের সকল বিভাগেই ইয়োরোপ, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডের, ছায়া পড়িত। আমেরিকা বস্তুতঃ সকল বিষয়েই ইংরাজের উপনিবেশ মাত্র ছিল। আমেরিকাবাসীর স্বাতন্ত্র্য কোন বিষয়ে লক্ষিত হইত না। ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত The Good Gray Poet নামক পুস্তিকায় লেখক কবিবর হুইটম্যানের গুণকীর্ত্তন করিতে যাইয়া আমেরিকানের এইরূপ সর্ব্বতোমুখী পরতন্ত্রতার উল্লেখ করিয়াছেন।—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পরানুবাদের যুগ

"Intellectually, we are still a dependency of Great Britain and one word—colonial—comprehends and stamps our literature. In no literary form except our newspapers, has there been anything distinctively American. I note our best books—the works of Jefferson, the romances of Brockden Brown, the speeches of Webster, Everett's Rhetoric, the divinity of Channing, some of Cooper's novels, the writings of Theodore Parker, the poetry of Bryant, the masterly law arguments of Lysander Spooner, the miscellanies of Margaret

Fuller, the histories of Hildreth, Baucroft and Motley, Ticknor's History of Spanish Literature, the political treatises of Calhoun, the rich benignant poems of Longfellow, the ballad of Whittier, the delicate songs of Philip pendleton Cooke, the weird poetry of Edgar Poe, the wizard tales of Hawthorne, Irving's Knickerbocker, Delia Bacon's splendid sibyllic book on Shakespeare, the political economy of Carey, the prison letters and immortal speech of John Brown, the lofty patrician eloquene of Wendell Phillips, and those diamond of first water, the great clear essays and greater poems of Emerson. This literature has often commanding merits, and much of it is very precious to me, but in respect of its national character, all that can be said is that it is tinged, more or less deeply with America; and the foreign model, the foreign standards, the foreign culture, the foreign ideas, dominate over it all."

চিন্তা ও বুদ্ধির দাসত্ব স্বীকার করিয়া আমরা এখনও গ্রেট ব্রিটেনের অধীন হইয়াই আছি; এবং উপনিবেশ-সম্পর্কীয়—এই একটি কথাতেই আমাদের সমস্ত সাহিত্য ছাপমারা হইয়া আছে। খবরের কাগজ ছাড়া আর কোন রকম সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় আমেরিকাত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট বই যেগুলি, সেগুলির জাতীয়তা অবশ্য আমেরিকার দ্বারাই অনুরঞ্জিত, তথাপি বিদেশী আদর্শ বিদেশী ভাব তাহাদের মধ্যে আধিপত্য করিতেছে।

চিন্তামণ্ডলে এইরূপ পরতন্ত্রতার যুগ ল্যাটিন আমেরিকায়ও বহুকাল চলিয়াছে। শেফার্ড বলেন :—

"As conditions in one state or another became relatively free from internal disturbance, constitutional and international law, political economy and education were the subjects that occupied a position of prominence. Written mainly from an external or abstract point of view, the various treatises on these matters were apt to lack definiteness of application to purely national concerns. Descriptive only too often of institutions and practices in Europe their presentation could not exercise a direct and potent influence on the life and thought of those to whom they were addressed.

Since 1876, however, when the Latin American nations in general began to be brought into closer contact with the world at large, a keen interest has been aroused among them in social and economic problems of a concrete character. Journalist, essayist, novelist, poet and historians have come to take an active part in the discussion of the principles and measures that may tend to solve these problems, so far as they have arisen in their own countries. Instead of dealing with what concerns Europe, many of the authors have sought

inspiration in the characteristics and environment of their own people."

এক এক প্রদেশরাজ্য যেমন যেমন আভ্যন্তর গণ্ডগোলের হাত হইতে যে-পরিমাণে মুক্ত হইয়া উঠিতেছিল সেখানে সেই পরিমাণে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় আইন কানুন, অর্থাগমের উপায় ও শিক্ষাদানের কথা প্রাধান্য লাভ করিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে লিখিত বিবিধ পুস্তক পুস্তিকাই বিদেশী ভাবে বা কেবলমাত্র তত্ত্ব হিসাবে লিখিত হওয়াতে জাতীয় ব্যাপারে তাহাদের উপযোগিতা ও নিগূঢ় বিশিষ্টতা অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল। ইয়োরোপের রীতিনীতি বা প্রতিষ্ঠানের বর্ণনামাত্র হওয়ায় যাহাদের উদ্দেশ করিয়া লেখা তাহাদের জীবন ও চিন্তা-প্রণালীর উপর উহাদের প্রভাব পড়িতেছিল না। ১৮৭৬ সাল হইতে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত ল্যাটিন আমেরিকার ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হইতে লাগিল, তখন ইহাদের মধ্যে বস্তুতন্ত্র রকমের সামাজিক ও আর্থিক সমস্যার আলোচনার দিকে মনোযোগ পড়িল। তখন নিজের দেশের সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কারের চেষ্টায় কাগজওয়ালা, প্রবন্ধলেখক, ঔপন্যাসিক, কবি, ঐতিহাসিক সকলেই লাগিয়া গেল। অনেক লেখক ইয়োরোপ সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়িয়া নিজের ঘরের ব্যাপার দিয়া সরস্বতীর সাধনা করিতে লাগিল।

শেপার্ড ল্যাটিন আমেরিকা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন আমরাও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঠিক তাহাই বলিতে পারি। ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সকল বিষয়েই পরানুবাদ ও পরানুকরণের যুগ চলিয়াছে। কি চিত্রশিল্প, কি সমাজ-সংস্কার, কি লোকহিত, কি শিক্ষাপ্রচার সর্ব্বত্রই আমরা বিদেশকে

উনবিংশশতাব্দীর ভারত ও ধন-বিজ্ঞান

১৯৩ পৃষ্ঠা

১১। অধ্যাপক সেলিগম্যান

নকল করিয়াছি। ক্রমশঃ আমরা একটা চিন্তাস্বরাজ খুঁজিয়া পাইয়াছি। ১৯০৫ সালে এই নূতন চিন্তামণ্ডলের বিকাশ বিশেষ রূপে দেখা দিয়াছে। সকল চিন্তাক্ষেত্রে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে এক্ষণে আমরা ভারতীয় বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্মান করিয়া চলিতেছি।

ভারতীয় আর্থিক অবস্থার আলোচনা এবং ভারতবর্ষে ধন-বিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক সেলিগম্যানের সঙ্গে কয়েকদিন কথাবার্ত্তা হইল। আমি বলিলাম—"ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আধুনিক জ্ঞান প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে ইয়োরোপের কয়েকটি অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি শিখান হয়। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষার ফলে কলেজে বসিয়া ভারতীয় ছাত্রেরা কেবল মাত্র জন ষ্টুয়ার্টমিল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এবং সিজুইকের নাম শুনিয়াছে। সাধারণতঃ ইহাঁদের এবং ইহাঁদের শিষ্যবর্গের গ্রন্থাবলী ছাড়া অন্য কোন-প্রকার গ্রন্থ পাঠ্যতালিকায় নির্দ্দিষ্ট হইত না। ইহাঁদের মতবাদসমূহ বেদবাক্যস্বরূপ ছাত্রগণকে মুখস্থ করান হইত। বলাবাহুল্য, ইহাঁদের রচনায় ভারতবর্ষের উল্লেখ অতি সামান্য মাত্র। কাজেই ভারতীয় ছাত্রেরা ধন-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিখিতে যাইয়া ইয়োরোপের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের, রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য ও মতবাদ জানিতে পারিত। অধিকন্তু, কোন এক সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য বিদেশী পণ্ডিতেরা যে সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন ভারতবর্ষে তাহার প্রচলন হইত না। একচোখো ভাবে সকল প্রশ্নের বিচার শিখান হইত। ফলতঃ, একে বিদেশী তথ্যরাশির তালিকা, তাঁহার উপর তৎসম্বন্ধে আংশিক এবং অসম্পূর্ণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা—ইহাই ভারতীয় ছাত্রের জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল।

ভারতবর্ষে যে সকল সমস্যা সর্ব্বদা বিদ্যমান তাহা কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জানিতে পারিত না—অধ্যাপকগণও জানিতেন না। ভারতীয় ছাত্র কখনও ফ্যাক্টরী দেখে নাই—ব্যবসায় "ধুরন্ধর" ইত্যাদির সংস্পর্শে আসে নাই—ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী, শ্রমজীবীর নির্য্যাতন ইত্যাদি কিছুই জানিত না। তথাপি এই সমুদয় সম্বন্ধে বিলাতী গ্রন্থকারেরা যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন সেগুলি অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ছাত্র ইংরাজীতে প্রবন্ধ রচনা করিত। "কারেন্সি থিয়রি", ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের "ইস্যু"-বিভাগ সম্বন্ধীয় মতামত, রিকার্ডোর "রেণ্ট"-তত্ত্ব, য়্যাডামস্মিথের অবাধ বাণিজ্য-নীতি, রেপ্রেজেণ্টেটিভ গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি-তন্ত্রের প্রশংসা, ফেডারেসন-তত্ত্ব ইত্যাদি কোন বিষয়ই অজানা থাকিত না। অথচ বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু কি কি, তাহার আলোচনা হইত না। ভারতবর্ষের পক্ষে "স্বাধীন বাণিজ্য"-নীতি ভাল কি "সংরক্ষণ-নীতি" মঙ্গলকর, ভারতবর্ষে "যুক্তরাষ্ট্র" স্থাপিত হইতে পারে কি না, ভারতবর্ষে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা বর্ত্তমান আকার কেন ধারণ করিল, ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি বিধানের জন্য বিলাতী মত অবলম্বন করা উচিত, কি জার্ম্মান বা আমেরিকান প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, কি একটা স্বতন্ত্র ভারতীয় প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত—এই সমুদয় প্রশ্ন ছাত্র বা শিক্ষকের চিত্তে স্থানই পাইত না।

সত্যকথা—যথার্থভাবে ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভারতীয় ছাত্রের চিত্তে স্থানই পাইত না। কতকগুলি নীরস মতবাদ ও তথ্যতালিকার সাহিত্যস্বরূপ এই বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থগুলি অধীত হইত। প্রকৃত বাস্তব-জীবনের সঙ্গে এই বিদ্যার কোন সংস্রব আছে, ভারতবাসী বুঝিতই না।

১৯০৬—৯ সালের ভিতর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কথঞ্চিৎ সংস্কার সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেবলমাত্র

বিলাতী মতবাদ যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহাদের গ্রন্থ অধীত হয় না। আমেরিকান, জার্ম্মান, অষ্ট্রিয়ান, ফরাসী ইত্যাদি সকল দেশীয় গ্রন্থকারগণের রচনা পাঠ্যতালিকায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ছাত্রেরা কোন একখানা বা দুইখানা গ্রন্থের দাসত্ব খানিকটা কাটাইতে পারিতেছে। কিন্তু এখনও শিক্ষাপ্রণালী সরস, সজীব ও কার্য্যকরী হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভারতীয় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পল্লী, নগর, জাতীয়তা, একরাষ্ট্রীয়তা, কৃষক, শ্রমজীবী, দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, শিশুজীবন, স্বাস্থ্যহানি ইত্যাদি আলোচিত হয় না। ভারতবর্ষের প্রায় কোন তথ্য না শিখিয়াই ছাত্রেরা এখনও ধনবিজ্ঞানাদি বিদ্যায় চরম পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতেছে। ভারতীয় অভাব নিবারণের উপায় আলোচনা করা ত দূরের কথা ভারতবাসীর পরিচিত বৈষয়িক এবং রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধেই কিছুমাত্র জ্ঞান প্রচারিত হয় না বলা যাইতে পারে। ধনবিজ্ঞানের আলোচনা এখনও বাস্তব-বিবর্জ্জিত ও শুষ্কভাবে হইয়া থাকে। প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে মিলাইয়া এই বিদ্যার পঠনপাঠন হয় না।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে আমাদের সুধীগণ দেশের কথা দেশবাসীকে জানাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ফলে সংবাদপত্র, মাসিক পত্র, সাময়িক সাহিত্য ইত্যাদি কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে। তাহার প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর না পৌঁছিলেও সাধারণ জনগণের উপর খানিকটা পড়িয়াছে বলিতে পারি। রাণাডে, গোখ্‌লে, রমেশ দত্ত, কংগ্রেসের নেতৃবর্গ, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এই বিষয়ে "স্বদেশী" ধনবিজ্ঞানের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। ১৯০৫ সালের পর এই নূতন পথ আরও বিস্তৃত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবর্ষে এখনও স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয় নাই।"

দেশের কথা।

সেলিগম্যান বলিলেন—"মহাশয়, আমরাও আমেরিকায় বহুকাল পর্য্যন্ত বিলাতের অনুবাদ ও অনুকরণ করিয়া মরিয়াছি। আমরা আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা এবং বৈষয়িক সমস্যাগুলি স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতাম না। মামুলি য়্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যাল্‌থাসের মতবাদগুলি আওড়াইয়া আমেরিকার অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের বিশ্লেষণ না করিয়া বিলাতী সমাজের নিয়মগুলি অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিতাম। আমাদের এই মোহ বহুকাল পর্য্যন্ত ছিল। ১৮৬৬-৭০ সালের গৃহ-বিবাদের পর যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক গোড়াপত্তন হয়। সেই সঙ্গে নূতন নূতন প্রদেশ-রাষ্ট্র স্থাপন, নগর স্থাপন, রাস্তা নির্ম্মাণ, রেলপথ নির্ম্মাণ, লৌহকারখানা স্থাপন, বড় বড় কারবার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সূত্রপাত হয়। তখন আর পূর্ব্বপরিচিত বিলাতী গ্রন্থকারদের প্রণীত ধনবিজ্ঞান পাঠ করিয়া স্বদেশের অবস্থা বুঝা কোনমতেই সম্ভবপর হইল না। আমরা বাধ্য হইয়া দেশের মাটির দিকে তাকাইলাম। নিজেদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ফ্যাক্টরী, কারখানা, ব্যবসাদার, মহাজন, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা আরব্ধ হইল। সেই আলোচনার ফলেই আজকালকার "আমেরিকান ধনবিজ্ঞান" গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা আমাদের সমস্যাসমূহ আলোচনা করিয়া যে সমুদয় সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি সে সমুদয় বিলাতী ধনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হইতে অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসর আমেরিকায় প্রকৃত স্বদেশী ধন-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার যুগ।"

আমেরিকায় স্বদেশী ধন-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ।

হুইটম্যানের "তৃণ-পত্র" এই যুগের প্রবর্ত্তক। এই সময়টাকে বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রের জন্মকাল বলা যাইতে পারে। তবে একটা কথা

মনে রাখা আবশ্যক। ইংরাজের সঙ্গে ইয়াঙ্কির রাষ্ট্রীয় কলহ যখন বাধিয়াছিল তখন হইতেই আমেরিকার আর্থিক ও বৈষয়িক স্বাতন্ত্র্য স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছিল। সুতরাং আর্থিক ও বৈষয়িক সমস্যা সম্বন্ধীয় চিন্তারাশি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই আমেরিকায় অনেকটা স্বতন্ত্র পথে চলিয়াছে। আমেরিকাবাসীরা কৃষিশিক্ষা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং এই বিষয়ক বিদ্যায় পূরাপূরি বিলাতের নকল কখনই করিত না। আমেরিকার ধন-বিজ্ঞানে এইরূপ স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতা আর এক কারণে বিশেষ প্রবল হয়। জার্ম্মান পণ্ডিত ফ্রিডরিক্ লিষ্ট স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কিছুকাল আমেরিকায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক প্রসিদ্ধ ইয়াঙ্কি বন্ধু জুটিয়াছিল। লিষ্ট বাল্যাবধিই তাঁহার জন্মভূমির বৈষয়িক উন্নতি বিধানের জন্য স্বাদেশিকতা, স্বাতন্ত্র্য ও সংরক্ষণ-নীতি প্রচার করিতেছিলেন। আমেরিকায় আসিয়াও তিনি বিলাতী য়্যাডামস্মিথ-প্রবর্ত্তিত "অবাধ বাণিজ্য"-নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। তাহার প্রভাব অতিশয় গভীর ও ব্যাপক হইয়াছিল বুঝিতে পারিতেছি।

লংম্যান্স্ গ্রীন কর্ত্তৃক প্রকাশিত The National System of Political Economy গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিষ্ট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য প্রচারিত হইয়াছে। আমেরিকায় লিষ্টের প্রভাব ইহা হইতে বুঝা যাইবে।—

"The tariff disputes between Great Britain and the United States were at that time (1822-24) at their height, and List's friends urged him to write a series of popular articles on the subject in his journal. He accordingly published twelve letters addressed to J.

Ingersoll, President of the Pennsylvanian 'Association for the Promotion of Manufacturing Industry.' In these he attacked the cosmopolitan system of free trade advocated by Adam Smith, and strongly urged the opposite policy based on protection to native industry, pointing his moral by illustrations drawn from the existing economical conditions of the United States.

The Association, which subsequently republished the letters under the title of "Outlines of New System of Political Economy (1827), passed a series of resolutions affirming that List, by his argument, had laid the foundation of a new and sound system of Political Economy, thereby rendering a signal service to the United States, and requesting him to undertake two literary works, one a scientific exposition of his theory, and the other a more popular treatise for use in public schools."

১৮২২-২৪ সালে গ্রেট ব্রীটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যশুল্ক লইয়া ঝগড়া চরমে উঠিয়াছিল। তখন লিষ্টের বন্ধুরা তাঁহাকে তাঁহার কাগজে এই বিষয়ে সাধারণ বোধ্য প্রবন্ধধারা লিখিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি গঠন-শিল্প সম্বন্ধে দ্বাদশ খানি চিঠি প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি য়্যাডামস্মিথের অবাধ বিশ্ববাণিজ্যতত্ত্বকে আক্রমণ করিয়া দেশীয় বাণিজ্যের সংরক্ষণনীতি সমর্থন করেন। এই

মতবাদ প্রচার দ্বারা লিষ্ট যে অর্থশাস্ত্রের একটি নূতন সত্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাহার দ্বারা তাঁহার স্বদেশ উপকৃত হইল তাহা স্বীকৃত হইল এবং তাঁহার তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে এবং স্কুলে পাঠ্য হইবার উপযুক্ত একখানি সরল সকল-বোধ্য পুস্তক লিখিতে তিনি অনুরুদ্ধ হইলেন।

অধ্যাপক হানে (Haney) প্রণীত History of Economic Thought গ্রন্থের Recent Economic Thought in the United States and its Background অধ্যায়ে আমেরিকার সংরক্ষণ-নীতি ও বৈষয়িক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রথম হইতেই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু "সিভিল ওয়ার" অর্থাৎ গৃহবিবাদের (১৮৬৬-৭০) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—

"All the time, however, English Economics formed the basis for such small teaching as there was. Men had little interest in Political Economy. But in the generation following Civil War times, there came a rush of great economic problems—notably the tariff and monetary matters—a considerable growth of interest in economics, and with these, a dominance of the English classical theories. * * * About the year 1885 however the beginning of a new era in American economic thought appeared. Among the more general grounds for the change were great industrial development like the rise of railway and corporation problems, and the very narrowness and dogmatism of the current economics, which invited reaction."

যে অল্প কিছু ধনবিজ্ঞান শিখান হইত তাহা ইংরাজি বার্ত্তাশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই হইত। অর্থশাস্ত্রের প্রতি লোকের বেশী আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু গৃহবিবাদের পরে বিষম অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে লোকের মন ঐ সমস্যার সমাধানের দিকে ঝুঁকিল। ১৮৮৫ সাল বরাবর আমেরিকার অর্থচিন্তায় একটা নবযুগের আবির্ভাব হইল। পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ রেলওয়ে ও সমবায় প্রথার প্রবর্ত্তন এবং চল্‌তি অর্থতত্ত্বের সঙ্কীর্ণতা ও বাঁধা-পথে চলিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।

দেখা যাইতেছে যে, অল্পকাল হইল ধন-বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তা এবং ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রচার বিস্তৃত ও গভীরভাবে আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকায় যে প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে তাহা প্রত্যেক দেশেরই অনুকরণীয়। ইয়াঙ্কিরা ধন-বিজ্ঞানের তথাকথিত "সাধারণ" নিয়ম প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বদেশের বাস্তব অনুষ্ঠানসমূহের বিশ্লেষণে এবং বৈষয়িক তথ্যসমূহের সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে "আমেরিকান ইকনমিক এ্যাসোসিয়েশন" নামে এক বৈষয়িক-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—(১) ধনবিজ্ঞান বিষয়ক অনুসন্ধানের সাহায্য প্রদান, (২) ধনবিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য প্রচার, (৩) ধন-বিষয়ক আলোচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, (৪) নানাবিধ বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা। পরিষৎ প্রচার করিলেন :—

"We believe that political economy as a science is still in its early stage of its development. While we appreciate the work of former economists, we look not so much to speculation as to the historical and statistical study of actual conditions of economic life for the satisfactory accomplishment of that development."

আমাদের বিশ্বাস যে, বার্ত্তাশাস্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে এখনও অপরিণত। পূর্ব্বজ বার্ত্তাশাস্ত্রীদের প্রচেষ্টার মূল্য অনুভব করিয়াও আমরা তত্ত্বপ্রচার অপেক্ষা বিষয়ের ও ঘটনার ইতিহাস ও তালিকা সংগ্রহ করিয়া বাস্তব জীবনের আর্থিক অবস্থার তত্ত্বনির্ণয় দ্বারা শাস্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গঠনের দিকে বেশী ঝোঁক দিতেছি।

আমরা আমাদের ১৯০৫ সালকে আমেরিকার ১৮৭০ অথবা ১৮৮৫ সালের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। বলা বাহুল্য, যাঁহারা বাঙ্গালাদেশের এবং বঙ্গের বাহিরে সমগ্র ভারতের বৈষয়িক চিন্তাধারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও আমাদের সাহিত্যসেবীগণের চিন্তা ও গবেষণা অধিকাংশই বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমাদের ধনবিজ্ঞানবিৎ লেখক ও কর্ম্মীরা আর বিলাতী অথবা অন্য কোন ইয়োরোপীয় জাতির প্রচারিত ধন-বিজ্ঞান গ্রন্থের দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন না। তাহার পরিবর্ত্তে ইহাঁরা "আমেরিকান বৈষয়িক-সাহিত্য-পরিষদে"র ন্যায় স্বদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, পারিবারিক আয়ব্যয়, পল্লীজীবন, ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য ও তালিকা এবং ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আমাদের চিন্তা "এ্যাবষ্ট্র্যাক্ট", অলীক ও নীরস না থাকিয়া ক্রমশঃ কংক্রিট, সরস, যথার্থ ও বাস্তব হইতেছে। লিষ্টের "National System" অনুযায়ী "ভারতীয় স্বদেশী ধন-বিজ্ঞান" প্রণীত হইবার উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে, বলা যাইতে পারে।

বিগত ৩০ বৎসরের ভিতর আমেরিকায় এইরূপ কংক্রিট সমস্যা এবং বাস্তব ঘটনা লইয়া চিন্তাশীল লেখকেরা গবেষণা করিয়াছেন। কোন প্রকার থিয়রি বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র না হইয়া ইহাঁরা প্রত্যেক সমস্যা ও তথ্য স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের

প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানবিৎ লেস্‌লি (Cliffe Leslie) যুক্তরাজ্যের আধুনিক ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ১৮৮০ সালে লিখিয়াছিলেন :—

"The men best qualified to stand in the front rank of American Economists are not the authors of systems or general theories or text-books of principles, but writers on special subjects. Only since the Civil War has America begun seriously to apply its mind to economic questions. * * * Many of the best economic essays the last decade has produced will be found in the pages of American periodicals. * * * In the perfection of its economic statistics America leaves England behind."

আমেরিকার বার্ত্তাশাস্ত্রীদের পুরোবর্ত্তী হইবার উপযুক্ত তাঁহারা নহেন যাঁহারা একটা প্রণালী বা সাধারণ তত্ত্ব বা মতবাদ সম্বন্ধে বই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যাঁহারা একটা বিশেষ বিষয়ে অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গৃহবিবাদের পর হইতে আমেরিকা ধন-বিজ্ঞানের দিকে মন ফিরাইয়াছে। এসম্বন্ধের অধিকাংশ প্রবন্ধ সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। ধনবিজ্ঞান সম্পর্কীয় বিষয়ের ঘটনা-তালিকা সংগ্রহে আমেরিকা ইংলণ্ডকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে।

বৈষয়িক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহের যুগ

কেবল আমেরিকা কেন, আজকাল জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, "abstract speculative economics"এর পরিবর্ত্তে "historical" এবং "statistical" আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল আলোচনাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকেও শিখান হয়। কিন্তু ভারতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্য্যন্ত ভারতীয় আর্থিক অবস্থার ইতিহাস অথবা বর্ত্তমান ভারতের আর্থিক অবস্থা শিখান হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রেরা দেশের যাবতীয় কৃষিবিষয়ক, ব্যবসাবিষয়ক এবং শিল্পবিষয়ক অনুষ্ঠান ও কর্ম্মকেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যা যথার্থ ভাবে জাতীয়জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। সঙ্গে-সঙ্গে কি কি ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া আমাদের আর্থিক অবস্থা বিগত ৩০০ বৎসরে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহা না বুঝিলে ধন-বিজ্ঞান শিক্ষায় আমাদের ছাত্রেরা রস ও আনন্দ পাইবে না। "ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের আলোচনা" এবং বর্ত্তমান অবস্থার "তালিকা ও তথ্যসংগ্রহ" প্রথমেই আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের "সাধারণ নিয়ম" আবিষ্কার করিবার জন্য এই ভাবেই অগ্রসর হইতে হয়।

বিলাতে দেখিয়াছি, বুথ সাহেব Life and Labour in London গ্রন্থে লণ্ডনের প্রত্যেক শ্রমজীবীর পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তাশীল কর্ম্মী ও লেখক বিলাতে আজকাল অনেক। আমেরিকায়ও এইরূপ কর্ম্মপ্রণালীর প্রভাব বিশেষরূপেই লক্ষ্য করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন-বিজ্ঞান চর্চ্চায় এই লক্ষণ দেখিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে যাঁহারা দেশের কথা আলোচনা করিতেছেন তাঁহারাও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বিস্তৃত ক্ষেত্রের আলোচনা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র "ইণ্টেন্সিভ্ ষ্টাডি" অর্থাৎ "সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে গভীরতর বিশ্লেষণ" সুরু হইয়াছে। ভ্যালু, রেণ্ট, ইউটিলিটি ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের বিশ্লেষণ এবং দার্শনিক তত্ত্বের আড়ম্বর প্রায়ই দেখিতে পাই না।

"র‍্যাসেলসেজ ফাউণ্ডেশ্যন" নামক এক পরিষৎ নিউইয়র্কে কয়েক

বৎসর হইতে কর্ম্ম করিতেছেন। ইহাঁরা জনগণের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের প্রকাশিত কয়েকখানা গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ইহা হইতে চিন্তার ধারা বুঝা যাইবে।—

1. Women in the Book-binding Trade. (মেয়ে দপ্তরী)।
2. Artificial Flower makers. (কৃত্রিম ফুল-শিল্পে মেয়েদের জীবন)।
3. Saleswomen in mercantile stores. (বড় বড় দোকানে নারী কর্ম্মচারী)।
4. The Standard of living among Workingmen's Families in New York City. (নিউ-ইয়র্কের শ্রমজীবীদিগের পারিবারিক আয় ব্যয়)।
5. Medical Inspection of Schools. (বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা)।
6. One thousand Homeless Men. (এক হাজার গৃহহীন পুরুষ)।
7. The Almshouse. (দরিদ্রের সেবাশ্রম)।
8. Women and the Trades. (ব্যবসায়ে নারীজাতি)।

"মেয়ে দপ্তরী" গ্রন্থের বিস্তৃত সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

1. Introductory. (ভূমিকা)।
2. The Book-binding Trade. (দপ্তরীগিরি)।
   (a) The Process of Binding. (দপ্তরীর কাজ)
   (b) Branches of the Trade. (দপ্তরীগিরির নানা বিষয়)।

(c) The Trade in New York. (নিউইয়র্কের দপ্তরী)।

(d) Nativity of Bindery Women. (মেয়ে দপ্তরীর জন্ম-তালিকা)।

3. Women's work in the Binderies. (মেয়েদের কাজ)।

4. Wages and Home Conditions. (বেতন ও ঘরকন্না)।

5. Irregularity of Employment. (সাময়িক কর্ম্মাভাব)।

6. Overtime and the Factory Laws. (কারখানার আইন)।

7. Collective Bargaining in the Bindery Trade. (যৌথ চুক্তি)।

8. Teaching girls the trade. (দপ্তরী মহলে বিদ্যাপ্রচার)।

9. Summary and outlook. (উপসংহার)।

সেমিনার ও পরীক্ষা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রণালী বুঝিবার জন্য অধ্যাপক সেলিগম্যান এবং অধ্যাপক সীগারের অধ্যাপনা দেখিলাম। ইঁহাদের সেমিনার-বিভাগের পি-এইচ ডি-ছাত্রগণের মৌলিক অনুসন্ধান এবং স্ব-চিন্তিত প্রবন্ধ রচনার প্রণালীও বুঝিবার চেষ্টা করা গেল। সেমিনার-বিভাগে দেখিলাম—ছাত্রেরা যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় বর্ত্তমান বৈষয়িক সমস্যা বাছিয়া লইয়াছে। সেই সম্বন্ধে মত সংগ্রহ, মত সমালোচনা এবং স্বচিন্তিত মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলিতেছে। রেলওয়ে, দোকানদারী, মূল্যবৃদ্ধি, খাজনা আদায়, ভূমিস্বত্ব, ঋণদান, মাখন তৈয়ারী করিবার প্রণালী, ইত্যাদি বিষয় একএকজন ছাত্র স্বকীয় থীসিস বা প্রবন্ধ রচনার জন্য গ্রহণ করিয়াছে। দেখিলাম বর্ত্তমানে—কংগ্রেস, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রশাসন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ যে

সমুদয় প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও ঠিক সেই সকল সমস্যাই সমাধান করিবার ভার লইয়াছে। কাজেই ধন-বিজ্ঞান আর নীরস নয়—প্রকৃত বাস্তবজীবনের সহায়।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা হইয়া গেল। একখানা প্রশ্নপত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান কি উপায়ে সরস ও সজীবভাবে শিখান যাইতে পারে তাহার পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়।—

1. State the leading principles of the Democratic platform of 1908 and compare it with the doctrines of the Progressive platform of 1912.

2. Review the "Struggles for Emancipation" as described by Ostro Gorski in his "Democracy and the Organisation of Political Parties."

3. Discuss the use of money in the campaigns of 1896 and 1904 and enumerate the chief types of legislation as designed to control the money in elections.

4. What, in your opinion, is the underlying doctrine of "The New Freedom," and how is it applied to the tariff, the trust, and banking?

বর্ত্তমান সমস্যার আলোচনা, সমস্যাসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশ নির্দ্ধারণ করা, তথ্যসংগ্রহ, তালিকাসংগ্রহ, সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে গভীরতর বিশ্লেষণ, থিয়রি বা তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র না হওয়া—এই সমুদয় লক্ষণ আমেরিকার সকল চিন্তাক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে। কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক গিডিংসের তত্ত্বাবধানেও

এইরূপ আলোচনা বিশেষরূপেই হইয়া থাকে। একব্যক্তি নিউইয়র্ক নগরের কোন এক রাস্তার উপর যতগুলি গৃহ আছে তাহার অধিবাসী-দিগের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণের ফল The Sociology of a New York City Block নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

নায়াগ্রা ঝোরা

পুলম্যান-কার

দুই সপ্তাহ মাত্র নিউইয়র্কে থাকার ইচ্ছা ছিল—থাকা হইল দুই মাস! সেইরূপ ইংল্যাণ্ডে থাকিবার ইচ্ছা ছিল মাত্র ছয় সপ্তাহ—কিন্তু কাটাইয়াছি পুরা ছয় মাস। এই হিসাবে চলিলে পর্য্যটন-লীলা কোন দিন সমাপ্ত হইবে কি না সন্দেহ।

দুই মাসের ভিতর নগর ছাড়াইয়া বেশী দূর কোন দিনই আসি নাই। এক দিন বোটানিক্যাল উদ্যানে অনেকক্ষণ কাটাইয়াছি—ইহা নগরের সীমার বহির্ভাগে অবস্থিত। আর একদিন নগর হইতে প্রায় ১৫।২০ মাইল দূরে একজন উকীলের বাগান বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমেরিকার রেলগাড়ী দেখি নাই।

জগৎপ্রসিদ্ধ নায়াগ্রার জলপ্রপাত দেখিবার সুযোগ জুটিল। ফেরি-ষ্টীমারে হাড্‌সন নদী পার হইলাম—বেশীক্ষণ লাগিল না। পরে রেল। আমেরিকার রেলযাত্রীদের আরাম সম্বন্ধে বহু গল্প শুনিয়াছি। একদিন একজন রুশ রুশিয়ার বৈষয়িক উন্নতির গল্প করিতে করিতে বলিতেছিলেন—"আর কি চাহেন মহাশয়? আমরা আমেরিকার "পুলম্যান্-কার" পর্য্যন্ত রুশিয়ায় চালাইতেছি। ইয়োরোপের আর কোন দেশে পুলম্যান্-কার এখনও প্রচলিত হয় নাই। রুশিয়া কি সত্য সত্যই

পশ্চাৎপদ ?” কাজেই গাড়ীতে চড়িবামাত্র পুল্‌ম্যান্‌কারের মহিমা বুঝিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ছেলেবেলায় ষ্টীমারের ভিতর এঞ্জিনচলা দেখিবার জন্য কে না ব্যস্ত হইয়াছে ? পাড়াগাঁয়ের লোক প্রথম প্রথম রেলগাড়ী দেখিয়া কতই না বিস্মিত হয়! পুল্‌ম্যান্‌-কার (Pullman Car) কি বস্তু তাহা জানিবার ইচ্ছাও কতকটা সেইরূপই দাঁড়াইল। পুল্‌ম্যান্‌ নামক এক ইয়াঙ্কি এইরূপ গাড়ী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এইজন্য গাড়ীর নাম পুল্‌ম্যান্‌-কার। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কিছু বুঝা গেল না। অন্যান্য কামরার আস্‌বাবপত্র যেরূপ এই পুল্‌ম্যান্‌-কামরারও ঠিক তাহাই।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় গাড়ী ছাড়িল। গাড়ীর ভিতর একজন সেবক বসিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো। বুঝিলাম—মামুলি কামরাকে পুল্‌ম্যান্‌-কামরায় পরিণত করাই তাহার কার্য্য।

আমাদের দেশে রেলগাড়ীর ভিতরে উপরিভাগেও বিছানা পাতিয়া শুইবার ব্যবস্থা করা যায়। এইখানে দেখিলাম, ঠিক সেই স্থানে চাবি দিয়া নিগ্রোসেবক একটা বাক্স খুলিল। তাহার মধ্যে বালিশ, তোষক, লেপ, বিছানার চাদর ইত্যাদি রহিয়াছে। এই বাক্সই আবার উপরিভাগের একটা খাটে পরিণত হইল। এদিকে নীচে যে সকল চেয়ারে আমরা সাম্‌নাসাম্‌নি বসিয়া আছি তাহার দুই একটা লইয়া এক একটা খাট তৈয়ারী হইতে থাকিল। এইরূপে কামরার দুই ধারে উপরিভাগে ছয়টা এবং নিম্নভাগে ছয়টা বিছানা প্রস্তুত করা যায়। প্রত্যেক বিছানাই সুবিস্তৃত ও সুপ্রশস্ত—কোনরূপ অসুবিধা ঘটিবার কারণ নাই।

এই বারটা বিছানাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য মাথার ও পায়ের কাছে দুইটা করিয়া আল্‌গা কাঠের দেওয়াল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। অধিকন্তু সম্মুখ দিকে মোটা কাপড়ের পরদা ঝুলিতে

থাকে। ফলতঃ গাড়ীর ভিতর স্বতন্ত্র বারটা কুঠুরী তৈয়ারী করা যায়। সমস্ত রাত্রি বসিয়া সেবক পাহারা দেয়। সকাল হইবামাত্র পুল্‌ম্যান্‌-কারকে আবার যথাপূর্ব্বং তথাপরং করা হয়।

কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, সাহিত্যসম্মিলন, শিক্ষাসম্মিলন ইত্যাদি উপ-লক্ষ্যে আজকাল ভারতবাসী নানাস্থানে বেড়াইতে যান। কংগ্রেস সম্মিলনাদির প্রবর্ত্তকেরা "ডেলিগেট"দিগকে নিমন্ত্রণ করিবার সময়ে পত্রের ভিতর "বিশেষ দ্রষ্টব্য"ভাবে জানাইয়া দেন—"মহাশয়, আসিবার সময় মশারি বিছানা ইত্যাদি সঙ্গে আনিতে ভুলিবেন না"। বিছানা ও গামছা লইয়া চলাফেরা করা আমাদের একটা জাতিগত অভ্যাস।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার কোথাও বিছানা বালিশ মশারি গামছা ইত্যাদি লইয়া চলাফেরা করিতে হয় না। সকল হোটেলেই লোক-জনকে এই সমস্ত বস্তু জোগান হয়। এক কাপড়ে পর্য্যটন করিতে বাহির হইলেও বিশেষ কোন কষ্টভোগ করিতে হয় না। কোন কোন স্থানে স্নানাগারে ব্যবহার করিবার জন্য পোষাক এবং চটিজুতা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কাজেই পর্য্যটকদিগের অনর্থক মোট বহিতে হয় না। একটা মস্ত সুবিধা সন্দেহ নাই—কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলেই নানাপ্রকার ছোঁয়াচে রোগ শরীরে প্রবেশ করিবার আশঙ্কা খুব বেশী।

এক বিষয়ে নিউইয়র্করাষ্ট্র অত্যন্ত কড়া নিয়ম করিয়াছেন। পাশ্চাত্য-সমাজে এক গ্লাসে হাজার লোক জলপান করে। আমাদের জাতি-ভেদের দেশে ইহা হইবার জো নাই—আমরা "স্পর্শ" ফল মানিয়া চলি। আমেরিকায় দেখিতেছি নিউইয়র্ক সরকার আমাদের ছুঁৎমার্গই অব-লম্বন করিবার জন্য আইনজারি করিয়াছেন। এই বিধানে একজন লোক যে গ্লাসে জলপান করিবে অপর কোন লোক সেই গ্লাসে জল পান করিতে পারিবে না। রেলগাড়ীতে এই জন্য কাগজের গ্লাস ব্যবহার করা

হইয়া থাকে—প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র গ্লাসে পিপাসা মিটাইয়া থাকে। জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে।

পর্য্যটকগণ আর এক কারণে এই সকল দেশে অনর্থক পরিশ্রম ও উদ্বেগ হইতে অব্যাহতি পায়। ইহাদিগকে বেশী মোট বহিতে হয় না। মালপত্র বহিবার জন্য বহু ভারবাহক সমিতি আছে। সাধারণতঃ সেগুলিকে Express Company or Transportation Agency ইত্যাদি বলা হয়। গৃহ হইতে রওনা হইবার সময় কোন এক সমিতিকে টেলিফোনে বলিয়া দিলে তাহাদের লোক আসিয়া মাল লইয়া যায়। তাহারাই পর্য্যটকের কথামত যথাস্থানে এগুলি পাঠাইয়া দেয়। পর্য্যটক হয় ত এক হাজার মাইল ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার হাতে সামান্য একটা হ্যাণ্ডব্যাগ পর্য্যন্ত না থাকিলেও ক্ষতি নাই। রাস্তায় যাহা কিছু প্রয়োজন সবই গাড়ীর ভিতর পাওয়া যাইবে এবং যথাস্থানে পৌছিয়া ভারবাহক সমিতির আফিসে টেলিফোন করিলে তাহারা মালগুলি নিজের নিকট দিয়া যাইবে। খরচ কিছু বেশী—কিন্তু আরাম যৎপরোনাস্তি। এদেশে রেলে বেড়াইবার সমান সুখ নাই। আমাদের দেশে রেলে যাইতে হইলে তিন সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। ব্যবসাদার জাতিরা সাংসারিক জীবনটাকে যথা-সম্ভব সহজ করিয়া তুলিয়াছে।

যাহা হউক পুলম্যানকারও দেখা হইল—Express Company-এর সুবিধাও ভোগ করিলাম। ইহা এক প্রকার কলিযুগের চরম সুখ আর কি ?

গাড়ী বেশ দ্রুত চলিতেছে। কিন্তু ভিতরে বসিয়া মনে হয় বেগ বড় বেশী নয়। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল—গাড়ীর স্প্রিংগুলি

খুব ভাল—এইজন্য ঝাঁকুনি অতি অল্প। অবশ্য ভারতবর্ষের অনেক গাড়ী আজকাল এইরূপই বটে।

সমস্ত রাত্রি বরফ পড়িতেছে—মাঠ ভরিয়া কেবল তুষার দেখিতে পাইতেছি। ষ্টেসনের নিকট যে সকল বাড়ীঘর দেখিতে পাইলাম সকলের ছাদ শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভূমি প্রায়ই অসমতল এবং পার্ব্বত্য ও তরুহীন। শীতকালে সবুজ রং কোথাও নাই—ঘাস পাতা দেখিবার জো নাই। বিলাতেও এই অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি। রেল রাস্তার ধারে যে দুই একটা নগর রাত্রে চোখে পড়িল—সবই নিউ-ইয়র্কের ছাঁচে ঢালা—আয়তনে ক্ষুদ্র।

সাড়ে চারিশত মাইল নয় ঘণ্টায় আসিলাম। কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ প্রায় ১৫ ঘণ্টার পথ—দূরত্ব একই।

কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত প্রথমশ্রেণীর ভাড়া ৪০৲। এখানে আরাম বেশী অথচ ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম। নিউ-ইয়র্ক হইতে নায়াগ্রা পর্য্যন্ত সাধারণ ভাড়া ২৪৲। তাহার উপর পুল্‌ম্যান-কারে শুইবার জন্য ৬৲।

ঈরিহ্রদের উপর বাফেলো নগর। ভোরে এখানে গাড়ী বদলাইতে হইল। এক ঘণ্টার ভিতর নায়াগ্রা-প্রপাত-নগরে পৌঁছিলাম। রাস্তায় প্রায় ছয় ইঞ্চি গভীর বরফ পড়িয়াছে। চারিদিকে শ্বেতবর্ণ বালুকা-রাশির আবরণ বোধ হইতেছে। ইহা একপ্রকার বরফের মরুভূমি। মিশরের আসোয়ান ভূমি মনে পড়িল। সেখানে গরম—এখানে ঠাণ্ডা।

রাস্তায় চাকাওয়ালা গাড়ী চলিতেছে না। দেখিতেছি—বরফের উপর চলিবার জন্য নূতন এক প্রকার গাড়ীর ব্যবহার হয়। গোলাকার চাকার পরিবর্ত্তে সোজা কাঠ বা লোহার পাত রাস্তার উপর সমান্তরাল ভাবে ঘষিতে পারে। গাড়ী এই পাতের উপর বসান। ঘোড়া গাড়ী

টানে—বরফের উপর দিয়া এই পাত অতি সহজে চলিতে পারে। এইরূপ গাড়ীকে "শ্লেজ" (Sledge) বলে। প্রাথমিক ইংরাজী পাঠে এইরূপ গাড়ীর বিবরণ শুনা গিয়াছিল।

বরফ পড়ার দৃশ্য নিউইয়র্কেও কয়েক দিন দেখিয়াছি। বিন্দু মাত্র বৃষ্টি নাই—এমন কি শীতও তত বেশী নয়—অথচ ফিন্ ফিন্ করিয়া তূলার গুঁড়ার মত শ্বেত বিন্দু আকাশ ছাইয়া ফেলে। বৃষ্টির সময়ে আকাশ যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকার দেখায়—তুষার পাতের সময়েও আকাশ খানিকটা কুয়াশাচ্ছন্ন বোধ হয়—দূরের জিনিষ দেখা যায় না। বৃষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর—কিন্তু বরফ পড়ে নিঃশব্দে।

এক হাজার পাগ্‌লা ঝোরা

বাঙ্গালী শোয়া নদী দেখিতে পায়—নদীর নৃত্য কখনও দেখে না। আমরা সমতল ভূমিতে বাস করি—ঝোরা, ঝরণা, জলপ্রপাত, falls ইত্যাদি আমাদের চোখে পড়ে না। রাঁচি হাজারিবাগ পুরুলিয়ার পাহাড়, সাহেবগঞ্জ, জামালপুর, রাজমহলের পাহাড় অথবা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশের, পাহাড়, গৌহাটী কামাখ্যা ও অসমিয়াদেশের পাহাড় এবং উড্র-কলিঙ্গ উৎকলের পাহাড় বাঙ্গালার প্রাচীর স্বরূপ। বাঙ্গালী সাধারণতঃ বঙ্গদেশকে 'নদীমাতৃক' বলিয়া জানে—এই পাহাড়গুলির কথা বেশী মনে রাখে না। যাহারা কর্ম্ম বা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বঙ্গের এই সমুদয় সীমান্ত প্রদেশে বাস করেন তাঁহারা বর্ষাকালে অন্ততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যতটিনী এবং জল-প্রপাত দেখিবার সুযোগ পান। মাঝে মাঝে দামোদরের বন্যা আসিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীকে জলপ্রপাত এবং স্রোতস্বতীর তাণ্ডবলীলা স্মরণ করাইয়া দেয়। আর যাঁহারা বাঙ্গালার নদী উপবন দীঘি দুর্গ ভ্রমণ করিয়া জন্মভূমির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা বঙ্গের উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে মধ্যভাগে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু ঝোরার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন।

ভারতের ঝরণা

ভারতবর্ষের ভিতর বাঙ্গালাদেশের বাহিরে অসংখ্য জলপ্রপাত আছে। দক্ষিণে কাবেরী-প্রপাত আজকাল জগৎপ্রসিদ্ধ। নগাধিরাজ হিমাচল ত কোটি কোটি ঝোরার জন্মদাতা। জব্বলপুরের মর্ম্মর শৈল, মধ্যভারতের অমরকণ্টক উপত্যকা এবং অগস্ত্যশাসিত গিরিবর ভারত-প্রসিদ্ধ ঝরণার আশ্রয়স্থল। বাঙ্গালীর নিকট দার্জ্জিলিঙ্গ পাহাড়ের

২১৫ পৃষ্ঠা

১২। নায়াগ্রা প্রবাহ

পাগ্‌লাঝোরাও সম্প্রতি সুপরিচিত। হিমালয়ের ঝরণা সম্বন্ধে আমাদের কবি গাহিতেছেন—

"নির্ঝরের ঝর ঝরে পত্রের মর্ম্মরে
শুনিবে স্বরগ গীত।"

নায়াগ্রা (Niagara) একটা নদীর নাম। ঈরি হ্রদ হইতে বাহির হইয়া এই স্রোতস্বতী অণ্টরিয়ো হ্রদে মিশিয়াছে। নদীর দৈর্ঘ্য ৩৬ মাইল মাত্র। এই পথ বহিয়া যাইতে নদীকে ৩৩৬ ফিট নিম্নভাগে গড়াইতে হয়। কারণ ঈরি হ্রদের জলের উপরিভাগ সাধারণ সমতল ক্ষেত্র হইতে ৫৬৮ ফিট উর্দ্ধে এবং অণ্টরিয়ো হ্রদের জল মাত্র ২৩২ ফিট উর্দ্ধে। কাজেই নায়াগ্রা নদী বা নালা উর্দ্ধতর জলের চৌবাচ্চা হইতে নিম্ন স্তরের চৌবাচ্চায় পড়িয়াছে। নিম্নে নামিবার সিঁড়ি পাঁচটা মাত্র ধাপে বিভক্ত :—

নায়াগ্রা প্রপাত

প্রথম ধাপ— ১৫ ফিট (ঈরি হইতে নিম্নে)
দ্বিতীয় ধাপ— ৫৫ ফিট (নদীর গত ক্রমশঃ গড়ান—এই ভাবে ২২ মাইল)
তৃতীয় ধাপ— ১৬১ ফিট (এই খানেই লম্ফন বা প্রপাত)
চতুর্থ ধাপ— ৯৮ ফিট } এই অংশ ১৪ মাইল।
পঞ্চম ধাপ— ৭ ফিট }

দেখা গেল নায়াগ্রা নদীর তৃতীয় ধাপের নাম নায়াগ্রা প্রপাত (Niagara Falls)। বর্ত্তমানে এই প্রপাতের দুই ধারে দুইটি বর্দ্ধিষ্ট নগর।' একটি যুক্তরাষ্ট্রের অধীন—নিউইয়র্ক প্রদেশরাষ্ট্রের অন্তর্গত। অপরটি ক্যানাডা-রাষ্ট্রের অধীন। দুইয়ের নামই 'নায়াগ্রা প্রপাত নগর।' নায়াগ্রা নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে মোহনা পর্য্যন্ত ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংলণ্ডে ১৮১৫ সালে

সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহার ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশ ক্যানাডা এবং স্বাধীন যুক্ত রাষ্ট্রের সীমা বিভাগ এইরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

ক্যানাডার দিক হইতেও নায়াগ্রাপ্রপাত দেখিতে আসা যায়—বহুকাল পর্য্যন্ত লোকেরা ঐ অঞ্চল হইতেই দেখিতে আসিত—ফরাসী ঔপনিবেশিকেরা সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্যানাডার দিক হইতেই এই প্রপাত আবিষ্কার করে।

যুক্তরাষ্ট্রের নায়াগ্রাপ্রপাত নগরের এক হোটেলে আড্ডা গাড়িয়াছি। শ্লেজ (sledge) শকটে বরফের উপর দিয়া ঝোরা দেখিতে বাহির হইলাম। নগরের ভিতর নূতনত্ব কিছু নাই। চারিদিকে বরফের স্তূপ চুণের গাদা অথবা বালুকারাশির মত দেখাইতেছে। একটা ক্ষুদ্র সেতু পার হইয়া দ্বীপের ভিতরে আসিলাম। সেতুর নীচে ঝোরার এক অংশ। এখান হইতেই ঝরণার শব্দ শুনিতে পাইতেছি।

বরফের বাগান

দ্বীপের নাম Goat Island বা ছাগল দ্বীপ। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপে এক ব্যক্তি কতকগুলি ছাগল রাখিয়াছিল। লোকে বলে এই জন্য দ্বীপের নাম এইরূপ। জানুয়ারী মাসের শেষ—কোন গাছে একটাও পাতা নাই—অসংখ্য মেপ্‌ল বৃক্ষ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভারতবর্ষের যে কোন পর্ব্বত পৃষ্ঠে এইরূপ বৃক্ষশ্রেণী দেখা যায়। শুনিলাম, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে দ্বীপের দৃশ্য অতি মনোহর। এখন ইহার সর্ব্ব অঙ্গ বরফে ঢাকা। বৃক্ষগুলির শাখা প্রশাখা এবং শিরোদেশও তুষারাবৃত। জমা বরফের দ্বারা গাছের ডাল পালাগুলির উপর উজ্জল শ্বেতবর্ণ পোষাক সৃষ্ট হইয়াছে। যেন চারিদিকে মসৃণ কাচের বাগান দেখিতেছি।

এই দ্বীপ আদিম ইণ্ডিয়ান্ জাতিসমূহের ধর্ম্মজীবনে বিশেষ আদরণীয় ছিল। এখানে তাহাদের উৎসব, মেলা, ধর্ম্মকর্ম্ম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত

২১৬ পৃষ্ঠা

১৩। নায়াগ্রা ঝোরা —ক্যানাডার কিনারা।

হইত। প্রকৃতির এই রম্য স্থানে সরল স্বভাব নরনারীগণ তাহাদের তীর্থক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিল। ইণ্ডিয়ানদের ঝরণাপূজা আমাদের গঙ্গা-পূজা এবং মিশরবাসীর নীল পূজার অনুরূপ। এই সকল অনুষ্ঠানের অনেকটা বাহ্যসাদৃশ্য সহজেই বুঝিতে পারি; কিন্তু ভিতরকার কথা একরূপ কি না গভীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

বিলাতী কবি পোপ ইণ্ডিয়ানদের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"And the poor Indian whose untutored mind
Sees God in clouds and hears him in the wind."

আজকালকার নৃতত্ত্ববিদেরা ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে কিছু নূতন মত প্রচার করিতেছেন। অধ্যাপক হ্যাডন তাঁহার The Soul of a Red Indian রচনায় তথাকথিত অসভ্য ও "untutored" জাতির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য দিয়াছেন।

ছাগল-দ্বীপ শীতকালে বরফের উদ্যানে পরিণত হয়। এই দৃশ্য সম্বন্ধে একজন কবি লিখিয়াছেন যে, প্রকৃতি

"Wasteful decks the branches bare
With icy diamonds rich and rare"

এই শ্বেত তুষারাবৃত বৃক্ষরাজির তল দিয়া দ্বীপের এক কোণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখান হইতে সম্মুখে ক্যানাডার পার এবং অতি নিম্নে নায়াগ্রানদী দেখা গেল; নদীর অধিকাংশই জমিয়া গিয়াছে—বড় বড় বরফের চাপ জলের উপর দুধের সরের মত ভাসিতেছে; যেখানে বরফের স্তূপ নাই সেখানে নদীর স্রোত দেখিতে পাইতেছি। বরফের তল দিয়া জল দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝোরার পতন ও লম্ফনের আওয়াজ কাণে প্রবেশ করিতেছে; যেখানে দাঁড়াইয়া আছি তাহার এক হাত দূরেই নায়াগ্রা ১৬১ ফিট নীচে লাফাইয়া

পড়িতেছে। বর্ষাকালে ২০০ পাগ্‌লাঝোরা একত্রিত হইলে যেরূপ গর্জ্জন ও জল-স্রোত হয় নায়াগ্রাপ্রপাতের এই দৃশ্য সেইরূপ। এখন শীতকাল —জল অনেকস্থলেই জমিয়া গিয়াছে—কাজেই সমগ্র প্রপাতের প্রভাব বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া উত্তালতরঙ্গ সিন্ধুর উন্মত্ত কোলাহল স্মরণ করিলাম। মনে হইল, সাগরের উপর ভাসিতেছি এবং সমুদ্রে ঝড় বহিতেছে। নির্ঝরের সঙ্গীত যাহার কর্ণে একবার প্রবেশ করিয়াছে সে তাহা ভুলিতে পারিবে না। নায়াগ্রা প্রপাতের সঙ্গীতও চিরকাল মনে থাকিবে।

রামধনু

সাগর সঙ্গীতের কথা ভাবিতে ভাবিতে আর একটা সাগর দৃশ্য মনে পড়িল। তরঙ্গবিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ভিতর সূর্য্যরশ্মি রামধনু সৃষ্টি করে। সমুদ্রে আসিবার পূর্ব্বে রামধনু কেবলমাত্র মেঘাচ্ছন্ন আকাশেই দেখিয়াছিলাম, জাহাজে বসিয়া রামধনু সাগরাম্বুর অতি সন্নিকটে দেখিয়াছি। আর এইখানে আমার দশ হাত দূরে সুবিশাল সুস্পষ্ট রামধনু দেখিতেছি। ইহা কেবল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নয়। ঊর্দ্ধ স্থান হইতে বহু নিম্নে জল পড়িলে জল পতনের আকার parabola এর অনুরূপ হয়। নায়াগ্রাপ্রপাতেরও জল ১৬১ ফিট নীচে এই আকারে পড়িতেছে। পতনের সঙ্গে সঙ্গে জলকণা কুয়াশা বা ধূমের ন্যায় আকাশে উঠিতেছে। এই কুয়াসার ভিতর সূর্য্যরশ্মি বিচিত্র রামধনু সৃষ্টি করিয়াছে। এই রামধনুর আকার parabolaএর মত।—নিম্নে ইহা নায়াগ্রানদীর জলের নিকট পর্য্যন্ত সোজা পৌঁছিয়াছে—ঊর্দ্ধে সাধারণ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার।

নির্ঝরের সঙ্গীত

বলা বাহুল্য, নায়াগ্রা সম্বন্ধে গত ৩০০ বৎসরের ভিতর নানা লোকে নানা কথা লিখিয়াছেন। নায়াগ্রার গর্জ্জন সম্বন্ধে বিলাতী কবি গোল্ড্‌স্মিথের রচনায় পাই :—

"And Niagara stuns with thundering sound."

১৪। নায়াগ্রা ঝোরা—যুক্তরাষ্ট্রের কিনারা

বজ্র গর্জ্জনের সঙ্গে নায়াগ্রার তুলনা আদিম ইণ্ডিয়ানেরাও করিত। বস্তুত নায়াগ্রা শব্দ ইণ্ডিয়ান্ ভাষায় এই অর্থই প্রকাশ করে। ইংরাজীতে এই শব্দের অর্থ The Thunderer of the Waters. আমাদের পরিভাষায় বজ্রায়ুধ ইন্দ্রদেব নায়াগ্রাস্বরূপ। প্রাচীন ইণ্ডিয়ানেরা প্রকৃতির এইরূপ দেখিয়া ভগবানকে এই মূর্ত্তিতে পূজা করিত। এই গর্জ্জন বা প্রপাতের নাম হইতে তাহারা নদীর নাম, স্থানের নাম এবং নিজ জাতির নামও রাখিয়াছিল।

এই গর্জ্জন-সঙ্গীত সম্বন্ধে আর একজন কবি লিখিয়াছেন:—

"Deep calleth unto Deep, and what are we
That hear the question of the voice sublime?
Oh! What are all the notes that ever rung
From War's vain trumpet by thy thundering side!
Yea, what is all the riot man can make
In his short life to thy unceasing roar!
And yet, hold babbler, what art thou to Him
Who drown'd a world and heaped the waters far
Above its loftiest mountains?—a light wave
That breaks and whispers of its Maker's might."

আর একটি ইয়াঙ্কি কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে:—

"This is Jehovah's fullest organ strain?
I hear the liquid music, rolling, breaking
From the gigantic pipes the great refrain
Bursts on my ravished ear, high thoughts awaking!
The low sub-bass, uprising from the deep

Swells the great pæan as it rolls supernal—
Anon, I hear, at one majestic sweep
The diapason of the keys eternal."

ইংরাজ সাহিত্যবীর ডিকেন্সও নায়াগ্রা-প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন :—

"Niagara was at once stamped upon my heart, an image of beauty to remain there, changeless and indelible, until its pulses ceased to beat forever. I think in every quiet season now, still do those waters roll and leap and roar and tumble all day long; still are the rainbows spanning them a hundred feet below. Still, when the Sun is on them do they shine and glow like molten lead. Still, when the day is gloomy, do they fall like snow or seem to crumble away like the front of a great chalk cliff, or roll down the rocks like dense white smoke. But always does the mighty stream appear to die as it comes down, and always from its unfathomable grave arises that tremendous ghost of spray and mist which is never laid."

নায়াগ্রা মাহাত্ম্য বর্ণনায় সুইডেন, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালী সকল দেশের কবিপর্য্যটকগণই নিজ নিজ ক্ষমতা দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। চিত্রশিল্পেও নায়াগ্রা ঝোরা অথবা এই ঝোরা সম্বন্ধে কল্পনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এক ব্যক্তি বলিতেছেন—

"The painter is delighted with Niagara, with the varying forms that challenge his pencil, with the play of

১৫। নায়াগ্রা ঝোরার কাল্পনিক মূর্ত্তি

light that defies his brush. The light of heaven dances upon it in a thousand different hues. To paint the glories that come and go upon the falling, rushing waters, the artist must dip his brush in the rainbow, and when he has done his best, he will not be believed by those who have not seen his subject with their own eyes"

আর একজন চিত্রসমালোচক বলিতেছেন—

"When motion can be expressed by colour, there will be some hope of imparting a joint idea of it; but until that can be done, Niagara must remain unportrayed."

এতক্ষণ পুরাপুরি যুক্তরাষ্ট্রের এলাকাধীন নায়াগ্রাপ্রপাত দেখিলাম। তাহার পর স্লেজে চড়িয়া বরফের বাগানের ভিতর দিয়া ছাগলদ্বীপের আর এক কোণে আসিলাম। এখানকার দৃশ্যও সেইরূপ—সেই গর্জ্জন, সেই জলস্রোত, সেই উন্মাদনা, সেই কুয়াশা, সেই রামধনু। অপর পারে ক্যানাডা। এখানকার জলপ্রপাত প্রথমটার অপেক্ষা চারিগুণ বিস্তৃত। সুতরাং নির্ঝরের ঝর ঝর এখানে চতুর্গুণ। এই ঝোরার অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত—কিয়দংশ মাত্র ক্যানাডা-রাষ্ট্রের সম্পত্তি। ১৮১৫ সালের সন্ধিতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

ছাগলদ্বীপের সমস্তই যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি। এই দ্বীপের দ্বারা নায়াগ্রা নদীর দুই শাখা বিভক্ত হইয়াছে—দুই শাখা হইতে দুইটা ঝোরা নির্গত হয়। নায়াগ্রা ঝোরা বলিলে এই দুইটা ঝোরা বুঝিতে হইবে—একটাকে সাধারণতঃ আমেরিকান ঝোরা অপরটাকে ক্যানাডিয়ান্ ঝোরা

বলে। কিন্তু ক্যানাডার রাষ্ট্রীয় অধিকার কেবলমাত্র একটার কিয়দংশে বিস্তৃত।

এই ছাগল দ্বীপ অণ্টরিয়ো হ্রদ হইতে ১২ মাইল এবং ঈরি হ্রদ হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ছাগলদ্বীপের বক্ষ হইতে নায়াগ্রা নদী দুই শাখায় দুই ঝোরারূপে ১৬১ ফিট খাড়া নিম্নে লাফাইয়া পড়ে। উল্লম্ফনের পর দুই ঝোরার জল একই gorge বা খালের ভিতর দিয়া অণ্টরিয়োর দিকে চলিতে থাকে। এই গভীর খালের ভিতর দিয়া ১২ মাইল চলিলে নায়াগ্রানদীর অবসান হয়। এক ধারে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পার্ব্বত্য কিনারা, অপর ধারে ক্যানাডার উচ্চ পার্ব্বত্য কিনারা। বস্তুতঃ যেন একটা পাথরের মেজে-বাঁধান নৰ্দ্দমার ভিতর দিয়া নায়াগ্রার জল প্রবাহিত হইতেছে বোধ হয়। নীলনদের কোন কোন অংশ এইরূপ।

ছাগলদ্বীপ ঘুরিয়া পুনরায় আমেরিকান ঝোরার নিকটে আসিলাম। বুঝা গেল—গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে দ্বীপটা সমস্তই একটা নন্দনকানন স্বরূপ। এখানে আমোদ প্রমোদ আহার বিহার ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়। প্রাচীন ইণ্ডিয়ানেরা এইখানে তাহাদের বার্ষিক ধর্ম্মমেলার অনুষ্ঠান করিত। ভারতবাসীরা এইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় স্থানে তাহাদের তীর্থক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছে। আধুনিক পাশ্চত্য নরনারীগণ এখানে হোটেল, রেস্তরাঁ, পার্ক, প্রমোদবন, নাচগৃহ ইত্যাদি স্থাপন করিয়া প্রকৃতিপূজা করে। প্রকৃতিপূজক মোটের উপর দুনিয়ার সকলেই—এক এক জাতি এক এক ভাবে।

ঝরণা-পূজা

একটা কাহিনী শুনিলাম। প্রাচীন ইণ্ডিয়ানেরা প্রতি বৎসর নায়াগ্রা-পূজার জন্য একটি করিয়া সুন্দরী বালিকাকে জলাঞ্জলি দিত। বালিকা উৎসাহের সহিত নানা আভরণে ভূষিত হইয়া নৌকাবক্ষে আরোহণ করিত। নৌকার ভীতর জনগণ

২২২ পৃষ্ঠা।

১৬। নায়াগ্রা পূজা বা ইণ্ডিয়ান বালিকার দেহাঞ্জলি

নানাপ্রকার উদ্ভিদ্, পশু ও অন্যান্য দ্রব্য দেবতার জন্য নৈবেদ্যস্বরূপ রাখিয়া দিত। পরে সহাস্য বদনে বালিকা নৌকা ছাড়িয়া আত্মবিসর্জ্জন করিত। গঙ্গাসাগরে শিশু ভাসান কি এইরূপই এক ধর্ম্মানুষ্ঠান নয়? তাহা ছাড়া, নরবলি দানের কাহিনীও আমাদের ধর্ম্মসাহিত্যে পাইয়া থাকি। প্রকৃতিপূজারই ইহা অন্যবিধ অভিব্যক্তি।

একবার কোন প্রবীণ ইণ্ডিয়ানবীরের এক মাত্র কন্যার বিসর্জ্জন স্থিরীকৃত হইল। বালিকাকে যথারীতি বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত করা হইতে লাগিল। পিতা বালিকাকে বিদায় দিল—এই বীরের পরিবারে বালিকা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। পিতা নিদারুণ শোক সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু কাহাকেও মনের ব্যথা প্রকাশ না করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। পরে বিসর্জ্জনের দিন ঝোরার চতুর্দ্দিকে অগণিত নরনারী ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে উপস্থিত। বালিকা নৌকাবক্ষে আত্মত্যাগের উদ্যোগ করিল। নৌকা ভাসিতে ভাসিতে শঙ্কটময় স্থানে উপস্থিত হইবে এমন সময় দেখা গেল, আর একখানা তরণীও ঠিক সেই বিপজ্জনক জলপাকের সন্নিকটে আসিয়াছে। এই তরণীর আরোহী ও বালিকা পরস্পর পরস্পরকে একবার দেখিল—তাহার পর উভয়ই অতলস্পর্শ নদীর অভ্যন্তরে লুকাইয়া গেল।

এইরূপ বেদনামূলক আখ্যায়িকা প্রাচীন গ্রীক এবং কেল্‌টিক সহিত্যে-ও পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের Persens the Deliverer নামক ইংরাজী নাটক খানিকটা এই ধরণের কথাবস্তু লইয়া গঠিত।

এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া আধুনিক চিত্রকর একটী ছবি আঁকিয়াছেন। আর একজন শিল্পিও নায়াগ্রার এইরূপ নররক্তপিপাসা এবং তাণ্ডবলীলার মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন।

ছাগলদ্বীপ প্রদক্ষিণ করিবার পর স্লেজ গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। এই-বার মোটরে ক্যানাডাভিমুখে যাত্রা করা গেল। যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্যানাডা যাইতে হইলে একটা বিরাট সেতু পার হইতে হয়। এই সেতু নায়াগ্রাখালের উপর নির্ম্মিত—ইহাতে একটীও স্তম্ভ নাই। এই হিসাবে ইহা একটা দেখিবার জিনিষ। শুনিলাম, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৩০০ ফিট। যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্যানাডায় কিম্বা ক্যানাডা হইতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া আসার জন্য এবং এই সেতু ব্যবহারের জন্য চুঙ্গি ও মাশুল দিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই কাষ্টম হাউসের কর্ম্মচারীরা মোটর ব্যবহারের জন্য ১৲ খাজনা লইয়া একটা টিকেট দিল। এই টিকেট দেখাইয়া ক্যানাডার কর্ম্মচারীগণের নিকট মুক্তি পাইলাম।

ক্যানাডায় কয়েক-ঘণ্টা

ক্যানাডার পারে যাইয়া প্রথমে নদীর স্রোতের সঙ্গে ৩।৪ মাইল অগ্রসর হইলাম। এখানে নামিয়া জলের বেগ দেখিবার সুবিধা পাওয়া গেল। উঠা নামা বহু শ্রমসাধ্য বিবেচনা করিয়া এক কোম্পানী তড়িত চালিত গড়ান গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছে। মার্সেলের মেরী-মন্দিরেও এইরূপ কল দেখিয়াছি। এক মিনিটে জলের নিকট উপস্থিত হইলাম! আসিয়াই মনে হইল—কালিম্পঙের পার্ব্বত্য পথ ও স্রোতস্বতী। দার্জ্জিলিঙ শৈলের অপরদিকে রঙ্গিত নদী যে পথে তিস্তা নদীর সঙ্গে মিলিতে অগ্রসর হইয়াছে সেই পথে স্রোতস্বতীর বেগ ও গর্জ্জন স্মরণে আসিল। নায়াগ্রা নদীর বেগ এইখানেই তাহার চরম সীমায় উপস্থিত। শুনিলাম, একজন কাপ্তেন এইখানে সাঁতার দিয়া পার হইতে চেষ্টা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নায়াগ্রার এই ঘুর্ণিপাক দেখিয়া ফিরিলাম। এক্ষণে নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে চলিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ পরে পুনরায় সেতুর

২২৪ পৃষ্ঠা

১৭। নায়াগ্রা প্রপাত—ক্যানাডার পার হইতে

নিকট আসিলাম। এখান হইতে অপর পারে যুক্তরাষ্ট্রের "আমেরিকান ঝোরা" সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। ক্রমশঃ ভিক্টোরিয়া পার্কের ভিতর দিয়া "ক্যানাডিয়ান্ ঝোরার" নিকটবর্ত্তী হইলাম। পথে একটা Electric Power House পড়িল। এই কারখানায় নায়াগ্রাপ্রপাতের বেগ ব্যবহার করিয়া তড়িদ্বেগ প্রস্তুত করা হয়। কারখানায় প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রহরীরা বলিল—"ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে। এজন্য ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্থানেই এই সকল কারখানা এক্ষণে সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। কোন লোকের প্রবেশাধিকার এক্ষণে নাই।" কাজেই জলের ক্ষমতাকে কি উপায়ে তড়িতের শক্তিতে পরিণত করা হয় তাহা বুঝিবার সুযোগ পাওয়া গেল না। নিউইয়র্কের কোন বড় তড়িতের কারখানায় বাষ্প হইতে তড়িৎ প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেখিয়াছি এখানকার যন্ত্রাদি অবশ্য স্বতন্ত্র ধরণের সন্দেহ নাই।

অবশেষে ক্যানাডার পার হইতে ক্যানাডিয়ান্ ঝোরা দেখিবার স্থানে উপস্থিত হইলাম। অপর পারে ছাগলদ্বীপ—এবং তাহার দুই ঝোরা।

এইখানে একটা কোম্পানী বিরাট ঝোরার তল ও পশ্চাৎভাগ হইতে ঝোরা দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। কর্ম্মচারীরা নূতন একটা ওয়াটারপ্রুফ পরাইয়া দিল। ওয়াটারপ্রুফের একটা টুপিও মাথায় পরিলাম। পরে মাটির ভিতরে একটা সুড়ঙ্গে প্রায় ১০০ ফিট নামিলাম। অবশ্য হাঁটিতে হইল না—এলেক্ট্রীসিটি-চালিত উত্তোলন যন্ত্রে উঠা নামা সাধিত হয়। তাহার পর খানিকদূর হাঁটিয়া টানেলের ভিতর চলিতে লাগিলাম। অবশেষে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি—মাথার উপর এবং চোখের সম্মুখে ভয়ঙ্কর গর্জ্জনকারী জলপ্রপাত। জলবিন্দুসমূহে অন্ধকারময় কুয়াশা সৃষ্ট হইয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রপাতের অপর দিকে কিছুই দেখা যায় না।

প্রপাতের পর হইতে নায়াগ্রা নদীর দুই ধার অতিশয় উচ্চ—ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের কিনারাই খাড়া ১৫০। ১৮০ ফিট। সুতরাং নদী বহু নিম্নে। শুনিলাম, নদীর গভীরতাও অত্যধিক। কোন কোন স্থানে জলের তলভাগ ১৫০ ফিট গভীর।

শক্তিকেন্দ্রের মাহাত্ম্য

আজ কাল নায়াগ্রা ঝোরা প্রধানতঃ শিল্পজগতে প্রসিদ্ধ। তড়িতের কারখানায় জলের বেগ ব্যবহৃত হইতে পারিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান মানব নায়াগ্রার নাম শুনিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা ভয় পাইয়াছেন, জগতের কয়লা রাশি শীঘ্রই ফুরাইয়া আসিবে। তাহা হইলে জল গরম করিয়া বাষ্প প্রস্তুত করা আর সম্ভবপর হইবে না। তখন জলের ক্ষমতাকে অন্য কোন ক্ষমতায় পরিণত করিবার আবশ্যকতা বিশেষরূপে বাড়িয়া যাইবে। নায়াগ্রা ঝোরায় প্রচুর পরিমাণ তড়িতের শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে। কাজেই ভবিষ্যৎ শিল্পজগতে নায়াগ্রা ঝোরার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন সহস্র কণ্ঠে হইতে থাকিবে। দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকেরা এই কারণে প্রকৃতির এই শ্রীমান্ ও বিভূতিমান্ শক্তি-কেন্দ্রের উপাসনা প্রচার করিতেছেন।

লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান

তীর্থস্থানের ঝকমারি

ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডাদের কথা সকলেই জানেন। মিশরে অসংখ্য "গাইড", "ইণ্টারপ্রেটার", প্রদর্শক ইত্যাদির পাল্লায় পড়িয়াছি। নায়াগ্রাতেও 'তীর্থের কাকে'র সংখ্যা এবং দৈরাত্ম্য কম নয়। ধর্ম্মক্ষেত্রেই হউক বা বিলাসক্ষেত্রেই হউক—টুরিষ্ট বা পর্য্যটকের ভিড় যেখানে সেইখানেই পাণ্ডা-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। পাণ্ডাদের ধরণ-ধারণ, কথাবার্ত্তা, বোলচাল, ভারতে, মিশরে ও ইয়াঙ্কিস্থানে সর্ব্বত্রই এক প্রকার।

তীর্থস্থান হইতে সকলেই নানাপ্রকার স্মারক দ্রব্য লইয়া আসে। শাক্ত বৈষ্ণব সকলেরই ইহা জানা আছে। খৃষ্টানেরাও প্যালেষ্টাইন হইতে গৃহে ফিরিবার সময়ে নানা পদার্থ সঙ্গে লইয়া যায়। মুসলমানেরা মক্কার "কাবা" হইতে জল লইয়া আসে। আর আধুনিক আদর্শের পর্য্যটকগণও তাঁহাদের প্রিয়স্থান হইতে কৃষিজাত শিল্পজাত অথবা প্রাকৃতিক বস্তুর নিদর্শন বহিয়া আনে। এইরূপে পর্য্যটক মাত্রেরই একটা করিয়া ছোট বা বড় মিউজিয়াম সৃষ্ট হয়। আজকালকার ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ তাঁহাদের তীর্থক্ষেত্র হইতে বিচিত্র বস্তু সংগ্রহ করেন। মিশর, ইতালী, ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশ নব্যপণ্ডিতগণের পক্ষে এই ধরণের তীর্থক্ষেত্র। টুরিষ্টেরা এই সকল দেশ দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি Curioshops, "স্থানীয় দ্রব্যভাণ্ডার"ও দেখিতে উৎসাহী হন। এই সকল দোকানের মালিকেরাও বিদেশীয় পর্য্যটক পাইলে আকাশের চাঁদ হাতে পায়। এইজন্য

ইহারা পাণ্ডাদের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখে। সুতরাং একে পাণ্ডার উপদ্রব তাহার উপর স্থানীয় দ্রব্যভাণ্ডার ওয়ালাদের উপদ্রব—দুই প্রকার উপদ্রবই সকল তীর্থযাত্রী বা পর্য্যটকগণকে ভোগ করিতে হয়।

নায়াগ্রা নগরে পৌঁছবামাত্রই পাণ্ডামূর্ত্তির সাক্ষাৎ হইল। প্রথমতঃ হোটেল নির্ব্বাচনের পালা। কিন্তু কুক কোম্পানীর টিকেটে পূর্ব্ব হইতে হোটেলের খরচ দিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাতে হোটেলের নাম লেখা ছিল। কাজেই হোটেলের দালালেরা বেশী গণ্ডগোল করিতে পারিল না। হোটেলে প্রদর্শক ও পাণ্ডারা দলে দলে আসিতে লাগিল। হোটেলের ভিতরেই নায়াগ্রার স্থানীয় দ্রব্যসমূহের এক দোকানও দেখিলাম।

লোহিতাঙ্গ দ্রব্য-ভাণ্ডার

পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া এখানকার কয়েকটা দোকানের ভিতর প্রবেশ করা গেল। প্রধানতঃ লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্ জাতির প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্য এই সকল দোকানে বিক্রী করা হয়। তাহা ছাড়া, নায়াগ্রানদীর অভ্যন্তরে নানাবিধ প্রস্তর ও ধাতু পাওয়া যায়। সেই সমুদয় উপকরণের খেলনার সামগ্রী, অলঙ্কার, মালা, হার, চুড়ী ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। এই সমুদয় দ্রব্যও বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে। দোকানে প্রবেশ করিলেই বিক্রেতা (সাধারণতঃ বিক্রেত্রী) ছলে বলে কৌশলে কতকগুলি জিনিষ গছাইয়া দিবার চেষ্টা করে। কোন দোকানে একবার ঢুকিলে অন্ততঃ দুই ঘণ্টার পূর্ব্বে বাহির হওয়া অসম্ভব।

নিউইয়র্কের মিউজিয়ামে লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানদের পরিবার, সমাজ, শিল্প, যুদ্ধসজ্জা, গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বস্তুই দেখিয়াছি। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও এই প্রকার দ্রব্যের সংগ্রহ যথেষ্ট। কলা-

ম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগে কয়েকদিন ইণ্ডিয়ান্-সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতাও শুনা গিয়াছে। অধ্যাপক বোয়াজ্ ইণ্ডিয়ান্ জাতিপুঞ্জের ভাষা, সাহিত্য, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণায় জগৎ প্রসিদ্ধ। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত লোহিতাঙ্গ নরনারীদিগের জীবনকথা কেবলমাত্র ল্যাবরেটরীতে অথবা নির্জ্জীব সংগ্রহালয়ে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। নায়াগ্রায় আসিয়া রক্তমাংসের শরীরযুক্ত জীবন্ত ইণ্ডিয়ান্ নরনারীর আবেষ্টনের ভিতর পড়িয়াছি। এখানে একটা অভিনব মানব সমাজের কর্ম্মকেন্দ্রে বাস করিতেছি।

নিউইয়র্ক প্রদেশের এই অঞ্চল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইণ্ডিয়ান্ জাতিপুঞ্জের অধীন ছিল। এই অঞ্চলের নদী, পর্ব্বত, হ্রদ, নগর, পল্লী ইত্যাদির নাম ইণ্ডিয়ান্ ভাষা হইতে গৃহীত। ঈরি, নায়াগ্রা, হিউরন, অণ্টারিয়ো ইত্যাদি শব্দ ইণ্ডিয়ান ভাষার অন্তর্গত। ষোড়শ-শতাব্দীর অবসানকালে এখানে নানাবিধ আদিমজাতির কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। ফরাসীরা ক্যানাডা অঞ্চল হইতে অগ্রসর হইয়া ইণ্ডিয়ান্দের সম্মুখীন হয়। তখন ইয়োরোপের বিবাদ বিসম্বাদ আমেরিকার উপনিবেশ সমূহেও চলিত। এইজন্য ফরাসী ও ইংরাজের দ্বন্দ্ব ক্যানাডায়ও অনুষ্ঠিত হইত। ফরাসী পরাজিত হইবার পর ইংরাজেরা ক্যানাডায় প্রভুত্বলাভ করে। কিন্তু ফরাসীই হউক, অথবা ইংরাজই হউক—সককেই ইণ্ডিয়ান্ জাতিপুঞ্জের সঙ্গে অস্ত্রপরীক্ষা করিতে হইত। ইণ্ডিয়ানেরা বড় শীঘ্র বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

পরে অষ্টাদশশতাব্দীর শেষ পাদে ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রামের ফলে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতালাভ করে। তখন হইতে একমাত্র ক্যানাডায় ইংরাজের আধিপত্য থাকিল। এই সময়েও ইণ্ডিয়ানেরা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। ইংরাজেরা ক্যানাডা

হইতে এবং যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা দক্ষিণ দিক হইতে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত। এদিকে ইংরাজে এবং যুক্তরাষ্ট্রেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। অবশেষে ১৮১৫ সালে সন্ধি স্থাপিত হয়। স্বাধীন ইণ্ডিয়ানেরা এক প্রকার লুপ্ত হইয়া যায়—অথবা ক্যানাডায় ও যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর reserved or protected বা সংরক্ষিত নরসমাজরূপে জীবনধারণ করিতেছি। কাজেই, নায়াগ্রা অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের অস্থিমজ্জা এবং তপ্ত নিঃশ্বাসের আবহাওয়ায় বিচরণ করিতেছি। নায়াগ্রাপ্রপাত, নায়াগ্রা নদী, ঈরি হ্রদ, অণ্টরিয়ো হ্রদ ইত্যাদি সবই ইণ্ডিয়ান্ জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতরূপে গ্রথিত।

সন্ধান পাইলাম—আমাদের এই নগরের ১০।১২ মাইল দূরে যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় একটি ইণ্ডিয়ান্ পল্লী সংরক্ষিত আছে। আজকাল ইণ্ডিয়ান্ প্রায় কোথাও দেখা যায় না—ইণ্ডিয়ান্ জাতির এই বিখ্যাত নায়াগ্রা-কেন্দ্রেও একঘর ইণ্ডিয়ান্ নাই। লোক গণনায় প্রকাশ—যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রদেশে বর্ত্তমানে মাত্র ৫০,০০০ ইণ্ডিয়ান্ নরনারী বাস করিতেছে। যাহা হউক, নায়াগ্রা অঞ্চলের এই সংরক্ষিত ইণ্ডিয়ান্ সমাজ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

তুষারের হোলি-খেলা

দিনরাত তুষার পড়িতেছে—তুষারের ঝড়ও বহিতেছে। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই শ্বেত তুলাসদৃশ বিন্দুসমূহের বিকীরণ। বাড়ী ঘর, রাস্তা ঘাট, লোকজনের পোষাক, রেলওয়ে, দোকান, হোটেল, গাছপালা সবই শ্বেতবর্ণ। ক্রমশঃ মাঠের ভিতর আসিয়া পড়িলাম—বিরাট শ্বেত প্রান্তর—বরফের বালুকারাশি পাগলের মত উড়িয়া বেড়াইতেছে—কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নাই। আমরা ভারতবর্ষে লাল রঙের দোললীলা দেখিয়া থাকি। বসন্ত উৎসবের সময়ে লোকজন, রাস্তা, ঘাট,

নদী, পুষ্করিণী, কাপড়, চোপড়, উঠান, বাগান সবই লালে লাল হইয়া যায়। সেই সময়ে এমন কি "লাল ফুলে লাল অলি লাল মধু পায়।" আমরা আর কোন রঙের একাধিপত্য অন্য কোন ঋতুতে দেখি না। ভারতবর্ষের প্রায় সকল সময়েই রঙের বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। নায়াগ্রা অঞ্চলে এ কয়দিন ধরিয়া শ্বেতবর্ণের একাধিপত্য দেখিতেছি। বরফের হোলিখেলা সাজাইয়া প্রকৃতি এই ঋতুর অভিবাদন করিতেছে। সবুজ তৃণপত্র-মণ্ডিত মখমল-সদৃশ কানন প্রান্তরের শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। শ্বেত তুষারের মসৃণ মরুভূমিও কম মনোহারিণী নয়।

স্লেজ গাড়ীতে প্রায় দুই ঘণ্টা চলিয়া ইণ্ডিয়ান্ পল্লীতে পঁহুছিলাম। একটি পরিবারের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। "সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই।" ইণ্ডিয়ানের নিজস্ব কিছুই পাইলাম না। এমন কি চেহারা দেখিয়াও লোহিতাঙ্গ অথবা কোন প্রকার বিশেষত্ব-বিশিষ্ট জাতির পরিচয় পাইলাম না। ইহাদিগকে ভারতবাসী বলিলেও ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিংশশতাব্দীর লোহিতাঙ্গ

পরিবারের কর্ত্তা গৃহে ছিল না। তিনটি রমণীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। বালিকা, বালিকার মাতা এবং তস্যাঃপি মাতা। শুনিলাম, সর্ব্বসমেত ৩৬৫ জন ইণ্ডিয়ান্ নরনারী এই পল্লীতে বাস করে। ইহারা ১২টি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত—প্রত্যেক দলের একজন স্বতন্ত্র দলপতি। সকলেরই ভাষা এক। জাতির নাম টাস্কোরোরা। বিবাহ এই দ্বাদশ দলের ভিতরেই আবদ্ধ। সকলেই ইংরাজীভাষা ব্যবহার করে—ইণ্ডিয়ান্ ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থাও নাই। নগরের সাধারণ ইয়াঙ্কি কুলী মজুরেরা যে সকল কর্ম্ম করে এই পল্লীর লোকেরাও তাহাই করে। পুরাতন শিল্পের মধ্যে চামড়ার জুতা, ব্যাগ, বালিশ, জামা ইত্যাদি

প্রস্তুত করা কিছু কিছু চলিয়া থাকে। কয়েক ঘর খৃষ্টান। পুরাতন দেবদেবীর পূজা এখনও চলিতেছে। উঠানে একটা কাষ্ঠপ্রতিমা দেখিলাম। নিম্নের অংশে পাপের প্রতিমূৰ্ত্তি—মধ্যম অংশে পাপ সংহারকের প্রতিমূর্ত্তি এবং সর্ব্বোচ্চ অংশ পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি। এই পক্ষী টাম্বোরোরা জাতিকে স্বর্গে লইয়া যায়। ইহাই ইহাদের পরমারাধ্য দেবতা।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রদেশ-রাষ্ট্রের কেন্দ্র

ইয়াঙ্কিস্থানের কোন নগরের নাম করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিউ-ইয়র্কের নাম মনে আসে। বার্লিন, প্যারি, লণ্ডন ইত্যাদি নগরের ন্যায় নিউইয়র্ক নগর জগৎ প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই সকল নগর হইতে নিউইয়র্ক নগরের বিশেষ প্রভেদ আছে। বার্লিন জার্ম্মাণের রাষ্ট্র-কেন্দ্র, প্যারি ফরাসীর রাষ্ট্র-কেন্দ্র, লণ্ডন ইংরাজের রাষ্ট্র-কেন্দ্র; কিন্তু নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কির রাষ্ট্র-কেন্দ্র নয়। নিউইয়র্ক যুক্ত-রাষ্ট্রের কর্ম্মকেন্দ্র ত নয়ই—এমন কি নিউইয়র্ক নামক প্রদেশ-রাষ্ট্রেরও কেন্দ্র নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র ওয়াশিংটন নগরে অবস্থিত—নিউইয়র্ক প্রদেশের কেন্দ্র অল্‌বানি নগরে অবস্থিত।

অল্‌বানি

নিউইয়র্ক প্রদেশ আয়তনে আমাদের বঙ্গদেশ হইতেও বৃহত্তর। এইরূপ ক্ষুদ্রবৃহৎ ৪৫টি প্রদেশ-রাষ্ট্রের সমবায়ে ইয়াঙ্কিদের যুক্ত-রাষ্ট্র গঠিত। এই সমবায়ের আকার ভারতবর্ষের ডবল। কিন্তু সর্ব্বসমেত লোক সংখ্যা দশ কোটী মাত্র—অর্থাৎ ভারতীয় লোক সংখ্যার ⅓ অংশ।

আজকাল কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী নয়—ইহা বঙ্গ-প্রদেশের রাষ্ট্রকেন্দ্র মাত্র। তথাপি ভারত-সমাজে ইহার স্থান নামিয়াছে কি? কিন্তু এক্ষণে যদি প্রাদেশিক রাষ্ট্র-কেন্দ্র কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে বা ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয় তাহা হইলে কলিকাতা বাঙ্গালাদেশের একটা

প্রসিদ্ধ বন্দর মাত্র থাকিবে। তাহাতেও কলিকাতার প্রাধান্য হয়ত কোন হিসাবেই না কমিতে পারে। ধরা যাউক যেন, শিল্পে, ব্যবসায়ে, বিদ্যাচর্চ্চায় সকল বিভাগেই কলিকাতা ভারতবর্ষে উচ্চতম স্থান রক্ষা করিল—অথচ ইহা ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-কেন্দ্র থাকিল না অথবা বঙ্গ-প্রদেশেরও রাষ্ট্র-কেন্দ্র থাকিল না। কলিকাতার এরূপ অবস্থা কল্পনা করিলে বর্ত্তমান নিউইয়র্ক নগরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। সেই অবস্থায় কলিকাতার শাসন মুর্শিদাবাদ বা ঢাকা হইতে পরিচালিত হইতে থাকিবে। এক্ষণে নিউইয়র্ক নগরের শাসন অল্‌বানি হইতে পরিচালিত হয়। অথচ দুনিয়ার লোকে অল্‌বানির নামই শুনে নাই কিন্তু নিউ-ইয়র্ককে জগতের অন্যতম প্রধান নগর বলিয়া জানে!

নায়াগ্রা ঝোরা দেখিয়া নিউইয়র্ক প্রদেশের এই রাষ্ট্র-কেন্দ্রে আসিলাম। বিচার, শাসন, মন্ত্রণাসভা, নগরপরিচালনা ইত্যাদি বুঝিবার সময় এযাত্রায় পাওয়া গেল না। সম্প্রতি সমগ্র প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থা মাত্র দেখিয়া রাখিলাম।

নিউইয়র্ক "প্রদেশের" শিক্ষা-পরিষদের নাম "বিশ্ববিদ্যালয়"। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে যাহা বুঝি, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণি বা অন্য কোন দেশের লোকেরা এই শব্দে যাহা বুঝে, নিউইয়র্ক প্রদেশের শিক্ষা-ধুরন্ধরেরা এই শব্দে তাহা বুঝেন না। ইঁহারা রাষ্ট্রের "শিক্ষা-পরিচালনা-বিভাগ"কে বিশ্ববিদ্যালয় নাম দিয়াছেন। কোন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেছে শুনিলে আমরা বুঝি যে, সে কোন "কলেজের" ছাত্র বা অধ্যাপকের নিকট বা তৎসম্পর্কিত কোন কার্য্যের জন্য যাইতেছে। আল্‌বানি নগরে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেছে শুনিলে বুঝিব যে, সে শিক্ষা-পরিচালনা-বিষয়ক একটা "আফিসে" যাইতেছে। এই আফিসে বিদ্যাদান ও বিদ্যাগ্রহণ সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা প্রচারিত হয়।

আমাদের দেশে ডিরেক্টার অব্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের কর্ম্মকেন্দ্র যে বস্তু, নিউইয়র্ক "প্রদেশের" বিশ্ববিদ্যালয়ও সেই বস্তু। এই খানে আর একটা প্রভেদ মনে রাখা আবশ্যক। কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এক প্রকার আফিসই বটে। কারণ শিক্ষাদান বিষয়ক নিয়ম জারি করাই ইঁহাদের কাজ—শিক্ষাদান করা নয়। কিন্তু জগতের অন্যত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ বিদ্যাদানেরই মন্দির—কেবল মাত্র আফিস নয়।

ইয়াঙ্কির শাসন-প্রিয়তা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির সঙ্গে পূর্ব্বে হইতে আলাপ ছিল। এখানে তিনি কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। একজন পরীক্ষাবিভাগের কর্ত্তা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরীক্ষা-বিভাগ আবার কি?" ইনি উত্তর করিলেন—"নিউইয়র্ক প্রদেশের যতগুলি নিম্নবিদ্যালয় ও মধ্যবিদ্যালয় আছে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষা আমরা করিয়া থাকি। এজন্য বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে শিক্ষকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসি। ইহাঁরা আমাদের এই কেন্দ্রে বসিয়া পরামর্শপূর্ব্বক প্রশ্নপত্র তৈয়ারী করেন। প্রশ্নপত্রগুলি ছাপাইয়া আমরা যথাসময়ে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিই। পরে উত্তর-পত্রগুলি আসে। সেইগুলি পরীক্ষা করাইবার জন্য আবার শিক্ষকগণকে আহ্বান করি। এইরূপে আমরা সমগ্র প্রদেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছি।" আমি বলিলাম—"এযে সামরিক শাসন দেখিতেছি মহাশয়! আমেরিকায় এতটা বাঁধাবাঁধি ও শাসন-প্রিয়তা আছে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। এমন কি, দূর হইতে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাসাহিত্য এবং অন্যান্য কাগজ পত্র পড়িয়া আমি ঠিক উল্টা ধারণাই করিয়াছিলাম। ভাবিতাম—এদেশে বোধ হয় বিদ্যালয়গুলির বৈচিত্র্য রক্ষা পায়,—ভিন্ন ভিন্ন

বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে স্বতন্ত্র উপায়ে ও স্বাধীনভাবে শিক্ষা-পরিচালনা করিবার সুযোগ পায়। আল্‌বানিতে আসিয়া বুঝিতেছি, শাসন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রও ইংল্যাণ্ড এবং জার্ম্মানিরই অনুরূপ।"

"লাইব্রেরী-বিদ্যালয়"

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী ঘর সুবৃহৎ প্রাসাদবিশেষ। ইহার সকল প্রকোষ্ঠ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা গেল। শিক্ষাসংক্রান্ত মিউজিয়াম এবং গ্রন্থশালা দেখান হইলে শাসনবিভাগের কর্ত্তা বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের গ্রন্থশালা দ্বিবিধ। প্রথম ভাগের নিয়ম অন্যান্য সাধারণ লাইব্রেরীর মত। দ্বিতীয় বিভাগকে আমরা ট্রাভলিং লাইব্রেরী বলি। এইরূপ 'পর্য্যটনশীল গ্রন্থশালার' জন্য আমাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে কোন কোন গ্রন্থের ১৫।২০ খণ্ড পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে হয়। আমি বলিলাম—"ভারতবর্ষেও আজ কাল আমরা এই প্রণালীর কার্য্য ধরিয়াছি। অবশ্য আমাদের কার্য্য-পরিমাণ নগণ্য, আপনাদের সম্মুখে উল্লেখ করিয়া চাঁদের সম্মুখে বাতি ধরিলাম মাত্র।" তিনি বলিলেন—"আপনাদের বড়োদা-রাষ্ট্রের একজন কর্ম্মচারী আমাদের এখানে কিছুকাল কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত কুডালকার। তিনি আমাদের লাইব্রেরী-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভও করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম—"লাইব্রেরী-বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা, কার্য্যপ্রণালী ইত্যাদি জানিবার উপায় আছে কি?" প্রদর্শক মহাশয় লাইব্রেরী বিভাগের কর্ত্তার নিকট লইয়া গেলেন। তিনি "লাইব্রেরী-বিদ্যালয়ের" গৃহগুলি দেখাইলেন। নানা ভাষায় লিখিত লাইব্রেরী সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ, নানা সাময়িক পত্র এবং জগতের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীসমূহের বিবরণী ও ইতিহাস এক সঙ্গে দেখিতে পাইলাম। ৫০।৬০ জন ছাত্রী লাইব্রেরী বিষয়ক বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছে শুনিলাম। কর্ত্তা বলিলেন, "আমরা গ্রাজুয়েট ছাত্র ভিন্ন আর কাহাকেও গ্রহণ করি না। সাধারণতঃ রমণীরাই

লাইব্রেরী-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া থাকে। রুষিয়া, জার্ম্মানি, ইংল্যণ্ড ইত্যাদি দূর বিদেশ হইতে আমরা ছাত্রী পাই। টাইপরাইটিং, বই-বাঁধাই, ছাপা-খানার কাজ, সূচীপত্র ও নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করন, ইত্যাদি ধরণের কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যচর্চ্চা, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ইত্যাদিও এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শিখিতে পারে। পাকা লাইব্রেরীয়ান হওয়া নিতান্ত সহজ কথা নয়।"

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেবলমাত্র গ্রন্থাবলীই নানা স্থানে পাঠান হয়—এরূপ নয়। এক বিভাগে দেখিলাম, অজস্র লণ্ঠন-শ্লাইড্ ও চিত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। প্রদর্শক মহাশয় বলিলেন—"নিউইয়র্ক প্রদেশের কোন ব্যক্তি যদি জনসাধারণকে ইতিহাস, ভূতত্ব, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখাইবার জন্য বক্তৃতা দিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা এই সমুদয় শ্লাইড্ ও চিত্র পাঠাইয়া দিই। এইজন্য প্রতিবৎসর আমরা ৩০০০০৲ টাকা খরচ করি।"

এতদিন মূক-বধির ও অন্ধ-বিদ্যালয়ের কথাই জানিতাম। কিন্তু নিউইয়র্কের বিখ্যাত পাব্লিক লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি —আল্‌বানিতেও দেখিলাম, অন্ধ ব্যক্তিগণের জন্যও গ্রন্থপাঠের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র একপ্রকার গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। অন্ধ-বিভাগের লাইব্রেরীতে কয়েকখানা বই দেখিলাম। এগুলি সাধারণ পুস্তকাবলির ন্যায় কালীর অক্ষরে পূর্ণ নয়। কাগজের উপর উচ্চনীচ দাগ বা চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। অন্ধেরা ইহাতে হাত বুলাইয়া অক্ষর ও শব্দ চিনিতে পারে। স্পর্শজ্ঞানের দ্বারা ইহারা দৃষ্টিশক্তির অভাব পূরণ করিয়া লয়। মানুষের দুঃখ নিবারণ করার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যে কত কার্য্যই করা হইতেছে!

অন্ধ-বিদ্যালয়

পঞ্চম অধ্যায়

আমেরিকার বনিয়াদি সমাজ

বষ্টন-মাহাত্ম্য

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না'ক তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥"—

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বাঙ্গালী আজকাল এইরূপ গাহিয়া থাকে। জার্ম্মানেরাও তাহাদের জন্মভূমি সম্বন্ধে গাহে—"ডয়েচ্‌ল্যাণ্ড, ডয়েচ্‌ল্যাণ্ড ইউবারেস্‌ আলেস্‌!" অর্থাৎ—

"ধন-ধান্য-পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা"

এই "ইউবারেস্‌ আলেস্‌" বা "সকল দেশের সেরা"-তত্ত্ব আমেরিকায় যৎপরোনাস্তি। নিউইয়র্কের ইয়াঙ্কিকে জিজ্ঞাসা কর সে বলিবে—"নিউইয়র্ক প্রদেশের মত প্রদেশ আর কোথাও নাই"। ক্যালিফার্নিয়ার ইয়াঙ্কও বলিয়া থাকে—"যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্ব অঞ্চলে বিশেষ কিছুই নাই, পশ্চিম অঞ্চলে আসুন, আমেরিকার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন।" এখানকার যে কোন প্রদেশ-রাষ্ট্রের লোক তাহার প্রদেশকে সকল দেশের সেরা বিবেচনা করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির ভিতরও এই ভাব দেখা যায়। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই নিজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে। সে দিন নিউইয়র্কের উকীল-পাড়ায় এক

গৃহে গল্প চলিতেছিল। একজন এ্যাটর্নী তাঁহার জজ-বন্ধুকে বলিলেন—"মহাশয় আমাদের এই নগরের বোটানিক্যাল উদ্যানসম্বন্ধে হল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানবিদ্-অধ্যাপক ডিভ্রীজ (De Vries) কি বলিয়াছেন জানেন কি? তাঁহার মতে ইহা নাকি জগতে অতুলনীয়।" আড্ডায় কয়েকজন উকীল এবং বক্তা উপস্থিত ছিলেন। কয়েকদিন পরে আর এক মহলে শুনিলাম, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট এই তথ্য প্রচার করিতেছেন। "এত বড় কথাটা জানা ছিল না!"—এই বলিয়া সকলেই আপ্‌শোষ করিতে লাগিলেন।

আজকাল আমাদের ভারতীয় ছাত্র আমেরিকার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম প্রায় সকল অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করিতেছে। ইহারা মাঝে মাঝে ইংরাজী অথবা বাঙ্গালা ও হিন্দী পত্রিকায় প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনগণের নিকট ইহাদের চিঠিপত্রও আসে। ইহারাও আমেরিকার ভাব বেশ হজম করিয়াছে, বুঝিতে পারি। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লিখিয়া থাকে—'এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকায় আর নাই'। শিকাগোর ছাত্রও তাহার বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এই মতই প্রচার করে। ইণ্ডিয়ানা প্রদেশের পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ও নাকি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা। কেবল তাহাই নয়। কেহ বলে—"আমাদের এখানে কৃষিবিদ্যা যেরূপ শিখান হয় এরূপ আর কোথাও হয় না।" আর একজন বলিতেছে—"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া তড়িতের কারখানা না দেখিলে আমেরিকায় আসা বৃথা হইল। অধ্যাপক সম্বন্ধেও ছাত্রদের মত এইরূপ। "এমন নামজাদা পাকা অধ্যাপক আর কোথাও নাই"—এই কথা ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের ছাত্রেরা একস্বরে বলিয়া থাকে। আমেরিকায় জল বায়ুর গুণে আমাদের ছেলেরাও ইয়াঙ্কি ভাবাপন্ন হইয়াছে। মন্দ কি?

বলা বাহুল্য, যুক্ত-রাষ্ট্রের নগরগুলির ভিতরও এইরূপ আড়াআড়ি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ আছে। নিউইয়র্কনগরের লোকেরা জানে যে, নিউইয়র্কই জগতের সেরা নগর। শিকাগোর নরনারীও বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ায় শিকাগো অদ্বিতীয়। আর ইয়াঙ্কি সভ্যতার প্রবর্ত্তক, প্রথম আমেরিকাপ্রবাসীর কর্ম্মকেন্দ্র, নব্য বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হার্ভার্ড-এমার্সনের লীলানিকেতন, বিপ্লব ও স্বাধীনতার প্রচারক বষ্টন-নগরেরত কথাই নাই। বষ্টনবাসীরা ধরাকে সরা জ্ঞান করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? বষ্টন আমেরিকার "বনিয়াদি" নগর—বষ্টন আমেরিকার অন্যান্য নগরকে নাবালক মাত্র বিবেচনা করে।

আমরা ভারতবর্ষকে জগদ্বাসীর পুণ্যভূমি বিবেচনা করি। আমাদের নিকট ভারতভূমি "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ"। থুসিডিডস বলেন যে, পেরিক্লীস তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র এথেন্স নগরকে "সমগ্র গ্রীক জাতির শিক্ষালয়" বিবেচনা করিতেন। ইংরাজ কবি মিল্টনের ভাষায় এথেন্স ছিল "গ্রীসের চোখ"। ইংরাজ তাঁহাদের অক্সফোর্ড-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ফরাসী তাঁহাদের প্যারি নগরীকে ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র বিবেচনা করেন। সেইরূপ বষ্টন-বাসীর জ্ঞানে বষ্টন নগর আমেরিকার এথেন্স অথবা অক্সফোর্ড অথবা প্যারি। ইহাতেও বষ্টনের নর নারী বোধ হয় সন্তুষ্ট নন। ইউরোপের কোন জনপদের সঙ্গে তুলনা করিলে বষ্টন যে ছোট হইয়া যাইবে! নব্য আমেরিকার সেরা নগর কি পুরাতন ইয়োরোপের কোন নগরের সমান? তাহা হইলে আমেরিকার নবীনত্ব, বিশেষত্ব, একটা 'নূতন কিছু', একটা বাহাদুরী থাকিল কোথায়? ইয়োরোপে যাহা নাই আমেরিকায় তাহা আছে। ইয়োরোপের লোকেরা যে সকল সত্য কল্পনায় আনিতে পারে না আমেরিকাবাসী সেই সমুদয় আবিষ্কার ও প্রচার করিতেছে! সুতরাং

সেই আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর বষ্টন দুনিয়ার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। ইহার নিকট জগতের সকল নগরই হতপ্রভ। এইরূপই বষ্টন-বাসীর ধারণা।

বষ্টন-বাসীর এইরূপ অহঙ্কার ও গৌরববোধ সম্বন্ধে ইয়াঙ্কি-সাহিত্যে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ পরিহাস-রসিক চিকিৎসক সাহিত্যসেবী অধ্যাপক হোম্‌স্ তাঁহার "প্রোফেসার এ্যাট দি ব্রেকফাষ্ট টেব্‌ল" নামক গ্রন্থে একজন বষ্টনবাসীর পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থ পত্র বা ডায়েরীর আকারে প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থ' বিশেষ। অধ্যাপক মহাশয় যেন কোন হোটেলে ৮।১০ জন লোকের সঙ্গে জীবন যাপন করিতেছেন। সকালে আহারে বসিয়া তাঁহারা যে সকল কথাবার্ত্তা বলেন, সেই গুলিই যেন বিবৃত হইতেছে। এইরূপ বিবরণ এক বৎসর ধরিয়া কোন মাসিক পত্রে বাহির হইয়াছিল। "ইহাতে লিট্‌ল বষ্টন" নামক একজন বষ্টনবাসীর কথা বেশী আলোচিত হইয়াছে। এই বষ্টন-বাসীর কথায় কথায় পাঠকেরা বুঝিতে পারে—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না'ক তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥"

বষ্টনবাসী একদিন বলিতেছেন—"ইয়োরোপের বায়ুতে অম্লজান ফুরাইয়া আসিয়াছে। বহুকাল হইতে লোকজন ওখানে বাস করিতেছে এবং অম্লজান সেবন করিতেছে, অম্লজান আর থাকিবে কোথা হইতে? বায়ু দূষিত হইয়া গিয়াছে। এখন আমেরিকায় আমাদের নূতন জগতে না আসিলে কেহ স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা করিতে পারিবে না।" হোম্‌সের ভাষায়—"The air of the Old World is good for nothing,— used up, sir,—breathed over and over again. You must come to this side, sir, for an atmosphere to

breathe nowadays. Did not worthy Mr. Higginson say that breath of New England's air is better than a sup of old England's ale ?"

"লিট্‌ল বষ্টন" মহাশয় সমগ্র আমেরিকার প্রশংসা শেষ করিয়া "তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা" প্রচার করিতেছেন। পুরাতন বিলাত অপেক্ষা নূতন বিলাত স্বাস্থ্যকর প্রমাণিত হইল। কিন্তু এই নূতন বিলাতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান কোথায় ? বষ্টনে। এজন্য বষ্টনবাসী বলিতেছেন—"বষ্টনে ত আমার মরা হইবে না—কারণ বষ্টনে মরা অসম্ভব। বষ্টন অমর লোকের সহর। আমাকে হয় নিউ-ইয়র্কে না হয় অন্য কোন নগরে যাইয়া মরিতে হইবে—or to New Orleans where they have the yellow fever, or to philadelphia where they have so many doctors". অর্থাৎ নিউ অর্লীন্স সহরে জ্বরের প্রকোপ বেশী। সেখানে মরা সম্ভব। অথবা ফিলাডেল্‌ফিয়া সহরেও মরা চলিতে পারে। কারণ তাহা না হইলে ওখানকার ডাক্তারদের পশার থাকিবে কি করিয়া ?

বষ্টনের পুরাতন মহাল্লায় দেখিতেছি—নিউইয়র্কের প্রশস্ত রাস্তাঘাটের বিশেষ অভাব। নিউইয়র্কের আকাশস্পর্শী প্রাসাদাবলী "স্কাই স্ক্রেপার"ও নূতন নগরে চোখে পড়ে না। বাড়ীঘর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র—পথগুলিও সঙ্কীর্ণ এবং আঁকাবাঁকা। ১৮৫৭ সালে হোম্‌সের ডায়েরী প্রকাশিত হয়। তখনকার বষ্টনও এইরূপই ছিল। আজকাল অবশ্য অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু "লিটল্ বষ্টনে"র চোখে এই সঙ্কীর্ণ পথঘাট বষ্টনের নিন্দা নয়। কারণ, "রূপেতে কি করে বাপু গুণ যদি থাকে ?" বষ্টনবাসী বলিতেছেন—"চিন্তারাজ্যের এমন প্রশস্ত পথ বষ্টন ছাড়া আর কোথাও পাইবে কি ? বিদ্যার পথ, জ্ঞানের পথ, ধর্ম্মের

পথ, স্বাধীনতার পথ, মনুষ্যত্বের পথ, মহত্ত্বের পথ, বষ্টনে যেরূপ প্রশস্ত আমেরিকায় আর কোথাও সেরূপ নয়,—ইয়োরোপে ত নয়ই। কারণ, ইয়োরোপীয়েরা ধর্ম্ম ও বিদ্যা সম্বন্ধে চিরকাল সঙ্কীর্ণমনা ও ক্ষুদ্রচেতা। তাহাদের এইরূপ ক্ষুদ্রত্ব ও সঙ্কীর্ণতার জন্যই ত ইয়োরোপীয় স্বাধীনচেতা নরনারী আমেরিকায় পলাইয়া আসিয়াছে।" হোম্‌স্ এই বষ্টনবাসীর মত লিখিয়াছেন :—

"You can't make me ashamed of the old place! Full of crooked little streets; but I tell you Boston has opened, and kept open, more turn-pikes that lead straight to free thought and free speech and free deeds than any other city of live men or dead men—I don't care how broad their streets were, nor how high their steeples."

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র ইংলাণ্ডের অধীনতা ছিন্ন করে। আমেরিকার এই বিপ্লব ও সংগ্রাম বষ্টনে সুরু হয়। ইহাও বষ্টনবাসীদিগের গৌরবের কথা। সেই সংগ্রামের প্রথম যুদ্ধ বাঙ্কারস্ হিল্ পাহাড়ে ঘটিয়াছিল। এই পাহাড় বষ্টন নগরেরই ভিতরে। আবার বষ্টন নগরের সমীপবর্ত্তী কেম্ব্রিজ নগরের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এই সংগ্রামে অগ্রণী ছিলেন। তখনকার ইংরাজেরা হার্ভার্ডকে "হটবেড্ অব্ সিডিশন" অর্থাৎ রাজদ্রোহের "বাথান" বলিত। বষ্টন-মাহাত্ম্য-প্রচারকেরা এই তথ্যও সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকেন। হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে "মেমরিয়্যাল হল" নামক এই ঘটনার স্মৃতিমন্দির এখনও বিশেষ গৌরবের সামগ্রী বিবেচিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তিনটি ঘটনা বিশেষ প্রসিদ্ধ :—(১) প্রতিবাদ বা সংগ্রাম ও বিরোধ, (২) স্বাধীনতা লাভ, (৩) ঐক্য-প্রতিষ্ঠা। নানা

প্রকার কঠোর সাধনার ফলে এই তিনটি ঘটনা ঘটিতে পারিয়াছে। তিনটি শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিতে পারিলেই তিনটি কার্য্য করিতে পারা যায় না। এই সকল শব্দ মুখের কথা নয়—এই সকল শব্দ উচ্চারণ করিতে উপযুক্ত "অধিকারী" হওয়া আবশ্যক। জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন না করিলে, রক্ত না দিতে পারিলে, এই সকল শব্দ মুখে আনা যায় না। যথার্থ ভাবে শব্দের বানান করিতে পারা বড়ই কঠিন। হোম্‌সের লিট্‌ল বষ্টন বলিতেছেন—"বিরোধ, সংগ্রাম, স্বাধীনতা, একতা ইত্যাদি শব্দ কি রামা শ্যামা বানান কিম্বা উচ্চারণ করিতে পারে? বষ্টনের লোক ছাড়া আর কাহারও সে সাধ্য নাই। বষ্টনের নরনারীই রক্ত দিয়া এই সকল শব্দ সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই অভিধান-প্রণয়ন একমাত্র বষ্টনেরই সাজে।"

বষ্টনবাসীর এই উক্তি হোম্‌সের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

Language! the blood of the soul, sir! into which our thoughts run and out of which they grow! You know what a word is worth here in Boston. Young Sam Adams got up on the stage at commencement, out at Cambridge there, with his gown on, * * * and taught people how to spell a word that was not in the Colonial Dictionaries! R—e, re, s-i-s, sis, t-a-n-c-e, *Resistance!* That was in 43, and it was a good many years before the Boston boys began spelling it with their muskets;—but when they did begin, they spelt it so loud that the old bed-ridden woman in the English alms houses heard every syllable! Yes, yes, yes,—it was a good

while before these other two Boston boys got the class so far along that it could spell these two hard words, *Independence* and *Union*! I tell you what, sir, there are a thousand lives, aye sometimes a million, go to get a new word into a languge that is worth speaking."

অর্থাৎ "ভাষা? সে ত আত্মার রক্ত—হৃদয়ের রস! সেই রক্ত ও রসেই মানুষের চিন্তাগুলি ভিজান থাকে। সেই রস হইতেই চিন্তার দানা বাহির হয়। আপনারা কি জানেন না, বষ্টনে এক একটা শব্দের মূল্য কত বেশী? সেই দিনকার কথা মনে করুন—যে দিন ঐ কেম্ব্রিজে—বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবের সময়ে—ছোক্‌রা এ্যাডাম্‌স্‌ রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া ইয়াঙ্কি সমাজকে একটা নূতন শব্দ বানান করিতে শিখাইল। সে শব্দটা তাঁহার পূর্ব্বেকার আমেরিকার কোন অভিধানে ছিল না। প—র, প্র, ত-ই, তি, ব—আ, বা, দ, প্রতিবাদ! বানানটা প্রথম শিখান হইল বটে, কিন্তু বষ্টনের ছোঁড়ারা এই শব্দ বড় শীঘ্র রপ্ত করিতে পারে নাই। বহু-কাল পরে তাহারা সঙ্গীন খাড়া করিয়া এই বানান অভ্যাস করিতে অগ্রসর হয়। সেই বানানের ঘটা কি! কত জোরে তাহারা চেঁচাইয়াছিল? এত জোরে যে, বিলাতের দরিদ্রভবনের শয্যাশায়ী রুগ্ন বুড়ীরাও শুনিতে পাইয়া ছিল। এই ত গেল হাতেখড়ী। তারপর প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ বষ্টনের ছোক্‌রারা পড়িতে পাইল। তখন তাহারা আর দুইটি নূতন শব্দের বানান শিখিল। সে বানান আরও কঠিন। 'স্বাধীনতা' এবং 'ঐক্য' এই দুই শব্দের কথা বলিতেছি। মানুষের ভাষায় এক একটা শব্দের মত শব্দ চালাইয়া দেওয়া সহজ কথা নয়। কোন সময়ে একটা শব্দের জন্ত হয়ত হাজার হাজার লোকের রক্ত দেওয়া আবশ্যক—কোন সময়ে বা লক্ষ লক্ষ!"

বষ্টন-বাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনতার ধ্বজা তুলিয়াছিল। ইহারাই স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রাণ দিয়াছিল। ইহারাই রক্ত দিয়া ভাষা গড়িয়াছে—ভাষার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এ গৌরব বষ্টনের নিজস্ব ও একচেটিয়া। কাজেই বষ্টনের নিকট অন্যান্য নগর মাথা নোয়াইতে বাধ্য।

হোম্‌স্ বলিতেছেন, "একদিন ভোজনালয়ে তর্ক চলিতেছে—যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ নগর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ? শেষ পর্য্যন্ত নিউইয়র্ক এবং বষ্টনের তুলনা আরম্ভ হইল। নিউইয়র্ক বড় কি বষ্টন বড়? বলা বাহুল্য, লিটল বষ্টনের মুখের তোড়ে অন্য সকলের স্থান ভাসিয়া গেল। ধর্ম্মের স্বাধীনতা একমাত্র বষ্টনেই পাইবে। অন্যান্য স্থানে কুসংস্কার ও অত্যাচার। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা—তাহাও বষ্টনেরই দান। অবশ্য নিউইয়র্ক একটা প্রকাণ্ড বাণিজ্যকেন্দ্র সন্দেহ নাই—ইতালির ভেনিস্ যেরূপ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সেইরূপ। কিন্তু ভেনিস্ কখনও ইতালীর সভ্যতার কেন্দ্র হইতে পারে নাই।

"All that did not make Venice the brain of Italy?"

যুক্তরাষ্ট্রে বষ্টনের মর্য্যাদা সম্বন্ধে লিটল বষ্টনের বাণী :—

"A new race and a whole new world for the new born human soul to work in! And Boston is the brain of it, and has been any time these hundred years! That's all I claim for Boston,—that it is the thinking centre of the continent and therefore of the planet. * * *

There is not a thing that was ever said or done in Boston, from pitching the tea overboard to the last eccelesiastic lie it tore into tatters and flung into the

dock, that was not thought very indelicate by some fool or tyrant or bigot. * * * Show me any other place where wealth and social influence are so fairly divided between the stationary and the progressive classes. Show me any other place where every other drawing room is not a chamber of the Inquisition, with papas and mammas for inquisitors.

অর্থাৎ "ইয়াঙ্কি জাতি মানব সমাজের এক নূতন জাতি। আমেরিকা একটা নূতন জগৎ। এই জগৎ একটা নূতন মানব জাতির কর্ম্মক্ষেত্র হইবারই উপযোগী। আর বষ্টন? সে ত এই নূতন মহাদেশের মস্তিষ্ক। বষ্টন আজ এক শত বৎসর ধরিয়াই আমেরিকান জাতির মাথা রহিয়াছে। ইহাই আমি বষ্টনের গৌরব সম্বন্ধে দাবী করিতে চাহি। বষ্টন সহর আমেরিকার মস্তিষ্ক অতএব দুনিয়ার মস্তিষ্ক!

বষ্টনকে দুনিয়ার লোকেরা বুঝিবে না। বষ্টনের লোকেরা যাহা করে তাহা অসাধারণ। আহাম্মুকেরা সে সব কাজ মাথায় ধারণা করিতে পারে না। গোঁড়ারা সে সব চিন্তার আশে পাশেও পৌঁছিতে পারে না। আর অত্যাচারী রাজপুরুষেরা সে সব গড় পছন্দ করিতে বাধ্য। বষ্টন নূতন নূতন পথ দেখাইয়া চলে। কাজেই মামুলি লোকেরা বষ্টনের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। মনে নাই? বষ্টনের লোকেরাই প্রথম সমুদ্রের ভিতর বিলাতী জাহাজের চা ফেলিয়া দিয়াছিল। মনে নাই? গোঁড়া খৃষ্টানীর উদ্ভট ধর্ম্ম মত বষ্টনবাসীরা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল। বষ্টনের এই সব কাজ লোকেরা প্রথম প্রথম পছন্দ করিয়াছে কি? আদৌ না। সমাজে টাকা পয়সার সমান ভাগ বাটোয়ারা বষ্টন ছাড়া জগতের আর কোথাও নাই। দুনিয়ার

সর্ব্বত্র মা বাপ দাদারা ছেলে মেয়ের উপর কি অত্যাচারই না করে? কিন্তু বষ্টন? সে ত বালক বালিকা যুবক যুবতীদিগের স্বর্গ। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এরূপ সুযোগ দুনিয়ার আর কোথাও পাইবে না।"

রসিক-প্রবর হোমসের রচনাকে ইংরাজী সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইঁহার গ্রন্থে ইয়াঙ্কি সমাজের আদব-কায়দা, ধরণ-ধারণ, আদর্শ ও চিন্তাপ্রণালী চিত্তাকর্ষকভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বষ্টন-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আর একটা চিত্র উদ্ধৃত করিতেছি। একদিন লিটল বষ্টন অধ্যাপক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আপনি কি বষ্টনের লোক?" অধ্যাপক বলিলেন—"না।" বষ্টনবাসী মহাদুঃখিত হইয়া বলিলেন:—"It is a pity, it is a pity; it is the place to be born in, but if you can't fix it so as to be born here, you can come and live here. Old Ben Franklin, the father of American Science and American union was not ashamed to be born here. Jim Otis, the father of American Independence, bothered about in Cape Cad marshes awhile, but he came to Boston as soon as he got big enongh. Goe Warren, the first bloody ruffled shirt of the Revolution was as good as born here. Parson Channing strolled along this way from Newport, and stayed here."

অর্থাৎ "বড়ই দুঃখের কথা! যদি জন্মগ্রহণ করিতেই হয় তাহলে বষ্টনেই জন্মান ভাল। যদি পার ত জন্মো না ক' বষ্টন ছাড়া আর কোথাও। যাক্, অন্ততঃ সকলেরই বষ্টনে আসিয়া বাস করা উচিত।

আমেরিকায় বিজ্ঞান এবং ইয়াঙ্কি ঐক্যের জন্মদাতা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বষ্টনে জন্মিতে লজ্জিত হন নাই। ইয়াঙ্কি স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক ওটিস্ কেপ ক্যাডের জঙ্গলা পাড়া গাঁয়ে কয়েক দিন ছিলেন বটে, কিন্তু বড় হইবা-মাত্রই তিনি বষ্টনে আসিয়াছিলেন। ওয়ারেণকে কে না জানে? তিনি ছিলেন বিপ্লবের বড় পাণ্ডা। তাঁহার জন্ম প্রায় বষ্টনেই হইয়াছিল বলিতে হইবে। আর ধর্ম্মবীর চ্যানিং নিউপোর্ট হইতে যাইবার সময়ে এই পথেই গিয়াছিলেন এবং কয়েক দিন ছিলেনও বষ্টনে।"

যেন তেন প্রকারেণ আমেরিকার কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণকে বষ্টনের সন্তান সপ্রমাণ করা বষ্টনবাসীর একটা লক্ষ্য। যাহার জন্ম বষ্টনে নয় তাঁহাকেও ইহারা বষ্টনে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। অন্ততঃ তিনি এখানে কিছুকাল বাস ত করিয়াছিলেন। খুব কম পক্ষে,—তিনি কি বষ্টনের পথ দিয়া একবারও যান নাই? তবে আর কি?

পাতালের অক্সফোর্ড

নিউইয়র্ক প্রদেশ ছাড়াইয়া ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশে আসিয়াছি। এই প্রদেশ-রাষ্ট্রের কেন্দ্র বষ্টননগর। কেম্ব্রিজ ইহারই উপনগর-স্বরূপ। কলিকাতার সঙ্গে ভবানীপুর বা কালীঘাটের যেরূপ সম্বন্ধ, বষ্টনের সঙ্গে কেম্ব্রিজের প্রায় তদ্রূপ। অবশ্য নগরদ্বয়ের শাসন স্বতন্ত্র।

বষ্টনের হোটেলে দুই রাত্রি কাটাইয়া সম্প্রতি কেম্ব্রিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্‌হাওয়ায় বাস করিতেছি। বিলাতী অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ত্যাগ করিবার পর এইরূপ আব্‌হাওয়া আর পাই নাই। এখানে ক্ষুদ্র গৃহে বাড়ীর কর্ত্তার মত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার সুযোগ পাইতেছি। হট্টগোল, লোকজনের ভিড় ইত্যাদি নগণ্য। ঘরে বসিয়া খোলা আকাশ ও গাছপালা দেখিতে পাই। নায়াগ্রা হইতে বরফপড়া সুরু হইয়াছে। এক সপ্তাহ ধরিয়া শ্বেততুষারের আবরণ সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি। ঘরের জানালা হইতে গাছের শাখা প্রশাখায় কাচের পোষাক দেখা যায়। দিনে সূর্য্যরশ্মি, রাত্রে চন্দ্রকিরণ এই তুষারমণ্ডিত বৃক্ষশিরসমূহের অভিনব শোভা সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িয়া রাস্তাঘাট এবং বাড়ীঘর ও গাছপালার বরফ ধুইয়া ফেলে। তখন পত্রহীন বৃক্ষগুলি নিতান্তই কেঠো নীরস জীবনহীন পাহারাওয়ালার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে। শীতের প্রারম্ভে লণ্ডনে এই অবস্থা দেখিয়াছি। আর বৃষ্টির জন্য রাস্তায় চলা বিশেষ অসুবিধাজনক। বরফের উপর হাঁটিতে সত্যসত্যই খানিকটা আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টির জলে রাস্তার উপর বরফের কাদা জমিতে থাকে। তখন আমাদের বাঙ্গালাদেশের
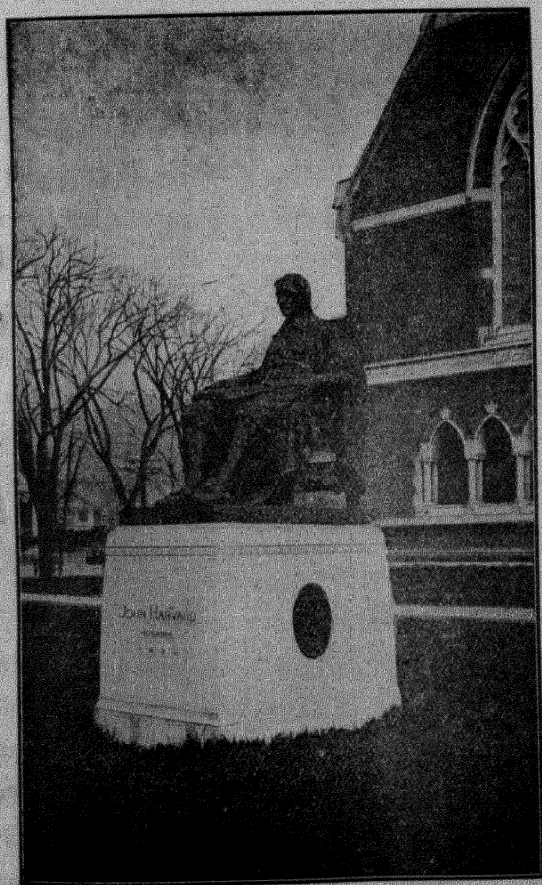
১৮। জন হর্ভার্ড, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত-কর্ত্তা

পল্লীগ্রামের কথা মনে পড়ে। বর্ষাকালে পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় একহাঁটু কাদা বা পাঁক জমিয়া যায়। তাহার উপর গরুর গাড়ীর গতায়তে পথে হাঁটা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এখানেও দেখিতেছি, বরফের পর বৃষ্টি হইলে পথগুলি সেইরূপই দুর্গম ও দুর্গন্ধময় হয়। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার! অবিমিশ্র সুখ মানুষ কোথায় পাইবে?

বিলাতী ঔপনিবেশিকেরা অনেক বিলাতী নগরের নামে আমেরিকায় নগরের নাম রাখিয়াছে। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রেও কেম্ব্রিজনগর। সেইরূপ ফরাসীরা তাহাদের দেশীয় নগরের নামে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক নগরের নাম রাখিয়াছে। ইয়োরোপের নানা দেশের নানা নগরের নামে যুক্তরাষ্ট্রের বহু নগর পরিচিত।

ইয়াঙ্কি-কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। হার্ভার্ড একজন লোকের নাম—স্থানের নাম নয়। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম অনুসারে ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচিত হয় না। আমেরিকায় কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের নামে পরিচিত—যথা লীল্যাণ্ড ষ্টান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, জন্‌স্ হপ্‌কিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। হার্ভার্ড নামক এক ইংরাজ এই অঞ্চলে অল্পকাল বাস করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি ৩০০ পুস্তক এবং ১০।১২ হাজার নগদ টাকা শিক্ষাপ্রচারের জন্য দান করেন। সে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের কথা—তখন ভারতবর্ষে মোগল-মারাঠার যুগ। তখনকার দিনে এই দানই চূড়ান্ত কৃতজ্ঞতার বস্তু ছিল। কাজেই গ্রহীতারা দাতার নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য "হার্ভার্ড-বিদ্যালয়" নাম স্থির করিলেন। হার্ভার্ড আজ জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ২৭৫ বৎসরে একটা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কি বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে দেখিয়া জগদ্বাসী বিস্মিত হইতেছে।

বিলাতী অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিদ্যালয় প্রায় সহস্র বৎসরের প্রতিষ্ঠান —হার্ভার্ড মাত্র ৩০০ বৎসর পূর্ণ করিতে চলিতেছে। অথচ বর্ত্তমান হার্ভার্ড অনেকাংশে অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিগণিত হয়। হার্ভার্ডের অধ্যাপক অক্সফোর্ডে নব্যদর্শন প্রচার করিলেন। তাহার পর হইতে ফরাসী ব্যার্গস ইংরাজ-সমাজে পরিচিত। শিশু হার্ভার্ড প্রবীণ অক্সফোর্ডকে নূতন পথ দেখাইয়া দিল।

আমরা ভারতবর্ষে যে ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় দেখি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সেই ছাঁচে গড়া প্রতিষ্ঠান নয়। ইহার আকৃতি বিলাতী অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপও নয়। ইয়াঙ্কি দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই এই হার্ভার্ডের ছাঁচে ঢালা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি হার্ভার্ডের ছাঁচে ঢালিতে হয় তাহা হইলে কতকগুলি আমুল পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, কলিকাতার বাহিরে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার ভিতর যতগুলি কলেজ আছে সেগুলিকে স্বাধীন করিয়া দিতে হইবে। তখন রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বহরমপুর বিশ্ববিদ্যালয়, হুগলি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কটক বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি জেলায় জেলায় স্বস্বপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার ভিতর যতগুলি কলেজ আছে সেইগুলির নূতন আকার দিতে হইবে। তাহার ফলে কলিকাতা সহরের ভিতর ৩।৪ টা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হইবে। অথবা সকলগুলিকে একত্র করিয়া একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত করা যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, রিপন কলেজ, সিটি কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ইত্যাদি কলেজগুলি স্বস্বপ্রধান ষোলকলায় পূর্ণ কলেজ থাকিবে না। এই সকল কলেজ একটা বিরাট পরিচালনা-সমিতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

প্রত্যেকের খরচপত্র আয়ব্যয় আস্‌বাব গৃহ ইত্যাদি সেই কেন্দ্র হইতে নির্দ্ধারিত হইবে। তখন প্রেসিডেন্সী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিভাগ বা শাখাস্বরূপ থাকিবে—রিপন আর একটা শাখা বা বিভাগ-স্বরূপ থাকিবে—ইত্যাদি। এই শাখাগুলির মধ্যে কোন হিসাবে তারতম্য, অথবা উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান থাকিবে না। তখন রিপন কলেজের ছাত্র, কিম্বা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র বলিয়া কেহই পরিচিত হইবে না। সকলকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলা হইবে।

তৃতীয়তঃ, কলেজগুলি এক একটা বিভাগের গৃহমাত্ররূপে পরিগণিত হইবে। হয়ত সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগ, ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থশালা, ইতিহাস-বিষয়ক বক্তৃতাগৃহ ইত্যাদি রিপন কলেজের ভবনে সন্নিবেশিত হইবে। আর বিজ্ঞানবিষয়ক সকলপ্রকার অনুষ্ঠান প্রেসি-ডেন্সী কলেজের গৃহে চলিতে থাকিবে। এক্ষণে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ, আর্টস্কুল এবং শিবপুরের সিবিল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ অনেকটা এইরূপেই পরিচালিত হয়। হার্ভার্ড-ছাঁচের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে এই তিনটা বিদ্যালয় অন্যান্য সাধারণ কলেজের সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িবে। ইহাদের কোনটিরই স্বাধীন অস্তিত্ব থাকিবে না। প্রেসিডেন্সী-ভবনে যে সকল ল্যাবরেটরী থাকিবে মেডিক্যাল কলেজের ভবনে সেই সকল ল্যাবরেটরী থাকিবে না—এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভবনেও সেই সমুদয় থাকিবে না। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটা বিরাট গ্রন্থশালা, একটা বিরাট মিউজিয়াম, একটা বিরাট হাঁস-পাতাল, একটা বিরাট চিড়িয়াখানা, একটা বিরাট চিত্রভবন, একটা বিরাট ল্যাবরেটরী এবং কতকগুলি বক্তৃতাগৃহ স্থাপিত হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনা-সমিতি হয়ত ৮।১০টা শাখা বা বিভাগে বিভক্ত হইবে। এই বিভাগগুলির অধীনে এক একটা গৃহ বা ভবন বা কলেজ

বা মিউজিয়াম ইত্যাদি পরিচালিত হইবে। বিজ্ঞান-বিভাগ প্রেসিডেন্সী-ভবনের ভার লইবেন। ইতিহাস-বিভাগ রিপন-ভবনের ভার লইবেন। এঞ্জিনীয়ারিং-বিভাগ শিবপুরের ভার লইবেন। চিকিৎসা-বিভাগ হাঁস-পাতালের ভার লইবেন, ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ, কোন ছাত্র হয়ত মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, চিত্রকলার ইতি-বৃত্ত, প্রাণ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন শিক্ষা করিবে। হার্ভার্ডের ছাঁচে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে এই ছাত্রকে তাহার মনোনীত শিক্ষণীয় বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় নিয়মসমূহ দেখিতে হইবে। এইজন্য একবার তাহাকে রিপন-ভবনে, আর একবার প্রেসিডেন্সী-ভবনে, আর একবার আর্টস্কুল-গৃহে ইত্যাদি নানা ভবনে যাওয়া আসা করিতে হইবে। কোন এক গৃহে তাহার সকল শিক্ষালাভ হইবে না। ফলতঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ রিপন, প্রেসিডেন্সী, শিবপুর, মেডিক্যাল, আর্ট ইত্যাদি সকল ভবনকে একস্থানে এক প্রাঙ্গণের ভিতর আনিতে সচেষ্ট থাকিবেন। অন্ততঃ কোন বাড়ী যেন অন্যান্য বাড়ী হইতে বেশী দূরে না থাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, ছাত্রেরা নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকিতে পারিবে। মেস, বা বোর্ডিং, অথবা পরিবার ইত্যাদি বাসস্থান সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। আজকাল ছাত্রশাসনের জন্য ভারতবর্ষে "রেসিডেন্শ্যাল" প্রথা প্রবর্ত্তনের হুজুগ উঠিয়াছে। ইহার বিধানে ছাত্রগণকে কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহে থাকিতে বাধ্য করা হইবে। এ নিয়ম দুনিয়ায় কোথাও নাই—একমাত্র বিলাতী অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ভিতর এই রীতি প্রচলিত। ইয়াঙ্কি-কেম্ব্রিজের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই রেসিডেন্শ্যাল প্রথা মানিয়া চলেন না।

জার্ম্মানি বা আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্রদের উপর এই ধরণের জুলুম করা হয় না।

অতি সহজে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আকৃতি কল্পনা করিতে হইলে কলিকাতার বর্ত্তমান কলেজগুলিকে এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। অবশ্য তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের উপরওয়ালা আর কেহ থাকিবেন না। প্রেসিডেন্সীর অধ্যাপকগণই বিজ্ঞান-বিভাগ, ইতিহাস-বিভাগ, দর্শন-বিভাগ ইত্যাদি সকল বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা থাকিবেন। ইঁহারাই পাঠ্য নির্ব্বাচন করিবেন, ছাত্রগণের পরীক্ষা লইবেন এবং যথাসময়ে উপাধি দিবেন। সেইরূপ মেট্রপলিটান, সিটি, রিপন প্রভৃতি কলেজকেও এক একটা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাদের বিভাগগুলি সবই কলেজের অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে থাকিবে। ইঁহাদের নিকটই ছাত্রেরা সার্টিফিকেটও পাইবে।

এই উপায়ে ছাঁচটা মাত্র বুঝা গেল। তাহা বলিয়া রিপন কলেজকে একটা বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করা কখনই চলিতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থায় প্রেসিডেন্সী, মেডিক্যাল এবং আর্টস্কুল ও মিউজিয়াম এই চারিটা প্রতিষ্ঠান একত্র করিলে এবং তাহার সঙ্গে সিনেট-হাউসের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি যোগ করিলে হার্ভার্ড-ধরণের একটা চলনসই বিশ্ববিদ্যালয় তৈয়ারী করা যায়। বিলাতের লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা এই দরের বিশ্ববিদ্যালয়। এইরূপ ১৫টা বিশ্ববিদ্যালয় একত্র করিলে বর্ত্তমান হার্ভার্ডের আয়তন বুঝা যায়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বা কীর্ত্তি অধ্যাপকগণের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করিবে। সেকথা সম্প্রতি আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা ভারতীয় সংস্করণ এক্ষণে আমাদের দেশে সুরু করা যাইতে পারে। হার্ভার্ডের চালচলন খরচপত্র

আসবাব গৃহ ইত্যাদির সংবাদ লইয়া কোন লাভ নাই। এখানে কোটি টাকার কমে কোন গৃহ নির্ম্মিত হয় না!

হার্ভার্ডের অধ্যাপকগণ নানা বিভাগে কিরূপ মৌলিক গবেষণা করিতেছেন তাহার পরিচয় লইলেই এখানকার বিরাট কাণ্ড বুঝিতে পারা যায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যতপ্রকার গ্রন্থ, পুস্তিকা, সাময়িক পত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তাহার ব্যয়েই আমাদের দেশে একটা বড় কলেজ চলিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাবিষয়ক গ্রন্থাদি ছাড়া নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি ও গ্রন্থাবলী ধারাবাহিকরূপে প্রচারিত হইয়া থাকে।

১। প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব (Publications of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology).

২। বাস্তুতত্ত্ব (Architectural Quarterly of Harvard University).

৩। উদ্যান-তত্ত্ব (Publications of the Arnold Arboretum).

৪। জ্যোতিষ (Publications of Astronomical Observatory).

৫। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান (Publications of the Gray Herbarium).

৬। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান (Contributions and Memoirs from the Cryptogarnic Laboratory).

৭। রসায়ন (Contributions from the Chemical Laboratory).

৮। গ্রীক ও ল্যাটিন (Harvard Studies in Classical Philology).

৯। ঐতিহাসিক (Harvard Historical Studies).

১০। ধনবিজ্ঞান (Harvard Economic Studies).

১১। ধনবিজ্ঞান (The Quarterly Journal of Economics).

১২। প্রাচ্যতত্ত্ব (Harvard Oriental Series).

১৩। আইন (Harvard Law Review).

১৪। গ্রন্থপঞ্জী (Bibliographical Contributions).

১৫। চিকিৎসা (Journal of Medical Research).

১৬। বিশ্ব-সাহিত্য (Harvard Studies in Comparative Literature).

১৭। ভাষা-বিজ্ঞান (Studies and Notes in Philology and Literature).

১৮। পদার্থ-বিজ্ঞান (Contributions from the Jefferson Physical Laboratory).

১৯। চিত্ত-বিজ্ঞান (Harvard Psychological Studies.)

২০। সমাজ-তত্ত্ব (Publications of the Department of Social Ethics).

২১। ধর্ম্মতত্ত্ব (Harvard Theological Review).

২২। জীবতত্ত্ব (Publications of the Museum of Comparative Zoology).

২৩। জীবতত্ত্ব (Contributions from the Zoological Laboratory of the Museum of Comprative Zoology).

জ্ঞানরাজ্যের বিশেষজ্ঞ এবং ওস্তাদ মহাশয়গণ এই সকল রচনাবলীর মূল্য বুঝিয়া থাকেন। কি আইন-বিভাগ, কি চিকিৎসা-বিভাগ, কি মনোবিজ্ঞান-বিভাগ, সকল বিভাগের পণ্ডিতেরা হার্ভার্ডে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাইবার জন্য ব্যগ্র।

হার্ভার্ডে প্রথম সপ্তাহ

নিউইয়র্কে দেখিয়াছি, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র বেশী নাই। বষ্টন-কেম্ব্রিজেও দেখিতেছি, হার্ভার্ডে ভারতীয় ছাত্রের আমদানী বড় কম। যুক্তরাষ্ট্রের আট্‌লান্টিক অঞ্চলে খরচ অত্যধিক। প্রশান্তসাগর অঞ্চলে এবং মধ্যভাগে খরচ অপেক্ষাকৃত অল্প। এইজন্য ভারতীয় ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও মধ্য প্রদেশে বেশী আসে। অবশ্য ঐ সকল অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রায় সুপ্রসিদ্ধ নয়।

ধনবান ভারতবাসীর সন্তানগণ আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার জন্য আসে না। আমেরিকার অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রই জনসাধারণ-প্রদত্ত চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া লেখাপড়া শিখিতেছে। আমাদের "ভাল" ছেলেরা এবং পয়সাওয়ালা লোকের ছেলেরা সাধারণতঃ বিলাতকেই উচ্চ শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র বিবেচনা করে। বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া আমাদের এই মোহ রহিয়াছে। এক্ষণে বোধ হয় নেশা কিছু ভাঙ্গিয়াছে। আজকাল ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে আমাদের ছাত্রেরা যাইতে শিখিতেছে। আমেরিকার দিকে ভাল ও ধনী ছেলেদের নজর এখনও পড়ে নাই।

বিগত ৫।৬ বৎসরের পূর্ব্বে বোধ হয় হার্ভার্ডে কোন ভারতীয় ছাত্র আসে নাই। ইতিমধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী ও মারাঠা ছাত্র হার্ভার্ডের শিক্ষা পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছে। শুনিলাম, ইহারা বেশ যোগ্যতাও দেখাইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পুরস্কার ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদি ইহাদের কেহ কেহ অর্জ্জন করিয়াছে। দুএকজন পি এইচ-ডি উপাধিও লাভ করিয়াছে। এখানকার অধ্যাপকগণ ভারতীয় ছাত্রের সুখ্যাতি

করিয়া থাকেন। লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়েও আমাদের শিক্ষার্থীদিগের প্রশংসা শুনিয়াছি।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে আমাদের ছাত্রেরা মাসিক ৩০০৲ হইতে ৫০০৲ খরচ করিয়া থাকে। ইহারা ব্যারিষ্টারী অথবা সরকারী চাকরীর জন্য তিন বৎসরকাল এইরূপ খরচ করে। হার্ভার্ডে স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে মাসিক অন্ততঃ ২০০৲ খরচ করা আবশ্যক। যাহারা ব্যারিষ্টারী অথবা চাকরীর প্রত্যাশা রাখে না এরূপ ছাত্র ভারতবর্ষে আজকাল অনেক দেখা যায়। ইহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া "ভাল" ছেলেদিগকে হার্ভার্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে দেশের সুনাম শীঘ্রই জগতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেশের কিয়দংশ হার্ভার্ডে আসিতে থাকুক। অল্পব্যয়ে অধিক ফল পাওয়া যাইবে।

কলাম্বিয়ায় দেখিয়াছি, হার্ভার্ডেও দেখিতেছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা ইয়োরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নামজাদা অধ্যাপক-গণকে দুএক বৎসরের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন, এবং তাঁহাদের পরিবর্ত্তে নিজেদের অধ্যাপকগণকে সেইসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। এইরূপ অধ্যাপক-বিনিময় ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জার্ম্মানির সঙ্গে সাধারণতঃ হইয়া থাকে। জেনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ দার্শনিক অয়কেন হার্ভার্ডে এইরূপ একস্‌চেঞ্জ প্রোফেসার (Exchange Professor) বা "বিনিময়-অধ্যাপক" হইয়া আসিয়াছিলেন। এই বৎসর দেখিতেছি —তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনেসাকি হার্ভার্ডে বৌদ্ধদর্শন প্রচার করিতেছেন। ভারতবর্ষের দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ অথবা বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রও একদিন হার্ভার্ডে নিমন্ত্রিত হইবেন না কি? প্র্যাগম্যাটিজম-তত্ত্বের প্রবর্ত্তক এবং অক্সফোর্ডে বার্গসোঁদর্শনপ্রচারক অধ্যাপক জেম্‌সের

আমলে বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ হার্ভার্ডে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত Pragmatism, Pluralistic Universe, এবং Varieties of Religious Experience নামক গ্রন্থত্রয়ে তাহার পরিচয় পাই। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথ হার্ভার্ডে সুপরিচিত। তাঁহার ইংরাজী "সাধনা" গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পঠিত হইয়াছিল। জগদীশচন্দ্রও দুএকবার হার্ভার্ডে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে প্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ এখনও সুপ্রচারিত নয়।

শুনিলাম—সম্প্রতি একটা নূতন নিয়ম করা হইয়াছে। তাহার ফলে ভারতীয় ছাত্রেরা হিন্দী, মারাঠী, বাঙ্গালা অথবা অন্য কোন মাতৃভাষায় পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে ভাষা-পরীক্ষা সম্বন্ধে অনেকটা অব্যাহতি পাইবে। ইংরাজী ভাষাকে ইহাদের দ্বিতীয়-ভাষা-স্বরূপ গ্রহণ করা হইবে। ইংরাজ অথবা ইয়াঙ্কি-ছাত্রেরা ইংরাজীর সঙ্গে ল্যাটিন অথবা ফরাসী ভাষা না শিখিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায় না। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে ল্যাটিন অথবা ফরাসী শিখিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া কঠিন। এজন্য তাহাদের মাতৃভাষার সঙ্গে মাত্র ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান পরীক্ষিত হইবে। ইহাতে ভারতীয় ছাত্রদিগের সুবিধা হইল সন্দেহ নাই।

একয়দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, পাঠাগার ইত্যাদি দেখিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে কিছু পড়াশুনাও করা যাইতেছে। পর্য্যটকগণের শরীর খুব সুস্থ ও শক্ত থাকা আবশ্যক। প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কর্ম্মঠ থাকিতে হয়। কাইরো হইতে এইরূপ নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি সুরু হইয়াছে। লোক দেখা, জিনিষ দেখা, আন্দোলন দেখা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। মাশুল দিয়া যখন আসা গিয়াছে তখন

কিছুই বাদ দিতে প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই শারীরিক পরিশ্রম অত্যধিক। তাহার উপর পড়াশুনার চাপও কম নয়। বিগত দশ বৎসরের ভিতর বিশ্বচিন্তায় অনেকদিকে নূতন নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে বসিয়া এ সকলগুলির সাক্ষাৎলাভ ত দূরের কথা—অনেক সময়ে উল্লেখ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই না। ভারতবর্ষে নূতন চিন্তা ৩০ বৎসর পরে পৌঁছিয়া থাকে। অথচ বর্ত্তমান জগতের এই সমুদয় তত্ত্বের ও তথ্যের মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে অন্ধের ন্যায় পর্য্যটন করা হয়,—অন্ততঃ কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার অধিকার জন্মে না। ফলতঃ পর্য্যটনকারীকে মস্তিষ্ক সর্ব্বদা সজাগ রাখিয়া চলিতে হয়। টাকা পয়সা খরচ ছাড়া শারীরিক এবং মানসিক খরচও পর্য্যটকগণের ব্যয়ের মধ্যে ধরা উচিত। এই দুই প্রকারের ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত না থাকিলে দেশের বাহিরে আসিয়া লাভ নাই।

কোন প্রধান নগরের মিউজিয়ামগুলির সঙ্গে হার্ভার্ডের সংগ্রহালয়-সমূহের তুলনা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের নিত্যব্যবহারের উপযোগী বস্তুসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। পুঁথিগত বিদ্যাকে সরস ও সজীব করিবার জন্য এই সমুদয় মিউজিয়ামের উৎপত্তি। কাজেই নিউইয়র্কের জীব-নমুনার সংগ্রহালয় (Natural History Museum) এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন অথবা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখা থাকিলে হার্ভার্ডে নূতন করিয়া কোন দ্রব্য দেখিবার প্রয়োজন হয় না।

হার্ভার্ডের উদ্ভিদ্-সম্বন্ধীয় মিউজিয়মে (Botanical Museum) বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটা বস্তু দেখিলাম। কাচের প্রস্তুত উদ্ভিদ্ লতাপাতা ও ফুল এখানকার কয়েকটা ঘরে প্রদর্শিত হইতেছে। এগুলি দেখিতে ঠিক প্রাকৃতিক পদার্থের অনুরূপ। সম্মুখে দাঁড়াইয়াও বিশ্বাস

হয় না যে, এগুলি প্রকৃতির অনুকরণে মানুষের তৈয়ারী জিনিষ। জার্ম্মানির কয়েকজন শিল্পী এইরূপ কৃত্রিম উদ্ভিদ্ প্রস্তুত করিতে পটু। তাঁহাদের সঙ্গে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাঁহারা অন্য কাহারও নিকট এই সমুদয় বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবেন না। যেমন যেমন দ্রব্যগুলি প্রস্তুত হয় তেমন তেমন এই সমুদয় হার্ভার্ডের সংগ্রহালয়ে তাঁহারা পাঠাইয়া থাকেন। কাজেই প্রতিবৎসর সংগ্রহালয়ের দ্রব্যসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের সকল বিভাগই হয়ত এই সমুদয় কাচের নমুনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইবে। জার্ম্মানিতে কাদামাটির কাজ, চীনামাটীর কাজ ইত্যাদি অত্যুৎকৃষ্টরূপে করা হয়। অস্থিবিদ্যা, জীব-বিদ্যা, শরীরবিদ্যা ইত্যাদি বিভাগের জন্য নানাপ্রকার 'মডেল' জার্ম্মান কুম্ভকারেরা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই সমুদয় মডেল বা নিদর্শন দুনিয়ার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলিকাতায়ও এই সমুদয় দ্রব্য দেখা যায়। কাচনির্ম্মিত মডেল এই প্রথম দেখিলাম। যেন তেন প্রকারেণ কাজ সারা নয়—এগুলি বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীতে ব্যবহার করা চলিতে পারে। এই সমুদয় মডেলে আকৃতির বৈচিত্র্য, রংয়ের বৈচিত্র্য ইত্যাদি সবই যথারীতি রক্ষিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তুর অভাব হইলে আজকাল চিত্রের সাহায্যে উদ্ভিদবিজ্ঞান শিখান হয়। ভবিষ্যতে এই সমুদয় কাচনির্ম্মিত নিদর্শনের ব্যবহার হইতে পারিবে।

প্রধানতঃ লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানদিগের জীবনযাত্রা বুঝাইবার জন্য এই সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন মেক্সিকো ও পেরু এবং জগতের অন্যান্য স্থানেরও ন্যূনাধিক পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নৃতত্ত্ব শিখিবার জন্য এই সংগ্রহালয়কেই

ল্যাবরেটরী ও বক্তৃতালয়রূপে ব্যবহার করেন। এক গৃহে কতকগুলি মড়ার মাথা দেখিলাম। জগতের নানাস্থান হইতে নানাজাতীয় নর-নারীর মাথা সংগৃহীত রহিয়াছে। ভারতীয় মস্তকও কতকগুলি দেখিলাম। অধ্যাপক লুশান বলিতেছিলেন, এই মাথা-সংগ্রহে তিনি জগতে অদ্বিতীয়।

ভূতত্ত্ব, ভূগোল ও খনিজতত্ত্ব-বিষয়ক গৃহে অন্যান্য সাধারণ বস্তুর সঙ্গে কতকগুলি প্রাচীন ইয়োরোপীয় মানচিত্র দেখিলাম। এডিনবারার 'আউটলুক টাওয়ারে' অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজের সংগৃহীত মানচিত্র-গুলি এইরূপ। এতদ্ব্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয়েরা কিরূপ গুলি-গোলা কামানবন্দুক ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন, তাহার সামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সে গুলির সঙ্গে আজকালকার জার্ম্মান-আবিষ্কারসমূহের তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের শুক্রনীতিবর্ণিত যুদ্ধসম্ভারের তুলনা সহজেই চলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টেণ্ড বন্দর এবং ট্রিয়েষ্ট বন্দরও চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রের মধ্যে দেখা গেল, উত্তরসাগরে ব্যবহৃত এবং ভূমধ্য-সাগরে ব্যবহৃত অর্ণবযান। এই সমুদয় অর্ণবযানও সমসাময়িক ভারতীয় জাহাজ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বোধ হইল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ সর্ব্বত্রই কি প্রায় একরূপ ছিল না?

সেমিটিক মিউজিয়াম দেখিলাম। ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ হইতে এসিয়ামাইনরের উপকূল পর্য্যন্ত জনপদের অতীত ইতিহাস এই সংগ্রহালয়ে বুঝিতে পারা যায়। প্রদর্শিত দ্রব্যনিচয়ের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশী নয়। অধিকাংশই বৃটিশ মিউজিয়াম, পারীর লুভ্র্ মিউজিয়াম এবং বার্লিন ও কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল নগরদ্বয়ের সংগ্রহালয়ে রক্ষিত নিদর্শন-সমূহের নকলচিত্র অথবা নকলমূর্ত্তি। কিন্তু অল্প আয়াসে এসিয়ার এই

অঞ্চলের মোটা কথা এখানে শিখিতে পারা যায়। প্রত্যেক দ্রব্য বুঝাইবার জন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রথমে প্রাচীন এসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতা দেখা গেল। প্রাচীন মিশরের মূর্ত্তি, খোদিত লিপি ইত্যাদির কথা সহজেই মনে পড়িল। নরপতিগণের মূর্ত্তি এবং দেবগণের মূর্ত্তি একরূপ। মিশরেও অনেক ক্ষেত্রে রাজাই দেবতা। যুদ্ধবিগ্রহ, নগর-আক্রমণ, মৃগয়া, অশ্বপরিচালনা, তীরধনুকপরীক্ষা ইত্যাদি সামরিক চিত্রই বেশী। প্রাচীন মিশরের ফ্যারাওগণ এবং প্রাচীন পারশ্যের হিটাইট সভ্যতার প্রবর্ত্তকগণ অনেকটা একধরণের জীবনযাপন করিতেন।

হিটাইটদের সভ্যতার নিদর্শন ধরিবার উপায় কঠিন নয়। মাথার দাড়ী এবং পোষাক দেখিলেই এসিরিয়া ও মিশরের প্রভেদ তে পারা যায়। অবশ্য প্রত্নতত্ত্ব অত ছেলেমানুষি নয়।

মিশরের ছাঁচে এসিরিয়ায় ওবেলিস্ক নির্ম্মিত হইত। একটা ওবেলিস্ক দেখিলাম। তাহাতে খৃষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দীর নরপতি শালমানেসার তাঁহার সামরিক কীর্ত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন।

প্রাচীন মিশর কিম্বা প্রাচীন এসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার কথা উঠিলে প্রাচীন ভারতের কথা সহজেই মনে আসে। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের কথা —ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বস্তু বা ঘটনার অকাট্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

সেমিটিক সংগ্রহালয়ের দ্বিতীয় বিভাগ প্যালেষ্টাইন-সম্পর্কিত। খৃষ্টানদিগের বাইবেলগ্রন্থে যে জনপদের উল্লেখ আছে সেই জনপদের ভূগোল ও ইতিহাস বুঝাইবার জন্য এই বিভাগ গঠিত। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট অর্থাৎ ইহুদিদের প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকে যেরূপ ধর্ম্মজীবন, মন্দির, যজ্ঞশালা, পশুবলি, আচারব্যবহার ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায় তাহা আজকাল

সহজে বুঝিবার উপায় নাই। ডাক্তার কনরাড শিক (Dr. conrad Schick) নামক এক ব্যক্তি জেরুজেলেমে বসিয়া সেই জীবন বুঝিবার প্রয়াস করিতেছেন। তিনি নানা উপায়ে প্রাচীন হীব্রুসভ্যতার চিত্র অঙ্কন করিয়া নানাস্থানে পাঠাইতেছেন। এখানে প্রাচীন ইহুদিমন্দির, সলমনের প্রাসাদ ও মন্দির, হারডের ভবন ইত্যাদি কয়েকটি গৃহের কাল্পনিক চিত্র ও মডেল দেখিলাম।

প্রচীন প্যালেষ্টাইন ও সীরিয়ার নরনারীদিগের জীবনযাপন-প্রণালী ব্যতীত এই গৃহে আধুনিক এশিয়ামাইনরের দ্রব্যাদিও সংগৃহীত হইয়াছে। জীবজন্তু, কাষ্ঠ, ধাতু, পোষাক, অলঙ্কার ইত্যাদি নানাবিধ বস্তু দেখিতে পাওয়া গেল।

"সেমিটিক" শব্দে একপ্রকার বিশেষ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে এরূপ জনগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বুঝায়। এইরূপ আর একটি শব্দ "আর্য্য"। আর্য্য বলিলে পণ্ডিতেরা আর্য্যভাষা-ভাষী জনগণকে বুঝিয়া থাকেন। ভাষাব্যবহারের সঙ্গে রক্তসংমিশ্রণ অথবা বংশমর্য্যাদা কিম্বা জাতি-কৌলীন্য ইত্যাদির কোন সম্বন্ধ নাই। য়্যান্থ্রপলজি বা নৃতত্ত্বের শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে আর্য্য বা সেমিটিক ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয় না। ভাষা-বিজ্ঞানের জাতিবিভাগ অনুসারেই এই সমুদয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সেমিটিক ভাষাভাষী জনগণের সভ্যতা প্রধানতঃ তিনটি ক্ষেত্রে বিকাশলাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ, প্রাচীন এসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার হিটাইট সভ্যতা। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন এসিয়ামাইনরের হীব্রু বা ইহুদি সভ্যতা। তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমান আরবের মহম্মদীয় সভ্যতা।

সুতরাং সেমিটিক্ সংগ্রহালয়ে মুসলমানী সভ্যতার নিদর্শনও থাকা আবশ্যক। হার্ভার্ডের মিউজিয়ামে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল।

ভারতবর্ষ, মিশর, পারস্য ও আরব ইত্যাদি নানা দেশ হইতে সংগৃহীত কয়েকখানা হস্তলিখিত কোরান-গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম। কাইরোর আরবী মিউজিয়ামে এই সমুদয় অসংখ্য দেখিয়াছি। বর্ত্তমান মুসলমান-জীবনও বুঝিতে পারা গেল।

আমেরিকা জাতি-তত্ত্ব-আলোচনার প্রধান কেন্দ্র। এজন্য য়্যানথ্রপলজি (নৃতত্ত্ব) এথ্নলজি (মানবজাতিতত্ত্ব) ইত্যাদি বিজ্ঞানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই আছে। হার্ভার্ডবিশ্ববিদ্যালয়ে এজন্য নানাপ্রকার সুবিধাও প্রদত্ত হয়। ছাত্রবৃত্তি, পর্য্যটনের ব্যয়, নৃতত্ত্ববিষয়ক তথ্য-সংগ্রহ ইত্যাদি সকলদিকে সুযোগ পাওয়া যায়। নৃতত্ত্বসম্বন্ধীয় সংগ্রহালয়ও মন্দ নয়—ইহা ক্রমশই বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, নিউইয়র্কের মিউজিয়ামে এবং হার্ভার্ডের এই মিউজিয়ামে—সর্ব্বত্রই লোহিতাঙ্গদিগের বৈষয়িক জীবন বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রধানতঃ চামড়ার কাজ এবং বেতের কাজে ইহারা দক্ষ। ইহাদের দেবদেবী, মুখোস ইত্যাদি অন্যান্য স্থানীয় নরসমাজের উদ্ভাবিত ধর্ম্ম-কলারই অনুরূপ বোধ হয়। ইহাদের হস্তশিল্প দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বর্ত্তমান যুগের বাষ্পশক্তিব্যবহারের পূর্ব্বে ইয়োরোপের জনসাধারণ কিরূপ ছিল, তাহা একবার কল্পনা করিয়া লইলে লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানদিগকে প্রিমিটিভ বা আদিম, অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য বলিতে প্রবৃত্তি হইবে না। বস্তুতঃ রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, কুসংস্কারহীন ও নিরহঙ্কার দৃষ্টিতে যতই মানবাত্মার বিভিন্ন অভিব্যক্তি দেখা যাইবে ততই "সভ্যতা" শব্দটা নূতন করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবে।

কম্প্যারেটিভ জুলজি অর্থাৎ তুলনাত্মক জীববিদ্যা-বিষয়ক সংগ্রহালয় নৃতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়ামেরই অনুরূপ। দুইই বহুকাল পূর্ব্বে প্রায় এক-সময়ে স্থাপিত। হার্ভার্ডে জীবতত্ত্ব ও প্রাণবিজ্ঞান সম্বন্ধে চর্চ্চা অনেকদিন

হইতেই চলিতেছে। এখানকার জীবতত্ত্ববিৎ আগাসিজ জগৎপ্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সংগ্রহালয়ের একটি ক্ষুদ্র গৃহে জীবজগতের সকলগুলি বিভাগই অতি সংক্ষেপে দেখান হইয়াছে। এই গৃহে ২।৪ বার যাওয়া আসা করিলে জুলজি বা জীববিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান সহজেই লাভ করা যায়। এই হিসাবে নিউইয়র্কের বোটানিক্যাল মিউজিয়ামও বিশেষ উপকারী।

এই ক্ষুদ্র গৃহের জীবশ্রেণীগুলি দেখিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত জীব-সম্প্রদায় দেখিবার জন্য অন্যান্য গৃহে আসিতে হয়। এইরূপ বহু কুঠরী অতিক্রম করিলে জীবজগতের বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের জীবজন্তু বুঝাইবার ব্যবস্থাও আছে। এতদ্ব্যতীত সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে জীব-সংগ্রহ করিবার যন্ত্র, জাল ইত্যাদিও দেখিতে পাইলাম।

মিউজিয়ামগুলি আয়তনে সুবৃহৎ নয় বলিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চালাইবার জন্য এইরূপ সংগ্রহই আবশ্যক। উচ্চ অঙ্গের অনুসন্ধান ইত্যাদির নিমিত্ত স্বতন্ত্র ল্যাবরেটরীর প্রয়োজন। মিউজিয়ামে তাহার ব্যবস্থাও আছে। একটা বিশেষ নিয়ম দেখিলাম। জনসাধারণ এই সমুদয় সংগ্রহালয় বিনামূল্যে দেখিতে অধিকার পায়।

প্রাচীন ক্রীটের মিনোয়ান্ সভ্যতা

একজন ইয়াঙ্কি বইন-রমণীর গৃহে নিমন্ত্রণ ছিল। ইহাঁর গৃহ যুক্ত-রাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে—নিগ্রোজাতীয় লোকেরা সাধারণতঃ ঐ অঞ্চলে বাস করে। এই ইয়াঙ্কিরমণী কুমারী অভিংটনের ন্যায় নিগ্রোসমাজের অন্যতম হিতৈষী—কিছুকাল হইতে উত্তরে আসিয়া বাস করিতেছেন।

তিনি প্রথমেই বলিলেন, "মহাশয়, পৃথিবীর সভ্যতা এতদিন পুরুষের হাতে ছিল—ক্রমশঃ নারীজাতির হাতে আসিতেছে। ভবিষ্যতে মানব-সমাজ রমণীতন্ত্র হইবে। তখন সভ্যতার নূতন রূপ দেখিতে পাইবেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিরূপ হইবে তাহার ইঙ্গিত করিতে পারেন কি?" ইনি বলিলেন—"জগতে যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি কাটাকাটি থাকিবে না। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে ইহাই পৃথিবীর শেষ সমর। এইখানেই পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সভ্যতার চরম। রমণীর বাণী যদি আদৃত হইত তাহা হইলে যুদ্ধ বাধিত না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"রমণীজাতি কি যুদ্ধ চাহে না? স্ত্রী-লোকেরা কি দেশের গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে না?" তিনি বলিলেন—"পুরুষেরা ওজর দেখায় যে, তাহারা রমণী জাতির শোচনীয় পরিণাম নিবারণ করিবার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রক্তারক্তির ফলে স্ত্রীলোকের এবং পরিবারের সুখ-বৃদ্ধি ত হয়ই না—শেষ পর্য্যন্ত দেশের মুখ উজ্জ্বলও হয় না। প্রথমতঃ, জননীরা তাহাদের কর্ম্মঠ সন্তানগণকে স্বচক্ষে মরিতে দেখে। যুদ্ধে যে সকল পুরুষ প্রাণত্যাগ করে তাহাদের কষ্ট একপ্রকার নাই বলিলেই

চলে। কিন্তু রমণীরা স্বামীপুত্রহীনভাবে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া মরিতে থাকে। এই কষ্ট পুরুষেরা বুঝিবে না। তারপর যুদ্ধের সময়ে অবলা রমণী কোথায় না লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছে? একে প্রিয়জনের বিয়োগ, তাহার উপর শত্রুহস্তে অমানুষিক অত্যাচার—প্রত্যেক সংগ্রামে রমণীসমাজকে এই দুই প্রকার দুর্দ্দৈব ভোগ করিতে হয়। কাজেই যেদিন হইতে রমণীজাতি রাষ্ট্রশাসনে যথার্থ অধিকার পাইবে সেদিন হইতে যুদ্ধবিগ্রহ সংসার হইতে উঠিয়া যাইবে। পুরুষের নিকট নারীজাতি যত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে তাহার মধ্যে যুদ্ধসংঘর্ষ অন্যতম। পুরুষদিগের উত্তেজনা, উদ্দীপনা এবং অদূরদর্শিতার ফলে রমণীকে কষ্টভোগ করিতে হয়। কিন্তু নারীর বাণী আর বেশী-দিন চাপা থাকিবে না; রাষ্ট্রমণ্ডলে পুরুষের একাধিপত্য অল্পকালের ভিতর ঘুচিয়া যাইবে।”

এই রমণী একজন চিত্রকর এবং নানাবিধ লোকহিতবিধায়ক কর্ম্মে লিপ্ত। ঐতিহাসিক আলোচনায় ইঁহার যথেষ্ট উৎসাহ। ইঁহার গৃহে আর একজন রমণীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনিও চিত্রকর এবং চিত্র-সমালোচক। সম্প্রতি ইয়োরোপীয় চিত্রশিল্পের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বুঝিতেছেন। ইঁহার হাতে Religious Art of France in the XIIth Century নামক ফরাসীগ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ দেখিলাম।

বসিবার ঘরে ছোটবড় নানাপ্রকার বিদেশীয় দ্রব্য সাজান রহিয়াছে—পিত্তলের কাজ, রূপার বাসন, কার্পেটের থলে, চিত্র ইত্যাদি। রমণী বলিলেন—“এইগুলি আমার বিদেশ পর্য্যটনের ফল। কোনটা রুশিয়া হইতে আমদানী, কোনটা স্পেন হইতে আমদানী, কোনটা এশিয়ামাইনার হইতে আমদানী।”

ইনি ৩।৪ বার ইয়োরোপের নানাদেশ দেখিয়া আসিয়াছেন।

একবার ঐতিহাসিক অভিধানের চিত্রকরস্বরূপ গিয়াছিলেন। কয়েকবৎসর হইল পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ক্রীটদ্বীপে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান পরিচালিত হয়। ঐতিহাসিকগণ খননকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন—এই রমণী খনন-লব্ধ সকল দ্রব্যের যথাযথ চিত্র আঁকিয়া দিতেন। রমণী এই অনুসন্ধানের প্রকাশিত সচিত্র বিবরণ দেখাইলেন, ইহাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলিই মুদ্রিত হইয়াছে।

ক্রীটদ্বীপ সম্বন্ধে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা আশা করা যায় না। মাস কয়েক হইল শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার কুমারস্বামী Ostasiatiche Zeitschrift নামক প্রাচ্যসভ্যতা বিষয়ক জার্ম্মাণ ত্রিমাসিকে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ পরে আমাদের মডার্ণরিভিউ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং প্রবাসীর পঞ্চশস্যে তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছিল। লেখক প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশিল্পে ক্রীটীয় শিল্প-রীতির প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে ক্রীটের কোনরূপ সম্পর্ক সম্বন্ধে বোধ হয় কোনপ্রকার আলোচনা হয় নাই।

বস্তুতঃ ক্রীটসম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা এবং মানবেতিহাসে, বিশেষতঃ ইয়োরোপের ইতিহাসে, ক্রীটীয় সভ্যতার মূল্য-নির্দ্ধারণ ও স্থান-নির্ণয় অতি অল্পদিনের কথা। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ ক্রীট সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ নানা বিস্ময়বিজড়িত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে অধ্যাপক ব্যুরি (Bury) প্রণীত গ্রীসের ইতিহাস (History of Greece) সুপরিচিত। এই গ্রন্থে ক্রীটীয় সভ্যতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইতে বুঝা যায়—আজকালকার পণ্ডিতেরা ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতাকে ইয়োরোপীয় সভ্যতার আদিম স্তর বিবেচনা করিতেছেন। এতদিন প্রাচীন গ্রীসকে

ইয়োরোপীয় মানবের শৈশবলীলাক্ষেত্র বিবেচনা করা হইত। বিগত ত্রিশ বৎসরের আবিষ্কারের ফলে সপ্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীন গ্রীস প্রাচীনতর ক্রীটীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী মাত্র। সেই প্রাচীনতর সভ্যতাকে ইজিয়ান (Aegean) সভ্যতা বলা হয়। ইজিয়ান সাগরের দ্বীপাবলির ভিতর এই সভ্যতার কেন্দ্র অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহার নাম এইরূপ। কেহ কেহ ইহাকে মিনোয়ান (Minoan) সভ্যতা বলিয়া থাকেন। ক্রীটদ্বীপের রাজগণের মিনস্ (Minos) উপাধি ছিল।

অধ্যাপক বারোজ্ (Burrows) প্রণীত The Discoveries in Crete—and their bearing on the history of ancient civilisation গ্রন্থে ক্রীটতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। ক্রীটের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম উপকূল, দক্ষিণ রুশিয়া, মধ্য ইয়োরোপ, মিশর ও এশিয়ামাইনর ইত্যাদি জনপদের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ;—

CRETE AND THE EAST : Minoan and Semitic religion—Minoan and Egyptian religion—The Distinctive Element in Cretan Orientalism—Babylon and the Mediterranean—The Red men of the Aegean—Carians and Phœnicians—The coming of the Greeks—The Mediterranean Race.

2. THE NEOLITHIC POTTERY OF SOUTH RUSSIA AND CENTRAL EUROPE : The Neolithic spiral area—Theory of Aegean Origin—Theory of Indo European Origin—Mediterranean Race Theory.

3. Crete and the Homeric Poems.

4. Egyptian chronology : The Great gap in Egyptian history—the continuity of Egyptian Art —Points of contact between Minoan and Egyptian Art.

প্রাচীন মিশরে যে সময়ে ফ্যারাওগণ রাজত্ব করিতেন তখন অবশ্য প্রাচীনগ্রীসের কোন প্রতিপত্তি ছিল না। কিন্তু তখন প্রাচীন ক্রীটের সভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল। ফ্যারাও-প্রবর্ত্তিত সভ্যতা এবং মিনোয়ান সভ্যতা উভয়ের পরস্পর আদানপ্রদানও কথঞ্চিৎ সাধিত হইয়াছিল। কাজেই মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাসে ক্রীটের স্থান আছে।

মিনোয়ান সভ্যতা প্রায় ২০০০ বৎসর বিরাজ করিয়াছিল। পরে এই সভ্যতা ধ্বংস করিয়া ঈজিয়ানসাগরের অভ্যন্তরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে এবং চতুষ্পার্শ্বে, অর্থাৎ গ্রীস, এশিয়ামাইনর ইত্যাদি জনপদে উত্তর ইয়োরোপ হইতে সমাগত জনগণ নূতন নূতন জীবন-কেন্দ্র স্থাপন করে। সে প্রায় খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেরও ১৫০০ বৎসরের কথা—ইহারাই গ্রীক নামে পরিচিত —হোমারীয় কাব্য এই যুগের রচনা। সুতরাং হোমার প্রাচীন গ্রীসের জন্মকালে এবং প্রাচীনতর ক্রীটের মৃত্যুকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ফলে হোমারীয় সাহিত্যে মিনোয়ান বা ঈজিয়ান সভ্যতারই সবিশেষ পরিচয় পাই। ক্রীটতত্ত্ব আলোচনার ফলে হোমারতত্ত্ব-সম্বন্ধে নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল।

দেখাশুনা

বষ্টনে যাওয়া আসা করিতেছি। পুরাতন নগরের অলিগলির পাশে নিউইয়র্কের ধরণে রাস্তাঘাট ক্রমশঃ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার শিক্ষাসংগ্রহালয় দেখিলাম। ভবনটি বেশীদিনের পুরাতন নয়—সংগ্রহও দিন দিন বাড়িতেছে। নিউইয়র্কের মিউজিয়ামে ফরাসী চিত্রকরগণের কার্য্য বেশী দেখিয়াছি। বষ্টনেও তাহাই দেখিতেছি। ইয়াঙ্কিরা মিশরীয়দিগের ন্যায় ফরাসীকে সত্য সত্যই ভালবাসে। ফরাসীবীর লাফেয়েত ইয়াঙ্কিস্থানের স্বাধীনতা-সমরে সাহায্য করিয়াছিলেন।

মিউজিয়ামে প্রাচীন ক্রীট-সম্পর্কিত দ্রব্যনিচয় দেখিলাম। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ১৫০০ পর্য্যন্ত কালের প্রস্তরপাত্র, পিত্তল ও হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্য, দেবীমূর্ত্তি ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থ সংগৃহীত রহিয়াছে। সংগ্রহের পরিমাণ বেশী নয়। জাপানী ও চীনা গৃহে অনেক জিনিষ দেখা গেল। এখানে মধ্যযুগের জাপানী চিত্রাবলীর সংখ্যা মন্দ নয়। জাপানীরা তরুলতা, পশুপক্ষী, বনপর্ব্বত ইত্যাদি আঁকিতে সিদ্ধহস্ত। নিউইয়র্কে একদিন চীনা চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী দেখিয়াছিলাম। তাহাতে খৃষ্টীয় ৬০০ হইতে ১৪০০ পর্য্যন্ত কালের কার্য্য দেখান হইয়াছিল। এই শিল্পেও প্রাকৃতিক-পদার্থ-চিত্রণের সৌষ্ঠব লক্ষ্য করিয়াছি। বষ্টনের সংগ্রহালয়ে জাপানী কুম্ভকারের কার্য্যও বহুল পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। মোটের উপর ধারণা জন্মিল যে, গ্রীস মিশর ইত্যাদি অপেক্ষা ফ্রান্স ও জাপান এই মিউজিয়ামে লোকের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করে। বোধ হয় জাপানের সংবাদ ইয়াঙ্কিদের সম্প্রতি বিশেষভাবে রাখা আবশ্যক।

২৭৪ পৃষ্ঠা
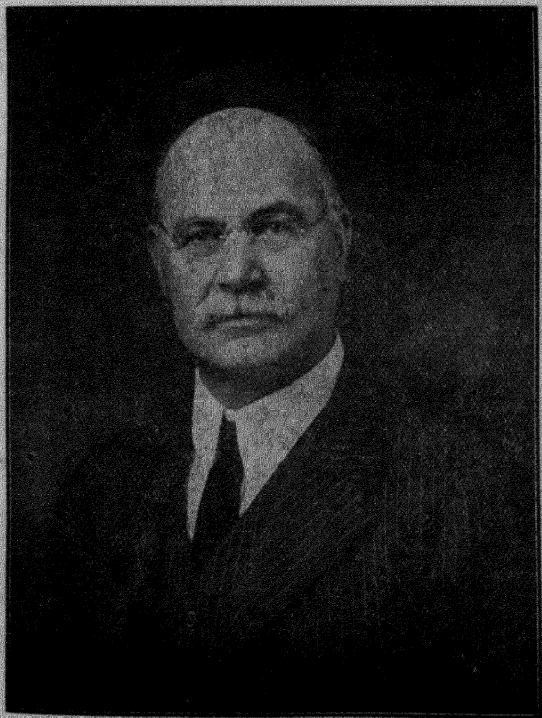
১৯। ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক টাওসিগ

বষ্টননগরে অনেক "সোশ্যাল সার্ভিস সেট্‌ল্‌মেণ্টস্‌" অর্থাৎ সমাজ-সেবকদের বাসকেন্দ্র আছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক বড় জায়গায়ই এইরূপ সমাজসেবার কেন্দ্র বা লোকহিতবিধায়িনী সমিতি আজকাল দেখা যায়। যেখানে যত টাকাপয়সা ও বিলাসভোগ সেই-খানেই তত দারিদ্র্য, দুর্দ্দশা ও অধোগতি! বষ্টনের এক কর্ম্মকেন্দ্রে উপস্থিত হইলাম। কয়েকজন রমণী ও একজন পুরুষের সঙ্গে আহার করা গেল। পুরুষটি আমারই মত অভ্যাগত। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে জর্জিয়া প্রদেশের আটলাণ্টানগরে শিক্ষাপ্রচার করেন। জর্জিয়া প্রদেশ নিগ্রোপ্রধান। ইনি একটি নিগ্রো-বিদ্যালয়ের পরিচালক। ইঁহাকে দেখিয়া শ্বেতাঙ্গ ইয়াঙ্কি বলিয়া বোধ হয়। এমনকি, নিগ্রোসুলভ কোঁকড়াচুলও ইঁহার নাই। ইনি চলিয়া গেলে ইয়াঙ্কি রমণীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ব্যক্তি যে নিগ্রো তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি?" এইরূপ দোআঁসলা নিগ্রোর সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র নিগ্রোসংখ্যার দশমাংশ।

ইয়াঙ্কি রমণীগণ পাড়ার দরিদ্র বালকবালিকাদিগকে বিনামূল্যে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য রাত্রিতে চালান হয়। রন্ধন হইতে ব্যায়াম ও নৃত্যকলা পর্য্যন্ত সকল বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। নিগ্রো ইয়াঙ্কি সকলবর্ণের লোকই এই সেবা-কেন্দ্রের উপকার লাভ করে। ইয়াঙ্কি রমণীগণ ভারতবর্ষের নাম শুনিয়াছেন; ইঁহাদের কোন কোন আত্মীয় দক্ষিণভারত, পঞ্চনদ এবং অন্যান্যস্থানে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণের সঙ্গে কর্ম্ম করিতেছেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের একটা আড্ডা আছে। তাহার নাম কলোনিয়াল ক্লাব। ইঁহাদের নিমন্ত্রণে বাহিরের লোকেরা এই ক্লাবের মেম্বার হইতে পারেন। এ দেশের অন্যান্য সাধারণ ক্লাবের মত

ইহা একটা হোটেলবিশেষ। পাঠাগারে নানাপ্রকার সংবাদপত্র রক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র লাইব্রেরীও আছে। ছাত্রদের আড্ডার নাম হার্ভার্ড ইউনিয়ন। বিলাতী অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে এইপ্রকার ইউনিয়ন আছে। এই ইউনিয়নের সভ্যেরা খেলাধূলা, নাচগান ইত্যাদি সকলপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

অধ্যাপক টাওসিগ (Taussig) হার্ভাডে´ ধনবিজ্ঞান বিভাগের কর্ত্তা। ইনি ভারতবর্ষে বোধহয় সুপরিচিত নন। ইহাঁর প্রণীত গ্রন্থ কয়েকবৎসর মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দেশে এতকাল মিলের যুগ চলিতেছিল—সম্প্রতি অধ্যাপক মার্শ্যালের যুগ চলিতেছে। টাওসিগের গ্রন্থে কথঞ্চিৎ নূতন আকারের কতকগুলি সমস্যার আলোচনা করা হইয়াছে।

টাওসিগ বলিলেন, "মহাশয়, আপনারা যদি ভারতবর্ষে ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার যথার্থ ব্যবস্থা করিতে চাহেন, তাহা হইলে বিগত এক হাজার বৎসরের আর্থিক ও বৈষয়িক ইতিহাস বুঝিতে চেষ্টা করুন। কয়েক-জন উচ্চশিক্ষিত ছাত্রকে "ইকনমিক হিষ্টরি" অর্থাৎ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও আর্থিক অবস্থার ইতিহাস আলোচনা করিতে নিযুক্ত করুন। তাহার জন্য ইহাঁদিগকে জার্ম্মানি, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আসিতে হইবে। আমার মতে, ইহাঁদের কোন একদেশে থাকিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক ছাত্রকে তিনদেশেই এক এক বৎসর করিয়া থাকিতে হইবে। আমেরিকায়ও ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা এই উপায়েই স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। কলাম্বিয়ার সেলিগ্‌ম্যান, উইস্কন্সিনের ইলাই ইত্যাদি আজকালকার প্রসিদ্ধ ইয়াঙ্কি অধ্যাপকগণ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা অনুসারে অধীত বিদ্যার প্রয়োগ করিতেছেন। আজকাল আমরা ইয়াঙ্কিস্থানে নূতন মতের ধনবিজ্ঞান

২৭৬ পৃষ্ঠা
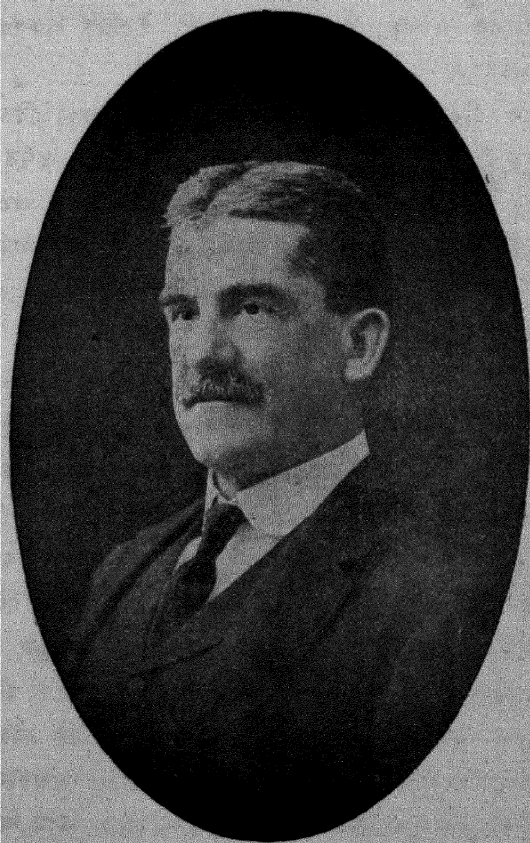
২০। অধ্যাপক ল্যানম্যান

প্রচার করিতেছি। প্রথম যুগে আমরা ইংরাজ পণ্ডিতগণের বুলি আওড়াইতাম মাত্র। ১৮৭০ সালের পর বিশবৎসর কাল আমরা জার্ম্মান মত অবলম্বন করিয়া ছিলাম। এক্ষণে আমাদের স্বতন্ত্র ইয়াঙ্কি-মতবাদ চলিতেছে, বলিতে পারি।"

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে খানিকক্ষণ আলোচনা হইল। যাহাকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভলিউশন (Industrial Revolution) বা "শিল্পবিপ্লব" বলা হয়—উনবিংশশতাব্দীর সেই বাষ্প-চালিত-শিল্পের বিকাশ বাজারের আয়তন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াছে। বিলাতের মালগুলি যদি একমাত্র বিলাতী লোকের অভাবনিবারণের জন্য প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে বিরাট কারখানা-যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত কারবার, শ্রমবিভাগ-নীতির প্রবর্ত্তন ইত্যাদি বেশী হইতে পারিত কি? কিন্তু সমগ্র ভারত-বর্ষের বাজার বিলাতের হস্তগত ছিল। এজন্য বহু নরনারীর বহুবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তাহার ফলেই বড় বড় ফ্যাক্টরী, সুবৃহৎ অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রচলন হইতে পারিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিলাতের বাজার না থাকিলে বড় বড় কারখানা খুলিয়া কোন লাভ হইত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজেরা নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্যের একচেটিয়া বাজার না পাইলে বৈজ্ঞানিক কলকারখানার ব্যবহার, সময়লাঘবকারী যন্ত্রাদির প্রয়োগ, নব নব আবিষ্কার—এক কথায় শিল্প-বিপ্লব—দেখা দিত না।

টাওসিগের মতে নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্যভোগ অথবা একচেটিয়া বাজারের অধিকার না থাকিলেও সুবৃহৎ শিল্পকারখানা এবং বড় বড় ফ্যাক্টরী Large Scale Production ইত্যাদি চলিতে পারিবে। "আজকাল নানাকারণে প্রত্যেকদেশই এক হিসাবে অন্যান্য সকল দেশের বাজার-স্বরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশসমূহের লোকেরা

পরস্পর দ্রব্যবিনিময় না করিয়া পারিবে না। ভবিষ্যতে বাজারের আয়তন কোন মতেই কমিবার সম্ভাবনা নাই। (World market বা) বিশ্ববাজার জগতে থাকিয়া গেল। কাজেই কোন দেশে বিরাট কারখানা খুলিয়া একসঙ্গে বহুপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে কারবার-ওয়ালাদিগকে খরিদদার খুঁজিবার জন্য বসিয়া থাকিতে হইবে না—অথবা একমাত্র স্বদেশীয় ক্রেতাদিগের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। পৃথিবীর নানাস্থান হইতেই অর্ডার যথাস্থানে আসিতে থাকিবে।"

টাওসিগ যুক্তরাষ্ট্রের কথা পাড়িলেন। ইনি বলেন যে, ইয়োরোপ অথবা এশিয়ার সকল দেশের সঙ্গে ইয়াঙ্কিদের ব্যবসায় ও বাণিজ্য যদি নিতান্তই স্থগিত হইয়া যায়, তথাপি আমেরিকায় বড় বড় ফ্যাক্টরীর কাজ চলিতে পারিবে। যুক্তরাষ্ট্রের পঁয়তাল্লিশ প্রদেশের অভাবমোচন করিবার জন্য সুবৃহৎ কারখানাসমূহের সুযোগগুলি ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক থাকিবে। কুটির-শিল্প এবং ক্ষুদ্র কারবার কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত চিরকালই থাকিবে। কিন্তু মোটের উপর বিংশশতাব্দীতে উনবিংশ-শতাব্দীর (Industrial Organisation বা) শিল্পব্যবস্থাই বজায় থাকিবে।

ভারতবর্ষের অনেকেই সংস্কৃতাধ্যাপক ল্যানম্যানের নাম শুনিয়াছেন। ইনি Harvard Oriental Series বা "হার্ভার্ড প্রাচ্য গ্রন্থমালা"র সম্পাদক। এই গ্রন্থমালায় সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেম্বলকার এম্-এ, পি-এইচ-ডির (হার্ভার্ড) 'উত্তরচরিত' গ্রন্থের সটীক সানুবাদ সংস্করণ বাহির হইতেছে।

ল্যান্‌ম্যানের গৃহে সংস্কৃত এবং পালির ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক ইংরাজী ফরাসী ও জার্ম্মাণ গ্রন্থ ও পত্রিকার সংগ্রহ দেখিলাম। ভারত-বর্ষে এরূপ একটা লাইব্রেরী পাইলে আমাদের ঐতিহাসিক ও প্রত্ন-

২১। মারাঠা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেল্বলকার
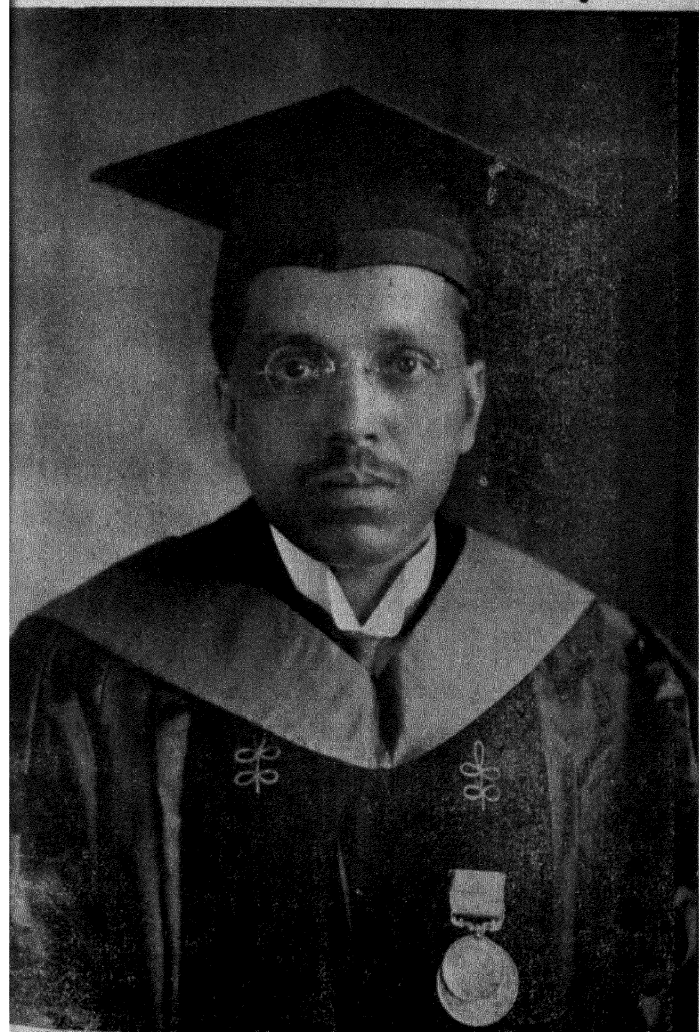
তাত্ত্বিকগণ যথার্থ উচ্চ শ্রেণীর কার্য্য করিতে সমর্থ হন। এইরূপ গ্রন্থালয়ের অভাবে আমাদের অধিকাংশ কার্য্যই মধ্যম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ থাকিয়া যাইতেছে। ইহাই ভারতীয় গ্রন্থকারের প্রণীত এবং ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর যথোচিত সমাদর না হইবার অন্যতম কারণ।

ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম অঞ্চলের নানা কেন্দ্র হইতে আজকাল সংস্কৃত প্রাকৃত বা পালি সাহিত্যের প্রচার হইয়া থাকে। ল্যান্‌ম্যান্ প্রত্যেক কেন্দ্রের নামই জানেন। ইহাঁর গৃহে সকলস্থানের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দেখিতে পাইলাম। আমরা ভারতবর্ষে থাকিয়াও সকল গ্রন্থাবলী একসঙ্গে চোখে দেখিয়াছি কি?

ল্যানম্যান্ ভারতীয় প্রকাশক ও সম্পাদকগণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, এই সকল গ্রন্থমালা সম্পাদনে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রযুক্ত হইতেছে, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু এরূপ বিশ্রীভাবে গ্রন্থ প্রকাশ করিবার রীতি বোধ হয় জগতে আর কোথাও নাই। আজকাল জ্ঞানের রাজ্য প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে—কম সময়ে প্রত্যেককে বেশী কাজ করিতে হইবে। কোন একটা খুঁটিনাটি লইয়া সময় খরচ করা অসম্ভব। কিন্তু ভারতে প্রকাশিত কোন গ্রন্থের মলাটে হয়ত নামই লিখিত থাকে না। কোন গ্রন্থে সূচীপত্র পশ্চাতে। নির্ঘণ্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করা কোন গ্রন্থকারই কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন না। পাতা কাটা, বাঁধান, মলাট ইত্যাদি বিষয়েও সকলেই অমনোযোগী। তাহার পর ধারাবাহিকরূপে যে সকল পত্রিকা মাস মাস বাহির হয় তাহাদের সম্পাদকগণ নিতান্তই কাণ্ডজ্ঞানহীন। হয়ত চারিখানা গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ প্রথম সংখ্যায় বাহির হইল। দ্বিতীয় সংখ্যায় হয়ত মাত্র দুইখানা গ্রন্থের পরবর্ত্তী কিয়দংশ বাহির হইল। তৃতীয় সংখ্যায়

হয়ত আবার চারিখানা গ্রন্থেরই কিছু কিছু অংশ বাহির হইল। এইরূপে হয়ত আট সংখ্যায় চারিখানা গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। কিন্তু বলুন ত—এই চারিখানা গ্রন্থ স্বতন্ত্র করিয়া বাঁধাইতে এবং স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিতে পাঠকের কি অসুবিধা? এত অসুবিধা ভোগ করা আজকালকার দিনে একবারে অসাধ্য। কাজেই ভারতীয় প্রকাশকগণের কার্য্য ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় আদৃত হয় না।"

বিশ্বসাহিত্য

আমাদের দেশের খবরের কাগজ এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-গুলিকে আমরা ঘরে বসিয়া যথেষ্টই নিন্দা করিয়া থাকি। বাহিরে আসিয়া বুঝিতেছি, আমরা সত্যসত্যই বেশী নিন্দার পাত্র নহি। বিলাতে এবং আমেরিকায় সংবাদপত্রগুলি বিশেষ কোন যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে বলিয়া মনে হয় না। কি বিষয়-নির্ব্বাচন, কি তথ্য-সংগ্রহ, কি সম্পাদকীয় মন্তব্যপ্রকাশ—কোন বিষয়েই বিলাতী ও ইয়াঙ্কি কাগজওয়ালারা ভারতীয় অসহযোগীদিগকে বেশী পশ্চাতে ফেলিতে পারেন না। তবে সমগ্র পাশ্চাত্যমণ্ডলে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও জীবনই উচ্চতর—এইজন্য স্বভাবতই এখানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা সাময়িক সাহিত্যের সুর কিছু উন্নত। তাহা ছাড়া, পরিচালনা সম্বন্ধে এখানে যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষ দেখা যায় সন্দেহ নাই। মাসিকই হউক বা দৈনিকই হউক—প্রত্যেক পত্রই এক একটা বিরাট লাভজনক ব্যবসায়-বিশেষ। এই ব্যবসায়-চালাইবার দিক্ হইতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক কাগজ-পরিচালকই যে কোন পাশ্চাত্য পরি-চালকের নিম্নে পড়িবেন—একথা বলিতে বাধ্য। কিন্তু সম্পাদনহিসাবে এলাহাবাদের দৈনিক "লীডার", মান্দ্রাজের সাপ্তাহিক "হিন্দু", কলিকাতার মাসিক "মডার্ণ রিভিউ" এবং মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকাগুলি এই ধরণের বিদেশী পত্রিকাবলীর সমকক্ষ। অবশ্য আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ-সম্পাদিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক পত্রের অভাব যৎপরোনাস্তি। দাক্ষিণাত্যের "দি ওয়েলথ্ অফ্ ইণ্ডিয়া", কলিকাতার "বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা", শ্রীযুক্ত

গঙ্গানাথ ঝার "ইণ্ডিয়ান থট" এবং পাণিনি আফিসের (The Sacred Books of the Hindus Series) হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থমালা ত্রিশ-কোটি নরনারীর দেশে নগণ্য বলিলেই চলে। খাঁটি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক পত্রিকা বোধ হয় একখানাও নাই। এইখানেই আমরা বর্ত্তমান জগতের নরসমাজ হইতে পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এই মাপকাঠিতে আমাদের স্বাধীনচিন্তার অভাব, আমাদের মৌলিকতার অভাব, আমাদের উদ্ভাবনীশক্তির অভাব সহজেই বুঝিতে পারি।

বিলাতের এবং ইয়াঙ্কিস্থানের দৈনিক ও মাসিক পত্রে চিত্রশিল্প, স্থাপত্য এবং নাটক, নৃত্যকলা, সঙ্গীত ও সাধারণ সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনা প্রায়ই বাহির হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও সাময়িক পত্রিকায় এবং খবরের কাগজে সমালোচনার স্তম্ভ আছে। সর্ব্বত্রই ধরণ-ধারণ, লিখিবার ভঙ্গী, সমালোচনার রীতি প্রায় একরূপ। এই রচনা-গুলিকে বাস্তাবিকপক্ষে সমালোচনা বলা অন্যায়—চিত্রপরিচয়, চিত্রকর-পরিচয়, শিল্পী-পরিচয়, গ্রন্থের বিবরণ, নর্ত্তকীর বিবরণ, ওস্তাদের জীবন-বৃত্তান্ত ইত্যাদি বলাই কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য মহলেও ভারতবর্ষ অপেক্ষা উচ্চতর প্রণালী দেখিতে পাই না। আমাদের সম্পাদক ও "শ্রীসমা-লোচক"গণকে বিশেষ দোষী বিবেচনা করিবার কারণ নাই। পুস্তক সমালোচনা করিতে হইলে লেখকগণ ভূমিকা, সূচীপত্র, নির্ঘণ্টপত্র এবং অভ্যন্তরের কোন অর্দ্ধ অধ্যায় হইতে বাছিয়া দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করেন। কোন নটী অথবা গায়ক এবং চিত্রাঙ্কণ বা মূর্ত্তির বিবরণ প্রদান করিতে হইলে লেখক গৃহসজ্জার কথা, শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের কথা ইত্যাদি অবতারণা করিয়া কার্য্য সাধিতে চেষ্টা করেন। রবিবাবুর গ্রন্থাবলী বিলাত ও আমেরিকার কত কাগজে প্রশংসিত হয়। সমালোচনার রীতি সেই মামুলিধরণের—

"ম্যাক্‌মিলান যখন প্রকাশক, নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত রবিবাবু যখন লেখক বা অনুবাদক, ভারতীয় "মিষ্টিক" চিন্তায় যখন এই গ্রন্থ ভরপুর, তখন বলাই বাহুল্য, এই গ্রন্থের বিশেষ আদর হইবে। পাঠকগণকে কবিতার (অথবা রচনার) রস আস্বাদন করাইবার জন্য কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। * * * আর একটা নমুনা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম * * *।"

এই ধরণের সমালোচনা বা শিল্পী-পরিচয় বিলাতী ও ইয়াঙ্কি সাময়িক পত্রে সাধারণতঃ দেখিতে পাই। সুতরাং ভারতবাসীর অত্যধিক আত্মনিন্দা করিবার প্রয়োজন নাই মনে হইতেছে।

যথার্থ সমালোচনাপদবাচ্য রচনা এই সকল দেশের পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই রচনাসমূহে লেখক কাব্য, সঙ্গীত ও সুকুমার শিল্পের ভিতরকার কথা টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করেন। কবি, গায়ক ও শিল্পীর বাণী—তাঁহাদের অন্তর্জ্জগৎ এই সমুদয় রচনায় স্পষ্টরূপে প্রচারিত হয়। উৎকৃষ্ট কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীতের ন্যায় এই ধরণের সমালোচনাও বিরল। কারণ, এরূপ সমালোচনা প্রকৃত প্রস্তাবে মৌলিক সৃষ্টিশক্তির পরিচয়—দার্শনিক মনীষার সাক্ষ্য—দর্শনশাস্ত্রেরই এক অঙ্গ বা বিভাগ।

প্রকৃত সমালোচক বঙ্গসাহিত্যের আসরেও দেখা দিয়াছেন। আমাদের সমালোচনার ঘর নিতান্ত শূন্য নয়। বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর সমালোচনাসাহিত্যে বাঙ্গালীর প্রতিনিধি। বিলাতি সমালোচকগণের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে বলিব, ব্যাজহট (Bagehot), লেসলী ষ্টিফেন (Leslie Stephen) এবং ম্যাথিউ আর্ণল্ড (Matthew Arnold) ইত্যাদির প্রবর্ত্তিত সমালোচনাপ্রণালী ইঁহাদের রচনাতেও দৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা সমালোচ্য

সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা, ভাষ্য ও টিপ্পনী লিখিয়াছেন।

সাহিত্যসমালোচনার অন্য এক রীতি দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ-প্রণীত The New Essays in Criticism নামক গ্রন্থে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত অনেকেই জানেন না। ইহার প্রভাবও ভারতবাসীর ইংরাজী এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে বিন্দুমাত্র পড়ে নাই। ইহাতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনা এবং পাশ্চাত্য সমালোচকগণের সমালোচনা আছে। তাহা ছাড়া, উনবিংশশতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থনিবদ্ধ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বর্ত্তমান জগতের চিন্তামণ্ডলে ভারতবর্ষের স্থান সহজেই ধরিতে পারা যায়। দুঃখের কথা, গ্রন্থের ভিতর বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখ এবং পাণ্ডিত্যের অবতারণা এত অধিক যে, পৃথিবীর বেশী লোক ইহা সহজে বুঝিতে পারিবে না—বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর ত কথাই নাই। ইহার প্রাঞ্জল সংস্করণ এবং ভাষ্যস্বরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

ব্রজেন্দ্রনাথ যেরূপ তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালীর পক্ষপাতী, চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন স্বাধীনভাবে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সমালোচনার আসরে নামিয়াছেন। ইঁহার রচনাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে এই সমুদয়ের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইবে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ঐতিহাসিক গ্রন্থ। লেখককে স্থানে স্থানে সমালোচকের কার্য্যও করিতে হইয়াছে। ইঁহার সমালোচনায় সাধারণতঃ ম্যাথিউ আর্নল্ড্, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির ব্যাখ্যা-প্রণালীই বিশেষ প্রকটিত—কিন্তু মাঝে মাঝে দ্বিতীয় প্রণালীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দীনেশবাবুর History of Bengali Language and Literature" নামক ইংরাজী গ্রন্থে এই রীতির পরিচয় বেশী।

বর্ত্তমান বাঙ্গালাসাহিত্যের আসরে মামুলি গ্রন্থপরিচয় অথবা "শ্রীসমালোচক'-লিখিত শিল্প-পরিচয় ব্যতীত যথার্থ সমালোচনার প্রয়াসও আছে। বিগত সাতবৎসরে সমালোচনার ঘরে লেখকের সংখ্যা বাড়িয়াছে—রবীন্দ্রনাথের নোবেল-প্রাইজ লাভের পর সাহিত্য-সমালোচনায় বাঙ্গালাসাহিত্য সবিশেষ পুষ্টিলাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর নিরেট ফল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি আমাদের দেশে সমালোচনার দুই রীতিই অবলম্বিত হইয়া থাকে।

বিলাতে থাকিয়া ইয়োরোপের কথা বেশী শুনিতাম না—বিশ্বচিন্তা, বিশ্বসাহিত্য ইত্যাদির সংবাদ পাইতাম না। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবারা ইত্যাদি বড় বড় চিন্তা-কেন্দ্রগুলি যেন জমাটবাঁধা প্রাচীর-বেষ্টিত চর বা দ্বীপস্বরূপ। দুনিয়ার ভাব-স্রোত এই সমুদয় 'চরে' সহজে প্রবেশ করে না। ইয়াঙ্কিস্থানে দেখিতেছি—সমগ্র ইয়োরোপই আমার সম্মুখে। এখানকার চিন্তামণ্ডলের আবহাওয়ায় সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, গতানুগতিকতা যেন একেবারেই নাই বোধ হইতেছে। কলাম্বিয়াবিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ডবিশ্ববিদ্যালয় দুই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তারাই ইয়োরোপের সকল প্রদেশকে নিজ নিজ কেন্দ্রে টানিয়া আনিতে সচেষ্ট। ফরাসী, ইটালীয়, রুশ, জার্ম্মান ইত্যাদি সকল জাতীয় চিন্তাই ইয়াঙ্কি-প্রতিষ্ঠানে মর্য্যাদা লাভ করে। ইয়োরোপের বিভিন্ন সাহিত্য কলা ও সভ্যতা শিখাইবার জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ফলতঃ ফ্রান্স, জার্ম্মানী ইত্যাদি দেশের পরিচয় ইংরাজীভাষায় পাইতে হইলে বিলাতে না যাইয়া আমেরিকায় আসাই সুবিধাজনক। হার্ভার্ড ও কলাম্বিয়া-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ইয়োরোপের নানা সাহিত্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, বিলাতের ইংরাজী-সাহিত্যে সে সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাঙ্গলাদেশে এক্ষণে সাহিত্যসমালোচনা, সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা, শিল্পরীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ইত্যাদি চলিতেছে। এদিকে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টিও পড়িয়াছে। এই সময়ে আমরা বিশ্বসাহিত্যের সংবাদ রাখিতে চেষ্টা করিলে সবিশেষ উপকৃত হইব। আমরা তুলনামূলক ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক আলোচনাপ্রণালী নানাক্ষেত্রে অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তও হইয়াছি। কাজেই দুনিয়ার চিন্তাশক্তি হইতে তথ্য ও তত্ত্বসংগ্রহ করিয়া স্বকীয় স্বাস্থ্য ও কলেবর পুষ্ট করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। আমরা যে পথে অগ্রসর হইয়াছি সেই পথই আরও প্রশস্ত ও বিস্তৃত হইতে পারিবে।

এইজন্য এক্ষণে তুলনামূলক সমালোচনা-প্রণালীর প্রবর্ত্তকগণের গ্রন্থ আমাদের দেশে অধীত ও প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। ফরাসী তেন (Taine), এদমঁ শেরার (Edmond Scherer) এবং স্যাঁৎ বভ (Sainte Beuve), ডেনমার্কের জর্জ ব্রাণ্ডেস (Georg Brandes) এবং আয়র্ল্যাণ্ডের ডাউডেন (Dowden) ইত্যাদির রচনাবলী সুপ্রচলিত হইলে সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, নাটক, কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদির মূল্য নূতন ভাবে সমাজে প্রচারিত হইতে থাকিবে। বস্তুতঃ সাহিত্যসমালোচনার ভিতর দিয়া জাতীয় চরিত্রগঠনের সুযোগ আসিবে। এই ধরণের সমালোচক যথার্থ ভাবে দার্শনিক—অর্থাৎ পথ প্রদর্শক—নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তক—সুতরাং জাতীয়জীবনের নিয়ামক।

হার্ভার্ডবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুনো ফ্রাঙ্কা জার্ম্মানসাহিত্য সম্বন্ধে একখানা সমালোচনাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য কোন দার্শনিক, সমালোচক বা ঐতিহাসিকের মতবাদ অভ্রান্ত

সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। ব্রাণ্ডেস, ডাউডেন অথবা ফ্রাঙ্কার সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধেও এই কথাই খাটিবে। কিন্তু ইহাঁদের আলোচনা-প্রণালী লক্ষ্য করিবার জন্যই ইহাঁদের আদর প্রধানতঃ হওয়া উচিত।

ফ্রাঙ্কা-প্রণীত Social Forces in German Literature গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচনাপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"There seems to be a decided need of a book which should give a coherent account of the great intellectual movements of German life as expressed in literature ; which should point out the mutual relation of action and reaction between these movements and the social and political condion of the masses from which they sprang or which they affected ; which in short, should trace the history of the German people in the works of its thinkers and poets."

অর্থাৎ জার্ম্মানীর সাহিত্যের মধ্য দিয়া জার্ম্মান জীবনের বুদ্ধিবিদ্যা সম্পর্কীয় যে সমস্ত প্রচেষ্টার আভাস পাওয়া যায় তাহার একটি ধারাবাহিক ও সুসংলগ্ন পরিচয় দিতে পারে এমন একখানা গ্রন্থের নিতান্ত প্রয়োজন আছে ; এই সমস্ত প্রচেষ্টা, যে জনসাধারণের মধ্য হইতে জন্মলাভ করিয়াছে বা যাহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার সহিত উক্ত প্রচেষ্টা-সকলের ঘাতপ্রতিঘাত ও পরস্পরের সম্পর্ক সেই গ্রন্থ ধরিয়া বুঝাইয়া দিবে। এক কথায় বলিতে গেলে, উক্ত গ্রন্থ জার্ম্মান জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ও কবিদের রচনা হইতে সমগ্র জার্ম্মান জাতির ইতিহাস উদ্ধার করিবে।

গ্রীন (John Richard Green)-প্রণীত History of English

people গ্রন্থ ভারতবর্ষে সুপরিচিত। এইগ্রন্থের সাহিত্যসংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে এই ধরণের সমালোচনাপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

জর্জ্জ ব্রাণ্ডেসের সেক্সপীয়ার-বিষয়ক গ্রন্থের নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। তাঁহার আর একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত। নাম Main Currents in Nineteenth Century Literatures. এতদ্ব্যতীত নরওয়ের নাটককার ইব্‌সেন, জার্ম্মান শ্রমজীবীর বন্ধু ফার্ডিনাণ্ড ল্যাসেল এবং পোলিশ জার্ম্মান দার্শনিক নীট্‌শে সম্বন্ধে জীবনী ও সমালোচনা-গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত। Main Currents গ্রন্থের বিভাগগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:—

1. The Emigrant Literature.
2. The Romantic School in Germany.
3. The Reaction in France.
4. Naturalism in England.
5. The Romantic School in France.
6. Young Germany.

আর্ণল্‌ড্‌ রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির অবলম্বিত ব্যাখ্যাভাষ্যরীতি এবং ব্রজেন্দ্রনাথ ডাউডেন ইত্যাদির অবলম্বিত তুলনামূলক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আলোচনা-প্রণালীর প্রভেদ জর্জ্জ ব্রাণ্ডেনের ভাষায় দেখাইতেছি:—

"Regarded from the merely aesthetic point of view as a work of art, a book is a self-contained, selfexistent whole, without any connection with the surrounding world. But looked at from the historical point of view, a book, even though it may be a perfect, complete work

of art, is only a piece cut out of an endlessly continuous web. Aesthetically considered, its idea, the main thought inspiring it, may satisfactorily explain it, without any cognisance taken of its author or its environment as an organism ; but historically considered, it implies, as the effect implies the cause, the intellectual idiosyncrasy of its author, which asserts itself in all his productions which condition this particular book, and some understanding of which is indispensable to its comprehension. The intellectual idiosyncrasy of the author, again, we cannot comprehend without some-acquaintance with the intellects which influenced his development, the spiritual atmosphere which he breathed."

সৌন্দর্য্য ও রসবোধের তরফ হইতে দেখিতে গেলে, গ্রন্থ তাহার আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, পারিপার্শ্বিক জগৎ-ব্যাপারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই ; কিন্তু ইতিহাসের তরফ হইতে দেখিলে প্রত্যেক গ্রন্থই একটা বিরাট অ-শেষ প্রবাহের একটি ঢেউ মাত্র। সৌন্দর্য্যের হিসাবে উহার অন্তর্গত প্রধান ভাবই সবিশেষ উপভোগ্য। তাহার জন্য গ্রন্থকার বা তাহার আশেপাশের ঘটনা বা সংস্থান প্রভৃতিকে আমল না দিলেও চলে। কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে, উহা তাহার রচয়িতার ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তির খেয়ালের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই খেয়ালকে ঠিকমত বুঝিতে হইলে, যে বুদ্ধি বিদ্যা মনন ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় গ্রন্থকার জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছেন তাহার সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক।

এই ধরণের সাহিত্যসমালোচনা সভ্যতার ইতিহাসের এক অধ্যায় স্বরূপ। ফরাসী অধ্যাপক গেরার (Guerard)-প্রণীত French Prophets of Yesterday : A Study of Religious Thought under the Second Empire এই শ্রেণীর সমালোচনাগ্রন্থ। ইহাতে গীজো (Guizot), শেরার (Scherar), কীনে (Quinet), মিশলে Michelet), হ্যুগো (Victor Hugo), সঁ্যা সিমঁ (Saint Simon), প্রুধঁ (Proudhon), ভিঞি (Vigny), লীল (Lisle), স্যাঁৎ বাভ (Sainte Beuve), তেন্ (Taine), রেনাঁ (Renan) ইত্যাদি লেখকগণের সাহিত্যজীবন ও চিন্তাপ্রণালী ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের রীতিতে আলোচিত হইয়াছে। ১৮৪৮ খ্রী: অ: হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত ফরাসীদিগের জাতীয় জীবন এই সাহিত্যসমালোচনার গ্রন্থে বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। লেখক ক্যালিফর্ণিয়ার লীল্যাণ্ড ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

৫।৭ বৎসর হইল হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের "জার্ম্মানসাহিত্যে ভাবুকতা" সম্বন্ধে কতগুলি বক্তৃতা হইয়াছিল। সেগুলি Romanticism and the Romantic School in Germany নামে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইয়াছে। লেখকের প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

"The results to which I have been led are essentially founded on the works of the authors themselves ; these I have endeavoured to understand in their historical setting and their relation to our time."

অর্থাৎ "আমার মতসমূহ লেখকগণের প্রচারিত আদর্শ ও চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা সমসাময়িক সমাজে কিরূপ স্থান অধিকার করিতেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অধিকন্তু তাঁহাদের আদর্শ ও

চিন্তাসমূহ হইতে বর্ত্তমান সমাজও কি উপকরণ লাভ করিয়াছে তাহাও আলোচনা করিয়াছি।"

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এইরূপ তুলনামূলক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রণালীতেই সাহিত্যসমালোচনা শিখাইবার প্রয়াস চলিতেছে। সাহিত্যের অভ্যন্তরে মানবাত্মার ক্রমিক অভিব্যক্তি এবং সভ্যতার বিকাশ বুঝাইবার জন্যই বিভিন্ন কেন্দ্রে "কম্প্যারেটিভ লিটারেচার" (Comparative Literature) বা বিশ্বসাহিত্য অর্থাৎ "তুলনামূলক সাহিত্য" অথবা Literary Criticism অর্থাৎ "সাহিত্য-সমালোচনার" পাঠচর্চ্চা নির্দ্ধারিত হয়। হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-সমালোচনা-বিভাগের পাঠ্যতালিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে :—

১। ইহুদি ও আরবী সাহিত্য এবং ইয়োরোপীয় সাহিত্যের আদান প্রদান (The Relations of Semitic Literatures to the Literature of Europe).

২। ভারতীয় সাহিত্য ও ইয়োরোপীয় সাহিত্য (The Relations of the Literature of India to the Literature of Europe).

৩। গ্রীক সাহিত্য ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় সাহিত্য (Relations of Greek Literature to European Literature in other tongues).

৪। ল্যাটিন সাহিত্য ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় সাহিত্য (The Relations of Latin Literature to European Literature in other tongues).

৫। আইরিশ ও ওয়েলশ্ সাহিত্য এবং ইয়োরোপীয় সাহিত্য

(The Relations of Irish and Welsh Literatures to the Literature of Europe in other tongues).

৬। আইস্‌ল্যাণ্ডের সাহিত্য এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় সাহিত্য (The Relations of Icelandic Literature to European Literature in other tongues).

৭। ফরাসী প্রোভেন্সাল সাহিত্য এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় সাহিত্য (The Relations of provencal Literature to European Literature in other tongues).

৮। স্পেনের সাহিত্য এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় সাহিত্য (The Relations of Spanish Literature to European Literature in other tongues).

৯। গথিক সাহিত্য এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় সাহিত্য (The Relations of Middle High German Literature to European Literature in other tongues).

১০। স্লাভনীয় সাহিত্য এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় সাহিত্য (The Relations of Slavic Literatures to European Literature in other tongues).

এই পাঠ্যতালিকা হইতে হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত সমালোচনা-রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ এবং আদান প্রদান বাহির করা হয়। সাহিত্যমণ্ডলে বিনিময় এবং লেনদেন ও পরস্পর প্রভাববিস্তার কতটা সাধিত হইয়াছে তাহার পরিচয় প্রদানই সাহিত্যসমালোচকগণের লক্ষ্য। ইহাঁরা ইয়োরোপীয় সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বশক্তির পরিচয় লইয়াছেন। আমরাও এই প্রণালীতে ভারতীয় সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া

বিশ্বশক্তির পরিচয় লইতে পারি। অথবা ক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ করিলে, —বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদান বুঝিতে অগ্রসর হইতে পারি। এইরূপ সাহিত্যসমালোচনার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং বাঙ্গালার ইতিহাস স্পষ্ট ও সজীব হইয়া উঠিবে।

একটা কথা উঠিতে পারে যে, আমরা নরওয়ে সুইডেন ডেন্‌মার্কের ভাষাও জানি না অথবা ঐ সকল দেশের সাহিত্যরথীদিগের রচনার অনুবাদও কখন পাঠ করি নাই। সুতরাং বয়েজেন (Boyesen)-প্রণীত Essays on Scandinavian Literature পড়িয়া লাভ কি? সেইরূপ কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অষ্ট্রীয়ার কোন সাহিত্যসেবীর নাম পর্য্যন্ত আমরা জানি না—পোলক (Pollak)-প্রণীত Franz Grillparzer and the Austrian Drama বুঝিব কি করিয়া? সেইরূপ পোল্যাণ্ডের সাহিত্যবীর মীকীভিক্টস্‌ (Mickiewicz) এবং রুশিয়ার আধুনিক উপন্যাস-লেখকগণের রচনাবিষয়ক ইংরাজী সমালোচনা-গ্রন্থ সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। যে গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত শুনা নাই তাহার সমালোচনা পড়িয়া কি হইবে? যাঁহারা সমালোচনা-সাহিত্যকে অন্য কোন সাহিত্যের আনুষঙ্গিক মাত্র বিবেচনা করেন তাঁহারা এইরূপই ভাবিবেন। কিন্তু সমালোচনার যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহাতে ইহা স্বয়ংই মৌলিক সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিজ্ঞানের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষণীয়। মের্ট্‌স (Merz) প্রণীত History of European Thought in the Nineteenth Century নামক ইয়োরোপীয় দর্শনবিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের যে ভাবে আলোচ্য, ঠিক সেই ভাবেই আমাদিগের রুশ, পোল, সুইডিশ, জার্ম্মান, স্পেনিশ, কেল্‌টিক, জাপানী, চীনা, আরবী, ফারসী ইত্যাদি সকল সাহিত্যের ইংরাজী, ফরাসী অথবা

জার্ম্মান সমালোচনা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বিভিন্ন জাতির চিন্তাসম্পদ এবং ভাবরাশি আয়ত্ত হইতে থাকিবে। অধিকন্তু সমালোচক-গণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান দৃঢ় হইবে। বহুবিধ সমালোচনার নমুনা পাইতে থাকিলে সমালোচনা-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি সহজেই আয়ত্ত হইয়া আসিবে।

বাঙ্গালীর "কবিকঙ্কনচণ্ডী" অথবা ভারতবাসীর "রঘুবংশম্" এই সমালোচনা-বিজ্ঞানের নিয়মে বুঝিতে হইলে তিন শ্রেণীর তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক :—

(১) এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিপাদ্যবিষয় অথবা রচনা-রীতি জগতের যে যে গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থের আলোচনা। বাল্মীকির রামায়ণ, গেটের ফাউষ্ট, দান্তের ডিভাইন কমেডি, হোমারের ইলিয়াড ইত্যাদি কোন গ্রন্থই বর্জ্জন করিলে চলিবে না।

(২) কালিদাস অথবা মুকুন্দরামের যুগে সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং শিক্ষাবিষয়ক সকল প্রকার তথ্যের আলোচনা। গ্রন্থকারদিগের জীবন সেই যুগের সাধারণ শক্তিপুঞ্জ হইতে কতখানি রসগ্রহণ করিয়াছিল এবং গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন তাহা জানিতে হইবে।

(৩) সমগ্র ভারত অথবা বাঙ্গালার ইতিহাসে কালিদাসের যুগ অথবা মুকুন্দরামের যুগ কোন্ স্থান অধিকার করিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। কালিদাসকে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভারতীয় ইতিহাসের ধারা বুঝিতে হইবে। সেইরূপ কবিকঙ্কণকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গালাসাহিত্য এবং বঙ্গীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশ বুঝিতে হইবে।

আমাদের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, নীতিশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, অভঙ্গ,

দোঁহা, আনন্দমঠ, গোরা ইত্যাদি যে কোন গ্রন্থের আলোচনায়ই এই তিনপ্রকার তথ্যের অবতারণা আবশ্যক। ধর্ম্ম-সাহিত্যই হউক অথবা লোক-সাহিত্যই হউক, সকল সাহিত্যকেই এই তুলনামূলক প্রণালী বা কম্প্যারেটিভ মেথড (Comparative Method) অথবা ঐতিহাসিক প্রণালী বা হিষ্টরিক্যাল মেথড (Historical Method) দ্বারা যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল ইয়োরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম এইরূপ সমালোচনার কষ্টিপাথরে ঘসা সুরু হইয়াছে। সেই সমালোচনার নাম "উচ্চাঙ্গের সমালোচনা"—"Higher Criticism"। ইয়াঙ্কি পাদ্রী সাণ্ডারল্যাণ্ড (Sunderland)-প্রণীত The Origin and Character of the Bible এই প্রণালীতে লিখিত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভারতবাসী মাত্রেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান

সাত সাত বৎসরের পর হার্ভার্ডের অধ্যাপকেরা একবর্ষব্যাপী বিদায় পাইয়া থাকেন। এইরূপ এক ছুটীতে নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ডিক্সন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কাশ্মীরের পার্ব্বত্য প্রদেশ, হিমাচল, পঞ্চনদ, আসাম ইত্যাদি স্থান পর্যটন করিয়া দেশে ফিরেন। কলিকাতা মিউ-জিয়ামের মারাঠা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুপ্তে মহাশয়ের সঙ্গে ইহাঁর আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—"আমি আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের প্রাচীন ও বর্ত্তমান নরসমাজ সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতাম। ক্রমশঃ ভাবিলাম, বোধ হয় যে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আমার সমস্যাসমূহের আনুষঙ্গিক তথ্য কিছু কিছু পাওয়া যাইবে। এই বুঝিয়া ফিলিপাইন, সুমাত্রা অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিলাম। ক্রমশঃ দেখিলাম, আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহেও বিস্তার করিতে হইবে। এই সূত্রে আমার ভারত ভ্রমণ। আবার যাইব আশা আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হার্ভার্ডে শরীরতত্ত্বের দিক্ হইতে নৃতত্ত্বের আলোচনা কতদিন হইল সুরু হইয়াছে?" ইনি বলিলেন—"এ সম্বন্ধে আমরা এখনও অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছি। চিকিৎসাবিভাগের কোন কোন ছাত্র এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। একজন অধ্যাপকও আছেন। কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, এখনও আমরা য়্যান্থ্রপমেট্রি বা নৃতত্ত্বে বিশেষ কিছু করি নাই। বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপক বোয়াজ্ ব্যতীত আর কোন পণ্ডিত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন

না বলিলেই চলে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন আছেন। এই বিষয়ের আলোচনা অক্সফোর্ডে কিছু কিছু হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে জার্ম্মানিই এই বিদ্যার কেন্দ্র। প্যারিতেও এই আলোচনা প্রসার লাভ করিতেছে। আমেরিকায় আমরা প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব (আর্কিয়লজি) সম্বন্ধেই বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছি। আমাদের নৃতত্ত্ববিভাগ ঐতিহাসিক বিবরণেরই এক অধ্যায়। আমরা শরীরতত্ত্ব অথবা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিক্ হইতে মানবজাতির পরিচয় লইতে এখনও সবিশেষ চেষ্টা করি নাই—সমাজতত্ত্বের এক শাখা-স্বরূপ নৃতত্ত্বের আলোচনা চালাইয়া থাকি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সর্ব্বত্রই দেখিতেছি—নৃতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন মানবের অথবা বর্ত্তমান যুগের "অসভ্য" ও অর্দ্ধসভ্য জাতিপুঞ্জের তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। দুনিয়ার অলিগলিতে আজকাল নৃতত্ত্বাভিযান পাঠান হইতেছে। যাহাদিগকে সভ্য বলা হয় সেই সকল জাতির মধ্যযুগ অথবা প্রাচীন যুগের আলোচনা নৃতত্ত্ববিদেরা করেন না কেন? বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইয়োরোপের সভ্য মানব এবং এশিয়ার সভ্য মানব প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন ক্রীট, প্রাচীন মিশর, প্রাচীন চীন, প্রাচীন এসিরিয়া এবং এমন কি প্রাচীন লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্ এবং বহু বর্ত্তমান "অসভ্য" ও "অর্দ্ধসভ্য" সমাজেরই অনেকটা সমান ছিল না কি? বাষ্পশক্তির প্রয়োগে বিগত একশত বৎসরে যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বোধ হয় প্রাচীনতম ফ্যারাও সম্রাটের আমল হইতে চতুর্দ্দশ লুইয়ের যুগ পর্য্যন্ত ৮০০০ বৎসরের ভিতর তত পরিবর্ত্তন হয় নাই। কাজেই নৃতত্ত্ববিদ্গণ অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, প্রাচীন বা আদিম মানব বলিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের নরনারীকে বুঝেন না কেন?"

ডিক্সন বলিলেন—"ঠিক কথা। এখন পর্য্যন্ত ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব—

এই দুই বিদ্যার সন্ধি স্থাপিত হয় নাই। ইতিহাস-বিদ্যা তথাকথিত সভ্য জাতিগুলির আলোচনা করিতেছে। নৃতত্ত্ব প্রাচীন, আদিম এবং নূতন নূতন জাতির বিবরণ দিতেছে। নৃতত্ত্বের তথ্যগুলি ক্রমশঃ ইতিহাসবিদ্যার মশলা বা উপকরণে পরিণত হইতেছে। কিন্তু কালে বোধ হয় ৫০ বৎসর পরে নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসে কোন প্রভেদ থাকিবে না।

বর্ত্তমানে আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের স্বতন্ত্র দায়িত্ব রহিয়াছে। প্রাচীন মানব, আদিম মানব অথবা অসভ্য মানব জগতে আর থাকিবে না। আধুনিক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জাতির বিশেষত্ব শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া যাইবে। বিভিন্ন সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য নরনারীর সঙ্গে এই সমুদয় আদিম মানবের রক্ত সংমিশ্রণও ঘটিতে থাকিবে। কাজেই এক্ষণে নৃতত্ত্ববিদেরা অন্যান্য সকল বিভাগ ছাড়িয়া দুনিয়ার বনজঙ্গলে অলিগলিতে এবং কোণে ঘোঁচে প্রবেশ করিতেছেন। এই ধরণের তথ্য ভবিষ্যতে আর পাওয়া যাইবে না।"

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ প্রাচীন মেক্সিকোর য়্যাজটেক সভ্যতার পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগ পেরুর প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য একজন ধনবানের অর্থসাহায্য পাইয়াছেন। এই ব্যক্তি বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ করিতেছেন। হার্ভার্ডের কর্ত্তারা মধ্য-আমেরিকা অর্থাৎ ইউকুটান, হণ্ডুরাস ইত্যাদি জনপদের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই তিন জনপদের প্রাচীন সভ্যতায় কোনরূপ আদান প্রদান ছিল কি? আমেরিকায় যখন ইউরোপীয়েরা বসতি স্থাপন করিতে আসে তখন ত এখানে লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান বাস

করিত। এই সকল ইণ্ডিয়ানেরা কি প্রাচীন মেক্সিকো, পেরু ও হণ্ডুরাসের নরনারীগণের উত্তরাধিকারী?"

ডিক্‌সন বলিলেন—"মহাশয়, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। মেক্সিকোর সঙ্গে মধ্য-আমেরিকার বিনিময় ও আদান প্রদান বোধ হয় চলিত। দুই অঞ্চলের পঞ্জিকা, দিনগণনা, কালনিরূপণ-প্রথা ইত্যাদি একরূপ। কিন্তু পেরুর সঙ্গে ইহাদের কোনটির সম্বন্ধ ছিল কিনা আন্দাজ করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ এখন পর্য্যন্ত এই তিন জনপদের প্রাচীন সভ্যতার কাল নিরূপিত হয় নাই। কেহ বলিতেছেন—এই সকল স্থানে খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে মানব-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেহ বলিতেছেন, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে এখানে সভ্যতা ছিলই না। বলা বাহুল্য, এই সকল সমস্যার মীমাংসা হইবে না।"

লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানেরা প্রাচীন য়্যাজ্‌টেক ইত্যাদি জাতিপুঞ্জের বংশধর কিনা তাহা বলা কঠিন। লোহিতাঙ্গদিগের সমাজে কোন সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। ইহারা গান করিত, ছবি আঁকিত, কিন্তু লিপিপ্রণালী অথবা বর্ণমালা উদ্ভাবন করিতে শিখে নাই। ইহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সাংসারিক কাজ সবই মুখে মুখে চলিত। কাজেই সংস্কার বা রীতিনীতির ধারা বুঝিতে পারা নিতান্তই কঠিন। এইজন্যই কাল নিরূপণ দুঃসাধ্য। তবে মেক্সিকোতে চিত্রের সাহায্যে ভাব প্রকাশ করিবার রীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু এগুলি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে নাই। জমিজমার হিসাব এবং পূজাপাঠ ছাড়া অন্য কোন দিকে পিক্‌চার রাইটিংস্ (Picture writings) বা চিত্রলেখার ব্যবহার হইত না।

ডিক্‌সন্ যুক্তরাষ্ট্রের লোকগণনা বিভাগের এক শাখার বিবরণ সম্পাদন করিতেছেন। ইনি বলিলেন—"যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি প্রায় সাড়ে

তিন লক্ষ লোহিতাঙ্গ নরনারী আছে—ক্যানাডায় প্রায় এক লক্ষ। মেক্সিকো এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় লোহিতাঙ্গদিগকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা হয় না।"

হার্ভার্ড ক্লাবে নৈশভোজন

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিতে পাই, পণ্ডিতেরা গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজের নাম প্রকাশ করিতেন না। গ্রন্থগুলি গুরুর নামে প্রচারিত হইত। বর্ত্তমানকালেও ভারতবর্ষে এই সনাতনী গুরুভক্তির ধারা চলিতেছে। অমুক টোলের ছাত্র অমুক গুরুর শিষ্য ইত্যাদি বলিয়া শিক্ষিতেরা গৌরব বোধ করিয়া থাকেন। চেলায় চেলায় অথবা শিষ্যে শিষ্যে সদ্ভাব এবং বন্ধুত্ব এই উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। "গুরুভাই" শব্দ আমাদের ধর্ম্মজীবনে এবং শিক্ষা-সংসারে সুপরিচিত।

পাশ্চাত্যসমাজে "আল্‌মা মেটার" (alma mater) একটা পারিভাষিক শব্দ আছে। ইহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কোন শিক্ষাকেন্দ্র বুঝান হয়। এই সকল দেশে লোকেরা ভারতবাসীর মত জন্মভূমিকে কখনও "মা" বলিয়া ডাকে না। কিন্তু বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের নিকট মাতৃস্বরূপ। এক জননীর সন্তানের ন্যায় ছাত্রেরা ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ চিরজীবন রক্ষা করিয়া চলে। এইজন্য ইহারা বিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর নানাপ্রকার ক্লাব সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া পুরাতন ছাত্রজীবনের স্মৃতি জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ছাত্রদের "ওল্ড বয়জ য়্যাসোসিয়েসনের" কথা সুবিদিত। ইয়াঙ্কিস্থানেও এই ব্যবস্থা বেশ লক্ষ্য করিতেছি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা আমেরিকার নানা স্থানে হার্ভার্ড ক্লাব স্থাপন করিয়াছেন।

নিউইয়র্কের হার্ভার্ড ক্লাবে বাস করিয়া হার্ভার্ডের চালচলন খানিকটা

বুঝিয়াছিলাম। আজ বষ্টনের হার্ভার্ড ক্লাবে নিমন্ত্রণ। প্রায় এক হাজার লোক উপস্থিত। এক ভোজনালয়ে একসঙ্গে এতগুলি ব্যক্তির খাওয়া দাওয়া হইল। ধূমপানের গৃহে দেখি, সম্মুখেই এক টেবিলের উপর কতকগুলি বিজয়চিহ্ন "কাপ" (Cup) সাজান রহিয়াছে। একজন বলিলেন—"এই যে সর্ব্বমধ্যে প্রকাণ্ড কাপটি দেখিতেছেন উহা আমরা বিলাত হইতে কাড়িয়া আনিয়াছি। অক্সফোর্ডের সঙ্গে হার্ভার্ডের একবার নৌচালন সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এইজন্য হার্ভাড ক্লাবের নৌচালন-সমিতি লণ্ডনে তাঁহাদের দল পাঠাইয়াছিলেন। টেম্‌স্ নদীতে বাহিচ হয়। অক্সফোর্ড পরাজিত হন।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক উড্‌স্ বলিলেন—"পূর্ব্বে বষ্টনে কোন হার্ভার্ড ক্লাব ছিল না। আমরা ভাবিতাম, পুরাতন ছাত্রেরা প্রয়োজন হইলে বষ্টন হইতে দশ মিনিটের ভিতর কেম্ব্রিজে আসিতে পারে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়েরই কোন গৃহে "ওল্ড বয়"দিগের সভাসমিতি ইত্যাদি পরিচালিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এই সকল সভায় পুরাতন ছাত্রের সংখ্যা অত্যধিক হইত। বষ্টনে আজকাল প্রায় ৬০০০ হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট বাস করেন। ইহাঁদের অনেকেই পুরাতন-ছাত্র-সভার সভ্য হইলেন। কাজেই একটা স্বতন্ত্র ভবন তৈয়ারী করা আবশ্যক হইল। এত বড় বাড়ী তৈয়ারী করা হইয়াছে—তথাপি স্থানাভাব—শীঘ্রই ইহাকে আবার বাড়াইতে হইবে।" আমি বলিলাম—"নিউইয়র্কের ক্লাবও সর্ব্বদা লোকে ভরা থাকে।" উড্‌স্ বলিলেন—"বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রদের এরূপ টান না থাকিলে হার্ভার্ড উন্নত হইতে পারিত না। আমরা গবর্মেণ্টের অথবা ধর্ম্মসভার সাহায্য পাই না—ধনী ছাত্রদিগের দানেই বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। হার্ভার্ড-ক্লাব খোস গল্পের একটা আড্ডা মাত্র নয়—কার্য্যকরী মাতৃভক্তি ও গুরুভক্তির কেন্দ্র বিশেষ।"

উড্‌স্ দুই তিনবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কাশী, পুণা, কাশ্মীর ইত্যাদি স্থানে সর্ব্বসমেত দুই বৎসর কাটাইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুদর্শন শিক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিল। সম্প্রতি ইনি যোগ-শাস্ত্র ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ ভূমিকাসহ "হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সীরিজ" অর্থাৎ হার্ভার্ড প্রাচ্য গ্রন্থমালা পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইতেছে। ইনি বলিলেন, "যোগশাস্ত্রের ভিতর সাইকলজি বা মনো-বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু তথ্য পাওয়া যায়। সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।"

আমি বলিলাম—"গ্রীক দর্শন অথবা জার্ম্মান দর্শন আলোচনা করিবার সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গ্রীস ও জার্ম্মানির পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন। প্লেটো, য়্যারিষ্টটল, কাণ্ট, ফিক্টে ইত্যাদি দার্শনিকগণকে সমগ্র জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিতরূপে বুঝান হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের উপনিষৎ, দর্শন ইত্যাদি গ্রন্থ, কিম্বা দার্শনিক, টীকাকার, ভাষ্যকার ইত্যাদি গণকে এইভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা হয় কি? ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার সঙ্গে এই সকল দর্শনবাদের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস কেহ করিতেছেন কি? আমাদের এই চিন্তাগুলি আকাশ হইতে পড়ে নাই। আমাদের দেশের লোকেরা খাওয়া পরা করিত, রাষ্ট্রশাসন করিত, ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইত, নাচ গান করিত, কবিতা লিখিত, নাটকাভিনয় দেখিত—তাহার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনালোচনা এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনও করিত। কাজেই ভারতীয় দর্শন বুঝিবার জন্য ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের সকল প্রকার অনুষ্ঠান বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয় কি?" উড্‌স্ বলিলেন—"ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ও বৈষয়িক তথ্য নিতান্ত অল্পমাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। সেগুলির সঙ্গে মিলাইয়া দর্শনালোচনা করিবার

সম্ভাবনা এক্ষণে খুব কম। আমরা বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থনিচয়ের অনুবাদ করিয়া যাইতেছি মাত্র। আপনি যে প্রস্তাব করিতেছেন তাহা ভবিষ্যতে হয়ত কার্য্যে পরিণত হইবে।"

আমি উড্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হার্ভার্ডে চীনা জাপানী এবং ভারতীয় ছাত্রের সংস্পর্শে আপনি আছেন। ইহাদের তুলনা করিয়া কখনও দেখিয়াছেন কি?" ইনি উত্তর করিলেন—"চীন জাপানের ছাত্রগণ প্রায় সকলেই উত্তম শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদিগকে গবর্মেণ্ট উচ্চবৃত্তি প্রদান করিয়া পাঠাইয়া থাকে। দেশে যাহারা যথেষ্ট উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচন করা হয়। কাজেই হার্ভার্ডে ইহারা সুফল প্রদর্শন করে। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদের এরূপ কোন অভিভাবক বা "সংরক্ষক" নাই। ইহারা নিজ চেষ্টায় নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে হয়ত হার্ভার্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়। গৃহ হইতে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য আসে না। তাহার উপর ছাত্রেরাও যে ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহাও বোধ হয় না। কাজেই ভারতীয় ছাত্রেরা আমাদের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। তবে কয়েকজন ছাত্রের সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। কয়েক বৎসর হইল জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের বৃত্তি পাইয়া চারিজন ছাত্র হার্ভার্ডে আসিয়াছিল। তাহারা সত্যসত্যই উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত—এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্বদেশেও ইহাদের সুনাম ছিল। এইরূপ বাছা ছাত্র আসিয়াছিল বলিয়া ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ নাম করিতে পারিয়াছে। একজন বোধ হয় এবার পি-এইচ্ ডি, উপাধি পাইবে। ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পুরস্কার এবং ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াছিল। এরূপ ভারতীয় ছাত্রেরই হার্ভার্ডে আসা উচিত।"

পরলোকগত অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের নাম করিয়া উড্‌স্

জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি তাঁহাকে জানিতেন কি?" আমি বলিলাম—"আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম।" উড্‌স্ বলিলেন—"আমরা তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং সুমধুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদিন আমি আমার ছাত্রগণকে ডেকার্টের দর্শনবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলাম। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেই গৃহে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার শেষে আমি তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি হয়ত দুই চারিটা ভদ্রতাসূচক সাধারণ কতকগুলি কথা বলিয়া ছাত্রগণকে সন্তুষ্ট করিবেন। কিন্তু দেখিলাম, ডেকার্টের দার্শনিক মত সম্বন্ধেই বক্তৃতা করিলেন। আমি যে পর্য্যন্ত বলিয়াছিলাম আপনার শিক্ষক ঠিক তাহার পর হইতে সুরু করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া ছাত্রগণ বিস্মিত হইল। আমিও স্তম্ভিত হইলাম। বিশেষভাবে প্রস্তুত না হইয়া ছাত্রগণের নিকট বক্তৃতা করিতে পারা সহজ কথা নয়। সেই সময়ে অধ্যাপক জেম্‌স জীবিত ছিলেন। বিনয়েন্দ্রনাথের দার্শনিকতা এবং বাগ্মিতা দেখিয়া তিনিও পুলকিত হন।" আমি বলিলাম—"দেশেও তাঁহার এই যশ ছিল।"

উড্‌স্ ভারতীয় ছাত্রগণের বন্ধু ও সহায়ক। অনেক সময়ে টাকার অভাব হইলে ভারতীয় ছাত্রেরা ইঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। দুই একজন অভাবগ্রস্ত ছাত্রের পারিবারিক অবস্থা বুঝিবার জন্য ইনি আমার সঙ্গে আলোচনা করিলেন। দূর বিদেশে ঋণদাতা পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। উড্‌স্ একজন পয়সাওয়ালা লোক, কাজেই টাকা ধার দেওয়া, ইঁহার পক্ষে সহজ। অন্যান্য অধ্যাপকগণের অন্নচিন্তা আছে, তাঁহারা বেতনের উপর নির্ভর করেন, ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা অপরকে ধার দিয়া সাহায্য করিতে অসমর্থ।

উড্‌স্ যখন কাশীতে ছিলেন তখন জাপানী বৌদ্ধ আনেসাকিও

সেখানে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে আনেসাকি হার্ভার্ডের অধ্যাপক। উড্‌সের পরামর্শেই বিশ্ববিদ্যালয় আনেসাকিকে পদ দিয়াছেন। উড্‌স্ পুণায় থাকিবার সময়ে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পালির অধ্যাপক ধর্ম্মানন্দ কোশাম্বীর সঙ্গে পরিচিত হন। উড্‌স্ হার্ভার্ডে ফিরিয়া আসিয়া কোশাম্বীকে এখানে আনাইয়াছিলেন। কোশাম্বী অধ্যাপক ল্যান্‌ম্যান এবং উড্‌স্‌কে পালি শিখাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন।

নৈশ ভোজনের পর একটা বক্তৃতা হইল। গত বৎসর ক্যানাডা রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে উত্তর মেরু অনুসন্ধানের জন্য অভিযান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই অভিযানের জাহাজের কাপ্তেন বক্তৃতা করিলেন। আলোকচিত্রের সাহায্যে সমগ্র অভিযানের বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই বক্তৃতা শুনিবার জন্যই আজ বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। ইয়াঙ্কি-স্থানের অন্যান্য সকল সভায় রমণীর প্রাধান্য দেখিতে পাই। কিন্তু হার্ভার্ড-ক্লাবে রমণীর স্থান নাই বোধ হইতেছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় নারীজাতির অধিকার কিছু খর্ব্ব।

রুশ অধ্যাপক

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ এবং পোলিশ ভাষা ও সাহিত্য শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। বিশেষভাবে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারাই আলোচিত হইয়া থাকে। এই বিভাগের কর্তা অধ্যাপক উঈনার একজন রুশ। ইনি টলষ্টয়ের গ্রন্থাবলী ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই জন্য ইহাঁকে আড়াই বৎসর দিনরাত খাটিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত The Anthology of Russian Literature নামক এক ইংরাজী গ্রন্থে ইনি রুশ সাহিত্যের ধারাবাহিক পরিচয় দিয়াছেন। ইহা একখানা ইতিহাসগ্রন্থ মাত্র নয়, রুশিয়ার প্রাচীন ও আধুনিক সকল সাহিত্যরথীদিগের রচনার ইংরাজী নমুনা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাকে ইংরাজী "Typical Selections from the Best English Authors"এর অনুরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। আমরা একমাত্র টলষ্টয়ের নামই এতদিন জানিতাম। সম্প্রতি তুর্গেনেভ এবং ডষ্টয়েবস্কিও ভারতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। উঈনার-প্রণীত এই নমুনা-সঙ্কলন গ্রন্থে সমগ্র রুশ সাহিত্যের পরিচয় পাইতে পারি।

উঈনার বলিলেন—"আমি সম্প্রতি আর-একখানা গ্রন্থে হাত দিয়াছি। এই দেখুন পাণ্ডুলিপি। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রুশজাতির সভ্যতা সম্বন্ধে সাধারণ কতকগুলি কথা বলিয়াছি। রুশিয়ার সঙ্গীত ও চিত্রকলা, রুশ সাহিত্য, রুশিয়ার রমণীসমাজ, প্রাচীন রুশ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। ইহাকে রুশ জাতীয়জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে।" গ্রন্থের নাম Russian Soul বা "রুশিয়ার

চিত্ত"। ইহাতে একটা সুবিস্তৃত বিব্লিওগ্রাফি বা প্রমাণপঞ্জী সংযুক্ত থাকিবে। তাহা দেখিলে ইংরাজী ভাষায় লিখিত রুশিয়া-বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহের নাম জানা যাইবে। ভারতবাসী রুশিয়া সম্বন্ধে বেশী ইংরাজী গ্রন্থের নাম জানেন না। এই পুস্তক পাঠ করিলে অনেক তথ্য হস্তগত হইবে। জগতের হাভভাব দেখিয়া বিশ্বাস হইতেছে যে, বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে রুশিয়া জগতে শীর্ষস্থানীয় মর্য্যাদা লাভ করিবে। সুতরাং যাঁহারা বর্ত্তমানজগতের শক্তিপুঞ্জ বুঝিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে রুশ-তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। এই হিসাবে উঈনারের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ ভারতবাসী মাত্রের অবশ্যপাঠ্য। গ্রন্থের আকার বৃহৎ হইবে না বুঝিলাম।

উঈনার রুশ-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু কেবল মাত্র স্লাভ জাতিপুঞ্জের ভাষা, চিন্তা, রীতিনীতি লইয়াই ইনি সময় কাটান না। পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা সকলেই নানাভাষায় সুপণ্ডিত। তিনচারিটা ভাষা জানেন না এরূপ অধ্যাপক ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বিরল—অবশ্য নামজাদা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপকগণের কথা বলিতেছি। তাহার পর যাঁহারা কোন ভাষা বা সাহিত্যের অধ্যাপক তাঁহারা সকলেই বহু ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং বহুসাহিত্যে সুপণ্ডিত। কম্প্যারেটিভ ফিললজি বা তুলনা-সিদ্ধ ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষা না করিয়া কেহই ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হন না। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন তাঁহারা নিজ মাতৃভাষার অতিরিক্ত গ্রীক ল্যাটিন ফরাসী জার্ম্মান এবং হীব্রু অথবা আরবী ভাষাও জানেন। অধ্যাপক উঈনার এইরূপ একজন বহুভাষাভিজ্ঞ বহুসাহিত্যাভিজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি ইয়োরোপের প্রায় সকল ভাষাই জানেন এবং দুনিয়ার অন্যান্য ভাষাসমূহের সাধারণ সংবাদ রাখেন। ভারতীয় ভাষাপুঞ্জের সম্বন্ধেও আলোচনা ইহাঁর সঙ্গে হইল।

ইনি বলিলেন—"আপনি তিন বৎসর পরে যদি আবার হার্ভার্ডে আসেন, আপনার সহিত বাঙ্গালায় কথা বলিব।"

উঈনার একখানা বিরাট গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইনি বলিলেন, "ইয়োরোপের মধ্যযুগ সম্বন্ধে আমাদের ঐতিহাসিকগণের যে সকল ধারণা আছে, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সেগুলি বদলাইয়া যাইবে। আমি প্রাচীন দলিলপত্র আলোচনা করিয়া বুঝিতেছি যে, এতদিন আমরা ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় ও আইন সম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশ-বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছি।" ইনি ২৫০,০০০ দলিল দানপত্র নিয়োগপত্র ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন। এইগুলি ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের ভিতর এই সকল দলিল প্রস্তুত হইয়াছিল। ইয়োরোপের নানা দেশ হইতে এই আড়াই লক্ষ চুক্তিপত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রাচীন দলিলাদি অনুসন্ধান ও সংগ্রহের প্রয়াস আছে কি?" আমি বলিলাম, "মহারাষ্ট্রে, তামিলদেশে এবং বাঙ্গালায় মাতৃভাষার সেবকগণ এই দিকে নজর দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজি বা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতেও এই সমুদয় বস্তু অনুসন্ধান করা হইতেছে। কিন্তু আইনের ক্রমবিকাশ, আর্থিক অবস্থা, অথবা সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বুঝিবার জন্য এগুলি এখনও বিশ্লেষিত ও আলোচিত হয় নাই। প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় ঘটনাপুঞ্জের সন তারিখ নির্ণয়ই এখন পর্য্যন্ত আমাদের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটা কাঠামো দাঁড়াইয়া গেলে জাতীয়জীবন বুঝিবার জন্য অন্যান্য দিকে অনুসন্ধান চলিবে আশা আছে।"

উঈনার বলিলেন—"মহাশয়, আজকাল ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে মাতৃভাষার পুষ্টি ও উন্নতির জন্য নানা আন্দোলন চলিতেছে শুনিতে

পাই। উনবিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে আমাদের ইয়োরোপেও এইরূপ আন্দোলন চলিয়াছিল। তাহার নাম রোমাণ্টিক মুভমেণ্ট (Romantic Movement)। এই রোমাণ্টিক আন্দোলনের ফলে আজ পাশ্চাত্যজগতে মহা অনৈক্য, বৈষম্য ও বিভিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে। বিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ন্যাশন্যালিটিক আন্দোলন বা "জাতিগত স্বাতন্ত্র্যে"র আন্দোলন সুরু হয়—ইয়োরোপে ঐক্য ও সাম্য লুপ্ত হইয়া যায়। আমার সন্দেহ হইতেছে—ভারতবর্ষেও ইয়োরোপের এই অনৈক্য আসিয়া না জুটে।"

আমি বলিলাম—"রোমাণ্টিক আন্দোলনের ফলে ইয়োরোপের ঐক্য নষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে ইয়োরোপীয় নরনারীর ক্ষতি হইয়াছে বলিতে পারেন কি? আপনি 'যেন তেন প্রকারেণ' ঐক্য রক্ষা এবং শান্তি রক্ষা চাহেন—না দুনিয়ার সর্ব্বত্র মনুষ্যত্ব বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি চাহেন? অস্বাভাবিক ঐক্য অপেক্ষা চরিত্রগঠনোপযোগী বৈচিত্র্য ভাল নয় কি? আমার মতে একতার জন্য মনুষ্যত্ব ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ববিকাশ বর্জ্জন করা যাইতে পারে না।"

উইনার বলিলেন—"মহাশয়, অনেক সময়ে জোর করিয়া অনৈক্য ও বৈচিত্র্য ডাকিয়া আনা হয়। ইয়োরোপে এইরূপ দেখিতে পাই। ফরাসী রুশো Emile গ্রন্থে প্রকৃতিপূজার অবতারণা করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স ও জার্ম্মানি ভরিয়া রুশোর শিষ্যবৃন্দ প্রকৃতি, প্রাকৃতিক জীবন, সরলতা, অকৃত্রিম স্বভাব, শিশুচরিত্র, দরিদ্র কৃষকসমাজ, জনসাধারণ ইত্যাদির মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। সাহিত্যের বাজারে "অসভ্যতা," লোক-সাহিত্য, পল্লীভাষা ইত্যাদি সমাদর করা একটা ফ্যাশনে পরিণত হইল। হার্ডার, ক্লপষ্টক, গ্রিম্ ইত্যাদি সাহিত্যসেবীগণ জার্ম্মান ভাবুকতার আন্দোলনে ধুরন্ধর।

ইহাদিগের দেখাদেখি ইয়োরোপের অলিগলিতেও এইরূপ পল্লী-মাহাত্ম্য, শ্রমজীবী-মাহাত্ম্য, জনসাধারণ-মাহাত্ম্য, প্রকৃতি-মাহাত্ম্য, ইত্যাদি প্রচারিত হইতে লাগিল। সকল স্থানেই নিজ নিজ কেন্দ্রের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা চলিল। যে সকল স্থানে প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন নাই সেই সকল স্থান হইতেও প্রাচীন সরলতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। রুশোপন্থী ভাবুকেরা সেই সমুদয় দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন! মহাশয়, এই প্রণালীতে আজ নরওয়ে সুইডেন ও ডেন্‌মার্ক তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে—অথচ ইহাদের লোকসংখ্যা সর্ব্বসমেত এক কোটি মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই তিন দেশের লোকেরা বৈচিত্র্যের কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই—রোমাণ্টিক আন্দোলনের পাল্লায় পড়িয়া আজ ইহারা তিনটি স্বতন্ত্র "নেশনে" বা রাষ্ট্রে পরিণত। এই ক্ষেত্রে দেখিতেছি, সাহিত্যসেবীদিগের হুজুগে অনর্থক অনৈক্য সৃষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ সার্ভিয়া, বুল্‌গেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া ইত্যাদি জাতির বৈচিত্র্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে কেহ কখনও শুনে নাই। আজ এমন কি আল্‌বেনিয়ারও একটা স্বতন্ত্র জাতিগত ভাষা সৃষ্ট হইতে চলিয়াছে। কবে শুনিব, বাঙ্গালাদেশেও উত্তরবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ নামে তিনটি নেশন বা রাষ্ট্র গড়িবার আন্দোলন চলিতেছে!"

উইনার নিজের পুত্রকন্যাগণকে গৃহে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাঁর শিক্ষাপ্রণালীর গুণে কম সময়ে অধিক শিখিতে পারা যায়। ইহাঁর প্রথম পুত্র এই উপায়ে বিশ বৎসরের পূর্ব্বে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ ডি উপাধি পাইয়াছে। সাধারণতঃ ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে কোন ছাত্র এই ডিগ্রি লাভ করিতে পারে না।

খৃষ্টধর্ম্মের "নব-বিধান"

হিন্দুসন্তান কাশীতে আসিয়া আর কিছু না দেখিলেও একবার বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করে। সেইরূপ ভারতবাসী বষ্টনে পদার্পণ করিলে অন্ততঃ ইউনিটারিয়ান য়্যাসোসিয়েশন (Unitarian Association) অর্থাৎ "একেশ্বরবাদীদিগের সমিতি"তে আসে। খৃষ্টান-সমাজের "ইউনিটেরিয়ান্" সম্প্রদায় যথাসম্ভব নরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরধর্ম্মবিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া এক উদার ও প্রশস্ত মতবাদের উপর মানব-জীবন গঠন করিতে চাহেন। কাজেই গোঁড়া খৃষ্টানদের মাপকাঠিতে ইউনিটেরিয়ানেরা হয়ত খৃষ্টান বলিয়া গণ্যই হন না—কিন্তু দুনিয়ার স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ভাবুক নরনারীগণ ইহাদিগকে ভ্রাতৃত্বের "রাখী" পাঠাইয়া থাকেন। ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে ইউনিটেরিয়ান্ সম্প্রদায় যেরূপ আলোচনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের স্বাতন্ত্র্য ও বিভিন্নতা রক্ষা পায়।

গোঁড়া খৃষ্টানেরা বিবেচনা করেন—খৃষ্ট-ধর্ম্ম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম্ম মানবের উন্নতি বিধান করিতে পারে না।

"The old idea of all religions except the Jewish and Christian was that they were utterly bad, superstitious, corrupt and cruel. While Judaism and Christianity had been revealed, Brahanism, Buddhism, Confucianism, and in fact, all other world-faiths had been invented!

Christianity alone was true, all other religions were false. They were natural ; Christianity was supernatural, and hence alone among them all divinely authoritative and trustworthy."

অর্থাৎ "য়িহুদি ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ছাড়া অপর সকল ধর্ম্মই যারপরনাই খারাপ, কুসংস্কারে পূর্ণ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর। য়িহুদি-ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম, অপর সকল ধর্ম্ম—যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, কনফসিয়াসের ধর্ম্ম ইত্যাদি—মানুষের কৌশলে উদ্ভাবিত। খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য, অপর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা। অপর সকল ধর্ম্মই স্বভাবানুগত, খৃষ্ট-ধর্ম্ম অতিপ্রাকৃত, সুতরাং ভগবৎ-আদিষ্ট ও বিশ্বাসের যোগ্য!"

এইরূপ গোঁড়া মত আলোচনা করিয়া একজন জার্ম্মানইয়াঙ্কি ইউনিটেরিয়ান পণ্ডিত বলিতেছেন—

"Such a view was derived chiefly from the prevailing ignorance concerning the other great religions of the world. Their traditions were still unknown ; their scriptures had not yet been read ; their doctrines and development had not been studied."

অর্থাৎ "অন্যান্য ধর্ম্মের সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এরূপ ধারণার কারণ—যাহাদের ঐতিহ্য জানা নাই, যাহাদের শাস্ত্র পড়া নাই, যাহাদের মতবাদ ও উন্নতির ইতিহাস অনায়ত্ত তাহাদিগকে বিচার করিলে এরূপ ভুল হয়ই।"

মূর্খের অশেষ দোষ—অজ্ঞ তাহার গৃহ-কোণকেই দুনিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু নানা ধর্ম্ম, নানা দেশ, নানা সাহিত্য যখন কোন ব্যক্তির জ্ঞান-রাজ্যে উপস্থিত হয় তখন কি দেখা যায়? প্রকৃতির বৈচিত্র্য,

জীবনের বৈচিত্র্য, কর্ম্মপ্রণালীর বৈচিত্র্য—ইহাদের ভিতর উচ্চনীচ ক্ষুদ্র-মহৎ বিশ্লেষণ করা বড়ই কঠিন। নানাপথে সকলেই এক কেন্দ্রে উপস্থিত হইতেছে। "নৃণাম্ একো গম্যস্ত্বমসি পয়সাম্ অর্ণব ইব।" ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের প্রণালীতে ধর্ম্মতথ্য আলোচিত হইলে এই উদার ধারণাই পুষ্ট হইবে। ইউনিটেরিয়ানেরা এই কম্প্যারেটিভ মেথড্ বা তুলনামূলক প্রণালী অবলম্বনের পক্ষপাতী। এইজন্য ইঁহারা গোঁড়া স্বধর্ম্মীদিগের সহানুভূতি হারাইয়াছেন—কিন্তু জগতের বিজ্ঞানসেবী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় ক্রমবিকাশপন্থী জনগণের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

তুলনামূলক আলোচনাপ্রণালী অবলম্বন করিলে বাইবেল-গ্রন্থের কি রূপ হয় তাহা পাদ্রী সাণ্ডারল্যাণ্ডের গ্রন্থপাঠে বুঝা যায়। এই "Higher Criticism" অর্থাৎ উচ্চাঙ্গের সমালোচনার ফলে অন্যান্য ধর্ম্মও খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে এক আসনে স্থান পাইবে। আমেরিকার একেশ্বর-বাদীদিগের সমিতির বিদেশী-বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ওয়েণ্ডটে (Wendte) বলিতেছেন—

"Thanks to the researches of eminent scholars, we are arriving at a juster estimate of the part played by the non-Christian religion since the regeneration of mankind. We have come to see that they all have their root in the same soil of human feeling and thought which gave birth to the Jewish and Christian faiths. Deep in human nature lie the instincts, the intuitions, the moral and spiritual capacities to which all great religious teachers appeal and out of which spring the

various philosophies and forms of religion. These are all useful to their day and generation, and expressed the degree of ethical insight to which their followers had attained, 'Christianity is not generally distinct from these. She is their younger sister, differing from them mainly in environment and degree of development attained, but sharing with them a common origin and fulfilling a common mission,—to interpret to man the facts of his own spiritual nature and the moral order of the universe ; to teach him to look up and away from matter and sense to the spiritual life that is in God."

অর্থাৎ "পণ্ডিতদিগের চেষ্টায় আমরা জানিতে পারিতেছি যে, খৃষ্টান ধর্ম্ম ছাড়া অপরাপর ধর্ম্মও মানবজাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছে। যে চিন্তা ও ভাবের ফলে য়িহুদি ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উদ্ভব, তাহাদেরও মূল সেইরূপ চিন্তা ও ভাবের মধ্যেই নিহিত। মানব-মনের মধ্যে যে সমস্ত ভাব ও সংস্কার আছে, ধর্ম্মগুরুগণ সেই সমস্তই উদ্বোধিত করিয়া তোলেন এবং তাহা হইতে বিবিধ দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্ম্মপ্রণালীর উদ্ভব হয় ; সেই সমস্ত তত্ত্ব ও প্রণালী যে সময়কার, সে সময়ের উহাই উপযোগী এবং তখনকার ধর্ম্মগুরুদের শিষ্যগণ কতদূর নৈতিক দৃষ্টি লাভ করিয়াছিল তাহারই পরিচায়ক। খৃষ্টের ধর্ম্ম এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। খৃষ্টধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের অনুজ। সকলের জন্মকারণ একই এবং উদ্দেশ্যও একই। মানুষকে তাহার আধ্যাত্মিক দিকটা সমঝাইয়া জগৎ-সংসারের নৈতিক প্রতিষ্ঠাটা বুঝাইয়া দেওয়া ; এবং যাহা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়

তাহা ছাড়িয়া মানুষকে ঈশ্বরের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতার দিকে লইয়া যাওয়া—এই দুই লক্ষ্য প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রচারেই দেখিতে পাই।”

ধর্ম্মজীবনবিষয়ক তথ্যসমূহের বিশ্লেষণে তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালী, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক আলোচনা ইত্যাদি অবলম্বিত হইলে মানবাত্মার ক্রমবিকাশ স্পষ্টতর হইতে থাকিবে। চিত্তের উৎকর্ষসাধন, আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান, শরীর ও মনের সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় এবং আত্মার পরস্পর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা পরিস্ফুট হইবে। তখন দেখা যাইবে যে, গীত, লোকসাহিত্য, নৃত্য, বাদ্য, শোভাযাত্রা, পূজা, আরতি, ব্রতানুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কণ, মূর্ত্তিগঠন, দেবালয়স্থাপন, ধ্যান, আরাধনা, কবিতা-আবৃত্তি, মন্ত্রপাঠ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ইত্যাদি সকল বস্তুরই ধর্ম্মজীবনে যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই সমুদয়ের কোনটিকে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। সমাজসেবা, লোকহিত, সংযমপালন এবং প্রার্থনা ছাড়াও এই সমুদয় অনুষ্ঠান মানবজীবনের পক্ষে ন্যূনাধিক পরিমাণে আবশ্যক। টেনিসনের কয়েক পংক্তি মনে পড়িতেছে।

“Where is one that, born of woman, altogether
can escape
From the lower world within him, moods of
tiger or of ape ?
Man is yet being made, and ere the crowning
Age of ages,
Shall not æon after æon pass and touch him
into shape ?”

হিন্দুধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যের আলোচনায় কম্প্যারেটিভ্ মেথড্ বা তুলনায় সমালোচনা এবং “উচ্চাঙ্গের সমালোচনা” অবলম্বিত হওয়া

নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে, প্রথমতঃ ক্রমবিকাশ-মান বিরাট হিন্দুসভ্যতার বিশ্বমূর্ত্তি দেখিতে পাইব। বুঝিতে পারিব যে, বৈদিকযুগেই, অথবা উপনিষদবেদান্তের যুগেই হিন্দুত্ব ফুরাইয়া যায় নাই। বুঝিতে পারিব যে, সকল যুগেই ভারতে ধর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—আমাদের জাতীয় জীবনগঙ্গা পুরাণতন্ত্রের গহনবনে আসিয়া শুকাইয়া যায় নাই। পুরাণতন্ত্রের যুগেও বেদ-উপনিষদ্-বেদান্তের জীবনধারা নবরূপে প্রবাহিত হইতেছিল। এখনও নূতনরূপ পরিগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের জন্য হিন্দুধর্ম্ম নবনব ধর্ম্মবীরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। কাজেই বিংশশতাব্দীর হিন্দুনরনারী কোন প্রাচীন দেবগ্রন্থ মাত্রের উপর নির্ভর না করিলেও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষবিধানের জন্য নবনব বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-সংহিতার সাহায্য পাইবেন।

ওয়েওটে বলিলেন—"মহাশয়, আপনি কলিকাতার নিউ ডিস্পেন্সেশন বা "নববিধান"-সমাজের সংবাদ রাখেন কি? ইঁহাদের সভ্যসংখ্যা দুই তিন শত মাত্র। কিন্তু ইঁহারা বক্তৃতায় বাগাড়ম্বর অত্যধিক করেন। দুনিয়ার লোকই যেন ইঁহাদের সমাজের অন্তর্গত!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইঁহারা কি নিজ 'সমাজে'র মাহাত্ম্য এই ভাবে প্রচার করেন—না স্বকীয় আদর্শ ও মতবাদের বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে এইরূপ গৌরব করেন? আদর্শ প্রচার সম্বন্ধে এইরূপ তেজস্বিতা বাঞ্ছনীয় নহে কি?" ওয়েওটে বলিলেন—"কথাটা যদি বক্তারা খুলিয়া বলেন তাহা হইলে গোলযোগ থাকে না। দূর হইতে আমাদের কানে অনর্থক বাগাড়ম্বরগুলি বড়ই বিকট লাগে। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' এবিষয়ে বেশ সংযত।"

ওয়েওটের মতে, ভারতবর্ষীয় লোকেরা বড়ই "গুরু"-বাদী। চরিত্র-বান্ অথবা প্রতিভাবান্ কোন নরনারী প্রাদুর্ভূত হইলে ভারতবর্ষে

তাঁহাদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যভোগ আরব্ধ হয়। "অল্পকালের ভিতরেই আপনাদের দেশে 'ঋষি', 'মহর্ষি', 'মহাত্মা', 'পরমহংস', 'স্বামী' ইত্যাদি কত হইয়াছেন! এমার্সন ভারতবর্ষে জন্মিলে আজ হয়ত 'অবতার' বিবেচিত হইতেন। কিন্তু ইয়াঙ্কিরা এমার্সনের মত ব্যক্তিকে লইয়াও বেশী মাতামাতি করে না।"

অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়কে ওয়েণ্ডটে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় মৈত্রেয় মহাশয় নাকি বলিয়াছেন—"হিন্দুরা বড়ই হৃদয়বান জাতি, লোকজনকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। আমরা ভক্তিপ্রবণ ও উচ্ছ্বাসময় জাতি—বিশেষত্বশীল অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট আমাদের মস্তক আপনা-আপনিই অবনত হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইয়াঙ্কিস্থান ত ডিমক্রেসি বা সাধারণ তীর্থক্ষেত্র, কিন্তু ইয়াঙ্কিরাও কি য়্যারিষ্টক্রেসি বা শক্তি-তন্ত্র ও গুণতন্ত্রের পক্ষপাতী নহেন? দুনিয়া কি সাধারণ শক্তিতে আপনা-আপনি চলিতেছে—না অ-সাধারণ ক্ষমতায় চালিত হইতেছে? শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থার চরম লক্ষ্য কি?—"য়্যাভারেজ" (Average) বা মাঝারি অর্থাৎ সাধারণ রামাশ্যামা তৈয়ারী করা, না জিনিয়াস (Genius) বা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাসম্পন্ন কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর তৈয়ারী করা?" ওয়েণ্ডটে বলিলেন—"মহাশয়, আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটনের আমলে য়্যারিষ্টক্রেসি বা আভিজাত্য ও কৌলীন্য ছিল—তিনি লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে উনিশবিশ, উচ্চনীচ ভেদ জ্ঞান করিয়া চলিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ সে সব চলিয়া গিয়াছে—এব্রাহাম লিঙ্কলনের যুগ হইতে আমরা পুরাপুরি সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়াছি। সভাপতি লিঙ্কলন নিতান্তই সাদাসিধা লোক ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে কোন লোক তাঁহাকে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বিবেচনা করিতেই পারিত

না। এমার্সনেরও জীবন অত্যন্ত সাধারণ ধরণের ছিল। রাস্তাঘাটের লোকজন হইতে ইহাঁকে পৃথক করা কঠিন ছিল।"

আমি বলিলাম—"গুণতন্ত্র বা শক্তিতন্ত্র য়্যারিষ্টক্রেসির নিয়মে 'অসাধারণ' ব্যক্তিগণ অহঙ্কারী, উচ্চাধিকারাকাঙ্ক্ষী বা যশঃপ্রার্থী হইবেন—কে বলিল? প্রতিভাবান্ ব্যক্তি অহঙ্কারীই হউন অথবা সাদাসিধাই হউন—আমাদের তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ চরিত্রের পার্থক্যে আমরা হয়ত তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইবার সময়ে উনিশবিশ করিব। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা পঞ্চাশ হাজার কিম্বা তিনকোটি নরনারীর মধ্য হইতে এক, দুই বা দশজন লোককে বাছিয়া আমাদের নেতৃত্বপদে বরণ করিলাম সেই সময়ে আমরা কি সাধারণতন্ত্রের প্রভাব স্বীকার করিতেছি, না শক্তিতন্ত্র ও গুণ-তন্ত্রের নিয়মানুসারে কাজ করিতেছি? আমেরিকার ইয়াঙ্কিরা যদি পূরাপূরি ডিমক্র্যাট বা সাধারণতন্ত্রবাদী হইত তাহা হইলে তাহারা রামাশ্যামাকেও ওয়াশিংটন-লিঙ্কলন-এমার্সনের পদে প্রতিষ্ঠিত করিত। কিন্তু তাহা ত কেহই করে নাই। উচ্চনীচ, সাধারণ-অসাধারণ, য়্যাভারেজ ও জিনিয়াস ইত্যাদি ভেদ এবং অনৈক্য, জগতে স্বাভাবিক। এই ভেদ স্বীকার না করিয়া কাহারও চলা অসম্ভব। জগতের উন্নতি সর্ব্বত্রই উচ্চতর অসাধারণ জিনিয়াস, হীরো, বীরপদবাচ্য ব্যক্তিগণের কর্ম্মফল। এমার্সন এইরূপ একজন বীর—ম্যাব্রাহাম লিঙ্কলন্ এইরূপ একজন বীর—তাঁহারা অন্যান্য ইয়াঙ্কি হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ মিল্টন সম্বন্ধে বলেন—"Thy soul was like a star and dwelt apart". ইহাঁরা সাধারণ লোকজনের সঙ্গে সাদাসিধাভাবে মিশিতেন সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহাঁরা কি এই কারণে তাহাদের সমান মাত্র ছিলেন? আমি অসাম্য চাহি—অনৈক্য চাহি—য়্যারিষ্টক্রেসির প্রবর্ত্তন চাহি—জিনিয়াসের উদ্ভব

দেখিতে চাহি—শক্তিমানের প্রাধান্য চাহি—গুণবানের কর্তৃত্ব চাহি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলুন, রাষ্ট্রকেন্দ্র বলুন—সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ বীরপুরুষ তৈয়ারী করিবার সুযোগ থাকা আবশ্যক।"

ওয়েগুটে বলিলেন—"মহাশয়, এই ব্যবস্থায় গুণবান্ ব্যক্তিগণের একাধিপত্য এবং ক্রমশঃ অত্যাচার আসিয়া উপস্থিত হয় না কি? মানুষের স্বভাব বড়ই অবিশ্বাসযোগ্য। আজ যিনি ভক্তি ও পূজার পাত্র কাল তিনি মদমত্তপাষণ্ড। পূজা খাইতে খাইতে মানুষেরা অন্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রথম হইতেই কোন ব্যক্তি বা জাতিকে উচ্চ অধিকার না দেওয়াই ভাল।"

আমি বলিলাম—"লোকচরিত্র যদি স্বভাবতই এইরূপ দূষিত হয় তাহার জন্য দুঃখ কি? যুগে যুগে নূতন নূতন গুণীব্যক্তি নূতন নূতন 'হীরো', নূতন নূতন কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর আমাদের পূজা পাইবেন। প্রত্যেক ত্রিশবৎসর পরেই হয়ত মানবসমাজে নবনব 'গুরু' এবং পথপ্রদর্শকের আবির্ভাব হইবে। মদমত্ত পুরাতন গুরু প্রত্যাখ্যাত হইবেন—এবং উদীয়মান নবীন বীর জনসমাজের হৃদয়সিংহাসনে বসিবেন। নীট্‌শের ভাষায় কালোপযোগী এইরূপ নবীন সমাজ-গঠনের নাম Transvaluation of Values বা যুগান্তর সাধন। কথাটা একেবারেই নূতন নয়। জগতে চিরকাল এইরূপ ঘটিয়াছে। ইয়াঙ্কিস্থানেও এইরূপই কার্য্যতঃ ঘটিতেছে। কেবল কথার মারপ্যাঁচে "ডিমক্রেসী" শব্দটা দুনিয়ার রাষ্ট্রমহলে সুপ্রচলিত হইয়াছে। অথচ সর্ব্বত্রই য়্যারিষ্টক্রেসির প্রভাব দেখিতে পাই। কাজেই এক্ষণে শূন্য পারিভাষিক শব্দ এবং ফর্ম্মুলা বর্জ্জন করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করা কর্ত্তব্য যে, মানবসমাজের পক্ষে 'সকলক্ষেত্রে য়্যারিষ্টক্রেসী বাঞ্ছনীয় এবং আবশ্যক, কোনক্ষেত্রেই 'ডিমক্রেসি' নয়।"

ওয়েণ্ডটে বলিলেন—"মহাশয়, আপনি জাতিভেদের এবং ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের দেশ হইতে আসিতেছেন। আপনার পক্ষে য়্যারিষ্টক্রেসির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন স্বাভাবিক।"

আমি বলিলাম—"ডিমক্রেসি বা সাধারণ-তন্ত্রের মূল্যও অস্বীকার করিবে কে? ইহার দ্বারা দুনিয়ার প্রত্যেক কেন্দ্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্ট হয়—নব নব অঞ্চলে নব নব ক্ষমতা বিকাশের সাহায্য প্রদত্ত হয়। ইহা একটা educative process মাত্র—সুযোগ প্রদানের একটা উপায় ও প্রণালী মাত্র—ইহা মানবসমাজের লক্ষ্য হইতে পারে না। লক্ষ্য হইবে ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নরনারীর সৃষ্টি। যাহারা বর্ত্তমানকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন বিশ্ব গড়িতে পারে সেইরূপ লোকের আবির্ভাবেই জগতের উন্নতি হয়। যাহারা কোনমতে মামুলি গতানুগতিক জীবনধারার সূত্র রক্ষা করিয়া চলিতে পারে তাহাদের হ্রাস-বৃদ্ধিতে জগতের বেশী আসে যায় না। যাহারা চিন্তার, কর্ম্মের, সভ্যতার, জীবনের পুরাতন মাপকাঠি বদলাইয়া নূতন মাপকাঠির প্রবর্ত্তন বা ইঙ্গিত মাত্র করিতে পারে, সেইরূপ নরনারীর উদ্ভবই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কাজেই অসাম্যের পথ বিস্তৃত রাখা নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্য কৌলীন্য, আভিজাত্য, শক্তিতন্ত্র, গুণতন্ত্র বা য়্যারিষ্টক্রেসি বাঞ্ছনীয়।"

ওয়েণ্ডটে বহুবার ইয়োরোপের নানাদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ইউনিটেরিয়ান সমিতির নায়কতায় জগতের নানা কেন্দ্রে স্বাধীনতাপ্রিয় ধর্ম্মসমাজের ক্ষুদ্রবৃহৎ সম্মিলন হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে লণ্ডন, আমষ্টার্ডাম, জেনেভা, বষ্টন, বার্লিন এবং পারী নগরে এইরূপ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, ইতালী, সুইজর্ল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ডেন্মার্ক, নরওয়ে, হাঙ্গারী, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের বহু পৃষ্ঠপোষক আছেন। অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ভারতীয় সমিতির ধুরন্ধর। এই বিশ্বব্যাপী

প্রতিষ্ঠানের নাম "International Congress of Free Christians and other Religious Liberals." এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য—"To open communication with those in all lands who are striving to unite pure religion and perfect liberty, and to increase fellowship and co-operation among them"—সর্ব্বদেশে যাঁহারা পবিত্র ও নির্ম্মল ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে মিলাইতে চাহেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের সুবিধা করা এবং তাঁহাদের সৌহৃদ্য ও সহকারিতা প্রবর্দ্ধিত করা। যাঁহারা পৃথিবীর ধর্ম্মসাহিত্যগুলি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের প্রণালীতে আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহারা এই সম্মিলনসমূহের কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়া থাকেন। বিশ্বসাহিত্য, বিশ্বধর্ম্ম, বিশ্বদর্শন এবং সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি তুলনাসিদ্ধ বিদ্যাসমূহের প্রবর্ত্তকগণ ভারতবর্ষেও এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ওয়েগুটে এইবার সদলবলে ভারতবর্ষে আসিতে ছিলেন—মান্দ্রাজে থৌষ্টিক কনফারেন্সে (Theistic Conference) ইহাঁদের উপস্থিত হইবার কথা ছিল। বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রসমরের প্রভাবে ইহাঁদের ভারতাভিযান স্থগিত রহিয়াছে। ওয়েগুটের গৃহে মান্দ্রাজ-অঞ্চলের খৃষ্টানমিশন-কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের চিত্র দেখিলাম। "দেবালয়" সংক্রান্ত ইংরাজী রিপোর্ট একখানা সম্মুখেই পড়িয়া ছিল। ওয়েগুটে "Indian Messenger"এ প্রকাশিত ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরিক গণ্ডগোল সম্বন্ধে এক মন্তব্য বষ্টনের কাগজে পাঠাইলেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ফটোগ্রাফ দেখাইয়া ওয়েগুটে বলিলেন—"ভারতবর্ষ হইতে এরূপ প্রতিভাবান্ লোক আমেরিকায় বোধ হয় আর কেহ আসেন নাই।"

মনোবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী

ভারতবাসী পদার্থ-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী দেখিয়াছেন, রসায়নের ল্যাবরেটরীর পরিচয় পাইয়াছেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরীক্ষালয়ের অস্তিত্বও অবগত আছেন। প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধীয় নানা বিদ্যার জন্য আমাদের দেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ পরীক্ষা-গৃহ অথবা বিজ্ঞান-শালা আছে। কিন্তু বিজ্জগৎ সম্বন্ধীয় বিদ্যা আলোচনা করিবার জন্যও যে এক্স্‌পেরিমেণ্ট অর্থাৎ নানাবিধ পরীক্ষা চলিতে পারে তাহা ভারতবাসীর ভালরকম জানা নাই। এক্স্‌পেরিমেণ্ট্যাল সাইকলজি, ফিজিয়লজিক্যাল সাইকলজি, সাইকো-ফিজিক্স ইত্যাদি নাম আমাদের দেশে সুপ্রচলিত হয় নাই। এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ভাসা-ভাসা ধারণা মাত্র আছে। ভারতবর্ষের ত কথাই নাই—বিলাতেও এই বিদ্যার চর্চ্চা বেশী হয় না। অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার গোড়াপত্তন পড়িয়াছে মাত্র। অধ্যাপক ম্যাকডুগাল তাঁহার সাইকলজিক্যাল ল্যাবরেটরী অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের বীক্ষণাগার দেখাইবার সময়ে লজ্জিত হইতেছিলেন। বস্তুতঃ বিদ্যাটা নিতান্তই নূতন। আধুনিক জগতের অন্যান্য বিজ্ঞানসমূহের ন্যায় পরীক্ষা-সিদ্ধ মনোবিজ্ঞানও জার্ম্মানিতেই বিশেষ পুষ্ট হইয়াছে। জার্ম্মান পণ্ডিত-গণের শিষ্যেরা আমেরিকায় এই বিদ্যা আমদানী করিয়াছে। হার্ভার্ডে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালয় পঁচিশ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক জেম্‌স্‌ ইহার প্রবর্ত্তক ছিলেন।

মাপ-জোক, গণনা, তালিকা, তথ্যসংগ্রহ, তথ্যতুলনা ইত্যাদি প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতিক জগতের সত্যগুলি আলোচিত হয়। ভূতত্ত্ব,

রসায়ন, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান, তড়িৎবিজ্ঞান ইত্যাদি জড়জগৎ সম্বন্ধীয় সকল বিদ্যায়ই এই সমুদয় আলোচনাপ্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। গোলমেলে ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট ধারণাসমূহ এই উপায়ে বিজ্ঞানরাজ্য হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থূলজগতের বিদ্যাগুলি ক্রমশঃ একজ্যাক্ট সায়েন্স ("exact science") অর্থাৎ মাপ-জোক-সমন্বিত, পরিমাণ-নিয়ন্ত্রিত, গণিত-শাসিত, স্থির-সিদ্ধান্তমূলক, সীমানির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।

মনোরাজ্যের বৈজ্ঞানিকেরাও এইসকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিজ্জগতের তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করিতে চাহেন। মানুষের চিন্তাগুলি কখন্ কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থা বা আকার গ্রহণ করে তাহা বুঝিবার জন্য ইঁহারা চেষ্টা করেন। এই নিমিত্ত মানবের স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, কল্পনাশক্তি, ইত্যাদি লইয়া নানা প্রকার "পরীক্ষা" বা একস্‌পেরিমেণ্ট করা হয়। এই সকল পরীক্ষার ফল নিয়মিতরূপে রক্ষিত হইয়া থাকে। স্থূলজগতের তথ্যসংগ্রহের ন্যায় মনোজগতের ষ্টেটিষ্টিক্‌স্ বা তালিকা-সংগ্রহ আজকাল দার্শনিকগণের অন্যতম লক্ষ্য। পরে এই সংখ্যাতালিকার উপকরণ লইয়া গণিত-বিদ্যার প্রয়োগ করা হয়। এই উপায়ে ফিজিক্‌স্ বা পদার্থ-বিজ্ঞান, বটানি বা উদ্ভিদবিদ্যা, জিয়লজি বা ভূবিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যার ন্যায় সাইকলজি বা মনস্তত্ত্ব ক্রমশঃ একজ্যাক্ট সায়েন্স বা সীমানির্দ্দিষ্টবিজ্ঞানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মনস্তত্ত্ব দার্শনিকের রাজ্য হইতে বৈজ্ঞানিকের রাজ্যে আসিয়া পড়িতেছে। শিক্ষাপ্রচারকগণ, চিকিৎসাব্যবসায়িগণ, ব্যবসায়ের ধুরন্ধরগণ এবং রাষ্ট্রের পরিচালকগণ এই নূতন একস্‌পেরিমেণ্টাল সাইকলজি (Experimental Psychology) বা পরীক্ষাসিদ্ধ মনস্তত্ত্ব বিদ্যার ফলসমূহ গ্রহণ করিয়া মানব-জীবনকে নানা উপায়ে উন্নত ও সুখময় করিতে পারিতেছেন। প্রতিদিন-

কার উঠা-বসায় এবং চলা-ফেরায় এই পরীক্ষাসিদ্ধ, গণিত-নিয়ন্ত্রিত মনোবিজ্ঞান কাজে লাগিতেছে।

অধ্যাপক জেম্‌স্ তাঁহার দর্শনচর্চ্চায় জগতের কোন তথ্যই বাদ দিতেন না। মানুষের পাগলামি, আবল-তাবল বকা, যাদুগিরি, মেস্‌-ম্যারিজ্‌ম্‌, হিপ্‌নটিজ্‌ম্ বা সম্মোহন বশীকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, যোগ, ধ্যান ইত্যাদি বিজ্ঞগৎসম্বন্ধীয় সকল তথ্যই জেম্‌সের দর্শনালোচনায় স্থান পাইত। কাজেই জার্ম্মানির উদীয়মান নব্যবিজ্ঞান তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এই বিদ্যা সম্বন্ধে জেম্‌স্ তাঁহার "Principles of Psychology" নামক প্রসিদ্ধ "চিত্ত-বিজ্ঞান" গ্রন্থে বলিতেছেন :—

"Within a few years, what one may call a microscopic Psychology has arisen in Germany, carried on by experimental methods, asking of course every moment for introspective data, but eliminating their uncertainty by operating on a large scale and taking statistical means. * * * Their success has brought into the field an array of experimental Psychologists, bent on studyiny the elements of mental life, dissecting them out from the gross results in which they are embedded, and as far as possible, reducing them to quantitative scales. * * * The mind must submit to a regular siege, in which minute advantages, gained night and day by the forces that hem her in, resolve themselves at last into her overthrow. There is little of the grand

style about these new prism, pendulum and chronograph philosophers. They mean business, not chivalry. What generous divination and that superiority in virtue which was thought by Cicero to give a man the best insight into nature have failed to do, their spying and scraping, their deadly capacity and almost diabolic cunning, will doubtless some day bring about. * * * The experimental method has quite changed the face of the science, so far as the latter is a record of the mere work done."

অর্থাৎ "অল্পদিনের মধ্যে জার্ম্মানীতে একটি অণুপরিমাণ-মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। এই বিজ্ঞানসেবকগণ প্রতিপদে মনোভাব বিশ্লেষণ করেন এবং প্রমাণের সংখ্যা-বাহুল্যের উপর নির্ভর করিয়া তবে সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হন। এইরূপে সেদেশে একদল পরীক্ষা-প্রয়াসী মনস্তত্ত্ববিদেরও আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা আবর্জ্জনা বর্জ্জন করিয়া খাঁটি তথ্যের দানাটি খুঁটিয়া বাহির করিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহারা চিত্তের সমস্ত প্রচ্ছন্ন ভাবগতিক একটু একটু করিয়া আয়ত্ত করিতে অগ্রসর। এই সব নূতন বৈজ্ঞানিকদের কার্য্যে আড়ম্বর কিছুমাত্র নাই; তাঁহারা আসর জাঁকাইয়া বীরত্ব ফলাইতে চাহেন না, তাঁহারা চাহেন কাজ। সিসেরো মনে করিতেন যে, মানুষ গুণে গরিষ্ঠ ও ধ্যানে নিষ্ঠ হইলেই প্রকৃতিরহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারিবে। কিন্তু সেইসব গুণ সত্ত্বেও মানুষ যাহা জানিতে পারে নাই, এই নববৈজ্ঞানিকদের প্রকৃতির দুয়ারে আড়িপাতা ও ধূর্ত্ত গোয়েন্দাগিরিতে তাহা একদিন নিশ্চয় ধরা পড়িয়া যাইবে। পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা চিত্ত-বিজ্ঞানের চেহারা একদম বদলাইয়া

গিয়াছে। কারণ পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের দ্বারা কৃত কর্ম্মের খাঁটি পরিচয় হস্তগত হয়। কল্পনা বা গোজাঁমিল বিনষ্ট হইয়া যায়।"

জেম্‌স্‌ এই পরীক্ষাপ্রণালী এবং যন্ত্রাদি-নিয়ন্ত্রিত মনোবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত ছিলেন। তিনি এই বিভাগে স্বয়ং বেশী জ্ঞান দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু জার্ম্মানী হইতে একজন উদীয়মান বিজ্ঞানসেবীকে হার্ভার্ডে লইয়া আসেন। তাঁহার নাম মুন্‌ষ্টারবার্গ। ইঁনি বর্ত্তমান কালে এই বিদ্যার অন্যতম ধুরন্ধর। মুন্‌ষ্টারবার্গ এখনও হার্ভার্ডের একস্‌পেরিমেণ্টাল সাইকলজি বা পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান বিভাগের কর্ত্তা।

জগতে আপনা-আপনি যাহা ঘটিয়া থাকে সেই সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহকে "অব্‌জার্ভেসন" (Observation) বা পর্য্যবেক্ষণ বলা হয়। বৃষ্টি হইল বা তুষারপাত হইল, ফুল ফুটিল অথবা চাঁদ উঠিল, কিম্বা কলেরায় লোক মারা গেল অথবা এঞ্জিনের বলে গাড়ী টানা হইল—এই সকল ঘটনার অনুরূপ অসংখ্য ঘটনা দিনরাত ঘটিতেছে। কিন্তু কখন্‌ কোন্‌ ঘটনা ঘটিবে তাহা ত জানা নাই। কাজেই বিজ্ঞানসেবীরা এইরূপ অনিশ্চিতভাবে ঘটনা পর্য্যবেক্ষণের জন্য বসিয়া থাকেন না। তাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া ঘটনা ঘটাইয়া থাকেন। এইরূপ ঘটনার নাম একস্‌পেরিমেণ্ট (Experiment) বা পরীক্ষা করা। আমি ঠাণ্ডাগৃহে বসিয়া আছি। এক্ষণে আমার হস্তপদ ইত্যাদির একপ্রকার অবস্থা দেখিতে পাইতেছি—আমার চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, ক্রিয়াশক্তি সবই এক বিশেষ অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু আমি হয়ত উত্তাপের নানা প্রকার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহি। কবে ঘর গরম হইবে কে জানে? ঠাণ্ডাদেশে ঘর কোন দিনই ত গরম হইবে না। তবে কি আমি উত্তাপের প্রভাব বুঝিবার সুযোগ পাইব না? বৈজ্ঞানিকেরা

এই সকল অসুবিধা নিবারণ করিবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে নানা ঘটনার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কৃত্রিম উপায়ে তথ্যলাভ করিবার জন্যই পরীক্ষালয়, বিজ্ঞানশালা, যন্ত্রগৃহ অথবা ল্যাবরেটরীর আবশ্যক হয়। মনোবিজ্ঞানের সেবকেরা নানা প্রকার মনোভাব পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নানাবিধ যন্ত্র হাতিয়ার কলকব্জা ইত্যাদির উদ্ভাবন করিয়াছেন। শিশুর চিত্ত, পাগলের চিত্ত, অপরাধীর চিত্ত, ডাকাইতের চিত্ত, পশুর চিত্ত, খরগোসের চিত্ত, ইত্যাদি নানা শ্রেণীর চিত্ত এই সকল পরীক্ষালয়ে পর্য্যবেক্ষন করা হয়। আমাদের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্‌সম্বন্ধে জীব-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া এই ধরণেরই কতকগুলি নূতন নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইঁহার পরীক্ষালয়ও পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালয়েরই খানিকটা অনুরূপ। হার্ভার্ডে মুনষ্টারবার্গ যে বিদ্যার অনুশীলন করিতেছেন জগদীশচন্দ্রও কলিকাতায় সেই বিদ্যারই অন্যতম বিভাগে যন্ত্র চালাইতেছেন। বর্ত্তমান জগতে যন্ত্র-চালিত পরীক্ষাফলিত গণনাসিদ্ধ বিদ্যার যুগ।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ হইতে হার্ভার্ড সাইকলজিক্যাল ষ্টাডীজ (Harvard Psychological Studies) নামক পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালয় এবং যন্ত্রসমূহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে :—

"The laboratory has always sought to avoid one-sidedness, and this the more as it was my special aim to adjust the selection of topics to the personal equations of the students, many of whom came with the special interests of the physician, the zoologist, the artist, the pedagogue and so on. My own special

interests may have emphasised those problems which refer to the motor functions and their relations to attention, apperception, space-sense, time-sense, feeling, etc. At the same time I have tried to develop the psychological-aesthetic work, which has become more and more a special branch of our laboratory, and there has been no year in which I have not insisted on some investigations in the fields of association, memory and educational psychology.

On the other hand, in a happy supplementation of interests, Dr. Holt has emphasised the psychology of the senses, and Dr. Yerkes has quickly developed a most efficient experimental deparment of animal psychology."

অর্থাৎ "পরীক্ষাগার এক-পেশেমি ঘুচাইয়া দ্যায়—এবং যে বিষয়ে যে ছাত্র অনুরক্ত তাহাকে তাহার রুচি অনুযায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ দ্যায়। এই পরীক্ষাগারে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালান হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতর প্রাণীর চিত্তও আলোচিত হইয়া থাকে।"

এই পত্রিকার সম্পাদক মুন্‌ষ্টারবার্গ। মুন্‌ষ্টারবার্গ আমাকে ল্যাবরেটরীর সকল গৃহে লইয়া গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলিতেছে—এইজন্য প্রায় কুঠ্‌রীতেই ছাত্র দেখিতে পাইলাম না। অল্পসময়ের ভিতর মুন্‌ষ্টারবার্গ যন্ত্রগুলির কার্য্য বুঝাইয়া দিলেন। যন্ত্রের জন্য একটা গুদামঘর আছে, সেখানে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দোকান হইতে

কিনিয়া রাখা হয়। কিন্তু মুন্‌ষ্টারবার্গ যন্ত্রপাতির এই গুদামঘরের (Instrumentarium) বেশী গৌরব করেন না। ইনি তাঁহাদের নিজ উদ্ভাবিত যন্ত্রের বিশেষ উল্লেখ করিলেন। যখন যেরূপ আবশ্যক হয়, তখন সেইরূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা আছে। এই কারখানা সম্বন্ধেই মুন্‌ষ্টারবার্গ বিশেষ গৌরব করেন। আমাদের জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলিও তাঁহার নিজ পরিচালিত ক্ষুদ্র কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছে। এবার ইয়োরোপে জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রগুলি দেখিয়া বিজ্ঞানসেবী মাত্রেই বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। মুন্‌ষ্টারবার্গ তাঁহার কারখানা সম্বন্ধে বলেন :—

"The place of the laboratory which we appreciate most highly is not the instrument-room but the work-shop, in which every new experimental idea can find at once its technical shape and form."

অর্থাৎ "পরীক্ষাগারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে ঘরটিকে আমরা বেশী সমাদর করি তাহা যন্ত্রাগার নহে, পরন্তু কারখানা-ঘর ; সেখানে প্রত্যেক ভাব স্বকীয় আকার পাইয়া উঠিবার অবকাশ পায়।"

বলাবাহুল্য, যাঁহারা জগতে নূতন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে অগ্রসর হন তাঁহাদিগকে বাজারে প্রচলিত জিনিষপত্র এবং সুপরিচিত যন্ত্রাদির উপর নির্ভর না করিয়া নিজ অভিপ্রায়মত সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। পথপ্রদর্শক মাত্রেরই এইরূপ অভিজ্ঞতা।

একটা জটিল যন্ত্র দেখাইয়া মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"ছাত্রেরা কাজ করিতে করিতে অনেক যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদলাইতে বাধ্য হইয়াছে। নূতন নূতন কলের আবিষ্কার এই উপায়েই হইয়া থাকে।" রেলওয়ে সিগ্ন্যালের দ্বারা কুলী বা কর্ম্মচারীর উপর কিরূপ প্রভাব প্রসারিত হয়

তাহা পরীক্ষা করিবার একটা কল দেখিলাম। একটা যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম ও ক্লান্তি মাপিবার এবং জীবনে তাহার প্রভাব বুঝিবার আয়োজন হইয়াছে। একজন পি-এইচ্ ডি উপাধিপ্রার্থী ছাত্র এই বিষয়ে মৌলিক অনুসন্ধান করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছে। ল্যাবরেটরীর কোন কোন ঘরে তড়িৎশক্তির কারখানা, ফটোগ্রাফে ছবি তুলিবার সরঞ্জাম ইত্যাদি দেখিলাম।

আলোক-বিষয়ক যন্ত্রাদি ব্যতীত শব্দবিষয়ক যন্ত্রাদি কতকগুলি গৃহে দেখিতে পাওয়া গেল। কয়েকটা ঘর দেখাইয়া মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"এগুলি সাউণ্ড-প্রুফ (Sound-proof) অর্থাৎ বাহিরের আওয়াজ কোন মতেই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সুতরাং গৃহে বসিয়া আপনি ইচ্ছামত যে-কোন প্রকার শব্দের প্রভাব পরীক্ষা করিতে পারেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই যে ল্যাবরেটরী-গৃহগুলি দেখিতেছি—সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতেও এই ধরণের যন্ত্রাদি থাকে না কি? তাহা হইলে ফিজিক্‌স্ বা পদার্থবিজ্ঞানে এবং সাইকলজি বা চিত্তবিজ্ঞানে প্রভেদ কোথায়?"

মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। এই জন্যই আমরা হার্ভার্ডে মনোবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীগুলির সঙ্গে মিলাইয়া ফেলি নাই। পরীক্ষাসিদ্ধ চিত্তবিজ্ঞানকে আমরা দর্শনেরই এক অঙ্গ বিবেচনা করিতেছি। এইজন্য দর্শনভবনের (এমার্সন-হল) সঙ্গে সাইকলজিক্যাল ল্যাবরেটরী বা মনোবিজ্ঞানের বীক্ষণাগারকে একসঙ্গে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। আমরা মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রণালীগুলি অবলম্বন করিব—কিন্তু মনোবিজ্ঞানকে স্থূল জগতের বিজ্ঞায় পরিণত হইতে দিব না।"

১৯০৫ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-ভবন "এমার্সন-হল" নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এক্স্‌পেরিমেণ্ট্যাল সাইকলজি বা পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছিল। সেই সময়ে মুন্‌ষ্টারবার্গ বলেন—

"Of course, on the surface a psychological laboratory has much more likeness to the workshop of the Physicist. But that has to do with externalities only. The psychologist and the physicist alike use subtle instruments, need dark rooms, and sound-proof rooms and are spun into a web of electric wires.

And yet the physicist has never done anything else than to measure his objects, while I feel sure that no psychologist has ever measured a psychical state. Psychical states are not quantities, and every socalled measurement thereof refers merely to their physical accompaniment and conditions. The world of qualities, in which one is never a multiple of the other, and the deepest tendencies of physics and psychology are thus utterly divergent."

অর্থাৎ "বাহ্যতঃ পদার্থবিজ্ঞানের ও মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের একটা সাদৃশ্য আছে; কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান মাপজোক পরিমাণের ব্যাপার, এবং মনোবিজ্ঞান গুণবৈচিত্র্য ও ভাববৈচিত্র্যের লীলা নির্ণয়ের ব্যাপার; সুতরাং দুটা বিদ্যার মুখ বিভিন্ন দিকে।"

মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"কলকব্জা, যন্ত্রহাতিয়ার না হইলে কি

পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন চলে না? এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলির জন্য যন্ত্রাদির আদৌ কোন আবশ্যকতা নাই। হার্ভার্ডের কয়েকজন পি-এইচ ডি উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্র কোন যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াই মনস্তত্ত্বের পরীক্ষাসিদ্ধ ফল আলোচনা করিয়াছিল। স্মৃতিশক্তি, কল্পনা-শক্তি, শিল্পজ্ঞান, সৌন্দর্য্যবোধ, ভাবসাহচর্য্য ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা করিতেছিল।"

মুন্‌ষ্টারবার্গ তাঁহার গুরু অধ্যাপক উণ্ডের (Wundt) নিকট হইতে একখানা পত্র পাইয়াছিলেন—

"I am especially glad that you affiliated your new psychological laboratory to philosophy, and that you did not migrate to the naturalists. There seems to be here and there a tendency to such migration, yet I believe that psychology not only now, but for all time belongs to philosophy; only then can psychology keep its necessary independence."

অর্থাৎ "তুমি যে তোমার মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার দর্শনশাস্ত্র-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছ, ইহাতে আনন্দিত হইলাম; মনোবিজ্ঞানকে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করার একটা ঝোঁক মাঝে মাঝে দেখা যায়; কিন্তু মনোবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শনশাস্ত্রেরই অধিকতর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।"

উণ্ড জার্ম্মানির লাইপজিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইঁহার শিষ্যেরাই যুক্তরাষ্ট্রের নানা কেন্দ্রে পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের প্রচারক হইয়াছেন। ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের "শিক্ষা-বিজ্ঞান"-প্রচারক ও মনস্তত্ত্বজ্ঞ প্রেসিডেন্ট ষ্ট্যানলি হল, উণ্ডের শিষ্য। মুন্‌ষ্টারবার্গ এবং ষ্টানলি হলের

ন্যায় কলাম্বিয়া, ইয়েল, শিকাগো, পেনসিলভ্যানিয়া, কর্ণেল, জন্‌স্‌হপকিন্‌স্‌ এবং ওয়াশিংটন ইত্যাদি কেন্দ্রের মনোবিজ্ঞান-ল্যাবরেটরীর পরিচালকেরাও উণ্ডের শিষ্য। পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানে উণ্ডের স্থান সম্বন্ধে মার্জ (Merz) তাঁহার History of European Thought in the Ninteenth Centuryতে লিখিয়াছেন—

"We are indebted to Prof. Wundt of Leipzg for a complete and exhaustive examination of the new province of exact science. He enlarged its boundaries taking in the ground covered by Latze's medical psychology as well as by Helmhotz's physiology of hearing and seeing ; added a large number of measurements of his own, some of them quite original, such as those referring to the time-sense, many of them in confirmation and extension of Fechner's collection of facts ; invented new methods and new apparatus ; brought the whole subject into connection with general physiology, as also with the more exclusively introspective psychology of the older, notably the English and Scottish, schools ; and pointed to the neccessary completion which these investigations demand from the several neighbouring fields of research. Through his labour "physiological psychology" as an independent science has for the first time become possible.

অর্থাৎ "এই বিজ্ঞানকে নূতন ভাবে তথ্যমূলক প্রমাণভিত্তির উপর

স্থাপন করার জন্য লাইপজিগের অধ্যাপক উণ্ডের নিকট আমরা ঋণী। তিনি পূর্ব্বগামী পণ্ডিতগণের পরীক্ষাফল ও জ্ঞান নিজের গবেষণায় নূতনতর ও বর্দ্ধিত করিয়া শারীর-মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করিয়াছেন।"

সুতরাং উণ্ড এই নব্য বিদ্যার জন্মদাতা ও পিতাস্বরূপ। জার্ম্মান পণ্ডিত ফেক্‌নারকে (Fechner) ইহার পিতামহ বলা যাইতে পারে। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার "সাইকোফিজিক্‌স্" (Psycho-physics) গ্রন্থে শরীর ও মনের পরস্পর সম্বন্ধ মাপজোকের সাহায্যে প্রথম আলোচিত হইয়াছিল। ইনি এই বিদ্যার নাম-করণের জন্যও দায়ী। মার্জ তাঁহার ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে লিখিতেছেন—

"Herbart's attempt to submit psychical phenomena to the exact methods of calculation had failed through the want of a measure for psychical quantities. Lotze had suggested the idea of a psychophysical mechanism, i. e., a constant and definite connection between inner and outer phenomena, between sensation and stimulus. E. H. Weber in his important researches on 'Touch and Bodily Feeling' had made a variety of measurements of sensations, and shown that in many cases stimuli must be augmented in proportion to their own original intensity in order to produce equal increments of sensation. These observations lent themselves to an easy mathematical generalisation. Fechner was the first to draw attention of philosophers to the existence of this relation in a variety of instances, and collected a

large number of fact to prove its general correctness. He conceived the idea of measuring sensation by their accompanying stimuli, a mode of measurement based upon that relation, which under the name of Weber's law or *formula*, he introduced as a general psychophysical proposition.

অর্থাৎ "হার্বার্ট মনের ব্যাপারগুলিকে মাপজোক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মাপিবার উপায় না থাকাতে সফল হন নাই; লট্‌সে বাহির ও অন্তরের ব্যাপারের মধ্যে যোগ নিত্য বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিলেন; ওয়েবার অনুভূতির বিবিধ পরিমাণের দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, সাড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে উত্তেজকেরও পরিমাণ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক; ফেকনার বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা গণিতসিদ্ধ প্রমাণ দিয়া সেই সত্য প্রতিপন্ন করেন। উত্তেজকের পরিমাণ নির্ণয় পূর্ব্বক সাড়ারও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি ওয়েবারের নিয়ম মনোবিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।"

ভারতবর্ষে যাঁহারা অন্ততঃ সালী-প্রণীত "মনোবিজ্ঞান" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ওয়েবারের (Weber) নিয়ম অবগত আছেন। পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ মার্জ-প্রণীত ইতিহাস-গ্রন্থের On the Psychophysical View of Nature অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"একটি বাঙ্গালী ছাত্র দর্শনবিভাগে চারপাঁচ বৎসর কাল শিক্ষালাভ করিতেছে। এই বৎসর সে পি-এইচ ডি লাভ করিবে। আমার সঙ্গেও সে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছে।" ইনি আর একটি ছাত্রের কথা বলিলেন। সে জাপানী—শিকাগো বিশ্ব-

বিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ করিয়া হার্ভার্ডে য়্যানিম্যাল সাইকলজি (Animal Psychology) বা ইতর প্রাণীর মনস্তত্ত্ব শিখিতেছে। এই বিদ্যা পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের এক বিভাগ।

মনোবিজ্ঞান দ্বিবিধ—পশুচিত্তের বিজ্ঞান এবং মানবচিত্তের বিজ্ঞান। মুনষ্টারবার্গ বলিলেন—"অধ্যাপক ইয়ার্কিস পশুচিত্তের বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। ইতরজীবের চেতনা, বুদ্ধি, স্মৃতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা ইঁহার কার্য্য। মানবচিত্তের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সঙ্গে পশুচিত্তের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার তুলনাসাধনও ইনি করিয়া থাকেন। এই তুলনাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান বা কম্প্যারেটিভ সাইকলজিও (Comparative psychology) হার্ভার্ডে শিখান হইয়া থাকে। কিন্তু ইয়ার্কিস্ ছয়মাস মাত্র হার্ভার্ডে থাকেন। অন্য ছয়মাস ইনি ক্যালিফর্ণিয়ায় অধ্যাপনা করেন। এখন তিনি এখানে নাই। যাহা হউক—তাঁহার বিজ্ঞানালয় আপনাকে দেখাইতেছি।"

পাখী, বানর, খরগোশ, ইঁদুর, সাপ, বিড়াল, ব্যাঙ ইত্যাদি নানাবিধ ইতর জীব দেখিলাম। এমার্সন-হলের সর্ব্বোচ্চ তলে এই চিড়িয়াখানা অবস্থিত। এক ঘরে জাপানী ছাত্র ইঁদুরের স্বভাব ও মেজাজ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। দুই প্রকারের ইঁদুর খাঁচার ভিতর রহিয়াছে—এক জাতি ভ্রাতা ও ভগ্নীর যৌনসম্বন্ধে উৎপন্ন, অপর জাতি অন্য ভাবে উৎপন্ন। এই দুই জাতীয় ইঁদুরের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের চরিত্র প্রদর্শন করে কি না ইহাই অনুসন্ধান ও পরীক্ষার বিষয়। এ বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কেহই কোনরূপ ফল পান নাই। জাপানী ছাত্রই প্রথম হাত দিয়াছে। অধ্যাপকও এই কার্য্যে কোনরূপ সাহায্য করিতে অসমর্থ।

তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রেরা এই বৎসর নিম্নলিখিত বিষয় লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছে—

1. Colour-vision in a ring-dove.
2. Multiple choice responses of albino rats of out-bred and inbred strains.
3. Delayed Reaction in albino rats.
4. Temperamental Differences in out-bred and in-bred strains of albino rats.

অধ্যাপক ইয়ার্কিস (Yerkes) প্রণীত Introduction to Psychology গ্রন্থে Normal Psychology, Abnormal Psychology, Adult Psychology, Child Psychology, Human Psychology, Plant and Animal Psychology, Individual Psychology এবং Group or Collective Psychology—এক কথায় নানাবিধ চিত্তের তুলনামূলক বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। মর্গানের (Morgan) Introduction to Comparative Psychology'ও উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী নৃত্যগীতবাদ্য

বিদেশী সাহিত্য বুঝা কঠিন নয়—বিদেশী চিত্রাঙ্কন বুঝাও কঠিন নয়—বিদেশী মূর্ত্তিগঠনও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু বিদেশী নৃত্যগীত-বাদ্য বুঝা বড়ই কঠিন। নাচগান মানুষের পক্ষে অতি স্বাভাবিক কার্য্য; কিন্তু এক জাতীয় লোক অপর জাতীয় নরনারীর এই নাচগান শীঘ্র বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সাধারণতঃ বিদেশী নৃত্যকে লম্ফন মাত্র বিবেচনা করা হয়—গীতকে বিকট চীৎকার মনে করা হয় এবং বাদ্যকে বেসুর নিনাদ বিবেচনা করা হয়।

বষ্টনের এক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতালয়ে গানবাজনা শুনিবার জন্য বিনা পয়সায় কম্‌প্লিমেণ্টারী টিকেট পাইয়াছিলাম। প্রায় পাঁচ হাজার স্ত্রী-পুরুষ আজ শ্রোতা। মঞ্চের উপর প্রায় একশত লোক সঙ্গীত করিতেছেন। কতকগুলি স্বর বাজান হইল—কয়েকটা গানও হইল। গান করিলেন এক রমণী। ইনি ওলন্দাজ—কণ্ঠস্বর মিষ্ট। বার্লিনে ইনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে ওস্তাদ কালোয়াতেরা হিন্দী বা উর্দ্দু ভাষায় গান গাহিয়া থাকেন। গীতের ভাষা বুঝি বা না বুঝি, আমরা এই ওস্তাদীই ভালবাসি—আমরা হিন্দীগীতই ফরমাস দিয়া শুনিয়া থাকি। ইংলণ্ড আমেরিকায়ও দেখিতে পাই—প্রত্যেক হোটেল রেষ্টরাঁ ইত্যাদিতে খাদ্য-দ্রব্যের নাম-তালিকা ফরাসীভাষায় লেখা—অথচ ফরাসী-জানা লোক একজনও নাই। ইহা একটা ফ্যাসন। সেইরূপ সঙ্গীতালয়ে সাধারণতঃ যে সকল গান হয় সেগুলি প্রধানতঃ ইতালীয় জার্ম্মান অথবা ফরাসী

ভাষায় রচিত। যাহারা ইংরাজী ছাড়া অন্য ভাষার ধার ধারে না তাহারা এই অপরিচিত ভাষায় লিখিত গীতাবলীর স্বর শুনিয়াই মুগ্ধ হয়! বুঝিতে না পারিলেও "সমে"র সময়ে 'হুঁ" করিতে সকলেই পারে। এখানেও দেখি, যথাসময়ে হাততালি দিতে কেহ ছাড়ে না।

সঙ্গীতালয়ে একখানা পুস্তিকা পাওয়া গেল। ইহাতে প্রত্যেক বাজনা ও গীতের ইতিহাস বিবৃত আছে। কবে কোথায় প্রথম অভিনয়, কে উদ্ভাবয়িতা বা রচয়িতা ইত্যাদি তথ্য জানিতে পারা যায়। প্রথমে একটা জার্ম্মান "সিম্‌ফনি" (Symphony) বাজান হইল। ইহা ১৮৪১ খৃঃ অঃ উদ্ভাবিত। রবার্ট শুমান (Robert Schuman) ইহার রচয়িতা।

ওলন্দাজ রমণী ইতালীয় ভাষায় একটি গীত গাহিলেন। এই গীত মণ্টিভার্ডি (Monteverde) (১৫৬৭-১৬৪৩ খৃঃ অঃ) কর্ত্তৃক রচিত। গীতের নাম The Lament of Ariadne বা য়্যারিয়্যাডান-বিলাপ। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের অজবিলাপ, সীতাবিলাপ, রতি-বিলাপ ইত্যাদির অনুরূপ। এক ইতালীয় রাজকুমারের বিবাহ-উপলক্ষ্যে একটা অপেরা (opera) অভিনয় হয়। তাহার ভিতর এই বিরহ-গীতি ছিল। শ্রোতৃ-মণ্ডলীর উপর ইহার প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে—

"The lament of Ariadne forsaken by Theseus was sung with so much feeling and in such a moving manner that all the hearers were deeply affected by it, and there were tears in every woman's eyes."

অর্থাৎ থিসিউস-পরিত্যক্তা য়্যারিয়্যাড্‌নির বিলাপ-সঙ্গীত এমন ভাব দিয়া গাওয়া হইয়াছিল যে, সকল শ্রোতারই মন দ্রব হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোকের চোখের জল পড়িয়াছিল।

এই করুণ বিরহ-গীতের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

"O Theseus, O my Theseus, you must say that you are mine, even though you fly from me, alas, cruel in my eyes! O Theseus, if you knew, O God, if you knew how troubled is your poor Ariadne, perhaps, repenting, you would turn your prow back toward the shore, and with tranquil breezes you would not leave me, you happy while I weep here. Alas, that you do not reply! Alas, that you are deaf to my cries!

O clouds, O whirlwinds, O winds, overwhelm him in the waves! Hasten, sea-monsters and lightning, fill your abysses with his dismembered body! What am I saying? Am I raving? O me miserable, what do I ask? O Theseus, O my Theseus, it is not I who has said these fierce words—my trouble speaks, my grief speaks, even my tongue speaks, but not my heart. Where is the faith you have sworn to me? Not thus did you reply in the old home of our ancestors. Are these the crowns wherewith my locks are adorned? These the sceptres, these the jewels, and the golden ornaments? Leave me prostrate, O wild beast which tears and devours me! Ah, my Theseus, you could leave me to die, weeping in vain, calling in vain for

help, the unhappy Ariadne who would give you her faith, her glory, her life!

Let me die! who would wish to comfort me in such a cruel fate in so great a martyrdom? Let me die!"

ইতালীর ওস্তাদ মান্টিভাডি ইয়োরোপীয় সঙ্গীত-কলার ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। মধ্যযুগে—এবং এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, ইয়োরোপীয় ভূম্যধিকারী এবং রাজারাজড়ারা কালোয়াত এবং ওস্তাদ-গণকে ধনসম্পত্তি দ্বারা পালন ও সংরক্ষণ করিতেন। বড় বড় উৎসব উপলক্ষ্যে গানবাজনা হইত। জার্ম্মান ওস্তাদ বাক্ (Bach) ১৬৮৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৫০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহাঁর সুরগুলি সর্ব্বত্র সুবিদিত। ইনিও এক সঙ্গীতপ্রিয় রাজকুমারের বন্ধু ও ওস্তাদ ছিলেন। নানাপ্রকার নাচের তালে সাহায্য করিবার জন্ম ইনি কতকগুলি বাজনার গৎ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এইরূপ একটা গৎ বষ্টন-সঙ্গীতালয়ে বাজান হইল—নাচের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

হ্যাণ্ডেল (Handel) আর-একজন জার্ম্মান ওস্তাদ। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়োরোপে নামজাদা হইয়াছিলেন। ইতালীয় ভাষায় ইনি বেশী গীত রচনা করেন। ওলন্দাজ রমণী হ্যাণ্ডেল প্রণীত একটি জার্ম্মান গীত গাহিলেন। তাহার ইংরাজী অনুবাদ :—

"Thanks be to thee, O Lord, for thou hast led thy people with thee, thy people Israel through the Sea. As a flock it passed through. Thy hand, O Lord, protected it in thy goodness. Thou gavest it safety."

অনেক সময়েই দেখা যায় যে, গীত রচনা করেন একজন কিন্তু তাহার

সুর ঠিক করেন আর একজন। জার্মান ওস্তাদ বীঠোবেন (Beethoven) কবি ম্যাথিসনের গীতাবলীর সুরযোজনা করিতে ভাল বাসিতেন। বীঠোবেনের নাম ইয়োরোপের নগণ্য পল্লীতেও পরিচিত। ইহাঁর তালমানলয়-সমন্বিত ম্যাথিসনের গীত বষ্টন-সঙ্গীতালয়ে শুনিলাম। ওলন্দাজ গায়িকা জার্মান ভাষায় গাহিলেন। গীতের ইংরাজী অনুবাদ :—

Lonely wanders thy friend, where o'er the garden
Charmful Springtime in mellow radiance floateth,
And thro' wavering, flow'ry branches quiv'reth
Adelaide !
In the glimmering floods, in alpine snowfields,
In the clouds' golden glow when day declineth,
In the stars' high dominion, beams thine image,
Adelaide !
Twilight breezes 'mid tender leaves are sighing,
Silv'ry May bells are tinkling in the grasses,
Waves are murm'ring and nightingales are warbling,
Adelaide !
Once, O marvel, my grave shall bear a flower,
From its ashes my heart shall yield a blossom,
Brightly gleaming, on every purply petal,
Adelaide !

বীঠোবেন গীতরচয়ীতার অনুমতি না লইয়াই ইহার সুরযোজনা করিয়াছিলেন। কবিকে গায়ক ৩।৪ বৎসর পর পত্র লিখিতেছেন :—

"You yourself know what change a few years produce in an artist who is constantly advancing; the greater the progress he makes in art, the less do his old works satisfy him. My most ardent wish is gratified if the musical setting of your heavenly 'Adelaide' does not altogether displease you; and if thereby you feel moved soon again to write another poem of similar kind, and not finding my request too bold, at once to send it to me, I will then put forth my best powers to come near to your beautiful poetry."

বীঠোবেন ব্যতীত আরও অনেক ওস্তাদ এই গানে সুর লাগাইয়াছিলেন। কিন্তু কবি স্বয়ং তাঁহার কবিতার ভূমিকায় বীঠোবেনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন :—

"Several composers gave a musical soul to this lyrical phantasy; but no one, such is my inmost conviction, by his melody threw the text into deeper shade than the gifted Ludwig van Beethoven at Vienna."

সর্ব্বশেষে একটা গৎ বাজান হইল। সেকস্‌পীয়ারের Midsummer Night's Dreamএর প্রারম্ভিক গীতের জার্ম্মান সুর শুনিতে পাইলাম। জার্ম্মান সাহিত্যে এবং জার্ম্মান সঙ্গীতে বিলাতী সেকস্‌পীয়ারের প্রভাব অত্যধিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেকস্‌পীয়ারের নাটকসমূহ জার্ম্মানভাষায় অনূদিত হয়। সাহিত্যরথী শ্লেগেলের (Schlegel) অনুবাদ জগৎপ্রসিদ্ধ। সেক্স্‌পীয়ারসাহিত্য জার্ম্মানে প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র জার্ম্মানির চিন্তামণ্ডলে নবযুগের সূত্রপাত হয়। ভাবুকতার

আন্দোলন বা "রোমান্টিক্ মুভমেণ্ট" সেই যুগের লক্ষণ। কাণ্ট ফিকটে হেগেল পেষ্টালজি বিস্মার্ক এবং "নব্য নেপোলিয়নের" ফাদারল্যাণ্ড বা জন্মভূমি যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে সেক্স্পীয়ারের প্রভাব বুঝিতে হইবে। সেকস্পীয়ারের জার্ম্মান-অনুবাদই উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মান ভাবুকতা, বীরত্ব এবং একরাষ্ট্রীয়তা ও সাম্রাজ্যনীতির প্রথম স্তর গঠন করিয়াছে।

জার্ম্মান সমালোচক ওয়ার্ণেয়ার (Wernaer) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্ম্মান-ভাবুকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার "Romanticism and the Romantic School in Germany" গ্রন্থে ওয়ার্ণেয়ার বলিতেছেন :—

"Shakespeare was classed by many contemporaries of the Romanticists among the Stormers and Stressers. The Romanticists themselves, however, claimed him as one of their own, considering him the greatest of romantic poets."

অর্থাৎ "জার্ম্মান ভাবুকগণ সেকস্পীয়ারকে নিজেদেরই মাসতুত ভাই, বিবেচনা করিতেন।"

স্বপ্নপ্রচার করা ভাবুকগণের অন্যতম লক্ষণ। জার্ম্মান ভাবুকগণ সাহিত্যে নানাপ্রকার স্বপ্ন প্রচার করিতেন। ওয়ার্ণেয়ার-প্রণীত গ্রন্থের Tieck and the Romantic Mood অধ্যায়ে প্রকাশ :—

"Already in 1793 when Tieck was but twenty years old, he recorded his reflections on this subject in a very interesting essay on *Shakespeare's Treatment of the Supernatural.* 'The Tempest' and 'The Midsummer Night's Dream' he writes, 'may be compared with

sunny dreams. Shakespeare, who so often in his Dramas reveals his intimate familiarity with the tenderest emotions of the human heart, no doubt studied the working of his own mind in his dreams, and made use of his knowledge thus gained in writing poetry.'"

অর্থাৎ "জার্ম্মান লেখক টীক বিলাতী সেকস্‌পীয়ারের রচনায় অতি-প্রাকৃত জগতের আলোচনা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। টীকের মতে সেকস্‌পীয়ার নিজের স্বপ্নসমূহই অনেক সময়ে নানা নাটকে সাজাইয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে মানবচরিত্রের নিগূঢ়তম ভাবসমূহ প্রকাশিত হইতে পারে কি?"

আজকাল সেকস্‌পীয়ারের বংশধরেরা শ্লেগেলের বংশধরগণের সঙ্গে ইয়োরোপের কুরুক্ষেত্রে মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত—কাজেই দুই জাতির সাহিত্য-সেবীগণের মনোমালিন্য বহু কাল পর্য্যন্ত চলিবে। এক জাতির গুণিগণ শত্রুপক্ষীয় গুণিগণের আদর করিতে পারিবেন না। কিন্তু সেকস্‌-পীয়ারকে ভুলিলে যুবক জার্ম্মানির জন্মবৃত্তান্ত ভুলিয়া যাওয়া হইবে।

জার্ম্মান গায়ক মেণ্ডেলসন (Mendelssohn) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে প্রসিদ্ধ হন। ইনি শ্লেগেল-অনূদিত সেকস্‌পীয়ার পাঠ করিয়া কবিতাগুলিতে সুরতাললয় যোজনা করিতে প্রবৃত্ত হন। মেণ্ডেলসনের সুরই বইনের সঙ্গীতালয়ে শুনিলাম। ওস্তাদের ভগ্নী এই সুরের গৌরব করিতেন :—

"We have grown up from childhood in the *Midsummer Night's Dream*, so to speak, and Felix has really made it so wholly his own that he has simply reproduced in music what Shakespeare produced in

words, from the splendid and really festal wedding march to the mournful music on Thisbe's death, the delightful fairy songs and dances and entr'actes—all men, spirit, and clowns, he has set forth in precisely the same spirit in which Shakespeare had before him."

অর্থাৎ "সেকস্‌পীয়ারের কল্পনামূলক স্বপ্নময় নাটকটি শৈশব হইতেই আমাদের দৈনিক আহার্য্য স্বরূপ। এই জন্য সেকস্‌পীয়ার যে ভাবে নাটক রচনা করিয়াছিলেন আমার দাদা সেই ভাবটি নিখুঁতভাবে ধরিতে পারিয়াছেন। এই কারণে সুরগুলি অতি মনোরম হইয়াছে।"

যন্ত্রসঙ্গীত এবং কণ্ঠসঙ্গীত সবই অতি উত্তম লাগিল। এই সঙ্গীতের বিস্তৃত বা বিশদ সমালোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। দেশী সঙ্গীতেরও বিস্তৃত সমালোচনা করিবার যোগ্যতা কোনদিন পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। এমন কি, আমাদের দেশে সঙ্গীতকলার বিশদ সমালোচনা কেহ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহাও শুনি নাই। এইজন্য বিদেশী গানবাজনাগুলি ভাল লাগিল ও সুমিষ্ট বোধ হইল —এই পর্য্যন্ত বলিতে পারাই যথেষ্ট মনে করিতেছি। গানের অথবা বাজনার আরম্ভ মধ্য অথবা শেষ সকল স্থলেই ধরিতে পারিয়াছি, একথা বলিতে পারি না। গীতের ভাষাগুলি বুঝিতে পারিলে হয়ত সুরগুলি বুঝা সহজ হইত। অধিকন্তু স্বদেশী গীতবাদ্য সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা থাকিলেও কানটা কিছু তৈয়ারী থাকিত। এতগুলি অপূর্ণতা লইয়া ভারতবাসী ইয়োরোপ ও আমেরিকার সঙ্গীতালয়ে উপস্থিত হন। কাজেই ঝকমারি বোধ হইবে না ত কি? এই কারণেই পাশ্চাত্য নৃতগীতবাদ্য তাণ্ডবলীলা মাত্র মনে হয়। এই জন্যই আবার মূর্খ এবং গীতবাদ্যে অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্যেরা আমাদের দেশীয় সঙ্গীতাদিকে অসভ্য বর্ব্বরোচিত বীভৎস অনুষ্ঠান বিবে-

চনা করিয়া থাকে। কিন্তু তালমানলয়-জ্ঞানসম্পন্ন বিদেশীয়েরা ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার আদর আরম্ভ করিয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত সমালোচনার আসরে প্রচারিত ছিল যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে "হার্ম্মনি" (Harmony) আছে—ভারতীয় সঙ্গীতে হার্ম্মনির অভাব মেলডি (Melody) আছে। এই দুইটা পারিভাষিক শব্দের অর্থ বুঝি না। যাহা হউক এক্ষণে সমালোচকেরা এই দুইটা শব্দ মাত্রের দ্বারা চালিত না হইয়া একটুকু গভীর ও বিস্তৃতভাবে সঙ্গীতকলার রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের যন্ত্রসঙ্গীত এবং কণ্ঠসঙ্গীতের গৌরব আজকাল পাশ্চাত্যমুখেও শুনিতে পাওয়া যায়।

বষ্টনে জার্ম্মান-সঙ্গীত শুনিয়া পুলকিত হইলাম—বিলাতে কোন কোন ইংরাজী গীত শুনিয়াও বুঝিতে পরিয়াছি যে, পাশ্চাত্য গানগুলি ভারতবাসীর কর্ণে পীড়াদায়ক নয় এবং ইহাদের বাজনাও চিত্তে খোঁচা-মারে না। নিউইয়র্কে এক রুশ গীর্জ্জায় উপস্থিত হইয়া গ্রীকমতাবলম্বী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসঙ্গীত শুনিয়াছিলম। রুশেরা সকল প্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই হিন্দুর প্রণালীতে চালাইয়া থাকে। মন্ত্রপাঠ, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, আরতি, উচ্চারণ, গীত ইত্যাদি কোন বিষয়েই প্রভেদ লক্ষ্য করা কঠিন। কেবল ভাষা পৃথক্। কিন্তু গানের সুরগুলি বেশ বুঝিতে পারা গেল।

আর একদিন একজন ইয়াঙ্কি কবির যন্ত্রসঙ্গীত শুনিয়াছি। ইনি নিউইয়র্কের ভাবুক সাহিত্যসেবী ফ্রান্সিস গ্রিয়ার্সন। ইনি গান গাহেন না —পিয়ানো বাজাইয়া থাকেন। ইহাঁর বাজনা ফ্রান্সে এবং বিলাতেও আদৃত হইয়াছে। নিউইয়র্কে একদিন ইহাঁর বাজনা শুনিলাম। একটা সুরের নাম প্রকাশিত হইল—"Arabian music"। ইনি প্রাচ্য দেশে কখনই যান নাই, কিন্তু ইনি মিষ্টিক এবং ভাবুকতা বিষয়ক সাহিত্যচর্চ্চা

করিয়াছেন। প্রাচ্যজগৎ মিষ্টিসিজিম বা ভাবুকতার দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং আরবই হউক, অথবা হিন্দুস্থানই হউক পাশ্চাত্যের হিসাবে সবই একপ্রকার। গ্রিয়ার্সন নাকি নূতন নূতন গৎ ও সুর উদ্ভাবন করিয়াছেন। আজকালকার দিনে পাশ্চাত্যজগতে প্রাচ্যবিষয়ক যে কোন বস্তু আদরণীয়। বোধ হয় এই জন্যই গ্রিয়ার্সন তাঁহার সঙ্গীতের সঙ্গে প্রাচ্যজনপদের নাম সংযুক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক গ্রিয়ার্সনের উদ্ভাবিত "ইমপ্রভিজেশন" (Improvisation)-গুলি মন্দ নয়। কোন কোনটায় কথঞ্চিৎ প্রাচ্য টান আছে। মিশরের কাইরোতে দুই একটা সুরের কিয়দংশ এইরূপ পাইয়াছি।

গ্রিয়ার্সন একজন সঙ্গীত-সংস্কারক। আজকাল এসকল দেশের সংস্কারকেরা প্রাচীন কিম্বা প্রাচ্যপ্রথা অবলম্বন করিতে চাহেন। আমাদের দেশের সংস্কারকেরাও হয় অতীতে যাইতে চাহিতেছেন—না হয় পাশ্চাত্যের প্রথা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। ভবিষ্যবাদী ফিউচারিষ্ট (Futurist) দল দুই মহলেই এখনও অল্প। বিশেষতঃ ভবিষ্যতের মূর্ত্তি কল্পনা করা নিতান্তই কঠিন। ইতালীয় ভবিষ্যবাদী চিত্রকরগণ এবং তাঁহাদের ফরাসী, ইংরাজ, জার্ম্মান ও ইয়াঙ্কি অনুচরেরা যে বস্তু প্রদান করিতেছেন তাহাতে জগতের কোন লোকেরই পেট ভরিতেছে না। কাজেই পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা হয় "গীতাঞ্জলি"র অভ্যর্থনা করিতেছেন—না হয় প্রাচীন আদিম ইত্যাদির সেবক হইয়াছেন। এইরূপে ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে।

একদিন নিউইয়র্কে এক নৃত্য-সংস্কার-পরিষদের ভবনে উপস্থিত ছিলাম। ইহাতে থিয়েটারের পেশাদার নর্ত্তকীরা আসেন না। নৃত্য-কলার উন্নতিবিধান করিবার জন্য এক ওস্তাদ রমণী এই ডান্সিং য়্যাকাডেমী স্থাপন করিয়াছেন। ভদ্রঘরের মেয়েদিগকে উচ্চধরণের

নৃত্যবিদ্যা শিখান এই পরিষদের উদ্দেশ্য। ইহাতে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা রাষ্ট্রের একজন শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে এই পরিষদে গিয়াছিলাম। ইনি স্বয়ং নাচিলেন না—ইনি পরিষদের প্রতিষ্ঠাত্রীর বন্ধু।

প্রথমে কিছুক্ষণ বক্তৃতা হইল। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকন্‌সিন প্রদেশ হইতে একজন রমণী এইজন্য নিউইয়র্কে আসিয়াছেন। ইনি নৃত্যগীত-বাদ্যের সংস্কারসাধন করিতে প্রয়াসী। বাজনা ও গানের সুরে শব্দের ওঠানামা এবং সরল বা বক্রগতি সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নৃত্যকালে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিই লক্ষ্য করিবার বিষয়। বক্তা সঙ্গীতকলার সঙ্গে নৃত্যকলার তুলনা করিয়া বুঝাইলেন। প্রত্যেক সুরের সঙ্গে সঙ্গে ইনি নিজের শরীর যথারীতি হেলাইয়া দুলাইয়া নৃত্যের ভঙ্গীর সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন। অধিকন্তু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের রেখাপাতে এবং আকৃতিগঠনেও যে এই গতিবিধি, নৃত্যভঙ্গী ও গানবাজনার রীতি অবলম্বিত হয় তাহাও বুঝান হইল। বাকি থাকিল চিত্রকলা। বক্তা বুঝাইলেন যে, এই সমুদয় সুকুমার শিল্পে যাহার নাম রেখাপাত, গতিভঙ্গী অথবা উঠাবসা তাহাই চিত্রকরের ভাষায় বর্ণবিন্যাস, বর্ণসমাবেশ ইত্যাদি। কাজেই গানের ভিতরও রং দেখিতে পাওয়া যায়—বাজনার ভিতরও বর্ণভেদ আছে। চিত্রকে যেরূপ রঙ্গিন বলা হইয়া থাকে, গান বাজনা নাচ ইত্যাদিকেও সেইরূপ রঙ্গিন বলা চলে। অর্থাৎ কানের দ্বারাও রং বুঝিতে পারা যায়, একমাত্র চোখের দ্বারা নয়। এইরূপে ইনি সকল সুকুমার শিল্পের সামঞ্জস্য এবং ঐক্য স্থাপন করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহের পরস্পর সাপেক্ষতা এবং সমতা প্রতিপাদন করিলেন। অধিকন্তু সঙ্গীতকলায় বর্ণতত্ত্বও প্রচারিত হইল।

সঙ্গীতে বর্ণতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বক্তা অনেক উদাহরণ দিলেন। ইনি

প্রাকৃতিক জগতে, জীবজগতে, উদ্ভিদ্‌জগতে, মানবজগতে, এককথায় সমগ্র সংসারে বর্ণভেদের উৎপত্তি আলোচনা করিলেন। নৃতত্ত্ববিদ্যায় প্রচারিত বর্ণভেদের কারণই ইনি উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"উত্তর মেরুতে শ্বেত ভল্লুক জন্মগ্রহণ করে—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নানাবর্ণে চিত্রিত জীবজন্তু দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে মানব বর্ণহীন অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ। উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজে বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়। সূর্য্যরশ্মির ঊনিশবিশ ভেদই জগতে লাল কাল শ্বেত পীত ইত্যাদি রং সৃষ্টির কারণ। প্রাকৃতিক জগতে ইহা লক্ষ্য কে না করিয়াছে? মানসিক জগতেও ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক।"

এই বলিয়া বক্তা তাঁহার একজন সহযোগিনীকে গ্রামোফোনের বাক্স হইতে একটা গান শুনাইতে বলিলেন। কলের গান বন্ধ হইলে বক্তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা বর্ণহীন জাতির গান—না বর্ণযুক্ত জাতির গান? ইহা শীতপ্রধান দেশীয় লোকের গান—না গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় লোকের গান?" কোন রমণী বলিলেন—"ইহাতে সুরের খাদ চড়াই বড় বেশী—ইহা নিশ্চয়ই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গীত—ইহা কালার্ড (coloured) বা রঙ্গিন।" আর একজন বলিলেন, "ঠাণ্ডাদেশের লোকেরা কখনই এরূপ ভাবে গলা ছাড়িয়া গাহিবে না। ইহাতে গরমের প্রভাব বেশ মনে হইতেছে।" এই ধরণের অনেকগুলি কলের গান শুনিলাম—সঙ্গে সঙ্গে বক্তার ব্যাখ্যা এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সমালোচনাও বুঝিতে লাগিলাম। আইরিশ, ফিনিশ, রুশ, জার্ম্মান, ইত্যাদি, চীনা, জাপানী, ভারতীয়, মিশরীয়, লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্, ফরাসী ইতালীয়, ইংরাজী ইত্যাদি সকল জাতীয় গীতই এইরূপে একসঙ্গে তুলনা করা হইল। সঙ্গীতকলায় ভূগোলের প্রভাব বুঝানই বক্তার উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে বোধ হয় ইনি বক্তব্য স্পষ্ট করিতে পারিয়াছেন।

ইঁহার সিদ্ধান্তসমূহ বেশ চিত্তাকর্ষক মনে হইল—ইনি বুঝাইবার যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলাম। এই ধরণের সমালোচনা জগতে নূতন নয়। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে মানবের চরিত্র, সমাজের চরিত্র, রাষ্ট্রের চরিত্র ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য অনেকেই এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। মানবের সভ্যতা, তাহার আবেষ্টন, জন্মস্থান, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ ইত্যাদির দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত, কেহই আজকাল ইহা সর্ব্বাংশে অস্বীকার করেন না। ফরাসী বোডিন ও মণ্টেউস্কি, জার্ম্মান হার্ডার ও হেগেল, ইংরাজ বাক্‌ল্ ও ব্যাজহট এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাক্‌লের (Buckle) History of Civilisationএ খানিকটা বাড়াবাড়ি আছে। ব্যাজহটের (Bagehot) Physics and Politicsগ্রন্থেও ভূগোলের মহিমা অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেই বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। এমন কি, কেহ কেহ বলিতেন—"কোন্ দেশ কত গরম তাহা জানিতে পারিলেই আমি বলিয়া দিব সেই দেশের লোকেরা প্রজাতন্ত্রশাসন পছন্দ করে কিম্বা রাজতন্ত্র শাসন পছন্দ করে। থার্ম্মমেটার বা তাপমানযন্ত্রের সাহায্যে জাতির চরিত্র মাপা যাইতে পারে।" এইরূপ জড়বাদী পণ্ডিতগণের চিন্তায় মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি ভূগোল, রসায়ন এবং পদার্থবিজ্ঞানেরই ছায়া মাত্র। মানবচিত্তের উপর জড়জগতের প্রভাব সম্বন্ধীয় এইরূপ মতবাদ জার্ম্মান দার্শনিক হীকেল (Haeckel) এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক হাক্সলে (Huxley) নিজ নিজ রচনায় প্রচারিত করিয়াছেন। এই মতের নাম এপি-ফেনোমেন্যালিজম (Epi-Phenomenalism) অর্থাৎ মন, চিত্ত, আত্মা ইত্যাদি ভূত, শরীর এবং জড়পদার্থ ইত্যাদির ফল বা ছায়া মাত্র—ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও মূল্য নাই।

সঙ্গীতকলার বর্ণতত্ত্বপ্রচারকও খানিকটা বাড়াবাড়ি করিলেন। কোন দেশের উত্তাপ জানিতে পারিলেই ইনি সেখানকার সঙ্গীতের ধরণধারণ বলিয়া দিতে পারেন, এইরূপই ইঁহার ধারণা! কিন্তু কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য নয়।

সকলের গান এবং বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে নাচ সুরু হইল। ওস্তাদ রমণী বলিলেন—"আজকাল নৃত্যকলায় কুরুচি দেখা দিয়াছে। সুরুচি প্রবর্ত্তনের জন্য আমি প্রাচীন গ্রীক রীতি প্রবর্ত্তন করিতে চাহি।" নাচ দেখিলাম। ভাল মন্দ বিশ্লেষণ করা কঠিন। সাধারণ থিয়েটারে কিম্বা নাচঘরে যে ধরণের নৃত্য দেখা যায় তাহা হইতে এগুলি স্বতন্ত্র, এই যা বুঝিলাম। কিন্তু ওস্তাদ পূর্ব্ব হইতে এই প্রভেদ ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিয়া না দিলে সাধারণ হইতে পার্থক্য বুঝিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

আজকাল নৃত্য-সংস্কারের আন্দোলন পাশ্চাত্য জগতের নানা স্থানে দেখা যায়। মধ্যযুগের কয়েকটা নৃত্যভঙ্গী পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রয়াস চলিতেছে। একজন কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে এক ব্যক্তি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। লণ্ডনের কোন নৃত্যবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বলেন—"লোকরুচি আজকাল এত বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, মধ্যযুগের ভাল ভাল কায়দাগুলি আর সমাদৃত হয় না। সেগুলি পুনঃ প্রবর্ত্তন করা একপ্রকার অসম্ভব।" তাঁহার কথা লণ্ডনের ডেলী টেলিগ্রাফে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"Why don't we revive them? Who would dance them even if we did succeed? We are always trying to improve the state of matters as regards dancing, but we do not make much headway. The *minuet*! What would a minuet be like danced by your modern woman,

with her hockey, golf and motor muscles, her masculine strike and her ungainly movements ? Then just picture to yourself the average modern man ; take him somewhat rotund in appearance, with a tight-fitting suit and his hands encased in white gloves two sizes too large in case they split in puting on, and you have a picture of the minuet as it is better left alone. No, the minuet demands powder and patches and old brocades and wigs and slow graceful movement. The men would have to wear high-heeled shoes, with buckles as they used to do and the modern man simply won't.

And the *pavane !* Do you know what a pavane means ? It was an old Italian dance, with slow and sweeping movements. Think of slow and sweeping movements with two-button white kid gloves. The cavalier danced it with his cloak on, and at a certain point in the dance he made a low bow and with a languid and graceful movement touched his sword. The hilt of the sword rose up and the cloak went with it, making something like the effect of a peacock's tail : hence the name pavane. And the ladies wore voluminous skirts and dipped and courtesied. No, the minuet and the pavane are out of keeping with the modern ball-room spirit. Deportment is out of fashion.

The modern woman does not deport herself, she shuffles and strides and slouches. * * * We are using a new set of drill exercises, because hockey and games of that kind have made our women so muscular and so ungainly. They have been over-doing it."

দেখিতেছি, কৃত্রিমতা অস্বাভাবিকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে দুনিয়ার সর্ব্বত্র এবং সকল ক্ষেত্রে "ষ্টর্ম য়্যাণ্ড ষ্ট্রেস্" ("Storm and stress") অর্থাৎ উন্মাদনা ও সংগ্রাম এবং তীব্র প্রতিবাদ চলিতেছে। ইহাই কি বিংশ শতাব্দীর রোমাণ্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত নয়? নবীন জগৎ গঠনের জন্য, নূতন আদর্শ প্রচারের জন্য, নূতন চিন্তাপ্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য কবি, গায়ক, নর্ত্তক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিক্ষাপ্রচারক, সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এশিয়াবাসীর জাগরণ, ইয়োরোপে ও আমেরিকায় এশিয়ার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ এবং এশিয়ার কীর্ত্তিপ্রচার, পাশ্চাত্যজগতের বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্র, সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, তুলনামূলক আলোচনাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন, "উচ্চাঙ্গের সমালোচনা," বোয়াজ প্রণীত "The Mind of Primitive Man," নীট্‌শের "Transvaluation of Values"-তত্ত্ব, "Anti-Intellectualism" বা ভাবুকতা, বার্গসোঁর "Intuition" বা সূক্ষ্মদৃষ্টি ইত্যাদি কি অষ্টাদশ শতাব্দীর ষ্টার্ম আণ্ড ড্র্যাঙ্গ (Sturm und Drang) বা বিশ্বসমালোচনারই পুনরাবৃত্তি বুঝাইতেছে না? কাজেই বিশ্বে যুগান্তর আগতপ্রায়। কবি শেলীর কথা মনে পড়িতেছে—"If winter comes, can spring be far behind?"

হার্ভার্ডে অধ্যাপনা

চীনাবাদাম ও ভুট্টা-ভাজা অথবা মুড়ি খাইতে খাইতে ছাত্রেরা বক্তৃতা-গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড গৃহ ভরিয়া গেল। মনোবিজ্ঞানের জন্য এত ছাত্র পূর্ব্বে আশা করি নাই। প্রায় চারিশত শিক্ষার্থীকে এক গৃহে দেখিতে পাওয়া আনন্দের কথা। কয়েক জন নিগ্রো ছাত্রও দেখিলাম।

দুই সপ্তাহ ধরিয়া পরীক্ষা চলিতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কাজকর্ম্ম একপ্রকার বন্ধই ছিল। অধ্যাপকেরাও সকলে কেম্ব্রিজে ছিলেন না। অবকাশের সময়ে হার্ভার্ডের অধ্যাপকগণ যুক্তরাষ্ট্রের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য আহূত হন। এখানে আসিয়াই শুনিলাম, কোন অধ্যাপক কর্ণেলে, কোন অধ্যাপক ক্যালিফর্ণিয়ায়, কোন অধ্যাপক নিউইয়র্কে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

আজ অধ্যাপক মুন্‌ষ্টারবার্গ এই চারিশত ছাত্রের মনোবিজ্ঞানে হাতেখড়ি আরম্ভ করিলেন। কোনও গ্রন্থ পাঠ করা হইল না—অথবা নোট-বুক হইতেও মাঝে মাঝে কিছু পাঠ করা হইল না। অধ্যাপক গল্পের ভাষায় কথাগুলি সরলভাবে বলিয়া গেলেন। অক্সফোর্ডের অধ্যাপকগণ এইভাবে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যান মাত্র। মুন্‌ষ্টারবার্গের প্রণালীই হৃদয়গ্রাহী।

মনোবিজ্ঞান পদার্থটা কি তাহা বুঝানই আজ বক্তার উদ্দেশ্য। মুন্‌ষ্টারবার্গ বুঝাইলেন, এই বিদ্যাটা কটমট ও নীরস নয়। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে, বিজ্ঞান-প্রচারে, শিক্ষা-ব্যবসায়ে, চিত্রকলায়, সাহিত্য-সেবায়,

সমাজ-সংস্কারে জীবনের প্রতিদিনকার প্রত্যেক কার্য্যেই এই বিদ্যার প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই সমুদয় কথা যথাসময়ে বিবৃত করা হইবে। অধিকন্তু সাধারণ নরনারীর পরিচিত চিন্তা, আবেগ, উচ্ছ্বাস, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, যুক্তিপ্রণালী ইত্যাদিই মুন্‌ষ্টারবার্গের একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকিবে না। ইনি প্রতিভাসম্পন্ন বীরগণের চিত্তবৃত্তি আলোচনা করিবেন আবার দুর্ব্বলচরিত্র মস্তিষ্কহীন পাগলদিগের মনোভাবও বিশ্লেষণ করিবেন। ইহাঁর আলোচনায় ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রণালী ছাড়া সমাজগত, সম্প্রদায়গত, বংশগত, জাতিগত, সমিতিগত, পরিষদ্‌গত, রাষ্ট্রগত, চিন্তা এবং ধারণাসমূহও বিশ্লেষিত হইবে। তাহা ছাড়া, কখনও শিশু-চরিত্র, কখনও প্রৌঢ়-চিত্ত কখনও বা বৃদ্ধের মন আলোচনার বিষয় থাকিবে। কেবল তাহাই নহে। পশুপক্ষী জীবজন্তুদিগের চেতনা, তাহাদের ধারণাশক্তি, তাহাদের স্মৃতিশক্তি, তাহাদের সুখ-দুঃখবোধ, ইত্যাদিও ইহাঁর ছাত্রেরা বুঝিবার চেষ্টা করিবে।

মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"তোমাদের জন্য আমি একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। নাম Psychology General and Applied, ইহাতে এই সমুদয় বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ অল্পদিন মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তোমাদের পূর্ব্বে আর কেহ ইহা ব্যবহার করে নাই। তোমরাই এই বৎসর ইহা প্রথম পাঠ করিবে। পাঠের পর তোমাদের সমালোচনা আমি চাহি। সেইসকল সমালোচনা-অনুসারে আমি আমার গ্রন্থের উন্নতি সাধন করিব।"

এমর্স ন হলে মুন্‌ষ্টারবার্গের অধ্যাপনা দেখিয়া কলোনিয়াল ক্লাব নামক অধ্যাপকগণের মজলিশে গেলাম। ইহার ক্ষুদ্র লাইব্রেরীতে বসিয়া বই ঘাঁটা গেল। বিজ্ঞানবীর আগাসিজের রচনাবলী এবং জীবন-বৃত্তান্ত বিশেষরূপে দেখিলাম। দর্শনে জেমসের যে স্থান, সাহিত্যে

হুইট্‌ম্যান ও এমার্সনের যে স্থান, বিজ্ঞানে আগাসিজের (Agassiz) সেই স্থান। ভূতত্ত্ব, ভূগোল, উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং জীববিদ্যা, এই কয় বিদ্যাই আগাসিজ প্রধানতঃ চর্চ্চা করিতেন। ইনি সুইজর্ল্যাণ্ড দেশীয় লোক ছিলেন—পরে ইয়াঙ্কিস্থানের অধিবাসী হন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে ইয়াঙ্কিস্থানের উত্তর ও দক্ষিণ রাষ্ট্রসমূহের গৃহবিবাদ চলিতেছিল। সেই যুদ্ধের পর দাসত্ব-প্রথা বিতাড়িত হয় এবং আধুনিক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। এই সময়ে আগাসিজ কোন ধনী বন্ধুর সাহায্যে ৮।১০ জন বৈজ্ঞানিককে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ-আমেরিকা বেড়াইতে আসেন। ব্রেজিল-ভ্রমণই প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই বৈজ্ঞানিক অভিযানের বৃত্তান্ত Journey in Brazil-পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে মেগাস্থেনীস, হুয়েন্থসাং, আল্‌বিরুনি, টেভার্নিয়ার ইত্যাদি পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত সুপরিচিত। যাঁহারা নূতন নূতন জগৎ, দেশ, প্রদেশ, দ্বীপ ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহাদের পর্যটন-কাহিনী বিশেষরূপে আলোচিত হয় না। এইসকল ভৌগোলিক আবিষ্কার-বৃত্তান্ত ভারতীয় সাহিত্যে থাকা আবশ্যক। অন্ততঃ মূলগ্রন্থগুলি ভারতবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানবিৎ, জীবতত্ত্ববিৎ, ভূতত্ত্বজ্ঞ, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তও ভারতবর্ষে প্রচলিত হওয়া উচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ ডারউইন এবং প্রথম ভাগে জার্ম্মান হাম্বল্ড (Humboldt) জগৎ ভ্রমণ করিয়া বিজ্ঞানে যুগান্তর আনিয়াছিলেন। ডারউইন এবং হাম্বল্ডের ভ্রমণকাহিনী বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। আগাসিজের ব্রেজিল ভ্রমণও বিজ্ঞান-সেবী মাত্রের আদরণীয় বস্তু।

ধন-বিজ্ঞানবিষয়ক অনুসন্ধানালয় বা সেমিনারে উপস্থিত হইলাম। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা যথারীতি আসিয়াছে। দুইজন অধ্যাপক নায়কতা

করিবেন। স্থাবরসম্পত্তির মূল্য নিরূপণ কি উপায়ে হইয়া থাকে তাহাই আজ আলোচনার বিষয়। কেম্ব্রিজনগরের অন্যতম শাসন-কর্ত্তা এই বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন। নগরের কতিপয় প্রবীণ ব্যবসায়ী ও মহাজন এই আলোচনায় যোগ দিতে আসিয়াছেন।

বক্তা নিউইয়র্ক, বষ্টন, পিটস্‌বার্গ ইত্যাদি নগরের নানা রাস্তার উল্লেখ করিলেন। কোন্ রাস্তার কোন্ দিকে ভূমির মূল্য কিরূপ তাহা জানান হইল। মূল্য-নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তারা কোন্ কোন্ বিষয় বিচার করিয়া দেখেন সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চলিল। বক্তৃতার পর তর্ক প্রশ্ন এবং সমালোচনার সময় ছিল না।

কলাম্বিয়ায়ও দেখিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে নগরশাসন, রেলের ভাড়া, ভূমিক্রয়, দোকানদারী, ভেজাল মাল, নূতন দ্রব্যের সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে ধনবিজ্ঞানশিক্ষার্থীরা আলোচনা করিতে শিখে। হার্ভার্ডেও তাহাই দেখিতেছি। ইহার সঙ্গে ভারতে প্রচলিত ধনবিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা তুলনা করিলে বলিব, আমরা ধন-বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা এখনও জানিনা। যেদিন দেখিব, নগরের শাসনকর্ত্তারা এবং প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ ঋণদান, ঋণগ্রহণ, রাজস্ব আদায়, রাজস্ব বিভাগ, ইত্যাদি যে সমুদয় বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও পঠদ্দশায় সেই-সমুদয় প্রশ্নেরই আলোচনা করিতেছে, সেইদিন বুঝিব, ধনবিজ্ঞান-বিদ্যাটা ভারতবর্ষে যথার্থই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞান ভারতবাসীর পেটে পড়ে নাই বলিতে হইবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গ্রন্থশালায় ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ রক্ষিত হয়। তাহার নাম 'ডিভিনিটি লাইব্রেরী'। ইহার ভিতর যাইয়া দেখি, অধ্যাপক ল্যান্‌ম্যান সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর নূতন তালিকা প্রস্তুত ও সাজান গুছান করিতেছেন। এই লাইব্রেরীর সম্মুখে বড় বড়

মিউজিয়ামগুলি অবস্থিত—পার্শ্বে সেমেটিক মিউজিয়াম। আমি ল্যান্‌ম্যানকে বলিলাম—"বোধ হয় আপনি একটা ভারতীয় মিউজিয়াম স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন?" ল্যান্‌ম্যান বলিলেন—"না মহাশয়, আমি এরূপ সংগ্রহালয় পছন্দ করি না। এই যে সেমিটিক মিউজিয়াম দেখিতেছেন—ইহার জন্য ঝাড়ুদার ও কেরাণী রাখিতেই যত খরচ তত খরচে ভাল ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারে। গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইলে দুনিয়ার সর্ব্বত্র উপকার ছড়াইয়া পড়ে। আর এই একটা বাড়ীতে লক্ষ লক্ষ টাকা পুতিয়া রাখিলে লাভ কি? কালেভদ্রে দুই একজন লোক হয়ত দ্রব্যগুলি দেখিতে আসে। আমাদের প্রাচ্য গ্রন্থমালা প্রচারের ফলে নরওয়ে, রুশিয়া, তোকিও হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রেজিল, চিলি পর্য্যন্ত হার্ভার্ডের নাম প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু একটা ইণ্ডিক মিউজিয়াম বা ভারতসম্পর্কীয় মিউজিয়াম স্থাপন করিলে অর্থব্যয় অত্যধিক হইত, অথচ সেই পরিমাণে হার্ভার্ডের অথবা জগদ্বাসীর উপকার হইত না!"

ধনবিজ্ঞানের সাধারণ ক্লাসে প্রায় ৫০০ ছাত্র উপস্থিত। দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বার্ষিক ছাত্রেরা আসিয়াছে। অধ্যাপক টাওসিগ পড়াইতেছেন। একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ইহাঁকে সাহায্য করিতেছে। নীউ লেক্‌চার হলে প্রবেশ করিয়া দেখি, একজন অধ্যাপকের আদেশ অনুসারে গ্র্যাজুয়েট বোর্ডের উপর লিখিতেছে। ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পশম ও চিনি কত আমদানি হইয়াছে এবং কত উৎপন্ন হইয়াছে তাহারই বিবরণ লিখিত হইতেছে। শুল্ক বসাইয়া যুক্তরাষ্ট্র কত আয় করিয়াছেন তাহাও তালিকায় দেখিলাম।

টাওসিগ গল্পাকারে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। প্রথমে গত পরীক্ষা সম্বন্ধীয় একটা প্রশ্ন আলোচিত হইল। কোন কোন দেশে রপ্তানী অপেক্ষা

আমদানী বেশী। গ্রেটবিটেন ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইহার কারণ কি? আবার কোন কোন দেশ হইতে সোনারূপা রপ্তানী অত্যধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। ইহারই বা কারণ কি? দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে সোনা-রূপা বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু রুশিয়ায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে সোনারূপা উৎপন্ন হইয়া দেশেই থাকে। এই সকল বিষয়ের পর অন্যকার পাঠ আরম্ভ হইল। সংরক্ষণনীতি অবলম্বনের সুফল বুঝান হইল। যুক্তরাষ্ট্রের গত দশ বৎসরের কথাই আলোচিত হইল। অধ্যাপক বলিলেন—"সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের ফল সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তাদিগের ভুল ধারণা আছে। প্রথমতঃ ইহাঁরা বিবেচনা করেন যে, বিদেশী দ্রব্যের উপর খাজনা বসাইতে পারিলেই স্বদেশকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তোলা যায়। দ্বিতীয়তঃ আর একদলের রাষ্ট্র-পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে, বিদেশী দ্রব্য আমদানীর উপর শুল্ক বসাইবার ফলেই যুক্তরাষ্ট্রে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।" ইনি দুই মতেরই বিরোধী। দেশের সমৃদ্ধি অথবা দ্রব্যাদির মূল্য বুঝিতে হইলে দেশী লোকদের মূলধন, ব্যাঙ্ক-পরিচালনা, কারেন্সি বা টাকা কড়ির পরিমাণ, ইত্যাদি আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) অথবা শুল্কনীতি (Tariff Legislation) কোন একটির ঘাড়ে সকল সুখ বা দুঃখ চাপাইলে সমস্যাটা তলাইয়া বুঝা হইবে না।

চারি পাঁচশত ছাত্র বক্তৃতা শুনিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। কেহ নোট লইতে পারে, কেহ পারে না। অনেকে ঘুমাইয়া পড়ে। অক্সফোর্ডেও এই অবস্থা। তাহা হইলে ছাত্রেরা শিখে কখন? এইজন্য গৃহে ইহাদের পড়াশুনা দেখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৫।২০ জন ছাত্রকে এক এক দলে বিভক্ত করা হয়। ইহারা সহকারী অধ্যাপকগণের অধীনে পড়াশুনা বুঝিয়া লইতে পারে। এইরূপ টিউটরিয়াল সিষ্টেম অক্সফোর্ডেও আছে।

হার্ভার্ডে এইরূপ দল-বিভাগের নাম সেক্‌শন-কনফারেন্স। এই ব্যবস্থা না থাকিলে কোন ছাত্রেরই হার্ভার্ডে উপকার হইত না। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং হার্ভার্ডে যত রকম প্রভেদ আছে তাহার মধ্যে এই বিষয়টি অন্যতম। সহযোগী অধ্যাপকগণের নিয়োগেই হার্ভার্ড কলাম্বিয়া ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসংখ্যা প্রায় ৮০০ হইতে ১১০০ হয়। এতগুলি লোক নিযুক্ত করিতে পারিলে সকল দেশেই গাধা পিটাইয়া মানুষ তৈয়ারী করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইতে পারে। অবশ্য সুযোগগুলি ব্যবহার করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। ভারতবাসীর সে ক্ষমতা নাই কি?

৩০।৪০ জন গ্রাজুয়েট ছাত্রের সেমিনার দেখিলাম। অধ্যাপক টাওসিগ পরিচালনা করিতেছেন। কলাম্বিয়ায় দেখিয়াছি—এক এক জন ছাত্র এক এক বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার লইয়াছে। সেলিগম্যানের সেমিনারে একদিন দেখিলাম, জার্ম্মানভাষায় প্রচারিত ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কয়েকখানা পত্রিকা পাঠ করিয়া একজন ছাত্র নোট সংগ্রহ করিয়াছে। কোন্ পত্রিকায় কিরূপ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে সেই কথা অন্যান্য ছাত্রগণকে জানান তাহার কর্ত্তব্য। এইরূপে ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় ধনবিজ্ঞানের কথাগুলি সকল ছাত্রই জানিতে পারে। টাওসিগের সেমিনারে দেখিলাম, "ইকনমিক থিয়রি" (Economic Theory) "বার্ত্তা"-তত্ত্ব আলোচনা হইতেছে। পূর্ব্বে য়্যাডামস্মিথ, রিকার্ডো, মার্শ্যাল ইত্যাদি ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার ধুরন্ধরগণের গ্রন্থ সমালোচিত হইয়াছে। টাওসিগ বলিলেন—"আমি শীঘ্রই মার্শ্যালের ভুলগুলি দেখাইয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিব। কোন কোন স্থলে ভাষা অস্পষ্ট—কোন কোন স্থলে যুক্তির দোষ।" আজ ক্লার্কপ্রণীত "The Distribution of Wealth" পুস্তকের সমালোচনা হইল। অধ্যায়ের পর অধ্যায় অনুসারে আলোচিত

বিষয়ের বিশেষত্ব দেখান হয়। তাহার পর সেই সমুদয় তথ্য সম্বন্ধে তর্ক, প্রশ্ন, বাদানুবাদ চলিতে থাকে। এই প্রণালীতে গ্রন্থসমূহের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হয়।

মনোবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে দেখিলাম, প্রত্যেক গৃহে দুইজন করিয়া পি-এইচ্ ডি উপাধিপ্রার্থী ছাত্র নানাপ্রকার পরীক্ষায় ব্যাপৃত। অধ্যাপক ল্যাঙ্গফীল্ড বলিলেন—"একজন ভারতীয় ছাত্র নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এই বিজ্ঞানালয়ে পি-এইচ্ ডি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া সে নব্য দার্শনিক মতবাদসমূহের সমালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছে। সেই বিভাগেই সে পি-এইচ্ ডি পাইবে। কিন্তু এক্স্পেরিমেণ্ট্যাল সাইকলজি বা প্রমাণমূলক মনোবিজ্ঞানে তাহার জ্ঞান প্রশংসার্হ। ভারতবর্ষে সে এই বিদ্যা প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে।"

হার্ভার্ডের পি-এইচ্ ডি পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। বার চৌদ্দ দিন ধরিয়া লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা হয়—তাহার উপর মৌলিক গবেষণায় উচ্চ সম্মান লাভ করা আবশ্যক। অক্সফোর্ডে বি-এ পাশের পর আর কোন পরীক্ষা লওয়া হয় না। জার্ম্মানীতে পি-এইচ্ ডি অক্সফোর্ডের বি-এ পরীক্ষার ন্যায় সর্ব্বনিম্ন পরীক্ষা। সকল দিক দেখিলে মনে হইবে যে, পরীক্ষা হিসাবে হার্ভার্ডের পি-এইচ্ ডি পরীক্ষা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

ইয়াঙ্কি সংস্কৃতজ্ঞের বুলি

অধ্যাপক ল্যানম্যানের বয়স ৬৪ বৎসর। এই বয়সে পাশ্চাত্য লোকেরা বৃদ্ধ বলিয়া গণ্য হন না। কিন্তু ল্যানম্যান কিছু স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতীয় বৃদ্ধগণের স্বভাব ইঁহাতে কিছু কিছু দেখিতেছি।

ল্যানম্যান প্রায়ই বলিয়া থাকেন—"কি আর বলিব মহাশয়—বড়ই কষ্টে দিন কাটিতেছে। চারিটা মেয়ে, দুইটা ছেলে। প্রত্যেককে উচ্চশিক্ষা দিতে যথেষ্ট অর্থব্যয়। এ দিকে বড় মেয়ের বয়স ২৫ বৎসর হইয়া গেল। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যুবক অধ্যাপকের সঙ্গে ইহার প্রণয় জন্মিয়াছে। অথচ চারি বৎসর হইয়া গেল যুবক এখনও বিবাহের পাকা কথা পাড়িল না। কন্যাদায় বিষম ব্যাপার। ভারতবর্ষেও কি 'মেয়ে পার' করা একটা সমস্যা নয়?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রণয় জন্মিয়াছে বলিয়া দুই জনের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে আশা করিতেছেন কি করিয়া?" ল্যানম্যান বলিলেন—"অবশ্য সাধারণত 'এনগেজমেন্ট' হইতেই বিবাহের আশা করা যায় না। কিন্তু যুবক আমার কন্যাকে আংটি উপহার দিয়াছে—আমার নিকট অনুমতি পর্য্যন্ত চাহিয়াছে। অবশ্য ইচ্ছা করিলে সে ইহাকে ছাড়িয়া দিতেও পারে—কিন্তু তাহার দায়িত্বজ্ঞান থাকা উচিত।"

রান্না-বাড়ির কথা, ঘর-দরজার কথা, জামা-জুতার কথা, টাকা-কড়ির কথা ইত্যাদিতে ল্যানম্যানের সঙ্গে একসঙ্গে ৪।৫ ঘণ্টা কাটান কিছুই কঠিন নয়। এতদিন বহু প্রবীণবয়স্ক পাশ্চাত্যপণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হইয়াছে—বস্তুতঃ কেহই ৫০ বৎসরের কম নন—অনেকেই ৬০

বৎসরের বেশী ! কিন্তু কেহই কোন দিন শারীরিক অসুস্থতার কথা পাড়েন নাই। কাহাকেও দেখিয়া তাঁহাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা সন্দেহ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। কিন্তু ল্যান্‌ম্যান্ অত্যধিক এলাইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহার মুখেই প্রথম শুনিলাম—"আর কতদিন বাঁচিব মহাশয় ? জীবনে কিছু করিতে পারিলাম না।" কেহ কেহ হয়ত ভাবিবেন—সংস্কৃত পাঠ করিতে করিতে ল্যানম্যান ভারতীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন।

ইয়াঙ্কিরা যে কয়জন জগৎপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের গৌরব করেন তাহার মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ হুইট্‌নি (Whitney) অন্যতম। বিজ্ঞানবীর আগাসিজের ন্যায় হুইট্‌নি নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ভাষাবিজ্ঞানে ইঁহার ব্যুৎপত্তি অসাধারণ ছিল। জার্ম্মান পণ্ডিত ম্যাক্‌সমুলারের ন্যায় হুইট্‌নি পাশ্চাত্যজগতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি করেন। হুইট্‌নি ল্যান্‌ম্যানের গুরু, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইয়েলই আমেরিকার সংস্কৃতকেন্দ্র।

ল্যান্‌ম্যান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হুইট্‌নির পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিদের মধ্যে কোন পণ্ডিত সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়াছিলেন কি ?" ল্যান্‌ম্যান্ বলিলেন—"তাঁহার পূর্ব্বে দুইজন সংস্কৃত প্রচার করেন—অধ্যাপক স্যাল্‌স্‌বারি এবং ওয়েল্‌স্। হুইট্‌নি স্যাল্‌স্‌বারির ছাত্র—স্যাল্‌স্‌বারির কাছে ইয়েলে হুইট্‌নির সংস্কৃত ভাষায় হাতে-খড়ি হয়।"

এখনকার মত তখনকার দিনেও জার্ম্মানীই সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। সংস্কৃত শিখিবার জন্য সকলকে জার্ম্মানীতে যাইতে হইত। টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোট (Roth) সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। হুইট্‌নি ইঁহার নিকটও সংস্কৃত শিখেন। বার্লিনে অথর্ব্ববেদের মূল পুঁথি ছিল। হুইট্‌নি দিনরাত খাটিয়া সেই পাণ্ডুলিপি হইতে ইংরাজী

অক্ষরে নকল করিতে থাকেন। আমেরিকায় ফিরিয়া আসিয়া হুইট্নি অথর্ব্ববেদের সটীক অনুবাদ প্রস্তুত করেন। সে গ্রন্থ এক্ষণে হার্ভার্ড প্রাচ্য গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে।

রোটের কথা উঠিবামাত্র ল্যান্‌ম্যান্ তাঁহার নিজ ছাত্রাবস্থার স্মৃতি-চিহ্নগুলি বাহির করিলেন। সহপাঠীদিগের ছবি দেখাইতে দেখাইতে সেই সময়কার জার্ম্মানজাতির অবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দু-এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে জার্ম্মানেরা ফরাসীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জার্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। সে আজ ৪০ বৎসরের কথা। জার্ম্মান-জাতি তখনও দরিদ্র—তাহাদের বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পদের কোন চিহ্ন তখন ছিল না। বরং নবীন সাম্রাজ্য টিকিবে কিনা সেই সন্দেহে সকলকে শঙ্কিত থাকিতে হইত।

রোটের ছাত্র হুইট্নি—আবার হুইট্নির ছাত্র ল্যান্‌ম্যান্ রোটের নিকট সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন। ল্যান্‌ম্যান্ ছবি দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন—"রোটের মত পণ্ডিত বিরল। ইঁহার সংস্কৃত অভিধান দেখিয়াছেন ত? এই দেখুন সেই বিরাট গ্রন্থ। তখন-কার দিনে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিভাগ হইতে শব্দপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত বাহির করা কি সামান্য পরিশ্রমের কথা? পুরাণ বলুন, উপনিষদ বলুন—সবই হস্তলিখিত পুঁথির ভিতর আবদ্ধ ছিল। সেই সকল পুঁথি ঘাঁটিয়া শব্দ বাহির করিতে অসাধারণ সহিষ্ণুতার আবশ্যক।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই অভিধান সঙ্কলনে রোট কি একাকী ছিলেন?" ইনি বলিলেন—"এই কার্য্যে সহযোগীও জুটিয়াছিল। রুশ সংস্কৃতজ্ঞ বীট্লিঙ্ক (Boehtlingk) রোটের সমান পরিশ্রম করিতেন। এদিকে হুইট্নি আমেরিকা হইতে জ্যোতিষবিষয়ক শব্দের ভার লইয়াছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতের সাহায্যও পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু রোটের সঙ্গে

বীটলিঙ্কের একবারও দেখা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। চিঠিপত্রের সাহায্যে এই বিরাট কার্য্য কি কিরূপে সম্পন্ন হইল তাহা ত আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

এই অভিধান সম্পূর্ণ করিতে পাকা ২৫ বৎসর লাগে। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে ইহা সমাপ্ত হয়। সেই বৎসর বীট্‌লিঙ্কের ৬০ বৎসর পূর্ণ হয়। ইনি তখন জার্ম্মানির জেনা নগরে বাস করিতেছিলেন। ল্যান্‌ম্যান বলিলেন—"এই উপলক্ষে এক সভা আহূত হয়। ভোজপানের আয়োজন হইয়াছিল। আমি তখন জার্ম্মানির শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। কিছু দিনের জন্য জেনাতে স্লাভনীয় ভাষা ও সাহিত্য শিখিতে প্রবৃত্ত হই। এই সময়ে বীট্‌লিঙ্কের সঙ্গে আমার আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। হুইট্‌নি অভিধান-সমাপ্তি-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তখনকার দিনে বার্লিনে সংস্কৃত শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল?" ল্যান্‌ম্যান্ উত্তর করিলেন—"বার্লিনে ওয়েবার (Weber) অধ্যাপক ছিলেন। আমি টুবিঙ্গেন হইতে বার্লিনেও গিয়াছিলাম। কিন্তু কি চরিত্রে, কি পাণ্ডিত্যে ওয়েবার রোটের সমকক্ষ নন।"

ল্যান্‌ম্যানের সহপাঠীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সুইডেনের পণ্ডিত ল্যাসেন (Lassen) ইয়োরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ মহলে সুপরিচিত। রিটার (Ritter) কীপার্ত্ত (Keipert) ভূগোল-বিদ্যায় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। ল্যান্‌ম্যান্ বলিলেন—"সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ বিস্ময়ের কথা বলিতেছি শুনুন। ষাট বৎসর বয়সে বীট্‌লিঙ্ক সেই সংস্কৃত অভিধানের উপসংহার বা পরিশিষ্ট একাকী সুরু করেন। অথচ পরিশিষ্ট প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা আয়তনে বৃহত্তর!"

আজকাল ইয়াঙ্কিস্থানের সাতটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা চলিয়া থাকে। ইয়েলের পর জন্‌স্ হপ্‌কিন্‌সে সংস্কৃত প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। সেই বৎসর ল্যান্‌ম্যান্ জার্ম্মানি হইতে ফিরিয়া আসেন। ল্যান্‌ম্যান্ এইখানে সংস্কৃতের প্রথম অধ্যাপক হন। পরে ইঁহার ছাত্র ব্লুমফিল্ড জন্‌স্ হপ্‌ কিন্সের অধ্যাপক হইয়াছেন। ব্লুম্‌ফিল্ড আজকাল সংস্কৃত মহলে প্রসিদ্ধ।

জন্‌স্ হপ্‌ কিন্সের পরে হার্ভার্ডে সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হয়। প্রথমে একজন অধ্যাপক ছিলেন। এলিয়ট যখন সভাপতি ছিলেন তখন তিনি নানা কৌশলে হুইট্‌নিকে ইয়েল হইতে ছাড়াইয়া আনিতে চেষ্টা করেন। ল্যান্‌ম্যান্ বলিলেন—"হুইট্‌নি তাঁহার আলমা মেটার অর্থাৎ শিক্ষামাতাকে ছাড়িলেন না। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারাও রোটকে টুবিঙ্গেন হইতে ছাড়াইয়া আনিতে চেষ্টা করেন—কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চ্চা হয়, পূর্ব্বে জানিতাম না। কিন্তু দেখিলাম, ইঁহাদের ইণ্ডো-ইরানীয় সীরীজ নামে ভারত-পারস্য-বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রচারিত হইতেছে। অধ্যাপক জ্যাক্‌সনের (Jackson) সঙ্গেও কয়েকবার আলোচনা ও দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি সংস্কৃত অপেক্ষা বোধ হয় পারসী ভাষা ও সাহিত্যে অধিক পারদর্শী। ইঁহার রচনাবলী পারস্য সম্বন্ধেই বেশী বুঝিলাম।" ল্যান্‌ম্যান্ বলিলেন—"জ্যাক্‌সনের সম্বন্ধে একটা মজার গল্প বলিতেছি। আমরা নিউইয়র্কে একবার 'আমেরিকান্ ওরিয়েণ্ট্যাল সোসাইটি'র সভা করিতেছিলাম, তাহাতে জ্যাক্‌সন উপস্থিত ছিলেন—তখন তিনি ছাত্র। ইঁহার সঙ্গে দৈবক্রমে আমার আলাপ হয়। তাহাতে বুঝিতে পারি যে, জ্যাক্‌সন স্বচেষ্টায় ইরাণীয় ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। ইঁহার সহিষ্ণুতা,

অনুরাগ ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে পত্র লিখিলাম যে, জ্যাক্‌সনকে একটা বৃত্তি দিয়া জার্ম্মানিতে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। সভাপতি তাহাই করিলেন। তাহার পর জ্যাক্‌সন প্রাচ্যবিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া কলাম্বিয়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষেও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসও ইনি রচনা করিয়াছেন।"

ক্যালিফর্ণিয়া ও শিকাগোতে আজকাল সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপকদ্বয় ল্যান্‌ম্যানেরই ছাত্র। দুইজনেই সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। পেন্‌সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এখানকার ছাত্র অধ্যাপক ব্লুমফীল্ডের ছাত্র— সুতরাং ল্যান্‌ম্যানের প্রশিষ্য।

ল্যান্‌ম্যান্‌কে আমেরিকান ওরিয়েণ্ট্যাল সোসাইটির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ল্যান্‌ম্যান্ বলিলেন—"ইহার ইতিহাসও ইয়াঙ্কিস্থানে সংস্কৃত চর্চ্চার ইতিহাসের অনুরূপ। প্রথমে বষ্টনে এই সমিতির কার্য্যালয় ছিল —কিন্তু ইয়েলে শীঘ্রই স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে অধ্যাপক সালিসবেরী (Salisbury) ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। পরে হুইট্‌নির আমলে ইহার উন্নতি হয়। আমিও কিছুকাল এই পরিষদের জন্য খাটিয়াছি। ইহাকে খাড়া করাইতে পারিলাম না—অথচ ইহার জন্য আমার যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই জন্যই আমি মৌলিক গবেষণায় হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমার জীবন নিষ্ফল হইতে চলিল। যাহা হউক—আমার শিষ্যেরা আমেরিকায় সংস্কৃত চর্চ্চার ধারা রক্ষা করিতে পারিবে বুঝিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমানে 'আমেরিকান ওরিয়েণ্ট্যাল সোসাইটি'র বড় দুরবস্থা। আমেরিকায় পুস্তক মুদ্রণের ব্যয় কিছু বেশী। এইজন্য পরিষৎ জার্ম্মানিতে ছাপা হইবার জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া

থাকেন। জার্ম্মানিতে খরচ কম। আমিও হার্ভার্ড ওরিয়েণ্ট্যাল সীরীজের কোন কোন গ্রন্থ অক্সফোর্ডের 'ক্লোরেন্স' প্রেসে ছাপিতে দিই, বিলাতে বই ছাপিবার খরচ আমেরিকা হইতে কম। আমাদের টাকা বড় অল্প। এইজন্য একখানা গ্রন্থ ছাপাখানার লোহার সিন্দুকে দুই বৎসর হইতে মজুত রাখা হইয়াছে। টাকা হাতে হইলে ছাপিবার অর্ডার দেওয়া যাইবে। একখানা গ্রন্থ গ্রহণ করিতেই পারিলাম না, লেখক দুঃখিত হইলেন সন্দেহ নাই। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও ইণ্ডো-ইরাণীয় গ্রন্থমালা ছাপিবার জন্য টাকা নাই। জ্যাক্সন বন্ধু জুটাইয়া টাকা সংগ্রহ করেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এদেশের অধ্যাপকগণ তাহা হইলে গ্রন্থ প্রকাশ করেন কি করিয়া?" ল্যান্‌ম্যান বলিলেন—"যে সকল বই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে একমাত্র সেই সকল বই প্রকাশকেরা নিজ খরচে ছাপাইয়া থাকেন। অন্যান্য গ্রন্থ লেখকগণ নিজব্যয়ে প্রকাশ করিতে বাধ্য হন। আমার "Sanskrit Reader" বা সংস্কৃত পাঠ ছাপিতে ৫০০০৲ খরচ হয় —আমাকে নিজে এই খরচ বহন করিতে হইয়াছিল। 'হার্ভার্ড ওরিয়েণ্ট্যাল সীরিজ' ছাপিবার টাকা বেশী নাই। কয়েক বৎসর কোন বই ছাপা হয় নাই বলিয়া ভাণ্ডারে টাকা জমিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে একসঙ্গে ৮।১০ খানা গ্রন্থ যন্ত্রস্থ। কাজেই বিলের দেনা শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

ল্যান্‌ম্যানের এক ছাত্র মৃত্যুকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগে ৩০,০০০৲ দান করেন, তাহার বার্ষিক আয় ২০০০৲।. এই টাকা হইতে ল্যান্‌ম্যান্-সম্পাদিত প্রাচ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ল্যান্‌ম্যান্ বলিলেন—"আমার গৃহের এই লাইব্রেরীতে কয়েকটা

দেখিবার উপযুক্ত বই আছে। এই দেখুন 'ধম্মপদ'—ইহা জার্ম্মান দার্শনিক শোপেনহোয়ারের বই ছিল। এই যে নোটগুলি দেখিতেছেন, এই সমুদয় শোপেনহোয়ারের হাতে লেখা!

"এই দেখুন বাঙ্গালা অক্ষরে 'ঋতুসংহার'। ইহাই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহা ভারতবর্ষে ছাপা হইয়াছিল।

"এই দেখুন রামমোহন রায়ের প্রণীত ঈশোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত। কিছুদিন হইল বিলাতের এক পুরাতন পুস্তকালয় হইতে আনাইয়াছি।

"এই দেখুন প্রথম দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত গ্রন্থ—হিতোপদেশ। ১৮০০ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরে ইহা ছাপা হয়।

"এই দেখুন 'সিদ্ধরূপ'। ইহা ল্যাটিনভাষায় রচিত। পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্বই বিশ্বাস করিতেন না। অনেকের ধারণা ছিল যে, এটা একটা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের জুয়াচুরী। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে 'সিদ্ধরূপ' সম্বন্ধে ল্যাটিন ভাষায় প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহার ফলে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলের বিশ্বাস জন্মে।"

ল্যান্‌ম্যান্ ভারতীয় ছাত্রগণের হিতৈষী। আবশ্যক হইলে তাহারা ইঁহার নিকট টাকা ধার লইতে পারে। ল্যান্‌ম্যান্ একদিন বলিলেন —"পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী (Sylvain Levi) বলেন যে, ভারতীয় ছাত্র পারীতে আসিলে তিনি তাহাদের বে-সরকারী ভারতীয় কনসাল স্বরূপ হন। আমিও সেইরূপ হার্ভার্ডে ভারতীয় ছাত্রগণের অভিভাবক স্বরূপ নিজকে বিবেচনা করি।"

ল্যান্‌ম্যান্ ভারতীয় পণ্ডিতগণের সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। ইনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে চিনিতেন—ভারতবর্ষে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ভাণ্ডারকারের সঙ্গেও ইঁহার আলাপ আছে। এতদ্ব্যতীত মেজর

বামনদাস বসু এবং মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থমালা সম্পাদকগণের কার্য্য সম্বন্ধে ল্যান্‌ম্যানের সহানুভূতি এবং প্রশংসা লক্ষ্য করিলাম। অধিকন্তু ইনি ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-গণের সম্মান যে ভাবে করিতে চাহেন তাহাতে পাশ্চাত্য মহলে একটা নূতনত্ব দেখা দিবে সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ পাশ্চাত্যেরা ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞগণের কোনরূপ খাতির করেন না। ল্যান্‌ম্যান্ এইরূপ অহঙ্কারের বিরোধী। ইনি ভারতবাসীর গুণপনা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত। সম্প্রতি মরাঠা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেলভেলকার হার্ভার্ডে পি-এইচ্ ডি উপাধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার "উত্তর চরিত" বিষয়ক গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকায় ল্যান্‌ম্যান্ বলিতেছেন—(প্রুফ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে)—

"Within the last decade, the West and the Far East have become virtually near neighbours. From the responsibilities of such neighbourhood there is no escape. We must have to do with the East, and as members of the world family of nations, we must treat the East aright. To treat the people of the East aright, we must respect them ; and to respect them we must know them. * * *

It is a happy augury that scholars of the East are joining hands with those of the West in the great work of helping each to understand the other. The work calls for just such co-operation and above all things else for co-operation in a spirit of mutual

sympathy and teachableness. There is much of great moment that America may learn for example, from the history of the peoples of India, and much again that the Hindus may learn from us. But the lessons will indeed be of no avail unless the spirit of arrogant self-sufficiency give way to the spirit of docility and the spirit of unfriendly criticism to that of mutually helpful constructive effort, the relation of teacher and taught is here in an eminent degree, a reciprocal one, for both East and West must be at once both teacher and taught......I am glad that a Hindu well versed in the learning of his native land, should think it worth while to learn of the West......And I hope again that many in the coming years may follow his example establishing thus most valuable relation of personal friendship and co-operation between Indianists of the Orient and the Occident."

অর্থাৎ "গত দশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিম ও পূর্ব্ব যেন প্রতিবেশী হইয়া উঠিয়াছে। এখন প্রতিবেশীর দায়িত্ব এড়াইবার উপায় কাহারও নাই। বিশ্ব-পরিবারের অঙ্গরূপে পূর্ব্বের প্রতি পশ্চিমকে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে হইবে। ন্যায্য ব্যবহার করিতে হইলে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে ; শ্রদ্ধাবান হইতে হইলে পরিচয় পাওয়া আবশ্যক।

সুলক্ষণ যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বন্ধুভাবে হাতে হাত মিলাইয়া পরস্পরকে বুঝিতে সাহায্য করিতেছেন। এইরূপ সহযোগিতা

ও শিখাইবার ইচ্ছা লইয়া সহযোগিতাই যথার্থ আবশ্যক। পশ্চিম বহু গুরুবিষয়ে ভারতের ইতিহাস হইতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে; ভারতেরও পশ্চিম হইতে শিখিবার অনেক আছে। কিন্তু দাম্ভিকতা আত্মম্ভরিতা দূর করিতে না পারিলে দৃষ্টান্ত কোন কাজেই লাগিবে না; প্রতিকুল সমালোচনা ত্যাগ করিয়া পরস্পরের সাহায্যে কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরস্পরের নিকট গুরু ও শিষ্য উভয়ই হইবে।"

ল্যান্‌ম্যানের এই ভূমিকায় নবযুগের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে।

ল্যান্‌ম্যান্ পালিসাহিত্যেরও চর্চ্চা করেন। ইহাঁর গৃহে বহু পালিগ্রন্থ দেখিলাম। ইনি কয়েক বৎসর হইতে "বিসুদ্ধিমগ্‌গ" সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন। এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আমাদের বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ কোশাম্বী হার্ভার্ডে তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছেন। ল্যান্‌ম্যানের সঙ্গে কোশাম্বীর বনিল না। কাজেই বিসুদ্ধিমগ্‌গ কবে সম্পূর্ণ হইবে বলা কঠিন। একাকী এই কার্য্য করিবার ক্ষমতা ল্যান্‌ম্যানের নাই।

ভারতবর্ষে আমরা উপযুক্ত লাইব্রেরীর অভাবে বড় কষ্ট পাই। ল্যান্‌ম্যানের নিজের লাইব্রেরীতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যে সমুদয় আধুনিক গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্রিকা, অভিধান ইত্যাদি আছে আমাদের উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যদি তাহার সাহায্য সহজে পাইতেন তাহা হইলে ভারতীয় পাণ্ডিত্যের সম্মান জগতে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যাইত। এ সকল সুযোগ ভারতবর্ষে কোন দিন সৃষ্ট হইবে না কি?

"হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সীরিজ্" গ্রন্থমালায় সর্ব্বসমেত প্রায় ত্রিশ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত ও যন্ত্রস্থ হইয়াছে। ল্যান্‌ম্যান্‌কে বলিয়া গ্রন্থগুলি

ভারতীয় পণ্ডিতগণকে বিনামূল্যে উপহার দিবার ব্যবস্থা করা গেল। ল্যান্‌ম্যান্‌ সম্মত হইলেন। বোধ হয় ভারতবাসীরা গ্রন্থগুলি যথাসময়ে পাইবেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, জাতীয় শিল্পপরিষৎ, বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, হরিদ্বারের গুরুকুল, কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা, এলাহাবাদের হিন্দীসাহিত্য সম্মিলন ইত্যাদি কয়েকটা কেন্দ্রের ঠিকানা দিলাম।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এক-একখানা গ্রন্থ সম্পাদন করিবার জন্য বহুবৎসর লাগিয়া থাকেন। ইঁহাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রশংসার্হ। তাহা ছাড়া, গ্রীক, ল্যাটিন, রুশ, জার্ম্মান, ফরাসী, আরবী ইত্যাদি ভাষাসমূহের দুই তিনটা ইঁহাদের প্রত্যেকের জানা থাকে। অধিকন্তু দর্শন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান ন্যূনাধিক পরিমাণে ইঁহাদের সকলেরই আছে। এই জন্য ইঁহাদের কার্য্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় বেশী পাই। ইঁহারা যে পরিমাণ সাধারণ বিদ্যা লইয়া সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করেন সে পরিমাণ বিদ্যা ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যেও বিরল। এই জন্য ইঁহাদের জ্ঞান সংস্কৃত অথবা পালিতে গভীর না হইলেও মোটের উপর ইঁহারা ভারতবাসীকে সহজে পরাস্ত করিতে পারেন। বিশেষতঃ একটা কাজে বহুকাল লাগিয়া থাকিবার সময়ে ইঁহারা অন্নচিন্তায় অস্থির হন না। ইহাই মস্ত সুবিধা। এই সুবিধা এবং লাইব্রেরীর সাহায্য পাইলে ভারতবাসীও জগতে নাম করিতে পারিবেন।

মাথা মাপার কারখানা

সে দিন অধ্যাপক ডিক্‌সন বলিতেছিলেন—"ইয়াঙ্কিস্থানে নৃতত্ত্ব (Anthropology) ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের ন্যায় আলোচিত হয়। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মস্তকের পরিধি, গায়ের রং, চুলের রং, চোখের রং ইত্যাদি আলোচনা করিয়া নরনারীর জাতি নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা নাই। শরীরতত্ত্ব অর্থাৎ য়্যানাটমির সাহায্যে 'য়্যান্থ্রপলজি' আলোচিত হইলে সেই বিদ্যাকে শারীর-নৃতত্ত্ব বা ফিজিক্যাল য়্যান্থ্রপলজি অথবা সোমাটলজি (Somatology) বলা হয়। এই 'সোমাটলজির' চর্চ্চা জার্ম্মানিতে ও ফ্রান্সে বেশী হয়। যুক্তরাজ্যে একমাত্র ওয়াশিংটনে ইহার জন্য বড় কেন্দ্র আছে। হার্ভার্ডে এই বিভাগ সবে মাত্র খোলা হইয়াছে।"

হার্ভার্ডে সোমাটলজি-বিভাগের কর্ত্তা ডাক্তার হুটনের সঙ্গে হার্ভার্ড ক্লাবে আলাপ হইল। ইনি যুবক—বৎসর দুএক পূর্ব্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করিয়াছেন। ইনি বলিলেন—"মহাশয়, আমি বাল্যাবধি সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ইত্যাদির অনুশীলন করিয়াছি। দৈবক্রমে শরীর-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, কম্প্যারেটিভ য়্যানাটমি এবং জুলজি ইত্যাদির দিকে ঝুঁকিয়াছি। অথচ এক্ষণে আমিই হার্ভার্ডে মাথামাপা-বিভাগের দায়িত্ব পাইয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার গতি পরিবর্ত্তিত হইল কি করিয়া?" ইনি উত্তর করিলেন—"আমি হার্ভার্ডে পি-এইচ ডি উপাধির জন্য মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিতেছিলাম। আমার আলোচ্য বিষয় ছিল, প্রাচীন

রোমের লোকসাহিত্য, লৌকিক ধর্ম্ম ও শিল্পকলা। যাহাকে কালচার্যাল (Cultural) অর্থাৎ সভ্যতা-বিষয়ক অথবা সাইকো-সোশ্যাল (Psycho-social) অর্থাৎ মানসিক নৃতত্ত্ব বলে আমার কার্য্য সেই বিভাগের অন্তর্গত ছিল বলা যাইতে পারে। হার্ভার্ডে পরীক্ষার পর আমি অক্সফোর্ডে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান বিদ্যাচর্চ্চার জন্য যাই। সেখানে য়্যান্থ্রপলজি বা নৃতত্ত্ব বিভাগে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করি। কর্ত্তারা বলিলেন, শরীরতত্ত্ব না শিখিলে ডিপ্লোমা পাইব না। কাজেই য়্যানাটমি বা অস্থি-বিদ্যা ধরিলাম। অক্সফোর্ডে সামান্যমাত্র ল্যাবরেটরী ছিল। আজকাল হার্ভার্ডে শরীরতত্ত্ব-বিষয়ক নৃতত্ত্বের জন্য যতবড় ল্যাবরেটরী আছে অক্সফোর্ডে তাহার দশমাংশও ছিল না। কিন্তু সেখানে একজন পাকা অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কর্ম্ম করিয়া আমি সোমাটলজি বিদ্যার অনুরাগী হইয়াছি। অক্সফোর্ডে বেশী ছাত্র এদিকে ঘেঁসে না।”

হুটনের সঙ্গে নৃতত্ত্বসংগ্রহালয়ে দেখা করিলাম। ইতি পূর্ব্বে কয়েকবার এই মিউজিয়াম দেখা হইয়াছে। আজ ল্যাবরেটরী ও লাইব্রেরী দেখাই উদ্দেশ্য। হুটন্ বলিলেন, “শারীরনৃতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন সম্পূর্ণ পাঠ্য-পুস্তক এখন বেশী প্রণীত হয় নাই। জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ম্মান অধ্যাপক রুডল্‌ফ মার্টিন একখানা সচিত্র বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, সর্ব্বাংশে ব্যবহারযোগ্য গ্রন্থ আর নাই। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্‌ওয়ার্থের ‘Morphology and Anthropology’ ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ। ইহাতে শরীরতত্ত্ব আমাদের বিজ্ঞানের উপযোগীরূপে আলোচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ‘হোম ইউনিভারসিটি’ গ্রন্থমালায় লণ্ডনের প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধ্যাপক কীথ ‘Human Body’ নামক ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ‘মাথা

মাপা' বিদ্যার অন্য কোন পুস্তক ত দেখি না। কিন্তু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিব পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রায়ই প্রকাশিত হয়।”

মাথা মাপার কারখানা দেখিতে অগ্রসর হইলাম। নানা প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ যন্ত্রের ব্যবহার দেখিলাম। হুটন্ অস্থি মাপার কায়দা, খুলি মাপার কৌশল, শরীর মাপিবার প্রণালী দেখাইয়া দিলেন। কতকগুলি মাথার খুলি হইতে চীনা মাটির "কাষ্ট" (Cast) বা নকল প্রস্তুত করা হইয়াছে। হুটন্ বলিলেন, “যে গুলি ইয়োরোপের বড় মিউজিয়ামের সম্পত্তি তাহাদের নকল এইরূপে পাইয়া থাকি।” আঙ্গুলের ছাপ লই-বার কল, শারীরিক শক্তি মাপিবার ডাইনামোমেটার ইত্যাদি বহুপ্রকার যন্ত্র দেখিলাম। গৃহগুলি সাধারণ চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের মিউজিয়াম স্বরূপ বোধ হইল। বেশীর ভাগ দেখা গেল, কতকগুলি যন্ত্র ও হাতিয়ার।

একস্থানে প্রায় ৫০০ মড়ার মাথা সাজান দেখিতে পাইলাম। অধ্যা-পক বলিলেন—“এইগুলি প্রি-হিষ্টরিক (Pre-historic) বা প্রাগৈতি-হাসিক। যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসি প্রদেশের কোন অঞ্চলে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে এই সমুদয় পাওয়া গিয়াছে। এই মাথাগুলি কোন্ যুগের তাহা বলা কঠিন। একজন ছাত্র পি-এইচ ডি উপাধির জন্য এইগুলি লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছে।” কতকগুলি হাড়ের টুকরা দেখাইয়া হুটন্ বলিলেন—“ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই সমুদয় ব্যবহার করি। চিকিৎসা-শিক্ষার্থী ছাত্রদেরও এইরূপ অস্থিজ্ঞান দেখাইতে হয়।”

ল্যাবরেটরীতে নানারংয়ের চুল সংগ্রহ করা হইয়াছে দেখিলাম। ইয়োরোপের মানচিত্রে সেফালিক ইন্‌ডেক্‌স (Cephalic Index) বুঝান হইয়াছে। কোন্ জনপদের নরনারীর মস্তকের আকৃতি লম্বা, কোন্ জনপদের নরনারীর মস্তক গোলাকার, ইহা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইবার

জন্য এই ম্যাপ অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জের শারীরিক গঠন সহজেই জানিতে পারা যায়।

হুটন্ বলিলেন—"মাথা-মাপা-বিদ্যাটা নিতান্ত সহজ ভাবে গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। একমাত্র উপর-উপর লম্বা-চৌড়ার অনুপাত জানিলেই মস্তকের যথার্থ আকৃতি বুঝা হয় না। অন্ততঃ তাহার দ্বারা নরনারীর জাতি-বিভাগ স্থির করা উচিত নয়। এতদিন পণ্ডিতেরা এইরূপ ভাসাভাসা অনুপাত বাহির করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে আরও গভীর ও বিস্তৃততর আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।" বুঝিলাম, আজকাল সকল বিভাগেই "ইণ্টেন্সিভ ষ্টাডি"র (intensive study) অর্থাৎ "গভীর গবেষণা"র যুগ চলিতেছে।

হুটন একটা নূতন কল দেখাইয়া বলিলেন—"এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে জার্ম্মানি হইতে ইহা আনাইয়াছি। কলটা অল্পদিন মাত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা মস্তকের আকৃতি সহজেই চিত্রিত করা যায়।" আর একটা কৌশল দেখিলাম। তাহার দ্বারা ক্রেনিয়্যাল ক্যাপাসিটি (Cranial capacity) অর্থাৎ মাথার খোলের আয়তন মাপা যায়। মাথার খুলির ভিতর কতখানি গর্ত্ত আছে, ইহা জানিতে না পারিলে ব্রেণ বা মস্তিষ্কের পরিমাণ বুঝা যায় না। অথবা মস্তিষ্কের পরিমাণ না জানিলে কেবল মাথার খুলির আকৃতি দেখিয়া কি হইবে? কাজেই মস্তিষ্ক মাপিবার প্রয়োজন খুব বেশী। খুলির ভিতর সরিষা ভরা হয়; পরে সেই সরিষাগুলি একটা ভাণ্ডে ঢালা হয়। এইরূপ ভরা ও ঢালা যাহাতে নির্দ্দোষভাবে হইতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা আছে। ভাণ্ডে ঢালা হইলে সরিষার পরিমাণ জানা যায়। এই পরিমাণ হইতে খুলির গর্ত্তের ক্যাপাসিটি—অর্থাৎ মস্তিষ্কের পরিমাণ বুঝা হয়।

একটা গৃহের ভিতর দেখিলাম, বড় বড় কাঠের বাক্সে নানা প্রকার

দ্রব্য মজুদ করা রহিয়াছে। হুটন বলিলেন—"হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে একবার মিশরাভিযান অনুষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে নানা দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। সেইগুলির মধ্যে যে-সমুদয় বস্তু নৃতত্ত্ব-সম্পর্কিত সেই-সমুদয় এইখানে রাখিয়াছি। নানা প্রকার অস্থি, মাথার খুলি, মাটির ভাঁড় ইত্যাদি এই বাক্স-সমূহের ভিতর আছে। এইগুলি সাজাইতে গুছাইতে বহুকাল লাগিবে, খরচও কম হইবে না।"

ল্যাবরেটরী ও মিউজিয়াম করাইবার জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহের ভিতর আলমারী দিতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হইবে। এতটাকা সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা খরচ করিতে প্রস্তুত নন। কাজেই জিনিষপত্রগুলি গাদা করিয়া নানাস্থানে রাখা হইয়াছে।

প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীতেই ফটোগ্রাফি-গৃহ থাকে। সোমাটলজি বিভাগেও দেখিলাম, একজন ছাত্র মিসৌরি-জনপদে আবিষ্কৃত অস্থি কঙ্কাল ইত্যাদি বস্তুসমূহের তালিকা ও চিত্র প্রস্তুত করিতেছে।

সর্ব্বশেষে লাইব্রেরী দেখিলাম। বিদ্যালয়ের অন্তর্গত যতগুলি ল্যাবরেটরী, মিউজিয়াম, চিত্রভবন ইত্যাদি আছে, প্রত্যেকের সংশ্লিষ্ট একটা করিয়া লাইব্রেরী আছে। ইহাতে অধ্যাপক ও ছাত্রের সুবিধা যৎপরোনাস্তি। কথায় কথায় ইহাঁদিগকে বড় লাইব্রেরীতে দৌড়িতে হয় না।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট গ্রন্থশালার জন্য নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে। তাহাতে প্রত্যেক অধ্যাপকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাঠগৃহ থাকিবে—এবং গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদিগের মৌলিক গবেষণার জন্যও ৩০০।৪০০ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইবে।

হুটন বলিলেন—"আমাদের মিউজিয়ামে নৃতত্ত্ববিষয়ক প্রায় সকল

গ্রন্থ ও পত্রিকাই আছে। অক্‌স্‌ফোর্ডে বড় অসুবিধা ভোগ করিতাম। এত সহজে কোন্‌ বই দেখিতে পাইতাম না। এখানে এক স্থানে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় রচনা রহিয়াছে। বেশী হয়রান হইয়া লাইব্রেরীর ক্যাটালগ হাতড়াইতে হইবে না।"

এমার্সন-হলে জগদীশচন্দ্র

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন—সে আজ প্রায় ২৫ বৎসরের কথা। দার্শনিক জেম্‌স্ প্রণীত Pragmatism গ্রন্থের The One and the Many অর্থাৎ "এক ও বহু" অধ্যায়ে তাহার পরিচয় পাই। মিষ্টিসিজ্‌ম্ অধ্যাত্মতত্ত্ব বা ভাবুকতার লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া অধ্যাপক জেম্‌স্ বলিতেছেন :—

"The paragon of all monastic systems is the Vedanta philosophy of Hindoosthan and the paragon of Vedantist missionaries was the late Swami Vivekananda who visited our land some years ago. The method of Vedantism is the mystical method. You do not reason, but after going through a certain discipline you see, and having seen, you can report the truth. Vivekananda thus reports the truth in one of his lectures here. 'Where is there any more misery for him who sees this Oneness in the Universe, this Oneness of life, Oneness of everything? This separation between man and man, man and woman, man and child, nation from nation, earth from moon, moon from sun, this separation between atom and atom is the cause really of all the misery, and the Vedanta says this separation does
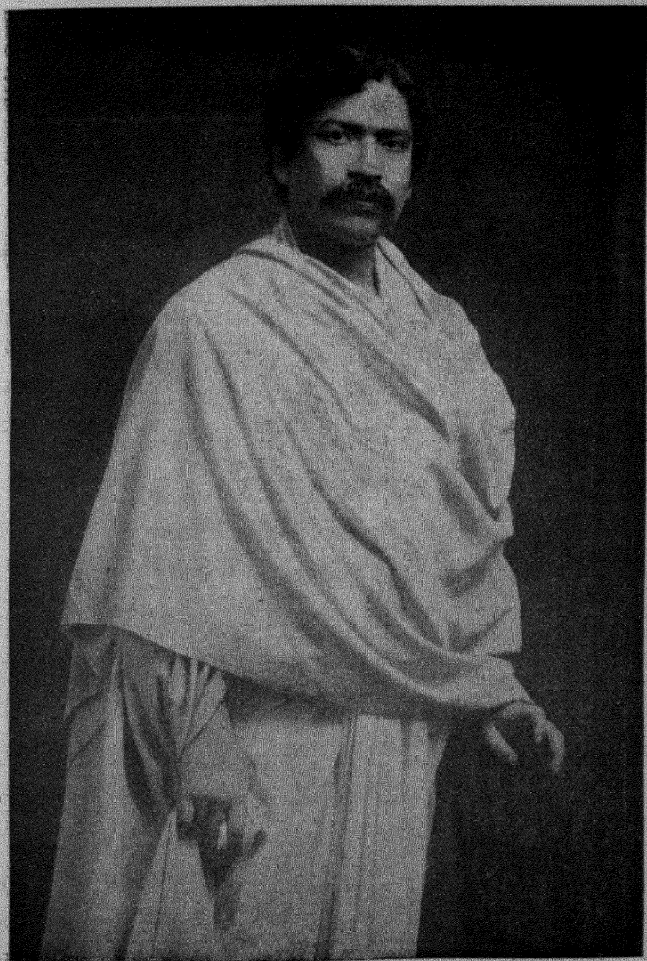
২২। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

not exist, it is not real. It is merely apparent, on the surface. In the heart of things there is unity still. If you go inside you find that unity between man and man, women and children, races and races, high and low, rich and poor, the God and men : all are One and animals too, if you go deep enough, and he who has attained to that has no more delusion. * * Where is there any more delusion for him? What can delude him? He knows the reality of everything, the secret of everything. Where is there any more misery for him? What does he desire? He has traced the reality of everything unto the Lord, that centre, that Unity of everything, and that is Eternal Bliss, Eternal Knowledge, Eternal Existence. Neither death nor disease nor sorrow nor misery nor discontent is there.'"

জেমস্ এই অদ্বৈতবাদ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন। বিবেকানন্দের মতবাদ সম্বন্ধে জেম্‌সের সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"Observe how radical the character of the monism here is. Separation is not simply overcome by the One, it is denied to exist. There is so many. We are not parts of the One. It has no parts, and since in a sense we undeniably *are*, it must be that each of us *is* the One, indivisibly and totally. *An Absolute One, and I that One,*—surely we have here a religion, which emo-

tionally considered, has a high practical value; it imparts a perfect sumptuosity of security."

জেম্‌স্ এই সম্বন্ধে আবার বলিতেছেন—

"We all have some ear for this monatic music, it elevates and reassures. We all have at least the germ of mysticism in us. And when our idealists recite their arguments for the Absolute, saying that the slightest union admitted anywhere carries logically absolute Oneness with it, and that the slightest separation admitted anywhere logically carries disunion remediless and complete, I cannot help suspecting that the palpable weak places in the intellectual reasonings they use are protected from their own criticism by a mystical feeling that, logic or no logic, absolute Oneness must somehow at any cost be true."

জেম্‌সের মতে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থির রাখা যাইতে পারে সত্য, আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্যও পাওয়া যাইতে পারে সত্য,—কিন্তু ইহা কোনরূপ যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, ইহা এক প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাস বা আবেগের ফল স্বরূপ। প্রেমিক কবি ইত্যাদি লোকের এইরূপ ভাবুকতা দেখা যায়। ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল লোকই এইরূপ ভাবপ্রবণ। কাজেই জেম্‌স্ ভাবুকতা পদার্থটা নিতান্ত অগ্রাহ্য করেন না।

যাহা হউক বুঝা গেল যে, ইয়াঙ্কিস্থানের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিকের চিন্তায় বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচার স্থান পাইয়াছে।

গত বৎসর রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতাবলী "সাধনা" নামে প্রচারিত হইয়াছে।

এইবার জগদীশচন্দ্র ভারতের বাণী প্রচার করিতেছেন। যে হলে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হইয়াছিল, জগদীশচন্দ্রও সেই হলেই বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। দর্শনবিভাগের সম্পাদক অধ্যাপক উডস্ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বসু মহাশয়কে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে বলিলেন:—"জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মহলে সুপরিচিত। আমরা হার্ভার্ডের দর্শনবিভাগে ইহাঁর অনুসন্ধানসমূহ আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদের অধ্যাপকগণ ইহাঁর গবেষণার ফলসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই হার্ভার্ডে জগদীশচন্দ্রের অমর্য্যাদা হইবে না।"

এ কয়দিন এমার্সন-হলের ল্যাবরেটরীগুলি দেখিতে দেখিতে এইরূপই মনে হইতেছিল। এক্স্‌পেরিমেণ্ট্যাল সাইকলজি বিদ্যার পশুবিভাগে এবং উদ্ভিদ্‌বিভাগে যে-সমুদয় কার্য্য হয় তাহা অনেকটা জগদীশচন্দ্রের অনুসন্ধান-সমূহের অনুরূপ। অধ্যাপক ইয়ার্কিস উদ্ভিদের চিত্ত এবং পশুচিত্ত বিদ্যায় মানবচিত্তের সঙ্গে ইতর চিত্তের ধারাবাহিকতা এবং সাম্য প্রচার করিতেছেন। ইয়ার্কিসকে যে-সকল দিকে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চালাইতে হয় জগদীশচন্দ্রকেও খানিকটা সেই দিকে কার্য্য করিতে হয়। তবে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের ফিজিয়লজি সম্বন্ধে বেশী দৃষ্টিপাত করেন এবং ইয়ার্কিস মনস্তত্ত্বের আলোচনায় যত্নবান্। জগদীশচন্দ্রের অনুসন্ধানসমূহ হইতে এই কারণেই দার্শনিক এবং মনস্তত্ত্ববিদেরা সাহায্য পাইয়া থাকেন।

বক্তৃতায় প্রায় ২০০ লোক উপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র, উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানের অধ্যাপক, দর্শনাধ্যাপক এবং সাধারণ

স্ত্রী পুরুষ বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন। বক্তৃতার নাম—"The Control of Nervous Impulse in Plants."

আলোকচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা হইল। চিত্রগুলি সব চিত্তাকর্ষক। বক্তৃতা অতি মধুর হইয়াছিল—ব্যাখ্যা-প্রণালীতে শ্রোতৃমণ্ডলী সন্তুষ্ট হইলেন। উদ্ভিদের মদ্য পান, উদ্ভিদের নিদ্রা, উদ্ভিদের মৃত্যু, উদ্ভিদের ক্লান্তি ইত্যাদি ছায়াবাজির বা লণ্ঠন-চিত্রের সাহায্যে হৃদয়গ্রাহিরূপে বুঝান হইল। সকলেই বুঝিল—

(১) মানুষ যেরূপ বাহিরের আঘাত পাইলে তাহার যথোচিত উত্তর দিয়া থাকে উদ্ভিদও ঠিক সেইরূপ করে।

(২) মানুষের হৃৎপিণ্ড যেরূপ কার্য্য করে উদ্ভিদেরও সেইরূপ হৃৎপিণ্ড আছে এবং হৃৎপিণ্ডের কার্য্যও সেইরূপ।

(৩) মানবশরীরের ভিতর চেতনাবাহী শিরা আছে, উদ্ভিদেরও তাহা আছে।

বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কয়েকটা এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা দেখান হইয়াছিল। যন্ত্রাদি বসুমহাশয়ের নিজের উদ্ভাবিত।

বক্তৃতা শুনিয়া হার্ভার্ডক্লাবে নৈশভোজনে যোগদান করিলাম। দর্শন-বিভাগের কর্ত্তারা উপস্থিত। দু-একজন বাহিরের লোকও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ এইরূপ খানার উৎসবে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। এ যাত্রায় তাহা হইল না। পাশাপাশি অথবা মুখোমুখি কথাবার্ত্তা মাত্র হইল। হার্ভার্ডক্লাবে বোধ হয় কোন রমণীর যাওয়া-আসা নাই—এজন্য জগদীশচন্দ্র একাকী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন—তাঁহার পত্নী সঙ্গে আসেন নাই। তিনি এমার্সনহলে বক্তৃতার সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকার সর্ব্বত্রই জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা সমাদৃত হইয়াছে।

ফিলাডেল্‌ফিয়ায় ইয়াঙ্কি বিজ্ঞান-সেবীদিগের সম্মিলন হইয়াছিল। প্রতি-বৎসর বড়দিনের সময়ে ভারতবর্ষের মত এদেশেও নানাপ্রকার কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, সম্মিলন ইত্যাদি হইয়া থাকে। ফিলাডেলফিয়ার সম্মিলনে বিজ্ঞানসেবীরা হিন্দুবৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি দেখিয়া এবং বক্তৃতা শুনিয়া পুলকিত হইয়াছেন। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বষ্টন, উইস্কন্সিন, শিকাগো, মিশিগান ইত্যাদি স্থানের নানা সভায় জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করিয়াছেন।

দর্শন ও কাব্য ছাড়া অন্যান্যবিভাগেও ভারতবাসীর মাথা খেলে—ইয়াঙ্কিরা এই কথা এতদিনে প্রথম বুঝিল। ইয়াঙ্কিস্থানে এবং দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই কথা বুঝাইবার জন্য ভারতবাসীর উপযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। জগৎ মাথার জোরে চলিতেছে—ভারতীয় মস্তিষ্কের শক্তি নানা ক্ষেত্রে দেখাইতে না পারিলে ভারতবাসী মানবজাতির সম্মান লাভ করিতে পারিবে না।

জাপানী বৌদ্ধ-প্রচারক

অধ্যাপক আনেসাকি বলিলেন—"মহাশয়, আজকাল পাশ্চাত্য লোকেরা এশিয়ার পর্য্যটকগণের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন ধরণের জীবনযাপন-প্রণালীর পরিচয় পাইতেছে। প্রাচ্যপর্য্যটকগণের আগমনে ইয়াঙ্কি ও ইয়োরোপীয়ানদিগের নূতন নূতন দিকে চোখ ফুটিতেছে—বিশ্বাস করি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বলিতেছেন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কিছু খুলিয়া বলিবেন কি?" জাপানী অধ্যাপক বলিলেন—"গত সপ্তাহে আমি শিকাগোতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলাম। কোন এক সভায় আমি, আমার ইয়াঙ্কি বন্ধু, আপনাদের অধ্যাপক বসু এবং তাঁহার স্ত্রী এবং বহু নরনারী উপস্থিত ছিলেন। এই সভার কথা আমার বন্ধু আমাকে কয়েকদিন পরে বলিতেছিলেন—'দেখুন, প্রাচ্যদের একটা গাম্ভীর্য্য ও গভীরতা আছে। আমরা বড়ই হাল্‌কা এবং তরলস্বভাব। সেদিন বসুপত্নীর সঙ্গে বহু ইয়াঙ্কিরমণী গল্প করিতেছিলেন। কথোপকথনের সময়ে লক্ষ্য করিলাম, ইয়াঙ্কিরা অনর্থক নানা কথা বকিয়া যাইতেছে। কাহারও উদ্দেশ্য নিজের বিদ্যা-ফলান—কাহারও বা ইচ্ছা একটা কায়দা করিয়া কথা বলা। কিন্তু বসুপত্নী সর্ব্বদা স্থির ও সংযতভাবে কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তির ভিতর একটা শান্তির লক্ষণ বিরাজ করিতেছিল। লোকদেখান পাণ্ডিত্য, চঞ্চলতা অথবা প্রগল্‌ভতা আমাদের রমণীগণের একটা লক্ষণ। প্রাচ্যের নিকট আমাদের ধৈর্য্য, স্থিরতা এবং সংযম শিক্ষা করা আবশ্যক।'"

২৩। জাপানী অধ্যাপক আনেসা ক
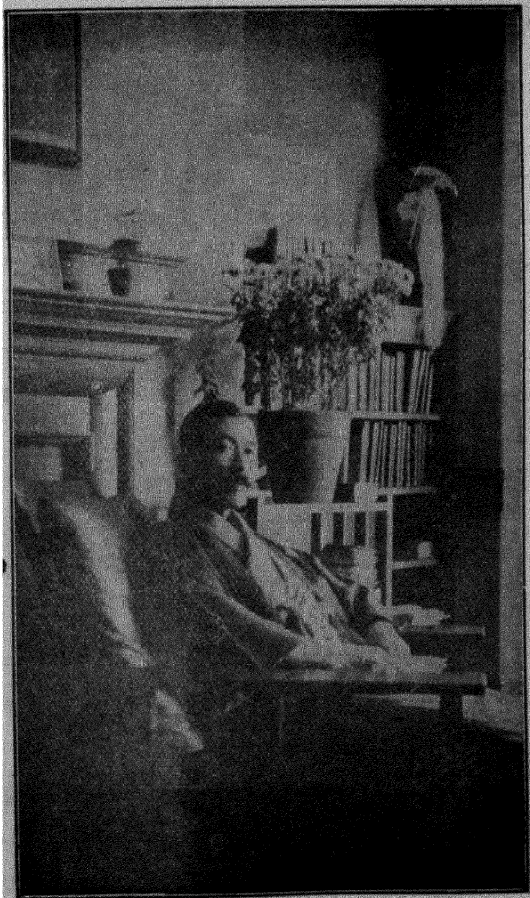
আনেসাকি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শিকাগোতে বক্তৃতা দিবার উপলক্ষ্য কি ছিল?" ইনি বলিলেন—"শিকাগোতে একটা সুবৃহৎ প্রাচ্য-সংগ্রহালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার কর্ম্মকর্ত্তারা আমাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিয়া ছিলেন। জাপানী-জাতীয়-জীবনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলাম। এই দেখুন বক্তৃতার মুদ্রিত সূচীপত্র।"

বিজ্ঞাপনপত্রে চারিটা বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার দেখিলাম। আনিসাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, দেখিতেছি ইহাতে লেখা রহিয়াছে, আপনি তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাহা হইলে আপনি হার্ভার্ডেও অধ্যাপক থাকিলেন কি করিয়া?" ইনি বলিলেন—"এক্ষণে আমি দুই স্থানেই অধ্যাপক। কিন্তু শিকাগোর কর্ম্মকর্ত্তারা হার্ভার্ডের নাম করিতে নারাজ। তাঁহারা আমার জাপানের সম্বন্ধই জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি একসঙ্গে হার্ভার্ডে ও তোকিওতে অধ্যাপক রহিলেন কি করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন জানি। আপনি কি এখানে একজন এক্স্চেঞ্জ-প্রোফেসার (বিনিময় অধ্যাপক)? তাহা হইলে হার্ভার্ড আপনার বিনিময়ে তোকিওতে কাহাকে পাঠাইয়াছেন?" আনেসাকি বলিলেন—"আমি এক্স্চেঞ্জ-প্রোফেসার নহি। আমার চাকরী নূতন ধরণের। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু জাপানী ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ আজকাল প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, কেহ বড় আফিসের কর্ত্তা, কেহ অধ্যাপক, কেহ সংবাদপত্রের সম্পাদক। এইরূপ একশত জন মিলিয়া একটা ধনভাণ্ডার গঠন করিয়াছেন। ইহার মূল্য ৬০০০০৲। এই

টাকার বার্ষিক সুদ হইতে একজন জাপানী অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও তোকিও বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত হইয়া এই ধনভাণ্ডার-সমিতির উদ্দেশ্য অনুসারে কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই সর্ত্ত অনুসারে জাপানের সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে হার্ভার্ডে অধ্যাপনা করিবার জন্য তোকিও বিশ্ববিদ্যালয় এক-একজন অধ্যাপক পাঠাইবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এক-একজন কয় বৎসরের জন্য আসিবেন তাহার কোন নিয়ম আছে কি? সাহিত্য ও সমাজবিষয়ক আলোচনা বলিলে কি বুঝিব? ইহা যে খুব ব্যাপক শব্দ। প্রাচীন ও মধ্যযুগ এবং বর্ত্তমানকাল সকল সময়েরই আলোচনা চলিতে পারিবে বোধ হইতেছে।"

আনেসাকি বলিলেন—"কত দিন এক এক অধ্যাপক থাকিবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। আলোচ্য বিষয় এবং আলোচনা-প্রণালীর উপর ইহা নির্ভর করিবে। আমি তিন বৎসরে আমার কার্য্য শেষ করিব মনে করিয়াছি। বৌদ্ধদর্শন শিক্ষা দিতেছি। পরে জাপানী কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমার পরবর্ত্তী অধ্যাপক হয়ত চিত্রকলা এবং অন্যান্য সুকুমার শিল্প শিক্ষা দিবেন। জাপানের সমগ্র জাতীয় জীবন এবং প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাসের যে কোন বিভাগ সম্বন্ধে অধ্যাপক আলোচনা করিতে পারেন। কোন সময়ে হয়ত বর্ত্তমান জাপানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অধ্যাপনা হইবে, কখনও বা জাপানী ব্যবসায় বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচিত হইতে পারিবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম কাহার মাথা হইতে বাহির হইয়াছিল?" আনেসাকি বলিলেন—"অধ্যাপক উড্‌সের। আমার সঙ্গে ইঁহার ভারতবর্ষে দেখা হয়। আমরা দুইজনে কিছুকাল

কাশীতে একত্র বাস করি। ইনি যখন জাপানে আসেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা ইহাঁর সঙ্গে দেখা করে। এইরূপ দেখা সাক্ষাৎ হইবার পর উডস্ হার্ভার্ডে জাপানী সভ্যতা প্রচারের আয়োজন করিতে থাকেন। জাপানী গ্র্যাজুয়েটগণের প্রয়াসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও কিছু সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি ৬০০০০৲ টাকা মাত্র উঠিয়াছে—সর্ব্বসমেত তিন লক্ষ টাকা তুলিবার ইচ্ছা আছে। তাহার সমস্ত সুদই অধ্যাপককে বেতন দেওয়া হইবে।

আনেসাকিকে বলিলাম—"মহাশয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও সমাজ পুরাপুরি পেসিমিজম বা দুঃখবাদে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবাসীর চিন্তায় অপটিমিজম্ বা আশাতত্ত্ব নাই। এইরূপ দুঃখবাদময় দর্শনের প্রভাবে ইহারা নিষ্কর্ম্মা, অলস এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্যেরা এইজন্য বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য এবং বেদান্তদর্শনকে বেশী তিরস্কার করিয়া থাকেন। জার্ম্মানদার্শনিক শোপেনহোয়ার বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক মতবাদ আলোচনা করিয়া পেসিমিষ্ট অর্থাৎ দুঃখবাদ-প্রচারক হইয়াছিলেন। এই জন্য পাশ্চাত্যেরা বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনকে দুঃখবাদের আকর বিবেচনা করেন। আপনি এই পাশ্চাত্য মত সম্বন্ধে কি বলেন?"

আনেসাকি বলিলেন—"আমার সঙ্গে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ষ্ট্যান্‌লি হলের কথোপকথন হইয়াছিল। হল্ পাশ্চাত্যসংসারে প্রচলিত মতই প্রকাশ করিতেছিলেন। আমার মত অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মে কর্ম্মতৎপরতা বিকশিত হইতে পারে তাহা তিনি কখনও ভাবেন নাই।"

একদিন ইউনিটেরিয়ান্ পাদ্রী ওয়েগুটে বলিতেছিলেন—"আপনাদের ঠাকুর-কবি গতবৎসর হার্ভার্ডে বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপকেরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—'ইহা কি হিন্দুত্ব ? হিন্দুধর্ম্মে এইরূপ উৎসাহপূর্ণতা, কর্ম্মতৎপরতা, জীবনবত্তা আসিল কোথা হইতে ? ইহা যে ইয়াঙ্কি এমার্সনের আশাতত্ত্ব। হিন্দুত্ব ত দুঃখবাদ এবং নৈরাশ্যের প্রতিশব্দ।' "

ভারতবর্ষের জলবায়ুতে নৈরাশ্য, অকর্ম্মণ্যতা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না—উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্যেরা এই কথাই শিখিয়াছেন। ইঁহারা ভারতবর্ষকে জড়ত্বের প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

আনেসাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি বলিলেন যে ষ্ট্যান্‌লি হলকে আপনি বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে নূতন ধারণা দিয়াছেন। প্রচলিত মত খণ্ডন করিলেন কি করিয়া ? "নির্ব্বাণ" শব্দ শুনিবা মাত্রই ইয়াঙ্কি ও ইয়োরোপীয়েরা থতমত খায় না কি ? যাহারা নির্ব্বাণের জন্য ব্যস্ত তাহারা কি কখনও সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প ইত্যাদির সংবাদ রাখিতে পারে ? যাহারা অহিংসা পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করে তাহারা কখনও অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহী হয় কি ? তাহারা শত্রুহস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করা ধর্ম্ম বিবেচনা করিবে কি ?"

আনেসাকি বলিলেন—"নির্ব্বাণের অর্থ বুঝিতে গোল হয়। তাহা ছাড়া, দুঃখবাদ স্বীকার করিয়া লইলেও অকর্ম্মণ্যতা অথবা জড়ত্ব পুষ্ট হইবে কেন ? বৌদ্ধেরা স্বীকার করেন যে, মানবের ভিতর অসংখ্য দুর্ব্বলতা সঙ্কীর্ণতা অসম্পূর্ণতা—এক কথায় অবিদ্যা রহিয়াছে। এগুলি উড়াইয়া দিবার জো নাই। ইহারই নাম দুঃখবাদ বা পেসিমিজম্‌ অথচ এই দুঃখবাদ মানুষের স্বাভাবিক। বৌদ্ধধর্ম্ম দুঃখ হইতে মুক্তির পথ দেখাইতে চাহেন—মানুষকে অকর্ম্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন জড়পদার্থে পরিণত করিতে চাহেন না। যখন নরনারীর অসম্পূর্ণতা ও অবিদ্যাগুলি "নির্ব্বাণ"

প্রাপ্ত হয় তখন তাহারা বুদ্ধত্ব লাভ করে। এই ত আমাদের ধর্ম্মমত। ইহাতে মানুষকে কর্ম্মঠ, কর্ম্মযোগী, উৎসাহী এবং পরিশ্রমী করিয়া তুলিবার কথা—অবনত অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় উঠাইয়া দিবার কথা। অবিদ্যার নির্ব্বাণই মানুষের বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধদেবের জীবনে কি দেখিতে পাই? তিনি কি কেবল গিরিগুহাশায়ী অথবা তরুতলোপবিষ্ট নিষ্কর্ম্মা পুরুষ ছিলেন? ইয়োরোপ ও ইয়াঙ্কিস্থানের নরনারী যে ধরণের কর্ম্মতৎপরতা দেখিলে সুখী হন বুদ্ধদেবের তাহা কম ছিল না। সমাজ-সেবা, লোকহিত, রোগীশুশ্রূষা, পরোপকার, দুঃখনিবারণ ইত্যাদি কত কার্য্যই না তিনি করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান বৌদ্ধপ্রচারকগণের জীবনেও কর্ম্মপ্রাধান্য দেখিতে পাই না কি? তাহার পর মহাযানশাখা-বলম্বী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রভাবেও কর্ম্মতৎপরতা কোন অংশে কমে নাই। এই সম্প্রদায় চীন ও জাপানে প্রভাববিস্তার করিয়াছিল। চীন ও জাপানের বহু প্রতিষ্ঠানে বৌদ্ধদিগের বাস্তবজ্ঞান, কর্ম্মপ্রিয়তা, আশাতত্ত্ব এবং শক্তিপূজা দেখিতে পাই। তারপর লড়াই ও রক্তারক্তির কথা—বৌদ্ধ হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে না কে বলিল? বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ চাহে—কিন্তু কিসের নির্ব্বাণ। এই সকল নির্ব্বাণের জন্য প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করাও ধর্ম্মসঙ্গত সুতরাং দুঃখবাদ ও নির্ব্বাণতত্ত্বের সঙ্গে সাংগ্রামিকতার কোন বিরোধ নাই। গোঁড়া বৌদ্ধও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।"

আমি বলিলাম—"দেখিতেছি—বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রাশ্চাত্যদিগের গতানুগতিক মত খণ্ডন করা আপনার একটা প্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধে কেন—সমগ্র এশিয়ার শিল্প বলুন, সমাজ বলুন, রাষ্ট্রপরিচালনা বলুন, বিদ্যাচর্চ্চা বলুন, সাহিত্য বলুন—সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যদের ভুল ধারণা আছে। এই সকল ধারণা বদলাইয়া দিবার জন্য এশিয়াবাসীর বিশেষ চেষ্টা করা উচিত নহে কি? এশিয়ার

ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস এতদিন পাশ্চাত্যেরা লিখিয়াছেন। এশিয়া সম্বন্ধে এশিয়াবাসীর মত এখনও প্রচারিত হয় নাই। এক্ষণে জাপানী, চীনা, হিন্দুস্থানী, পারশী, আরবী ও মিশরী পণ্ডিতগণের এক ইতিহাস-পরিষৎ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রাচ্য-সভ্যতার বিশ্বকোষ সঙ্কলিত হইবে। প্রত্যেক দেশের বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কার ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া সভ্যতার নানা বিভাগ সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিবেন। এইরূপ রচনা প্রকাশিত হইলে প্রাচ্য জীবন সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ধারণা কিছু কিছু বদলাইতে পারিবে।"

আনেসাকি বলিলেন—"এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের আবশ্যক হইবে। পাশ্চাত্যেরা এই ধরণের কার্য্য করিবার জন্য অজস্র টাকা পাইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা উপযুক্ত পরিমাণ টাকা তুলিতে পারিব কি? জাপান, চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য, মিশর ইত্যাদি দেশে অনুসন্ধান-কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে—অন্ততঃ কতিপয় লোককে মাসিক অর্থসাহায্য দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহকার্য্যে এবং গ্রন্থ-প্রণয়নে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া, এশিয়ার কোন প্রসিদ্ধ নগরে প্রধান কেন্দ্র ও কার্য্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। ইহার পরিচালনার জন্যও অর্থ আবশ্যক।"

ইয়াঙ্কিস্থানে প্রাচ্য সভ্যতা আলোচনার কেন্দ্র সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। আনেসাকি বলিলেন—"ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী অধ্যাপক জাপানের ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়ায় চীনা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। বষ্টনের কলাভবনে জাপানী চিত্রকলার সংগ্রহ বোধ হয় দেখিয়াছেন। মিশিগানের জাপানী সংগ্রহ-গুলিই শ্রেষ্ঠতর।"

আমি বলিলাম—"কলাম্বিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে বোধ হয় [আ]লোচনা বেশী হয় না। অধ্যাপক হার্থ চীনের ভাষা, ব্যবসায়, সাহিত্য, [শি]ল্প ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনা করিয়া থাকেন।" আনেসাকি [ব]লিলেন—"নিউইয়র্ক বড় সহর—নিত্য নূতন ফ্যাশন ওখানে উপস্থিত [হ]য়। আজকাল ইয়াঙ্কি ধনী লোকেরা চীনা পদার্থ সংগ্রহের জন্য জলের [ম]ত টাকা খরচ করিতেছে। চীনের চিত্র-শিল্প-বিষয়ক প্রদর্শনী আজকাল [নি]উইয়র্কে অনেক দেখিতে পাইবেন। এইরূপ হুজুগের কেন্দ্রে [বি]শ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরিচালকগণ হুজুগের প্রভাব এড়াইতে [প]ারেন না। ইঁহারা ফ্যাশন-স্রোতের সঙ্গে কথঞ্চিৎ গা ঢালিতে বাধ্য [হ]ন। এই কারণে স্থায়ী চীনা সাহিত্য বা দর্শন অপেক্ষা সাময়িক [চী]নাতত্ত্বের আলোচনা কলাম্বিয়ায় অধিক হইবার কথা। এখানে [চি]ত্রশিল্পের আলোচনা যত হয় বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা তাহার [দ]শমাংশও হয় কিনা সন্দেহ। হুজুগপ্রধান স্থানে চিত্তবিক্ষেপ বেশী হয়—কার্য্যপ্রণালী বড় শীঘ্র শীঘ্র বদলাইয়া যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গতি অতি দ্রুত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু কলাম্বিয়া অত্যধিক মাত্রায় 'আধুনিক' বা "uptodate" এবং গতিশীল। সকল বিশ্ববিদ্যালয়েরই [কি]ঞ্চিৎ 'সেকেলে' বা পুরাতনপন্থী ও স্থিতিশীল থাকা মন্দ নয়।"

বষ্টনের বেদান্ত-ভবন

বষ্টন-নগরের "বষ্টন ট্রান্‌স্‌ক্রিপ্ট" ইয়াঙ্কিসমাজের বনিয়াদি সংবাদ-পত্র। যুক্তরাষ্ট্রবাসী মাত্রেই ইহার গৌরব করিয়া থাকেন। ইহার কার্য্যালয় দেখা গেল। সম্পাদক বলিলেন—"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইয়াঙ্কিদের মনোযোগ আকর্ষণ করা বড় কঠিন। আমরা ভারত-বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। প্রায় স্ত্রীপুরুষের মুখেই আজকাল ঠাকুর-কবির নাম শুনিতে পাইবেন। ইয়াঙ্কিস্থানে তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিক্রয়ও মন্দ নয়। কিন্তু আলোচনা করিলে দেখিবেন—কেহই ঐ-সমুদয় পাঠ করে নাই।"

নিউইয়র্কের মত বষ্টনেও রামকৃষ্ণ-ভক্তগণের এক কেন্দ্র আছে। এইরূপ কেন্দ্র স্যান্‌ফ্রানসিস্কোয় এবং সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা-নগরেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই-সকল কেন্দ্রে বৈদান্তিক মত প্রচারিত হইয়া থাকে। বষ্টন-কেন্দ্র হইতে "মেসেজ অব দি ইষ্ট" (প্রাচ্য-বাণী) নামক এক মাসিকপত্র বাহির হয়। বষ্টন-কেন্দ্রের স্বামী পরমানন্দ প্রত্যেক সপ্তাহে ৬০। ৭০ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনী পাইয়া থাকেন। বৎসর-খানেক হইল এই কেন্দ্রের নিজ গৃহ ক্রয় করা হইয়াছে। এই বেদান্তা-লয়ের বক্তৃতাগৃহে একটি বেদী আছে। তাহার উপর দেবনাগরী অক্ষরে লেখা—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" একটি বৃহদাকারের "ওঁ" অক্ষর প্রাচীরে অঙ্কিত দেখিলাম। ক্ষুদ্র লাইব্রেরীতে ধর্ম্মবিষয়ক এবং ভারত-সম্পর্কিত নানা-প্রকার গ্রন্থ আছে—পাঠকেরা এগুলি গৃহে লইয়া যাই-তেও পারে।

এখানে ভগ্নী "দেবমাতার" সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ভারতবর্ষে

২৪। বষ্টনের বেদান্ত-ভবন

গিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে কর্ম্ম করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করাই ইঁহার কার্য্য ছিল। বষ্টনের বেদান্ত-কেন্দ্রে ইনি স্ত্রীবিভাগের কর্তৃত্ব করিতেছেন। ৺ ভগ্নী নিবেদিতার পর ভগ্নী ক্রিষ্টিনা কলিকাতায় শিক্ষাপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার শরীর খারাপ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সম্প্রতি তিনি আমেরিকায় স্বাস্থ্যলাভ করিবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে নিউইয়র্কে দেখা হইয়াছিল। ভগ্নী দেবমাতাকে এই দুইজনের অনুরূপই বোধ হইল।

নিউইয়র্কে এবং বষ্টন-কেম্ব্রিজে বহু ইয়াঙ্কির সঙ্গে বেদান্ত-সমিতি সমূহের সম্বন্ধে নানা কথা হইয়াছে। সকলের মুখেই শুনিতে পাই— "মহাশয়, স্বামীজীদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য উচ্চশিক্ষিত পুরুষেরা বেদান্তালয়ে যান না। একমাত্র রমণীগণই ইঁহাদের মক্কেল। ভারতবর্ষকে সুপ্রচারিত করিতে হইলে এইরূপ হুজুগপ্রিয় ইয়াঙ্কি নারীর সাহায্য লইলে চলিবে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলের চিত্ত অধিকার করিতে পারিলেই আপনারা সত্যসত্যই দেশের কাজ করিতে পারিবেন। আপনাদের পণ্ডিতগণ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় আসুন—পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় আন্দোলন আরব্ধ হইবে। থিয়জফি এবং বেদান্তের মামুলি বোলচাল দিয়া আমাদের মন ভিজান অসম্ভব।"

একথাটা প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। তাহা বলিয়া ভারতীয় স্বামীদিগের পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং কর্ম্মনিষ্ঠাও অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। ইয়াঙ্কিস্থানই হউক অথবা ইয়োরোপই হউক—কোথাও ভারতবর্ষের যথার্থ সম্মান নাই। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় থাকিয়াও যাঁহারা দশবিশজন নরনারীকে স্বকীয় প্রভাবের বশে আনিতে পারেন এবং গৃহনির্ম্মাণ, পত্রিকাপ্রচার ও গ্রন্থাদি প্রকাশের অর্থ সংগ্রহ করিতে

পারেন তাঁহারা ভারতবাসীমাত্রের সম্মানার্হ। আরাম-কেদারায় বসিয়া স্বামীদিগকে মূর্খ, পাণ্ডিত্যহীন ইত্যাদি বলিয়া তিরস্কার করা বেআদবি। এই-সকল ভারতপ্রচারক এখনও স্বদেশবাসীর একটি কপর্দ্দকও খরচ করেন নাই—নিজ নিজ চরিত্রবলে স্থানীয় জনগণের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। আর, পাণ্ডিত্যের কথা তুলিলে জানিয়া রাখা উচিত যে, সাধারণ পাদ্রী মহাশয়গণের পেটে যতটা বিদ্যা থাকে, আমাদের স্বামিগণের বিদ্যা অন্ততঃ ততটুকু আছে। দুএকক্ষেত্রে চরিত্রসম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া কোন কোন ভারতীয় স্বদেশসেবক হয়ত ভাবিবেন—"ইহাতে ভারতবর্ষের নাম খারাপ হইতেছে। ভারতবাসীর মুখে চুনকালি পড়িতেছে।" একটুকু গভীরভাবে দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, ইহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় না। দুএকজনের চরিত্র-দোষে একটা জাতি অথবা একটা আন্দোলন পচিয়া যায় না। "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।" অধিকন্তু এই ধরণের "চরিত্রদোষ" প্রত্যেক পাশ্চাত্য নরনারীরই আছে, বলা চলিতে পারে।

যাহা হউক একমাত্র বেদান্তপ্রচারেই ভারতপ্রচার হইবে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাষ্ট্রশক্তি, ভারতবাসীর ধারাবাহিক বিজ্ঞান-বল, ভারতীয় কৃষিশিল্পবাণিজ্যের ইতিহাস, বর্ত্তমানভারতের কর্ম্মবীর ও সাহিত্যবীরগণের জীবনবৃত্তান্ত, যুবক ভারতের সর্ব্বতোমুখী "রোমান্টিক" (ভাবুকতাময়) আন্দোলন ইত্যাদি নানাবিধ তথ্য দুনিয়ায় প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। এজন্য সাহিত্য-সমালোচক, চিত্রশিল্পী, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, আইনজ্ঞ, উকীল, সংবাদপত্রের সম্পাদক, শিক্ষা-পরিষদের ধুরন্ধর, শিল্পকারখানার পরিচালক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ভারতীয় পর্য্যটকগণের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। "গীতাঞ্জলি" ও "সাধনা"র যুগ পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে ইয়োরোপীয়েরা বেদান্ত উপনিষৎ ও থিয়জফির

২৫। "মা-ঠাকরুণ" (স্যানফ্র্যানসিস্কোর "প্যাসিফিক বেদান্তকেন্দ্রে"র হিন্দুমন্দিরে রক্ষিত ফটো)

দেশ বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতমাতার অন্যান্য মূর্ত্তি দেখাইবার সময় আসিয়াছে—বিদেশীয়েরা সেই মূর্ত্তি দেখিবার জন্যও উদ্গ্রীব। জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, ভাণ্ডারকর, গোখ্লে*, রাসবিহারী, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল-চন্দ্র এবং শিক্ষাব্রতধারী মুন্সীরাম ইত্যাদি ভারতরত্নগণের অনুচরগণ এই কর্ম্ম গ্রহণ করুন। তাহা হইলে বর্ত্তমান জগতের পণ্ডিত-মহলে ভারতীয় চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি যাচাই হইতে পারিবে। তখন পাশ্চাত্যেরা বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত বৈদান্তিক আন্দোলনের যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

মেয়েরা যে-সকল আন্দোলনে যোগদান করে পণ্ডিতেরা সেই-সকল আন্দোলনের মূল্য স্বীকার করেন না। আমেরিকায় এ কথা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। যতই স্ত্রীস্বাধীনতা এবং পুরুষের সঙ্গে রমণী-জাতির সাম্য প্রচারিত হউক না কেন, ইয়াঙ্কিরা ভিতরে-ভিতরে রমণী-জাতিকে কিছু তরলমতি, চঞ্চলচিত্ত, হুজুগপ্রিয় এবং হাল্কাস্বভাব বিবেচনা করিয়া থাকেন। সে দিন জাপানী অধ্যাপক আনেসাকি বলিতেছিলেন—"মহাশয়, আমি জার্ম্মানীতে এবং আমেরিকাতেও লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে-সকল কলেজে মেয়েছাত্র বেশী সেই-সকল শিক্ষালয়ের অধ্যাপকগণ কিছু অগভীর এবং যুক্তিহীন হইয়া পড়েন। মেয়েদের স্বভাব এবং

* আজ (২১ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫) গোখলের মৃত্যুসংবাদ "বষ্টন ট্র্যান্স্ক্রিপ্ট" এ বাহির হইয়াছে। রাত্রি ১ টার সময় সংবাদ পাই। শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে দিনের ভিতর প্রায় ২৫ বার গোখলের কথা মনে হইয়াছিল। অথচ আর কোন দিন গোখলের বিষয় এত ভাবি নাই। লণ্ডনে থাকিবার সময়ে গোখলের সঙ্গে এক হোটেলেই কিছুকাল বাস করিয়াছি। এমন কি তখনও তাঁহার নাম এত বার মনে পড়ে নাই।

বিচিত্র প্রশ্ন ও সমস্যা বুঝিয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিবার জন্য অধ্যাপকগণকে খানিকটা নিম্নতর ভূমিতে নামিতে হয়। ইহাতে জ্ঞান মাপিবার কাঠি বেশ খাটো হইয়া যায়।" কাজেই ভারতগৌরব রমণীমহলে আবদ্ধ থাকিলে বেশী ফল পাওয়া যাইবে না। তবে নাই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভাল।

১৫। স্যানফ্র্যানসিস্কোর "হিন্দুমন্দির"

৪০০ পৃষ্ঠা
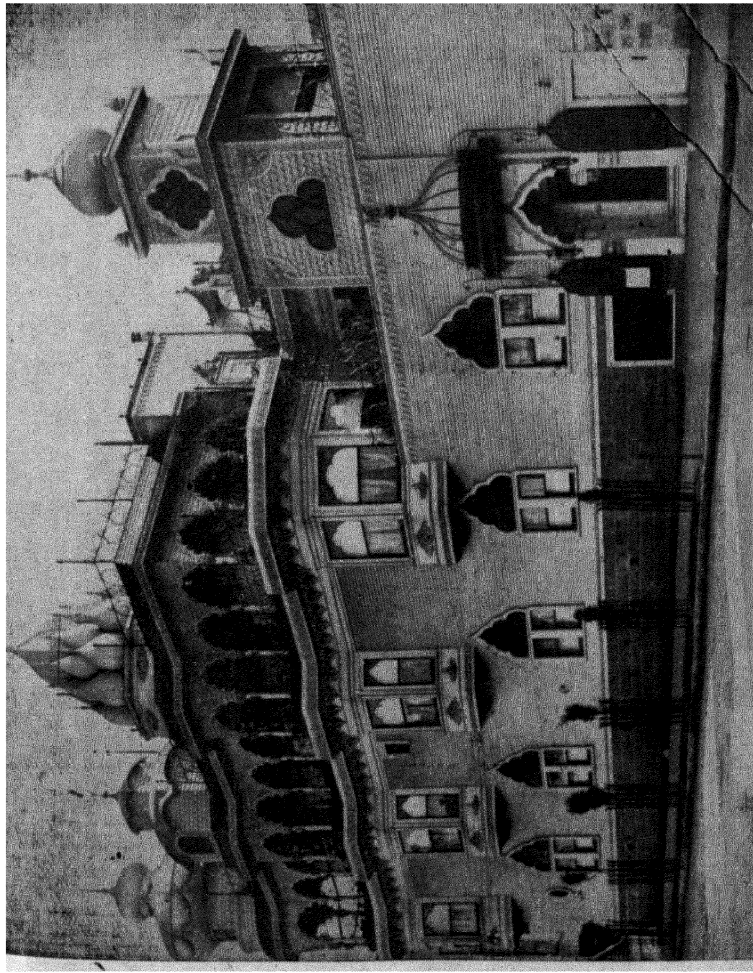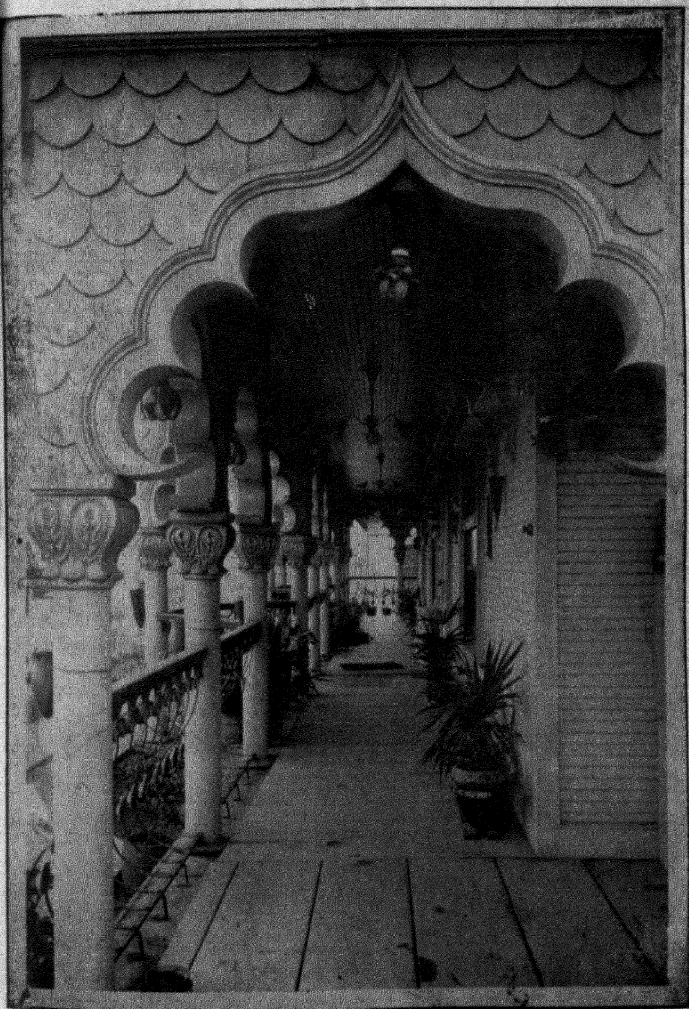
২৭। স্যানফ্র্যানসিস্কোর হিন্দুমন্দিরের ভিতরকার এক বারাণ্ডা

গ্রন্থে আলোচিত। উদ্ভিদের চাষে, জীবজন্তুর উন্নতি বিধানে এবং মানবসমাজের উৎকর্ষসাধনে এই সমুদয় গবেষণার মূল্যও আলোচনা করা হইয়াছে। অধ্যাপক কাস্‌লের (Castle) দুইটি প্রবন্ধ ইহাতে আছে।

কাস্‌ল দেখাইলেন, ধূসরবর্ণ ইঁদুর হইতে কৃষ্ণবর্ণ ইঁদুরের জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইতে আবার নূতন এক বংশের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের বর্ণ শ্বেত—কিন্তু মাঝে মাঝে কাল দাগযুক্ত।

অধ্যাপক বলিলেন—"এই দেখুন এক বিচিত্র রংয়ের ইঁদুর। সাধারণতঃ পীতবর্ণ ইঁদুর দেখা যায় না। বিলাতে দৈবক্রমে কয়েকটা পাওয়া গিয়াছিল। আমি এইটা বিলাত হইতে আনাইয়াছিলাম। তাহার পর ইহার সঙ্গে একটা কৃষ্ণবর্ণ ইঁদুরের সংযোগ স্থাপন করি। সন্তান জন্মিলে দেখিলাম, উহা ধূসরবর্ণ বন্য জাতীয় হইয়াছে। আবার কাল দাগযুক্ত শ্বেতবর্ণ ইঁদুরের সংযোগেও এই পীত ইঁদুর সেই পূর্ব্বতন ধূসরজাতীয় সন্তানই প্রসব করিয়াছে। সুতরাং অষ্ট্রিয়ান্ পণ্ডিত মেণ্ডেলের (Mendel) সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হইতেছে।"

কাস্‌ল নূতন নূতন বংশ ও জাতিসমূহের উৎপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইনি বলিলেন—"অসংখ্য প্রকারের জন্তু সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। ল্যাবরেটরীর পরীক্ষায় বুঝা যায় যে, যৌন-নির্ব্বাচনে হাত থাকিলে মানুষ পশু-সমাজে অগণিত জাতিভেদের সূত্রপাত করিতে পারে।"

একটা বাক্সের ভিতর দেখিলাম—কতকগুলি কার্ড সাজান রহিয়াছে। কাসল বলিলেন—"এই সকল কার্ডে প্রত্যেক ইঁদুরের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকের জীবন-কথা ইহার ভিতর লিপিবদ্ধ।

কয়পুরুষে কাহার কিরূপ আকৃতি-পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা সহজে বুঝিবার জন্য এই সকল কোষ্ঠী রাখা হইতেছে।" বুঝিলাম এগুলি ইঁদুরের কুলজী গ্রন্থ।

ইঁদুরের ঘর হইতে খরগোশের ঘরে আসিলাম। এই গৃহেও পূর্ব্বোক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। গিনিপিগের সমাজেও মেণ্ডেলতত্ত্বই সপ্রমাণ হয়। কাস্‌ল বলিলেন—"দক্ষিণ আমেরিকার আদিম ইণ্ডিয়ানেরা গিনিপিগ্ খাইয়া জীবন ধারণ করিত। ইয়োরোপের অন্যান্য পশু তখন দক্ষিণ আমেরিকায় ছিল না। আমি দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এই জীবগুলি লইয়া আসিয়াছি। একটা নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছি। সাধারণতঃ গিনিপিগের পায়ে তিনটা মাত্র নখ থাকে। আমি একটা বংশ সৃষ্টি করিয়াছি তাহার প্রত্যেকের পায়ে চারিটা করিয়া নখ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"চারিটা নখ কোন দিন হইতে পারিবে তাহা প্রথমে আন্দাজ করিলেন কি করিয়া?" কাস্‌ল বলিলেন—"দৈবক্রমে একটা গিনিপিগ্ নজরে পড়ে—তাহার পায়ে চতুর্থ নখের সামান্য মাত্র সূচনা গজিয়া উঠিতেছিল। তাহা দেখিয়া এই দিকে অনুসন্ধান চলিতে থাকে। এক্ষণে নানা যৌননির্ব্বাচণের পর নূতন একটা জাতি গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি।"

জীবজন্তুর গৃহগুলি দেখিতে মাঠের ভিতর পড়িলাম। কাস্‌ল বলিলেন —"ঐ দেখুন একটা বাগান। ইহাতে দুনিয়ার সকল উদ্ভিদই আছে। অবশ্য আমেরিকার জলবায়ুতে যে সকল উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে —পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে সেই সকল উদ্ভিদ এখানে আনা হইয়াছে।"

তাহার পর গরম-গৃহে আসিলাম। কাস্‌ল বলিলেন—"আমি জীব-জন্তুর সম্বন্ধে যে সকল অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা চালাইতেছি—আমার সহযোগী অধ্যাপক ঈষ্ট উদ্ভিদ সম্বন্ধে সেইপ্রকার গবেষণাই করিতেছেন।

উদ্ভিদের বর্ণসঙ্কর, জাতিভেদ, আকৃতি-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি আলোচনা করিয়া ঈষ্ট মেণ্ডেলের সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন। কতকগুলি উদ্ভিদ লইয়া রংয়ের পরিবর্ত্তন আলোচিত হইতেছে। সন্তান-উদ্ভিদ্, জনক-উদ্ভিদের বর্ণ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে কি না তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। লতাবাহারের চারাগুলি লইয়া এইরূপ অনুসন্ধান করা হইতেছে। কোন কোন উদ্ভিদের পাতাগুলি শীর্ণ দেখিলাম। কাস্‌ল বলিলেন—"এইগুলি ব্যাধিগ্রস্ত। এই ব্যাধি জনক হইতে সন্তানে সংক্রামিত হইবে কি না তাহা পরীক্ষা করা এখানে উদ্দেশ্য"। নূতন নূতন বীজসৃষ্টির উদ্যোগও দেখা গেল।

এই সমুদয় দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কালিফর্ণিয়ায় লুথার বার্ব্বাঙ্ক উদ্ভিদ্‌সমূহের যে সমুদয় পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন তাহা অবশ্য আপনারা দেখিয়াছেন। বার্ব্বাঙ্ক কি ইয়াঙ্কিস্থানের বিজ্ঞান-মহলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি?" কাস্‌ল বলিলেন—"বার্ব্বাঙ্ক সাধারণ কৃষক মাত্র। তাঁহার বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি কিছুই নাই। অন্যান্য হাতুড়ে কৃষকেরা যেরূপ কার্য্য করে ইনিও সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণশক্তি এবং নির্ব্বাচনের দক্ষতা অসাধারণ। তিনি যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ওস্তাদ। শিশু, বীজ, চারাগাছ, পাতা ইত্যাদি দেখিবামাত্র ইনি বুঝিতে পারেন কাহার সন্তান বা ভবিষ্যৎ কিরূপ। কিন্তু বিজ্ঞান-রাজ্যে বার্ব্বাঙ্ক একটি মাত্রও সূত্র অথবা নূতন সত্য অথবা নূতন আলোচনাপ্রণালী দান করিতে পারেন নাই। তাঁহার কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটা তাহা বুঝিবার জন্য হার্ভার্ডের এক অধ্যাপক কালিফর্ণিয়ায় গিয়াছিলেন। ইনি দুই বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ প্রকাশিত হইলে বার্ব্বাঙ্কের বৈজ্ঞানিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।"

বাস্‌সে ইনষ্টিটিউশান পূর্ব্বে কৃষিবিদ্যালয় ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ম্যাসাচুসেটস প্রদেশ-রাষ্ট্র সমগ্র প্রদেশের কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিকলেজ তুলিয়া দিয়াছেন। বাস্‌সে প্রতিষ্ঠানে জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ্‌ লইয়া উচ্চ অঙ্গের পরীক্ষা হয় মাত্র। ইহা "য়্যাপ্লাইড বায়লজি" (Applied Biology) বা ফলিত প্রাণবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী। অবশ্য প্রদেশ-রাষ্ট্রের বিজ্ঞানালয়েও এই সকল পরীক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু সরকারী বিভাগের বৈজ্ঞানিকেরা ব্যবসায়ে এবং শিল্পে ফলপ্রদ বস্তুসমূহের আলোচনাই বেশী করেন। তাঁহাদের গণ্ডী "অর্থকরী" বিদ্যা। এই গণ্ডীর বাহিরে তাঁহারা গবেষণা করিতে অগ্রসর হন না। কিন্তু হার্ভার্ডের অধ্যাপকগণ একমাত্র বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যই নানাবিধ "নিরর্থক" পরীক্ষায় ও অনুসন্ধানে সময় দিবার সুযোগ পান। বিশ্ববিদ্যালয় লাভালাভে নিরপেক্ষ। বিদ্যার প্রসার বাড়ানই তাঁহাদের লক্ষ্য।

বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও বংশোন্নতি

বিবাহ-করা এবং বংশবৃদ্ধি-করা মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক কাজ। এমন কি মানবজাতি তাহার ধর্ম্মসাহিত্যে এই কার্য্যের অতি উচ্চ মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছে। বাইবেল বলিতেছেন—"Live and Multiply" অর্থাৎ "দীর্ঘায়ু হও এবং বংশবৃদ্ধি কর"। হিন্দু জানেন—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই প্রায় এক সিদ্ধান্ত দেখা যায়।

কিন্তু বংশবৃদ্ধি এক বস্তু এবং বংশোন্নতি আর এক বস্তু। বংশবৃদ্ধি হইতে থাকিলেই যে বংশের উন্নতি হইতে থাকিবে তাহার কোন কথা নাই। আবার বংশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে হয়ত অনেক স্থলে বংশবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করা আবশ্যক হয়।

একমাত্র বংশবৃদ্ধির কথাই মানুষ ভাবে না—বংশোন্নতির বিষয় চিন্তা করাও মানুষের স্বভাব। প্রাচীন কালের মানব, মধ্যযুগের মানব, ইয়োরোপের মানব, ভারতবর্ষের মানব—সকলেই কর্ম্মঠ, স্বাস্থ্যশীল, ধীমান্ সন্তানসন্ততির জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। এইজন্য প্রত্যেক যুগের সমাজব্যবস্থায়ই বংশোন্নতির প্রয়াস ও লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যুগে যুগে দেশে দেশে যত সমাজসংস্কারক, রাষ্ট্রসংস্কারক, আদর্শজীবনপ্রচারক ও শিক্ষাপ্রচারক আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বংশোন্নতির উপায় আলোচনা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। একমাত্র বংশবৃদ্ধির কথা আলোচনা করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। সকলেই বিবাহ, যৌন-সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় এমনভাবে নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট

হইয়াছেন যাহাতে সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উৎকর্ষের অধিকারী হইয়া জন্মিতে পারে। ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েই সন্তান যাহাতে উন্নত চিত্ত এবং সুস্থ শরীরের বীজ বহন করিতে সমর্থ হয় সমাজসংস্কারক মাত্রেই তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রয়াসী।

হার্ভার্ডের ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক ফীল্ড লিখিতেছেন :—

"Twenty-three hundred years ago the political dialogues of Plato outlined a policy of controlling marriage selection and parentage for the general good of society and declared that the statesman who would advance the welfare of his citizens should, like the fancier of birds, or dogs or horses, take care to breed from the best only."

অর্থাৎ "দার্শনিক প্লেটোও যৌন-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সে আজ ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তাঁহার রাষ্ট্রশাসন-বিষয়ক কথোপকথনসমূহের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার মতে যে সে ব্যক্তিকে জনক বা জননী হইতে দেওয়া উচিত নয়—বিবাহ-বন্ধন বিশেষ সতর্কতার সহিত অনুষ্ঠিত হইতে দেওয়া আবশ্যক। পাখী, কুকুর এবং ঘোড়ার প্রতিপালক এবং ব্যবসাদারেরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানোয়ারগুলির সন্তানই বাড়াইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। সেইরূপ সমাজের শাসনকর্ত্তাদেরও সর্ব্বোৎকৃষ্ট নরনারী-গণের বিবাহ বিধিবদ্ধ করা উচিত। নতুবা সমাজের উন্নতি অসম্ভব।"

পাশ্চাত্ত্যেরা কথায় কথায় তাঁহাদের প্লেটোসংহিতার নজির দেখান—আমরা মনুসংহিতার উল্লেখ করি। বলা বাহুল্য, বিবাহবন্ধন কিরূপ

হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে বৃদ্ধমনু, অতিবৃদ্ধমনু, কনিষ্ঠমনু, এবং মামুলিমনু অতি বিস্তৃত এবং বিশদ আলোচনাই করিয়াছেন। কেবল মাত্র মনুর নামে যে সকল গ্রন্থ, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদি সুপ্রচলিত সেগুলিই হিন্দুর বিবাহতত্ত্বের শেষ কথা নয়। স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি নামে পরিচিত এমন কোন ভারতীয় গ্রন্থ নাই, যাহাতে বংশোন্নতির জন্য যৌননির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আলোচিত হয় নাই। প্রণালীগুলি ভাল হউক বা মন্দ হউক ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাপকগণ, ধর্ম্মপ্রচারকগণ এবং শিক্ষাধুরন্ধরগণ সকল যুগেই ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উন্নতিবিধানের জন্য এই সমুদয় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্যের পাতায় পাতায় ইউজেনিক্‌স্ অর্থাৎ সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রজনন-বিদ্যার আলোচনা এত বিস্তৃত ও গভীরভাবে অন্য কোথাও হইয়াছে কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষে যাহাকে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বলা হইয়া থাকে তাহার গোড়ার কথাই বংশোন্নতি ও সুপ্রজনন। কখন্ বিবাহ করিবে, কাহাকে বিবাহ করিবে, কোন্ বয়সে কিরূপ অবস্থায় সন্তানসৃষ্টির উপযুক্ত হইবে, সন্তানপ্রসবের পূর্ব্বে কিরূপ বিধিব্যবস্থা থাকা আবশ্যক ইত্যাদির আলোচনাই "বর্ণাশ্রমে"র ভিত্তি।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা", "প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং" কিম্বা "দীর্ঘায়ু হও এবং বংশবৃদ্ধি কর" ইত্যাদি সূত্র অতি সহজ ও সরল। এত সহজে সমাজশাসন এবং সমাজ-পরিচালনা চলিতে পারে না। এই জন্যই ভারতবাসীর বর্ণাশ্রম এত জটিলতাপূর্ণ। বর্ণাশ্রমী সমাজ বলিলে দুই শ্রেণীর নিয়মপালন বুঝিতে হইবে:—প্রথম বর্ণভেদের নিয়ম। ইহার দ্বারা বংশের পর বংশ, জাতির পর জাতি, পরিবারের পর পরিবার, বর্ত্তমানের পর ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সকল প্রকার উন্নতি সহজলভ্য হয়।

এ নিয়মগুলি প্রধানতঃ বিবাহ ও যৌননির্ব্বাচন সম্বন্ধীয়। দ্বিতীয়তঃ আশ্রমভেদের নিয়ম। ইহার দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের সমগ্রজীবনে সকল প্রকার উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়। মানবমাত্রেরই জীবনে নানা স্তর থাকা অবশ্যম্ভাবী—তাহার মধ্যে বিবাহের স্তরও আছে। কাজেই আশ্রমভেদের নিয়মে বিবাহের নিয়মও পালন করিতে হয়। কিন্তু আশ্রমভেদের সকল নিয়মই বিবাহ সম্বন্ধীয় নয়। এক কথায় নিয়মগুলিকে ব্যক্তিত্ববিকাশ বা শিক্ষাপ্রণালীর নিয়ম বলা যাইতে পারে। ইহার আদর্শ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

"শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।"

এই ফর্ম্মুলায় আশ্রমের নিয়ম বুঝা গেল—বর্ণের নিয়ম নয়।

মোটের উপর দেখিতে পাই, বিবাহ-তত্ত্ব বর্ণভেদ এবং আশ্রমভেদ উভয় নীতিরই মূলে রহিয়াছে। কাজেই বর্ণাশ্রমী সমাজের প্রবর্ত্তকগণ বিবাহ-বিজ্ঞানে এবং যৌননির্ব্বাচন-বিদ্যায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না বিবেচনা করা যাইতে পারে। তবে বর্ণাশ্রমী সমাজ যুগে যুগে কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে তাহার কথা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানকালেই বা বর্ণাশ্রমী সমাজ কি কি কারণে আধুনিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহার আলোচনাও সম্প্রতি করিতেছি না। এইটুকুমাত্র জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ইউজেনিক্‌স্ নামক একটা নূতন পারিভাষিক শব্দ বিগত ৫০ বৎসরের ভিতর ইয়োরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতমহলে দেখা দিয়াছে এবং বিদ্যাটা মাত্র দশবার বৎসরের ভিতর মাথা তুলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজপরিচালকগণ এই বিদ্যার প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই বিদ্যার দৌড় কত খানি ছিল তাহা যাচাই করা সময় সাপেক্ষ।

বর্ণাশ্রমপ্রথার দুই শ্রেণীর নিয়ম দেখিলাম। আধুনিক বিজ্ঞানবিভাগের পরিভাষা ব্যবহার করিলে বলিব যে, প্রথমশ্রেণীর নিয়মগুলি ইউজেনিক্‌স্ বা সুপ্রজনন-বিদ্যার অন্তর্গত এবং দ্বিতীয়শ্রেণীর নিয়মগুলি "এডুকেশন পেডাগজি" বা শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত। অধ্যাপক ইয়ার্কিসের Introduction to Psychology অর্থাৎ "চিত্তবিজ্ঞানের ভূমিকা" গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে সুপ্রজননবিদ্যা এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রভেদ বুঝান হইয়াছে। এই প্রভেদ দেখিলে আমাদের বর্ণতত্ত্ব এবং আশ্রম-তত্ত্বের প্রভেদ বুঝিতে পারিব।

আশ্রমতত্ত্ব শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত ও ব্যক্তিগত। এই সম্বন্ধে ইয়ার্কিস (Yerkes) বলিতেছেন, "Education deals directly with the mind of the *individual.* It directs its development, modifies its activities, leads it to efficiency."

ব্যক্তির চিত্ত গঠন করা শিক্ষাবিজ্ঞানের কার্য্য। ব্যক্তি বিশেষের সকল প্রকার ক্ষমতা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিবার জন্যই শিক্ষা বিধানের আবশ্যক।

অর্থাৎ কোন্ বয়সে কোন্ ব্যক্তির পক্ষে কি শ্রেয় এবং কি প্রেয় তাহা বিশ্লেষণ করা এবং ব্যক্তির সমগ্রজীবনের সোপান প্রস্তুত করিয়া দেওয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের কার্য্য। "আশ্রম"-ভেদের নিয়ম এই সোপান প্রস্তুত করিবারই প্রণালীমাত্র।

বর্ণতত্ত্ব বংশোন্নতি-বিজ্ঞানের (অর্থাৎ সুপ্রজনন-বিদ্যার) অন্তর্গত ও বংশগত। ইয়ার্কিস বলিতেছেন—"Eugenics deals with mind in the *race.* It directs the course of phylogenesis by controlling inheritance and it thus makes for increased efficiency in the individual." অর্থাৎ "সমগ্র জাতির

চিত্ত ইউজেনিক্স্-বিদ্যার আলোচ্য বিষয়। সন্তানের জন্ম সম্বন্ধে নিয়ম প্রবর্ত্তন করা এই বিদ্যার লক্ষ্য। তাহার দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশের গতি নিয়ন্ত্রিত হইবে—অধিকন্তু ভবিষ্যৎকালের ব্যক্তিচরিত্রও সুগঠিত হইবে।"

সুপ্রজনন-বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বৈজ্ঞানিক গ্যাল্টনের (Sir Francis Galton) ভাষায়—"Eugenics is the study of agencies under social control that may improve or impair the racial qualities of future generations either physically or mentally."

অর্থাৎ কোন্ কোন্ ব্যক্তি জনক বা জননী হইবার উপযুক্ত, কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ বাঞ্ছনীয়, সন্তানজন্মের পূর্ব্বে পিতামাতার জীবন কিরূপ পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করা ইউজেনিক্স্-বিদ্যার কার্য্য। ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থসমূহের আলোচিত তথ্যগুলিতে আগাগোড়া এই বংশোন্নতিবিধানের প্রয়াসই দেখিতে পাই না কি?

আজকাল ভারতবর্ষে "আশ্রম" আর দেখা যায় না। শিক্ষাপ্রণালী গবর্মেণ্টের আদর্শ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতীয় "গুরুগৃহ"-বাসরীতি গঙ্গার মত ক্রমশঃ নির্জ্জীব হইয়া আসিতেছে। ইহাতে আর জীবনের স্রোত ও গতিবিধি দেখিতে পাই না। এমন কি, "আশ্রমভেদ" নামক কোন পদার্থ ভারতসমাজে ছিল তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। আশ্রম-তত্ত্বের কথা আমরা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি।

এখন আছে মাত্র বর্ণভেদ বা জাতিভেদ। ইহাও আজকাল নির্জ্জীব, পঙ্কিল, গতিবিধিহীন, নড়নচড়নহীন। সজীব সমাজের বিবাহবন্ধন, যৌননির্ব্বাচন, রক্তসংমিশ্রণ ইত্যাদি যেরূপ হয় সেরূপ দেখা যায় না। এদিকে বর্ণভেদের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতা লইয়া মহা দলাদলি

চলিতেছে। প্রধানতঃ দুইদল। একদল বলিতেছেন :—"মানব-সমাজে উচ্চ নীচ, ছোটবড়, ইতরভদ্র ইত্যাদি থাকা উচিত নয়—অতএব বর্ণভেদ ভাঙ্গিয়া ফেল।" ইহাঁরা ফরাসী পণ্ডিত রুসো-প্রবর্ত্তিত "মানবমাত্রের সাম্য"বাদ অবলম্বন করিয়া থাকেন। অপরপক্ষ বলিতে-ছেন:—"ভেদ অবশ্যম্ভাবী—সমাজে ছোটবড় থাকিবেই। পাশ্চাত্য সমাজে টাকাপয়সার পরিমাণ অনুসারে জাতিভেদ সৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে গুণানুসারে জাতিভেদের ব্যবস্থা করিয়াছি। গুণগুলি বংশগত। কাজেই আমরা বংশপরম্পরায় জাতিভেদের সাহায্যে গুণগুলি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি।"

দেখা যাইতেছে যে, দুই দলই এক একটা দার্শনিক যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। যদি আলোচনাটা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের ডিবেটিং-ক্লাবের চতুঃসীমায় আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে একটা রফা হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু উভয়েই নিজ নিজ মত অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সমাজকে ভাঙ্গিতে গড়িতে চাহেন। কাজেই উভয়েই অন্ধভাবে স্বকীয় দর্শনবাদ অনুসরণ করিতেছেন। যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ তাঁহাদের পক্ষে বিজ্ঞান-সেবকের ন্যায় "রাগদ্বেষ-বহিষ্কৃত" হওয়া অসম্ভব। কাজেই বর্ণভেদ, অথবা আশ্রমভেদ, এবং মোটের উপর বর্ণাশ্রমীসমাজ নিরপেক্ষ সমালোচনার বস্তু হইতে পারে নাই। আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময়ে আমরা যেরূপ চিত্তে অগ্রসর হই—অথবা কোন পুষ্পের দলগুলি গণনা করিবার সময়ে আমরা যেরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন থাকি, বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমরা সেরূপ থাকিতে পারি নাই। খৃষ্টানেরাও তাঁহাদের ধর্ম্ম, সমাজ ইত্যাদি আলোচনা করিবার সময়ে পুরাপুরি নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না। ইহা মানুষের স্বধর্ম্ম।

যাহা হউক দলাদলি বহুকাল চলিয়াছে—দুইদলে অনেকটা বুঝা-পড়াও হইয়াছে। মতভেদ এবং কর্ম্মভেদ থাকা সত্ত্বেও আজকাল দুইদলের ধুরন্ধরগণ নানাক্ষেত্রে একসঙ্গে জীবনযাপন করিতেছেন। এইরূপ পরস্পরে সহানুভূতি, ভাববিনিময় এবং সমবায়প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া বিশ্বাস হইতেছে যে, শীঘ্রই বর্ণাশ্রমতত্ত্ব নিরপেক্ষ সমালোচনার বস্তু হইতে পারিবে। আজকালকার ভারতীয় ইংরাজী ও প্রাদেশিক সাহিত্যে তাহার লক্ষণও দেখিতে পাইতেছি।

বিশেষতঃ কিছুকাল হইল—বিগত ৮।১০ বৎসরের ভিতর সুপ্রজনন-বিদ্যা এবং নৃতত্ত্ব-বিদ্যা পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে মাথা তুলিয়াছে। ব্যক্তি-গত উন্নতি, বংশের উন্নতি, জাতিসমস্যা, পীতাতঙ্ক, কৃষ্ণাতঙ্ক, বর্ণসঙ্কর, ইত্যাদি আলোচনা করিবার জন্য রাষ্ট্রবীর, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও তাহার প্রভাব আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যেরা তাঁহাদের নিজ নিজ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য নানাপ্রকার সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতেছেন। পাশ্চাত্যদেশে বিদ্যার গতি অতি দ্রুত। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত-গুলি রোজই বদলাইতেছে—মতপ্রতিষ্ঠা এবং মত-খণ্ডন প্রতিদিনই চলিতেছে। তাঁহারা মত ভাঙ্গিতেও পশ্চাৎপদ নন—আবার নূতন মত গড়িতেও তাঁহাদের বেশী সময় লাগে না। ভারতবাসীরা নিজেদের সমস্যা স্বাধীনভাবে আলোচনা করেন না। আবার বিদেশীয় ধুরন্ধরগণের সিদ্ধান্তসমূহের যথার্থ মূল্যও আমরা বুঝিতে অসমর্থ। আজ একজন আমেরিকার পণ্ডিত প্রচার করিলেন—নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গের বিবাহ হইলে সুফল লাভ হয়। অমনি একদল ভারতীয় সমাজ-সেবক সুর ধরিলেন—"ভারতবর্ষেও এইরূপ বর্ণসঙ্করের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়।" অথবা হয়ত একজন ইংরাজ পণ্ডিত

প্রচার করিলেন—"পণ্ডিতের সন্তানেরাই পণ্ডিত হন, বদমায়েসের সন্তানেরা বদমায়েস হয়। সুতরাং বংশগত জাতিভেদই প্রশস্ত।" অমনি ভারতীয় ধুরন্ধর বলিতে লাগিলেন—"এই জন্যই ভারতবর্ষের ঋষিগণ ব্রাহ্মণের সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এইজন্যই Heredityর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন।" আর একজন জার্ম্মান পণ্ডিত সপ্রমাণ করিলেন যে, মানবচরিত্র আবেষ্টন, জন্মনিকেতন এবং শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা গঠিত হয়, জনকজননীর চরিত্রের উপর নির্ভর করে না। অমনি ভারতীয় প্রচারক বলিতে আরম্ভ করিলেন—"বর্ণভেদের নিয়মানুযায়ী বিবাহবন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত। যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে যে-কোন ব্যক্তির বিবাহ হইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।"

পরাধীন জাতির অশেষ দোষ—কোন বিষয়েই তাহার স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে না। এই জন্যই কি গ্রীক পণ্ডিত য়্যারিষ্টটল বলিতেন—"A slave is a living tool"—অর্থাৎ "গোলামের জাতি সজীব যন্ত্রমাত্র?" আজকাল "তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান" আলোচিত হইয়া থাকে। মনস্তত্ত্ববিদেরা পাগলের চিত্ত, প্রতিভাবান্ ব্যক্তির চিত্ত, শিশুর চিত্ত, মূর্খের চিত্ত ইত্যাদি নানাবিধ চিত্ত বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারা গোলামের চিত্ত ও মনিবের চিত্ত, দাসের চিত্ত এবং প্রভুর চিত্ত, পরাধীনের চিত্ত এবং স্বাধীনের চিত্ত আলোচনা করেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে "কম্পারেটিভ সাইকলজি"-বিদ্যার Normal and Abnormal Psychology অর্থাৎ "প্রকৃতিস্থ এবং অপ্রকৃতিস্থ চিত্ত"-বিভাগের এক শাখায় এই দুই ধরণের চিত্ত বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। তাহার নাম হইবে "সাইকলজি অব্ দি স্লেভ" অর্থাৎ "গোলামের চিত্ত" এবং "সাইকলজি অব্ দি মাষ্টার" অর্থাৎ "মনিবের

চিত্ত"। জার্ম্মান দার্শনিক নীটশে "মাষ্টার মর‍্যালিটি" অর্থাৎ "প্রভু-ধর্ম্ম" এবং "স্লেভ মর‍্যালিটি" অর্থাৎ "দাস-ধর্ম্ম" এই দুইটী পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে এই দুইটি নূতন পারিভাষিক শব্দ জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে মনোবিজ্ঞানের এই নূতন প্রস্তাবিত বিভাগের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান ভারতীয় পণ্ডিতগণের সমাজতত্ত্ব-আলোচনায় স্লেভ-সাইকলজির অর্থাৎ দাস-চিত্তের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আশা হইতেছে, ভারতবর্ষের গবেষণাকারীগণ আর বেশী দিন এইরূপ স্লেভ-সাইকলজির দৃষ্টান্তস্থল থাকিবে না। স্বাধীনভাবে নিজদৃষ্টিতে নিজের ভবিষ্যৎ-স্বার্থ-অনুসারে স্বদেশীয় তথ্যসমূহ ভারতবর্ষে আলোচিত হইতে পারিবে, কথায় কথায় পরকীয় ফর্ম্মুলাগুলি ভারতসমাজে প্রযুক্ত হইবে না।

কতকগুলি সাময়িক কারণে ইয়োরোপে ইউজেনিক্‌স বা বংশোন্নতি-বিজ্ঞান বা সুপ্রজননবিদ্যার প্রচলন হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষবর্ষে অধ্যাপক কার্ল পীয়ার্সন এক বক্তৃতা করেন। তখন ইংলণ্ডে ঘোরতর আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। বুয়ার সমরে ইংরাজজাতির শারীরিক ক্ষমতা পরীক্ষিত হইতেছিল। বিচক্ষণেরা বুঝিয়াছিলেন—ইংরাজ নরনারীগণ সকলবিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্য শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যলাভ, বংশোন্নতি, কর্ম্মঠ সন্তানের জন্ম ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ বাড়িতেছিল। অধ্যাপক কার্ল পীয়ার্সনের (Karl Pearson) "National Life from the standpoint of Science" অর্থাৎ "বৈজ্ঞানিকের চোখে ইংরাজের আয়ু ও শক্তি" নামক প্রবন্ধ সর্ব্বত্র আলোচিত হইতে লাগিল। তখন হইতে বিলাতে ইউজেনিকস্-বিদ্যার চর্চ্চা উৎসাহিত হইতেছে—একণে ১৫ বৎসরের

ভিতর ইয়োরোপে এবং আমেরিকার নানা স্থানে ইহা একটা ফ্যাশনে দাঁড়াইয়াছে। বুঝিয়া না বুঝিয়া সকলেই সুপ্রজননবিদ্যার সূত্র আওড়াতে চেষ্টা করেন।

অধ্যাপক ফীল্ড তাঁহার The Progress of Eugenics "সুপ্রজনন-বিদ্যার ইতিহাস" প্রবন্ধে কার্ল পীয়ার্সনের বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া ইংরাজসমাজের শোচনীয় চিত্র প্রদান করিতেছেন—

"The time (Nov. 1900), indeed, appears to have been unusually favourable to the reception and spread of such teachings. The shock of the reverses in South Africa, by which, throughout England, spirit 'were depressed in a manner probably never before experienced by those of our countrymen now living' was more or less directly the reason for Professor Pearson's choice of his topic : 'I have endeavoured to place before you a few of the problems which, it seems to me, arise from a consideration of some of our recent difficulties in war and in trade. England in manufacture and commerce as in war, had shown a want of brains in the right place.' But lack, of physique as well as lack of brain was causing apprehension, as evidenced later by the appointment (Sept. 2, 1903) of an Inter-Departmental Committee on Physical Deterioration 'to make a preliminary inquiry into the allegations concerning the deterioration of certain classes of the population as

shown by the large percentage of rejections for physical causes of recruits for the Army and by other evidence, especially the Report of the Royal Commission on Physical Training (Scotland)'—which had been created the year before. Subsequently the Committee was further instructed 'to indicate generally the causes of such physical deterioration as does exist in certain classes, and to point out the means by which it can be most effectually diminished.' Probably the public had been prepared for notions of degeneracy in some parts of the population by the epoch-making investigations of Charles Booth in London—investigation which were just then culminating, after a duration of more than a decade. Finally, it was not without significance that the school of biologists who stood for quantitative studies by means of the technique of modern mathematical statistics, and among whom Galton was a recognised leader, signalised their growing solidarity and influence by establishing in October 1901, their journal Biometrika, which from the time of its initial number has published many articles bearing more or less directly upon eugenics."

প্রথমতঃ, বুয়ার যুদ্ধে ইংরাজেরা সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদের দুর্ব্বলতার পরিচয় পান। নেপোলিয়ানি সমরের পর ইংরাজ সমাজে এরূপ নৈরাশ্য

ও ভয় আর কখনও দেখা দেয় নাই। পীয়ারসন স্বকীয় জাতির এই মানসিক অবস্থা আলোচনা করিবার জন্যই প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার ভূমিকায় প্রকাশ—"ইংলণ্ডের লোকেরা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নিতান্ত বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়াছে। এই ধরণের অক্ষমতা ইংরাজ সমাজে কেন দেখা দিয়াছিল তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।"

দ্বিতীয়তঃ, শারীরিক অশক্তির পরিচয়ও অনেক প্রকাশিত হইতেছিল। যুদ্ধের নিমিত্ত সৈন্য বাছাইয়ের সময় বহুসংখ্যক লোককে অস্বাস্থ্য এবং শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য গ্রহণ করা হয় নাই। স্কটল্যাণ্ডের "শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা" বিভাগের কার্য্য-বিবরণীতেও এইরূপ শোচনীয় অবস্থাই প্রকাশিত হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, গবমেণ্ট শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। দুর্ব্বলতা নিবারণের উপায় উদ্ভাবনও এই কমিটির কার্য্য নির্দ্ধারিত হয় (১৯০৩)।

চতুর্থতঃ, দশবার বৎসর পূর্ব্বে চার্লস্ বুথ লণ্ডন নগরের শ্রমজীবি সমাজের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া তথ্যসংগ্রহ সুরু করেন। সেই তথ্যসমূহ এই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া ইংরাজেরা জাতীয় দুর্ব্বলতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অভ্যস্ত হন।

পঞ্চমতঃ, গ্যাল্টনপ্রমুখ প্রাণ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বহুকাল হইতে এক নূতন দিকে তাঁহাদের অনুসন্ধান চালিত করিতেছিলেন। গণিতের সাহায্যে জীবনবিষয়ক তথ্যের তালিকাসংগ্রহ তাঁহাদের বিশেষ প্রয়াস ছিল। এই সময়ে তাঁহারা একটা নূতন দল গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হন। "বাইওমাট্রিকা" নামক মুখপত্রও প্রবর্ত্তিত হয় (১৯০১)। এই পত্রে

সুপ্রজনন, বংশোন্নতি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রবন্ধ প্রথম সংখ্যায়ই বাহির হইয়াছিল।

এই সকল কারণে বিংশশতাব্দীর প্রথমদিকে ইউজেনিকস্-বিদ্যা পণ্ডিত মহলে দেখা দিয়াছে।

সম্মুখ সমরে পরাজিত হইয়া ইংরাজ বংশোন্নতি-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় মনোযোগী হইলেন। সমর-বিজ্ঞান শক্তি-বিজ্ঞানের সূত্রপাত করিল। উপযুক্ত সৈনিকপুরুষ উৎপন্ন করিবার জন্য বিলাতে সুপ্রজননবিদ্যার আদর হইয়াছে।

সুপ্রজননবিদ্যা সম্বন্ধে বেশী গ্রন্থ এখনও প্রণীত হয় নাই। সেদিন অধ্যাপক কাস্‌ল্ বলিতেছিলেন—"আমরা পশুপক্ষী এবং তরুলতা সম্বন্ধে যৌননির্ব্বাচনের ফলসমূহ তালিকাকারে সংগ্রহ করিতেছি মাত্র। মানবজীবন এবং মানবসমাজ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সময় এখনও আসে নাই। অধিকন্তু কোন প্রকার সমাজসংস্কারের নিয়ম প্রচার করিবার ক্ষমতা আমাদের এখনও জন্মে নাই। কিন্তু হাতুড়ে সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ ইতিমধ্যেই নানা প্রকার দল পাকাইয়া সমাজগঠন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।"

কয়েকখানা ইংরাজী গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

1. Galton—Hereditary Genius, English Men of Science, Inquiries into Human Faculty, Natural Inheritance, Eugenics: its Definition, Scope and Aims.

2. Woods—Heredity in Royalty.

3. Thompson—Heredity.

4. Ribbt—Heredity.

5. Saleeby—Parenthood and Race-Culture.

6. Maken—Heredity and Human Progress.
7. Goddard—Heredity of Feeblemindedness.
8. Whethams—The Family and the Nation.
9. Kellicott—The social Direction of Human Evolution.
10. Davenport—Race Improvement through Eugenics.
11. Ward—Applied Sociology.
12. Fay—Marriages of the Deaf in America.
13. Jordan—The Blood of the Nation, The Human Harvest.
14. Warner—American Charities.
15. Rentoul—Race Culture or Race Suicide ?

যুবকভারতে 'রোমাণ্টিসিজম্' ও 'প্রাগ্‌ম্যাটিজম্'।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজয়ী পাশ্চাত্যেরা ভারতের সমাজ ও চিন্তা-ধারা সম্বন্ধে প্রচার করিয়াছেন—"ভারতবাসীরা অকর্ম্মণ্য, উচ্ছ্বাসময়, কাণ্ডজ্ঞানহীন, পরলোকতন্ত্র, বাস্তব জীবনে উদাসীন এবং নৈরাশ্যশীল।" অথচ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের আমল হইতে মারাঠা বীর বাজীরাও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের লোকেরা শিল্পকর্ম্মে, যুদ্ধবিদ্যায়, দুর্গনির্ম্মাণে, সমুদ্রবাণিজ্যে, রাষ্ট্র-পরিচালনায়, শত্রুবিজয়ে কোন দিনই পরাঙ্মুখ ছিল না। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইতালীয়, ইংরাজ নানা জাতীয় পর্য্যটকই ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের নগর-শাসন, জনগণের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি, রাস্তাঘাট ইত্যাদির যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। ইংরাজ ক্লাইবের চোখে মুর্শিদাবাদ তৎকালীন লণ্ডন অপেক্ষা উন্নত ছিল। ফরাসী কাপ্তেনের চোখে ভারতীয় সমুদ্রপোত ফরাসী ও ইংরাজ জাহাজ অপেক্ষা বেশী শক্ত ও কার্য্যক্ষম বিবেচিত হইত। অথচ এই জাতিই আবার বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, ভক্তিশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র ইত্যাদি রচনা করিয়া ইহ সংসারের হীনতা প্রচার করিয়াছে। সত্য কথা, হিন্দু জাতির নজর দুই দিকেই সমানভাবে ছিল—তাহার ভাবুকতায় বাস্তব জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা দেখা যায়, আবার অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধেও চুলচেরা বিশ্লেষণ দেখা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী সকল-কর্ম্মক্ষেত্রেই বাস্তব হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাদিগকে অতীন্দ্রিয় অথবা

অতীন্দ্রিয়ের ভড়ঙ লইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবহীন অতীন্দ্রিয়—অলীক ও কল্পনার সামগ্রী মাত্র। খাটি আধ্যাত্মিকতা অন্তঃবস্তু। এইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে বেদান্ত উপনিষৎ গীতা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক সাহিত্য আগা-গোড়া ভুল বুঝা হইয়াছে। একটা মিথ্যা মায়াবাদ প্রচারিত হইয়া ভারতবাসীকে জড়পদার্থে পরিণত করিয়াছে। এমন কি, এই মায়াবাদ লইয়াই ভারতবাসী গৌরবও করিয়াছেন। পাশ্চাত্যেরা যখন ইহ জগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হইলেন তখন ভারতবাসী পাশ্চাত্যগণকে বলিতে থাকিলেন—"বেশ ত, ইয়োরোপীয় দর্শন ভোগমূলক—তোমরা প্রবৃত্তি-মার্গের লোক। ভারতীয় দর্শন ত্যাগমূলক—আমরা নিবৃত্তিমার্গের লোক। তোমরা এই সংসারের তত্ত্ব লইয়া মজিয়া রহিয়াছ, আমরা পরলোকের চরম আনন্দে বিভোর হইয়া থাকি।" এইরূপ আলোচনায় পরাধীনজাতি শান্তি পাইয়া থাকে। পরাধীন যীশুখ্রীষ্টও এইজন্য তাঁহার স্বজাতীয়গণকে অত্যাচারী রোমীয় সম্রাট্‌-সম্বন্ধে বলিতেন—"Render unto Cæsar the things that are Cæsar's" "সীজারের (সম্রাটের) পাওনা সীজারকেই দাও" অর্থাৎ "বিনা বাক্যব্যয়ে মনিবের হুকুম তামিল করিয়া চল" অর্থাৎ "কোন প্রকার হুজুগ গণ্ডগোলে প্রবেশ করিও না।" এইরূপ সহিষ্ণুতা এবং শান্তিপ্রিয়তা গোলামী ধর্ম্মের লক্ষণ। যীশু বলিতেন—"My Kingdom is not of this world." অর্থাৎ "আমি তোমাদিগকে ইহজগতের সংবাদ দিতেছি না। আমি পরজগতের বার্ত্তা আনিয়াছি।" অর্থাৎ "আমার নিকট আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব মাত্র শুনিতে পাইবে—বর্ত্তমান জীবনের সুখ দুঃখের কথা আমার বাণীতে নাই।" খৃষ্টানেরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে যে, গোলাম যীশু অত্যাচারপীড়িত ইহুদি সমাজে অন্য কোন উপদেশ প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। গোলামাবাদে আধ্যাত্মিকতাই

প্রচারিত হইয়া থাকে। ইহা "মর্কট-বৈরাগ্যে"র মাসতুত ভাই। কথায় বলে—"পায় না ত খায় না।" "ইংরাজীতে ইহার নাম "Virtue of a necessity"। অর্থাৎ "দায়ে পড়িয়া বৈরাগ্য"। এই অবস্থায় পাশ্চাত্যেরা ভারতবাসীর অকর্ম্মণ্যতা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, মায়াবাদ ইত্যাদি লক্ষ্য করিবার অনেক সুযোগ পাইলেন। তাহা দেখিয়া-শুনিয়া ভারতের সমগ্র অতীত ইতিহাসটাকেই জড়ত্ব, মায়াবাদ, দুঃখবাদ, পারলৌকিকতা ইত্যাদির বিবরণরূপে প্রচার করিতে থাকিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ ভারতবাসী বুঝিলেন—ভারতবর্ষের প্রশংসাই বোধ হয় করা হইতেছে। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও এই সুরই ধরিলেন। তাঁহারা ভারতের ইতিহাসে একমাত্র ধর্ম্ম-প্রচারের কাহিনী আবিষ্কার করিলেন!

ভারতবাসীর চিত্তসম্মোহন আজকাল দূরীভূত হইয়াছে। বিংশশতাব্দীর যুবক ভারত আজ কর্ম্মজ্ঞানহীন বেদান্তের গৌরব করেন না—জগৎকে একটা অলীক বস্তু বিবেচনা করা আর ইঁহাদের প্রবৃত্তি নয়। মর্কট বৈরাগ্য বিষবৎ বর্জ্জিত হইতেছে। বেদান্ত গীতা উপনিষদের যথার্থ ভাবুকতা—বাস্তবযুক্ত আধ্যাত্মিকতা এক্ষণে ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। আমরা দুইদিকেই দৃষ্টি দিয়াছি। আমাদের রোমাণ্টিক (ভাবুকতাময়) আন্দোলনে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িতেছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন প্রচারিত হইতেছে—প্রকৃতি দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—আত্মার অমরতায় বিশ্বাস নবভাবে দেখা দিতেছে। আবার সেই সঙ্গেই আমরা বর্ত্তমানকেও নানা উপায়ে সুখময় করিয়া তুলিতেছি—মানব-সমাজ হইতে দূরে পলাইয়া যাইবার প্রবৃত্তি কমিয়া আসিতেছে—শিল্পের আন্দোলন, সেবার আন্দোলন, পল্লী-সংস্কারের আন্দোলন, শ্রমজীবীদিগের উন্নতিবিধান, শিক্ষা-প্রচার ইত্যাদি বাস্তব

ও বর্ত্তমান সমস্যাগুলি দক্ষতার সহিত সমাধান করা যাইতেছে। এক-দিকে কবি গাহিতেছেন :—

"শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া, যাইব বহিয়া।" ইত্যাদি

অথবা—"আকাশের তারা ডাকিছে আমারে
সমীরণ ডাকে "আয় আয়" করে।"

অথবা—"অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা
সে ঘটনা হবে হবে।"

এবং—"ভুলে যাও বর্ত্তমানে দূর ভবিষ্যতে চাহি।"

অপর দিকে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে জেলায় জেলায় নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে বর্ত্তমান অবস্থা সংস্কারের জন্যই অসংখ্য কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কুলী মজুর তাঁতী জোলা অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ লোক আন্দোলনে যোগদান করিতেছে। মফঃস্বলের বাণী এবং দরিদ্রের ক্রন্দন আমাদের জীবন ও সাহিত্য এবং শিল্পের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ইহা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতা। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস হইতেও ভারতবাসীর বিজ্ঞানবল, কর্ম্মশক্তি, রাষ্ট্র-পাণ্ডিত্য, রণ-পাণ্ডিত্য ইত্যাদির নিদর্শন বাহির করা হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী তাঁহাদের ইতিহাসে মায়াবাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যুবকভারত অতীত ইতিহাসে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছেন। ইতিহাসের ধারাটাই নূতন প্রণালীতে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। অধিকন্তু অতীতে ডুবিয়া থাকিবার জন্য আমরা মরা ভারতের চিতাভস্ম ও কবর হইতে প্রত্নতত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করিতেছি না।

অতীতের জন্য অতীতের আদর আমরা করি না। সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের অন্যতম উপকরণ রূপে পুরাতন কথাগুলি আলোচনা করিতেছি। যুবকভারত সকল বিষয়েই "ভবিষ্যপন্থী" বা "ফিউচারিষ্ট"। গেটে-শিলার, ফিকটে-পেষ্টালজির যুগে জার্ম্মানির যে অবস্থা ছিল, যুবক-ভারতের আজ সেই অবস্থা চলিতেছে।

ভারতীয় চিন্তা এক্ষণে যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে মনে হয়, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সংসারের প্রাগ্‌ম্যাটিজম্-তত্ত্ব ভারতবাসীর উপযোগী। কর্ম্মতৎপর যুবকভারত এই তত্ত্ব অনুসারেই জীবন যাপন করিতেছেন। কাজেই আমাদের নিকট এই তত্ত্ব নূতন বোধ হইবে না। জার্ম্মান অয়কেনের "লাইফ্‌স্ বেসিস," ফরাসী বার্গসঁর "ক্রীয়েটিভ ইভলিউসন" এবং অক্‌স্‌ফোর্ড অধ্যাপকগণের প্লেটোতত্ত্ব ইত্যাদির প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি বেশী দিবার প্রয়োজন নাই। হার্ভার্ডের জেম্‌স্-প্রবর্ত্তিত দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীই বর্ত্তমান কালে ভারতবাসীর পক্ষে অতি উপাদেয় হইবে। ভারতে এক্ষণে "ফলবাদ," প্রত্যক্ষবাদ, "বহুত্ব", বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিত্বের দর্শন আবশ্যক। জেম্‌সের "প্রাগ্‌ম্যাটিজম" ("ফলবাদ"), "প্লুর‍্যালিষ্টিক ইউনিভার্স" ("অনৈক্যময় জগৎ বা বিশ্বে বহুত্ব"), "ভেরাইটীজ অব্ রিলিজাস্ এক্‌সপিরিয়েন্স" ("ধর্ম্ম জীবনের বৈচিত্র্য") এই তিনখানা গ্রন্থ ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হওয়া কর্ত্তব্য। কর্ম্মনিষ্ঠ যুবক-ভারত এক্ষণে প্রাগ্‌ম্যাটিক অর্থাৎ ফলবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী, প্লুর‍্যালিষ্ট অর্থাৎ বহুত্ববাদী এবং ভেরিড অর্থাৎ বৈচিত্র্যনিষ্ঠ হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের অনুরূপ দর্শন ও যুক্তি জেম্‌সের আলোচনায় প্রচুর পাওয়া যায়।
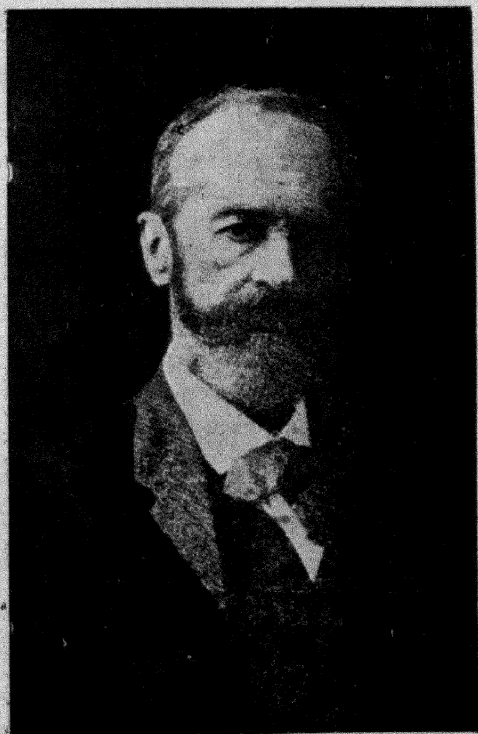
২৮। দার্শনিক জেমস

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওয়াশিংটনের পথে

পণ্ডিতমহলে স্থিতিশীলতা

হার্ভার্ড ছাড়িবার পূর্ব্বে একজন এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্ব অঞ্চলের বহু কারখানায় পরামর্শদাতার কার্য্য করিয়া থাকেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনীয়ারিংবিভাগেও ইনি অধ্যাপকতা করেন।

ইঁহার স্ত্রী বেদান্তভবনে ঘন ঘন যাওয়া আসা করেন—দুই এক পংক্তি সংস্কৃতও মুখস্থ আছে দেখিলাম। সপত্নীক অধ্যাপক য়্যাড্যাম্‌স্‌ ভারতীয় ছাত্রগণের পরম হিতৈষী। ভারতবাসী মাত্রেই ইঁহাদের অতিথি হইয়া থাকেন। কথাবার্ত্তায় জানা গেল, বষ্টন-কেম্ব্রিজে আজ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজী, মারাঠা, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী যত ছাত্র আসিয়াছে ইঁহারা সকলকেই ভাল রকম চিনেন। অনেকের নাম ইঁহাদের মুখে শুনিলাম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এরূপ আগ্রহ সাধারণতঃ দেখা যায় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে উৎসাহিত হইলেন কি করিয়া?" য়্যাড্যাম্‌স্‌-পত্নী বলিলেন—"মহাশয়, এরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ফলে আমাদের লাভই হইয়াছে। বিদেশীয় লোক জনের সঙ্গে মিশিয়া আমরা দুনিয়ার বিশালতা ও বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। ভারতবর্ষের

হাবভাব, আদর্শ ও চিন্তা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে বার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। কিন্তু ঘরের সম্মুখে যখন ভারতবর্ষ উপস্থিত তখন তাহার সম্মান করিব না? ইহাতে বিনা পয়সায় জ্ঞানবৃদ্ধি ও হৃদয়ের প্রসার লাভ সাধিত হইতেছে। আমাদের জগৎ যেন বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দৃষ্টিশক্তিও বাড়িয়াছে।"

বস্তুতঃ কোন জনপদে বিদেশীয় নরনারী আসিতে থাকিলে সেই জনপদের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না। বিদ্যাকেন্দ্রসমূহে এইরূপ ছাত্র-ছাত্রীগণের আমদানী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি আইওয়া, ইলিনয় এবং মিশিগ্যান প্রদেশত্রয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশীয় ছাত্রগণের নিকট বার্ষিক বেতন আদায়ের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার ফলে এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা, জাপানী, ভারতীয় এবং অন্যান্য দেশের দরিদ্র ছাত্রেরা আর আসিতে পারিবে না। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে বুঝাইয়াছেন—"দেখুন, বেতন আদায়ের নিয়ম করিয়া আপনারা ভাবিতেছেন কিছু লাভ করিবেন? ইহা আপনাদের বুঝিবার ভুল। গত ৮।১০ বৎসরের ভিতর আপনাদের এই সকল কেন্দ্রে বিদেশীয় ছাত্রগণ আসিয়াছে। তাহাদের আগমনে আপনাদের ইয়াঙ্কি অধ্যাপক ও ছাত্রগণ লাভবান্ হন নাই কি? প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার ভিতর বাস করিতে করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকজন খানিকটা অন্ধ ও গতানুগতিক হইয়া যায়। বিদেশের নূতন দৃষ্টি এবং নূতন চিন্তাসম্পদ্ লইয়া যে সকল ছাত্রেরা এখানে আসিয়াছে তাহারা সত্যসত্যই আপনাদের আবেষ্টনের মধ্যে কতকগুলি নূতন শক্তি দান করিয়াছে। সেই শক্তিসমূহের ওজন করা কঠিন—পয়সার হিসাবে মাপা বোধ হয় অসম্ভব। কিন্তু একটু গভীর ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করুন। দেখিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া এই বিদেশীয় প্রভাবে উন্নত,

উদার ও প্রশস্ত হইয়াছে। একঘেয়ে একটানা চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রণালীর ভিতর বৈচিত্র্য, বহুত্ব ও নবীনত্ব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সার্ব্বজনীনতা লাভ করার কি কোন মূল্যই নাই? আমার বিবেচনায় পয়সা খরচ করিয়া, বৃত্তি প্রদান করিয়া বিদেশীয় ছাত্র আমদানী করাই কর্ত্তব্য। যাহারা আসিয়াছে অথবা আসিতে চাহে তাহাদিগকে বেতন বৃদ্ধির ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ নিজ নিজ কেন্দ্রে বিদেশীয় ছাত্রগণকে অন্নবস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা 'সংরক্ষণ' করিতেন। বিদেশীয় ছাত্র মাত্রেই ভারতবাসীর ধারণায় দেশের অতিথি বিবেচিত হইত। ভারতবর্ষের এই শিক্ষানীতি সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে প্রত্যেক শিক্ষা-কেন্দ্রে বিশ্বমুখিনতা ও সার্ব্বজনীনতা সহজেই সৃষ্ট হইতে পারিবে।"

বিদেশীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা "কাল্‌চার" (Culture) বা জ্ঞান-বৃদ্ধির একটা প্রশস্ত পথ সন্দেহ নাই। এইরূপে বিনা খরচে হৃদয়ের প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতেরা এশিয়াবাসীদিগের সঙ্গে পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন। কোন পর্য্যটক উপস্থিত হইয়াছেন শুনিলেই ইঁহারা তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লন। য়্যাড্যাম্‌স্‌ পরিবারের ভারত-সমাদর অবশ্য কথঞ্চিৎ অসাধারণ।

য়্যাড্যামস্‌ এঞ্জিনীয়ার—কিন্তু নানা কারখানা ও কারবারের সঙ্গে যোগ থাকায় ইনি ব্যবসায় বাণিজ্য, দেশের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির সংবাদ বেশ রাখেন। ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজকাল যুক্তরাষ্ট্রে বৈষয়িক আন্দোলনের গতি কোন দিকে বুঝিতে পারা যায় কি? "সোশ্যালিজম" বা সমাজতন্ত্র, সমবায়, সংরক্ষণ, কুটির-শিল্প, নগর-সংস্কার

ইত্যাদি বিষয়ক রব ত এদেশে বেশী শুনিতে পাই না। কলাম্বিয়া এবং হার্ভার্ডের অধ্যাপক মহলে গতানুগতিক ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা হইয়া থাকে বোধ হইতেছে।"

য়্যাড্যাম্‌স্‌ বলিলেন—"মহাশয়, কোন নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নামজাদা অধ্যাপক কখনও নূতন কোন আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন কি? ইঁহাদের নিকট নূতন জীবন গঠনের অনুরূপ চিন্তা কখনই পাইবেন না। ইঁহারা সাধারণতঃ মামুলি গতানুগতিক চিন্তাপ্রণালীর ধারা রক্ষা করিয়া চলেন। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই স্থিতিশীল—ইঁহারা নড়ন চড়ন ভাল বাসেন না।"

আমি বলিলাম—"রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপই দেখা যায়। একবার কোন জাতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিলে শীঘ্রই সে অপরাপর জাতি-পুঞ্জের উন্নতি রুদ্ধ করিতে চাহে। জগতের শান্তি রক্ষাই তাহার লক্ষ্য ও ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। জগতের কোথাও কোন পরিবর্ত্তন তাহার ভয়ের ও উদ্বেগের কারণ হয়। এই জন্য শান্তিপ্রিয়তা ("Status quo") বা স্থিতিশীলতা, কন্‌জার্ভেটিজম্‌ বা গতানুগতিকতা ও রক্ষণশীলতা শব্দের দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতিমাত্রের নীতি বিবৃত করা যাইতে পারে। সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্রেও এইরূপ দেখা যায়। একবার কোন সম্প্রদায় বিদ্যাবলে অথবা চরিত্রবলে অথবা ধনবলে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিলে শীঘ্রই সে নূতন উদীয়মান সম্প্রদায়ের বিপক্ষে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করে। নূতন কর্ম্মপ্রণালী, নূতন সমাজগঠন, এবং 'transvaluation of values' বা যুগান্তর-সাধন তাহার স্বার্থের বিরুদ্ধে থাকে। সকল বিষয়ে পুরাতন সমাজবন্ধন রক্ষা করাই তাহার লক্ষ্য। কিন্তু বিদ্যাক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা, পুরাতন পন্থিত্ব, গতানুগতিকতা ইত্যাদির উৎপত্তি হয় কেন? পণ্ডিত-মহলে ত নিত্য নূতন ভাঙ্গাগড়াই দেখিবার আশা করা উচিত।"

ম্যাডাম্‌স্‌ বলিলেন—"আজকাল এ দেশে "Single Tax" বা জমিদারী-কর-নীতি জনসমাজে আলোচিত হইতেছে। দেশের সকলেই এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। আমাদের বৈষয়িক আন্দোলন-সমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান। 'ভূমির মালিকেরা খাজনা দিবেন—যাঁহাদের ভূমি নাই তাঁহাদিগকে খাজনা দিতে হইবে না'—এই নীতির উদ্দেশ্য এইরূপ। ইহাকে "জমিদার-দলন" নীতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই নীতির আলোচনা কোন প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে হয় না। অধ্যাপক সীগার, অধ্যাপক সেলিগম্যান, অধ্যাপক টাওফিগ ইত্যাদি নামজাদা ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণ সকলেই এ সম্বন্ধে "কনজার্ভেটিভ" বা পুরাতনপন্থী, অর্থাৎ যাহা আছে তাহাই রক্ষা করিতে চাহেন—নূতন মতের সমর্থন করেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিশেষ কোন কারণ আছে কি?" ম্যাড্যাম্‌স্‌ বলিলেন—"প্রথমতঃ, ইঁহাদের সকলেই প্রবীণ এবং প্রসিদ্ধ। নূতন কোন সংস্কারের আন্দোলনে যোগ দিলে লোকে ইঁহাদিগকে নাবালক ও অবিবেচক বলিবে। এইজন্য লোকনিন্দার ভয়ে ইঁহারা দূর হইতে আন্দোলনটা দেখিতেছেন—আন্দোলনের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন না। দ্বিতীয়তঃ, স্বার্থহানির ভয়। এদেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধনকুবেরগণের অর্থে পরিপুষ্ট। ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ীদিগকে সন্তুষ্ট রাখা এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। তাহা না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনাগম বন্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই অধ্যাপকগণ ধনী ব্যক্তিদিগের স্বার্থ বুঝিয়া মত প্রচার করিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ ধন-কুবেরদিগের নিকট বিশেষ কারণে ঋণী। বৃদ্ধ বয়সে ইঁহারা ধনকুবের-প্রদত্ত ভাণ্ডার হইতে পেন্সন পাইয়া থাকেন। সুতরাং স্বাধীন মত প্রচার

করা অধ্যাপকগণের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। এই সকল কারণে হার্ভার্ড, কলাম্বিয়া ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ গতানুগতিক মতবাদই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। নিতান্ত সামাজিক বিপ্লব সাধিত না হইলে প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ ব্যক্তিরা নূতন মতবাদ গ্রহন করিতে অসমর্থ।"
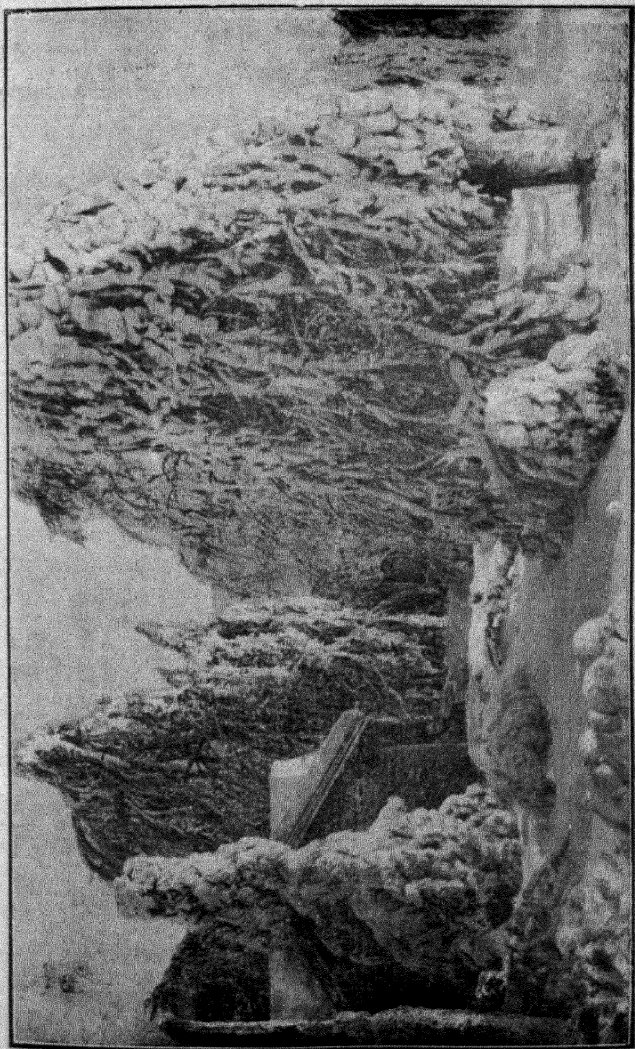
২৯। তুষারমণ্ডিত মেপলস্ বৃক্ষ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রমণী

অনেক পাশ্চাত্য রমণী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"মহাশয়, আমরা আমাদের ছেলে মেয়েকে যেরূপ ভালবাসি আপনাদের দেশে জনক জননীরা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিকে সেরূপ ভাল বাসে কি?" ভারতবাসী এই প্রশ্ন শুনিবা মাত্রই স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন। কারণ ভারতীয় নরনারীর বিশ্বাস তাঁহাদের মত স্নেহপরায়ণ, করুণ-হৃদয়, বাৎসল্যপূর্ণ লোক জন পৃথিবীতে আর নাই। অথচ ইংল্যণ্ড ও আমেরিকায় দেখিতেছি, এই সকল দেশের নরনারীও নিজেদেরকে অতিশয় হৃদয়বান্ বিবেচনা করিয়া থাকেন। প্রেম, ভালবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহ, করুণা ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা প্রাচ্যেরও একচেটিয়া নয়, পাশ্চাত্যেরও একচেটিয়া নয়।

একজন ইয়াঙ্কি রমণী একটি ভারতীয় ছাত্রকে প্রায়ই বলিতেন—"ওহে বাপু, তোমার কি মা বাপ নাই? না তোমাদের দেশের মা বাপদের মায়া মমতা নাই?" ছাত্র থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিত—"সে কি? এরূপ প্রশ্নের অর্থ কি?" রমণী বলিতেন—"দশ বার হাজার মাইল দূরে সন্তানকে পাঠাইয়া যে মাতাপিতা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন তাঁহাদের হৃদয় নাই বলিব না ত কি? ইহা আমার ধারণার অতীত।" দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় জনক জননীর দুর্ব্বলতা ইয়াঙ্কিস্থানেও আছে। মানব হৃদয় সর্ব্বত্রই একরূপ। সাদা চামড়া ও কাল চামড়ার প্রভেদ অতি সমান্য মাত্র। দুই প্রকার নরনারীর শরীরেই রক্তের চলাচল হয়—দুয়ের বক্ষঃস্থলেই হৃদপিণ্ড ধড়ফড় করে। কোন জাতিই আগাগোড়া দেবতুল্য নয়—কোন জাতিই পুরাপুরি পশু-স্বভাব নয়।

একজন ইয়াঙ্কি ছাত্র আমাদের এক ভারতীয় ছাত্রের বন্ধু ছিল। ভারতীয় ছাত্র ইয়াঙ্কি ছাত্রের গৃহে পয়সা দিয়া বাস করিত। ইয়াঙ্কি জননী গৃহকর্ত্রী ছিলেন। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় পুরুষেরা ঘরের কর্ত্তা নহেন। সর্ব্বত্রই ল্যাণ্ডলেডী অর্থাৎ বাড়ীওয়ালীর প্রভাব। এই ইয়াঙ্কি বাড়ীওয়ালী ভারতীয় ছাত্রকে সন্তানের মত ভালবাসিত। গতবৎসর মেক্সিকোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই বাধিতেছিল। সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশে প্রদেশে সৈন্য-সংগ্রহ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দলে দলে ভলাণ্টিয়ার হইতে লাগিল। ইয়াঙ্কি ছাত্র বিশেষ কর্ম্মঠ ও উৎসাহী সুতরাং সেও বাপমার অনুমতি না লইয়াই স্বেচ্ছাসেবকগণের দলে যোগ দিল। এদিকে তাহার মাতা তাহাকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না। কিন্তু সাম্‌নাসাম্‌নি বচসায় কোন লাভ নাই। কারণ পুত্র মাতার কথা কোন মতেই শুনিবে না—মাতার ইহা বেশ জানা ছিল। কাজেই ইয়াঙ্কি রমণী ভারতীয় ছাত্রকে মধ্যস্থ করিলেন। ভারতীয় ছাত্র রমণীর সুখদুঃখের কথা শুনিত ও সহানুভূতি প্রকাশ করিত। ভারতীয় জননীরাও অসমসাহসিক কার্য্য হইতে নিজ সন্তানগণকে এই উপায়ে বিরত করিতে চেষ্টিত হন। জননীচরিত্র দুনিয়ায় এক।

পাশ্চাত্য রমণীদিগের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিলে পর দেখা যায় যে, শেষ পর্য্যন্ত ঘরকন্নার কথা, হাঁড়ীকুঁড়ীর কথা, রান্নাবাড়ির কথা ইত্যাদিই আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দুএক দিনের আলোচনায় দেশ, সমাজ, কাব্য, চিত্র, রাষ্ট্র ইত্যাদি লম্বা লম্বা বোলচাল বেশ চলে। ক্রমশঃ মেয়েলি গল্প সুরু হয়। মেয়েলি গল্প জগতের সর্ব্বত্রই একপ্রকার—ভারতীয় মেয়েতে আর পাশ্চাত্য মেয়েতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই।
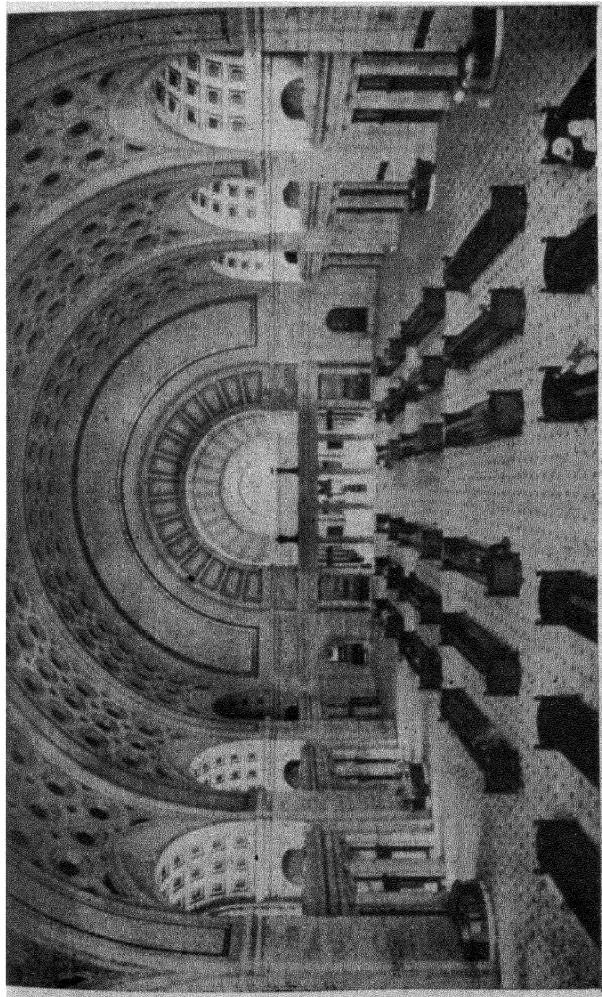
৩০। ইউনিয়ন ষ্টেটের মোসাফের-খানা

মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে বিবাহের গল্পে আসিয়া ঠেকিতে বেশীক্ষণ লাগে না। ভারতবর্ষের যেরূপ এদেশেও সেইরূপ। তবে পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী একটা অবস্থা আছে—পুরুষ ও রমণীর জীবনগঠনে তাহার প্রভাব অত্যধিক। ভারতবর্ষে ইহা নাই। এইজন্য এ সম্বন্ধে গল্প আমাদের দেশে চলে না। এখানে কিন্তু তাহাই মেয়েলি গল্পের প্রধান কথা।

আমাদের দেশে মেয়েমানুষের কৃপায় তীর্থস্থানগুলি গুলজার থাকে। এসকল দেশেও দেখিতেছি, একমাত্র মেয়েমানুষেরাই ধর্ম্ম-কথার আলোচনা করে। অবশ্য পেশাদার পাদ্রী মহাশয়গণ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতে বাধ্য। বিলাতী স্ত্রীলোকেরা রোমাণ ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট ইত্যাদি সম্প্রদায়-ভেদ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করে না। কিন্তু ইয়াঙ্কি রমণীদের ভিতর সাম্প্রদায়িক ভাব যথেষ্টই লক্ষ্য করিতেছি। 'অমুক লোক ব্যাপটিষ্ট তাহার সঙ্গে আমার চলাফেরা অসম্ভব' অথবা 'ক্যাথলিকদের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম!' ইত্যাদি কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এদিকে নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় আমেরিকায় রোজই সৃষ্ট হইতেছে। আজ Christian Scienceএর বা বৈজ্ঞানিক খৃষ্টধর্ম্মের দল, কাল "বাহা"-তত্ত্ব কিম্বা থিয়জফির দল স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। এই সকল সম্প্রদায় পুষ্ট করিবার পক্ষে রমণীরাই অগ্রণী। এইজন্য বেদান্তধর্ম্মের শিষ্যগণের মধ্যে স্ত্রীসংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অধিক।

সপ্তম অধ্যায়

ফেডারাল্ দরবারের রাষ্ট্র-কেন্দ্র

রবিবারে ওয়াশিংটন

শনিবার রাত্রিকালে ওয়াশিংটন পৌঁছিলাম। পথে ফিলাডেল্‌ফিয়া নগর পড়িল। এই নগরকে ইয়াঙ্কিরা স্বাধীনতার জন্মস্থান বিবেচনা করিয়া থাকে। এই নগরে সম্মিলিত হইয়াই ত্রয়োদশটি-উপনিবেশের প্রতিনিধিবর্গ ইংরাজের অধীনতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দের ৪ঠা জুলাই ফিলাডেল্‌ফিয়া সত্যসত্যই ইয়াঙ্কিস্থানের স্বাধীনতা-পুর ছিল। এই কারণে এখনও ইহার গৌরব। সাধারণতঃ কিন্তু ফিলাডেল্‌ফিয়ার ডিগ্রীধারী ও উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঠাট্টা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ফিলাডেল্‌ফিয়ায় বিশেষত্ব কিছু নাই।

ইয়াঙ্কিস্থানের রেলপথগুলি সহরের ভিতর দিয়া গিয়াছে। প্রায়ই দেখিতে পাই, নগর ও পল্লীর বড় রাস্তার উপর রেল চলিতেছে। সাধারণতঃ সহরের ভিতর যেরূপ ট্রাম চলে সেইরূপ এখানে রেলগাড়ীও চলে। গাড়ীর মধ্যে থাকিয়া একাধিক নগরের দোকান, বাজার, প্রাসাদ, অট্টালিকা ইত্যাদি দেখিতে পাইয়াছি।

শীতকালে গাছের পাতা নাই—বৃক্ষগুলি সবই শুষ্ক কাষ্ঠম্। এ কয়দিন বরফ পড়িতেছে না—কাজেই নূতন কোন সৌন্দর্য্যও সৃষ্ট
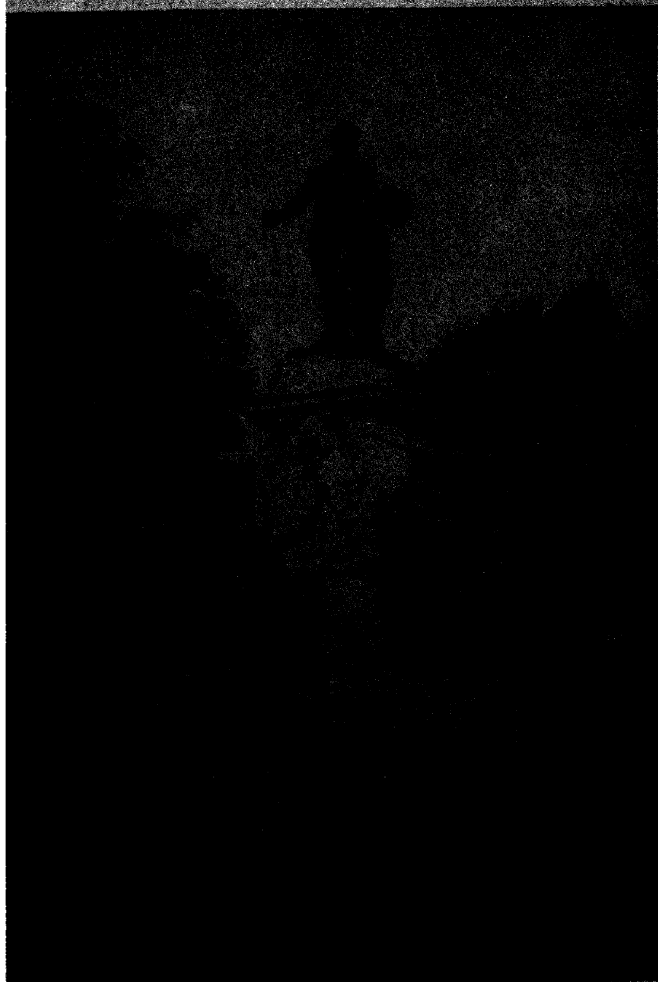
হইতে পারে নাই। রেলপথের দুইধারে হয় নগরাদির চিহ্ন—না হয় সমতল ভূমি। ফ্রান্স ছাড়িয়া অবধি যথার্থ প্রাকৃতিক শোভা আর দেখিতে পাইলাম না। গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডকে সবুজ বর্ণে মণ্ডিত দেখিয়াছি। কিন্তু ইয়াঙ্কিস্থানের পূর্ব্ব প্রান্তে কোন প্রকার নয়নরঞ্জক দৃশ্য দেখিতে পাইলাম না। এদেশের নগরগুলিকেও সুন্দর বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার বটে কিন্তু বাড়ী-ঘরের আকৃতি ও আয়তন সবই নিতান্ত ব্যবসাদারীর নিয়মে গঠিত বলিয়া বোধ হয়। কোথাও বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

ওয়াশিংটন যুক্তদরবারের (ফেডার‍্যাল গবর্মেণ্ট) রাষ্ট্র-কেন্দ্র। ইয়াঙ্কিরা ইহাকে সমগ্র জাতির "বড় সহর" (nation's capital) বলিয়া থাকে। পঁয়তাল্লিশটা স্বাধীন প্রদেশ স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া ইয়াঙ্কিস্থানের যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। সেই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রনগর ওয়াশিংটন। কাজেই ওয়াশিংটনে প্রাদেশিকতা, সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে ঐক্য, মিলন, সমবায়, ইত্যাদিই বিশেষ প্রকটিত। এই জন্য ষ্টেসনের নাম ইউনিয়ন ষ্টেশন। এমন কি এই নগরের কতক-গুলি রাস্তাও পঁয়তাল্লিশটা রাষ্ট্রের নামে পরিচিত। পাছে কোন এক প্রদেশের অবমাননা করা হয় এই ভয়ে সকল বিষয়েই এই নগরে সার্ব্বজনীনতা ও সম্মিলনপরতা রক্ষিত হইয়াছে।

ষ্টেসন দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলাম। বিরাট কারখানা। লোহালক্কড়, গাড়ী, প্ল্যাটফরম, লোকের চলাচল ইত্যাদি প্যারি ও লণ্ডনে এইরূপই বরং বেশী। এখানের বিশেষত্ব "মোসাফেরখানা"। এত বৃহৎ অট্টালিকা আর কখনও দেখি নাই। এক ছাদের তলে এইরূপ প্রশস্ত, দীর্ঘ ও উচ্চ গৃহ জগতে আর কোথাও আছে কি না জানি না। শুনিলাম, ৫০,০০০ লোক এইখানে দাঁড়াইতে পারে। ছাদ আগাগোড়া খিলান করা।

খিলানের দিকে তাকাইলেও বিস্মিত হইতে হয়। রোমনগরের "triumphal arches" বা বিজয়-ফটক দেখিয়া নাকি এঞ্জিনীয়ার এই মোসাফেরখানার খিলান তৈয়ারী করিয়াছেন।

রেল হইতে নগরের ভিতর একটা উচ্চ ওবেলিস্ক দেখিতে পাইলাম। মিশরীয় কায়দায় কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে মনে হইল। ষ্টেসন হইতে বাসস্থানে আসিবার পথে বুঝা গেল, এই নগর নিউইয়র্ক অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়।

"কস্‌মস্‌ক্লাবে" বাস করিতেছি। পূর্ব্ব হইতে এখানে কামরা ঠিক করা ছিল। "হার্ভার্ড ক্লাবে"র মত এই ক্লাবেও সভ্য এবং সভ্যগণের বন্ধু ভিন্ন আর কেহ বাস করিতে পারেন না। সাধারণতঃ হোটেলে যেরূপ খরচ পড়ে এই সকল ক্লাবেও সেইরূপ খরচ। কিন্তু হোটেলে বাস করিয়া এদেশের চিন্তাস্রোত ও কর্ম্ম-প্রবাহের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই হিসাবে সাধারণ হোটেল অপেক্ষা বাড়ীওয়ালীর কামরা ভাল। ক্লাবে থাকায় অনেক লাভ আছে। লেখা পড়া বেশ চলিতে পারে। হোটেলে যেরূপ বায় ভূতের নৃত্য এখানে সেরূপ নয়—অন্ততঃ ততটা নয়। কস্‌মস্‌ক্লাব ওয়াশিংটনের একটা নামজাদা প্রতিষ্ঠান। এখানকার বিজ্ঞান-পরিষৎ, সাহিত্য-পরিষৎ, নৃতত্ত্ব-পরিষৎ, দর্শন-পরিষৎ, রসায়ন-পরিষৎ ইত্যাদি ১৪।১৫টা বিদ্বৎসমিতি এই ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেই পরিষৎ-সমূহের সভ্যগণ এই ভবনে তাঁহাদের বক্তৃতা, আলোচনা, পরামর্শ, সম্মিলন, পানভোজন, ইত্যাদি করিয়া থাকেন। এই ক্লাবকে ওয়াশিংটনের চিন্তাকেন্দ্র বিবেচনা করা যাইতে পারে। লাইব্রেরী, পাঠাগার ইত্যাদি মন্দ নয়। প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনও এই ক্লাবের মেম্বর।

রবিবারে ইংলণ্ডের মত ইয়াঙ্কিস্থানেও কাজকর্ম্ম, চলাচল, ইত্যাদি

৩২। ওয়াশিংটন স্তম্ভ
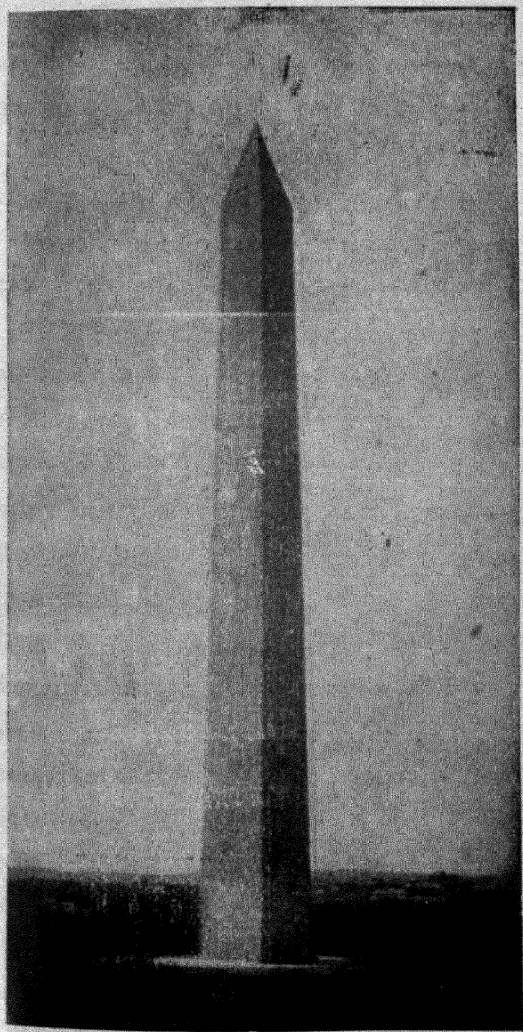
সবই স্থগিত। নিউইয়র্ক, বষ্টন, কেম্ব্রিজ সকল নগরই এই দিন জনপ্রাণীহীন। ক্লাব হইতে বাহির হইয়া দেখি, ওয়াশিংটনও রবিবারে নির্জ্জীব। লোক জন রাস্তায় নাই বলিলেই চলে। কোথাও দুইচারিটী নরনারী গির্জ্জায় যাইতেছে অথবা হাঁটিয়া বেড়াইতেছে।

"কস্‌মস্ ক্লাবে"র ভবনও সুপ্রসিদ্ধ। এই গৃহে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ম্যাডিসন বাস করিতেন। অন্যান্য বিখ্যাত জননায়কও এই বাড়ীতে বাস করিয়া গিয়াছেন। এই বাড়ীর সমীপবর্ত্তী স্থান ওয়াশিংটনের চৌরঙ্গী স্বরূপ। এখান হইতে দুই মিনিটের ভিতর প্রেসিডেন্টের হোয়াইট হাউস বা শ্বেতহর্ম্ম্যে যাওয়া যায়। ক্লাবের সম্মুখেই "লাফেয়ে স্কোয়ার"।

ফরাসী বীর লাফেয়ে (Lafayette) ইয়াঙ্কি স্বদেশসেবকগণের আরাধ্য দেবতা। ইয়াঙ্কিস্থানের স্বাধীনতা-সমরে লাফেয়ে তাঁহার ফরাসী অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কারণে কৃতজ্ঞ ইয়াঙ্কি নরনারী এই সকল ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক-গণকে এখনও পূজা করিয়া থাকে। লাফেয়ের নামে নগর, পল্লী ও রাস্তা যুক্তরাষ্ট্রের নানা প্রদেশে দেখিতে পাই। লাফেয়ের নামে পরিচিত পার্ক বা উদ্যান, কস্‌মস্ ক্লাবের সম্মুখে বিরাজিত।

গৃহ হইতে বাহির হইয়াই পার্কে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখের কোণে এক বীরমূর্ত্তি। লেখা আছে "কসিউস্কো"। প্রুশিয়ার ফ্রেডরিক এবং রুশিয়ার ক্যাথেরিণ যখন পোল্যাণ্ডের ভাগবাটোয়ারা করিতেছিলেন সেই সময়ে পোলিশজাতির কর্ম্মবীর কসিউস্কো তাহাতে বাধা দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি কৃতকার্য্য হন নাই—পোল্যাণ্ড তাঁহার পর ত্রিধা বিভক্ত হইল। লাফেয়ে-স্কোয়ারের কসিউস্কো-মূর্ত্তির নিম্নে লিখিত আছে:—"কসিউস্কোর পতনে স্বাধীনতা দেবী

কাঁদিয়া উঠিলেন" ("And Freedom shrieked as Kosciusko fell").

স্বাধীনতার করুণ-ক্রন্দনের এই চিত্র দেখিবার পর স্বাধীনতার বিজয়-চিত্র দেখিতে পাইলাম। ইহা স্বেচ্ছা-সেবক লাফেয়ের প্রতিমূর্ত্তি। অনুচর-সহ লাফেয়ে দণ্ডায়মান—আমেরিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহাকে তরবারি উপহার দিতেছেন। জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে বিদেশীয় স্বেচ্ছা-সেবকগণের স্থান নগণ্য নয়। এইজন্য চীনা স্বদেশ-সেবকগণ ইয়াঙ্কিদের নিকট আবদার করেন—"তোমরা ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক লাফেয়ের সাহায্য পাইয়াছিলে। এক্ষণে একজন ইয়াঙ্কি লাফেয়ে আসিয়া চীনা স্বদেশ-সেবকগণের সাহায্যদাতা হউন"।

উদ্যান দেখিয়া প্রেসিডেন্টের শ্বেত-প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইলাম। কোন সময়ে সামান্য দরিদ্র নগণ্য শিশুও কালে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট য়্যাব্রাহাম লিঙ্কন ও "From Log Cabin to White House" গ্রন্থের নাম সর্ব্বত্র প্রবাদস্বরূপ পরিচিত। প্রাসাদের পর আবার প্রান্তর ও উদ্যান। খানিকদূর চলিয়া সেই ওবেলিস্কের নিকট আসিলাম। কথঞ্চিৎ উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর এই পিরামিডশীর্ষ চতুষ্কোণ স্তম্ভ নির্ম্মিত। ইয়াঙ্কিস্থানের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মবীর স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সেনাপতি ওয়াশিংটনের স্মরণার্থে এই স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে।

এই স্মৃতিস্তম্ভ হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় দেড় মাইল পর্য্যন্ত বাগানের পর বাগান চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কতকগুলি প্রাসাদতুল্য ভবন—কোনটা বিজ্ঞানালয়, কোনটা মিউজিয়াম, কোনটা বিদ্বৎপরিষদ ইত্যাদি। ইয়াঙ্কিস্থানের জগৎপ্রসিদ্ধ "স্মিথসোনীয়ান" ইন্‌ষ্টিটিউশন ইহাদের অন্যতম। কলিকাতায় ধর্ম্মতলার মোড় হইতে পোস্তাবাজারের মোড়

৩৩। পোল্যাণ্ডের বিফলমনোরথ বীরবর কসিউস্কো

পর্য্যন্ত গড়ের মাঠ বিস্তৃত। এখানেও প্রায় সেইরূপ মাঠের স্থানে স্থানে নানাপ্রকার সরকারী ভবন। একটা বোটানিক্যাল উদ্যানও এই সঙ্গে দেখা গেল। অবশেষে ওয়াশিংটনের কাছারী-পাড়া। লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনষ্টার মহাল্লায় যেমন সরকারী বাড়ীঘর আফিস ও কর্ম্মকেন্দ্র-সমূহ অবস্থিত ওয়াশিংটনের এই অঞ্চলেও সেইরূপ রাষ্ট্রীয় কার্য্যালয়-গুলি অবস্থিত। এখানকার ক্যাপিটল-সৌধ লণ্ডনের পার্ল্যামেণ্ট-ভবন স্বরূপ। ক্যাপিটল-সৌধের দুইধারে রাষ্ট্রসভার সভ্যগণের আফিস —একধারে সেনেটার বা বড়ঘরের কর্ত্তারা থাকেন—আর একধারে রেপ্রেজেণ্টেটিভ ছোটঘরের কর্ত্তারা থাকেন। ক্যাপিটলের সম্মুখে বিরাট লাইব্রেরী।

"ক্যাপিটল"-ভবন এবং লাইব্রেরী-ভবন উভয়ই ওয়াশিংটন নগরের তাজমহল স্বরূপ। নানাপ্রকার চিত্রে ও স্থাপত্যে সৌধদ্বয় সুশোভিত। ক্যাপিটলের এক অংশে The Genius of America অথবা "আমেরিকার প্রতিভা" নামক একটি মূর্ত্তিপুঞ্জ আছে। এই স্থাপত্যকর্ম্মে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়াঙ্কিদিগের চরিত্র বুঝান হইয়াছে। ইয়াঙ্কিরা দুইটি দিবসের গৌরব করিয়া থাকে। প্রথমতঃ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। এই দিনের নাম স্বাধীনতা-তিথি (Independence Day)। এই দিবস ফিলাডেলফিয়ার সম্মিলনে ইংল্যাণ্ড হইতে ইয়াঙ্কিস্থানের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছিল। এই ঘোষণার পর ইংরাজ ও ইয়াঙ্কিতে যুদ্ধ চলিতে থাকে। দ্বিতীয় দিবস ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ। যুদ্ধে জয়লাভের পর ইয়াঙ্কিস্থানের স্বাধীনতা ইংরাজ-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল—ইংরাজ ইয়াঙ্কিস্থান হইতে বিতাড়িত হইলেন। তাহার পর ইয়াঙ্কিসমাজে রাষ্ট্র-শাসনপ্রণালী আলোচিত হইতে থাকিল। যুদ্ধের সময়ে তেরটি উপনিবেশ কোন মতে মিলিয়া কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু সকলের মধ্যে ঐক্যস্থাপন

দু-এক বৎসরের কার্য্য নয়। যুদ্ধাবসানের পর ঘরোয়া সমস্যা উপস্থিত হইল। ঐক্যপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-রাষ্ট্রের মধ্যে সমবায় স্থাপনের জন্য কথাবার্ত্তা ও বুঝাপড়া চলিতে লাগিল। সমবায়-রাষ্ট্রের অর্থাৎ ফেডারাল-দরবারের একটা খসড়া শাসন-প্রণালীও স্থিরীকৃত হইয়া গেল। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই খসড়া ফেডার্যাল-শাসন-ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। এই "কন্‌ষ্টিটিউশন" লইয়া বহুকাল ঝগড়া চলিয়াছে—এমন কি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে একটা গৃহবিবাদও হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র অনেকবার ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। মোটের উপর সেই কন্‌ষ্টিটিউশনই বর্ত্তমানেও দাঁড়াইয়া আছে।

শিল্পী আমেরিকাদেবীকে ঈগল-বাহিনী-রূপে মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়াছেন। একটা বেদীর উপর তাঁহার ঢাল অবস্থিত। বেদীতে "৪ঠা জুলাই ১৭৭৬" এই অক্ষরগুলি খোদিত। আমেরিকা আশাদেবীর কথা শুনিতেছেন এবং ন্যায়ের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। ন্যায়ের হস্তে একখানা কাগজে "১৭ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৭" এই কথাগুলি অঙ্কিত।

কংগ্রেসের গ্রন্থশালায় বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। এইগুলি দেখিলে, ইয়োরোপীয় সভ্যতার ধারাবাহিক বিবরণ বুঝিতে পারা যায়। একটি চিত্রের নাম "The Progress of Civilisation" অর্থাৎ 'সভ্যতার ক্রমবিকাশ'। ইহাতে শিল্পী জগতের বারটি জাতি ও যুগকে বার রকমের কৃতিত্বের অধিকারিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শিল্পীর মত নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

১। মিশর—প্যাপিরাস-পত্রে হায়েরোগ্লিফিক লিপির চিত্র। চিত্রকর বুঝাইতে চাহেন যে, মিশরীয়েরা চিরস্থায়ী ঐতিহাসিক লিপি প্রদান

৪৪৩ পৃষ্ঠা

৩৪। ক্যাপিটল সৌধ
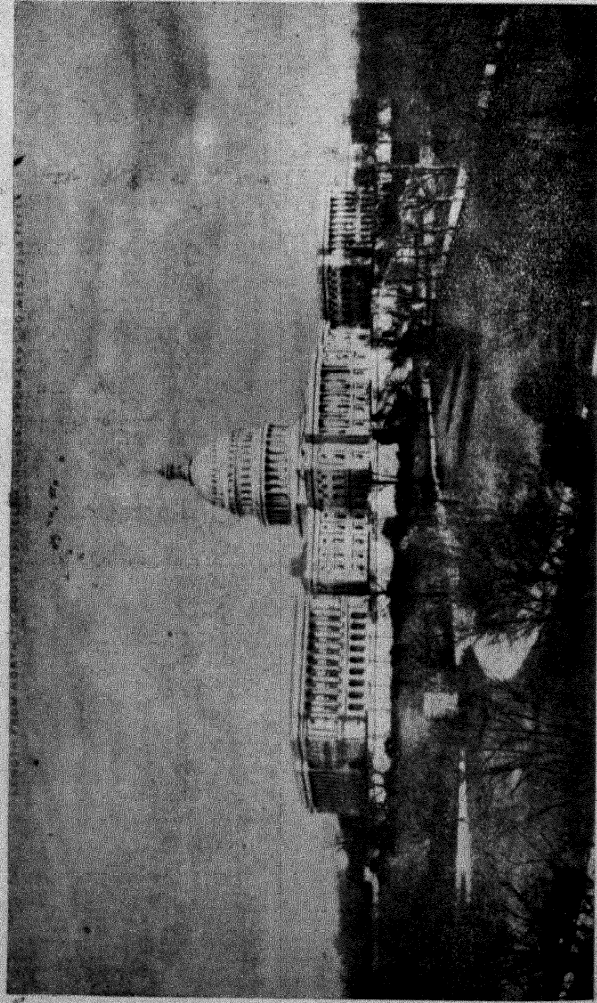
করিয়াছেন। লিপিবদ্ধ ইতিহাস রচনায় মিশরবাসীর প্রতিভা বিকশিত।

২। জুডিয়া—ইহুদি পুরোহিত হীব্রু ভাষায় প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন—'Thou shalt love thy neighbour as thyself' অর্থাৎ "বসুধৈব কুটুম্বকম্"। ইহুদিগণের গৌরব ধর্ম্মপ্রচারে।

৩। গ্রীস—গ্রীক প্রতিভার পরিণতি দর্শনালোচনায়।

৪। রোম—রোমান সৈন্যের চিত্র। শাসনপ্রণালী, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদিতে রোমীয় শক্তির বিকাশ হইয়াছিল।

৫। মুসলমান—একজন আরোব্যপোষাকধারী ব্যক্তি কাচের যন্ত্র এবং গণিতশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া দণ্ডায়মান। শিল্পীর মতে জগৎকে মুসলমান জাতি পদার্থ-বিজ্ঞান উপহার দিয়াছে।

৬। মধ্যযুগ—এই যুগের বর্ণনায় যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সৈনিক পুরুষগণের বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে—নূতন ধরণের ধর্ম্মগৃহ-রচনা (গথিক মন্দির) চিত্রিত হইয়াছে—এবং ধর্ম্মযাজক পোপের প্রবল প্রতাপ বুঝান হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ইয়োরোপের জাতীয় ভাষাসমূহের মূল প্রস্রবনও দেখান হইয়াছে।

৭। ইতালী—তুলি, বাটালি, বীণা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি ইতালীর নিদর্শন। নানাপ্রকার সুকুমার শিল্পে ইতালীয়দিগের গৌরব।

৮। জার্ম্মাণি—পঞ্চদশ শতাব্দীর পোষাকে একব্যক্তি ছাপাখানার কাজ করিতেছে এবং প্রুফ-সংশোধন করিতেছে। জার্ম্মাণির গৌরব মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার।

৯। স্পেন—নাবিকের পদতলে ভূমণ্ডলের মূর্ত্তি। স্পেন-প্রতিভা নূতন জগৎ আবিষ্কারে প্রকটিত হইয়াছিল।

১০। ইংল্যাণ্ড—সেক্‌স্‌পীয়ারের Mid Summer Night's

Dream নাটকের প্রথম পৃষ্ঠা হাতে লইয়া এলিজাবেথান যুগের পোষাক পরিয়া একব্যক্তি ইংরাজজাতির প্রতিনিধি হইয়াছে। ইংরাজের গৌরব সাহিত্যে।

১১। ফ্রান্স—রমণী স্বাধীনতার টুপি মাথায় দিয়া এবং রণবেশে সজ্জিত হইয়া কামানের উপর বেষ্টিত। তাঁহার হস্তে The Right of Man বা "মানবের অধিকার"-পত্র। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-বিপ্লবের কর্ত্তারা এই সকল অধিকার প্রচার করিয়াছিলেন। ফরাসী জাতি স্বাধীনতার পুরোহিত।

১২। আমেরিকা—একজন ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার ডাইনামো হস্তে আমেরিকার প্রতিনিধি। বিজ্ঞান ও শিল্প আমেরিকা-প্রতিভার বিশেষ ক্ষেত্র।

এই 'সভ্যতার ক্রমবিকাশ'-চিত্রে চীন অথবা ভারতবর্ষের উল্লেখ নাই। শিল্পীর কল্পনা অতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

---
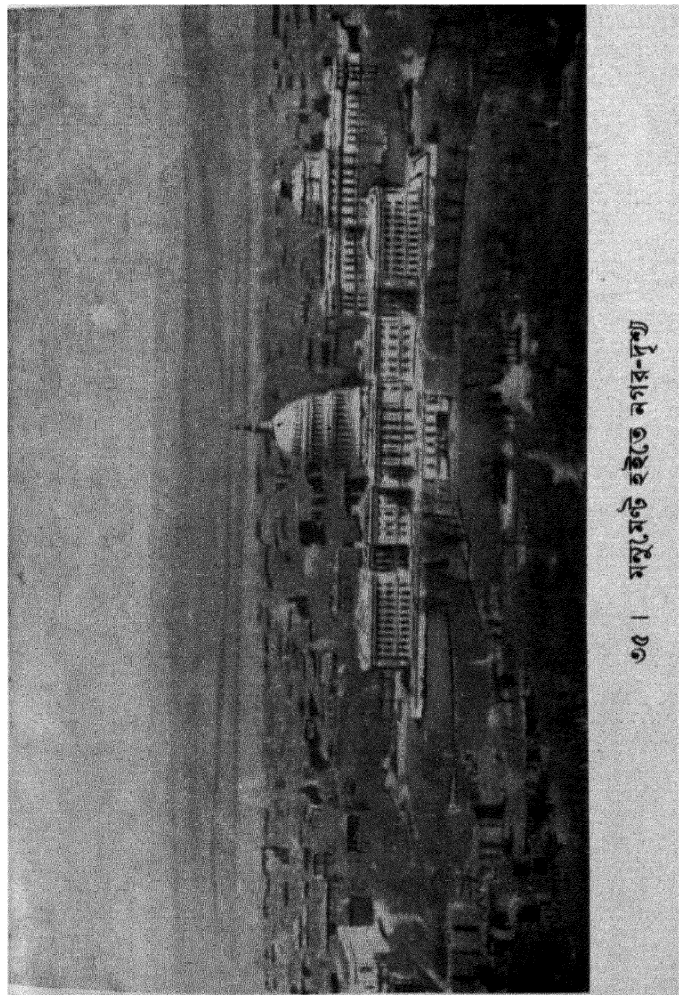
৩৫ । মনুমেণ্ট হইতে নগর-দৃশ্য
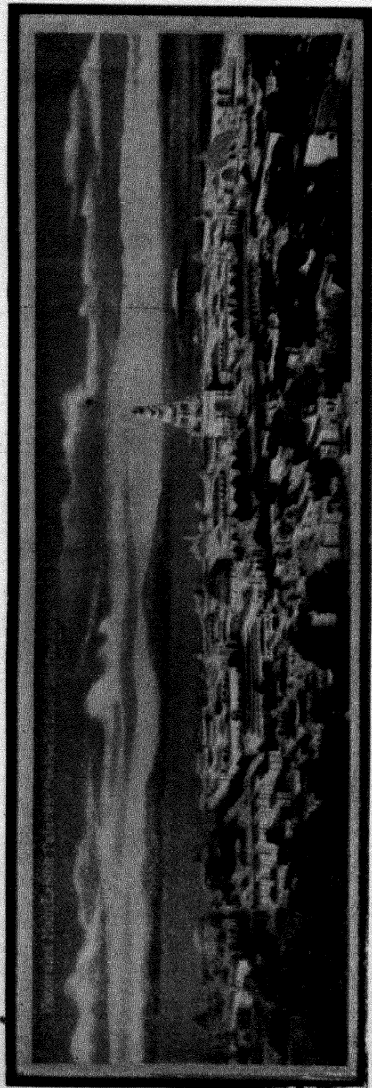
৩৫। মনুমেণ্ট হইতে নগর-দৃশ্য।

India Press, Calcutta.

ওয়াশিংটনের "গড়ের মাঠ"

এখানকার ময়দানের পার্শ্ববর্ত্তী এবং ভিতরকার অট্টালিকাগুলি দেখিলেই ওয়াশিংটন দেখা হইল। পর্য্যটকগণের পক্ষে ওয়াশিংটনে আর কিছুই নাই। রবিবার সবই বন্ধ ছিল—বাহির হইতে দেখিয়াছি মাত্র। আজ এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলির ভিতরটা দেখিয়া লইলাম।

ক্লাবের পাঠাগারে বসিয়াই কসিউস্কো-মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। রাস্তায় বাহির হইয়া ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে আসিলাম। এই অঞ্চলে প্রেসিডেণ্ট-ভবন, টাকশাল ও মালখানা, আমেরিকা-সম্মিলনীর কার্য্যালয়, বিপ্লব-ললনা-সমিতি, শিল্পসদন ইত্যাদি অবস্থিত।

প্রথমে প্যান্-আমেরিকান্ ইউনিয়নের গৃহ দেখা গেল। ভারতবাসীরা "প্যান্" উপসর্গের ব্যবহার বেশী করেন না। 'প্যানে'র অর্থ 'সর্ব্ব', যথা সর্ব্ববঙ্গ-শিক্ষা-সম্মিলন। সমগ্র ভারতের লোকেরা মিলিত হইয়া জাতীয় মহাসমিতি কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই সমিতিকে 'প্যান্ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' বলা চলে। আমরা ইহাকে "ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কংগ্রেস্" নামে অভিহিত করিয়াছি। 'ন্যাশন্যাল' শব্দটা এইস্থলে 'প্যানে'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই হিসাবে আমরা, ইয়াঙ্কিদের যুক্তরাষ্ট্র হইতে শব্দটা গ্রহণ করিয়াছি। 'ন্যাশন্যাল' অর্থে ইয়াঙ্কিরা 'যুক্ত', 'সর্ব্ব' অর্থাৎ 'প্যান্' বুঝিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে 'ন্যাশন্যাল' 'প্রাদেশিকে'র ('ষ্টেট' অথবা 'প্রভিন্স') বিপরীত। ন্যাশন্যাল শব্দের অন্যান্য অর্থও আছে।

ভারতবাসীরা স্বয়ং 'প্যান্' শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু ভারতে

প্যান্-উপসর্গ-বিশিষ্ট আন্দোলন পৌঁছিয়াছে। প্রথমতঃ "প্যান্-ইস্লাম" আন্দোলন। মিশর, তুরস্ক, উত্তর-আফ্রিকা, আরব, পারস্য, ভারত, চীন ইত্যাদি সকল দেশের মুসলমান ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইতে চাহেন। এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসকে ইয়োরোপীয়েরা প্যান্-ইসলাম বলিয়া থাকেন। খৃষ্টানমহলে ইহার ফলে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের নিকট প্যান্-ইসলাম শব্দ নূতন নয়। দ্বিতীয়তঃ ইয়োরোপীয়েরা আর একটা আতঙ্ক তৈয়ারী করিয়া লইতেছেন। ইঁহাদের বিশ্বাস, এসিয়ার সকল জাতি মিলিত হইয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার জাতি-পুঞ্জের সঙ্গে শীঘ্রই সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইবে। এশিয়াবাসীর এই সমবায়কে পাশ্চাত্যেরা প্যান্-এসিয়াটিক আখ্যা দিয়া থাকেন। এসিয়ার সঙ্গে ইয়োরোপের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু এসিয়ার জাতিপুঞ্জ পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় ও কর্ম্মবিনিময় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এসিয়ার বিভিন্ন-দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়, বিদ্যাসম্বন্ধীয়, বাণিজ্য-বিষয়ক এবং অপরবিধ সম্বন্ধের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে নিযুক্ত আছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান নরনারী পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। বিংশ শতাব্দীতে ইহাদিগকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐক্যবন্ধন অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর দেখা যাইতেছে।

প্যান্-উপসর্গযুক্ত আন্দোলন ইয়োরোপেও দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সময়ে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার ভিতর তিন-তিনটা 'প্যান' আন্দোলনের সঙ্ঘাত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্যান্-শ্লাভিজম্। রুশিয়ার শ্লাভনীয় জাতি সার্ভিয়া ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শ্লাভদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বশ্লাভ-সম্মিলনের সূত্রপাত করিতে চাহেন। এই জন্যই জার্ম্মাণজাতিপুঞ্জ সমবেত হইয়া প্যান্-জার্ম্মাণ আন্দোলন খাড়া করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে
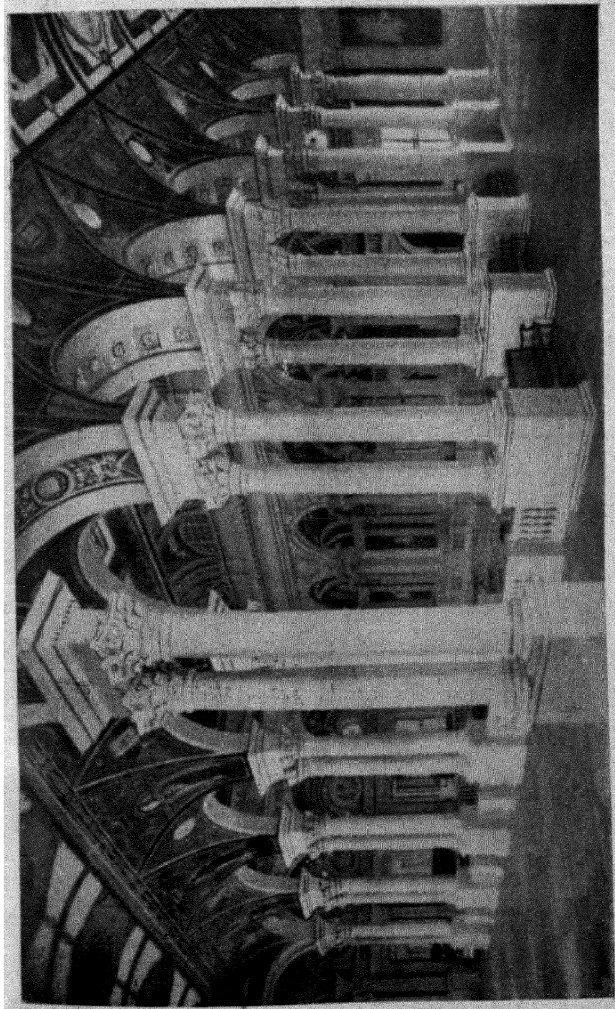
৩৬। কংগ্রেস-লাইব্রেরীর ভিতরকার দৃশ্য

প্যান্-ইংলিশ-সম্মিলনী স্থাপনের উদ্যোগও চলিতেছে। ইংরাজ পণ্ডিতেরা অষ্ট্রেলিয়া, ক্যাণাডা, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ইত্যাদি ইংরাজী ভাষাভাষী জনগণের সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের ইংরাজী ভাষাভাষী নরনারীকে বন্ধুত্ব-পাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্টিত। ইহাঁদের বিশ্বাস, এইরূপ একটা ইংরাজ-সম্মিলনী স্থাপিত না হইলে স্লাভসম্মিলনী কিম্বা জার্ম্মাণ-সম্মিলনী, কিম্বা ইস্‌লাম-সম্মিলনী, কিম্বা এশিয়া-সম্মিলনীর বিরুদ্ধে কোন ইংরাজ রাষ্ট্র, উপনিবেশ অথবা যুক্তরাষ্ট্র আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

ক্যাণাডা ইংরাজসাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশ। কাজেই ইহার পুরাপুরি স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা নাই। ইহার ভাগ্য ইয়োরোপের সঙ্গে জড়িত। এইজন্য আমেরিকা-সম্মিলনীতে ইহার স্থান নাই। আমেরিকা-সম্মিলনীতে উত্তর দক্ষিণ আমেরিকার ২০ টি ল্যাটিন রাষ্ট্র এবং ইয়াঙ্কিদের যুক্তরাষ্ট্র ঐক্যবন্ধনের উপায় আলোচনা করিয়া থাকেন। যুদ্ধবিগ্রহ না করিয়া যাহাতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ মিটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই প্যান্-আমেরিকান-ইউনিয়নের উদ্দেশ্য। ইয়োরোপের হেগ-নগরে দুনিয়ার সভ্যরাষ্ট্রসমূহ এই উদ্দেশ্যেই কন্‌ফারেন্স করিয়া থাকেন। আমেরিকার এই সম্মিলনী এবং হেগের আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক উভয় প্রতিষ্ঠানেই ধনকুবের কার্ণেগি অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন। পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কার্ণেগি একজন অগ্রণী। ইহাঁর অর্থেই ওয়াশিংটনের আমেরিকা-সম্মিলনীগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইয়াঙ্কিরা দক্ষিণ-আমেরিকা এবং উত্তর-আমেরিকার ল্যাটিন রাষ্ট্রসমূহ সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তাহারা একবার এই ইউনিয়নের গৃহে পদার্পণ করিলে সহজে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে। একটা মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী আছে। একখানা মাসিকপত্র সম্পাদিত হয়।

তাহা ছাড়া, সময়ে সময়ে নানাপ্রকার পুস্তিকা মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়া থাকে। একখানা পুস্তকের নাম "The Young Man's Chances in South and Central America." বা "দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় কর্ম্মের সুযোগ"।

ইউনিয়নের একটা প্রকোষ্ঠে কলাম্বাস-সম্পর্কিত নানাপ্রকার চিত্র, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। একখানা পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা দেখিলাম—ইহা মূল হইতে নকল। কলাম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া স্পেনিশ ভাষায় এক পুস্তিকা বা পত্র রচনা করেন। পরে তাহা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ল্যাটিনে অনূদিত হয়। সেই পুস্তিকার সম্পূর্ণ নামের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"Letter from Christopher Columbus to whom our age oweth much concerning islands of India beyond the Ganges, recently discovered. In the search of which he was sent eight months ago under the auspices and at the expense of the most invincible king of the Spains, Ferdinand. Addressed to the Noble Lord Rafal Sanchez, treasurer of the most grand king, which the noble and learned man Alexander de Cosco translated from Spanish idiom into Latin, the third day of the Calender of May 1493.

এই পত্রে জানা যায় যে, স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড কলাম্বাসকে আট মাস পূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৪৯২ অক্টোবর) গঙ্গানদীর অপর পারে অবস্থিত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করিতে পাঠাইয়াছিলেন। কলাম্বাস দৈবক্রমে আমেরিকায় উপস্থিত হন। আমেরিকাকেই তিনি
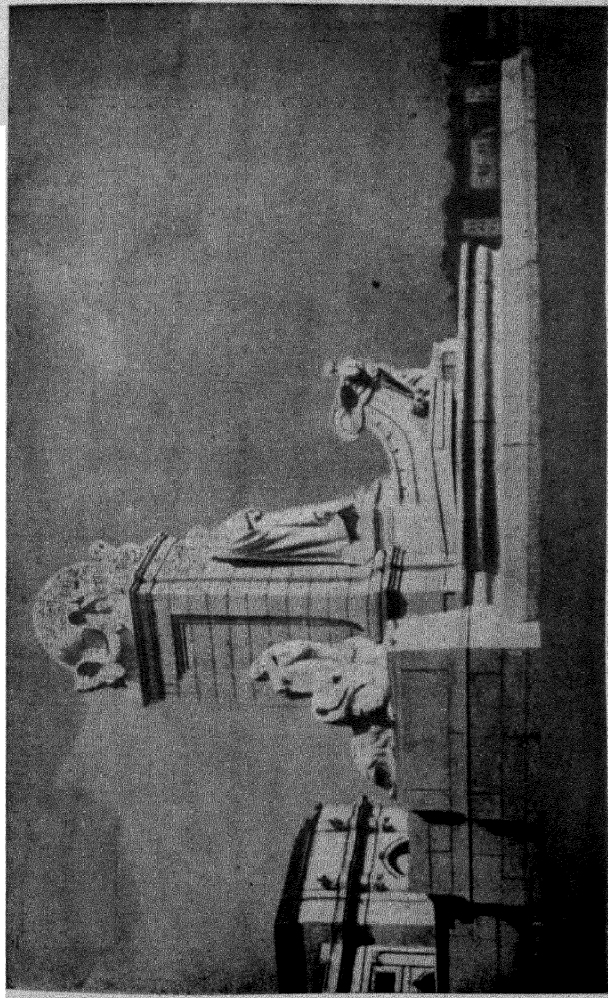
৩৭। নব ভূখণ্ডের পথপ্রদর্শক ভাবুক কর্ম্মবীর কলম্বাস

ভারতবর্ষ ভাবিয়াছিলেন। সেই অবাধ পৃথিবীতে দুইটা ভারতবর্ষ বা ইণ্ডিয়া।

আমেরিকা-সম্মিলনীর সংগ্রহালয় দেখিয়া "বিপ্লব-ললনা-সমিতি" দেখিলাম। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়ার কংগ্রেসে ইয়াঙ্কিরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাহার পর ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রাম চলে। এই সংগ্রামে তেরটা প্রদেশের লোক লিপ্ত ছিল। বর্ত্তমান কালের ইয়াঙ্কিরা সেই তেরটা প্রদেশকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। আমাদের পরিভাষায় বলিব যে, সেই প্রদেশসমূহের লোকেরা "কুলীন" বা "ব্রাহ্মণ" পদবাচ্য। পাশ্চাত্য মাপকাঠিতে উহাদিগকে য়্যারিষ্টক্রেসী বা অভিজাত বংশের অন্তর্গত করা হয়। যাহারা সেই যুগের স্বাধীনতাসমরে যোগ দিয়াছিল তাহাদের বংশধরগণ এইজন্য বিশেষভাবে গৌরববোধ করে। আজকাল ইয়াঙ্কিসমাজের রমণীরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহাদের বংশবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছেন। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারা সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। তাহার নাম বিপ্লব-ললনা-সমিতি (National Society of the Daughters of American Revolution). এই সমিতির গৃহে যাইয়া দেখি, তেরটা রাষ্ট্রের বহির্ভূত অন্যান্য রাষ্ট্রের মহিলারাও এই গৌরবরক্ষাকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। প্রদর্শক বলিলেন—"আজকাল সেই সকল বীরপুরুষগণের বংশধরেরা নানা রাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্য বহু দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতেও বিপ্লবযুগের স্মৃতিচিহ্ন ইত্যাদি আসিতেছে। কিন্তু যাঁহারা বিপ্লবকারীদিগের সন্তান নহেন তাঁহারা এই পরিষদের সভ্য হইতে পারেন না।"

বিপ্লব-ললনা-সমিতির পার্শ্বেই সুকুমার শিল্পভবন। ইয়াঙ্কি দম্পতি-গণের কার্য্য মন্দ নয়। এখান হইতে টাকশালের ভিতর যাওয়া

গেল। পর্য্যটকগণকে টাকা ও নোট তৈয়ারী করিবার প্রণালী দেখাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। তাহার পর ওয়াশিংটনের "বাকিংহাম প্যালেস"-স্বরূপ শ্বেতভবনে আসা গেল। ইহার ভিতরে আসিতে 'পাশ' দরকার হয়। শুনিলাম, আজ সভাপতি উড্রো উইল্‌সন ইয়োরোপীয় সংগ্রামের অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য মন্ত্রী ব্রায়্যানের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন। জার্ম্মাণির 'অসামরিক' (non-combatant) প্রজাবৃন্দকেও ভাতে মারিবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসী রাষ্ট্রদ্বয় নূতন বাণিজ্য-নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য উদাসীন দেশের ব্যবসায় নিতান্ত বাধাপ্রাপ্ত হইবে। উইল্‌সন জার্ম্মাণির শত্রুগণের এই নিয়ম বোধ হয় গ্রাহ্য করিবেন না।

খানিক দূর চলিয়া স্মিথসোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউশনে আসিলাম। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, ইত্যাদি নানা বিদ্যায় মৌলিক অনুসন্ধানের ফল মানব-সমাজে প্রচারিত করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। জগতের সর্ব্বত্র ইহাঁদের গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে। ইহাই এই পরিষদের বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের নানাস্থানেও স্মিথ্‌সোনিয়ান পরিষদের পুস্তকসমূহ প্রেরিত হয়। এই পরিষদের নূতন বিভাগের কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিলাম। ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়, আমি যদি আমার গৃহে একটা লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া আপনাদের নিকট পুস্তকের জন্য আবেদন করি তাহা হইলে কি আপনারা গ্রন্থগুলি পাঠাইয়া দিবেন?" ইনি বলিলেন—"আমরা কোন ব্যক্তিকে পুস্তক পাঠাই না। সমিতি, বিদ্যালয়, পরিষৎ, য়্যাক্যাডেমী, পাঠাগার, গ্রন্থশালা ইত্যাদির নিকট পুস্তক পাঠানই আমাদের উদ্দেশ্য। যাহাতে গ্রন্থগুলি সুপ্রচারিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা কার্য্য করি।"

স্মিথসোনিয়ান্-পরিষৎ তাঁহাদের গ্রন্থাবলী বিক্রয় করেন না। এই

সকল গ্রন্থে নব্য বিজ্ঞানসমূহের আবিষ্কারগুলি সন্নিবেশিত আছে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর গ্রন্থ বিশেষরূপেই আবশ্যক। বিনা পয়সায় এইরূপ উচ্চ সাহিত্যলাভের জন্য ভারতীয় লাইব্রেরী এবং কলেজের কর্ম্মকর্ত্তারা সচেষ্ট হইতে পারেন। এখানকার কর্ত্তাদের নিকট কয়েকটা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা দিলাম। যথাসময়ে ভারতবাসীরা পুস্তক-গুলি পাইবেন।

এই পরিষদ্-ভবনের নিকটেই বিউরো অব্ ফিশারি (Bureau of Fisheries)। এইখানে যুক্তরাষ্ট্রের মাছের চাষসম্পর্কিত সকল সংবাদ অবগত হইলাম। কর্ত্তা বলিলেন—"বাঙ্গালাদেশের একজন আমাদের নিকট মাছের চাষ শিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে ইলিশমাছের ডিম পুষিতে পারেন। সম্প্রতি আমরা ক্যালিফর্ণিয়া হইতে বহু ডিম পঞ্জাবে পাঠাইয়াছি, বোধ হয় এখনও পৌঁছে নাই। আমার বিশ্বাস মান্দ্রাজে মাছের চাষ ভাল হয়। সেখানকার শাসনবিভাগ হইতে নিকল্সনকে আমেরিকায় পাঠান হইয়াছিল। তিনি অনেক দিন এই অঞ্চলে থাকিয়া এই কার্য্য-পরিচালনা শিখিয়া গিয়াছেন। আজকাল কস্‌মস্-ক্লাবে একজন অষ্ট্রেলিয়ান বাস করিতেছেন। ইনি মাছের চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন।"

জার্ম্মাণি, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে মাছের চাষ করিয়া থাকে। কিন্তু ইয়াঙ্কিস্থানে গবর্মেণ্ট এই কার্য্য করিতেছেন। উত্তম ডিম বিনামূল্যে দুনিয়ার সর্ব্বত্র পাঠান যুক্তরাষ্ট্র একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন। ইহা একপ্রকার ভাবুকতা সন্দেহ নাই।

মাছের চাষ সম্বন্ধে নানা গল্প শুনিয়া ক্যাপিটল-ভবন এবং কংগ্রেসের গ্রন্থশালার ভিতর দেখিতে বাহির হইলাম। সংক্ষেপে সারা গেল। ময়দানের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত আসিলাম।

ইয়াঙ্কি-চরিত্র সমালোচনা

মৎস্য-পালন-বিভাগের কর্ত্তা বলিতেছিলেন—"মহাশয়, আজকাল বাজারে শ্যাড্ মাছ উঠিয়াছে। এই মাছ সমুদ্রে থাকে, এই ঋতুতে নদীতে উজান বহিয়া আসে। শ্যাড্ (shad) আপনাদের ঈলিশ।" এ কয়দিন ক্লাবে রোজই ঈলিশ মাছ ভাজা খাইতেছি! দেশ হইতে বাহির হইয়া প্রথম পাঁচ ছয় মাস পুরাপুরি নিরামিসাশী ছিলাম। ক্রমশঃ মাছ মাংস ধরিয়াছি—এখনও 'গবাদি' ধরিতে হয় নাই।

একজন শিক্ষিতা নিগ্রো রমণীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—এক্ষণে ওয়াশিংটনের এক কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। ইঁহার ভগ্নীরাও গ্র্যাজুয়েট এবং শিক্ষকতা করেন। ইঁহারা বহুকাল হইতে এই নগরের বাসীন্দা। ইঁহাদের গৃহ দেখিলাম—সাধারণতঃ শ্বেতাঙ্গদিগের গৃহে যে সমুদয় আসবাব পত্র দেখা যায় এখানেও তাহাই দেখিতে পাওয়া গেল। ইঁহাদের কথাবার্ত্তা চালচলন সবই অন্যান্য ইয়াঙ্কিদের মত। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা 'নিগ্রো' নাম পছন্দ করেন—না "কালার্ড" বা রঙ্গিন নাম পছন্দ করেন?" ইঁহাদের মতে নিগ্রো নামে কোন আপত্তি নাই কিন্তু কালার্ড (coloured) বলিয়া পরিচয় দিতেই ইঁহারা চাহেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" উত্তর পাইলাম—"আফ্রিকান অথবা নিগ্রো শব্দে খানিকটা বিদ্বেষ এবং দূরত্ব প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমরা আমেরিকার

সম্বন্ধ ছাড়িতে চাহি না। এ দিকে কালার্ড বলিয়া পরিচিত হইতে আমাদের কোন দুঃখ নাই—কারণ জাপানী চীনা ইত্যাদি পীতাঙ্গ জাতিরাও কালার্ড বা রঙ্গিন।

ময়দানে যাইয়া ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম দেখিলাম। যুক্ত-রাষ্ট্রের উদ্ভিদ্ জীবজন্তু প্রস্তর ধাতু ইত্যাদিই বিশেষরূপে সংগৃহীত। চিত্রসংগ্রহ এবং মূর্তিসংগ্রহও উল্লেখযোগ্য। চীনা ও জাপানী সুকুমার শিল্প বষ্টনের ন্যায় এখানেও পরিমাণে মন্দ নয়।

মিউজিয়ামে জাতিতত্ত্ব-বিভাগের কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ হইল। ইঁহার দেশ ইয়োরোপের বোহিমিয়ায়। ইনি শরীর বিষয়ক য়্যানথ্রপলজি (Physical Anthropology) বা সোমাটলজি (Somatology) বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। মিউজিয়ামে একটা মাথামাপার কারখানা আছে—এই কারখানায় ইনি গবেষণা করিয়া থাকেন। ইনি বলিলেন—"যদি ছয় সপ্তাহ আমার সঙ্গে কাটাইতে পারেন তাহা হইলে আপনাকে কিছু শিখাইয়া দিতে পারি। যাহাহউক দুএকদিনের ভিতর আমাদের অনুসন্ধান-প্রণালী কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন।" ইঁহার নাম হ্রেলিস্কা (Dr. Hrdlicka)।

ইয়াঙ্কি জাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দুইজন প্রসিদ্ধ লেখক দুই খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পর্য্যটকগণের 'আমেরিকা-ভ্রমণ' যেরূপ হয় এই দুই গ্রন্থ সেই ধরণের নয়। একটা জাতিকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বুঝিবার প্রয়াস গ্রন্থকারেরা দেখাইয়াছেন। বহুকাল ইয়াঙ্কি সমাজে বসবাসের পর ইঁহারা গ্রন্থরচনায় হাঁত দিয়াছেন। এই দুইখানা গ্রন্থই ভারতবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, বর্ত্তমান কালে আমেরিকার বিশেষত্ব ভারতবর্ষে বেশী আলোচিত হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশীয় সমাজকে বুঝিবার জন্য কিরূপভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত তাহাও

ভারতবাসীর জানা আবশ্যক। পুস্তক দুইখানা পাঠ করিলে এই দুই উদ্দেশ্যই সুসিদ্ধ হইবে।

মুন্‌ষ্টারবার্গের The Americans গ্রন্থে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—

ক। রাষ্ট্রের কথা (Political Life)—

১। কর্ম্ম-পরিচালনায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা (The Spirit of Self-Direction).

২। রাষ্ট্রীয় দল-বিভাগ ইত্যাদি (Political parties).

খ। বৈষয়িক কথা (Economic Life)—

১১। কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা (The Spirit of Self-Initiative).

১২। বৈষয়িক অভ্যুত্থান (The Economic Rise).

১৩। কয়েকটি সমস্যা (The Economic Problems).—

(ক) রূপার বাজার (The Silver Question).

(খ) শুল্ক-সমস্যা (The Tariff Question).

(গ) "ট্রাষ্ট" বা একচেটিয়া কারবার (The Trust Question).

(ঘ) মজুর-সমস্যা (The Labour Question).

গ। জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা (Intellectual Life)

১৪। চরম ব্যক্তিত্ব-বিকাশের আকাঙ্ক্ষা (The Spirit of Self-Perfection).

ঘ। পরিবার ও সমাজের কথা (Social Life)—

২১। দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা (The Spirit of Self-Assertion).

২২। নারী জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠা (The Self-Assertion of Women).

২৩। কৌলীন্য ও আভিজাত্য (Aristocratic Tendencies).

দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম The American People : A study in National Psychology. লেখক Maurice Law. মুন্‌ষ্টারবার্গ পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রিত চিত্ত-বিজ্ঞানের একজন ধুরন্ধর। কাজেই তাঁহার গ্রন্থেও এই গ্রন্থের ন্যায় জাতীয় চিত্তের বিশ্লেষণই করা হইয়াছে।

The American People দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগের নাম The Planting of a Nation. অর্থাৎ "দেশের গোড়া পত্তন" বা "বীজবপন"। ইহার সূচীপত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

২। ইয়াঙ্কি ধমনীতে নবীন রক্ত (The American People a new Race).

৩। জাতি-সংগঠনে বিশ্বশক্তির প্রভাব (The Influence of Environment on Race).

৪। জলবায়ুর গুণে জাতি-সংমিশ্রণ (Climatic Amalgamation of Race).

৮। ধর্ম্ম-প্রভাবে স্বরাজ বা গণতন্ত্র (Puritanism gives birth to Democracy)

১০। ইয়াঙ্কি রক্তে বিপ্লব ও বিদ্রোহের বীজ (The American has always been a rebel).

১৪। তামাক চাষের প্রভাবে "দাসত্ব"-প্রথা (Tobacco and Slavery).

১৭। ধানের চাষে সামাজিক যুগান্তর (Rice produces new Social coditions).

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম The Harvesting of a Nation অর্থাৎ "দেশ-সৌধ-প্রতিষ্ঠা" বা "শস্য-কর্ত্তন"। ইহার কয়েক অধ্যায় নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

৫। রাষ্ট্র-কেন্দ্রহীন মহাদেশ (A country without a capital).

১২। শাসন-ব্যবস্থা (The constitution).

১৪। ইয়াঙ্কি নরনারীর বে-আইনি স্বভাব (Why the American people have a contempt for Law).

১৫। মার্কিন সমাজে বারোয়ারির প্রভাব (The Influence of Immigration on American Development).

১৯। ঘরোয়া লড়াইয়ের ফল (The effect of the Civil War on National Psychology).

২০। স্পেন-যুদ্ধের প্রভাব (The Psychological Influence of the Spanish War).

বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে হইলে দুনিয়ার বিচিত্র মানবসভাগুলির পরিচয় লইতে হইবে। তাহার জন্য বিশেষরূপে নিজকে প্রস্তুত করা আবশ্যক। প্রথমতঃ তথ্য দেখিবার দৃষ্টি থাকা চাই। অধিকন্তু সেই সমুদয় বুঝিবার ক্ষমতা থাকা চাই। আমেরিকা-বিষয়ক গ্রন্থ দুইখানা এবিষয়ে ভারতবাসীকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

নিগ্রোপরিবারে কাফি-পান

নৈশভোজনের পর নিগ্রোগৃহে নিমন্ত্রণ ছিল। পরিবারে তিন ভগ্নী এবং এক ভ্রাতা। সকলেই শিক্ষিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—প্রত্যেকেই শিক্ষকতা করেন।

যুবকের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, তিনি একখানা জার্ম্মাণ বই পড়িতেছেন। ইনি ইয়োরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে জার্ম্মাণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। ভারতবর্ষের অনেক কথাই ইঁহার জানা আছে। পূর্ব্বে এতটা আশা করি নাই। মনসুন বাতাস হইতে আরম্ভ করিয়া হকি, ক্রিকেট, 'চেস', কিপ্লিঙ্গের Kim ও Jungle Book পর্য্যন্ত নানা কথার আলোচনা হইল। উচ্চশিক্ষিত ইংরাজ অথবা ইয়াঙ্কি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারেন এই নিগ্রো যুবক তাহা অপেক্ষা বেশী জানেন বোধ হইল। ইঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও কোন ভারতবাসীর দেখা হয় নাই। মাসিক পত্র এবং পুস্তক পাঠ করিয়া ইনি ভারতবর্ষের সংবাদ রাখিয়া থাকেন।

ভ্রাতার পাঠাগারে জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসিয়া কথোপকথনে যোগ দিলেন। ইনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—সম্প্রতি এক হস্তশিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। ইনি প্রথমেই বলিলেন, "মহাশয়, আমি ঘোরতর ইয়াঙ্কি। গত গ্রীষ্মের সময়ে আমি ইয়োরোপে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। প্যারি, লণ্ডন, এডিনবারা ইত্যাদি নানা নগর দেখিলাম—কিন্তু ওয়াশিংটনকে ভুলিতে পারি নাই। আমেরিকার মায়া ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব।" ইনি ধর্ম্মচর্চ্চা কিছু বেশী করেন—ইঁহার গলায় যীশুখৃষ্টের ক্রস ঝুলিতেছিল।

পাঠাগারের আসবাব-পত্র ছবি, ফটো ইত্যাদি সবই উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গদের অনুরূপ। ইহাঁদের ধরণধারণ, কথা বলিবার ভঙ্গী, গলার আওয়াজ কোন বিষয়েই নূতনত্ব লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় ভগ্নী আসিয়া বলিলেন—"বৈঠকখানায় আমাদের বন্ধু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" সকলে মিলিয়া নীচে নামিয়া গেলাম। বন্ধুর সঙ্গে করমর্দ্দন হইল। বুঝা গেল, এই অভ্যাগত রমণী নিগ্রো—কিন্তু গায়ের রং অথবা চুলের গঠন কিম্বা মুখের আকৃতি দেখিয়া বিন্দুমাত্র এরূপ সন্দেহ হইতে পারে না। নিগ্রোগৃহে ইহাঁর সঙ্গে দেখা না হইলে ইহাঁকে শ্বেতাঙ্গ ইয়াঙ্কি রমণীই মনে করিতাম।

এই শ্বেতাঙ্গপ্রায়া নিগ্রোরমণী বলিলেন—"মহাশয়, আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাবলী পাঠ করিয়া থাকি। ভারতবর্ষের আর কোন কথা জানি না।" ইতিমধ্যে আর একজন গ্র্যাজুয়েট রমণী উপস্থিত হইলেন। ইনি বলিলেন—"আমি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রকে চিনিতাম। তাঁহাদের নিকট ভারতবর্ষের কথা শুনিয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা ভারতবর্ষের বিষয় জানিতে চাহেন কেন?" ইহাঁরা বলিলেন—"আজকালকার দিনে দুনিয়ার সংবাদ না রাখিলে শিক্ষিত হওয়া যায় কি? পৃথিবীর আয়তন যেন ছোট হইয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষ ত ঘরের কোণে! কাজেই প্রতিবেশীর কথা জানিয়া রাখা নিতান্তই স্বাভাবিক।"

ক্রমশঃ দুই জন পুরুষ আসিলেন। একজন ইতিহাস-শিক্ষক। আর একজন বিদ্যালয়-পরিদর্শক। ইনি যুক্তরাষ্ট্রের গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহাদের শাসিত ফিলিপাইন দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পরিদর্শক মহাশয় তিনবৎসর ম্যানিলায় ছিলেন। তাহার পর ভারতবর্ষ দেখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষে দুইমাস কাটাইয়া

ছিলেন। মণ্ডালে, রেঙ্গুন, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, কলম্বো ইত্যাদি নগরের কোন কোন কথা ইঁহার মনে আছে। ইনি খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কথা এবং ইউরোপীয়ানদের কথা পাড়িলেন। কালীঘাটের পাঁঠাবলি সম্বন্ধে বলিলেন, "প্রাচীন ইহুদিরাও এইরূপ করিত।"

বৈঠকখানা হইতে ভোজনালয়ে যাওয়া গেল। যথারীতি কাফি পান করা হইল। নানাপ্রকার গল্প চলিতে লাগিল। সর্ব্বসমেত তিন ঘণ্টা কাটাইলাম—কিন্তু একটা নূতন জাতীয় নরনারীর সঙ্গে কথা চলিতেছে বুঝা গেল না। সর্ব্বসমেত ৮।১০ জন লোক উপস্থিত—কাহারও নিকট এই দীর্ঘকালের ভিতর এমন কিছু পাইলাম না যাহাতে মনে হইতে পারে যে, কোন নিকৃষ্ট সমাজের মধ্যে বসিয়া আছি। বর্ত্তমান কালে জগতের সর্ব্বত্র ন্যূনাধিক পরিমাণে এক ধরণের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহার প্রভাবেই ইয়াঙ্কিস্থানের শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ এবং শিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। সর্ব্বত্র চিন্তা-প্রণালীর একটা সমতা সৃষ্ট হইয়াছে।

যে কয়জন নিগ্রোজাতীয় লোকের সঙ্গে দেখা হইল তাঁহাদের কেহই পূরাপূরি কৃষ্ণাঙ্গ নহেন। এমন কি, ইঁহাদের কাহাকেও খাঁটি নিগ্রো বলা চলে না। ইঁহাদের গায়ের রং সাধারণ ভারতবাসীর অনুরূপ। পুরুষগণের চুল অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুদ্র মেষের লোমের মত কুঞ্চিত। ইয়াঙ্কিস্থানে নিগ্রোসংখ্যা এক কোটি—তাহার মধ্যে খাঁটি কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো মাত্র পঁচিশ লক্ষ। অবশিষ্ট নিগ্রোরা এই নিগ্রোপরিবারের ন্যায় দো-আঁস্‌লা।

বহুত্ব, অনৈক্য ও ভেদবুদ্ধি

বাঙ্গালী আজকাল কোন একজন লোককে গুরু মানিয়া চলে না। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির একছত্র আধিপত্য নাই। সাহিত্যের আসরেও কোন ব্যক্তিবিশেষের মত বিনাবাক্যব্যয়ে স্বীকৃত হয় না। সর্ব্বত্র সকল বিভাগেই বহুনায়কতার যুগ চলিতেছে। অনেক ব্যক্তি নেতৃস্থানীয়, অনেক ব্যক্তি বীরপদবাচ্য, অনেক ব্যক্তি পূজার্হ, অনেক ব্যক্তি পথপ্রদর্শক, অনেক ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য বিবেচিত হইতেছেন। সাহিত্যে, শিল্পে, শিক্ষাক্ষেত্রে, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে, সংবাদ পত্রের পরিচালনায়, কর্ম্ম-কেন্দ্র গঠনের প্রয়াসে নানা কর্ম্মী ও চিন্তাশীল নর-নারীর কৃতিত্ব দেখিতে পাই—ন্যূনাধিক পরিমাণে একসঙ্গে বহু লোক যশস্বী হইতেছেন এবং জনগণের সম্মান পাইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন স্থান বিশেষের মাহাত্ম্যও আজকাল স্বীকৃত হয় না। কোন নগর বা জেলাকে বাঙ্গালীরা একমাত্র চিন্তাকেন্দ্র অথবা একমাত্র কর্ম্মকেন্দ্র অথবা গুরুস্থানীয়' বিবেচনা করে না। কলিকাতার প্রভুত্ব বাঙ্গালী সমাজ হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে মফঃস্বলের পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে বিভিন্ন জীবনকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন একটা কর্ম্মের আন্দোলন রাজধানীতে উদ্ভূত হইলেই যে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র তাহা অনুসৃত হইবে এমন কোন কথা নাই। বরং জেলায় জেলায় যে সব আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহাই ক্রমশঃ রাজধানীতে আসিয়া পৌছে। মফঃস্বলের বাণী কলিকাতার বাণী অপেক্ষা নিম্নস্থান প্রদত্ত হয় না। সেইরূপ একমাত্র তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণই আজকাল

জনসাধারণের শ্রদ্ধার্হ নহেন। অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ নরনারীর কর্ম্মশক্তি ও চরিত্রবল উচ্চশিক্ষিত মহলে আদৃত হইতেছে। বঙ্গীয় নেতৃগণের মধ্যে তথাকথিত অশিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সংখ্যাও কম নয়। জাতীয় চিন্তাসম্পদ ও কর্ম্মশক্তি দেশের নানা স্থানে নানা কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহুবিধ পরিষৎ, সম্মিলন, সমিতি, ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা এই শক্তি-বিকীরণের অন্যতম লক্ষণ। এই জন্যই হার্ভার্ডে থাকিতে থাকিতে মনে হইতেছিল যে, বাঙ্গালীর জীবন দার্শনিক জেম্‌সের প্লুর‍্যালিজম্ বা "বহুত্ব"-বাদ প্রচারিত করিতেছে। সুতরাং ইহাঁর Pluralistic Universe এবং Varieties of Religious Experience নামক গ্রন্থদ্বয় বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইবার যোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ংই বহুত্ব, অনৈক্য ও ভেদবুদ্ধির দেশ। এখানে কোন এক কেন্দ্রের আধিপত্য দেখিতে পাই না। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ বা যুক্তরাষ্ট্রের নামে ইউনিটি অর্থাৎ ঐক্যের গন্ধ যথেষ্টই আছে। কিন্তু এখানে ঐক্য বেশী প্রবল, কি অনৈক্য বেশী প্রবল বিচার করা কঠিন। নামের মধ্যেই ষ্টেটস শব্দে বহুবচনের ব্যবহার লক্ষ্য করিলেই প্লুর‍্যালিজম্ বা বহুত্ব প্রতীয়মান হইবে। বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্রকে বহুত্ব, বৈচিত্র্য, বহু কেন্দ্রীকরণ, ডিসেণ্ট্র্যালিজেশন (decentralisation) "জনপদগত স্বতন্ত্রতা" ইত্যাদির প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করিতেই প্রবৃত্তি হয়। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক নগর নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা সেরা বিবেচনা করে—সকলেই 'আপসে আপ্' চলিতেছে—কেহই কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। নিউইয়র্ক নিজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর মনে করে। শিকাগো এবং স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো নগরের লোকেরা নিউইয়র্ককে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে। বষ্টনের আস্পর্দ্ধা বষ্টনের বাহিরে নিন্দিত হইয়া থাকে।

সকলেই বলে—"আমাকে দেখ।" এই জন্যই যুক্তরাষ্ট্রকে লোকে "A country without capital" অর্থাৎ কেন্দ্রহীন সমাজ বলিয়া জানে। এখানে এমন কোন নগর নাই যাহাকে দেশের হৃৎপিণ্ড অথবা জাতির মস্তিষ্কস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। বিলাতে যেরূপ লণ্ডন, ফ্রান্সে যেরূপ প্যারি, রুশিয়ায় যেরূপ পেট্রোগ্রাড, জার্ম্মাণিতে যেরূপ বার্লিন, যুক্তরাষ্ট্রে সেরূপ কোন নগর নাই। কোন এক নগরে ঘা লাগাইলে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র আন্দোলন পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। বষ্টন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ইত্যাদি সবই স্বস্ব প্রধান।

যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে এই ধরণের কথাই Marice Law বলিতেছেন:—
"We are to study the history of a people who from their beginning and up to the present day have never had a capital, in which there has never been one great centre to which gravitated by the natural force of attraction all that was best and worst, which held the highest intellectual and social development, which set for the whole country the fashions, to which men turned as irresistibly in search of fame or fortune as in the time of Cœsar every Roman looked to Rome, or as in our own day, every provincial, who has only his courage and brains to inspire him, goes up to London to begin his conquest of the world, or the Frenchman of the departments set out for Paris hopeful of grasping the end of the rainbow. It is true that there is today in the United States a political capital, a commercial

metropolis, and numerous local political and commercial centres and it is equally true that from the beginning, in colonial times and until the Revolution, each colony had its seat of government in Massachusetts, Boston; in Maryland, Annapolis; in the Carolines, Charleston, and so on—just as today each state has its capital; but that is entirely different from Rome or London or Paris."

এই অনেককেন্দ্রীকরণের দৃষ্টান্ত ত্রিশ কোটি নরনারীর ভারতে বিশেষরূপেই ধ্যান করা উচিত। পরস্পর পরস্পরকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনের স্বভাব গভীর ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রাদেশিকতা, জনপদগত স্বতন্ত্রতা, ব্যক্তিত্ব, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি নিতান্ত অবহেলার বস্তু নয়। পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর না করাই পরস্পর পরস্পরকে যথার্থ সম্মান করিবার উপায়। হিন্দুসমাজে বহু দেবদেবীতত্ত্ব, সম্প্রদায়-ভেদ, রীতি নীতির বৈচিত্র্য, ব্যক্তিগত সাধন-প্রণালীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, 'বার মাসে তের পার্ব্বণ,' তীর্থক্ষেত্রের বহুত্ব কেন সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। এইরূপ বৈচিত্র্য, বহুত্ব, অনৈক্য ও জটিলতার সমাজেও কি উপায়ে বৈদান্তিক ঐক্য, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদির জয় জয়কার চলিতেছে তাহা দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের রীতিতে বুঝিবার সময় আসিয়াছে। একদিকে নানা মুনির নানা মত, এবং নিত্য নূতন দেবতার পূজা, অপরদিকে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সখ্য, সহানুভূতি ও পরস্পর সম্মান—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য যে জাতি করিতে পারিয়াছে তাহারা রাষ্ট্রমণ্ডলের ডিসেণ্ট্র্যালিজেশন বা বহুকেন্দ্রীকরণ এবং *Laisser faire* অর্থাৎ

অবাধ বিকাশ ইত্যাদি মার্কিণের মূলকথা সহজেই হজম করিতে পারিবে। একটা তথাকথিত 'ইউনিটি,' 'ন্যাশন্যাল', একতা-স্থাপন ইত্যাদি ফর্ম্মুলার প্রভাবে ভারতবাসীর বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই। মানব-স্বভাবের দিকে এবং দেশের জলবায়ুর দিকে লক্ষ্য রাখিলেই ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এই হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রর ফেডার‍্যাল শাসন-প্রণালী হিন্দুস্থানী নরনারীর পক্ষে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ ও দৃষ্টান্তস্বরূপ।
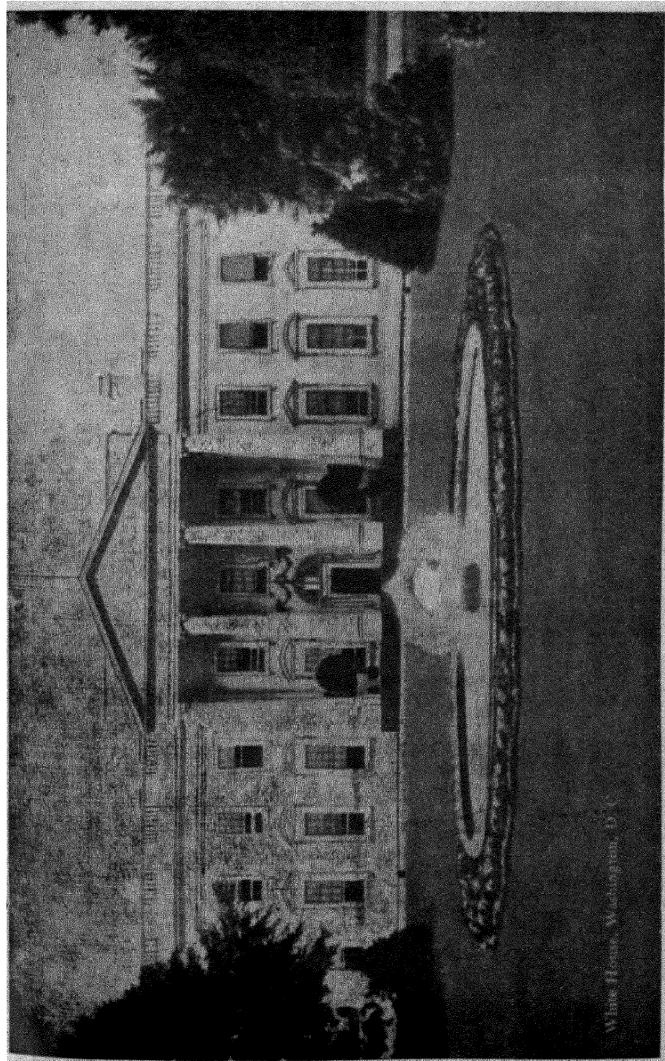
৩৮। প্রেসিডেন্ট-প্রাসাদ ("শ্বেত-প্রাসাদ")

শ্বেত-প্রাসাদে রোমাঞ্চ

লণ্ডনের পার্ল্যামেণ্টগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মনে হইয়াছিল—"দুনিয়ার সকল পার্ল্যামেণ্টের সূতিকাগারে পদার্পণ করিতেছি।" ইংরাজজাতির মহাসমিতি জগতের সর্ব্বপুরাতন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—ইহাই অন্যান্য পার্ল্যামেণ্টের জন্মদাত্রী।

বর্ত্তমান সংগ্রামের প্রারম্ভে বাকিংহাম প্রাসাদের সম্মুখে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাগম দেখিয়াও রোমাঞ্চিত হইয়াছি। ভাবিতাম—"এই জাতি রাজা ও রাণীকে কার্য্যতঃ ক্ষমতাহীন ও অধিকারহীন এবং সকল উপায়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। অথচ হৃদয়ে হৃদয়ে ইহাদের রাজভক্তি কি অসীম!" ইংরাজসমাজে রাজা প্রকৃতপক্ষে পুতুল ও খেলনার সামগ্রী মাত্র—অথচ রাজপরিবারকে দেখিবার জন্য, রাজপ্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইবার জন্য, রাজারাণীর মূর্ত্তি সংগ্রহ করিবার জন্য জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যগ্র। রাজপূজা সত্য সত্যই ইংলণ্ডবাসীর মজ্জাগত।

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট-প্রাসাদে পদার্পণ করিয়াই এক বিচিত্র মনোভাবে পূর্ণ হইয়া গেলাম। ইয়াঙ্কিরা রাজারাণী নামে কোন পদার্থ বুঝিতেই পারেন না। 'রাজ'শব্দটা পর্য্যন্ত ইহাঁদের অভিধানে পাওয়া যায় না। রাস্তা হইতে রামাশ্যামার মত একটা লোক কুড়াইয়া আনিয়া এই জাতি তাহাকে দেশের কর্ত্তা করিয়া তোলে। অথচ তাহার ক্ষমতা অত্যধিক—বিলাতের রাজা কোন দিন যে সকল অধিকারের কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না ইয়াঙ্কিদের প্রেসিডেন্টের পক্ষে সেই সমুদয় অধিকার স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ। ইংলণ্ডের রাজা রাজবংশে জন্মিয়াও সামান্য

ব্যক্তি অপেক্ষা ক্ষমতাবান্ নহেন। আবার ইয়াঙ্কিদের প্রেসিডেণ্ট একজন সাধারণ ব্যক্তি হইয়াও রাজবংশসম্ভূত নৃপতি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্। ইংরাজ ও ইয়াঙ্কি দুই জাতিই মোটের উপর বিলাতী পূর্ব্বপুরুষগণের সন্তান। দুই জাতিই ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক শাসনের অধীন ছিল। দুই জাতির মাতৃভাষাও এখন পর্য্যন্ত একই। অথচ রাষ্ট্রীয় জীবনে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য! ইংরাজ-চরিত্র ইয়াঙ্কি বুঝিতে পারে না—ইয়াঙ্কি-চরিত্র ইংরাজ বুঝিতে পারে না।

আমাদের দেশে ফরিদপুর জেলার এক নমঃশূদ্রের ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করা যাউক। পল্লী-পাঠশালায় বিদ্যালাভের পর সে যেন নগরের উচ্চ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। ক্রমশঃ দেশের উচ্চতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কৃতিত্ব দেখাইয়া যশস্বী হইল। ধরা যাউক এই উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কোন বিদ্যালয়ে মাষ্টারী আরম্ভ করিল। মাষ্টারী করিতে করিতে কলেজের অধ্যাপক হইল—শেষ পর্য্যন্ত চরিত্রবলে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব পর্য্যন্ত জুটিল। ফরিদ-পুরে বাল্যজীবন কাটাইয়া এই নমঃশূদ্র যেন কলিকাতায় যৌবনকাল কাটাইয়াছে—অবশেষে মান্দ্রাজের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি বা চান্সেলার পদে বৃত হইয়াছে। এই সময়ে ঘটনাচক্রে তাহাকে দিল্লীতে যাইয়া অথবা বোম্বাই নগরে বসিয়া সমগ্র ভারতের শাসনভার বহন করিতে হইল। গোটা ভারতের লোক যেন তাহাকে এই গুরুদায়িত্ব প্রদান করিল। কয়েক বৎসর এই কার্য্য করিবার পর সে আবার একজন অধ্যাপক হইল। এই চিত্র কল্পনা করিতে পারিলে ইয়াঙ্কি-যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিত্ব বুঝিতে পারিব। দেশে বসিয়া, কেতাব পড়িয়া, এই চিত্র বহুবার কল্পনা করিয়াছি। কিন্তু ওয়াশিংটনের 'হোয়াইট হাউসে' প্রবেশ করিবামাত্র সত্যটা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিলাম—শরীর

৪৬৭ পৃষ্ঠা

৩৯। যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক উড্রো উইলসন

রোমাঞ্চিত হইয়া গেল। স্থূল জগতে সপ্তম আশ্চর্য্য, অষ্টম আশ্চর্য্য ইত্যাদির গল্প শুনা যায়—এবং সেগুলি চোখে দেখিয়াও পুলকিত হওয়া যায়। কিন্তু ভাবরাজ্যের মধ্যেও বিস্ময়জনক তথ্য কম নাই। ইয়াঙ্কি-স্থানের শ্বেত-প্রাসাদ সেই বিস্ময়, পুলক ও রোমাঞ্চের মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গৃহের ভিতরে তাজমহলের গৌরব নাই—বাকিংহাম প্রাসাদেরও ঐশ্বর্য্য নাই। অথচ ইহার সঙ্গে তুলনা করিবার যোগ্য দ্বিতীয় ভবন পৃথিবীতে নাই। সত্যসত্যই, "এমন ঘরটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি।" ইয়াঙ্কি রিপাব্লিকের পর ফরাসী বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্র শাসনের সূত্রপাত। ইয়াঙ্কিরাই জগৎকে এই প্রেসিডেণ্ট-তত্ত্ব দান করিয়াছে।

হয় ত ইয়াঙ্কিস্থানের সভাপতিত্ব ইয়োরোপে অথবা এশিয়ায় অনুকরণ করা অসম্ভব। হয় ত নানা ঐতিহাসিক কারণে ইংরাজ বা জার্ম্মাণ, জাপানী বা রুশ ইয়াঙ্কি সভাপতির মত একজন দেশের কর্ত্তা নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না। ভারতবাসীর পক্ষে ইহা কোন মতেই বুঝিয়া উঠা হয় ত সুকঠিন। কিন্তু হৃদয়বান্ মানুষ মাত্রেই এই দৃশ্য দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

"কৃষ্ণাঙ্গ মহাল্লায়" অর্দ্ধদিন

কাল ফেডার‍্যাল রাষ্ট্রের শ্রমজীবি-বিভাগের একজন কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। বিলাতী পরিভাষায় ইনি মন্ত্রিস্থানীয়। ইনি বলিলেন,—"মহাশয়, আমরা মন্ত্রী বটে—কিন্তু বিলাতী মন্ত্রীদিগের ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা প্রেসিডেণ্টের সহকারীমাত্র। কংগ্রেসের কার্য্যপরিচালনায় আমাদের কোন হাত নাই—আমরা কংগ্রেসের কোন সভায় বসিতে পর্য্যন্ত পারি না।" ইহাঁর নিকট শ্রমজীবিবিভাগ এবং ব্যবসায়-বিভাগের কার্য্যক্ষেত্র বুঝিয়া লওয়া গেল।

যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেটিষ্টিক‍্স্ বা তথ্যসংগ্রহ-বিভাগের একজন কর্ত্তার সঙ্গেও কথাবার্ত্তা হইল। ইনি পূর্ব্বে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক ছিলেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি উড্রোউইলসনই বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রহিয়াছেন।

আজ কস‍্মস্-ক্লাবে মৎস্যপালন-বিভাগ, তথ্যসংগ্রহ-বিভাগ এবং ব্যবসায়-সম্পর্কীয় বিচারালয়-বিভাগের কর্ত্তাদের সঙ্গে ভোজন করা গেল। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম—যুক্তরাষ্ট্রের নব নব নিয়মে প্রদেশগুলির ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে—নানা উপায়ে ফেডার‍্যাল দরবারের কর্ম্মক্ষেত্র বাড়িতে চলিয়াছে। বিশেষতঃ ফিলিপাইন দ্বীপ অধিকারের পর ইয়াঙ্কিরা ক্রমশঃ সাম্রাজ্যনীতির পক্ষপাতী হইতে সুরু করিয়াছে।

খাওয়াদাওয়ার পর নগরে নিগ্রোটোলায় বেড়াইতে গেলাম। নিউ-ইয়র্ক ও বষ্টনে বেশী নিগ্রো চোখে পড়ে নাই। কিন্তু ওয়াশিংটনে রাস্তায়-ঘাটে গণ্ডায়-গণ্ডায় কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। যতই দক্ষিণ

অঞ্চলে যাইব ততই নিগ্রোসংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। ওয়াশিংটন এই হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্ত্তী জনপদ।

হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ ছিল। হাওয়ার্ড একজন ইয়াঙ্কি শ্বেতাঙ্গ। ইনি ১৮৬১-৬৫ খৃষ্টাব্দের সিভিল ওয়ার বা ঘরোয়া বিবাদের সময়ে জীবিত ছিলেন। তাহাতে দক্ষিণপ্রান্তের রাষ্ট্রসমূহ পরাজিত হয় এবং তাহাদের গোলামস্বত্বাধিকারীরা দাসজাতিকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হন। হাওয়ার্ড মুক্তিপ্রাপ্ত দাসজাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন। তাঁহার প্রারব্ধ অনুষ্ঠানই ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ কৃষ্ণাঙ্গদিগের জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণাঙ্গ সম্পাদক কুক একজন কর্ম্মঠ উৎসাহশীল ব্যক্তি। বুকার ওয়াশিংটন ইত্যাদি কর্ম্মবীরের চরিত্র কুকের ভিতর আছে বোধ হইল। ইহাঁর পত্নীও শিক্ষাসংক্রান্ত নানা আন্দোলনে লিপ্ত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে খানিকক্ষণ কাটাইয়া সপত্নীক কুকের সঙ্গে বাহিরে আসিলাম। কুক বলিলেন—"আজ এখানে একটা বড় উৎসব হইবে, চলুন দেখিয়া আসি।"

ওয়াশিংটন নগরের মধ্যস্থলে "সেণ্ট্রাল হাই স্কুল" অবস্থিত। ইহা ফেডার‍্যাল রাষ্ট্রের অধীনে পরিচালিত হয়। প্রধানতঃ শ্বেতাঙ্গ বালক বালিকারা এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। সম্প্রতি চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণ আরব্ধ হইয়াছে। আজ তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। এই উপলক্ষ্যে বিরাট সভা। যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম—নানা শ্রেণীর নরনারী মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ফেডার‍্যাল রাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তারা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ এবং কংগ্রেসের কোন কোন বড় সভ্য বক্তৃতা করিলেন। তিন চারি মিনিটের বেশী কাহারও বক্তৃতা হইল না। বক্তারা

সকলেই প্রায় একস্বরে কথা বলিয়া গেলেন। "এতটাকা খরচ করা হইতেছে—কিসের জন্য? ছাত্রছাত্রীরা সকলেই উপযুক্ত সিটিজেন বা স্বদেশসেবক হইতে পারিবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কন্‌ষ্টিটিউশন বা শাসন-প্রণালী সম্মান করিয়া জীবন যাপন করিতে শিখিবে"—সকলের মুখেই এই আশা ও উপদেশ প্রচারিত হইল। প্রিন্সিপ্যাল ছাত্র ও ছাত্রীগণ এবং শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ বিদ্যালয়ের নিজস্বগীত গাহিলেন। এই সকল দেশে প্রত্যেক বিদ্যালয়েরই এক একটা 'খাস' গান আছে। তাহার পর কংগ্রেসের সভ্যগণ, অন্যান্য ফেডার‍্যাল কর্ত্তারা এবং সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলী মিলিত হইয়া আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত গাহিলেন।

সভাভঙ্গের পর কুক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। চিকিৎসকের মোটরে চড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিলাম। চিকিৎসক মহাশয় একটা নিগ্রো হাঁসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক। তাহার ভিতর যাইয়া কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়া দিলেন। প্রায় ৩৫০ রোগী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। পুরুষ, রমণী, শিশু ইত্যাদির জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কামরা রহিয়াছে। আমেরিকায় হাঁসপাতাল যেরূপ হওয়া উচিৎ ইহা সেইরূপই দেখিলাম। ডাক্তার বলিলেন—"দুই একজন শ্বেতাঙ্গ ধাত্রী আমাদের এখানে কাজ করেন। ইহা একটা নূতন তথ্য। কারণ শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়া কাজ করিতে চাহেন না।"

হাঁসপাতাল হইতে চিকিৎসক নগরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পথে দুই একঘর রোগী দেখা হইল—আর একজন কৃষ্ণাঙ্গ চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল। পরে ইনি দুই তিনজন আত্মীয়ার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা শিক্ষকতা করেন।

মানবজগতে জাতি-বিভাগ

ভাষা হিসাবে মানবসমাজ নানা জাতিতে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে "আর্য্য" জাতি অন্যতম। আর্য্যজাতি বলিলে শুদ্ধচরিত্র, পবিত্রাত্মা অথবা বিশেষ কোন প্রকার শারীরিক গঠনযুক্ত নরনারীর সঙ্ঘ বুঝায় না। বিশেষ একপ্রকার ভাষার নাম আর্য্য। সেই ভাষাভাষী জনগণকে আর্য্যজাতিভুক্ত করা হয়। এই শব্দে রক্তের বিশুদ্ধতা অথবা সংমিশ্রণ ইত্যাদি কিছুই বুঝা যায় না।

পৃথিবীতে কোন ধরণের বিশুদ্ধ রক্তবিশিষ্ট জাতি আছে কিনা সন্দেহ। মানব সমাজের সকল জাতিই হাইবৃড (hybrid) বা দো-আঁসলা। রক্ত হিসাবে, চেহারা হিসাবে, শরীরের গঠন হিসাবে, মাথার পরিধি হিসাবে এই দো-আঁসলা জাতিগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা অসম্ভব নয়। এইরূপে জাতি নির্ণয় করাই শরীর বিষয়ক নৃতত্ত্বের (Physical Anthropology) কার্য্য।

ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামে ডাক্তার হ্রেলিস্কারের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাইলাম। ইনি প্রথমে তাঁহার লাইব্রেরী দেখাইলেন। একটা ছোট ঘরের ভিতর অনেক জিনিষ দেখা গেল। হ্রেলিস্কা বলিলেন—"মহাশয়, আমাদের বিজ্ঞানটা এখনও শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। এ বিষয়ে গ্রন্থ বেশী রচিত হয় নাই। নানা মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রে প্রবন্ধাদি বাহির হয়—তাহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারিত হয়। আমার নিকট এইরূপ পুস্তিকা সহস্র সহস্র জমা হইয়াছে। এইগুলি নানা ভাষায় লিখিত। এই সমুদয় সাজাইয়া রাখিবার জন্যই যথেষ্ট খাটিতে হইয়াছে।

আমেরিকার সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, কোন লাইব্রেরীতে মুদ্রিত ক্যাটা-লগ বা গ্রন্থ-তালিকা থাকে না। লাইব্রেরীয়ানগণ বলেন—"পুস্তকাকারে ক্যাটালগ থাকিলে বড় অসুবিধা হয়—কারণ প্রতিদিন নূতন নূতন বই বাহির হইতেছে—সেগুলি বর্ণমালানুসারে যথাস্থানে রাখিতে হইলে রোজই পুস্তক বদলান আবশ্যক হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে কার্ড-ক্যাটালগ ব্যবহার করাই ভাল। পুস্তকের নাম ও বিবরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ডে লিখিলে কার্ডগুলি বর্ণমালানুসারে সাজাইলেই চলিতে পারে। নূতন নূতন পুস্তকের জন্য নূতন নূতন কার্ড লিখিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা সহজ।"

হ্রেলিস্কার লাইব্রেরীতে দেখিলাম, কার্ডগুলি যথারীতি রক্ষিত হইয়াছে। প্রবন্ধ ও পুস্তিকাসমূহ বিষয় অনুসারে সাজান রহিয়াছে। মানবের চুল সম্বন্ধে রচনা স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত, সেইরূপ দাঁত, রং, হাড়, চামড়া, মাথার খুলি ইত্যাদির জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আলমারির খোপ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার ছবি এবং ফটোগ্রাফও কার্ডের মত বর্ণমালানুসারে রক্ষিত হইতেছে।

লাইব্রেরী দেখিয়া সংগ্রহালয়ে প্রবেশ করিলাম। হ্রেলিস্কা বলিলেন —"এই যে অস্থিগুলি দেখিতেছেন এরূপ অস্থি মানবজাতির শরীরে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাগৈতিহাসিক মানবদেহে এই সমুদয় থাকিত। এগুলি এক্ষণে পর্ব্বতগাত্রে ফসিল আকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ দেখুন কতকগুলি বিচিত্র মাথার খুলি। এইসমুদয়ও বর্ত্তমান মানব-জাতির প্রাচীনতর অবস্থার সাক্ষী। এই কয়েকটা আলমারীর বস্তুসমূহ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলে বর্ত্তমান মানবের শারীরিক গঠন ঐতি-হাসিকভাবে বুঝিতে পারা যায়। মানবের শরীর চিরকাল একরূপ ছিল না। যুগে যুগে তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।"

কোন আল্‌মারির এক পার্শ্বে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র মাথা দেখিলাম,

অপর পার্শ্বে অতি বৃহৎ খুলি দেখিলাম। হেলিস্কা বলিলেন, "একই লোহিতাঙ্গ জাতির প্রবীণ ব্যক্তিগণের মস্তকে এইরূপ প্রভেদ দেখা যায়। সবই প্রৌঢ় মানুষের মাথা—কিন্তু কতকগুলি নিতান্ত ছোট, কতকগুলি অতি বৃহৎ।"

একস্থানে জীবন্ত নরনারীর মাথা মাপিবার কল দেখা গেল। অন্যত্র প্রায় দুই হাজার মস্তিষ্ক ভিন্ন ভিন্ন কাচের পাত্রে সাজান রহিয়াছে। হেলিস্কা বলিলেন—"কতকগুলি মানবের মস্তিষ্ক, কতকগুলি স্তন্যপায়ী অন্যান্য জীবের মস্তিষ্ক। এগুলি এমন এক জলীয় পদার্থে ভিজাইয়া রাখা হইয়াছে যাহার ফলে মস্তিষ্কের আকৃতি সঙ্কুচিত অথবা বর্দ্ধিত হইতে না পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন একটা মাথার খুলি দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন কি এটা কোন্ জাতীয় লোকের?" হেলিস্কা বলিলেন—"মহাশয়, মানবের জাতিগুলিকে সর্ব্বাংশে তফাৎ করিয়া ফেলা বড় কঠিন। কতকগুলির প্রভেদ অতি বেশী—সেই সকল জাতীয় মাথা দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যায়। কিন্তু অনেক জাতির বিভিন্নতা সামান্য মাত্র—তাহাদের প্রভেদ লক্ষ্য করা বড় কঠিন—অনেক বিষয়েই তাহাদের মধ্যে সাম্য আছে। এই সকল ক্ষেত্রে মাথা দেখিবামাত্র তাহাদের জাতি নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব।"

তাহার পর জাতি বিভাগ, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি আলোচিত হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে অথবা জীব-বিজ্ঞানে যেরূপ ট্যাক্সনমি (Taxonomy) বা শ্রেণীবিভাগ অধ্যায় আছে সেইরূপ শ্রেণীবিভাগ মানবসমাজে সম্ভবপর কি? নৃতত্ত্ব (য়্যানথ্রপলজি) বিজ্ঞানের দ্বারা মানবসমাজকে উচ্চ নিম্ন স্তরে বিভক্ত করা চলে কি? উদ্ভিজ্জগতে য়্যাল্‌জি (Algœ) হইতে সপুষ্পক তরুবর পর্য্যন্ত একটা জীবনধারা

লক্ষ্য করা যায়। জীবজগতেও প্রটোজোয়া (Protozoa) বা আদিমজীব হইতে আরম্ভ করিয়া স্তন্যপায়ী ও শিরদাঁড়াবিশিষ্ট জীবপর্য্যন্ত শারীরিক ক্রমবিকাশের রীতি বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ মানবজগতে নিম্নতম শারীরিক গঠন বা আকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম শারীরিক গঠন বা আকৃতির ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ ধরিতে পারেন কি ?"

হ্রেলিস্কা বলিলেন—"একবারে অসম্ভব নয়। মানবসমাজে সর্ব্বনিম্ন-শ্রেণী কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী শ্বেতাঙ্গ। অন্যান্য জাতিরা মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। নিম্নতম হইতে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর প্রভেদ বেশী নয়—কিন্তু সর্ব্বনিম্নে এবং সর্ব্বোচ্চে প্রভেদ অত্যধিক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোকে সর্ব্বনিম্ন মানব বলিতেছেন কেন ?" হ্রেলিস্কা বলিলেন—"আমি শারীরিক গঠন হিসাবে কথাটা বলিতেছি। নিগ্রোর হাত, পা, কান, ঠোঁট, চোয়াল, মুখভঙ্গী, নাক সবই প্রাগৈতিহাসিক সর্ব্বপুরাতন মানবের অনুরূপ। সম্প্রতি যবদ্বীপে একটা প্রাগৈতিহাসিক মানবশরীর পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে ইয়োরোপীয় মানব অথবা ভারতীয় মানবের প্রভেদ অত্যধিক—কিন্তু নিগ্রোর সঙ্গে অনেক বিষয়েই তাহার মিল আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্বেতাঙ্গ কাহাকে বলে ?" ডাক্তার বলিলেন—"ইয়োরোপের সকল জাতি, প্রাচীন মিশরীয়গণ, এশিরীয়, ব্যাবিলনীয় ও ইহুদিজাতি এবং ভারতবর্ষের জাতিপুঞ্জ সকলকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া থাকি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভারত-বাসীকে শ্বেতাঙ্গ ভাবিলেন কি করিয়া ?" ডাক্তার বলিলেন—"শ্বেতাঙ্গ একটা পারিভাষিক শব্দ। একমাত্র চামড়ার রং দেখিয়াই কোন

জাতিকে শ্বেতাঙ্গ বলিতেছি না। নাক, চোখ, মুখ, কান, চিবুক, মুখের আকৃতি, মাথার খুলি, শারীরিক দৈর্ঘ্যের তুলনায় মাথার পরিমাণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই ভারতবর্ষের অধিকাংশ জাতি মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, ইহুদি, আরব, পার্শী এবং ইয়োরোপের রুশ, জার্ম্মাণ, ইতালীয়, ইংরাজ ইত্যাদি সকল জাতির সমকক্ষ। ভাষা হিসাবে এই জাতিগুলি আর্য্য, সেমিটিক ইত্যাদি দলভুক্ত—কিন্তু রক্ত হিসাবে ইহারা সকলেই এক গোত্রের অন্তর্গত। তাহাকে আমরা "শ্বেতাঙ্গ" বলিয়া থাকি।"

হ্রেলিস্কার মতে ভারতবর্ষের লোকেরা যদি কিছুকাল শীতপ্রধান দেশে থাকে তাহা হইলে অল্পকালের ভিতরেই তাহারা শ্বেতাঙ্গ হইয়া যাইতে পারে—ইহারা বাস্তবিক কৃষ্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু চীনা জাপানী ইত্যাদি পীত জাতি শ্বেতাঙ্গ হইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে লোহিতাঙ্গের বীজ আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্ পীত জাতিরই এক শাখা। হ্রেলিস্কার মতে পীত জাতি শারীরিক হিসাবে কৃষ্ণ ও শ্বেতের মধ্যবর্ত্তী। কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের সমীপবর্ত্তী জাতির মধ্যে নিগ্রেটো, মেলানেসিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মানব হিসাবে যে জাতি যত নিম্নে পশু হিসাবে সে তত উচ্চে। এই জন্য কৃষ্ণাঙ্গের শারীরিক শক্তি শ্বেতাঙ্গের অপেক্ষা যথেষ্ট বেশী।

হ্রেলিস্কা বলিলেন—প্রথম যুগের মানব শারীরিক হিসাবে নিগ্রো ধরণের ছিল। তখনও জাতিগুলি বিভক্ত হয় নাই। পরে নানা আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়া জাতিগুলি বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। আধুনিক নিগ্রো প্রাচীনতম কাঠামো বেশী বদলায় নাই—কিন্তু অন্যান্য জাতি যথেষ্টই বদলাইয়াছে।"

তাহার পর মস্তিষ্কের কথা আলোচিত হইল। হ্রেলিস্কার মতে,

"শারীরিক গঠন হিসাবে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো প্রাচীনতম মানবের সমীপবর্ত্তী কিন্তু চিন্তাশক্তি হিসাবে তাহা হইতে বহু দূরে। বরং শ্বেতাঙ্গে এবং কৃষ্ণাঙ্গে মস্তিষ্ক হিসাবে বেশী প্রভেদ নাই। তবে একজাতির মস্তিষ্ক বিকাশলাভ করিয়াছে—অন্যজাতির মস্তিষ্কশক্তি এখনও প্রকটিত হয় নাই। কাজেই একমাত্র শারীরিক গঠন, চুলের আকৃতি, মুখভঙ্গী, মাথার খুলি, চামড়ার রং ইত্যাদি দেখিয়া সভ্যতা হিসাবে কোন জাতিকে উচ্চ বা নিম্ন বলা যায় না। শারীর-নৃতত্ত্বের বিচারে কতকগুলি জাতিকে উচ্চ, কতকগুলিকে নিম্ন বলা হয়--কিন্তু মানসিক বা সভ্যতা বিষয়ক নৃতত্ত্বের (Cultural Anthropology) হিসাবে সেই সকল জাতিই উচ্চ বা নিম্ন হ'বে কি না তাহা বলা কঠিন। তাহার জন্য স্বতন্ত্র অনুসন্ধান আবশ্যক।"

কংগ্রেসের "রেপ্রেজেণ্টেটিভ্"

ভারতবর্ষে কংগ্রেস শব্দ সুপরিচিত। বর্ত্তমান জগতে ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রই এই শব্দ এবং এই শব্দের অন্তর্গত বস্তু আবিষ্কার করিয়াছেন। ইয়াঙ্কিস্থান হইতেই ভারতবর্ষে এই শব্দের আমদানী। কিন্তু ভারতীয় ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া ইয়াঙ্কি কংগ্রেসের পরিচয় পাওয়া যায় না।

কংগ্রেস বিচারালয় নয়, শাসন-বিভাগও নয়, কংগ্রেস আইন প্রস্তুত করিবার সম্মিলনী, যাহাকে ভারতবর্ষে ব্যবস্থাপক সভা বলা হয়। বিলা-তের পার্ল্যামেণ্ট যে বস্তু, ব্রিটিশশাসিত ভারতের "লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল" যে বস্তু, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল কংগ্রেসও সেই বস্তু। অথচ আমাদের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল কিংবা বৃটিশ পার্ল্যামেণ্ট ইত্যাদি ব্যবস্থাপক সভার বৃত্তান্ত জানা থাকিলেই ইয়াঙ্কিদের ব্যবস্থাপক সভা বুঝিতে পারা যায় না। বিলাতী পাল্যামেণ্টের ক্ষমতা ও কার্য্য-পরিচালনা-প্রণালী এক প্রকার, ইয়াঙ্কিদের জাতীয় মহা সমিতির ক্ষমতা ও কার্য্য-পরিচালনা-প্রণালী অন্যপ্রকার। সম্প্রতি ব্রিটিশ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই—কারণ বিজিতদেশ শাসন করিবার জন্য ইংরাজকে কতকগুলি স্বতন্ত্র নিয়ম করিতে হইয়াছে। সেই সমুদয়ের প্রয়োগ বিলাতে অথবা ইয়াঙ্কিস্থানে কিম্বা অন্য কোন স্বাধীন দেশে দেখা যায় না। আর ভারতীয় উকীল-নেতাদিগের "জাতীয় মহাসমিতি"র কথা এক্ষেত্রে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক—কেন না ইহা বিজিত দেশের কতকগুলি নেতৃস্থানীয় লোকের মজ্‌লিস্ মাত্র।

শাসনকর্ত্তাদিগকে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক করিয়া রাখাই ইহার এক-মাত্র উদ্দেশ্য। এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখা উচিত যে, ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, ভারতীয় সুপ্রিম লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল, বিলাতী প্যার্ল্যামেণ্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল কংগ্রেস—সকল সম্মিলনই জাতিতে এক। আইন প্রস্তুত করা ইহাদের কার্য্য—ইহারা আইন প্রয়োগ করে না অথবা সেনাবিভাগ ও পুলিশ-বিভাগের ন্যায় দেশ শাসনও করে না।

ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল-ভবন কংগ্রেস বা ব্যবস্থাপক সভার গৃহ—এখানকার পার্ল্যামেণ্ট-সৌধস্বরূপ। ক্যাপিটল হইতে কংগ্রেসের কয়েকজন কর্ত্তার চিঠি পাওয়া গেল। দেখিলাম, চিঠির উপর কোন ডাক-টিকিট লাগান নাই। পরে বুঝিলাম—কংগ্রেসের সভ্যগণ আমরা যেখানে ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া থাকি, সেইখানে নিজের নাম সহি করিয়া দিয়াছেন। কর্ত্তাদের নাম সহিই ষ্ট্যাম্প লাগাইবার সমান।

বিলাতী পার্ল্যামেণ্টের দুই মহল—ছোট মহলের নাম 'হাউস অব্ কমন্স', বড় মহলের নাম 'হাউস অব্ লর্ডস্'। এক মহলে পয়সা-ওয়ালা লোকেদের প্রতিনিধিরা বসেন—অপর মহলে রামাশ্যামাদের প্রতিনিধিবর্গ অর্থাৎ ছোট মহলই বিশেষ প্রতাপশালী, বড় মহলের ক্ষমতা অতি অল্প। ইয়াঙ্কি পার্ল্যামেণ্ট বা কংগ্রেসেরও দুই মহল—ছোট মহলে বড় মহলে যে প্রভেদ থাকে, এখানে সে প্রভেদ নাই। দুই মহলের ক্ষমতা, কর্ম্মক্ষেত্র এবং কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন—কেহ কাহারও অধীন বা নিম্নপদস্থ নয়। বিলাতে যেরূপ লোয়ার হাউস ও আপার হাউস শব্দ প্রযোজ্য এখানে সেরূপ প্রযোজ্য নয়। ইয়াঙ্কিদের এক মহলের নাম হাউস অব্ রেপ্রেজেণ্টেটিভ অপর মহলের নাম সেনেট। দুই মহলের জন্য জনগণ দুই ধরণে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। পয়সাওয়ালা প্রতিনিধির দল অথবা দরিদ্র প্রতিনিধির

দল—এইরূপ দলভেদ ইয়াঙ্কি স্থানে নাই। একদল প্রতিনিধিকে 'রেপ্রেজেণ্টেটিভ্' বলে অপর দলকে 'সেনেটার' বলে।

আজ একজন নামজাদা রেপ্রেজেণ্টেটিভের সঙ্গে ক্যাপিটলে দেখা হইল। ইনি দক্ষিণ অঞ্চলের আলাবামারাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিনিধি। আলাবামা প্রদেশের টাস্কেগী নগরে নিগ্রোনায়ক বুকার ওয়াশিংটনের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় অবস্থিত। রেপ্রেজেণ্টেটিভ মহাশয় বহুবার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কংগ্রেসের খাজনা আদায় এবং করস্থাপন বিভাগের কর্তৃত্ব করিতেছেন। দেখা হইবামাত্র ইনি বলিলেন —"মহাশয়, কাল পর্য্যন্ত আমি হাউস অব্ রেপ্রেজেণ্টেটিভসে প্রতিনিধি ছিলাম—আজ হইতে আমি সেনেটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছি। এখন আমি সেনেটার।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি, মহাশয়, রেপ্রেজেণ্টেটিভ থাকিতে থাকিতে আপনি সেনেটার হইলেন কি করিয়া? একমহল হইতে আর এক মহলে বদলি হইবার নিয়ম আছে কি?" রেপ্রেজেণ্টেটিভ বলিলেন—"এক মহল হইতে অপর মহলে বদলি হইবার নিয়ম নাই। আমি এক মহল হইতে অপর মহলে বদলিও হই নাই। কাল আমার রেপ্রেজেণ্টেটিভ মহলে আয়ু স্বাভাবিক নিয়ম ক্রমে পূর্ণ হইয়াছে। সাধারণ নিয়মে আজ হইতে আমি নিষ্কর্ম্মা—দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু ঘটনাক্রমে আলাবামা প্রদেশের জনগণ আমাকে সেনেটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছে। কাজেই এক মহলের কার্য্য শেষ না হইতেই অপর মহলে কার্য্য পাইলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জনসাধারণ সেনেটের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে কেন? জনসাধারণ ত একমাত্র হউস্ অব্ রেপ্রেজেণ্টেটিভ্সে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে অধিকারী। সেনেটার নির্ব্বাচনের জন্য প্রদেশরাষ্ট্রই দায়ী নহে কি? আলাবামারাষ্ট্র আপনাকে নির্ব্বাচিত করিবে

ইহাই ত স্বাভাবিক বলিয়া জানি।" রেপ্রেজেণ্টেটিভ বলিলেন—"মহাশয়, আপনি পুঁথিপড়া বিদ্যা আওড়াইতেছেন। বিগত দুই তিন বৎসরের ভিতর আমাদের কন্‌ষ্টিটিউসনে অনেক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সকল নিয়মের ফলে জনগণই আজকাল সেনেটার নির্ব্বাচিত করে।" আমি বলিলাম—"তাহা হইলে দেখিতেছি প্রদেশরাষ্ট্র কংগ্রেসের কোন মহলেই আর প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে না। জনগণই রেপ্রেজেণ্টেটিভ নির্ব্বাচন করিয়া আসিতেছে—নূতন নিয়মে সেনেটারও নির্ব্বাচন করিবে। আর কংগ্রেসের বাহিরে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন ত জনগণের হাতে আছেই। তাহা হইলে প্রদেশরাষ্ট্রের ক্ষমতা একপ্রকার লুপ্তপ্রায়।" জনগণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে রেপ্রেজেণ্টেটিভ বলিলেন—"মহাশয়, আর একটা কথা জানা আবশ্যক। জনসাধারণই দুই প্রকার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে সত্য—কিন্তু প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা জেলা হইতে ভিন্ন ভিন্ন রেপ্রেজেণ্টেটিভ নির্ব্বাচিত হইবেন। সুতরাং রেপ্রেজেণ্টেটিভ প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র প্রদেশের প্রতিনিধি নহেন—তিনি কোন জেলা বা বিভাগ বিশেষের প্রতিনিধি নহেন—তিনি সমগ্র প্রদেশের প্রতিনিধি। তাহাছাড়া, কোন প্রদেশ হইতেই দুই জনের বেশী সেনেটার নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। যে প্রদেশে মাত্র দশ হাজার লোক, সেখান হইতেও দুইজন সেনেটে আসিবেন, আবার যেখানে একলক্ষ লোক সেখান হইতেও দুইজন মাত্র সেনেটার নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু রেপ্রেজেণ্টেটিভ সংখ্যা প্রত্যেক প্রদেশের লোকসংখ্যার উপর নির্ভর করিবে। কোন প্রদেশ হইতে রেপ্রেজেণ্টেটিভ হয় ত একজন আসিবেন—কোন প্রদেশ হইতে হয় ত দশজন ইত্যাদি।"

ইয়াঙ্কি কন্‌ষ্টিটিউশন বুঝিবার জন্য কল্পনার আশ্রয় লওয়া যাউক।

ইয়াঙ্কিস্থানের লোকসংখ্যা দশ কোটি—প্রদেশ-সংখ্যা ৪৫। ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা ত্রিশ কোটি, প্রদেশ-সংখ্যা (করদ রাজ্য লইয়া) অগণিত। সহজে বুঝিবার জন্য গোটা ভারতের কথা ছাড়িয়া কেবল বঙ্গভাষাভাষী জনগণের দৃষ্টান্ত ধরিতেছি। বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও আনুমানিক লোক-সংখ্যা গ্রহণ করিতেছি। মনে করা যাউক এই প্রদেশ বা বিভাগগুলি যেন স্বতন্ত্র-স্ব-স্ব-প্রধান রাষ্ট্র বিশেষ।

উত্তরবঙ্গ—	১০,০০০,০০০
মধ্যবঙ্গ—	৭,৫০০,০০০
পশ্চিমবঙ্গ—	১২,৫০০,০০০
পূর্ব্ববঙ্গ—	১৫,০০০,০০০
চট্টগ্রাম—	৫,০০০,০০০
	৫০,০০০,০০০

এই কাল্পনিক বঙ্গীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বসমেত ৫ কোটি লোক—বিলাত, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি রাষ্ট্রের লোক-সংখ্যা প্রায় এইরূপ। পাঁচটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সমবায়ে এই দেশ গঠিত। ইহার জন্য ইয়াঙ্কি আদর্শে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে পাঁচকোটি লোক মিলিয়া একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন। সভাপতি-নির্ব্বাচনের প্রণালী এখনও বর্ণণা করা হয় নাই। ব্যবস্থাপক সভা বা কংগ্রেসের কথাই বলা হইতেছিল। সেনেটমহলে দশজন মাত্র নির্ব্বাচিত হইবেন—প্রত্যেক রাষ্ট্র দুইজন সেনেটার পাঠাইবেন—পূর্ব্ববঙ্গের দেড় কোটি লোকও দুইজন প্রতিনিধি সেনেটে পাঠাইবেন—আবার চট্টগ্রামের অর্দ্ধকোটি লোকও দুইজনই পাঠাইবেন। এই উপায়ে সেনেট-প্রতিষ্ঠানে পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে চট্টগ্রামের এবং পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সাম্যরক্ষিত হইবে।

ইহার ফলে কোন রাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্র হইতে নিজকে ছোট বা বড় বিবেচনা করিতে পারিবে না। পূর্ব্ববঙ্গের দেড়কোটি লোক কোথা হইতে এই দুইজন সেনেটার বাছিবেন? পূর্ব্ববঙ্গের সকল জেলা হইতে। বলা বাহুল্য, যাহারা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধ তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

তারপর রেপ্রেজেণ্টেটিভদের কথা। ধরা যাউক যেন 'হাউস অব্ রেপ্রেজেণ্টেটিভ্‌সে' সর্ব্বসমেত ৩০০ প্রতিনিধি আবশ্যক। বঙ্গের লোক-সংখ্যা ৫ কোটি। এই পাঁচ কোটিকে তিনশত দিয়া ভাগ করিতে হইবে—ভাগ ফল হইল ১৬০,০০০। প্রত্যেক ১৬০,০০০ লোক একজন করিয়া রেপ্রেজেণ্টেটিভ নির্ব্বাচন করিবে। উত্তরবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সর্ব্বসমেত প্রায় ৬৫ জন প্রতিনিধি আসিবে—উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রায় ৯০ জন আসিবে ইত্যাদি।

ইয়াঙ্কি কন্‌ষ্টিটিউশনে দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে—(১) কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্র হইতে হীন নহে—ছোট হউক বড় হউক, ধনী হউক, নির্ধন হউক রাষ্ট্র মাত্রেরই সমান অধিকার। অতএব সমবায়-রাষ্ট্রে ইহার জন্য ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এই জন্যই সেনেটে প্রত্যেক রাষ্ট্রের দুই প্রতিনিধি।

(২) কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি হইতে হীন নহে—ধনী হউক নির্ধন হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক ব্যক্তিমাত্রেরই সমান অধিকার। অতএব সমবায়-রাষ্ট্রে ইহার জন্য ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এই জন্যই রেপ্রেজেণ্টেটিভ্ মহলের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ব্যক্তি মাত্রেরই অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।

ইয়াঙ্কিস্থানের পরিচয়

সকাল সাড়ে সাতটা হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত "কায়েন মনসা বাচা" পরিশ্রম করিতে হয়। দিনের পর দিন ইহাই নিত্য-কর্ম্মপদ্ধতি। হয় ভ্রমণ না হয় কথোপকথন, না হয় পঠন—পর্য্যটকের ডায়েরীতে অন্য কোন তথ্য থাকা অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে বক্তৃতা করা অথবা প্রবন্ধ-পাঠের ব্যাধি ধরে নাই। তাহা হইলে আরও মেহানতের আশঙ্কা থাকিত। অধিকন্তু নানা উপায়ে সংবাদদাতাদিগের উৎপাত এড়ান গিয়াছে। মোটের উপর, 'খাই দাই ঘুরে বেড়াই'—'চলে যাই আপন মনে, চাহিনা কারও পানে।'

ঘণ্টা দুএক খরচ করিয়া নেভি-ইয়ার্ড দেখা গেল। জাহাজ এখানে প্রস্তুত করা হয় না—একটা ক্ষুদ্র মিউজিয়াম আছে—তাহা ছাড়া মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারদিগের বোধগম্য বহুবিধ কলকারখানার কারবার চলিতেছে। সাধারণ চোখে দেখিয়া কিছু বুঝিবার যো নাই।

বিলাতে যখন ছিলাম তখন পার্ল্যামেণ্টের অধিবেশন শেষ হইয়া আসিতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশকাল উপস্থিত হইতেছিল। প্রায় সকল স্থানেই ভাঙ্গা আসর দেখিয়াছি। যুক্তরাষ্ট্রেও সেইরূপই অবস্থা। বড়দিনের ছুটিতে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলাম—পরীক্ষার ছুটির সময়ে হার্ভার্ডে গেলাম। কাজেই কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখিবার জন্য প্রত্যেক কেন্দ্রেই অত্যধিক সময় কাটাইতে হইয়াছে। ওয়াশিংটনে উপস্থিত হইয়া দেখি, সেনেটার ও রেপ্রেজেণ্টেটিভ মহাশয়গণ মহা ব্যস্ত। কংগ্রেসের কার্য্য এই বৎসরকার মত খতম করিয়া সকলেই

বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের দেশে পূজার ছুটির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আফিসে বিদ্যালয়ে যেরূপ হৈ চৈ হট্টগোল বিশৃঙ্খলা, এখানকার কংগ্রেস মহলেও প্রায় সেইরূপ দেখিতেছি।

ইতিমধ্যে কেহ কেহ ওয়াশিংটন ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন—কেহ কেহ ফিলিপাইন, হনলুলু ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জে রাষ্ট্রীয় সহরে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আজ একজন সুপ্রসিদ্ধ রেপ্রেজেণ্টেটিভের সঙ্গে পরিচয় হইল। ইনি নিউইয়র্ক প্রদেশের প্রতিনিধি। ইনি প্রথমেই বলিলেন—"মহাশয়, আর নয় মাসের ভিতর কংগ্রেসের কোন অধিবেশন হইবে না। যদি প্রেসিডেণ্ট বিশেষ কোন জরুরি কার্য্যের জন্য আমাদিগকে আহ্বান করেন তাহা হইলে হয়ত আবার আমরা আসিয়া জুটিতে পারি।" ইনি য়্যাপ্রপ্রিয়েশনস অর্থাৎ ব্যয়-বিভাগের কর্ত্তা। ইনি উপর্য্যুপরি নয়বার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ইঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। ইঁহার আফিসে কয়েকটা কল দেখিলাম। টেলিফোনের উন্নত সংস্করণ একটা যন্ত্র দেখিলাম। ইহাতে মুখ লাগাইয়া কথা বলিতে হয় না—অথবা কাণ পাতিয়াও শুনিতে হয় না। এই ব্যক্তি সেইখান হইতে কথা বলিতে লাগিলেন—কলের ভিতর দিয়া আওয়াজ আসিয়া পৌছিল। ঘরের সকলেই শুনিতে পাইলাম। রেপ্রেজেণ্টেটিভ্ তাঁহার স্থানে বসিয়াই সহকারীকে আদেশ করিলেন। কথাটা কলের ভিতর দিয়া সহকারীর নিকট পৌছিল। ইহার নাম ডিক্টোগ্রাফ (Dictograph)। আর দু-একটা কলের সাহায্যে বড় বড় অঙ্ক কষা হইতেছে দেখিতে পাইলাম। এইরূপ গণনার যন্ত্রের (Antomatic Calculator) ব্যবহার ইয়াঙ্কিস্থানের সর্ব্বত্রই চলিতেছে। সেদিনষ্টেটিষ্টিকস-বিভাগের কর্ত্তা বলিতেছিলেন—

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আর বুদ্ধি খাটাইয়া করিতে হয় না। তথ্য-সংগ্রহ-বিভাগে আসিয়া ফলগুলি দেখিয়া যাইবেন।”

রেপ্রেজেণ্টেটিভ মহাশয় ভারতবর্ষের সংবাদ কিছুই রাখেন না। বর্ত্তমানযুগে উচ্চ শিক্ষিত লোকের মধ্যে এত অনভিজ্ঞতা আছে, বিশ্বাস করা কঠিন। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভারতবর্ষে ফরাসী ভাষার চল বোধ হয় কিছু বেশী!” শুনিবামাত্র মনে হইল—“এই ইয়াঙ্কি রাষ্ট্রনায়কের দোষ কি? বিলাতেও অসংখ্য লোক ভারতবর্ষের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। বহু লোক জানে যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ। কাহারও কাহারও ধারণা যে, এখানে ওলন্দাজদিগের একটা উপনিবেশ আছে। অধিকন্তু বর্ত্তমান সংগ্রামের সময়ে ভারতবাসীকে ইংরাজেরা রুশ, ফরাসী, জাপাণী ইত্যাদির ন্যায় বন্ধু-রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ allies বিবেচনা করিতেছে। সাধারণ ইংরাজ নরনারী, গুর্খা, শিখ, পাঠান, রাজপুত এবং অন্যান্য ভারতীয় সৈন্যগণকে ইংল্যাণ্ডের সাহার্য্যকারী স্বেচ্ছাসেবক অথবা মিত্রজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেছে। ভারতবর্ষ যে ইংরাজের একটা জমিদারী বিশেষ তাহা ইংরাজেরাও জানেন না!”

আমরা বলিভিয়া অথবা ভেনেজুয়েলা সম্বন্ধে যতটুকু জানি, ইয়াঙ্কিরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা বেশী জানেন না। উচ্চশিক্ষিত জন-নায়কগণের কথাই বলিতেছি—অর্দ্ধশিক্ষিতেরা ত ভারতবর্ষের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই।

ভারতবর্ষের শিক্ষিত মহলে ইয়াঙ্কিস্থান অনেকটা সুপরিচিত। আমরা বিলাত সম্বন্ধে যতটা জানি, যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রায় ততটাই জানি। ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থে বাল্যকাল হইতেই আমরা আমেরিকার গল্প শুনিয়া আসিতেছি। কলাম্বাসের আবিষ্কার-কাহিনী এবং ইয়াঙ্কি স্বাধীনতার বিবরণ অন্ততঃ এই দুইটি বিষয় অর্দ্ধশিক্ষিত ভারতবাসীরও

জানা আছে। উচ্চশিক্ষিতেরা ইংরাজী সাহিত্যের সাহায্যে আমেরিকার অনেক তথ্যই অবগত আছেন্। এখানকার শিল্প, বিজ্ঞান, কারখানা, ব্যবসাদারী, কাব্য, দর্শন, ধর্ম্মচর্চ্চা ইত্যাদি নানা বিষয়েই আমরা আমেরিকাকে চিনি। ইংরাজীভাষায় লিখিত বহুগ্রন্থের রচয়িতা ইয়াঙ্কি। এই সূত্রেও ভারতবাসী ইয়াঙ্কিস্থানের সংবাদ কম রাখেন না। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, তড়িৎ-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থাবলীর জন্য অনেক সময়েই আমরা ইয়াঙ্কি প্রকাশকগণের শরণাপন্ন হইয়া থাকি। এই সকল বিষয়ে ভাল ভাল গ্রন্থ জার্ম্মাণ অথবা ফরাসী ভাষায় পাওয়া যায়। আমরা অনেকেই এই দুই ভাষা ব্যবহার করিতে অসমর্থ। ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের উপর যাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র বিলাতী লেখকের রচনা পর্য্যাপ্ত নয়। ইয়াঙ্কি লেখকেরা অধিকাংশ স্থলে ভারতীয় বিজ্ঞান সেবিগণের রসদ জোগাইয়া থাকেন।

অধিকন্তু, মৌলিক কাব্য ও গন্ত সাহিত্যে আমরা সেক্সপিয়ার, স্কট্, জর্জ্জ এলিয়ট, টেনিসন্‌কে যেরূপ জানি ইয়াঙ্কিস্থানের সাহিত্য বীরগণকেও সেইরূপই জানি। লংফেলোর, কবিতাবলী, হুইটিয়ারের "Songs of Labour", হথর্ণের "Scarlet Letter," হুইট্‌ম্যানের Leaves of Grass, ব্যাঙ্ক্রফ্ট ও প্রেস্কট ইত্যাদির প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ, আর্ভিংএর Sketch Book, মট্‌লির Dutch Republic, এমার্সনের বক্তৃতা, জেমসের দর্শনবাদ ন্যূনাধিক পরিমাণে ভারতবাসীর জানা আছে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার ও শিক্ষা-প্রণালী কেহ কেহ আলোচনা করিয়া থাকেন। বিগত ৮।১০ বৎসরের ভিতর আমেরিকার ভারতীয় ছাত্রেরা ইংরাজীতে অথবা হিন্দী, মারাঠী, বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় দেশবাসীকে ইয়াঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ

পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল কারণে আমেরিকায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এখানকার বহুকথা আমাদের জানা থাকে। আসল জায়গায় পদার্পণ করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটান হয় মাত্র। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা সম্বন্ধে দেশে বসিয়াই এতকথা জানি যে, যথাস্থানে আসিয়া নূতন কিছু শিখিলাম কিনা সন্দেহ হইতেছে। অবশ্য চোখে দেখায় আর কাণে শোনায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু জগতের অন্য কোন দেশ সম্বন্ধে আমাদের এত বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান আছে বলিতে পারি না। রুশিয়া, জার্ম্মাণ, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, চীন, মিশর, পারস্য ইত্যাদি দেশের ভাষা আমাদের কয়জনে জানেন? ইংরাজী ভাষার কৃপায় ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দুনিয়ার অনেক খবর পাই! ফরাসী এবং অন্যান্য ভাষা না জানা থাকিলে জগতের অন্যান্য কেন্দ্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অন্ধ থাকিতে বাধ্য। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে হইলে উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসীকে দুই তিনটা বিদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত হইতে হইবে।

ইয়াঙ্কিস্থান সম্বন্ধে ইংরাজীতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু গ্রন্থই আছে। ভারতবাসী অনেক গ্রন্থই পাঠ করিয়া থাকেন। ব্রাইস (Bryce) প্রণীত The American Commonwealthএর নাম জানেন না পৃথিবীতে এমন কোন লোক নাই। ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল কন্‌ষ্টিটিউশন সম্বন্ধে ইহা একখানা "ক্লাসিক" বা সর্ব্বজনপ্রশংসিত আদর্শ-পুস্তক। বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন প্রণীত The State গ্রন্থ আজকাল ভারতবর্ষের বি, এ, ক্লাশে পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে আমেরিকার শাসন-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। এইটুকু পাঠ করিলে ব্রাইসের বই না পড়িলেও চলে। কয়েকবৎসর হইল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রশাসনাধ্যাপক হার্ট (Hart) একখানা আমেরিকার ইতিহাস সম্পাদন করিয়াছেন। কয়েকজন নামজাদা লেখকের সাহায্যে সেই

গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগ লেখান হইয়াছে। পুস্তকের নাম The American Nation. তাহা হইতে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায় সঙ্কলন করিয়া অধ্যাপক হার্ট একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার নাম "Social and Economic Forces in American History." ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর অঞ্চল, দক্ষিণ অঞ্চল, পূর্ব্ব অঞ্চল ও পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্নতা এবং ক্রমবিকাশ বুঝান হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশগুলি বাস্তবিকপক্ষে গত ৭০ বৎসরের মধ্যে গঠিত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশে এবং পশ্চিমপ্রদেশে বন জঙ্গল মাত্র ছিল। এত অল্পকালের ভিতর কি করিয়া সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপিত হইল, নগর গঠিত হইল, কারখানা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল এই সকল কথা হার্টসঙ্কলিত পুস্তিকায় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রই একটা নূতন দেশ—তাহার ভিতরেও নূতনতর, নূতনতম প্রদেশ আছে—এ কথা ভারতবাসীর হয়ত ভাল রকম জানা নাই। নূতন গঠিত দেশের সমাজে কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালী কিরূপ হয় তাহা বুঝিবার জন্য আমেরিকায় আসা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে হার্টের গ্রন্থ অতীব মূল্যবান্।

আমরা ভারতবর্ষে চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ Imperial Gazetteer of India পাঠ করিয়া থাকি। ঠিক এই ধরণের একখানা ইয়াঙ্কি গ্রন্থের নাম The United States. ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত—সম্পাদকের নাম শেলার (Shaler)। ইহার বিস্তৃত নাম—A Study of the American Commonwealth, its Natural resources, People, Industries, Manufactures, Commerce and its work in Literature, Science, Education and Self-Governments. অভিধানের ন্যায় এই গ্রন্থ সর্ব্বদা কাছে রাখা ভাল।

লণ্ডনে থাকিবার সময়ে একটা উৎসব দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

১৯১৪ সালে-ইয়াঙ্কি ইংরাজের সন্ধি ও মিত্রতার শতবর্ষ পূর্ণ হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামের ঘেন্টনগরে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজে ও ইয়াঙ্কিতে দুইবার লড়াই হয়। প্রথম লড়াইয়ের ফলে ইয়াঙ্কিরা স্বাধীন হন। সে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের কথা। ইংরাজ ইয়াঙ্কিকে শীঘ্র ছাড়িতে চাহেন নাই। পুনরায় যুদ্ধবাধে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাহার সমাপ্তি হয়। তাহার পর একশত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহার ভিতর সম্মুখ-সমরে ইহাঁদের কেহই প্রবৃত্ত হন নাই—পশ্চাতে পশ্চাতে ডিপ্লোমেসীর সাহায্যে পরস্পর পরস্পরকে কাবু করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন মাত্র। যাহা হউক একশত বৎসর শান্তি ছিল। এই জন্য গত বৎসর লণ্ডনে এক প্রদর্শনী খুলিয়া উৎসব করা হইল। কস্‌মস্‌ ক্লাবের লাইব্রেরীতে অনেক নূতন নূতন পুস্তকের আমদানী দেখিলাম। তাহার মধ্যে একখানার নাম The British Empire and the United States, লেখক কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানাধ্যাপক Dunning. ইহাঁর Political Theories-গ্রন্থ ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। ডানিং এই নূতন গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য উৎসবের কর্ম্মকর্ত্তাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই পুস্তকে ইংরাজ-ইয়াঙ্কির শতবর্ষব্যাপী রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, এই দুই জাতির ভিতর মনোমালিন্য এক দিনের জন্যও বন্ধ থাকে নাই। বহুবারই যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। ডানিং স্বয়ং একথা প্রচারও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধুয়া এই—"যদিও অমুক অমুক বিষয় লইয়া ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় গোলযোগ রহিয়াছে, যদিও অমুক অমুক ক্ষেত্রে লড়াই বাধ বাধ হইয়াছিল তথাপি বলিতে হইবে আমাদের একশত বৎসর শান্তিতেই কাটিয়াছে। কারণ আমরা যে জ্ঞাতি ও কুটুম্ব! একবার লড়াই করিয়া স্বাধীন হইয়াছি তাহাতে কি হয়? আমরা বন্ধু!"

তথাকথিত মন্‌রো-নীতি

ভারতবর্ষের চরমপন্থী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারিগণ রব তুলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ ভারতবাসীদিগেরই একচেটিয়া কর্ম্মক্ষেত্র থাকিবে—বিদেশীয় জনগণের কর্ত্তৃত্ব কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।" বিদেশীয় দ্রব্যনিচয়ের বয়কট বা বহিষ্করণ এই আন্দোলনের এক অঙ্গ। সর্ব্বতোমুখী বহিষ্করণের নীতিকে ইংরাজিতে বলা হয়, "ইণ্ডিয়া ফর দি ইণ্ডিয়ানস"। সেইরূপ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আজকাল এশিয়ার রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ রব তুলিতেছেন—"এশিয়া ফর দি এশিয়ান্‌স" অর্থাৎ এশিয়ায় কোন ইয়োরোপীয় অথবা আমেরিকান জাতির প্রভুত্ব থাকিতে পারিবে না—এশিয়া বৌদ্ধ, মুসলমান ও হিন্দুজনগণ তাহাদের নিজ নিজ সমস্যা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মীমাংসা করিবে।" ইয়োরামেরিকা এশিয়া হইতে বহিষ্কৃত হউক। এইরূপ বহিষ্কারনীতি ইয়াঙ্কিস্থানেও একটা আছে। সেই সূত্র বা ফর্ম্মুলাকে মন্‌রো ডক্‌ট্রিন (Monroe Doctrine) বলা হয়। উনবিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে মন্‌রো যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ছিলেন। ইনি উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জকে বয়কট করিবার জন্য এক সূত্র প্রচার করেন। সেই নীতি ইয়াঙ্কিরা এখনও প্রচার করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের যেখানে সেখানে মন্‌রো-নীতির উল্লেখ হয়। স্বদেশের কথা ছাড়িয়া বিদেশের কোন কথা তুলিলেই ইয়াঙ্কিরা এই সূত্র আওড়াইয়া থাকে। ইহাই যুক্তরাষ্ট্রের পর-রাষ্ট্রনীতির ("ফরেন পলিসী"র) প্রধানতম স্তম্ভ।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটার্লুর সময়ে নেপোলিয়নের অবসান হয়।

তাহার পর ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় সীমাগুলি কিছুকালের জন্য স্থির থাকে। এই সময়ে ইয়োরোপীয় নরপতিবর্গ সম্মিলিত হইয়া একটা দরবার স্থাপন করেন। কোন দেশের জনসাধারণকে বিদ্রোহী অথবা প্রজাতন্ত্রশাসনের পক্ষপাতী হইতে না দেওয়াই ইঁহাদের সমবেত স্বার্থ ছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব হইতে ইয়োরোপে যে তাণ্ডব সৃষ্ট হয় তাহার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করাই সেই যুক্ত-দরবারের উদ্দেশ্য। এই সম্মিলনীর নাম হোলি য়্যালায়্যান্স (Holy Alliance) বা ধর্ম্মসম্মিলন। রাজারা বুঝিয়াছিলেন,—"প্রজারা ডিমক্রেসী, গণতন্ত্র, স্বরাজ, রিপাব্লিক, স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদির জন্য বিপ্লব সৃষ্টি করিলে দেশের সর্ব্বত্র অধর্ম্ম ও দুর্নীতি প্রসারিত হইবে। সয়তানের প্ররোচনায়ই জনসাধারণ এইরূপ রাজদ্বেষী হইতেছে। রাজভক্তিই ধর্ম্মসঙ্গত—বিপ্লবসাধন অধর্ম্মের কথা। অতএব সমাজে ধর্ম্মরক্ষার জন্য রাজাদিগের ব্রতবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এইরূপ হইলেই ইয়োরোপে রাজতন্ত্রশাসন বা মনার্কি রক্ষা পাইবে—প্রজাবৃন্দকে দাবিয়া রাখা যাইবে—বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই নষ্ট করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইবে।" বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্র-শাসন খর্ব্ব করিয়া রাজশক্তিকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য নৃপতিগণ 'ধর্ম্ম-সম্মিলন' প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এ দিকে আমেরিকার নরনারীগণ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজয়ের সনন্দ লাভ করিয়াছে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ইয়াঙ্কিরা একটা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র-শাসনাবলম্বী যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। জগতে প্রজাতন্ত্রশাসনের প্রতিষ্ঠা এই প্রথম। ফরাসীরা তখনও বিপ্লব সুরু করে নাই। কাজেই ইয়াঙ্কি-দিগকে জগতে প্রজাতন্ত্রশাসনের সুফল দেখাইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইত। ইংরাজেরা ইয়াঙ্কিদিগকে জব্দ করিবার উপায় সর্ব্বদাই

খুঁজিতে লাগিলেন। ইয়োরোপের অন্যান্য রাজারাও এই অভিনব বিপ্লবকারীদিগের কাজকর্ম্ম ও রাষ্ট্রপরিচালনা দেখিয়া ভীত হইলেন। তাঁহাদের ভয়, পাছে জার্ম্মাণ, ইতালীয়, রুশ ইত্যাদি লোকেরা ইয়াঙ্কিদের দৃষ্টান্তে রাজদ্বেষী হইয়া পড়ে। ইয়াঙ্কি প্রজাতন্ত্রশাসন বাস্তবিকই ইয়োরোপীয় রাজগণের নিকট একটা উৎপাত স্বরূপ ছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজে ইয়াঙ্কিতে পুনরায় যুদ্ধ বাধিল—ইংরাজেরা পুনরায় হারিলেন—প্রজাতন্ত্রশাসন টিকিয়া গেল। কাজেই যখন "ধর্ম্ম-সম্মিলন" প্রতিষ্ঠিত হইল ইয়াঙ্কিরা বুঝিলেন, "ইয়োরোপীয় রাজাদের মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে—ইহাঁরা নিতান্তই বাড়াবাড়ি করিতেছেন।" কিন্তু ইয়াঙ্কিরা তখনও অতি দুর্ব্বল—ঘর সামলাইতেই পুরাপূরি সমর্থ নন—কাজেই কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া দূর হইতে দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনের অধোগতি ঘটে। সেই সুযোগে স্পেনসাম্রাজ্যের দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে থাকে। স্বাধীনতা লাভ করিয়াই জনগণ প্রজাতন্ত্রশাসনের পক্ষপাতী হয়। একে বিপ্লব, তাহার উপর গণতন্ত্র, স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসন (রিপাব্লিক বা ডিমক্রেসী)। কাজেই "ধর্ম্মসম্মিলনে"র চিন্তায় সয়তানের আস্ফালন এবং ইয়াঙ্কিদের বিবেচনায় কতকগুলি মিত্রলাভ। স্পেন হোলি য়্যালায়্যান্সের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন—"বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে আমার সাম্রাজ্যের বশে আনিয়া দিন"। "ধর্ম্মসম্মিলন" হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। ইয়াঙ্কি সভাপতি মনুরো গম্ভীরভাবে বলিলেন, "খবরদার—আমেরিকার ভূখণ্ডে কোন ইয়োরোপীয়ান হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ইয়োরোপের মামুলি রাষ্ট্র-নীতি আমেরিকায় প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না। আমেরিকার লোকেরা আমেরিকার উত্তর, মধ্য ও

দক্ষিণ প্রান্তের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ। আজ পর্য্যন্ত যে সকল ইয়োরোপীয়ানের সম্পত্তি এই নবভূখণ্ডে রহিয়াছে তাহা ভবিষ্যতেও থাকিবে। কিন্তু এই মহাদেশের আর এক ছটাক জমিও কোন ইয়োরোপীয়ান্ জাতি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারিবেন না"। এই ইয়োরোপীয়-বহিষ্কার-ঘোষণাই মন্‌রো-নীতি। নানা কারণে "ধর্ম্মসম্মিলন" স্পেনের সাহায্য করিতে অসমর্থ হইলেন—ঘটনাচক্রে ইংরাজও কতকগুলি স্বকীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ইয়াঙ্কিদের কথায়ই সায় দিলেন। মোটের উপর মন্‌রোর জয় হইল। ইয়াঙ্কিরা প্রকারান্তরে সমগ্র আমেরিকাখণ্ডের অভিভাবক হইলেন। ইয়োরোপীয়েরা দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলি ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইবার অবসর এখনও পান নাই। "The Republics of Central and South America" নামক গ্রন্থের বহির্ব্বানিজ্য ও বিদেশীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে আদান প্রদান বিষয়ক অধ্যায়ে এনক্ (Enock) বলিতেছেন—

"There is little doubt that the partition of various territories of Latin America by certain European powers, would have taken place were it not for the restraining influence of the United States."

অর্থাৎ "ইয়াঙ্কিরাষ্ট্র অনেকাংশে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। ইয়াঙ্কিদের অভিভাবকতায় এই অবনত রাষ্ট্রগুলি ইয়োরোপীয়গণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।"

ইয়াঙ্কিরা ইয়োরোপ হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসিতেন। যুক্তরাষ্ট্রের পিতাস্বরূপ জর্জ্জ ওয়াশিংটনও ইয়াঙ্কিদিগকে ইয়োরোপ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"ইয়োরোপের

সঙ্গে ব্যবসায় চালাইবে। কিন্তু কোন ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন প্রকার সন্ধিস্থাপন করিবে না। ইয়োরোপীয়েরা বড় কুচক্রী—উহাদের গোলযোগের ভিতর একবার প্রবেশ করিলে বাহির হওয়া কঠিন হইবে। আমরা শিশুজাতি—আমাদের সতন্ত্রতা রক্ষা করিবার জন্য সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাহা ছাড়া, আমাদের রাষ্ট্রশাসন-প্রণালী জগতে নূতন। পুরাতন সভ্যতার অধিকারীরা এ তত্ত্ব বুঝিবে না। কাজেই উহাদের সঙ্গে আমাদের না মেশাই ভাল।" ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ ওয়াশিংট জনগণকে বিদায়-বক্তৃতায় বলেন—

"The nations of Europe have important problems which do not concern us as a free people. The causes of their frequent misunderstandings lie far outside of our province, and the circumstance that America is geographically remote will facilitate our political isolation, and the nations who go to war will hardly challenge our young nation, since it is clear that they will have nothing to gain by it." সভাপতি জেফারসনও এইরূপ মতই পোষণ করিতেন।

পরে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হোলি য়্যালায়্যান্সের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া সভাপতি মনরো কংগ্রেসকে লিখিয়া পাঠান—

(1) "We should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety.

(2) We could not have any interposition for the purpose of oppressing governments on this side of the

water whose independence we had acknowledged or controlling in any manner their destiny by any European power, in any other light than as a manifestation of an unfriendly disposition toward the United States."

অর্থাৎ (১) ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রশাসন-প্রণালী আমেরিকার কোন অংশে প্রবর্ত্তিত হইতেছে দেখিলেই বুঝিব, আমাদের ইয়াঙ্কি স্বরাজের সম্মুখে বিপদ উপস্থিত।

(২) আমেরিকা খণ্ডের কোন অংশে কোন ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র কিছু মাত্র জুলুম করিলে অথবা হুকুম চালাইলে আমরা বুঝিব যে, ইয়াঙ্কি স্বরাজের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করা হইতেছে।

ইয়াঙ্কিদের এই চোখ রাঙান দেখিয়াই ইয়োরোপীয়েরা হতভম্ব হইয়া যায় নাই। ইয়োরোপীয়েরা নিজ নিজ গৃহবিবাদ মিটাইতে ব্যস্ত ছিল—এজন্য দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার নূতন দেশগুলির ভিতর স্বকীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বেশী নজর দিতে পারে নাই। ১৮২৩ সালের পর ইয়োরোপের ভিতর তিন চারিটা বড় বড় বিপ্লব সাধিত হইয়া গিয়াছে। সেই সকল সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারা সহজ কথা নয়। ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ, ইতালীয়, হাঙ্গারীয়ান, রুশ এবং অন্যান্য জাতীয় নরনারী ল্যাটিন-আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছে। এশিয়া হইতে জাপানীরাও ল্যাটিন-আমেরিকায় উপনিবেশ বসাইতেছে। ল্যাটিন-আমেরিকার ২০ স্বরাজে এই সকল বিদেশীয় বসতি হইতে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় গোলযোগ উপস্থিত হইবে। "মন্‌রো-নীতি"র দোহাই দিয়া ইয়াঙ্কিরা ইয়োরোপীয়ান অথবা এসিয়াটিক পীতজাতিকে হঠাইতে পারিবেন না। সেনাবল এবং নৌবল সাহায্য না করিলে একমাত্র বাক্য-

বলে জার্ম্মাণ বা জাপানীকে ল্যাটিন-আমেরিকা হইতে বিতাড়িত করা অসম্ভব হইবে। মনরো-নীতির বুজরুকি ইয়াঙ্কি ভিন্ন আর কোন জাতি বর্ত্তমান কালে সম্মান করে না। ইয়োরোপীয়ান এবং জাপানী বলিতেছে :—

(১) "প্রজাতন্ত্র-শাসন বা স্বরাজ ইয়াঙ্কিস্থানে আবিষ্কৃত এবং প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু এই শাসন-প্রণালীর সুফল আজকাল জাপান, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ইতালী ইত্যাদি প্রায় সকল সভ্য দেশেই জনগণ ভোগ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, সুইজর্ল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে ত স্বরাজ আছেই। সুতরাং আজকাল কুশাসনের কথা বলিয়া ইয়াঙ্কিরা এশিয়া ও ইয়োরোপকে নিন্দা করিতে পারেন না। অষ্টাদশশতাব্দীতে আমাদের অসম্পূর্ণতা ছিল স্বীকার করিতেছি। তাহা ছাড়া, আর একটা কথাও বুঝা উচিত। ল্যাটিন আমেরিকায় যে সকল তথাকথিত স্বরাজ বা রিপাব্লিক স্থাপিত হইয়াছে তাহাদিগকে সত্যসত্যই কি স্বরাজ বলা চলে? এগুলিতে অরাজ বা "য়্যানার্কি" বা "মাৎস্যন্যায়ে"র নামান্তর মাত্র দেখা যায়! একটা কথার মারপ্যাচে সভ্যতর জাতিগুলিকে অসভ্য জনপদের কর্ত্তৃত্ব হইতে বহিষ্কৃত করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

(২) আমরা না হয় নবভূখণ্ডের দেশ দখল করিতে অগ্রসর হইব না। আমেরিকার কোন রাষ্ট্রীয় গোলযোগে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না। কিন্তু ইয়াঙ্কিরা কেন পুরাতন ভূখণ্ডের রাষ্ট্রমণ্ডলে নাক গুঁজিতেছেন? চীনে গোলযোগ বাধিল—তাহাতে ইয়োরোপীয়ানদিগের সঙ্গে ইয়াঙ্কিরা যোগ দিলেন! ফিলিপাইন দ্বীপের দেড় কোটি নরনারীকে ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ইহা কি মনরো-নীতির প্রতিকূল আচরণ নয়? যদি আমাদিগকে আপনাদের মণ্ডল হইতে বাহিরে রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র হইতেও আপনাদের বাহিরে থাকা

উচিত। কিন্তু দেখিতেছি, ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র আজকাল এশিয়া ও ইয়োরোপের সকল রাষ্ট্রব্যাপারেই একজন অগ্রণী!"

ইয়াঙ্কিদের আধুনিক ইম্পিরিয়্যালিজ্‌ম্‌ বা সাম্রাজ্য-নীতি সমালোচনা করিয়া অনেকেই বলিতেছেন—"আর মনরো-নীতির কথা তুলিবেন না। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রও যে বস্তু ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রও সেই বস্তু—এক্ষণে শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি চলিবে!" তারপর, ল্যাটিন আমেরিকার সমস্যাগুলিও বড় সহজ নয়। কথার চটকে বিদেশীয়গণকে ল্যাটিন আমেরিকার স্বরাজগুলি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া অসম্ভব। মেক্সিকো হইতে চিলি পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রই ইয়োরোপ হইতে টাকা ধার লইয়া থাকেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশীয় লোকের কোটি কোটি টাকা এই সকল দেশে খাটিতেছে। অথচ টাকা আদায় করিবার সুবিধা পাওয়া যায় না—কারণ গভর্মেণ্টগুলি প্রায়ই দেউলিয়া থাকে। অধিকন্তু এই সকল দেশে বিপ্লব লাগিয়াই আছে। কাজেই বিদেশীয় ধনী জনগণের জীবন ও ধনসম্পত্তি সর্ব্বদা সুরক্ষিত হয় না। অশান্তি ও অরাজকতার ফলে অনেক সময়েই টাকা মারা যায়।

এই জন্য মনরো-নীতির বিরুদ্ধবাদী ইয়োরোপীয়েরা ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্রকে বলিতেছেন—"আমরা ত গায়ে পড়িয়া তোমাদের ল্যাটিন স্বরাজে যাই না। স্বরাজের শাসনকর্ত্তারা এবং জনগণ আমাদের টাকা ধারেন। আমাদিগকে ঐ সকল দেশে লইয়া যাওয়া উহাঁদেরই প্রধান স্বার্থ। অথচ ইহাঁরা সহজে টাকা শোধ দিতে পারেন না। আমরা কি কোন বন্ধক না লইয়াই টাকা ধার দিব? আমাদের ব্যবসায়ীরা কি এতই বেকুব? কাজেই আমাদের রাষ্ট্রসমূহ ল্যাটিন স্বরাজগুলির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। যাহাতে ঘনঘন বিপ্লব উপস্থিত না হয়, যাহাতে দেশের ভিতর সর্ব্বদা শান্তি বিরাজিত থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি

রাখা আমাদের রাষ্ট্রসমূহের কর্ত্তব্য। এইখানেই বুঝিতেছেন যে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্য্য। যদি ইয়াঙ্কি যুক্ত-রাষ্ট্র আমাদের জনগণের জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রসমূহ ল্যাটিন আমেরিকায় আর হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইবে না। আপনারা ত মনরো-নীতি জারী করিয়া কাগজে কলমে ল্যাটিন আমেরিকার অভিভাবক এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে অভিভাবক হউন—উহাদের দেশে শান্তি ও সুশাসনের ব্যবস্থা করুন—উহাদিগকে প্রয়োজনীয় টাকা ধার দিতে প্রবৃত্ত হউন—এবং আমাদের টাকা শোধ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তবেই বুঝিব মনরো-নীতি রক্ষা করিবার ক্ষমতা আপনাদের আছে। তাহা না পারিলে বৃথা বাক্যাড়ম্বর করিবেন না। দুনিয়ার অন্যত্র যেরূপ হইয়াছে ল্যাটিন আমেরিকায়ও সেই রূপই হইবে—যথাসময়ে ভাগবাটোয়ারা সুরু হইবে।"

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান কালে মনরো-নীতি বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। "গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।" ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব আদৌ চাহে না। এই অভিভাবকত্বের ফলে ল্যাটিন আমেরিকা নিরাপদে শৈশব কাটাইয়াছে সত্য—কিন্তু এক্ষণে তাহাদের যৌবনকাল। ইহারা ইয়াঙ্কিদের কর্ত্তামি একেবারে সহ্য করিতে পারে না। এনক্ বলিতেছেন—

"The attitude of the United States towards Latin America has at times given rise to a feeling of resentment and perplexity on the part of their sensitive southern neighbours." দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বর্দ্ধনশীল

রাষ্ট্রপুঞ্জ অনেক সময়ে ইয়াঙ্কিদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কাজেই ইয়াঙ্কিদের অভিভাবকত্ব আর চলিবে না।

অধিকন্তু ইয়াঙ্কিরা এতদিন ল্যাটিন আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন ও নিরপেক্ষ ছিলেন। ইহাঁদের নিজের দেশ গড়িয়া তুলিতেই সময় ও অর্থব্যয় যৎপরোনাস্তি হইয়াছে। অন্যত্র দৃষ্টি ফেলিতে ইহাঁদের অবসর হয় নাই। এই জন্য বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা ঐ সকল দেশে ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। বিদেশীয় টাকায় ল্যাটিন স্বরাজগুলি একপ্রকার কেনা হইয়া রহিয়াছে। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া ইয়াঙ্কিরা প্যান্‌-আমেরিকান্‌ ইউনিয়ন বা আমেরিকা-সম্মিলনী খাড়া করিয়াছেন। ইহাঁরা আর নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবেন না মনে হইতেছে—কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার গতি ফিরান এখন অসাধ্য—ওখানে কর্ত্তামি করাও দূরের কথা। বস্তুতঃ আমেরিকা-সম্মিলনীতে ল্যাটিনদিগকে হাতে পায়ে ধরিয়া রাখা হইতেছে।

নিগ্রো-বিশ্ববিদ্যালয়

নিগ্রোরা বেশ পরিহাসরসিক ও আমোদপ্রিয়। ইহারা গাল ভরিয়া হাসিতে পারে। এই খোলাপ্রাণ নরনারীর সঙ্গে কথা বলিয়া সুখ পাওয়া যায়।

আজ প্রায় একহাজার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ও রমণীকে একসঙ্গে দেখিলাম। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিগ্রো অধ্যাপক কুকের গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। সেই উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ ও কার্য্য-পরিচালনা দেখিবার সুযোগ ঘটিল। প্রায় চারি ঘণ্টা এই কৃষ্ণাঙ্গ কর্ম্মী পুরুষের সঙ্গে কাটাইলাম।

কুকের বয়স ষাট বৎসরের অধিক—কিন্তু দেখিলে বোধ হইবে ৪০।৪৫ বৎসরের অধিক নয়। ইঁহাকে প্রধানতঃ সম্পাদক ও কর্ম্ম-কর্ত্তার কার্য্য করিতে হয়। এজন্য সর্ব্বদাই ইনি ব্যস্ত। একটা বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্ব ইঁহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া ছাত্র পড়ানও আছে। ইনি বানিজ্য বিষয়ক আইন এবং আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র-মণ্ডলের বিধি-ব্যবস্থা এই দুই বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, বোর্ডিংগৃহ ইত্যাদি দেখা গেল। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্রীরাও ছাত্রদের সঙ্গে পড়ে। ইয়াঙ্কিস্থানের এই ধরণের স্ত্রীপুরুষ-সমন্বিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কো-এডুকেশন্যাল (Co-educational) বলে। রমণী-স্বাধীনতাপ্রার্থী লোকেরা এইরূপ বিদ্যালয়ই পছন্দ করে।

কুক একজন ট্রিনিড্যাডদ্বীপবাসী ভারত সন্তানের সঙ্গে পরিচিত

৪০। নিগ্রো অধ্যাপক কুক্

করিয়া দিলেন। ইনি এখানকার একজন ছাত্র—ইঁহার জন্ম হইয়াছে ট্রিনিড্যাডে—কিন্তু মাতা আসিয়াছেন গাজিপুর হইতে এবং পিতা মাদ্রাজ অঞ্চলের লোক। হিন্দীতে দুই চারিটা কথা বলিবার ক্ষমতা আছে দেখিলাম। ইনি বলিলেন—"ট্রিনিড্যাডের হিন্দুস্থানীগণ ক্রমশঃ মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির কথা ভুলিয়া যাইতেছে। ইংরাজী ভাষাই ইহাদের মাতৃভাষায় পরিণত হইবে মনে হইতেছে।" ছাত্রের চেহারা দেখিয়া নিগ্রোর মূর্ত্তি মনে পড়ে না—দেখিবামাত্রই আলাপ হইবার পূর্ব্বে আমি ইহাকে হিন্দুস্থানের লোক বলিয়া সন্দেহ করিতেছিলাম। ইনি এখনও খৃষ্টান নহেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের একজন ভারত-সন্তানের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনিও কোন বৃটিশ দ্বীপের অধিবাসী। তিনি খৃষ্টান—চাকরী করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিবার সঙ্কল্প আছে বুঝিয়াছিলাম।

ছাত্রীদিগের বোর্ডিংগৃহ দেখিবার সময়ে একজন বলিলেন—"মহাশয় এই ঘরটা আমাদের ভজনালয়। ইয়াঙ্কিরা ধর্ম্মকথার আলোচনা অত্যধিক করে—উঠিতে বসিতে ইহাদের মুখে প্রার্থনা শুনিতে পাইবেন। অথচ জীবনে ইহারা নিতান্ত নাস্তিক—ভগবদ্ভক্তি প্রায়ইদেখা যায় না। আমরাও ইহাদের সংস্পর্শে থাকিয়া মৌখিক ধর্ম্ম যথেষ্টই শিখিয়াছি। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে আমাদের জীবন উন্নত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না।" নিগ্রোরমণী ট্রিনিড্যাডবাসীকে বলিলেন—"এই ঘরে কোন সময়ে প্রার্থনা হয়— কোন সময়ে নাচগান বাজনা হয়!"

বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনীয়ারিং-বিভাগ এবং চিকিৎসা-বিভাগও আছে। ইয়াঙ্কিস্থানের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই নিগ্রো-প্রতিষ্ঠানেও ততগুলি লক্ষ্য করিলাম। আসবাব-পত্র, সাজান গুছান, পরিচালনা ইত্যাদি সবই এক ধরণের। আদর্শের কিম্বা

কর্ম্মপ্রণালীর পার্থক্য কিছুই নাই। নিগ্রোদের কারখানায় আসিলে নূতন কিছু দেখিতে পাইব এরূপ ভাবা ভুল। তবে কলাম্বিয়া, হার্ভার্ড ইত্যাদির সঙ্গে তুলনায় হাওয়ার্ড একটা পাঠশালা মাত্র। অবশ্য খরচপত্র, টাকা-পয়সা, বাহ্যচটক ইত্যাদির কথা বলিতেছি। নিগ্রোবিশ্ববিদ্যালয় কিছু দরিদ্র। এইজন্য যতটুকু প্রভেদ হইতে পারে তাহাই লক্ষ্য করা যায়। শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গের জাতিগত, চরিত্রগত অথবা মনীষাগত প্রভেদ কিছুই পাই না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাপেল বা ধর্ম্মমন্দিরে ছাত্র, ছাত্রী এবং অধ্যাপকগণ সমবেত হইলেন। এখানকার সভাপতি একজন শ্বেতাঙ্গ—শুনিলাম অধ্যাপকগণের মধ্যেও অনেক শ্বেতাঙ্গ আছেন। কুক বলিলেন—"পূর্ব্বে বহু শ্বেতাঙ্গ ছাত্রও হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত। গত দশবৎসর হইতে তাহারা এদিকে আর ঘেঁশেন না—সম্প্রতি ১৫০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে অধিকাংশই নিগ্রো।" ধর্ম্মমন্দিরে যথারীতি গান ও বক্তৃতা হইল।

সর্ব্বসমেত ১৩০ জন অধ্যাপক ও সহকারী শিক্ষক এখানে কার্য্য করেন। বার্ষিক ব্যয় মোটের উপর ৬০০০০০৲। আমেরিকার হিসাবে এ খরচ অতি সামান্য মাত্র। শুনিলাম, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এত বড় নিগ্রো-বিশ্ব-বিদ্যালয় আর নাই। টাস্কেজীতে শিল্পশিক্ষা হয় মাত্র—সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নাই।

কুক্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"অধিকাংশ ছাত্র ও ছাত্রীকেই ত কৃষ্ণাঙ্গ বোধ হইতেছে না। কোন কোন মুখের গঠনও শ্বেতাঙ্গ নরনারীর অনুরূপ। এমন কি চুলও কোঁকড়া নয়। কয় পুরুষে এইরূপ বর্ণপরিবর্ত্তন এবং গঠনপরিবর্ত্তন হয়?" ইনি বলিলেন—"আমার কথা বলিতেছি শুনুন। আমি ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে গোলাম

হইয়া জন্মিয়াছি। আমার মাতা নিগ্রো—পিতা শেতাঙ্গ। আমার চেহারা দেখিয়া আপনি কখনই ভাবিতে পারিবেন না যে, আমার ভিতর কৃষ্ণাঙ্গের রক্ত আছে। আমার রং পূরাপূরি শ্বেতাঙ্গের রঙের মতও নয়। কিন্তু আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই শ্বেতাঙ্গদিগের সদৃশ! দেখুন আমার চুল পর্য্যন্ত আপনার মতই লম্বা। এক পুরুষে দো-আঁসলা নরনারীর এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। আমি যদি কোন শ্বেতাঙ্গ রমণীকে বিবাহ করিতাম তাহা হইলে খাঁটি শ্বেতাঙ্গ সন্তানের জন্ম হইত। রং বদলান অতি সহজ। চুল বদলাইতে বোধ হয় দুই-তিন পুরুষ লাগে। আমার বিশ্বাস, রক্তসংমিশ্রণের সুযোগ যদি বেশী পাওয়া যায়, তাহা হইলে গোলামের জাতি বলিয়া একটা পদার্থ পৃথিবীতে থাকিবেই না। আমি এখনই অনেক তথাকথিত শ্বেতাঙ্গের জন্ম বিবরণ জানি। তাঁহারা আসল গোলামের বাচ্চা। কিন্তু চেহারা দেখিয়া কাহারও ধরিবার সাধ্য নাই।"

উচ্চশিক্ষিত নিগ্রোদের সঙ্গে কথা বলিলে তাঁহাদিগকে কোন একটা নিকৃষ্ট জাতির অন্তর্গত নরনারী ভাবিতে পারা যায় না। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, ইয়াঙ্কি, ইংরাজ, হিন্দুস্থানী, জাপানী যে জাতীয় শিক্ষিত লোকই হউন না—দেখিতেছি চিন্তাপ্রণালী, কর্ম্মপ্রণালী, রসবোধ বিচারশক্তি, ইত্যাদি সবই ন্যূনাধিক পরিমাণে একরূপ। অবশ্য বীরপদবাচ্য অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান্ লোকের কথা ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু সাধারণ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান যুগে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এক ধরণে হাসে, এক কায়দায় কথা বলে, এক প্রণালীতে সমস্যার সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হয়, একই ধরণের সাহিত্যশিল্পে আনন্দ উপভোগ করে। আধুনিক জগতের শিক্ষাপ্রণালী দুনিয়ার সকল লোককেই মোটের উপর এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তুলিতেছে। নিগ্রোসমাজে বিচরণ করিয়া এই ধারণা বদ্ধমূলভাবে লাভ করিলাম। ৫০ বৎসর

পূর্ব্বে এই জাতির প্রায় প্রত্যেক নরনারীই খাঁটি গোলাম ছিল। অথচ আজ তাহাদের সন্তানসন্ততিরা শিক্ষা-প্রভাবে ইয়াঙ্কি, ইংরাজ, হিন্দু, জাপানীর সঙ্গে সমান ভাবে বিশ্বসমালোচনায় সমর্থ।

কুক বলিলেন—"আমাদের এখানে একজন ভারতীয় মুসলমান ছাত্র ব্যবসায়বিদ্যা শিখিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছে। শুনিয়াছি সে কোন তৈলের ব্যবসায়ে কর্ম্ম করিতেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেখিতেছি, নিগ্রো ছাড়া অন্যান্য জাতীয় লোকও আপনাদের এখানে আসে?" ইনি বলিলেন—"আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও যাহা আমাদের এই হাওয়ার্ডও তাহাই।"

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল দরবার হইতে বহন করা হয়। কোন কোন কংগ্রেসওয়ালা এইবার টাকা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দেশময় নিগ্রোবন্ধু শেতাঙ্গেরা আন্দোলন করিয়া প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে দেন নাই।

কুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিভাগ, ফার্ম্মেসি (Pharmacy) বা ঔষধ-প্রস্তুতকরণ-বিভাগ এবং দাঁত-বাঁধান-বিভাগ ইত্যাদি সকল বিভাগের ল্যাবরেটরীতে লইয়া গেলেন। অধ্যাপকগণের সঙ্গে আলাপ হইল। একজন বলিলেন—"মহাশয়, কিছুদিন পূর্ব্বে আপনাদের জগদীশচন্দ্র বসু ওয়াশিংটনে উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।" নিগ্রোরা চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইতেছে। বর্ত্তমান সভাপতি উড্রোউইল্‌সন সম্বন্ধে কুক বলিলেন—"মহাশয়, ইহাঁকে সভাপতি বলিয়া খাতির করিতে বাধ্য। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ইহাঁর প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নাই। ইনি নিগ্রোদিগের হিতৈষী নহেন। অবশ্য হাওয়ার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের টাকা বন্ধ করিবার আন্দোলনে ইনি আমাদের বিরুদ্ধে যান নাই। তাহা হইলে ইহাঁর লোকসমাজে মুখ দেখান কঠিন হইবে যে!"

অষ্টম অধ্যায়

মধ্য-পশ্চিম প্রদেশ

রেলে আটশত মাইল

এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বপ্রান্তে কাটাইলাম। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল ছাড়াইয়া বেশী দূর আসি নাই। নায়গ্রাপ্রপাতে এবং আল্‌বানিতে কয়েকদিনের জন্য সমুদ্র হইতে দূরে ছিলাম। বষ্টন, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন দেখিয়া পূর্ব্বপ্রান্তের সম্পূর্ণ ধারণা করা চলে না—কারণ বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে এই অঞ্চলের উত্তরার্দ্ধ দেখা হইল মাত্র। ওয়াশিংটনের দক্ষিণে জনপদসমূহের নূতন আকৃতি এবং নূতন সমস্যা। এই দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলি এযাত্রায় দেখিবার সুযোগ ঘটিল না। আলাবামা-রাষ্ট্রে বুকার ওয়াশিংটনের টাস্কেগী বিদ্যালয় দেখিবার ইচ্ছা ছিল। তাহার পথে জর্জ্জিয়া-প্রদেশের এক নগরে কোন ইয়াঙ্কি রমণী নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা পূর্ব্বে গোলামখানার মালিক ছিলেন। এক্ষণে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গোলামজাতির হিতসাধনে ব্রতী আছেন। ইহাঁদের নিগ্রোসেবা-কার্য্যও দেখিবার সুযোগ জুটিল না। ঘটনাচক্রে অতি সত্বরেই পূর্ব্বপ্রান্ত পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলাম।

কলিকাতায় আমরা অনেক সময়ে দেওঘর, মধুপুর ইত্যাদি স্থানকেও 'পশ্চিম' বলিয়া থাকি। ভাগলপুর, বাঁকিপুর, কাশী, এলাহাবাদের ত

কথাই নাই। ভারতে পশ্চিমেরও পশ্চিম আছে। বলা বাহুল্য, বিশাল যুক্তরাষ্ট্রদেশেও পশ্চিম, পশ্চিমের পশ্চিম, মহাপশ্চিম ইত্যাদি রূপে জনপদসমূহের বিবরণ নিতান্তই স্বাভাবিক। ওহায়ো, ইলিনয়, উইস্কন্সিন, মিশিগান ইত্যাদি প্রদেশ "মিড্‌ল্ ওয়েষ্ট" অর্থাৎ মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত। ইঁহাদিগকে মধ্য-পশ্চিম রাষ্ট্র বলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া অবধি দিবাভাগে রেলে যাতায়াত করা হয় নাই। কাজেই দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ে নাই। এইবার দ্বিপ্রহরে রেলে চড়িলাম। গাড়ীতে বসিয়া বাহিরের বস্তুগুলি দেখিবার ব্যবস্থা আছে। গাড়ীর এই অংশকে "অব্‌জার্ভেশন-কার" বা পর্য্যবেক্ষণ-কামরা বলে। ইহা শকটের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। ইহাতে খানিকটা খোলা স্থান আছে। এখানে বসিলে চারিদিককার আবেষ্টন পুরাপুরি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পর্য্যবেক্ষণ-কামরা পার্লার-কারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। পার্লার-কার একপ্রকার বৈঠকখানা বিশেষ। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র চেয়ারে বসিবার স্থান আছে। চেয়ারগুলি যথেচ্ছভাবে সহজেই সকল দিকে ঘুরান ফিরান যায়। মেজেতে কার্পেট পাতা। কামরায় প্রবেশ করিলে গাড়ীর কথা মনে না হইয়া গৃহের কথাই মনে আসে। তাহার উপর এই সকল দেশে ঘরে গাড়ীতে সর্ব্বত্রই নলের ভিতর দিয়া গরমজল প্রবাহিত করা হয়। তাহার ফলে ঘর গাড়ী সবই প্রয়োজন অনুসারে তাপ পায়। কাজেই লোকজন শীতে কষ্ট পায় না। পার্লার-কারের আরাম-চেয়ারে বসিয়া এই সকল সুবিধার কথাই ভাবিতেছিলাম। ভারতবর্ষে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরাও এখানকার মত আরাম ভোগ করিতে পারেন কি?

রেলপথের দুই ধারে বসতি অতি বিরল। মাঝে মাঝে দুই একটা

পল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামের রাস্তাগুলি আমাদের দেশীয় কর্দ্দমযুক্ত পথের মত। পাড়াগেঁয়ে ডাকঘর দেখিয়াও ভারতীয় কথাই মনে পড়িল। প্রধানতঃ মাঠ পাহাড় উপত্যকা এবং পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীই এই অঞ্চলে বেশী চোখে পড়ে। পর্ব্বতগুলির নাম 'আলিগানিজ্।"

ভারতের মধ্যপ্রদেশ অথবা গোয়ালিয়র হইতে বোম্বাই কিম্বা পুণা যাইতে হইলে "পশ্চিম-ঘাট" পর্ব্বতশ্রেণী পার হইতে হয়। গাড়ীতে বসিয়া সেই দৃশ্যই মনে পড়িল। কোথাও গাড়ী পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া চলিতেছে—উর্দ্ধে দেখিতেছি অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, নিম্নে অনতিবিস্তৃত নদী। কোথাও বা দুই সমান্তরাল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথের ভিতর দিয়া যাইতেছি। কোথাও বা পাহাড় কাটিয়া রাস্তা তৈয়ারী করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে বোধ হয় যেন আমাদের চারিদিকেই পর্ব্বতের আবেষ্টন—যেন গাড়ী সম্মুখের কোন পাহাড়ে ঠেকিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে। পর্য্যবেক্ষণ-প্রকোষ্ঠে বসিয়া পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে থাকিলে অনেক সময়ে মনে হয় যেন পর্ব্বত-প্রাচীর-বেষ্টিত নিম্নভূমির উপর রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। মাঠে পাহাড়ের গায়ে সর্ব্বত্রই শ্বেত তুষারের চাপ দেখিতে পাইলাম।

সন্ধ্যার সময়ে ভোজনালয়ে চা-পান ও ফলাহার করা গেল। মূল্য লাগিল ২৶৹, বক্‌শিষ দিতে হইল ।৴৹। বেশী খাইলে আরও বেশী পয়সা দিতে হইত। গাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করিতে হইলে প্রতিবারে ২৷৹ টাকার কমে নির্ব্বাহ হয় না! বিলাতের গাড়ীতে খাওয়াখরচ এত বেশী নয়।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ে গাড়ী পিট্‌স্‌বার্গে থামিল। পিট্‌স্‌বার্গ যুক্তরাষ্ট্রের উদীয়মান নগর—একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র—ইয়াঙ্কিদের লীড্‌স্ বা ম্যাঞ্চেষ্টার। গাড়ী হইতে অন্ধকারে দেখা গেল, আকাশস্পর্শী প্রাসাদ-

সমূহের বাতিগুলি তারার মত বোধ হইতেছে। অথবা বোধ হইল যেন উচ্চ পর্ব্বতের গাত্রস্থিত ছোট ছোট গৃহ হইতে আলোক আসিতেছে। নিউইয়র্কের স্কাই-স্ক্রেপার্স ওয়াশিংটনে বেশী দেখিতে পাই নাই। পিট্স্‌বার্গে বোধ হয় অনেক।

পিট্স্‌বার্গে পার্লার-কার কাটিয়া রাখা হইল—আরোহীরা পুল্‌ম্যান্‌-কারের শয়ন কক্ষে আসিলেন। নৈশভোজন পূর্ব্বেই সারা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে সাতটা সাড়েসাতটার পূর্ব্বেই রাত্রিকালের আহার সারিতে হয়।

বিছানা য়ণ্ডইয়া লফ্‌লিন (Laughlin) প্রণীত "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আমেরিকা" (Industrial America) গ্রন্থ পাঠ করা গেল। লফ্‌লিন শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক। কিছুদিন পূর্ব্বে ইঁহাকে জার্ম্মানিতে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এইরূপ বক্তৃতার ব্যবস্থায় জার্ম্মান সম্রাট্ স্বয়ংই প্রধান উদ্যোগী। গ্রন্থের ভূমিকায় দেখিলাম—"In connection with the interchange of professors between Germany and America, in which the German Emperor has taken an interest, the author was invited by Director Althoff, of the *Cultas--Ministerium*, to deliver a course of lectures in the spring of 1906 before the *Vereinigung fur Staats-wissen schaftliche Fortbildung*, in Berlin. Lectures from this course were also given in the *Gurzenich* in Cologne and before the students of the University of Berlin." বক্তৃতার বিষয় ছিল—বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বৈষয়িক সমস্যাসমূহ। বক্তা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছিলেন :—

১। ইয়োরোপে ও আমেরিকায় ব্যবসায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

২। সংরক্ষণ-নীতি।

৩। মজুর-সমস্যা।

৪। 'ট্রাষ্ট" বা মহাজন-সঙ্ঘের কথা।

৫। রেলওয়ে-সমস্যা।

৫। ব্যাঙ্কিং।

৭। যুক্তরাষ্ট্রের ধন-বিজ্ঞান-চর্চ্চার বর্ত্তমান অবস্থা।

অধ্যাপক লফ্‌লিন জার্ম্মান ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরে প্রবন্ধগুলি ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভে ইয়াঙ্কিসন্তান নিম্নলিখিতরূপে আমেরিকা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন:—

"The ships that carried Balboa and other early adventurers to America sought on Eldorado and cargoes of gold and silver. The ships which come to America from Europe today carry many who are seeking their fortunes in the New World; but they take back much more of golden grain than of the precious metals. In the soil of American farms, in the mines of American coal, iron, zinc, copper and lead, in the deposit of American petroleum and nickels in the areas of American forests, in the efficiency of American labour, and in the genius of American industrial managers is to be found the real Eldorado. Resources far beyond the old traders' dreams of avarice, the adaptability and cleverness of our labour, and the inventiveness and highly developed managerial

power of our captains of industry, are the causes which have enabled the United States successfully to enter the markets of the Old World in these recent years."

অর্থাৎ "বাল্‌বোয়া এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় কর্ম্মবীরেরা আমেরিকায় আসিয়াছিলেন স্বর্ণ-ভূমির তল্লাসে। তাঁহারা সোণারূপার লোভে সাগর লঙ্ঘিতে প্রয়াসী হইতেন। আজকালও ইয়োরোপ হইতে আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ নরনারী আসিয়া থাকে। তাহারা অন্নের জন্য আসে। দেশে ফিরিবার সময়ে এই সকল লোক কি কেবল টাকা পয়সাই সঙ্গে লইয়া যায়? তাহা নহে। আমেরিকা হইতে ধাতুর সোণারূপা অপেক্ষা সোণার শস্যই বেশী রপ্তানি হয়। আমেরিকা সত্য সত্যই স্বর্ণ-ভূমি। কিন্তু কেবল চক্‌চকে পীতবর্ণ সুবর্ণ ধাতুর জন্যই আমেরিকাকে সোনার দেশ বলা উচিত নয়। এখানকার সোনা ফলে কৃষিভূমিতে; কয়লা, লোহা, তামা ও সীসার খনিতে; কেরোসিন তেলের কূপে; বনজঙ্গলের কাঠ খড়ঘাসে। আর ফলে ইয়াঙ্কিদের মাথায়, ইয়াঙ্কিদের পরিশ্রমে, ইয়াঙ্কিদের প্রতিভায়, ইয়াঙ্কিদের কর্ম্মকৌশলে। পুরাতন আমলের লোকেরা কত লোভের বশেই না আমেরিকায় আসিত! কিন্তু তাহারা আজ জীবিত থাকিলে কি দেখিত? দেখিত যে, তাহাদের বিরাট লোভের চরম সীমা ছাড়াইয়াও আমেরিকায় ধনধান্য আছে। এখানকার প্রাকৃতিক সুযোগ অসীম, এখানকার লোকজনের কর্ম্মতৎপরতা অসীম, এখানকার ধুরন্ধরদিগের সাহস ও উৎসাহ অসীম। কাজেই আজকাল আমেরিকা সকল ক্ষেত্রেই ইয়োরোপ ও এশিয়ার বাজারে ইয়োরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী।"

যথাসময়ে নিগ্রোভৃত্য আসিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। সকালে উঠিয়া দেখি, পাহাড়ময় দেশ ছাড়াইয়া আসিয়াছি—বিশাল প্রান্তরের ভিতর দিয়া

গাড়ী চলিতেছে। প্রান্তর বালুকাময় এবং অনেকটা তরুহীন বলা যাইতে পারে। খানিক পরে মিশিগান হ্রদের কূল দিয়া চলিতে লাগিলাম। প্রায় দশটার সময়ে গাড়ী শিকাগোতে পৌছিল। শুনিলাম, এই লাইনে গাড়ী প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে পৌছে। আজ প্রায় ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হইল।

গাড়ী থামিবার কিছু পূর্ব্বে ভৃত্য জামা ঝাড়িয়া দিল। সকালে ঝাটার বাড়ি খাওয়া গেল। সে রাত্রিতেই জুতা ব্রুশ করিয়া রাখিয়াছে। গাড়ী হইতে নামিবার সময়ে চামড়ার ব্যাগগুলিও পরিষ্কার করিয়া দিল। মোটের উপর রেলে ভ্রমণ করিতেছি, কি বিলাসভবনে বাস করিতেছি, বুঝিতে পারিলাম না। ভৃত্যকে বকশিষ দেওয়া গেল বার আনা।

ষ্টেসনের ফটকের সম্মুখেই একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। হোটেলের নাম করিলাম। সে ট্যাক্সিগাড়ী ডাকিয়া দিল—তৎক্ষণাৎ পয়সা দিবার নিয়ম। ভাড়া দিতে হইল ১১॥০। ভাবিলাম 'ত্রাহি মধুসূদন!' ষ্টেসন হইতে হোটেল ৮।১০ মাইল দূরে। শিকাগো সহর ২৬ মাইল বিস্তৃত। কাজেই এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে যাইতে হইলে লম্বা পাড়ির কথা ভাবিতে হয়। যাহা হউক, মোটরভাড়া সাড়ে এগার টাকা দিবার পর মনটা কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল। পর্য্যটনলীলা এইখানেই বা শেষ করিতে হয়!

হোটেল হ্রদের কিনারায় অবস্থিত—বিশেষ নামজাদা। ঘরে বসিয়া হ্রদ দেখিতে পাইতেছি। আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার হোটেলে বসিয়া সমুদ্র দেখিতাম। পূর্ব্ব হইতে হোটেলে সংবাদ দিয়া আসিয়াছিলাম। হোটেলের কর্ত্তা এজন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমেরিকার হোটেলে স্থান পাওয়া কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীর পক্ষে বড়ই দুঃসাধ্য। কাল চামড়ার লোকেরা ইয়াঙ্কিস্থানে নিতান্তই নির্য্যাতিত হয়। কোন কোন হোটেলে

একমাত্র নিগ্রোসম্বন্ধেই এই নির্য্যাতন-নীতি প্রচলিত। কিন্তু প্রায় হোটেলেই সকল জাতীয় কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীসম্বন্ধে এক নিয়ম। এই জন্য আগে হোটেলের কর্ত্তার সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া আসাই ভাল। হোটেলের কামরা-ভাড়াই দৈনিক ৬৷৷০। খাই-খরচ স্বতন্ত্র।

ভাষা-সমস্যায় ইয়াঙ্কিস্থান ও হিন্দুস্থান

হোটেলের এক দাসী ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে কথা বলিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার বাড়ী কোথায়?" সে বলিল—"আমি হাঙ্গারিয়ান্।" আমি বলিলাম—"তোমার মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছ কি?" সে উত্তর করিল—"প্রাণ থাকিতে ভুলিব না।" কথাটা ঘুরাইয়া বলিলাম—"আচ্ছা, তুমি তোমার 'স্বদেশে' ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা কর কি?" দাসী বলিল—"না মহাশয়, হাঙ্গারীতে ফেরা বোধ হয় আর হইবে না। আমার আত্মীয়স্বজন সকলেই এক্ষণে আমেরিকায় বাস করিতেছে। আমি প্রায় সাত বৎসরকাল এখানে আছি।" ইয়াঙ্কিস্থানে একবার পদার্পণ করিলে ইয়োরোপীয় পুরুষ-রমণীরা আর নিজ নিজ জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইতে চাহে না। আমেরিকা ইহাদের নিকট সোনার দেশ—স্বদেশে যে ঘোরতর কর্ম্মাভাব ও অন্নকষ্ট। এই হাঙ্গারিয়ান্ দাসী হোটেলে মাসিক ৬০৲ বেতন পায়—অধিকন্তু খোরাক এবং বাসগৃহও হোটেলেই। কাজেই "নিজ বাসভূমি"র প্রতি টান আর থাকিবে কোথা হইতে? নিজ মাতৃভাষা ভুলিয়া যাওয়া ত কয়েক বৎসরের কথা মাত্র। আমেরিকায় আসিয়া ইংরাজীভাষা শিক্ষা করা সকল ইয়োরোপীয় "ইমিগ্র্যাণ্টে"রই স্বার্থ। ইয়াঙ্কিরাষ্ট্র বিশেষ চেষ্টা না করিলেও ইহারা পেটের দায়ে এবং স্বার্থের টানে মাতৃভাষা ভুলিয়া ইয়াঙ্কিভাষা শিখিতে বাধ্য। বিগত ৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া আমেরিকায় এইরূপ দৃশ্য অহরহ ঘটিতেছে। নানা ভাষাভাষী নরনারীগণ অল্পকালের ভিতরেই যথাসম্ভব এক ভাষাভাষী সমাজে পরিণত হইতেছে।

১৯০৫ সালের কোন পার্ল্যামেণ্ট-বৈঠকে ইতালীর পররাষ্ট্রসচিব টিটনি (Tittoni) আমেরিকায় ইতালীয় নরনারীর অবস্থা চিত্রিত করিয়াছিলেন। "Italy's Foreign and Colonial Policy" অর্থাৎ "ইতালীর পররাষ্ট্রনীতি" নামক গ্রন্থ হইতে তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"It must be the object of our greatest care to foster in distant lands the continued study and use of the Italian tongue among our countrymen, in order to avoid being confronted by the painful phenomenon which has taken place in some regions, where after two generations of life abroad our emigrants are still Italians, but the Italian language has ceased to exist among them."

অর্থাৎ "বিদেশপ্রবাসী ইতালীয়দিগকে ইতালীয় ভাষা শিখাইবার বিশেষ ব্যবস্থা করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইতিমধ্যে তাহাদের অনেকে মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ এখনও তাহারা ইতালীকেই স্বদেশ বিবেচনা করিতেছে। এই অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই।"

যে সকল লোক ইতালী হইতে আসিয়া আমেরিকায় বাস করিতেছে তাহারা ইতালীকেই এখনও স্বদেশ বিবেচনা করে। দুই তিন পুরুষ ইয়াঙ্কিস্থানে জীবন যাপন করিয়াও তাহারা "নিজ বাসভূমি"র প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা ইতালীয় ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহারা ইংরাজি ভাষাকেই মাতৃভাষা বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। যে ভাষা ব্যবহার না করিলে ভাত কাপড় জুটা অসম্ভব সেই ভাষা আয়ত্ত করিতে কি দেরী লাগে? অন্নবস্ত্রের তাড়না মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান

তাড়না।* জীবজগতের বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে বলে "ইন্‌ষ্টিংট অব্ সেল্‌ফ্ প্রিজার্ভেশন" বা "আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। যে আকাঙ্ক্ষায় ইতালীয়েরা স্বর্গাদপি গরীয়সি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে সেই আকাঙ্ক্ষায়ই তাহারা মাতৃভাষাকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুতরাং পর-রাষ্ট্রসচিব দুঃখ করিলে কি হইবে? কষ্টকল্পনা করিয়া আমেরিকায় ইতালীয় ভাষা শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় খুলিলেও বেশী ফল লাভ হইবে না।

আমেরিকার জার্ম্মান, পোল, রুশ, আইরিশ ইত্যাদি সকলেরই এই অবস্থা। প্রথমে যখন ইহারা স্বদেশ ছাড়িয়া আমেরিকায় আসিয়াছিল তখন ইহারা আমেরিকাকে কর্ম্মক্ষেত্র এবং রোজগারের জায়গামাত্র বিবেচনা করিত; ইয়াঙ্কিস্থানকে স্বদেশজ্ঞানে পূজা করিতে চাহিত না। ক্রমশঃ তাহারা ইউরোপের পুরাতন বুলি ছাড়িল। দ্বিতীয় পুরুষের আইরিশ এবং জার্ম্মানেরা ইয়োরোপের প্রতি মায়ার বন্ধন পুরাপুরি কাটাইতে পারেন নাই। কিন্তু পৌত্র-দৌহিত্রেরা খাঁটি ইংরাজি-ভাষা-ভাষী ইয়াঙ্কি—ইহারা আয়র্ল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, ইত্যাদি দেশের নাম স্বপ্নেও ভাবে না। পুরাতন মাতৃভাষাগুলি তিন পুরুষের ভিতর বিদেশীয় ভাষা বিবেচিত হইতেছে। সুজলা সুফলা আমেরিকাভূমি অভ্যাগত ইয়োরোপীয়গণকে ধন-ধান্য-শস্যরত্নের কুহকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে।

এই জন্যই দেখিতেছি—আমেরিকাবাসী জার্ম্মানেরা বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানির সুখ-দুঃখে বিশেষ বিচলিত নহেন। জার্ম্মানিও ইহাঁদের নিকট ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়ারই মত বিদেশ। ইহাঁরা ইয়াঙ্কিস্থানের স্বদেশসেবক—ইয়াঙ্কিজাতির প্রকৃত স্বার্থ বিবেচনা না করিয়া ইহাঁরা কোন মত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নন। অবশ্য এই কথার বিপরীত দৃষ্টান্তও নিতান্ত অল্প নয়।

আজকালকার আমেরিকান্ আইরিশেরাও আয়র্ল্যাণ্ডের* জাতীয় আন্দোলনসম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন। এই জন্য আইরিশ ধুরন্ধরেরা আমেরিকায় আসিয়া তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না। অথচ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকাবাসী আইরিশগণই আয়র্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ধুরন্ধর ছিলেন।

মানবজাতির এই বারোয়ারীতলা আমেরিকায় ভাষাসমস্যার মীমাংসা অতি সহজেই হইয়া যাইতেছে। ইয়াঙ্কিস্থানেও ভাষার ঐক্য সত্য সত্যই দাঁড়াইয়া যাইতেছে কিনা তাহা সম্প্রতি তলাইয়া দেখিব না। বহুভাষাভাষী নরনারীর জন্মভূমি ভারতবর্ষেও এইরূপে ভাষাসমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না কি? ভারতীয় স্বদেশসেবকগণ ইয়াঙ্কিস্থানে পদার্পণ করিলেই ভাবিতে প্রলুব্ধ হইবেন—"দেখিতেছি—ভারতবর্ষ অপেক্ষা আমেরিকারই বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, অনৈক্য বেশী। এখানেও 'বার রাজপুতের তের হাঁড়ী,' বরং দলাদলি আরও অধিক! অথচ এখানে এক লিপি ও এক ভাষার প্রচার হইতে পারিয়াছে। তাহা হইলে ভারতবর্ষেও ইহা অসম্ভব হইবে কেন?" শুনিলাম, একজন ভারতীয় আন্দোলনসমূহের প্রসিদ্ধ কর্ণধার ছাত্রগণকে বলিয়াছেন—"যদি আইন জারি করিবার ক্ষমতা আমার থাকে তাহা হইলে দশ বৎসরের ভিতর ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্য স্থাপন করিতে পারি।"

ভাষাসমস্যা এত সহজ নয়—আইনের জোরে ভাষা বদলান যায় না। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে মাতৃভাষাকে বিদেশীয় বিবেচনা করান অসম্ভব এবং কোন বিদেশীয় ভাষাকে মাতৃভাষার মর্য্যাদা প্রদান করা অসম্ভব। যদি দুই-চারি-দশঘরবিশিষ্ট কোন পল্লীর কথা ধরি তাহা হইলে হয়ত একটা আইনের জোরে তাহার ভিতর নূতন একটা ভাষা প্রবর্ত্তন করা অসাধ্য না হইতে পারে। যদি নিতান্ত নগণ্য সাহিত্যহীন সমাজবন্ধনশূন্য

আদিম মানবের কথা ধরি তাহা হইলে হয়ত একটা অভিনব ভাষা ও লিপি তাহার উপর চাপান বিশেষ কষ্টসাধ্য না হইতেও পারে। কিন্তু যেখানে লক্ষ লক্ষ অথবা কোটি কোটি নরনারীর অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, লেন-দেন, বিনিময় ও আদান-প্রদান এবং সমাজ-বন্ধনের সংস্রব আছে সেখানে একটা পরকীয় ভাষা আমদানী করা মুখের কথামাত্র নয়। আর যদি সেই সকল লোকের মাতৃভাষায় উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য রচিত হইয়া থাকে, যদি তাহাদের ভাষায় যুগযুগান্তরের প্রভাব পড়িয়া থাকে তাহা হইলে সেই সকল ভাষা মুছিয়া ফেলা এবং তাহার স্থানে একটা বিজাতীয় ভাষার আধিপত্য বিস্তার করা মানুষের ক্ষমতায় কুলাইবে না।

যদি রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অথবা আইনের জোরে কোন সমাজের মাতৃ-ভাষা উপড়াইয়া ফেলা যাইত তাহা হইলে জার্ম্মাণেরা পোলভাষা সমূলে উৎপাটন করিতে পারিত—তাহা হইলে রুশিয়ার পোল-প্রজারা পোলিশ-ভাষা ভুলিয়া রুশ-ভাষাকেই মাতৃভাষা বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইত—এবং অষ্ট্রীয়ায়ও পোলিশ-নরনারীগণ মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন পরিত্যাগ করিত। কিন্তু কি দেখিতেছি? শতাব্দব্যাপী কঠোর পোল-নির্য্যাতন-নীতি অবলম্বন করিয়াও জার্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়ান্ এবং রুশরাষ্ট্র পোলিশ জাতির মাতৃভাষা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই—এবং পারিবেনও না। এখনও মিক্ভীকৃজের (Adam Mickwieckzi) ন্যায় সাহিত্যবীর পোল্যাণ্ডে দেখা দিতেছেন—এবং তাঁহাদের পোলিশ-ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিবার জন্য রুশ এবং জার্ম্মাণ-পণ্ডিতগণ অতিশয় ব্যগ্র। ইয়োরোপের পোলেরা মাতৃভাষা ভুলিল না—অথচ আমেরিকার পোলেরা মাতৃভাষা ভুলিতেছে—ইহারা খাঁটি ইয়াঙ্কির মত ইংরাজীতে মনোভাব প্রকাশ করে। আমেরিকায় কি জার্ম্মাণি, রুশিয়া অথবা

অষ্ট্রিয়ার মত পোল-নির্য্যাতন-নীতি অবলম্বিত হইয়াছে ? তাহা ত কখনই কেহ শুনে নাই। পোলদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া ইংরাজী শিখাইবার জন্য এবং পোলিশ ভুলাইবার জন্য ইয়াঙ্কিরাষ্ট্রের অত্যধিক চেষ্টা আছে কি ? তাহাও ত বোধ হয় না। অবশ্য ইংরাজী শিখাইবার জন্য এদেশে বিদ্যালয়-গুলি বিশেষভাবেই গঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু পোলিশ ভাষা বর্জ্জন করাইবার জন্য কোন ব্যবস্থা এখানে নাই। অথচ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রবীরেরা যাহা পারিলেন না আমেরিকায় তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে সম্ভব হইল। পোলেরা পোলিশ-ভাষা ভুলিতে চলিল। এই অদ্ভুত ঘটনার একমাত্র কারণ—পেটের দায়, অন্নবস্ত্রের তাড়না, ভাতকাপড়ের আকাঙ্ক্ষা, "ইনষ্টিংক্ট অব সেল্‌ফ প্রিজার্ভেশন"। পেটের দায়ে পোলেরা স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়াছে। এই বিদেশের আব্-হাওয়া, কায়দা-কানুন, ধরণ-ধারণ না জানিলে পেট ভরিবে কি করিয়া ? —আত্মরক্ষা হইবে কি করিয়া ? "সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।" এই জন্যই পোলেরা ভালমানুষের মত স্বচেষ্টায়ই ইয়াঙ্কিস্থানের ভাষা শিখিতে অগ্রসর হয় এবং পোল্যাণ্ডকে বিদেশ বিবেচনা করিয়া আমেরিকাকেই জননী জন্মভূমি বলিয়া ডাকে। আইনে যাহা হয় না অভাবে তাহা সহজসাধ্য।

রাষ্ট্রের ক্ষমতায় এবং আইনের জোরে "আঁধার ঘরে চাঁদ ভাসান যায় না," তাহার জন্য প্রকৃতির শক্তি আবশ্যক। আইনের প্রভাবে ভাষার ওলট্ পালট্ করা সম্ভবপর হইলে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে ভাষাসমস্যা থাকিত না—বল্কানে ভাষার ঐক্য স্থাপিত হইত—সুইজর্ল্যাণ্ডে তিন ভাষার ব্যবহার দেখিতাম না—বেলজিয়ামে দুই ভাষা থাকিত না—আল্‌সেস্ লোরেণপ্রদেশে ফরাসীভাষার জন্য আন্দোলন নিবিয়া যাইত —শ্লেজ্‌উইগ্ হোলষ্টিন্ জেলায় জার্ম্মানির ডেনিশভাষার নির্য্যাতন সফল

হইত। এই সকল জেলা, প্রদেশ বা দেশের লোকসংখ্যা অতি সামান্য মাত্র। অথচ নূতন নূতন ভাষাপ্রবর্ত্তনের প্রয়াস বিন্দুমাত্র সফলতা লাভ করে নাই। তাহার জন্য রাষ্ট্রের কর্ত্তারা কত চোখ রাঙাইলেন —কত নিপীড়ন করিলেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় নরনারীগণও "যায় যাবে জীবন চলে" বলিয়া মাতৃভাষার বন্দনা ত্যাগ করিল না। এই ভাষা-সমস্যা লইয়া এখনও জেল, ফাঁসী, রক্তারক্তি এবং লড়াই ইয়োরোপে প্রায়ই হইয়া থাকে। বিংশশতাব্দীর বিরাট কুরুক্ষেত্রেও সেই ভাষা-সমস্যারই জের চলিতেছে। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর বেদনা প্রধানতঃ ভাষা-সমস্যা হইতে উদ্ভূত—যুবক সার্ভিয়ার ভাবুকতায় মাতৃভাষার অন্দোলনই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

ইয়োরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলায়ও যাহা সম্ভবপর হইল না, সমগ্র ইয়োরোপের সমান যুক্তরাষ্ট্রদেশে তাহা অবলীলাক্রমে সাধিত হইতেছে। এখানে ফরাসী-ভাষাভাষী লোক ফরাসী ভুলিতেছে, ডেনিশ-ভাষাভাষী লোক ডেনিশ ভুলিতেছে, হাঙ্গারিয়ান্, রোমেনিয়ান্, সার্ভিয়ান্, ইতালীয়ান্, গ্রীক সকলেই নিজ নিজ ভাষা ভুলিতেছে। আমেরিকার জলবায়ুর গুণে অসম্ভবও সম্ভব হইল।

যদি রাষ্ট্রপ্রভাবে মাতৃভাষা ভুলান যাইত তাহা হইলে ভারতবর্ষে এতদিন ইংরাজীভাষার একাধিপত্য দেখিতাম—ত্রিশকোটি নরনারীর সকলে ইংরাজীতে কথা বলিত। তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতেছি, ইংরাজী-ভাষা খুব জোর সংস্কৃতভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে মাত্র। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শিক্ষিত ভারতবাসিগণ সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে ভাব ও কর্ম্মের বিনিময় সাধন করিতেন—সংস্কৃতভাষা আমাদের "লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কা" স্বরূপ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার পরিবর্ত্তে ইংরাজী দেখিতে পাইতেছি, তথাপি ইংরাজী এখনও মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর মধ্যে আবদ্ধ।

এখনও সংস্কৃতজ্ঞ ভারতবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা ইংরাজীজ্ঞ ভারতবাসীর সংখ্যা বোধ হয় বেশী নয়। পরন্তু, প্রত্যেক প্রদেশেই জনগণের সহস্রবর্ষব্যাপি মাতৃভাষার প্রসার ও পুষ্টি সাধিত হইতেছে। এক্ষণে বাধ্যতামূলক শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে এই সকল প্রাদেশিক ভাষার সাহায্যই লইতে হইবে। কম্পালসরি এডুকেশনের নিয়ম অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলেও ইংরাজীভাষাকে ভারতবাসীর একমাত্র ভাষায় পরিণত করা অসাধ্য। খুব জোর ত্রিশকোটি নরনারীর প্রত্যেকে ইংরাজীকে একটা সর্ব্বজনপরিচিত দ্বিতীয় ভাষাস্বরূপ বিবেচনা করিতে পারে। অবশ্য এই অবস্থা বর্ত্তমানে কল্পনা করাও কঠিন। ক্ষণেকের জন্য ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও মাতৃভাষাগুলির বিভিন্নতা এবং অনৈক্য থাকিবেই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং সেই অবস্থায়ও আমেরিকার আদর্শে ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্য স্থাপিত হইল না বলিতেই হইবে।

বস্তুতঃ ভাষার অনৈক্য স্বাভাবিক—এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যগুলির উচ্ছেদসাধন করা একপ্রকার অসম্ভব। যে সকল প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ হয় সেই সকল শক্তির প্রভাব যতদিন থাকিবে ততদিন তদনুরূপ বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থাকিতে বাধ্য। মানুষ এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে পুরাপুরি অগ্রাহ্য করিতে পারে না। মানুষের চেষ্টায় এই শক্তিপুঞ্জের কথঞ্চিৎ নূতন আকার দেওয়া যাইতে পারে মাত্র। তাহার প্রভাবে অনেক সময়ে সুফলও ফলিতে পারে।

অধিকন্তু ইয়াঙ্কিস্থানের দৃষ্টান্তে ইয়োরোপের কোন লাভ নাই। একটা খাঁটী নূতন দেশে যে সকল কথা খাটে বহুদিনকার রীতিনীতি-পদ্ধতিবিশিষ্ট মানবসমাজে সেই সকল কথা খাটে না। ইয়োরোপের জলবায়ুর সঙ্গে দুই সহস্র বর্ষের মানবকর্ম্ম মিশিয়া রহিয়াছে। ইয়োরোপ

পুরাতন জগৎ—আমেরিকা নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ড—১৬২০ খৃষ্টাব্দে ইয়াঙ্কি-স্থানে প্রথম ইয়োরোপীয় বসতি স্থাপিত হয়। বিগত ১০০ বৎসরের ভিতর ইয়াঙ্কিস্থানের জনপদসমূহে পল্লী ও নগর স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার বহু নগরই মাত্র ৩০।৪০ বৎসর বয়স্ক। এখনও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যোজনব্যাপী মাঠ পড়িয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর আদিম অবস্থা ইয়াঙ্কিস্থানে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। নূতন ও পুরাতন জগতের প্রভেদ না বুঝিলে ইয়াঙ্কি ও ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রভেদ বুঝা যাইবে না। নূতন স্থানে আইন জারি করিয়া ইচ্ছানুরূপ অনুষ্ঠান সুরু করা সহজ—কিন্তু প্রাচীন জনপদে পুরুষপরম্পরাক্রম না মানিলে মহা অনর্থ ঘটা স্বাভাবিক। মানুষের সুপরিচিত সংস্কারগুলি অগ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। পুরাতন জগতের কোন বিস্তৃত ভূখণ্ডে ভাষার ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে না।

নিউইয়র্কের প্রতিদ্বন্দ্বী

ওয়াশিংটনে লোকজনের ভিড়, গাড়ীর যাতায়াত, হট্টগোল ইত্যাদি নগরজীবনের আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলি বেশী দেখি নাই। ওয়াশিংটন ইয়াঙ্করাষ্ট্রের কেন্দ্র বটে—কিন্তু নগর দেখিয়া ইহাতে ইয়াঙ্কি সভ্যতার বিশেষত্ব পাওয়া যায় না।

শিকাগোতে আসিয়া নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়াছি মনে হইতেছে। এখানে নিউইয়র্কের ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প, হুজুগ, হৈচৈ ইত্যাদি সবই দেখিতে পাইতেছি। শিকাগোর ব্যাঙ্কপাড়া ও বড়বাজার নিউইয়র্কেরই অনুরূপ। রাস্তাঘাট, বাসগৃহ, হোটেল, আকাশস্পর্শী প্রাসাদ ইত্যাদির আকৃতি এবং পরিমাণ নিউইয়র্কেও এই ধরণেরই। মার্শ্যাল ফীল্ড কোম্পানীর দোকানে প্রবেশ করিয়া কিছু জিনিষপত্র কেনা গেল। লণ্ডনের গ্যামেজেস্, হুইট্‌লি ইত্যাদি কোম্পানী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দোকানগুলি এক একটা বিরাট রাজ্যবিশেষ। শুনিলাম, মার্শ্যাল ফীল্ড কোম্পানী অপেক্ষা বৃহত্তর দোকান-কোম্পানী পৃথিবীতে আর একটি মাত্র আছে—সে বার্লিনে।

নিউইয়র্ককে মানবজাতির বারোয়ারীতলা মনে হইয়াছিল। শিকাগো এই হিসাবেও নিউইয়র্কের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই নগরে প্রায় ৪০ ভাষাভাষী সমাজের বসতি আছে। এই সমাজগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। কোন সমাজে দশ হাজার লোক, কোন সমাজে হয়ত পাঁচ লক্ষ। এইরূপ সমাজ অন্ততঃ চৌদ্দটা। তাহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজও আছে। শিকাগোতে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এইরূপে ৪০টা ভাষা ব্যবহার করিয়া

থাকে। মিশরের কাইরো নগরে বহুভাষাভাষী নরনারীর সমাগম হইয়াছে। শুনিতে পাই, কন্‌ষ্টান্টিনোপল নগর নাকি এই হিসাবে সকল নগরের সেরা। কিন্তু শিকাগোতে প্রত্যেক ভাষা ব্যবহার করিবার জন্য হাজার হাজার লোক দেখা যায়—আর কন্‌ষ্টান্টিনোপলে কয়েকটা ভাষামাত্র বহু লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য ভাষা-ব্যবহারকারীদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। শিকাগোতে প্রতিদিন দশভাষায় সংবাদ পত্র বাহির হয়—এবং বিশ ভাষায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়। কাজেই ভাষার ঐক্য ইয়াঙ্কিস্থানে নাই বলিতে বাধ্য।

শিকাগোর এক এক পাড়া এক একটা স্বাধীন নগরস্বরূপ। কোথাও জার্ম্মাণেরা একটা সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে—কোথাও বা নরওয়েদেশীয় নরনারীর সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ বৈচিত্র্যময় অনৈক্যময় নগর জগতে বিরল। একজন বলিতেছেন—"Temporary residence in the foreign quarters of the city proves that they really are little cities within the metropolis, each speaking its own language, clinging to its heredity, customs, and in large part governing itself." অর্থাৎ "এই সব বিদেশী অভ্যাগতের পাড়াগুলিতে আমেরিকার রীতিনীতি, আদব কায়দা প্রচলিত নাই। বিদেশীদের নিজ নিজ প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইহাদের চালচলন ভিন্ন ভিন্ন।" বিস্ময়ের কথা—এত ভাষাগত, এত রীতিনীতিগত, সংস্কারগত, এবং ধর্ম্মগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও নগরশাসনে ঐক্য রক্ষিত হইতে পারিয়াছে।

শিকাগো, নিউইয়র্ক, ম্যাঞ্চেষ্টার, লণ্ডন ইত্যাদি আধুনিক জগতের মহানগরীগুলি দেখিলে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উপস্থিত হয়—"মানবজাতির এই বিরাট মৌচাকসমূহে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিধান করা হইতেছে কি

করিয়া? গোটা বঙ্গদেশ শাসন করিতে যতখানি ক্ষমতা, বিদ্যাবুদ্ধি, দায়িত্বজ্ঞান আবশ্যক, এক একটা মহানগরীর শাসনকার্য্যেও সেইরূপ যোগ্যতা, কর্ত্তব্যবোধ এবং কর্ম্মশক্তি আবশ্যক। প্রত্যেক কেন্দ্রেই টাকা-পয়সার লেনদেন, জলসরবরাহ, স্বাস্থ্যরক্ষা, রাস্তাঘাট-পরিষ্কার, গৃহনির্ম্মাণ, শান্তিরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ক সমস্যাগুলি বিপুল। ভাবিতে গেলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সকল মহানগরীতে বাস করিলে রাষ্ট্রশাসন-সম্বন্ধে কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা জন্মে। গ্রন্থপাঠ করিয়া "সিভিকস্" নগর-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিলে জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে না। শিকাগোর মত সহরে আসিয়া ব্যাঙ্কার, মহাজন, খাজাঞ্চী, জজ, পুলিশের কর্ত্তা, রেলওয়ের কর্ম্মচারী, টেলিফোন কোম্পানী, নগর-পরিষৎ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোকজনের সঙ্গে দেখা করা আবশ্যক। রাজস্ব, তথ্য-তালিকা, আয়ব্যয়, শাসন, সেবার অনুষ্ঠান, ইত্যাদি নগরজীবনবিষয়ক নানা কথা অন্য কোন উপায়ে ভাল করিয়া বুঝা যায় না। যাঁহারা ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, নগর-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান শিখিতে চাহেন তাঁহাদিগের এইরূপ মহানগরীতে বাস করা কর্ত্তব্য। মহানগরীগুলি এই সকল বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীস্বরূপ। ভারতবর্ষে এই সকল বিদ্যা শিখাইবার সত্যসত্যই কোন ব্যবস্থা নাই। মিউনিসিপ্যালিটিতে, কর্পরেশনে, অথবা অন্যান্য কর্ম্মকেন্দ্রে কার্য্য করিয়া আমাদের স্বদেশবাসিগণ খানিকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু নগর-শাসন, পল্লী-শাসন, রাষ্ট্র-শাসন, ইত্যাদি কার্য্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ আমাদের দেশে কিঞ্চিন্মাত্রও নাই। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়েও এই সকল বিদ্যার নামোল্লেখও অনেক সময়ে হয় না। ধন-বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইয়া থাকে সত্য—কিন্তু ছাত্রদের বিদ্যা নিতান্তই পুঁথিগত থাকিয়া যায়। দেশের অথবা বিদেশের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলি

বুঝিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত জন্মে না—সেগুলি মীমাংসা করা ত দূরের কথা। সুযোগ থাকিলে কলিকাতার মত বড় সহরে সিভিক্‌সের আলোচনা সহজেই চলিতে পারিত।

এই জন্যই মনে হইতেছে—ভারতীয় অধ্যাপক ও উচ্চশিক্ষিত ছাত্রগণ শিকাগোর মত বিপুল মানব-মৌচাকে কয়েক বৎসর জীবনযাপন করিলে রাষ্ট্রশাসন-সম্পর্কিত নানা তথ্য ও তত্ত্ব শিখিবার সুযোগ সহজেই পাইতে পারেন। রেলওয়ে-পরিচালনা, ট্রামওয়ে-পরিচালনা, হাসপাতাল-পরিচালনা, শ্রমজীবিসমস্যা, দারিদ্র্যসমস্যা, মাদকতাসমস্যা, জনগণের নীতিহীনতা, লোকশিক্ষা, তথ্যসংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়সমূহ বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিবার ক্ষেত্র এই সকল মানব-মৌচাকেই বিশেষরূপে পাওয়া যায়।

চীনা ছাত্রেরা আমেরিকার মহানগরীগুলিকে শাসন-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন-বিজ্ঞানাধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"মহাশয়, আপনার অধীনে চীনা এবং ভারতীয় ছাত্র লেখাপড়া শিখিতেছে। এই দুই জাতীয় ছাত্রের তুলনা করিয়া আপনি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন কি?" সেলিগ্‌ম্যান বলিয়াছিলেন—"তুলনা করিবার উপযুক্ত উপকরণ আমাদের হাতে নাই। কারণ নিউইয়র্কে খরচপত্র বেশী—কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও বেতন অত্যধিক। কাজেই এখানে হিন্দুছাত্র অতি বিরল—সর্ব্বসমেত বোধ হয় বার জন ছাত্রও কলাম্বিয়ায় আসে নাই। কিন্তু চীনা ছাত্রদের অর্থাভাব নাই। চীনের রাষ্ট্র তাহাদিগকে বার্ষিক ২৫০০।৩০০০ টাকা বৃত্তি দিয়া এখানে পাঠাইয়া থাকেন। শত শত চীনা ছাত্র কলাম্বিয়ার উচ্চতম উপাধি লইয়া দেশে ফিরিতেছে। অধিকন্তু, যাহারা এখানে বৃত্তি পাইয়া আসে তাহারা

সকলেই বাছা ছেলে। এই অবস্থায় হিন্দুস্থানী ও চীনা ছাত্রে তুলনা করা সহজ নয়।”

সেলিগ্‌ম্যানের মতে—“চীনা ছাত্রেরা আমেরিকায় আসিয়া শিক্ষণীয় বিষয়নির্ব্বাচনের জন্য অনর্থক সময় নষ্ট করে না। ইহারা দেশের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত—এই সকল মীমাংসা করিবার যোগ্যতালাভের জন্য আমেরিকায় আসে। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদের এরূপ কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখা যায় না।”

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চীনা ছাত্র নিউইয়র্ক নগরের খাজনা আদায় এবং টাকা খরচসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া পি, এইচ্‌, ডি উপাধি পাইয়াছেন। সেই গ্রন্থের চীনাভাষায় অনুবাদও বাহির হইতেছে। গ্রন্থের নাম Finance of the City of New York. কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Studies in Economics, History and Public Law নামক গ্রন্থমালায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় (১)—আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব, (২) করস্থাপন, (৩) নগরের শাসনের জন্য ঋণগ্রহণ ইত্যাদি।

গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন—“Many of the Scientific methods adopted by New York City in reforming her finances have been adopted by other cities in the United States for reforming theirs. Even the United States Government is now making a special effort to use the same methods of budgetary segregation as are in use in New York City today. I see no reason why a system that admits of being copied and successfully installed by municipal and the federal Governments in

the old Republic of the United States, may not be copied and installed by the provincial and central Governments of the Young Republic of China * * * Even though it will not be easy for China to follow New York City's example, I believe this account of how New York City has been financially maintained, without even a fractional loss of her credit, will be of value to Chinese fiscal authorities."

অর্থাৎ "নিউইয়র্কে নূতন প্রণালীতে সরকারী টাকা তোলা ও খরচ করা হইতেছে। এই প্রণালী ইয়াঙ্কিস্থানের নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে এবং যুক্তদরবারেও প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল। এই দৃষ্টান্ত চীনা স্বরাজেও অবলম্বিত হউক।"

শিকাগোতে বসিয়া আর একটা কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেছি। একশত বৎসর পূর্ব্বে শিকাগো নগরের অস্তিত্বই ছিল না। এমন কি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এই জনপদে মাঠ ধু ধু করিত—জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যাইত না বলিলেই চলে। এই অল্পকালের ভিতরে একটা ২৫।২৬ মাইল লম্বা এবং ৮।১০।১২ মাইল চৌড়া নগরের বিকাশ হইয়াছে। ইয়াঙ্কিরা কি যাদু জানে? ভারতবর্ষে প্রাচীন রাজধানীগুলির বহু প্রাসাদ, মন্দির, দুর্গ এবং অন্যান্য অট্টালিকা সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তি শুনিতে পাই। "মহাশয়, এই যে বাড়ীটা দেখিতেছেন ইহা অলৌকিক শক্তিবলে এক-রাত্রির ভিতর নির্ম্মিত হইয়াছিল"—ইত্যাদি বিবরণ আমাদের দেশে সুপ্রচলিত। এইরূপ রাতারাতি নগরনির্ম্মাণ ইয়াঙ্কিস্থানে সত্য সত্যই ঘটিয়াছে দেখিতেছি। আমেরিকা আগাগোড়াই নূতন—তাহার ভিতরেও নূতনতর এবং নূতনতম আছে। শিকাগো এইরূপ "নূতনেরও নূতন"

নগর। বলা বাহুল্য, ১৭৭৫—৮৬ খৃঃ অব্দে যখন তেরটা রাষ্ট্র সম্মিলিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে তখন ইয়াঙ্কিরা স্বপ্নেও ভাবিত না যে, মিশিগান হ্রদের সমীপবর্ত্তী প্রদেশে নানা মহানগরীর উৎপত্তি হইবে। অথচ আজ শিকাগো আট্‌লান্টিককূলবর্ত্তী নগরগুলিকে সকল বিষয়েই পরাজিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন কি, নিউইয়র্কও শিকাগোর সম্মুখে বড়াই করিতে পারে না। নিউইয়র্কের আস্ফালন সম্বন্ধে শিকাগোর মত—"গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।"

আমেরিকার অট্টালিকাগুলিও দেখিবার জিনিষ। ইয়াঙ্কিজাতির বিপুল উদ্যম, উৎসাহ ও ভাবুকতা এই বিরাট ভবন ও সৌধগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কোন বিষয়ে ইহাদের দীনতা, কাপুরুষতা, ক্ষুদ্রত্ব, সঙ্কীর্ণতা নাই মনে হইবে। বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্রে ধস্তাধস্তি করিবার ক্ষমতা এবং ভবিষ্যতে জলন্ত বিশ্বাস এই সকল অট্টালিকারূপে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান। প্রাচীন মিশরের ফ্যারাও সম্রাটদিগের পিরামিড এবং মন্দির-রচনায়ও এইরূপ ভাবুকতাই ছিল। ইয়াঙ্কিস্থানের নগরে নগরে ভ্রমণ করিলে মানবশক্তি ও মানবসাহসের পরাকাষ্ঠা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। মিশরের এঞ্জিনীয়ারেরা সত্যসত্যই ভাবিতেন, এবং ইয়াঙ্কিনগর-প্রতিষ্ঠাতারা সর্ব্বদাই ভাবিয়া থাকেন—

"নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে' জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিবে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
উর্দ্ধ নীলাকাশে!"

ইহারই নাম—"ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে

যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

বিলাতে থাকিবার সময়ে এরূপ অসীমসাহসিকতা, অসীম বাসনারাশি, অলৌকিক কর্ম্মশক্তি এবং অসাধারণ চিন্তাক্ষমতার পরিচয় পাই নাই। ইয়াঙ্কিস্থানে প্রত্যেক পদবিক্ষেপেই বিপুল ভাবুকতার পরিচয় পাইতেছি।

অট্টালিকাগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং গভীরতাই একমাত্র দেখিবার জিনিষ নয়—এগুলিকে সৌন্দর্য্য, কলাজ্ঞান, সৌষ্ঠব এবং সামঞ্জস্য হিসাবেও দাঁড়াইয়া দেখা উচিত। বড় বড় সহরের প্রধান প্রধান রেলওয়ে ষ্টেসনগুলি, মিউজিয়াম ও চিত্রশালাসমূহ, রাষ্ট্রশাসন ও নগরশাসনের আফিসগুলি, বড়বাজারের দোকান ও কার্য্যালয়গুলি, কোন কোন হোটেল এবং বিদ্যালয়সমূহ না দেখিলে বর্ত্তমান যুগের সৌন্দর্য্যজ্ঞানসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে হয়। আজকালকার দিনে আমরা প্রাচীন জনপদসমূহের কোন পুরাতন অথবা জীর্ণশীর্ণ অট্টালিকা দেখিবা-মাত্র প্রথমেই তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাকি! প্রাচীন গৌরবের মহিমাপ্রচার করা দুনিয়ার শিক্ষিতমহলে একটা 'ফ্যাসান' বা বাতিক হইয়াছে। অথচ বর্ত্তমান মানবও যে নানাবিধ সৌন্দর্য্যের নিদর্শন সৃষ্টি করিতেছে সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিতেই চাহি না। দৃষ্টি দিলে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নগরনির্ম্মাণ, প্রাসাদনির্ম্মাণ, ব্যাঙ্কনির্ম্মাণ, মিউজিয়ামনির্ম্মাণ, লাইব্রেরীনির্ম্মাণ ইত্যাদি নানাবিধ অট্টালিকা নির্ম্মাণে উচ্চ অঙ্গের কলাজ্ঞান দেখিতে পাইব। সুকুমার শিল্প, সৌন্দর্য্যবোধ ইত্যাদি প্রাচীন মানবেরই একচেটিয়া নয়—বর্ত্তমান যুগের মানবও এই সমুদয়ের অধিকারী।

বলা বাহুল্য, যে দেশে 'রাতারাতি' বিশাল নগর ও যোজনব্যাপী

সৌধ নির্ম্মিত হয় সে দেশের এঞ্জিনীয়ার ও গৃহশিল্পীরা বিশেষ দক্ষ। সেই দেশকে "আর্কিটেকচার" বা গৃহনির্ম্মাণ-বিদ্যার ল্যাবরেটরী বিবেচনা করা উচিত। ইয়াঙ্কিস্থানের "বাস্তুশিল্প" সম্বন্ধে Royal Cortissoz তাঁহার "Art and Common sense" নামক গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধের নাম "Four Leaders in American Architecture."

শিকাগোর মত নগরের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই ভ্যাবাচাকা লাগিবার কথা। হয়ত এখানকার কোন বস্তুই ভারতবর্ষে আমদানী করা কঠিন হইবে। কিন্তু এগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিলে গৌণভাবে অনেক সুফল ফলিতে পারে।

"কোরা" মানুষের দেশ

নিউইয়র্কে আসিয়াই লক্ষ্য করিয়াছি, বনিয়াদি বিলাতের কায়দা-কানুন, ভদ্রতা সভ্যতা ইয়াঙ্কিরা জানে না। রাস্তায় ঘাটে, বিদ্যালয়ে, আফিসে, ব্যাঙ্কপাড়ায়, থিয়েটারে, ট্রামে, বাগানে—কোথাও যেন সৌজন্য শিষ্টাচার নাই। লণ্ডন বা ম্যাঞ্চেষ্টারের কুলীপাড়ায় লোকজনের যেরূপ আচার ব্যবহার নিউইয়র্কের "চৌরঙ্গিপাড়ায়"ও ইয়াঙ্কি নরনারীর যেন সেইরূপ চালচলন।

শিকাগোতে এই দৃশ আরও বেশী লক্ষ্য করিতেছি। এখানকার যে কোন রাস্তায় যে কোন স্থানে দাঁড়াইয়া আধ ঘণ্টা খানেক লোক-জনের গতিবিধি দেখিতে থাকিলে বোধ হইবে যেন প্রত্যেক মানুষই ন্যূনাধিক 'uncultured' বা 'অসভ্য'। ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার, রাষ্ট্রশাসক, কেরাণী—সকলের মুখেই যেন একটা কাঁচা 'কোরা' স্বভাবের ছাপ মারা রহিয়াছে। 'সভ্যভব্য' অর্থাৎ 'ঘষামাজা পালিশ করা' সমাজের লক্ষণ কোথাও দেখিতে পাই না। যেন সকলেই বন জঙ্গল, খনি, কৃষিক্ষেত্র, ফ্যাক্টরী, কারখানা ইত্যাদি হইতে সবেমাত্র বাহির হইয়া আসিয়াছে। বড় বড় হোটেলে যে সকল পয়সা-ওয়ালা ইয়াঙ্কি বাস করে তাহাদের হাবভাবও অনেকটা এই ধরণেরই।

ক্ষেত হইতে আলু, কপি, কড়াইশুটি তুলিয়া আনিবামাত্রই সেগুলি ব্যবহার করা যায় না। সেগুলিকে ঝাড়িয়া বাছিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। একবার দুইবার তিনবার ধুইলে তবে সেগুলি হইতে ধুলা মাটি কঙ্কর ইত্যাদি চলিয়া যায়। মোটের উপর বলিতে গেলে বিলাতী সমাজকে এইরূপ ধোয়া পরিষ্কার করা সমাজ বলিতে পারি

—আর ইয়াঙ্কিকে ক্ষেতের ফসলস্বরূপ বিবেচনা করিতে পারি। ইয়াঙ্কির গায়ে এখনও আবাদের মাটি লাগিয়া আছে। ইয়াঙ্কিস্থানে মানবজাতির একটা অভিনব সভ্যতার বিকাশ সাধিত হইতেছে। এখনও ইহার শক্তি প্রকটিত হয় নাই। "গোড়াপত্তনের যুগ" মাত্র চলিতেছে। ইয়াঙ্কিস্থান সত্য সত্যই "কোরা" মানুষের দেশ। ইহাই ইয়াঙ্কি সভ্যতার বিশেষত্ব।

ইয়াঙ্কিরা যখন ইংরাজসাম্রাজ্য হইতে স্বাধীনতা লাভ করে তখন বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রের ½ অংশমাত্র বিপ্লবকারীদিগের পরিচিত ছিল। তাহারও আবার ½ অংশমাত্রে লোকজনের বসতি ছিল। তখন আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রদেশের বহুস্থান পুরাপুরি অজানা ছিল, এবং ⅓ অংশে স্পেন সাম্রাজ্যের অধিকার ছিল। বলা বাহুল্য, সেই সকল স্থানে লোকজন ছিলই না বলিলে চলে। আদিম লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানেরা বাস করিত—তাহাদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান স্পেনিস অথবা ইয়াঙ্কিদের সাক্ষাৎকার বড় বেশী ঘটিত না। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি।

আজকাল মিশিগান, ওহায়ো, উইস্‌কন্‌সিন্‌, আইওয়া, ইলিনয় ইত্যাদি মধ্যপশ্চিম প্রদেশের রাষ্ট্রসমূহে বহু প্রসিদ্ধ নগর দেখিতে পাই। তাহাদের মধ্যে শিকাগো এমন কি নিউইয়র্কেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ইয়াঙ্কি-বিপ্লবের সময়ে এই অঞ্চল মহাপশ্চিম নামে বিবৃত হইত—ইহা "সীমান্ত প্রদেশ" স্বরূপ ছিল। বষ্টন, নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর, ফিলাডেল্‌ফিয়ার "বনিয়াদি" ইয়াঙ্কিরা তখন মিশিশিপি, ওহায়ো ও মিশৌরি নদীর কুলবর্ত্তী এবং মিশিগান, হিউরণাদি হ্রদের সন্নিহিত প্রদেশের অধিবাসীদিগকে 'Men of the western waters,' 'men of the western world' অর্থাৎ পশ্চিমা লোক বলিয়া জানিত। ইয়াঙ্কিস্থানের 'কুলীন' সমাজে ইহাদের কোন স্থান ছিল না।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টার্ণার তাঁহার "The rise of New West" গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, ১৮১২ সালের পরে শিকাগো অঞ্চলে ইয়াঙ্কিসমাজের বসতিস্থাপন সুরু হয়। "The rise of the New west was the most significant fact in American history in the years immediately following the war of 1812." শিকাগোনগর ইলিনয় প্রদেশের অন্তর্গত—১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইলিনয়কে একটা প্রদেশরূপেও বিবেচনা করা হইত না। সমগ্র আমেরিকাই নবীন দেশ—এই নবীন দেশের শিশুসভ্যতাও আবার ক্রমে ক্রমে পশ্চিম অঞ্চলে হাত পা ছড়াইয়াছে। ইলিনয় প্রদেশ গঠনই হইল সে দিন—কাজেই শিকাগোনগরের অর্ব্বাচীনসমাজে কাঁচাকোরা মানবের লক্ষণ এখনও দেখিব, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি? এইসকল প্রদেশ এখন-"গোড়াপত্তনের যুগে"ই রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিস্থানের বনিয়াদি অঞ্চল হইতে এই নদী-হ্রদের প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছিল। তখনও রেলগাড়ী, জাহাজ, বাষ্পশক্তির প্রচলন হয় নাই। গর্দ্দভপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে, গরুর গাড়ীতে যাত্রীর দল চলিত। একজন সমসাময়িক পর্য্যটক সেই উপনিবেশ-স্থাপনের চিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বার্কবেক (Birkbeck) তাঁহার Notes on Journey from Virginia to Illinois গ্রন্থে লিখিতেছেন ;—

"Old America seems to be breaking up, and moving wesward. We are seldom out of light, as we travel on this grand trunk, towards the Ohio, of family groups; behind and before us. * * * A small waggon (so light that you might almost carry it, yet strong enough

to bear a good load of bedding, utensils and provisions and a swarm of young citizens ;—and to sustain marvellous shocks in its passage over these rocky hights) with two small horses, sometimes a cow or two, comprises their all, excepting a little store of hard earned cash for the land office of the district, where they may obtain a like for as many acres as they possess half dollars, being onefourth of the purchase-money. The waggon has a lift, or cover, made of a sheet or perhaps a blanket. The family are seen before, behind, or within the vehicle, according to the road or the weather or perhaps the spirits of the party. * * * A cart and a single horse frequently afford the means of transfer ; sometimes a horse and a pack of cattle at the back of the poor pilgrim bears all his effects, and his wife follows, naked footed, bending under the hopes of the family. "

৯৮ বৎসর পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিস্থানের মধ্যপশ্চিম অঞ্চলে এই উপায়ে জনপদ স্থাপিত হইতেছিল। ইয়োরোপ এবং এশিয়ায় এই উপায়েই জনপদ স্থাপিত হইয়াছিল। বনজঙ্গল পরিষ্কার করা, মাটি কাটা, ঘরবাড়ী তৈয়ারী করা, জমিচষা, পল্লীস্থাপন, নগরপ্রতিষ্ঠা, সমাজগঠন, প্রাচীন ভূখণ্ডেও এই আমেরিকার প্রণালীতেই সাধিত হইয়াছে। একটা শৈশবকাল বা গোড়াপত্তনের যুগ অতিক্রম না করিয়া এশিয়া ও ইয়োরোপের নরনারী "culture" বা "সভ্যভব্যতা"র যুগে পৌঁছে

নাই। তবে গোড়াপত্তনের যুগ পুরাতন ভূখণ্ডে স্মরণাতীত কালে সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারত, প্রাচীন চীন, প্রাচীন মিশর, প্রাচীন গ্রীস ইত্যাদির শৈশবকাল আজকাল কল্পনা করাও কঠিন। এই সকল দেশের প্রাচীনতম সাহিত্যও সেই গোড়াপত্তনের যুগের সাক্ষী নহে—সেই সকল সাহিত্য রচিত হইবার বহুপূর্ব্বে গ্রীক, মিশরীয়, হিন্দু, চীনা জাতিসমূহের শৈশবকাল অতীত হইয়াছে। তথাপি বলা যাইতে পারে যে, ঋগ্‌বেদ এবং 'ইলিয়াড্' অনেকটা 'কোরা' মানুষেরই সাহিত্য। এই হিসাবে বলিতে হইবে যে, ইয়াঙ্কিস্থানে বিগত একশত বৎসরের ভিতর যে যুগ চলিতেছে সেই যুগের সঙ্গে ইয়োরোপ ও এশিয়ার কোন যুগের তুলনা করিতে হইলে ইলিয়াড্ ও বৈদিক যুগের কথা ভাবিতে হইবে। হোমার এবং মধুচ্ছন্দা ঋষির যুগে গ্রীক ও হিন্দুরা অনেকটা বার্কবেক বর্ণিত ইয়াঙ্কি ঔপনিবেশিকগণের ন্যায়ই সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করিতেছিলেন। কাঁচা কোরা নবীন জীবনের গন্ধ এই সকল সাহিত্যে পাইয়া থাকি—আজ ইয়াঙ্কিসমাজের মধ্যে বাস করিয়া সেই তাজা মানুষের নবীন ও অর্দ্ধসমাপ্ত কাজকর্ম্ম ও চিন্তাপদ্ধতি দেখিতেছি। ইয়াঙ্কিদের এখনও "অতীত যুগ" আসে নাই—ইহাদের "ইতিহাস" সৃষ্ট হয় নাই। কাজেই বনিয়াদি হিন্দু, গ্রীক, ইংরাজ, ইয়োরোপীয়ান ইত্যাদির সঙ্গে ইয়াঙ্কির তুলনা করা ঠিক নয়।

কিন্তু এই তথাকথিত "অ"সভ্য, uncultured কোরা সমাজের গুণপনাই কি নগণ্য? ইয়াঙ্কিস্থানের শিশুসভ্যতা কি নিতান্তই অগ্রাহ্য করিবার সামগ্রী? বনিয়াদি এশিয়া ও ইয়োরোপের কি আমেরিকার নামে নাক শিঁট্‌কান উচিত? ইয়োরোপের কুলীনেরা এই "হঠাৎ বড়" ইয়াঙ্কি জাতিগণকে ঠাট্টা নিন্দা করিয়া থাকেন। ইহারা ইয়াঙ্কিস্থানকে সকল বিষয়েই অবজ্ঞা করিতে ভালবাসেন। ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরাজ

প্রত্যেক জাতীয় নরনারীর ভিতরেই বহুলোক ইয়াঙ্কিস্থানের কথা উঠিলে নাক শিঁট্‌কাইয়া বসেন।

যখন কেম্ব্রিজে ছিলাম তখন অধ্যাপক ডিকিন্‌সনের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তিনি সবেমাত্র ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও আমেরিকা বেড়াইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার পর্য্যটনকাহিনী তখন ছাপা হইয়াছিল। পরে এই গ্রন্থ "appearences" নামে বাহির হইয়াছে। এই পুস্তকের আমেরিকা-অধ্যায়ে আগাগোড়া ইয়াঙ্কিনিন্দা প্রচারিত। ডিকিন্‌সন ইয়াঙ্কিসমাজের অসম্পূর্ণতাগুলিই লক্ষ্য করিয়াছেন। "ইয়াঙ্কিরা অত্যুক্তিপ্রিয়, বিজ্ঞাপনপ্রচারক জাতি—ইহাদের culture নাই।" এই ধুয়াই সকল পৃষ্ঠায় পাইলাম। শুনিলাম, ভারতবর্ষের নামজাদা পর্য্যটকগণও নাকি ইয়াঙ্কিস্থানের নামে নাক শিঁটকাইয়া থাকেন। "এখানকার লোকেরা প্রায়ই প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, জুয়া-চোর, অর্থপিশাচ এবং অসভ্য। ইয়াঙ্কিদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মৌলিকতা নাই, স্বাধীন চিন্তা নাই, উচ্চ অঙ্গের গবেষণা নাই। আমেরিকার যথার্থ culture এর অভাব।" ভারতবাসীও ইয়াঙ্কি চরিত্রের সমালোচনায় এই সুর ধরিয়াছেন। এইজন্য ভারতবর্ষে এখনও আমেরিকার উপাধিপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদিগের মর্য্যাদা নাই। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষিত ভারতবাসীরাই এখনও আমাদের চিন্তায় কুলীন পদবাচ্য।

ইয়াঙ্কিসভ্যতার বিশেষত্ব

ইয়াঙ্কিস্থানে যত বেশী দিন কাটিতেছে ততই মনে হইতেছে, কবিবর হুইটম্যানই ইয়াঙ্কি-সমাজের বাণীমূর্ত্তি। এখানে কেহ কাহারও দিকে তাকায় না—সকলেই আপন মনে আপন কাজ করিয়া যাইতেছে। অতীতের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই, সকলেই বর্ত্তমান লইয়া বিভোর। ভবিষ্যৎসম্বন্ধে সফলতার আশা সকলকেই অনুপ্রাণিত করিতেছে। বিফলতা, নৈরাশ্য, ভীতিবিহ্বলতা ইত্যাদির নাম মাত্র কোন ব্যক্তি শুনে নাই। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, আত্মসম্মান ও আত্মশাসন এখানকার আবহাওয়ার সাধারণ লক্ষণ। কেহ কাহাকেও খাতির করে না—আবার কেহ কাহারও খাতির চাহেও না। এই বিবরণ ইয়াঙ্কি-সমাজের সর্ব্বত্রই খাটে—মধ্যপশ্চিম প্রদেশে বিশেষরূপেই প্রযোজ্য।

গ্রীক্ রাষ্ট্রবীর পেরিক্লীস তাঁহার য়্যাথেন্স নগরকে School of Hellas অর্থাৎ গ্রীসের বিদ্যালয় বা গ্রীসের অন্তরতম গ্রীস বিবেচনা করিতেন। সেইরূপ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপশ্চিম প্রদেশ ইয়াঙ্কিস্থানের ইয়াঙ্কি-স্থান। হেমচন্দ্রের "হোথা আমেরিকা * * * নূতন করিয়া গড়িতে চায়" বুঝিতে হইলে ওহায়ো, মিশিগান, ইলিনয়, উইস্কন্সিন প্রদেশেই আসিতে হইবে।

ব্রাইস তাঁহার বিখ্যাত American Commonwealth গ্রন্থে এই জনপদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"The west is the most American part of America, what Europe is to Asia, what England is to the rest of Europe, what America is to

England, that the western states and territories are to the Atlantic states."

আমাদের ভারতীয় ভাষায় বলিতে পারি যে, আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের জন্মদাতা ইয়োরোপ ভারতবর্ষের পশ্চিমে। সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজই আধুনিক। কিন্তু ইয়োরোপের সকল দেশই, আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চ্চায়, সমান দক্ষ নয়। ইয়োরোপেও অনেক দেশে খানিকটা সেকেলে রহিয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড অর্থাৎ ইয়োরোপের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী দেশসমূহই আধুনিক সভ্যতার প্রবর্ত্তক। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই পশ্চিম প্রান্তের মধ্যেও আবার উনিশবিশ করা চলে। কারণ ইয়োরোপের পাশ্চাত্যতম দেশ ইংল্যাণ্ডই এই নূতন সভ্যতার যথার্থ আবিষ্কারক এবং লীলাক্ষেত্র। অতএব ইংরাজেরাই আধুনিকেরও আধুনিক—পাশ্চাত্যেরও পাশ্চাত্য। এই খানেই বিচার শেষ হইল না। কারণ ইংল্যাণ্ডেরও পশ্চিমে এক মহাদেশ আছে তাহার নাম আমেরিকা। এই আমেরিকার ইয়াঙ্কিজাতি ইংরাজকেও শিল্পে ও বিজ্ঞানে হারাইয়া দিয়াছে। সুতরাং ইয়াঙ্কিস্থানই আধুনিক সভ্যতাসম্বন্ধে "সকল দেশের সেরা"। আবার তাহার ভিতরেও মধ্য-পশ্চিম প্রদেশ আমেরিকার আমেরিকা। কাজেই ভারতবাসীর সঙ্গে শিকাগোবাসীর সম্বন্ধ উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুর সম্বন্ধের মত। আধুনিক শিল্পবিজ্ঞান-সমন্বিত বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় জীবনযাপনের কথা ধরিলে ভারতের লোক এবং এই মধ্য-পশ্চিম প্রদেশের লোক ঠিক বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী। সভ্যতার দুই antipodesএ এই দুই সমাজ বাস করে। প্রাকৃতিক ভূগোলের বিচারেও হিন্দুস্থানী ও ইয়াঙ্কি antipodesএ বাস করিয়া থাকে—আমাদের যখন বেলা বারটা শিকাগো-জনপদে তখন রাত্রি বারটা। কলিকাতাবাসী কল-কারখানার ধার ধারেই না বলিলে চলে—শিকাগোবাসী

কল-কারখানা ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারে না। আমাদের দিন উঁহাদের রাত্রি। এই আমেরিকার আমেরিকা সম্বন্ধে অধ্যাপক টার্ণার (Turner) তাঁহার Contributions of the west to American Democracy প্রবন্ধে ("Atlantic Monthly") বলিতেছেন :—

"In these new Western lands Americans achieved a boldness of conception of the country's destiny and democracy. The ideal of the west was its emphasis upon the worth and possibilities of the common man, its belief in the right of every man to rise to the full measure of his own nature, under condition of social nobility. * * * * * * * * It was certain that this society, where equality and individualism flourished, where assertive democracy was supreme, where impatience with the old order of things was a ruling passion, would resent the rule of trained statesmen and official classes, and would fight nominations by congressional caucus and the continuance of presidential dynasties. Besides its susceptibility to charge, the west had generated, from its Indian fighting, forest filling and expansion, a belligerency and largeness of outlook with regard to the nation's territorial destiny. As the pioneer widening the ring-wall of his clearing in the midst of the stumps and marshes of the wilderness, had a vision of the lofty buildings and crowded street of a future

city, so the west as a whole developed ideals of the future of the Common man, and of the grandeur and expansion of the nation."

রুশো, ভল্টেয়ার আদি বিপ্লববাদীদিগের বক্তৃতাফলে বনিয়াদি ফরাসী-সমাজে যে ফল ফলে নাই—আমেরিকার এই বন-জঙ্গলে বাস করিবার প্রভাবে ইয়াঙ্কিরা সেই বস্তু জগতে আবিষ্কার করিয়াছে। ফরাসীদিগের Right of Man বা "মানবের অধিকার" একটা কথার কথামাত্র রহিয়া গেল—কিন্তু ইয়াঙ্কিস্থানের মধ্যপশ্চিম প্রদেশে সত্য সত্যই মানবমাত্রের অধিকারপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। বনিয়াদি সমাজে আর অর্ব্বাচীন সমাজে এই প্রভেদ। বনিয়াদি ইয়োরোপ সহজে এই কথা বুঝিবেন না—বনিয়াদি-তর ভারতবর্ষের ত কথাই নাই।

ভারতবর্ষের হিন্দু Right of man অন্য নিয়মে প্রবর্ত্তন করিত। ভারতীয় সমাজের সাম্যবাদ কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্রভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই স্বাধীন সমাজ আজকাল নাই, সুতরাং সে সাম্যবাদ বেশী আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে "জন সাধারণের যুগ" সম্প্রতি চলিতেছে। যুবক ভারত এই জন্য ইয়াঙ্কি-আদর্শ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। তাহা না পারিলেও মানবজাতির এই বারইয়ারী-তলায় আসিয়া অনাবদ্ধ প্রকৃতির স্বাধীন বিকাশ দেখা আবশ্যক। জীবনের উৎস হইতে এখানে শতধারায় মানবাত্মা প্রকটিত হইতেছে—বিশ্বরচনায় ঐশী শক্তি এবং জগৎসৃষ্টির প্রাক্কাল বুঝিবার জন্য বনিয়াদি সমাজের "সভ্য" মানবকে ইয়াঙ্কিস্থানের এই "কোরা", কাঁচা, 'অ'-সভ্য জনপদেই আসিতে হইবে।

ইয়োরোপের কত লক্ষ অন্নবস্ত্রহীন নরনারী ইয়াঙ্কিস্থানে আসিয়া ত্রাণ পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমেরিকা সত্য সত্যই পতিতপাবন

অনাথের নাথ—"মায়ে তাড়ান বাপে খেদান" লোকের উদ্ধারকর্ত্তা। নানাশ্রেণীর অস্পৃশ্য পদদলিত নির্য্যাতীত সহস্র সহস্র পুরুষরমণী ইয়াঙ্কি-সমাজে কয়েক বৎসর বসবাসের পর জাতিতে উঠিয়াছে। ইয়োরোপের নমঃশূদ্রেরা আমেরিকায় কুলীন ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা লাভ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে। ইয়াঙ্কিস্থানে আসিয়া বনিয়াদি চালের Culture বা সভ্য-ভব্যতার কথা ভাবিতে পারি নাই। অহরহঃ এই পতিতপাবনী শক্তি ও সমাজ-সংগঠনী ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেছি। এরূপ তুমুলভাবে এই ধরণের কার্য্য দুনিয়ার আর কোথাও কখনও হয় নাই। অবশ্য বিগত ৫০০০ বৎসরকালের ভিতর ভারতবর্ষে, চীনে, মিশরে, ইয়োরোপে বহু অবনত জাতি উন্নতিলাভ করিয়াছে—ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফলে যুগে যুগে সর্ব্বত্রই অনার্য্য আর্য্যপদলাভ করিয়াছে, অসভ্য সভ্য হইয়াছে, অশিক্ষিত শিক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ইয়াঙ্কিস্থান যেন একমাত্র এই পতিতোদ্ধার ব্রত লইয়াই জগতে আবির্ভূত হইয়াছে। দুনিয়ার পেরিয়াকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবার জন্যই যেন বিধাতা ইয়াঙ্কিস্থানে একটা সমাজযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর কোন এক শতাব্দীতে এত সংখ্যক পতিতের উদ্ধার হয় নাই। এই খানেই আমেরিকার শক্তি ও গৌরব।

কাঁঠালগাছে আমের আশা করিলে কি হইবে? নবীন সমাজে প্রাচীন সমাজের বনিয়াদি চাল আশা করা উচিত কি? যাহাদের অতীত নাই তাহাদের নিকট ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়—তাহারা বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য পালন করিতেছে কিনা তাহাই পরীক্ষা করা উচিত। মান, মর্য্যাদা, পদগৌরব, prestige, reputation ইত্যাদি জিনিষ দুই এক দিনে সৃষ্ট হয় না। এই সকল পদার্থ সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়। যে সমাজের অতীত নাই, যাহাদের ইতিহাস

নাই, তাহারা prestige অথবা reputation—ইজ্জত এবং কীর্ত্তির কথা ভাবিবে কোথা হইতে? তাহারা বর্ত্তমানে যেরূপ কার্য্য করিয়া যাইতেছে তাহার ফলে ভবিষ্যতের জন্য কীর্ত্তি ও ইজ্জতের ব্যবস্থা হইয়া থাকিতেছে। প্রথমেই বুঝিয়া রাখা উচিত, ইয়াঙ্কিসমাজ মাত্র ৫০।৭৫।১২৫। ১৪০ বৎসরের সমাজ। অতএব এখানে বনিয়াদি সমাজে সুপ্রচলিত কায়দাকানুন, reputation, culture, রীতিনীতি, সৌজন্য, শিষ্টাচার ইত্যাদি অনুসন্ধান করা উচিত নয়।

এখানকার শিক্ষাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা ধরা যাউক। হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া এদেশে একশত বৎসরের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র একটিও নাই। এই দুইটিই আবার গত শতাব্দীর ভিতরেই যথার্থ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং অক্‌স্‌ফোর্ড কেম্ব্রিজ প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গৌরব আমেরিকার কোথাও পাইব কেন? ইয়োরোপের ঐ সকল বিদ্যাকেন্দ্র ৮০০।৯০০ বৎসরের প্রতিষ্ঠান। এক শতাব্দীর ভিতর কেবল জার্ম্মাণীর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় দুনিয়ায় নাম ছড়াইতে পারিয়াছে। বার্লিন আজ অক্সফোর্ড প্যারিকেও হারাইতে বসিয়াছে। বার্লিনের কীর্ত্তি ইয়াঙ্কিস্থানের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই লাভ করিতে পারে নাই। এইখানে মনে রাখা উচিত যে, বার্লিন একশত বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয় বটে কিন্তু জার্ম্মাণ-সমাজ, জার্ম্মাণ-ভাষা, জার্ম্মাণ-সাহিত্য বহু প্রাচীন। কাজেই হার্ভার্ড ইয়েলের সঙ্গে বার্লিনের তুলনা করা অন্যায়।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা তুলিলে prestige, standing, or reputationএর কথা না তুলাই যুক্তিসঙ্গত। ইয়োরোপের নানাস্থানে গত ৫০।৭৫।১০০ বৎসরের ভিতর যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের সঙ্গেই আমেরিকার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা হওয়া উচিত। ম্যাঞ্চেষ্টার, লীড্‌স্‌, শেফিল্ড, বার্মিংহাম

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিকাগো, ইলিনয়, মিশিগান, কলাম্বিয়া, কর্ণেল, ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে মাপিয়া দেখা যাইতে পারে। দুনিয়ায় লাড্‌স্‌ ম্যাঞ্চেষ্টারের যে গৌরব কর্ণেল শিকাগোর তাহা অপেক্ষা কম গৌরব আছে কি? ম্যাঞ্চেষ্টারের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ইয়োরোপ অথবা ভারতবর্ষের কয়জন লোক শুনিয়াছেন? সেইরূপ ইলিনয় ক্যালিফর্ণিয়ার নাম বেশী ভারতবাসী শুনেন নাই বলিয়া কি এইগুলি পচিয়া গিয়াছে? কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

ইয়াঙ্করা, বিশেষতঃ মধ্যপশ্চিম প্রদেশবাসীরা কৃষি,শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য ইত্যাদি লইয়াই দিন কাটায়। অন্য কোন বিষয় ভাবিবার সময় ইহাদের নাই। ইহাদের সমাজে আলোচ্য বস্তুগুলি একমাত্র এই ধরণের। কাজেই এখানকার আবহাওয়ায় যেসকল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হইয়াছে সকলগুলিই ন্যূনাধিক পরিমাণে কৃষিশিল্প ব্যবসায়সম্পর্কিত। সাহিত্য, দর্শন, সুকুমার শিল্পের চর্চ্চা এই অঞ্চলে একপ্রকার হয় না বলা যাইতে পারে। তবে শিক্ষাকেন্দ্রে সকল বিদ্যার ব্যবস্থাই থাকা আবশ্যক। এই জন্য মধ্যপশ্চিম প্রদেশের (এবং মোটের উপর ইয়াঙ্কিস্থানের) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিল্পব্যবসায় ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও কিছু কিছু শিক্ষা দান করা হয়। কিন্তু সকলেরই ঝোঁক এঞ্জিনীয়ারিং, রসায়ন, ব্যাঙ্কিং, কৃষি ইত্যাদির দিকে।

আমেরিকার ছাত্রেরা মাটি কাটিতে শিখে, জমি চষিতে শিখে, খনি হইতে মালসংগ্রহ করিতে শিখে। ইহারা বাগান প্রস্তুত করে, অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, রেলপথ বিস্তার করিতে পারে, চাষ-আবাদ করিতে জানে। ধাতুগলান, সেতুনির্ম্মাণ, ফ্যাক্টরীচালান, ব্যাঙ্কস্থাপন, রংপ্রস্তুতকরণ, ঔষধপ্রস্তুতকরণ ইত্যাদি বিষয়ক বিদ্যা শিখিবার জন্যই ইয়াঙ্কিরা ব্যগ্র। এই জন্য বিদ্যা-কেন্দ্রে এই সমুদয় বিজ্ঞানের আলোচনাই অধিক হইয়া থাকে।

সুতরাং ইয়াঙ্কিস্থানে আসিয়া য়্যারিষ্টটল, প্লেটো, অথবা বেদান্ত, উপনিষৎ সেক্‌স্‌পীয়ার, গেটে ইত্যাদির সংবাদ না লওয়াই উচিত। এজন্য অক্‌স্‌ফোর্ড আছে, প্যারি আছে, বার্লিন আছে (আমেরিকায় অন্ততঃ হার্ভার্ড আছে)। এই সকল বিদ্যার কথা না তুলিলে ইয়াঙ্কিবিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে নিরাশ হইবার কারণ নাই। ভারতবর্ষের যাঁহারা ব্যারিষ্টার হইতে চাহেন তাঁহারা বিলাতে যাইবেন সন্দেহ নাই। আর যাঁহারা দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদিতে সুপণ্ডিত হইতে চাহেন তাঁহারা অক্‌স্‌ফোর্ড, প্যারি, বার্লিন (এবং এমন কি হার্ভার্ডও) যাইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা কৃষক, এঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক, রসায়নবিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ ইত্যাদি হইতে চাহেন তাঁহারা ইয়াঙ্কিস্থানের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বাছিয়া লউন। সকল ভারতীয় ছাত্রেরই গড্ডালিকাপ্রবাহের মত বিলাতের দিকে ছুটিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের শিক্ষিত সমাজ এই জন্য অনেকটা একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা ইয়াঙ্কিবিশ্ববিদ্যালয়ের নামে নাক শিঁট্‌কাইয়া থাকেন তাঁহাদের ভাবিয়া চিন্তিয়া মত প্রকাশ করা উচিত। ফরাসী, ইংরাজ অথবা জার্ম্মাণদের প্রচারিত বুলি আওড়াইয়া নিজেদের অজ্ঞতা না জাহির করাই শ্রেয়ঃ।

শিকাগো, ইলিনয়, উইস্‌কন্সিন, পার্ডু, মিশিগান, আইওয়া, ওহায়ো ইত্যাদি মধ্যপ্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে গত ৪।৫ বৎসরের ভিতর কতিপয় ভারতীয় ছাত্র 'গ্রাজুয়েট' হইয়াছেন। ইহাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি কর্ম্ম-শক্তি মাপিবার সময় এখনও আসে নাই। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, বিলাত হইতে গণ্ডায় গণ্ডায় যে সকল গ্র্যাজুয়েট দেশে ফিরিতেছেন তাঁহাদের অনেকের তুলনায় এই ইয়াঙ্কিগ্র্যাজুয়েটগণ যোগ্যতর বিবেচিত হইবেন। ইহাঁরা বেশী করিৎকর্ম্মা হইতে পারিবেন, আশা করিতেছি।

আমেরিকায় চীনাছাত্র

এশিয়ার মুসলমান সমাজগুলি ইয়োরোপের লাগা। এজন্য তুরস্ক, মিশর, পারস্য ইত্যাদি দেশে ইয়োরোপের প্রভাব বেশী। এদিকে জাপান ও চীন আমেরিকার লাগা। এজন্য এই দুইসমাজে আমেরিকার প্রভাব বেশী। ভারতবর্ষ এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে—আমরা ইয়োরোপ হইতে যতদূরে ইয়াঙ্কিস্থান হইতেও ততদূরে—কাজেই আমাদের উপর উভয়ের প্রভাবই অতি অল্প।

ইয়োরোপের লোকেরা যখন প্রাচ্যসভ্যতা কিম্বা এশিয়ার নাম উল্লেখ করে তখন তাহারা প্রধানতঃ তুরস্ক মিশর ইত্যাদি বুঝে। ওরিয়েণ্টাল শব্দে ইহারা মুসলমান জাতিকে জানে। পান-ইসলামিজম্ বা "মুসলমান-বিভীষিকা" ইয়োরোপীয়দিগের বিচারে প্রাচ্য সমস্যা। এই কারণে মুসলমানের প্রভাব ইয়োরোপে বেশী। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ও রাষ্ট্র-বীরেরা মুসলমানজাতি ও ধর্ম্মের সংবাদ বেশী রাখেন। পক্ষান্তরে আমেরিকার লোকেরা যখন প্রাচ্যসভ্যতা কিম্বা এশিয়ার নাম উল্লেখ করে তখন তাহারা প্রধানতঃ জাপান ও চীন এই দুই সমাজকে বুঝে। Oriental শব্দে ইয়াঙ্কিরা পীতজাতিদ্বয়কে জানে। Yellow Peril বা "পীতাঙ্গ বিভীষিকা"ই ইয়াঙ্কিদের বিচারে oriental question অর্থাৎ প্রাচ্য সমস্যা। এই কারণে চীনা ও জাপানীদের প্রভাব ইয়াঙ্কিসমাজে বেশী। ইয়াঙ্কি পণ্ডিত, জনসাধারণ, ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রবীরেরা চীন ও জাপানের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন।

ভারতবর্ষের নাম কোথায়ও শুনিতে পাওয়া যায় না। কি

ইয়োরোপ কি আমেরিকা উভয় ভূখণ্ডেই হিন্দুস্থান নিতান্ত অপরিচিত। ভারতীয় চিন্তা, কর্ম্ম, সমাজ, শিল্প বা সাহিত্যের কোন প্রভাব জগতে নাই। ভারত-বিভীষিকা বলিয়া কোন শব্দ ইয়োরোপে অথবা আমেরিকার চিন্তামণ্ডলে ও সাহিত্যসংসারে দেখা দেয় নাই। রুশিয়ার একজন অধ্যাপক বলিতেছিলেন—"India is an Ultina spule to us." ভারতবর্ষ বাস্তবিকই দুনিয়ার সীমান্ত প্রদেশে অথবা বাহিরেই রহিয়াছে। ব্রেজিল সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি লিখিয়াছেন—"দেখিতেছি, ভারতবর্ষে Modern culture বা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইয়া থাকে। এ কথা আমরা জানিতাম না।" তবে পৃথিবীর প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত ও পালি ভাষার চর্চ্চা হয়। এই সকল শিক্ষা-কেন্দ্রের গণ্ডীর ভিতরেই ভারতবর্ষের নাম আবদ্ধ। পাশ্চাত্য সমাজের কোন বিভাগে ভারতীয় প্রভাব বিন্দুমাত্র নাই। বিবেকানন্দ, বেদান্ত, থিয়জফি, গীতাঞ্জলি ইত্যাদির দ্বারা জগতে এখনও ভারতীয় আন্দোলন সত্যভাবে সৃষ্ট হয় নাই! বর্ত্তমান ভারতসম্বন্ধে দুনিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞ—প্রাচীন মরা ভারত লইয়া কোন কোন পণ্ডিত ঐতিহাসিক অথবা Philological "গবেষণা" করেন মাত্র।

ইয়াঙ্কিস্থানে এই কথা বেশ বুঝিতেছি। ভারতবাসী উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুসম্বন্ধে যতটা জানেন ইয়াঙ্কিরা হিন্দুস্থানসম্বন্ধে ঠিক ততটা জানেন। কিন্তু চীন ও জাপানের কথা এখানকার গল্পগুজবে পর্য্যন্ত শুনিতে পাই। এই দুই দেশের সংবাদ না লইয়া ইয়াঙ্কিরা থাকিতে পারেন না। পীতাঙ্গ-বিভীষিকা ইয়াঙ্কিরাষ্ট্রের মহা আশঙ্কাস্থল। কাজেই হয় শত্রুভাবে না হয় মিত্রভাবে ইয়াঙ্কিকে চীন ও জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হয়। বর্ত্তমানে জাপানের সঙ্গে ইয়াঙ্কিস্থানের মনকষাকষি চলিতেছে—এই দ্বন্দ্ব শীঘ্র ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চীনারা ইয়াঙ্কিদের

আজকাল বড়ই আত্মীয়। চীনের খাতির করা ইয়াঙ্কিসমাজে একটা রীতি দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

প্রধানতঃ ইয়াঙ্কিস্থান হইতেই চীনে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমদানী করা হয়। এজন্য আমেরিকায় চীনের বহুলোক আসা যাওয়া করে। ইয়াঙ্কি-দেশের সর্ব্বত্র চীনা কুলী, চীনা বনিক্, চীনা ব্যাঙ্কার, চীনা হোটেল, চীনা দোকান, চীনা বাজার ইত্যাদি দেখা যায়। কাজেই চীনা-ছাত্রেরা, আমেরিকার সকল প্রদেশেই গণ্ডায় গণ্ডায় আসে। এই বৎসর চীনের কেবল একটা পরিষদ হইতেই একশত ছাত্র ও ছাত্রী আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাদের ব্যয় পরিষদ্ বহন করিবেন। ছাত্রেরা কৃষি, এঞ্জিনীয়ারিং, রসায়ন, ঔষধপ্রস্তুতকরণ, ব্যাঙ্কিং, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, রাজস্ব-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে নানা প্রতিষ্ঠান হইতে বৎসর বৎসর বহুসংখ্যক চীনা-ছাত্র বৃত্তি পাইয়া ইয়াঙ্কি-স্থানে বিদ্যার্জ্জন করিতে আসে।

ইয়াঙ্কিস্থানের চীনা-ছাত্রেরা একটা পরিষদ্ স্থাপন করিয়াছে। আট দশ বৎসর হইতে ইহার কার্য্য চলিতেছে। ইহাকে চীনা-ছাত্রদের কংগ্রেস বলা যাইতে পারে। নাম—The Chinese Students' Aliance of America. আমেরিকার আদর্শগুলি বিশেষভাবে চীনা-সমাজে সংক্রামিত করিবার জন্য ইহাঁদের প্রয়াস। প্রধানতঃ শিক্ষা সাহিত্য ও বিজ্ঞানসম্বন্ধে আলোচনা করা পরিষদের উদ্দেশ্য। কিন্তু রাষ্ট্র-নীতি, সমাজসমস্যা, দেশের আর্থিক অবস্থাসম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ এবং মত-প্রচারও হইয়া থাকে। এই পরিষদ্ একখানা মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাহার নাম—The Chinese Students' Monthly. দশমবর্ষে পদার্পণ করিবার সময়ে সম্পাদক লিখিতেছেন :—

"With this issue *The Monthly* enters the tenth year

of its existence as the official organ of the Chinese Students' Alliance in America. In these nine years it has undergone great changes in its make-up and subject matter. From a journal of a few sheet it has grown to one hundred or more pages ; the latest expansion takes the form of increasing the number of issues from eight to nine annually. Out of a magazine devoted almost entirely to this little student world of ours, it has developed into one that includes in its discussions all the important movements in China :—educational, social, industrial and political. It counts among its contributors, not only Chinese students, but also men, Chinese and American, distinguished in every walk of life.

That *The Monthly* is filling a real need is shown by the expansion of its circulation. It has grown almost tenfold and what is much more gratifying is that almost half of its subscribers are Americans. In the United States there has been a marked increase of interest in China and its people in recent years. Consequently there has risen a ready demand for literature on China. It is our object to supply this demand as far as possible. We desire not to present our national problems as to help our American friends to have better understanding of China."

চীনা-ছাত্রেরা ইয়াঙ্কিকে চীনের সংবাদ প্রদান করিতেছেন—চীন-

সম্বন্ধে ইয়াঙ্কিদের লোকমত গঠন করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশবাসী-দিগকেও ইয়াঙ্কিস্থানের বৃত্তান্ত পাঠাইতেছেন। চীনা-ছাত্রপরিষদ্ এই উপায়ে দুই দেশের ভিতর ভাববিনিময়ে ও কর্ম্মবিনিময়ে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন। চীনাদের নিকট আমেরিকা যে বস্তু, ভারতীয় ছাত্রের নিকট ইংল্যাণ্ড সেই বস্তু। ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীরা নিজব্যয়ে অথবা ব্যক্তির সাহায্যে প্রধানতঃ বিলাতেই যাইয়া থাকেন। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রেরা বিলাতবাসীকে অথবা ইয়োরোপকে ভারতবর্ষের কোন তথ্য দান করিয়াছেন কি? অর্দ্ধশতাব্দী হইল বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সহস্র সহস্র ভারতীয় যুবক ডিগ্রি আনিতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদের চেষ্টায় ইংরাজ কিম্বা ফরাসী ও জার্ম্মাণ সমাজ ভারততত্ত্ব কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছেন কি? বিলাতের লোকমত কিম্বা ইয়োরোপের লোকমত বোধ হয় ভারতীয় ছাত্রগণ কর্ত্তৃক বিন্দুমাত্র গঠিত হয় নাই। দেশের ব্যারিষ্টার মহোদয়গণ কি বলিবেন জানি না।

আমেরিকার চীনা-ছাত্রেরা ইয়াঙ্কিদিগকে নিজেদের খবর দেওয়াই প্রধান কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন না। ইয়াঙ্কিস্থানের নানা কেন্দ্রে সহস্র সহস্র চীনাছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাদের সকলকে এক উদ্দেশ্যে এবং এক লক্ষ্যে গড়িয়া তোলাই এই পরিষদের যথার্থ প্রয়াস। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এবং ভাবের আদান-প্রদান ও মেলা-মেশার সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্যই পরিষদ্ বিশেষ চেষ্টিত। মাসিকপত্র-সম্পাদন ইহার অন্যতম উপায়। এতদ্ব্যতীত চীনারা গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে তিনটী সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহের চীনা-ছাত্রেরা একটা সম্মিলনে যোগদান করেন। মধ্য-পশ্চিম প্রদেশের চীনা-ছাত্রেরা আর একটা সম্মিলনে যোগদান করেন। আর পশ্চিমতম প্রদেশসমূহের ছাত্রেরা তৃতীয় সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন। এইরূপ

প্রতিবৎসর তিন কেন্দ্রে তিনটা সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। ভারতবর্ষে সাহিত্যসম্মিলন, কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, Biharee students' conference ইত্যাদির ন্যায় এই সকল চীনা-সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহ হইয়া থাকে। নাচগান, হাসিখেলা, বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি সহকারে সৌভ্রাত্রসদ্ভাবগুলির অধিবেশন হয়। বিলাতের বড় বড় কেন্দ্রে ভারতীয় ছাত্রেরা এক একটা "মজলিশ" অথবা "association" ইত্যাদি গঠন করিয়াছেন। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবারা এই তিন স্থানের ভারতীয়-ছাত্র-সমিতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইঁহারা কোন পত্রিকা-সম্পাদনও করেন না—ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে যে সকল ভারতীয় ছাত্র রহিয়াছে তাহাদের সকলের সঙ্গে সকলের আলাপ পরিচয় ও সদ্ভাব বর্দ্ধনের জন্য চেষ্টিত নন। অক্সফোর্ডের ছাত্রেরা কেম্ব্রিজের ছাত্রদিগের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। বলা বাহুল্য, আমেরিকায় চীনা-ছাত্রেরা উচ্চতর আদর্শে জীবন যাপন করিতেছেন।

চীনা-ছাত্র-পরিষদের সম্মিলনগুলি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"Every summer the Chinese students in America hold one conference in each of the following geographical sections the East, the Middle West, the West. In these conferences they have the opportunity to form new friendships and renew old ones; to exchange views concerning their experiences in this country and current questions in China; to discuss problems in their prospective professions and to enter in friendly competition in athletics, oration and debates."

আমেরিকার হিন্দুস্থান-পরিষৎ

আমেরিকার নামে দুনিয়ার সকল লোকেরই জিহ্বায় জল পড়ে। ভারতবাসীও এই নিয়মের বহির্ভূত নহেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত আমেরিকাকে ভালবাসিত, যুবক-ভারতের ত কথাই নাই। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ্জ ওয়াশিংটন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, এব্রাহাম লিঙ্কলন্ এবং গারফীল্ডের নাম কোন্ হিন্দুস্থানী না শুনিয়াছেন? "No Taxation without Representation" (অর্থাৎ "আগে পাঠাই প্রতিনিধি, তারপর দিব খাজনা") সূত্রের প্রভাব ভারতবর্ষে নগণ্য নয়। ইয়াঙ্কি-সমাজের অন্য কোন তথ্য আমাদের জানা না থাকিলেও, এ কথা বলিতে পারি যে, "টমকাকার কুটির" এবং "From Log Cabin to White House" গ্রন্থদ্বয় ভারতের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। অধিকন্তু আমাদের রাষ্ট্রবীরেরা আমেরিকা হইতে "ন্যাশন্যাল কংগ্রেস" শব্দ আমদানি করিয়াছেন। আর যাহারা উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা হুইট্‌ম্যান্, এমার্সন এবং জেম্‌সের রচনা পাঠ করিয়াছেন।

আমেরিকাকে বাঙ্গালী কি চোখে দেখেন তাহার পরিচয় আমরা হেমচন্দ্রের কবিতায় পাই। "হোথা আমেরিকা, নব অভ্যুদয়" ইত্যাদি ছয় পংক্তিতে ভারতীয় কবি আমেরিকা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের আমলেও বোধ হয় আমেরিকার নাম মাত্র আমাদের শোনা ছিল—আমেরিকায় ভারতবাসীর যাওয়া-আসা ছিল কিনা সন্দেহ। "তখনও তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি।" বোধ হয় দুই চারি জন চিকিৎসক হোমিওপ্যাথি-বিদ্যায় আমেরিকার উপাধিধারী ছিলেন।

তখন আমরা পাশ্চাত্য জগৎ বলিলে মোটের উপর কেবল ভারত-প্রভু বিলাতকেই চিনিতাম।

আমেরিকার সঙ্গে ভারতের জীবন্ত সম্বন্ধ সুরু হয়—বিবেকানন্দের প্রচার হইতে। প্রচারকের শিকাগো-বক্তৃতায় যুবক-ভারতের প্রতি ইয়াঙ্কি-সমাজের দৃষ্টি বোধ হয় প্রথম পড়ে। ভারতবাসীও তখন হইতে আমেরিকাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রথম চিনিতে থাকে। সেই সময়ে প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও ইয়াঙ্কি-সমাজে ভারতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করিতেছিলেন। প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি।

তাহার ১০।১২ বৎসর পর ঊনবিংশ শতাব্দী পূর্ণ হয়। বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিবার সময়ে ভারতবর্ষের জননায়কগণ বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার আয়োজনে দৃঢ় সঙ্কল্প হন। বোধ হয় ১৯০৩।৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ "নাউ অর নেভার" নামক পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহা দ্বারা তিনি দেশবাসীকে বুঝাইতেছিলেন যে, দেশের শিল্পোন্নতি না হইলে ভারতবাসী জগৎ হইতে তিরোহিত হইবে। সেই শোচনীয় অবস্থা এড়াইবার জন্য যথাসম্ভব সতর্ক হওয়া আবশ্যক—এবং কাল বিলম্ব না করিয়া স্বদেশীয় কৃষি-শিল্পের উৎকর্ষ বিধান করা কর্ত্তব্য। এইজন্য বিদেশ হইতে নব্যবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত কার্য্যপ্রণালী শিখিয়া আসা উচিত। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কলিকাতায় বিদেশ-প্রেরণ-পরিষৎ স্থাপিত হইল। বিদেশের সঙ্গে ভারতবাসীর গভীরতর এবং ঘনিষ্টতর সংযোগ-বিধানের ব্যবস্থা ইহার পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই।

পূর্ব্বে ভারতীয় ছাত্রেরা বিদেশে আসিত। কিন্তু অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের ডিগ্রি লাভই তাহাদের উদ্দেশ্য থাকিত—এবং হয় ব্যারিষ্টারী না হয় অধ্যাপকতা কিম্বা অন্য কোন প্রকার সরকারী চাকুরী পাওয়াই

তাহাদের লক্ষ্য দেখা যাইত। "বিদেশ-প্রেরণ-পরিষদে"র প্রতিষ্ঠা হইতে আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়া গেল। আমরা সমগ্র বিশ্বকেই আমাদের শিক্ষালয় বিবেচনা করিতে শিখিলাম। কেবলমাত্র ইংলণ্ডকেই আমাদের শিক্ষাদাতা না ভাবিয়া জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, জাপান ও আমেরিকায় আমাদের ছাত্রগণকে পাঠাইতে লাগিলাম। অধিকন্তু, তখন হইতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সংখ্যাও বাড়িয়া গেল। আমাদের ছাত্রেরা বয়ন-বিদ্যা, রঞ্জনশিল্প, রেশমী-কীটপালন, কৃষিবিজ্ঞান, ঔষধপ্রস্তুতকরণ, তড়িদ্বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং, চীনামাটির কাজ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, দোকান-দারী, বিজ্ঞাপন-প্রচার ইত্যাদি নানাবিধ নূতন নূতন জ্ঞান আহরণ করিতে লাগিল। সেরিকালচার, পিসিকাল্‌চার, ট্যানিং, টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রি, সেরামিক্স, ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং, মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারীং, ব্যাঙ্কিং, ইত্যাদি বহু নূতন নূতন বিদ্যার নাম ভারতে প্রচারিত হইতে থাকিল

বিদেশ-প্রেরণ-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইবার দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ভারতে "স্বদেশী আন্দোলন" সুরু হয়। বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জন এবং স্বদেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ—এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। দেশের নানাস্থানে নানা প্রকার শিল্পের অনুষ্ঠান আরব্ধ হইল। তাহার জন্য নব্যবিদ্যায় পারদর্শী বহুবিধ ওস্তাদের অভাব বোধ করা গেল। ইহার ফলে বিদেশ-প্রেরণ-পরিষদের আবশ্যক দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। অধিকন্তু দেশের নানাস্থান হইতে ছাত্রেরা স্বচেষ্টায় এবং স্বাধীনভাবেই বিদেশে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বাহির হইয়া পড়িল। ১৯০৫ সাল হইতে এই অবস্থা চলিতেছে।

ভারতবাসী যখন স্বদেশী আন্দোলন সুরু করেন,—ঠিক সেই সময়েই জাপান রুশিয়াকে পরাজিত করিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হন। জাপানের জয়-

লাভে যুবক-ভারত রোমাঞ্চিত হইল। এই কারণে আমাদের বিদেশগমনাকাঙ্ক্ষী ছাত্রগণ প্রথম প্রথম জাপানের দিকেই বেশী ছুটিত। ক্রমশঃ আমেরিকায় আমাদের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আমরা জার্ম্মাণি এবং ফ্রান্সের দিকে আমাদের নজর মাত্র দুই এক বৎসর হইল ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছি। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, ১৯০৫ সালে যুবক-ভারতের জন্মকাল হইতে হিন্দুস্থানের সঙ্গে ইয়াঙ্কিস্থানের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধ ক্রমশঃ আরও ঘনিষ্ঠতর হইবে আশা আছে।

দেশে একটা ধারণা আছে যে, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকিলে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকরী পাইবার যোগ্য নহেন। এই জন্য যাহারা জাপান ইত্যাদি দেশে আসে তাহারা সরকারী চাকরী পাইবে না ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ বিবেচিত হয়। অবশ্য এই কথার ব্যতিক্রমও কয়েকস্থলে দেখা গিয়াছে। যাহা হউক এই কারণে যাহারা কৃষিকর্ম্মে, শিল্পে ও ব্যবসায়ে জীবন সমর্পণ করিতে ভালবাসে অথবা এই সকল কার্য্যসম্বন্ধীয় বিদ্যার শিক্ষকতা করিতে চাহে তাহারা জাপান, আমেরিকা, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সে আসিয়া থাকে। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ইহারা সরকারী চাকরীর প্রত্যাশা রাখে না।

বিলাতেও দেখিয়াছি—আমেরিকায়ও দেখিতেছি যে, ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী—সর্ব্বাপেক্ষা কম বিহারী ও যুক্তপ্রদেশবাসী। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের ছাত্র বিদেশে নাই বলিলেই চলে। মুসলমানদের সংখ্যাও অত্যল্প—আমেরিকায় ২৬৫ জন ভারতীয় ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৩।৪ জন মুসলমান। ইয়াঙ্কিস্থানের ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্যে অধিকাংশই "স্বদেশী আন্দোলনে"র কোন না কোন বিভাগের সঙ্গে লিপ্ত ছিল। বিগত সাত বৎসরের ভিতর প্রায় ৫০ জন ছাত্র "বঙ্গদেশস্থ

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে"র প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থানুসারে প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া আমেরিকায় নানা বিদ্যার অধিকারী হইয়াছে।

আমেরিকার নামে নাক শিট্‌কান আমাদের দেশে একটা ফ্যাশান দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটগণের সম্মান ভারতবর্ষে নাই। বোধ হয় প্রথম প্রথম কোন কোন ছাত্র আমেরিকায় লেখাপড়া না শিখিয়াই দেশে ফিরিত। তাহাদের দৃষ্টান্তে দেশনায়কেরা ভাবিতেন—হয় আমেরিকায় লেখাপড়া আদৌ শিখান হয় না অথবা ছাত্রেরা আমেরিকায় আসিলে জুয়াচুরী ও প্রবঞ্চনা শিখে। বিশেষতঃ, আমাদের ছাত্রেরা প্রায় কেহই উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য স্বদেশ হইতে পায় নাই। নিয়মিতরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইলে অন্ততঃ ১৫০৲ টাকা মাসিক আবশ্যক হয়। এই টাকার সিকি অংশও অনেকের কপালে জুটে নাই। তাহাদিগকে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবনধারণ করিতে হইয়াছে। মাত্র অবসর মত অধ্যয়নের সুযোগ তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে। এই কারণেও আমাদের যুবকেরা সুফল দেখাইতে পারে নাই। তাহার উপর মনে রাখা আবশ্যক যে, আমেরিকায় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ কোন দিনই আসে নাই। বিদেশে "ভালছেলে"রা আসিতে চাহিলে তাহাদিগকে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে পাঠান হয়। উৎকৃষ্টতর ছাত্রদিগকে বার্লিনে পাঠান হয়। কাজেই আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্ব উচ্চতম শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেই পারে না। আর এক কথা—প্রথম প্রথম আমাদের ছাত্রেরা বিদেশে আসিতে চাহিত না। তখন কঠোরভাবে নির্ব্বাচন না করিয়াই বহু ছাত্র পাঠান হইয়াছিল। কয়েক-জন নিতান্ত অনুপযুক্ত ছাত্রও এই উপায়ে জাপানে এবং আমেরিকায় আসিতে পারিয়াছিল। এণ্ট্রান্স-ফেল, বি এ-ফেল যুবকও বিদেশে 'বিজ্ঞান শিখিতে' আসিয়াছে! এইজন্য দেশে একটা গুজব রটিয়াছিল

যে, আমেরিকায় একমাত্র "মায়ে তাড়ান এবং বাপে খেদান" ছেলেরাই আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই একজন ছাত্রের চরিত্র-হীনতার কাহিনীও হয়ত দেশে পৌঁছিয়াছে। তাহার জন্যও আমাদের অভিভাবকগণ আমেরিকার উপর নারাজ।

গভীরভাবে আলোচনা করিলে নারাজ হইবার অথবা নাক শিট্‌কাইবার কোন কারণই থাকিবে না। দুই চারিজনের অসদ্ব্যবহারে অথবা অকৃতকার্য্যতায় অথবা চরিত্রহীনতায় সমগ্র সমাজ পচিয়া যায় না। ভারতবর্ষের মুখে চুণকালিও ইহাতে পড়ে বলিয়া মনে হয় না। ইয়াঙ্কি-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা মোটের উপর ভারতীয় ছাত্রগণের চরিত্রে এবং জ্ঞানানুরাগে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট। ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন —"মহাশয়, উপযুক্ত মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া ছাত্র পাঠাইতে থাকুন এবং যথার্থ-শিক্ষানুরাগী উচ্চশিক্ষিত ছাত্র পাঠাইতে থাকুন—তাহা হইলে শীঘ্রই আমেরিকায় ভারতীয় আন্দোলন আরব্ধ হইতে পারিবে।" আমাদের ধুরন্ধরগণ এই কথা বেশ বুঝিলে আমেরিকার সম্বন্ধে ভুল ধারণা সংশোধন করিতে পারিবেন।

আশা আছে, আগামী পাঁচ বৎসরের ভিতর ভারতের পয়সাওয়ালা লোকেরা সন্তানগণকে আমেরিকায় পাঠাইতে প্রবৃত্ত হইবেন। "ভাল ছেলেরা"ও অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজকেই স্বর্গ বিবেচনা না করিয়া ইয়াঙ্কি-স্থানের যথোচিত সম্মান করিতে অগ্রসর হইবেন। ফলতঃ আমাদের শিক্ষাবিধানে বিলাতের একচেটিয়া অধিকার আর থাকিবে না।

আমেরিকার ভারতীয় ছাত্রেরা চীনা-ছাত্রদের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। ইহারাও "হিন্দুস্থান এ্যাসোসিয়েসন অব্ আমেরিকা" অর্থাৎ "আমেরিকার হিন্দুস্থান-পরিষৎ" নাম দিয়া একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছে। দুই এক বৎসর মাত্র ইহার কার্য্য হইয়াছে।

প্রত্যেক বড় কেন্দ্রেই এই পরিষদের শাখা-পরিষৎ আছে যথা—নিউইয়র্ক শাখা পরিষৎ, শিকাগো শাখা-পরিষৎ, ইলিনয় শাখা-পরিষৎ, উইস্‌কন্সিন্ শাখা-পরিষৎ, ক্যালিফর্ণিয়া শাখা-পরিষৎ ইত্যাদি। এই পরিষৎ একখানা পত্রিকা বাহির করিতেছেন—তাহার নাম "হিন্দুস্থানী ষ্টুডেণ্ট"। ইহাতে শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য ভিন্ন অন্য কোন কথার আলোচনা হয় না। কলিকাতার "কলেজিয়ান" এই শ্রেণীর পত্রিকা। এই বৎসর পরিষদের নায়কতায় একটা ভারতীয় সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাহার নাম "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল হিন্দুস্থানী ষ্টুডেণ্টস্ কন্‌ভেনশন"। এইবার সম্মিলনের অধিবেশন হইবে—পশ্চিম অঞ্চলের স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কো নগরে। সেখানে মহা-ধুমধামের সহিত প্যানামা-খালা-কাটা উপলক্ষে বিরাট প্রদর্শনী খোলা হইতেছে। প্রদর্শনীর ক্ষেত্রেই প্রথম ভারতীয় সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পৃথিবীর যেখানে যেখানে ভারতীয় ছাত্র, অধ্যাপক, পর্য্যটক বা ব্যবসায়ী আছেন তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রিত করা হইতেছে। ইঁহাদের আশা আছে যে, বোর্ণিয়ো, যবদ্বীপ, শ্যাম, চীন, জাপান, হাওয়াই, দক্ষিণ আমেরিকা, জ্যামেকা, ফ্রান্স এবং অন্যান্য স্থান হইতে দুই একজন করিয়া প্রতিনিধি আসিবেন।

অল্পকালের ভিতরেই হিন্দুস্থান-পরিষদের নাম ইয়াঙ্কি-সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইয়াঙ্কিস্থানের সেবাব্রতধারী নরনারীগণ ভারতীয় ছাত্রগণকে নানা উপায়ে সাহায্য করিবার জন্য পরিষদের নিকট অভিলাষ ব্যক্ত করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন—"আমি একজন ভারতীয় বালিকার আমেরিকায় শিক্ষার ব্যয় বহন করিব।" কেহ বলিতেছেন—"যদি কোন দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্র বা ছাত্রী কর্ম্ম প্রার্থনা করে তাহাকে আমি আমার পরিবারে কর্ম্ম দিতে প্রস্তুত আছি।" কোন কোন উচ্চ-শিক্ষিতা রমণী লিখিয়াছেন—"আমি ভারতবর্ষে যাইয়া স্ত্রী-সমাজে

শিক্ষাবিস্তার করিতে ইচ্ছা করি। আমাকে যাওয়া-আসার খরচ এবং সেখানে থাকিয়া জীবনধারণ করিবার জন্য অর্থ-সাহায্য করা হউক। আমি কোন বেতন চাহি না। ভারতবর্ষের সনাতন-আদর্শ অনুসারে যাহাতে শিক্ষাবিস্তার হয় তাহার প্রতিই আমার দৃষ্টি থাকিবে। সেই আদর্শ বুঝিবার জন্যও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

অধিকন্তু একটা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মেও হিন্দুস্থান-পরিষদের আবশ্যকতা বুঝা গিয়াছিল। গত বৎসর ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল-দরবার হইতে একটা আইন জারি করা হইতেছিল। তাহার দ্বারা ভারতীয় কুলী ও ছাত্রগণের সহজে ইয়াঙ্কিস্থানে প্রবেশ করিবার সুযোগ নষ্ট করা হইত। ভারতবর্ষের জননায়কগণ বোধ হয় সে সংবাদ যথাসময়ে রাখেন নাই। যাহাহউক হিন্দুস্থান-পরিষদের আয়োজনে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সুরু হয়। অবশেষে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ, পি এইচ্ ডি, পরিষদের পক্ষ হইতে ওয়াশিংটনের দরবারে প্রেরিত হন। তিনি সেখানে দুই সপ্তাহকাল থাকিয়া রেপ্রেজেণ্টেটিভ ও সেনেটারদিগকে এবং প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইল্‌সনকে অবস্থা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার সঙ্গে ক্যালিফর্ণিয়া হইতে শিখ-পরিষদের একজন প্রতিনিধিও গিয়াছিলেন। ইঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়। সম্প্রতি আইন জারি করা স্থগিত আছে। তবে বোধ হয় আইন জারি হইবেই। ভারতীয় "শ্রমজীবী" এবং কুলী আর আমেরিকায় আসিতে পারিবে না। ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ কিছুকাল হইতে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত কোন কোন বিদ্যা বিষয়ে অধ্যাপকতা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঁহার খ্যাতি আছে।

হিন্দুস্থান-পরিষৎ মাত্র দুই বৎসরের শিশু। প্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত—নিজেদের লেখাপড়া চালাইবার ক্ষমতাই অধিকাংশ

ছাত্রের নাই। প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে স্বাবলম্বী। নূতন আইন জারি হইলে "স্বাবলম্বী" ছাত্রগণকে কুলী বা "শ্রমজীবী" বিবেচনা করা হইবে। ছাত্র বিবেচনা করা হইবে না। সুতরাং প্রত্যেক ভারত সন্তানকে হয় দেশ হইতে টাকা পয়সা আনাইয়া লেখাপড়া শিখিতে হইবে—না হয় আমেরিকা হইতে দেশে ফেরত পাঠান হইবে। ইয়াঙ্কি-স্থান ভারতবাসীকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিবার সুযোগ দিয়াছে। খাটিয়া খাইবার সঙ্গে সঙ্গেও বিদ্যা অর্জ্জন করা যায়—ইয়াঙ্কি-সমাজে আসিবার পূর্ব্বে ভারতীয় ছাত্রের তাহা জানা ছিল না। ইয়াঙ্কিস্থান যুবক-ভারতের সাহসিকতা এবং আত্মসম্মান বোধ শতগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। যখন যুবক-ভারতের ইতিহাস রচিত হইবে তখন ইয়াঙ্কিস্থানের বিষয়ে বিশেষ এক জলন্ত অধ্যায় লিখিত হইবে—সন্দেহ নাই। আর উৎসাহী, স্বাবলম্বী, কঠোর শিক্ষাব্রতধারী, তথাকথিত "মায়ের তাড়ান, বাপে খেদান" অন্নবস্ত্রহীন ভারতীয় ছাত্রেরা যে পরিষদের সূত্রপাত করিয়া গেল তাহার পরিচয়ও ভবিষ্যৎ ভারতেতিহাসে প্রদত্ত হইবে। যুবক-ভারতের সাধনায় ও কর্ম্মযোগে এই প্রতিষ্ঠান অমূল্য।

নবম অধ্যায়

আরও পশ্চিম

মিসিসিপির অপর পার

আমরা অনেক সময়ে মধুপুর, দেওঘর ইত্যাদি অঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়া "পশ্চিম" ভ্রমণের গল্প করিয়া থাকি। পাটনা, কাশী ইত্যাদি নগর ত মহাপশ্চিম! কিন্তু কাশীর পশ্চিমে "আরও পশ্চিম" ভারত এবং "মহাপশ্চিম" ভারত অবস্থিত। কাশীকে ভারতীয় মধ্যপশ্চিম প্রদেশের একটা নগর বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইলিনয় প্রদেশ এবং শিকাগো নগর ইয়াঙ্কিস্থানের এইরূপ মধ্যপশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত। বস্তুতঃ নিউইয়র্ক হইতে শিকাগো আসিয়াও যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্ব অঞ্চলেই আছি মনে হইতেছে। যতখান আসিয়াছি, শিকাগো হইতে তাহার তিনগুণ গেলে তবে আমেরিকার পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হইব। বলা বাহুল্য, অতি অল্প সংখ্যক ইয়াঙ্কিই এই বিশাল মহাদেশের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া থাকে। আমরা ভারতবর্ষের যে প্রদেশে বাস করি সেই প্রদেশের সংবাদই বেশী রাখি—অন্যান্য প্রদেশসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকটা অস্পষ্ট, অগভীর এবং উড়ু-উড়ু। ইয়াঙ্কিরাও তাহাদের সুবিস্তৃত যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটা মাত্র প্রদেশসম্বন্ধে খোঁজখবর রাখিয়া থাকে—অন্যান্য প্রদেশসম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান নিতান্তই অবজ্ঞেয়। চরম বেগের গাড়ীতে চড়িলেও নিউইয়র্ক হইতে স্যানফ্র্যান্সিস্কো

পৌঁছিতে চারি দিন চারি রাত্রি লাগে। ইয়াঙ্কিস্থানের আয়তন ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ।

নদীর ধারে প্রসিদ্ধ নগর গড়িয়া উঠিয়াছে—ইতিহাসে তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাই। নীল, গঙ্গা, ইয়াংসিকিয়াং তাইগ্রিস্ ইত্যাদি নদীর প্রভাবেই মিশর, ভারত, চীন, পারস্য ইত্যাদি দেশে সভ্যতার বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। ইয়োরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রও নদীমাতৃক দেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিতে পাই। আবার মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সমুদ্রের প্রভাবও কম নয়। সমুদ্রের কূলে বহুনগর মস্তক উন্নত করিয়া সমগ্র দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমুদ্র-বন্দরসমূহের সমৃদ্ধি যথেষ্ট লক্ষ্য করিতে পারি। বর্ত্তমান কালের সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ নগরগুলিও সবই সমুদ্র-বন্দর।

ইয়াঙ্কিস্থানের নগর-গঠনে নদী ও সমুদ্র উভয়ের প্রভাবই প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। অধিকন্তু, এখানে সাগর-সদৃশ মহাহ্রদসমূহের কূলে কূলেও একাধিক প্রসিদ্ধ নগর উৎপন্ন হইয়াছে। মিশিগান হ্রদের বন্দর শিকাগো তাহাদের অন্যতম। মিশিগান হ্রদেরই আর একটা প্রসিদ্ধ বন্দরের নাম মিল্‌ৌকি—উহা উইস্‌কন্সিন প্রদেশের অন্তর্গত।

হ্রদ-বন্দরগুলি একাধারে শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র। নায়াগ্রাঝোরা দেখিতে যাইবার সময়ে নিউইয়র্ক প্রদেশের বাফেলো নগর অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এই নগর ঈরি হ্রদের একটি প্রধানতম বন্দর। ওহায়ো প্রদেশের দুইটি প্রসিদ্ধ নগরও ঈরি হ্রদের উপর অবস্থিত। একটির নাম টোলিডো অপরটির নাম ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড। হ্রদের ধারে এইরূপ নগরের উৎপত্তি আমেরিকার একটা বিশেষত্ব। হ্রদ-বন্দরগুলি না দেখিলে ইয়াঙ্কিদের বর্ত্তমান বাণিজ্যধারা সম্যক্ বুঝা যায় না। অথচ ১৮২০।৩০ খৃষ্টাব্দে এই সকল নগর নিতান্ত নগণ্য পল্লীগ্রামমাত্র ছিল।

অধ্যাপক টার্ণার বলিতেছেন—"Buffalo and Detroit were hardly more than villages until the close of this period. They waited for the rise of steam navigation on the Great Lakes. Cleveland also was but a hamlet during most of the decade. * * * Chicago and Mil-waukee were mere far trading stations in the Indian Country."

৭০।৮০ বৎসরের ভিতর একটা ২৬ মাইল বিস্তৃত নগর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। শিকাগোতে বসিয়া এই অপরূপ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিতেছি। এত অল্প সময়ে এইরূপ সমৃদ্ধিলাভ বিশ্বাস করা কঠিন। বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের সকল প্রকার উন্নতিই নিতান্ত অর্ব্বাচীন—৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বেকার জগতে ভারতীয় (ও প্রাচ্য) এবং ইয়োরোপীয় (ও পাশ্চাত্য) শিল্পবিজ্ঞান-সভ্যতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয়েরা পাশ্চাত্য জাতিপুঞ্জের তুলনায় কোন বৈষয়িক ও সাংসারিক অনুষ্ঠানেই হীন ছিলেন না। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের নবীনতম উন্নতির লক্ষণগুলি দেখিবার সময়ে একথা যেন ভুলিয়া না যাই।

বিলাতের মত আমেরিকায়ও শীতকালের প্রাকৃতিক দৃশ্য কদাকার। বিলাতে শীতের আরম্ভ মাত্র দেখিয়া আসিয়াছি—আমেরিকায় শীত কাটাইলাম। আমাদের দেশে এখন "বৈশাখের খর রবি উঠেছে আকাশে।" এখানেও গরম পড়িয়াছে কিন্তু শীতের প্রকোপ পূরাপূরি চলিয়া যায় নাই। গাছপালায় নূতন পাতা এখনও গজায় নাই। সর্ব্বত্রই 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।'

"শিকাগো ইলিনয় প্রদেশের সর্ব্ব পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত। সোজা পশ্চিম যাত্রা করিলাম। রেলপথের দুই পার্শ্বে কৃষিভূমি এবং পত্রহীন

তরুরাজি। একঘেয়ে সমতল ক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছু চোখে পড়ে না। সামান্য তরঙ্গায়িত ভূমি অতি বিরল। ধূসরবর্ণের বালুকাময় মৃত্তিকা সর্ব্বত্র দেখিতেছি। নয়নতৃপ্তিকর কোন পদার্থ মিসিসিপি-মাতৃক জনপদে পাইলাম না।

কৃষিক্ষেত্রগুলির আয়তন অতি বৃহৎ। ভারতবর্ষে একশত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্র একত্র করিলে যেরূপ হয় এখানকার এক একটা আবাদই আকারে তত বড়। তিনটা করিয়া ঘোড়া এক একটা লাঙ্গলের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। লাঙ্গলটার তীক্ষ্ণভাগ আমাদের মামুলি লাঙ্গল অপেক্ষা দেখিতে প্রায় পাঁচ সাতগুণ বেশী। বস্তুতঃ লাঙ্গল একটা কল-বিশেষ, চাষী ইহার উপর স্বচ্ছন্দে বসিয়া ঘোড়া চালাইতে থাকে। অল্প কালের ভিতরেই বড় বড় ক্ষেত্র যথেচ্ছরূপে চষা হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আবাদের অন্যান্য কাজের জন্য ত ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ও কল ব্যবহৃত হয়। কলগুলির মূল্য অথবা জটিলতা বেশী বলিয়া মনে হইল না। এই সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়াই অল্প সময়ে অধিক কাজ করা যাইতে পারে,—যন্ত্রগুলি সময় এবং পরিশ্রম লাঘব করিবার উপায় বিশেষ। এই জন্যই ভারতীয় একশত ক্ষেত্র সমবেতভাবে আমেরিকার একটা মাত্র ক্ষেত্রের সমান। এই কারণেই কোন দেশের লোকবল বুঝিতে যাইয়া কেবল মাত্র মাথা গুণিলে চলে না। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ত্রিশকোটী আর ইয়াঙ্কিস্থানের লোকসংখ্যা মাত্র দশকোটী। তথাপি বলিব, ইয়াঙ্কিদের লোকবলই অধিক—কলের বলে ইহাদের এক-একজন লোক অনেক বিষয়ে আমাদের ৫।১০।১৫।২০ জন লোকের সমান।

শিকাগো হ্রদ হইতে প্রায় ২০০ শত মাইল পশ্চিমে আসিয়া ইলিনয় প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিলাম। এখানে মিসিসিপি নদী পার হইতে হইল। নদীর দুইধারে দুইটী নগর। ইলিনয় প্রদেশের নগরের নাম

রক্-আইল্যাণ্ড। অপর পারে আইওয়া রাষ্ট্রের আরম্ভ—সীমান্ত নগরের নাম ড্যাভেন পোর্ট। ভারতবর্ষে চৈত্র-বৈশাখ মাসে রেলের যাত্রীরা যেরূপ গরম সহ্য করে আজ ইলিনয় আইওয়া প্রদেশের রেলপথে সেইরূপ গরম পাইলাম। অবশ্য গ্রীষ্মঋতু আমেরিকায় এখনও পুরাপুরি দেখা দেয় নাই। আজিকার অবস্থা সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস মাত্র। ইয়াঙ্কি-সহযাত্রীরা বলাবলি করিতে লাগিল—"Almost a July-day." আমি ভাবিলাম, "আম-পাকান গরম।"

আর মাইল পঞ্চাশেক পরে আইওয়া নগর। এই নগরে প্রদেশ-রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এখানে গাড়ী হইতে নামা গেল। সামান্য একটা রেলওয়ে ষ্টেসন। মনে হইল, বাঙ্গালাদেশের কোন এক ষ্টেশনে নামিয়াছি। লোকজনের কলরব, গতিবিধি, হোটেল-গৃহের আড়ম্বর, গাড়োয়ানদের হৈ-চৈ কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছি না। নিভৃত জনপদে পদার্পণ করিলাম। মধ্যে মধ্যে পাখীর গান শুনা যাইতেছে। কোথায় নিউইয়র্ক, বাফেলো, ক্লীভল্যাণ্ড, শিকাগো, আর কোথায় আইওয়া। আইওয়া হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া গেলে কোন ব্যক্তি ইয়াঙ্কিস্থানের বিশেষত্ব কিছুই প্রচার করিতে পারিবেন না। অথচ নিউইয়র্ক শিকাগো মাত্র দেখিয়া গেলেও আমেরিকার আংশিক জ্ঞান জন্মিবে মাত্র। আইওয়া ইয়াঙ্কিস্থানের বরিশাল জেলা। কৃষিকার্য্য এবং শূকরপালন এই দুই বিষয়ে আইওয়া-রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয়। এই-জন্য আইওয়া ষ্টেসনে নামিবামাত্র মোটের উপর বাঙ্গালা দেশের ধরণ-ধারণ ও আবহাওয়া যেন সম্মুখে পাইলাম।

আইওয়ায় পল্লীজীবন

আইওয়া সহরটা ঠিক যেন বাঙ্গালাদেশের রংপুর। বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, দোকান-বাজার সবই আমাদের মফঃস্বলের কথা মনে করাইয়া দেয়। রাজধানীর ধুলা-ময়লা, গলি-ঘোঁচ এখানে নাই। বহুতলবিশিষ্ট গৃহও এখানে দু-একটার বেশী দেখিতে পাইতেছি না। ফাঁকা পরিষ্কার কোলাহলহীন পল্লীজীবন যাপন করা যাইতেছে। সহরের পাকা পাকা বাঁধান রাস্তায় ১৫।২০ মিনিট হাঁটিয়াই খাঁটি বনভূমি, কৃষিক্ষেত্র ও পল্লী-পথে পৌঁছান যায়। বর্ষাকালে রাস্তায় জল-কাদার উপদ্রবও নিতান্ত কম নয়। কর্দ্দমাক্ত পল্লীরাস্তায় গরুর গাড়ী চলিয়া গেলে যেরূপ অবস্থা হয়, শুনিলাম, এই সহরের আশে পাশেই সেই ধরণের অবস্থা বৃষ্টিকালে ঘটিয়া থাকে।

ক্ষুদ্র আইওয়া নদী নগরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। নদীর জল বাঁধিয়া রাখিয়া নগর-শাসকেরা কৃত্রিম প্রপাত তৈয়ারী করিয়া লইয়াছেন। সেই প্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করা হয়। তাহার দ্বারাই নগরের আলোক, ট্রামওয়ে ইত্যাদি সম্পর্কিত কলকারখানাগুলি চালান হইয়া থাকে। আমেরিকায় বিদ্যুতের ব্যবহার নিতান্তই মামুলি ঘরোয়া কথা। পাড়াগাঁয়ের লোকেরাও বিদ্যুৎ-পরিচালিত কলযন্ত্র-সমূহকে সাধারণ হাঁড়ী-কলসীর মত ব্যবহার করিতে সুদক্ষ। এখানে তড়িচ্চালিত মোটরগাড়ীগুলি আমাদের গরুর গাড়ীর মত সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রসিদ্ধ নগরসমূহের অধিবাসীরাও যে সমুদয় বস্তু দেখিলে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইবেন এখানকার পল্লীবাসীগণ সে

গুলিকে নিত্য নৈমিত্তিক কাজে "আটপৌরে" বস্তু স্বরূপ ব্যবহার করিতেছে। কাজেই ভারতীয় পল্লীগ্রামের আসবাব-পত্র, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এবং কর্ম্মকেন্দ্র ইত্যাদির সঙ্গে এখানকার পল্লীসদৃশ ক্ষুদ্র নগরাবলীর আসবাব-পত্রাদির তুলনা করা চলে না।

বেশ গরম পড়িয়াছে। সন্ধ্যাকালে নদী পার হইয়া মাঠে বেড়াইতে গেলাম। মাছি ও পোকার উৎপাত বেশ বুঝিতেছি—ঝিঁঝিঁ পোকা এবং ব্যাঙের ডাকও শুনিতে পাওয়া গেল। বাঙ্গালাদেশের পল্লীপথে মুদী-দোকানদারেরা হাট হইতে সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া আসে। এই দৃশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন। এখানেও সেই ধরণের দৃশ্যই যেন চোখে পড়িল। ভাবিলাম, আইওয়াবাসীরাও গাহিতে পারেন—

"ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে
তোমার ধানেভরা আঙ্গিনাতে জীবনের দিন কাটে
(মরি হায় হায় রে)
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার
রাখাল তোমার চাষী।"

সঙ্গে ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ বসু এবং নবীন চন্দ্র দাস। বেড়াইতে বেড়াইতে নবীনের সঙ্গে কয়েকজন ইয়াঙ্কির দেখা হইল। তাহাদের সঙ্গে ইহার বেশ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রহিয়াছে বুঝিলাম। নবীন বলিলেন—"আমি এই অঞ্চলের চাষী, রাখাল, ধোপা, নাপিত, পাচক, ঘরামী, দোকানদার ইত্যাদি নানাশ্রেণীর লোকের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। আমাকে ইহারা আমার নাম ধরিয়া ডাকে—এবং আমাকে বেশ ভালবাসে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এরূপ বন্ধুত্ব জন্মিল কিরূপে?" নবীন বলিলেন—"এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দুই বৎসর লেখা পড়া

করিবার পর আমার অর্থকষ্ট হয়। দেশ হইতে টাকা উপযুক্ত পরিমাণে পাইতাম না। তখন আমাকে নিজে খাটিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হইল। সেই উপলক্ষ্যে আমি এই নগরের বহুলোককে চিনিয়া ফেলিয়াছি। নগরের সন্নিহিত পল্লীসমূহেও আমার পরিচিত বহু লোক আছে। আমি বাস্তবিকই বলিতে পারি—'ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষী'।" এইরূপ অভিজ্ঞতায় উপকার আছে।

শুনিলাম—এই অঞ্চলের লোকজন খুব সাদাসিধা ও সরলপ্রকৃতি। ইহাদের চলাফেরা, কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী সকল বিষয়েই পাড়াগেঁয়ে স্বাধীনতা ও সরলতা দেখা যায়। সহুরে কৃত্রিমতা, কায়দা-কানুন, এবং ওস্তাদী "চাল" এখানকার লোকজনের স্বভাববিরুদ্ধ।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল—লোকালয়ে একটি দুইটি করিয়া বাতি জ্বলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ উদ্যানের তরুরাজির মধ্যে কাটাইয়া নদী পার হইলাম। রাস্তায় লোক খুব কমই যাওয়া আসা করিতেছে। মনে হইল—

"তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে!
তখন খেলাধূলো সকল ফেলে তোমার কোলে ছুটে আসি।"

প্রদেশ-রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-সমিতি

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপকের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করা গেল। ইঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বিভাগের কর্ত্তা। ঘণ্টাদেড়েক কথাবার্ত্তা চলিল। সপত্নীক জগদীশচন্দ্র এখানে কয়েকদিন কাটাইয়া গিয়াছেন শুনিলাম।

একজন বলিলেন—"মহাশয়, সম্প্রতি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৪।৫ জন ভারতীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। কিন্তু আগামী বর্ষ হইতে আমরা হয়ত বেশী ছাত্র ভারতবর্ষ হইতে পাইতে পারি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহার বিশেষ কোন কারণ আছে কি?" ইনি উত্তর করিলেন—"এই বৎসর মধ্যপশ্চিম প্রদেশের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশীয় ছাত্রগণের প্রবেশ রুদ্ধ করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। অপনি বোধ হয় জানেন যে, আমাদের প্রদেশ-রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক। প্রদেশের সকল ছাত্রই বিনা বেতনে এই সকল কেন্দ্রে শিক্ষা পাইয়া থাকে। কিন্তু অন্য কোন প্রদেশ হইতে ছাত্র আসিলে তাহাদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা হয়। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইওয়াবাসী ছাত্র ও ছাত্রীরা বিনা বেতনে শিক্ষা পায়। কিন্তু ইলিনয় প্রদেশের কোন ছাত্র আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহাকে মাসিক বেতন দিতে হয়। এই রীতি প্রত্যেক প্রদেশেই অবলম্বিত। কিন্তু বেতনের হার অতি অল্প। এই জন্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে এবং চীন, জাপান, ভারতবর্ষ ইত্যাদি বিদেশ হইতেও আমরা

ছাত্র পাইয়া থাকি। সম্প্রতি উইস্‌কন্সিনরাষ্ট্র বেতনের হার বাড়াইয়া দিয়াছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইলে যত বেতন দিতে হয় উইস্‌কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয় সেইরূপ বেতন চাহিতেছেন। ইহার ফলে বিভিন্ন প্রদেশীয় এবং বিদেশীয় ছাত্র উইস্‌কন্সিনের দিকে আর ঘেঁসিবে না মনে হইতেছে। কিন্তু আমরা বেতন বৃদ্ধির পক্ষপাতী নহি। এই কারণে হয়ত চীনা, জাপানী, ভারতীয় এবং ফিলিপিনো ছাত্র আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আকৃষ্ট হইতে পারে।"

ইয়াঙ্কিস্থানের প্রত্যেক প্রাদেশিক রাষ্ট্রই উচ্চশিক্ষা এবং নিম্নশিক্ষার সকল ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। পূরাদমে "সংরক্ষণনীতি"র কার্য্য প্রত্যেক প্রদেশেই চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধান, কৃষিশিক্ষাবিস্তার, কৃষিকলেজ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিও প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বিবেচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল দরবারও প্রাদেশিক কৃষিবিভাগসমূহের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। অল্পকালের ভিতর ইচ্ছানুরূপ সমৃদ্ধিলাভের জন্য রাষ্ট্র উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইহারা জনগণের স্বাভাবিক ও স্বাধীন কর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি এইরূপে শতগুণ বাড়াইয়া তুলিতে সমর্থ হইতেছেন।

ইতিহাস-বিভাগের কর্ত্তা অধ্যাপক শ্যামবগ বলিলেন—"মহাশয়, আপনি মধ্যপশ্চিম প্রদেশসমূহের ষ্টেট হিষ্টরিক্যাল সোসাইটিগুলি দেখিয়াছেন কি?" আমি বলিলাম—"কৈ, কখনও ত এই প্রতিষ্ঠান-সমূহের নাম শুনি নাই।" আমাদের দেশে সাহিত্যপরিষৎ, সাহিত্যসভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, ইয়াঙ্কিস্থানের প্রদেশরাষ্ট্রীয় হিষ্টারিক্যাল সোসাইটিগুলি সেই ধরণের কার্য্যই করিতে-ছেন। তবে আমাদের পরিষৎসমূহের কর্ম্মক্ষেত্র অতিশয় বিস্তৃত ও ব্যাপক। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া নদ-নদী পর্য্যন্ত

সকল বিষয়ে আলোচনা ভারতীয় সাহিত্যপরিষৎসমূহের উদ্দেশ্য রহিয়াছে। কেন কোন পরিষৎ কেবল মাত্র ঐতিহাসিক অনুসন্ধানেই সকল শক্তি নিয়োজিত করেন। এখানকার আইওয়া, মিশিগান, ইলিনয়, উইস্কন্সিন ইত্যাদি প্রদেশের ষ্টেট হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি বা ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-সমিতিগুলি একমাত্র ইতিহাসালোচনায়ই ব্যাপৃত। এই কার্য্যের জন্য রাষ্ট্র হইতে প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়। রাষ্ট্রশাসকগণ লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, সংগ্রহালয়, গ্রন্থপ্রকাশ, লেখকনিয়োগ, বৃত্তিপ্রদান ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ মুক্তহস্তে টাকা খরচ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম সাহিত্য-ক্ষেত্রে "সংরক্ষণ-নীতি" অবলম্বন। জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহিত্য-চর্চ্চায় ব্রতী হউক বা না হউক, রাষ্ট্রবীরগণ সমাজের ভিতর সাহিত্যচর্চ্চা অনায়াসসাধ্য করিয়া তুলিতে প্রয়াসী। উপযুক্ত লোকজনকে অর্থ সাহায্য করিলেই এই কার্য্য সহজে সিদ্ধ হয়।

অধ্যাপক শ্বামবগের সঙ্গে আইওয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধানসমিতি সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। ইনি বলিলেন—"আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক, আবার এই অনুসন্ধানসমিতির সম্পাদক এবং পরি-চালক। বৎসরে ৬০০০০৲ এই সমিতি কর্ত্তৃক খরচ করা হইতেছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মত্যাগ করিলেও অনুসন্ধানসমিতির কর্ম্মেই জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।" ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-সমিতির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিভাগ অথবা অন্য কোন বিভাগের কোন-রূপ সম্পর্ক নাই। প্রদেশ-রাষ্ট্র দুই প্রতিষ্ঠানেরই কর্ত্তা কিন্তু কার্য্য-পরিচালনা উভয়ের স্বতন্ত্র। এখন পর্য্যন্ত অনুসন্ধানসমিতির নিজ ভবন নির্ম্মিত হয় নাই। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়েরই কতকগুলি গৃহে সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

সমিতির লাইব্রেরী ও পাঠাগার দেখিলাম। শ্বামবগ্ বলিলেন—

মহাশয়, অন্যান্য প্রদেশের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানসমিতিগুলি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠায় বেশী খরচ করে। আমি এই নিয়মের বিরোধী। আমি গ্রন্থপ্রকাশ, মৌলিক অনুসন্ধান, লেখক-নিয়োগ ইত্যাদি কার্য্যেই উৎসাহী। আইওয়ায় বস্তুসংগ্রহ অপেক্ষা ঐতিহাসিক আলোচনা বেশী দেখিতে পাইবেন।"

গত দশ বৎসরের ভিতর যতগুলি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে সবগুলি একে একে দেখিলাম। আর কোন বিদ্বৎসমিতির অধীনে দশ বৎসরের মধ্যে এতগুলি মূল্যবান্ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না। গ্রন্থাবলীর নাম সূচীপত্র ও আলোচনা-প্রণালী দেখিয়া বুঝিলাম, শ্যামবগ্ ইতিহাস শব্দটাকে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নাই। আইওয়া প্রদেশের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল কথাই সমিতির নিযুক্ত পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়াছেন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, নীতি, ধর্ম্ম, শাসন, নগর, স্বাস্থ্য, প্রাচীন উপনিবেশ ইত্যাদি কোন বস্তুই ইঁহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত নয়। সামাজিক তথ্যসংগ্রহ, বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহ, বীরপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ, সমাজসংস্কার, পল্লীসংস্কার, রাষ্ট্রসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার—সকল বিভাগেই দুই চারিখানা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কাজেই সমিতির নাম যদিও ঐতিহাসিক, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কার্য্যক্ষেত্র মানবজীবনের ন্যায় বিশাল ও বিস্তৃত। একটি গ্রন্থমালার নাম অ্যাপ্লাইড হিষ্টরি (Applied History) বা "কার্য্যকরী ইতিহাসবিদ্যা"। কয়েক গ্রন্থের পাতা উল্টাইয়া বুঝিলাম, সাধারণতঃ যাহাকে অ্যাপ্লাইড সোশিয়লজি বলা হয় শ্যামবগ্ তাহার কার্য্যকরী ইতিহাসবিদ্যা নাম দিয়াছেন। সমগ্র মানবসমাজের যে কোন তথ্যই ইতিহাসবিদ্যার অন্তর্গত। কাজেই ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে সোশিয়লজি বা সমাজবিজ্ঞানেরই প্রতিশব্দ স্বরূপ। সুতরাং দুই নামের যে কোনটা ব্যবহার করা চলিতে পারে। কিন্তু অ্যাপ্লাইড

হিষ্টরি নামটা নূতন। আমি শ্যামবগ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, এই নাম রাখিবার বিশেষ কোন কারণ আছে কি ?" ইনি হাসিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আমি যদি সুপ্রচলিত অ্যাপ্লাইড সোশিয়লজি নাম দিতাম তাহা হইলে রাষ্ট্রের কর্ত্তাদের নিকট তৎক্ষণাৎ জবাবদিহি হইতে হইত। তাঁহারা কৈফিয়ৎ চাহিতেন—'আমরা তোমাকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানসমিতির ভার দিয়াছি। তুমি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রসর হইলে কেন ?' কাজেই আমি "কার্য্যকরী ইতিহাস-বিদ্যা" নামে কতকগুলি আলোচনা প্রকাশ করিতেছি নগরশাসন, রাজস্ব-আদায়, লোকসংখ্যা, শ্রমজীবি-সমস্যা, বিবাহসমস্যা, ডাইভোর্স ইত্যাদি সকল কথাই এই কার্য্যকরী ইতিহাসবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। এই সব দেখিয়া রাষ্ট্রশাসকেরা সন্তুষ্টই আছেন। অথচ এই সমুদয়ই সমাজবিজ্ঞান বিদ্যারও অন্তর্গত।"

শ্যামবগের গ্রন্থসম্পাদন-প্রণালী দেখিলাম। এক একখানি গ্রন্থ ইনি লেখকগণকে ৩।৪ বার সংশোধন করিতে বলেন। প্রত্যেকবার ইনি নিজে সংশোধনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহার পর, মুদ্রণ প্রুফপাঠ, সূচীপত্র ইত্যাদিতে যৎপরোনাস্তি যত্ন লওয়া হয়। এই সকল কার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এত টাকা খরচ করিবার ব্যবস্থা নাই বলিয়া আমাদের সাহিত্যপ্রচার নিখুঁত হয় না।

যুবক-ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র

অধ্যাপক শ্যামবগ্ বলিতেছিলেন—"মহাশয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের ডাক্তার স্থধীন্দ্র বসু অধ্যাপকতা করিতেছেন। ইনি আমার বিভাগেই একজন সহযোগী।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইহাঁর শিক্ষা-প্রণালী ছাত্রেরা পছন্দ করে কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরই বা ইহাঁর সম্বন্ধে কিরূপ মত?" ইনি উত্তর করিলেন—"প্রথম প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা সুধীন্দ্রের নিয়োগসম্বন্ধে বড়ই আপত্তি করিতেছিলেন। আমার বিশেষ চেষ্টায় ইহাঁকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আইওয়া রাষ্ট্রের পাদ্রীরা শাসনকর্ত্তাদের নিকট প্রচার করিতেন যে, একবার একজন ভারতবাসী ইয়াঙ্কিস্থানে উচ্চপদ লাভ করিলে ভারতবর্ষে তাঁহাদের সম্মান ও খ্যাতি আর থাকিবে না। ভারতবাসীরা যতদিন পর্য্যন্ত জগতে তাহাদের ক্ষমতাপ্রয়োগের ক্ষেত্র না পায় ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণের প্রতিপত্তি থাকিবে। অধ্যাপকগণও সুধীন্দ্রের নিয়োগে বড়ই নারাজ ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে গোলযোগ কাটিয়া গিয়াছে। ছাত্রেরা ইহাঁকে ভালই বাসে বলিতে হইবে। ইনি উপনিবেশ, পররাষ্ট্র-নীতি, এশিয়ার অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিন বিষয়েই ইনি ৩০ জন করিয়া ছাত্র পাইয়াছেন। ইহার দ্বারাই ইহাঁর কৃতিত্ব বুঝিতে পারা যায়।"

সুধীন্দ্র বসু ৮।১০ বৎসর হইতে আমেরিকায় আছেন। ইনি নানা প্রদেশে ঘুরিয়াছেন। ইলিনয় ও আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাঁর শিক্ষালাভ হইয়াছে। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই ইনি পি, এইচ্, ডি, উপাধি লাভ করিয়াছেন। প্রথম হইতেই ইনি স্বাবলম্বীরূপে জীবনযাপন করিতেন। নিজে

খাটিয়া অন্নসংস্থান করিতে করিতে ইনি বিদ্যার্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে কিছু টাকা জমাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। মধ্যবিত্ত ভারতবাসীর পক্ষে অর্থ সঞ্চয় করা একটা অসাধারণ কার্য্য। অল্প বয়সেই ডাক্তার বসু কিছু অর্থের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন শুনিয়া অনেকে সুখী হইবেন।

শ্যামবগ্ বলিলেন—"এক বৎসরের ভিতরই সুধীন্দ্রকে চীন জাপান ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশ পর্য্যটন করিতে পাঠান হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থসাহায্য করিবেন। ইনি দশ বৎসর হইল দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছেন—সুতরাং বর্ত্তমান ভারতের অনেক বিষয়েই ইঁহার অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু সেই সময়ে একবার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিলে ইঁহার কার্য্যক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে।"

সুধীন্দ্র ভারতবর্ষের মায়া কাটাইয়া আমেরিকার প্রজা হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। আর মাসদুয়েকের মধ্যে ইনি ইয়াঙ্কিস্থানের নাগরিক স্বত্ব লাভ করিবেন। ভারত-সন্তান এইরূপে ইয়াঙ্কি হইবেন। ইনি এখনও বিবাহ করেন নাই—ইয়াঙ্কি-রমণী কিম্বা ভারত-রমণী ইঁহার পত্নী হইবেন এখনও বলা যায় না।

"আমি এমন মায়ের ছেলে নই মা যে বিমাতাকে মা বলিব—"এই ভাবে রামপ্রসাদ তাঁহার মাতৃভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক সময়ে বিমাতাকে মা বলাও আবশ্যক। বর্ত্তমান যুগে ভারতবাসীর পক্ষে এই আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে। আসল মায়ের সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া সৎমায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লওয়া নিতান্ত কুপুত্রের কর্ম্ম বিবেচিত হইবে না। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন—

"মায়ের ভায়ের এমন স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি !"

ইহাই যুবক-ভারতের ধারণা, বাসনা ও সাধনা। কিন্তু এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্যই যুবক-ভারতকে কিছু বক্রপথে চলিতে হইবে। তাহাকে "নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর নির্ম্মম" হইয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। হয়ত "এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি" এই সাধ তাহার মিটিবে না। এই বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়াই হয়ত তাহার জীবন পরিচালিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ যাঁহাকে "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ" জ্ঞানে পূজা করিতেছি, তাঁহার জন্যই তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। দুনিয়ার বাজার হইতে যে তাঁহার জন্য পূজা-সামগ্রী সংগ্রহ করা আবশ্যক।

দুনিয়ার লোকেরা বর্ত্তমান ভারতসম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখে না। মরা পচা বাসি ভারত-বিষয়ে কোন কোন পণ্ডিতের ন্যূনাধিক জ্ঞান আছে সত্য—কিন্তু সজীব যুবক তাজা ভারত-সম্বন্ধে বিশ্ববাসী নিতান্ত অজ্ঞ। এই ভারতের তথ্যসমূহ কে প্রচার করিবে? ভারতে বসিয়া ত এই সকল তথ্য প্রচার করা অসম্ভব। তাহার জন্য দুনিয়ায় বাহির হইতে হইবে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর বসতি স্থাপন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সেই উপলক্ষে তাহাদের বিবাহ-সমস্যাও নূতন ভাবে মীমাংসা করা প্রয়োজন হইবে। সহস্র সহস্র ভারতসন্তান বিদেশে প্রবাসী হইতে থাকিলে ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক বিবাহযোগ্যা কন্যাও বাহিরে পাঠাইতে হইবে। অধিকন্তু ভারতীয় যুবকগণ বিদেশীয় রমণীদিগের পাণিগ্রহণ করিতেও হয়ত অভ্যস্ত হইয়া পড়িবেন। দুনিয়ায় যুবক-ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সমাজ-সমস্যা একটা নূতন আকার ধারণ করিবে। এখন পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু অল্পকালের ভিতরেই এই সকল প্রশ্ন গুরুতর আকারে দেখা দিবে।

সুধীন্দ্র এই হিসাবে যুবক-ভারতের নবীন কর্ম্মক্ষেত্রে অন্যমত পথ-প্রবর্ত্তক। আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেখিতে পাইব যে, এই পন্থা অনুসরণ করিবার জন্য অনেক ভারতবাসীই প্রস্তুত হইতেছেন। বিদেশ-প্রবাসী ভারতীয় সন্তানগণ এইরূপে একটা "বৃহত্তর ভারত" গড়িয়া তুলিলেই ভারতমাতা বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে সুযোগ পাইবেন। আজ পর্য্যন্ত এইরূপ বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠে নাই বলিয়াই এক্ষণে ভারতবাসী দুনিয়ার শক্তিপুঞ্জ নিজ প্রয়োজন অনুসারে কাজে লাগাইতে পারিতেছেন না।

রকিপর্ব্বতের পূর্ব্বসীমান্ত

আইওয়া রেলষ্টেসনের গায়ে লেখা আছে—See us increase. বস্তুতঃ সমগ্র আমেরিকার কপালেই যেন এই কথা লিখিত রহিয়াছে। ইয়াঙ্কিস্থানের নগর, পল্লী সবই বাড়িয়া চলিতেছে—এখানকার লোকবল, ধনবল, কৃষিবল, শিল্পবল সর্ব্বদা বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর। "ইংক্রীজ" বা "উন্নতি" শব্দটা ইয়াঙ্কিসমাজের সর্ব্বত্রই ছাপ মারা রহিয়াছে বলিতে পারি।

আইওয়া ছাড়িয়া চলিলাম। রেলের পর্য্যবেক্ষণ-কামরায় বসিয়া জনপদের দৃশ্যাবলী দেখা গেল। দেখিবার বেশী কিছু নাই। পর্য্যবেক্ষণ-কামরার আস্‌বাব্‌-পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য! চিঠি লিখিবার জন্য কাগজ খাম কালী কলম টেবিল ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়। ডাক্‌-টিকেট পর্য্যন্ত গাড়ীর ভিতরেই বিক্রয় হয়। গাড়ীতে বসিয়াই তারে সংবাদ পাঠান যায়, আনাও যায়। একটা ক্ষুদ্র লাইব্রেরীও আছে—সকল প্রকার উচ্চ শ্রেণীর সংবাদপত্র মাসিকপত্র ইত্যাদি সাজান রহিয়াছে। রেলযাত্রীরা স্বচ্ছন্দে সময় কাটাইবার সুযোগ যথেষ্ট পায়।

রাত্রিকালে মিসৌরি নদী অতিক্রম করা হইল। এই নদী আইওয়া এবং নেব্রাস্কা প্রদেশদ্বয়ের সীমায় প্রবাহিত। সকালে দেখি, ক্যান্‌সাস্‌ প্রদেশের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। এই জনপদে বালুকাময় ভুট্টাক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছি। ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে যেমন পাটের জমি চোখে পড়ে, কোন কোন অঞ্চলে যেমন ধান্য অথবা তুলার ক্ষেত দেখিতে পাই, আমেরিকায় সেইরূপ প্রধানতঃ ভুট্টার ক্ষেতই প্রায়

সকল স্থানে দেখা যায়। "কর্ন" বা শস্য বলিলে ইয়াঙ্কিরা ভুট্টা বুঝে। কয়েক ঘণ্টা পরে কলরাডো প্রদেশের ভিতর পড়িলাম। গাড়ী ডেন্‌ভার নগরে থামিল। শিকাগো হইতে প্রায় ১১০০ মাইল পশ্চিমে আসা গেল।

আইওয়ায় গাড়ীতে বসিয়াই বুঝিতেছিলাম, আমরা ক্রমশঃ উচ্চতর ভূমির উপর উঠিতেছি। অথচ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে না—ভূমির উচ্চতা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিকাগো সমুদ্র হইতে মাত্র ৬০০ ফিট উর্দ্ধে—কিন্তু ডেন্‌ভার প্রায় ৫২০০ ফিট উর্দ্ধে। এগার শত মাইলব্যাপী জনপদ ধীরে ধীরে উচ্চতা লাভ করিয়াছে। এই প্রকাণ্ড টেবল্‌ল্যাণ্ডের অনুরূপ উচ্চভূমি আমরা হিমাচলে অথবা উত্তরভারতে দেখিতে পাই না। বিন্ধ্যপর্ব্বতের এবং ডেকান্‌টেবল্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে মিসিসিপি-মিসৌরি উপত্যকা এবং রকি পার্ব্বত্য অঞ্চলের তুলনা চলিতে পারে। কলিকাতা হইতে যাঁহারা গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে পশ্চিমযাত্রা করেন তাঁহারাও হাজারিবাগ অঞ্চলে খানিকটা এইরূপ টেবল্‌ল্যাণ্ডের পরিচয় পান।

৫২০০ ফিট উচ্চ ভূমির উপর গাড়ী চলিতেছে—বৈশাখ মাসে ঠিক এই সময়ে অনেক বাঙ্গালী কার্সিয়াঙ্গ-দার্জ্জিলিঙ্গে এই পরিমাণ উচ্চ ভূমিতেই চলাফেরা করিতেছেন। তাঁহারা পাহাড়ে বাস করিতেছেন ইহা বেশ বুঝা যায়—কিন্তু ডেন্‌ভারে সেই কার্সিয়াঙ্গ-দার্জ্জিলিঙ্গের উচ্চ ভূমিতে থাকিয়াও পাহাড়ে রহিয়াছি মনে হয় না। চারি দিকে সমতল ক্ষেত্রই দেখিতে পাইতেছি। বহুদূরে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে সমগ্র জনপদই রকিপর্ব্বতের গাত্র, স্কন্ধ ও মস্তক। এই জনপদ ধৌত করিয়াই ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্রোতস্বতী পূর্ব্বদিকে মিসিসিপিতে গিয়া পড়িয়াছে। মিসৌরি এইরূপ অন্যতম রকিদুহিতা। পর্ব্বে

আলিগানি পর্ব্বত, পশ্চিমে রকিপর্ব্বত :—এই দুই পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান মিসিসিপিমাতৃক ভূমি। ভারতের পঞ্চনদ সিন্ধুমাতৃক ভূমি। আর্য্যাবর্ত্তের অবশিষ্টাংশ নানা শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত গঙ্গা-ব্রহ্ম-পুত্রের সন্তান। ইয়াঙ্কিস্থানের এই সুবিস্তৃত জনপদও সেইরূপ নানা শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত মিসিসিপি-নদের উপত্যকা। এই অঞ্চল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্দ্ধাংশ—অর্দ্ধাংশ অপেক্ষাও বেশী।

আলিগানি হইতে রকিপর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে সেদিন মাত্র লোকজনের বসতি স্থাপিত হইয়াছে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের সময়ে আলিগানি পর্ব্বতই ইয়াঙ্কিদের পশ্চিমসীমা ছিল। আলিগানি হইতে মিসিসিপির পূর্ব্বকিনারা পর্য্যন্ত জনপদসম্বন্ধে অতি সামান্য জ্ঞান ছিল। ১৮২০-৩০ খৃষ্টাব্দের ভিতর এই অংশে লোকালয় স্থাপনের সূত্রপাত হয় মাত্র—কিন্তু মিসিসিপির অপর পার হইতে রকি পর্য্যন্ত অঞ্চলে মাঠ ধূধূ করিত। প্রাচীন লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্ এবং বন্যপশু-সমূহ এখানকার একমাত্র প্রাণী ছিল—ইয়াঙ্কিসভ্যতার কোন প্রভাব পৌঁছিতে পারে নাই। তখন এই ভূমিখণ্ডের উপর স্পেন-সম্রাট্ কাগজে কলমে কর্তৃত্ব করিতেন—অথচ ইহার কোন অংশসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান স্পেন্-দরবারেরও ছিল না।

আজ যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধতম শিল্পকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র এবং ধনৈশ্বর্য্যের জন্মদাতা রেলপথ দেখিতে পাইতেছি, সত্তর আশী বৎসর পূর্ব্বে সেই অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ছিল না—এমন কি শ্বেতাঙ্গজনগণের প্রভাবেও ছিল না। অধ্যাপক টার্নার বলিতেছেন—"West of the Mississippi lay a huge new world—an ocean of grassy prairie that rolled far to the west till it reached the zone where insufficient rainfall

transformed it into the arid plains, which stretched far away to the foothills of the Rocky Mountains. Over this vast waste, equal in area to France, Germany, Spain, Portugal, Austria-Hungary, Italy, Denmark and Belgium combined, a land where now wheat and cornfields and grazing herds produce much of the food supply for the larger part of America and for great areas of Europe, roamed the bison and the Indian hunter. Beyond this the Rocky Mountains and the Sierra Nevadas, enclosing high plateaus, heaved up their vast bulk through nearly a thousand miles from east to west, concealing untouched treasures of silver and gold. The great valleys of the Pacific coast in Oregon and California held but a sparse population of Indian traders, a few spanish mission and scattered herdsmen."

ডেন্‌ভারে গাড়ী বদলাইতে হইল। চারি পাঁচ ঘণ্টার ভিতর সহরটা দেখিয়া লইবার স্থযোগ পাওয়া গেল। ইয়াঙ্কিস্থানের প্রত্যেক নগরেই Sight-seeing Cars পাওয়া যায়। এই সকল মটর গাড়ীতে চড়িয়া পর্য্যটকেরা সস্তায় সহরের নানা অংশ দেখিয়া লইতে পারে। তিন টাকা খরচ করিয়া এইরূপ এক গাড়ীতে মোসাফের হইলাম। বড়বাজার, উদ্যানসমূহ, হোটেল, রাজপথ, থিয়েটার, নাচঘর, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সকল দর্শনীয় স্থানের নিকট দিয়া গাড়ী ঘুরিয়া আসিল।

আইওয়া সহরটায় ইয়াঙ্কিস্থানের বাহ্য বিশেষত্ব কিছু নাই—কিন্তু

ডেন্‌ভার দেখিয়া নিউইয়র্ক, শিকাগোর কথা মনে পড়িল। ডেন্‌ভার নিতান্ত নূতন নগর। দেখিলেই মনে হয়, বাড়ীঘর রাস্তাঘাট সবই যেন এই সেদিন নির্ম্মিত হইয়াছে। নিউইয়র্ক-শিকাগোর হট্টগোল, ধূলাময়লা এখানে নাই—সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিরাজ করিতেছে। মোটের উপর সমস্ত সহরটাকে একখানা ছবিরমত সুন্দর বোধ হইল। নিউইয়র্ক-শিকাগোর বহু অঞ্চলে বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু ডেন্‌ভারের সর্ব্বত্রই বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়। এই কারণে নিউইয়র্কেরই সমান বড় বড় নগরগুলির সঙ্গে ডেন্‌ভারের তুলনা করা উচিত নয়। কিন্তু ছোটখাট ও মাঝারি আকারের নগরহিসাবে ডেন্‌ভার একটা আদর্শ নগর সন্দেহ নাই।

একটা ভবনের সম্মুখে আসিয়া প্রদর্শক বলিলেন, "এই গৃহের চূড়াটা দেখুন। আমাদের পদতল হইতে উহা বেশী উর্দ্ধে অবস্থিত নয়। কিন্তু চূড়ার শেষ অংশ সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে ৫২৮০ ফিট উচ্চ অর্থাৎ ইহা ঠিক এক মাইল উর্দ্ধে।"

ডেন্‌ভারের সর্ব্বত্র শিম্‌লা, আল্‌মোড়া, দার্জ্জিলিঙ্গ ইত্যাদি গিরি-নগরের উচ্চতায় রহিয়াছি, কিন্তু সহরের কোথাও গিরিশৃঙ্গ বা তরঙ্গায়িত ভূমি দেখা গেল না। সহরের ১৫।২০ মাইল দূরে উচ্চ পর্ব্বতের স্কন্ধ ও মস্তক দেখিতে পাইলাম। বস্তুতঃ ডেন্‌ভার রকিপর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত—অবশ্য এই পাদদেশই প্রায় এক মাইল উচ্চভূমি।

সহর দেখিয়া নাপিতের দোকানে প্রবেশ করিলাম। ইয়াঙ্কিস্থানে নাপিতের দোকানে স্নান-গৃহ থাকে। সাড়ে বার আনা খরচ করিয়া স্নান করা গেল। পরে ষ্টেসনের মোসাফেরখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভারতীয় মোসাফেরখানার দৃশ্য চোখে পড়িল। নানা ভাষাভাষী নরনারী ও বালকবালিকা ঘরের ভিতর বসিয়া শুইয়া

দাঁড়াইয়া আছে। পথিকের চিরসহচর সিগার-সিগারেট্ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইতেছে। গাঁটরি-বোচকা খুলিয়া মোসাফেরগণ রুটিমাংস ফলমূল খাইতেছে। হোটেলে গিয়া খাইতে খরচ অত্যধিক। চারিটুকরা বেগুন ভাজার মূল্য বার আনা। কাজেই রেলযাত্রীদের অধিকাংশই নিজের সঙ্গে "চাল চিঁড়ে" বাঁধিয়া আনে।

লবণ-হ্রদের পথে

ডেন্‌ভারের পর আরও উচ্চতর টেবল্‌ল্যাণ্ডের উপর দিয়া গাড়ী চলিতে লগিল। মোটের উপর সর্ব্বসমেত ১২০০ মাইল দার্জ্জিলিঙের সমান উচ্চ ভূমিতে রহিলাম। এই পার্ব্বত্য অঞ্চল মিসিশিপি উপত্যকার মত উর্ব্বর নয়।

সকালে উঠিয়া দেখি, কলরাডো প্রদেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি। ওয়াইওমিঙ্গ প্রদেশের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। এই সকল অঞ্চলে জলকষ্ট বেশ হয়—কৃষিকার্য্যের জন্য কৃত্রিম জলাশয় খনন করা আবশ্যক। এই কারণে ফসলের উৎপত্তি কম। বস্তুতঃ রেলপথ নির্ম্মিত না হইলে এই প্রদেশে লোকজনের বসতি স্থাপন হইত কিনা সন্দেহ। কৃষি ও শিল্পের কেন্দ্র এই পথে বেশী নাই। কিন্তু কলরাডো, ওয়াইওমিঙ্গ ইত্যাদি রাষ্ট্রের নানা স্থানে ধাতুর আকর যৎপরোনাস্তি রহিয়াছে। কয়লা, সোনা, রূপা, শীসা ইত্যাদি ধাতু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

দিবাভাগে অল্প ভাড়ার কামরায় আসিয়া বসিলাম। এখানে প্রত্যেক বেঞ্চে দুই জন লোকের বসিবার স্থান। সমস্ত কামরাটা লোকে ভরা। খুব হৈচৈ হাল্লা হইতেছে। কয়েকজন লোক মহা চীৎকার করিয়া প্রেমসঙ্গীত গাহিতেছে। ইহাদের সঙ্গে এক জন স্ত্রীলোক আছে—তাহার সঙ্গে নানাপ্রকার হাসি ঠাট্টা চলিতেছে। এই দলের এক জন পুরুষ কিছু দূরে এক জন অপরিচিত স্ত্রীলোকের পার্শ্বে বসিয়াছে। সেইখান হইতে অন্যান্য বন্ধুগণের সঙ্গে রসিকতা করিতেছে। অপরিচিত স্ত্রীলোকটি বড়ই বিব্রত বোধ করিতে লাগিল। খানিক পরে রেলওয়ে কণ্ডাক্টার আসিয়া পুরুষটাকে এই স্থান হইতে সরাইয়া দিতে উদ্যত

হইল। কয়েক মিনিট বচসা চলিবার পর লোকটা সরিয়া গেল। সে বলিল—"ভদ্র লোকের অপমান করিতেছ? ষ্টেসনে গাড়ী আসিলে, কণ্ডাক্টার, তোমায় মজা দেখাইব। মহাশয়গণ সাক্ষী থাকিবেন।" কণ্ডাক্টার স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলেন, লোকটা কি আপনাকে বিরক্ত করিতেছিল না? উহাকে সরাইয়া দিয়া ভাল করি নাই?" রমণী বলিলেন—"হাঁ ভালই হইয়াছে।" বলা বাহুল্য, ষ্টেসনে গাড়ী থামিবার পর কেহ কাহারও নামে কোথাও নালিশ করিল না। ইতিমধ্যে গাড়ীর ভিতর গলাবাজিও কমিয়া আসিয়াছে।

বারটা একটার সময়ে ভোজনালয়ের পরিবেষকেরা আসিয়া বলিয়া গেল—"খাবার প্রস্তুত"। প্রায় কেহই স্থান ছাড়িয়া হোটেলে খাইতে গেল না। কাহারও কাহারও সঙ্গেই খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে। অধিকন্তু কামরার ভিতরেই একজন রেলকর্ম্মচারী খাবার বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। কলা, কমলালেবু, চীনাবাদামভাজা, ভূট্টার মুড়কি ইত্যাদি নানা জিনিষ পাওয়া গেল। সস্তায় পেট ভরিতে পারিলাম।

ভারতীয় দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগ অপেক্ষা পশ্চিমভাগ উচ্চতর। প্রধান প্রধান নদীসমূহ পশ্চিমঘাট হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বঘাট ভেদ করিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক গঠনও এইরূপ। রকিপর্ব্বত পশ্চিমঘাটস্বরূপ এবং আলিগানি পূর্ব্বঘাটস্বরূপ। নদী ও শাখানদীগুলি প্রধানতঃ উত্তর ও পশ্চিম হইতে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে প্রবাহিত।

অপরাহ্নে উটাপ্রদেশের ভিতর গাড়ী প্রবেশ করিল। জলহীন মরু-প্রদেশ আরও কিছু কাল চলিল। কিন্তু পার্ব্বত্য জনপদের সৌন্দর্য্য দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত একঘেয়ে টেব্‌লল্যাণ্ডের উপর ছিলাম—ক্রমশঃ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক দৃশ্যের আবেষ্টনে আসিয়া পড়িলাম। কোথাও জলপ্রপাত ও স্রোতস্বতী দেখিতে পাইতে—

কোথাও অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের ভিতর স্নড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। অদূরে তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতচূড়া দেখা যাইতেছে। কিয়ৎকাল পরে খানিকটা নিম্নতর ভূমির উপর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। তখন হইতে সবুজ-পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদের শোভা রেলযাত্রীকে এক নূতন জগতের বার্ত্তা আনিয়া দিল। নিউইয়র্ক হইতে আরম্ভ করিয়া এতদূর পর্য্যন্ত এখনও কোথাও সবুজবর্ণের তৃণপত্র দেখিতে পাই নাই। শীতকালে সর্ব্বত্রই নীরস কৃষ্ণবর্ণ পত্রহীন বৃক্ষরাজি দেখা যায়। কিন্তু উটাপ্রদেশে অগ্‌ডেন ষ্টেসনের সমীপবর্ত্তী হইতে প্রকৃতির অভিনব মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। রেলপথের দুইধারে শস্যশ্যামলভূমি নয়ন আকৃষ্ট করিল।

অগ্‌ডেন ষ্টেসনের পরেই লবণ-হ্রদ। উটাপ্রদেশের ভিতরেই ইহা অবস্থিত। মিশিগান্, ঈরি ইত্যাদি হ্রদসমূহের জল লবণাক্ত নয়—কিন্তু অগ্‌ডেনের নিকটবর্ত্তী সুবিস্তৃত হ্রদের জল সবিশেষ লবণময়। এই জন্য ইহার নাম "লবণ-হ্রদ"। প্যালেষ্টিনের মরুসাগরের ন্যায় এই হ্রদের জলেও কোন বস্তু ডুবিয়া যায় না। এই নিমিত্ত সাঁতার কাটা শিখিবার জন্য সহস্র সহস্র নরনারী লবণ-হ্রদে আসিয়া থাকে। হ্রদের গভীরতা অত্যন্ত অল্প। হ্রদের উপর দিয়া সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে—কোন কোন স্থানে পাথর ফেলিয়াই হ্রদ শুকাইয়া ফেলা হইয়াছে। ফলতঃ হ্রদের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত সোজা রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে এই হ্রদ-বিভাগকারী পথের উপর দিয়া গাড়ী চলিল। বলা বাহুল্য, এই রাস্তায় হ্রদের দৃশ্য একটা প্রধান দর্শনযোগ্য বস্তু।

লবণ-হ্রদ হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করা হয়। রেলের খাবারওয়ালারা হ্রদসম্বন্ধে মোসাফেরদিগকে একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিল। তাহার পর প্রত্যেককে একটা ছোট থলের ভিতর খানিকটা লবণ উপহার দিল।

নেভাডা পর্ব্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

সকালে নেভাডা প্রদেশের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। চারিদিককার আবেষ্টন পর্ব্বতময়। ডেনভারে রকিপর্ব্বতের আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর হইতে পার্ব্বত্য মরুদেশের মধ্য দিয়া রেলপথের বিস্তার দেখিতে পাইতেছি। ইয়াঙ্কিসমাজ অত্যুচ্চ আকাশস্পর্শী প্রাসাদ নির্ম্মাণে যে সাহসিকতা ও ভাবুকতা দেখাইয়াছে সেই অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় এই দুর্গমপথে রেলনির্ম্মাণকার্য্যে দেখিতে পাইতেছি। সত্তর-আশীবৎসর পূর্ব্বে যে অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ নর-নারীর চিহ্নমাত্র ছিল না, আজ সেই সকল দেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া গমনাগমনের সুবিধা সৃষ্ট হইয়াছে। পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাচীন মিশরীয়েরা যদি বর্ত্তমান মানবের বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে তাহা হইলে রকি-নেভাডা পর্ব্বতের ভিতর রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াও ইয়াঙ্কিরা বিস্ময়জনক কার্য্যই সম্পন্ন করিয়াছে। এখানে একটা অসাধ্যসাধনেরই দৃষ্টান্ত পাইতেছি।

অতিশয় রমণীয় দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছি। ক্রমশঃ কালিফর্ণিয়া প্রদেশে আসিয়া পড়িলাম। নেভাডা পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশেই এখনও রহিয়াছি। গিরিশৃঙ্গে তুষার দেখা যাইতেছে—কিন্তু বৃক্ষসমূহ সম্পূর্ণ আবৃত হইতে পারে নাই। শ্বেত বরফময় ভূমির উপর বৃক্ষরাজি অতি সুন্দর দেখাইতেছে। এক স্থানে ৭০০০ ফিট উচ্চ শৃঙ্গের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। ইহাই এই রেলপথের উচ্চতম স্থান। ইহার নাম Summit of the world. এই স্থানের সমীপবর্ত্তী প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম।

গাড়ী এই অঞ্চলে আসিবার কিছু পূর্ব্বে রেলের একজন কর্ম্মচারী একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিল। তাহাতে ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশের উচ্চতম রেলষ্টেসন ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইল। আরোহীরা সকলেই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

এই অঞ্চলে রেলপথ সর্পগতির ন্যায় বক্রাকৃতি। গাড়ী পাহাড়ের উপরে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে উঠিতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গ, সিম্‌লা ইত্যাদি রেলওয়ে এই ধরণের স্তরবিন্যস্ত। আজ বৃষ্টি পড়িতেছে—কুয়াশায় ও বরফে এই অঞ্চল প্রায়ই আবৃত থাকে। পথ অনেক সময়ে বরফের চাপে রুদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্য কাঠের ঘরের ভিতর দিয়া গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রেলপথের আবরণস্বরূপ এইরূপ কাষ্ঠগৃহ বহু মাইল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম। পথে একটা পার্ব্বত্য হ্রদ দেখা গেল। ইহা ভীমতাল বা নৈনিতালের মত বোধ হইল।

নেভাডাপর্ব্বত মূল্যবান্ ধাতুর আকরে পরিপূর্ণ। ক্যালিফার্ণিয়া প্রদেশের যে অঞ্চলে সোণার খনি সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় সেই স্থানের পার্শ্ব দিয়া গাড়ী চলিল। আমাদের দুই ধারে রক্তবর্ণ ভূমি দেখিতে পাইলাম। এই সকল ভূমির অভ্যন্তরেই সোণার খনি ছিল। বহু আকরের ধাতু নিঃশেষ করা হইয়াছে—কোন কোন স্থানের খনিতে কার্য্য এখনও চলিতেছে।

প্রায় ১৫০০ মাইল উচ্চভূমিতে কাটাইয়া নিম্নদিকে নামিতে লাগিলাম। ১৫০ মাইলের ভিতর ৭০০০ ফিট হইতে ১০ ফিট উচ্চ-ভূমিতে নামিয়া পড়িলাম। ৫ ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমশঃ নিম্নগামী থাকা গেল। এই পথে প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিবর্ত্তন চোখে পড়িল। ঘণ্টাদুয়েক সাধারণ অনুচ্চ সমতল ভূমিতে কৃষিক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর

অপর পারে পৌঁছিলাম। পথে এক স্থানে গাড়ী তিন টুকরা করিয়া জাহাজে নদীপার করা হইয়াছিল। অপর পার হইতে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো গমনাগমনের জন্য ফেরি আছে।

দশম অধ্যায়

দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

ইয়াঙ্কিস্থানের 'মধ্য পশ্চিম' এবং 'আরও পশ্চিম' জনপদসমূহ এক্ষণে আমাদের পূর্ব্ব দিকে। কলাম্বাস-আবিষ্কৃত ভূখণ্ডের মহাপশ্চিম প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। বস্তুতঃ ইহা সমগ্র জগতেরই পশ্চিমতম অংশ।

প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমতম অথবা পূর্ব্বতম বলিয়া কোন শব্দ ব্যবহৃত হইতেই পারে না। প্রকৃতি দেবীর জ্ঞানে পূর্ব্ব বা পশ্চিম নামে কতকগুলি চিহ্নিত স্থান নাই। রামের বাড়ীর যে ঘর পশ্চিম ভিটায় অবস্থিত, সেই ঘর যদুর বাড়ীর হিসাবে পূর্ব্ব ভিটায় অবস্থিত। ইয়াঙ্কিদের পশ্চিমতম প্রদেশ ক্যালিফর্ণিয়া—কিন্তু ক্যালিফর্ণিয়াবাসী প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে সূর্য্যাস্ত দেশ দেখে না কি? কাজেই স্যান্‌ফ্রানসিস্কোর লোকেরা জাপানের টোকিওকে পাশ্চাত্য দেশীয় নগর বিবেচনা করিতে বাধ্য। ভারতবাসীর হিসাবে আফগানিস্থান হইতে ইংলিশস্থান পর্য্যন্ত সকল দেশই পাশ্চাত্য, সেইরূপ কালিফর্ণিয়াবাসীর হিসাবে জাপান হইতে হিন্দুস্থান পারস্য তুরস্ক পর্য্যন্ত সবই পশ্চিম দেশ। কাজেই স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোকে দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর বলিলে ভৌগোলিক জ্ঞানের অল্পতা সপ্রমাণ হয়। অথচ বিশ্ববাসী সকলেই এই ভুল বিশ্বাস ও ধারণা সংশোধন করিতেছে না কেন? আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত অৰ্দ্ধশিক্ষিত জগতের সকল লোকেই পৃথিবীর কতকগুলি দেশকে Near

East বা সমীপবর্ত্তী প্রাচ্য, কতকগুলি দেশকে Farther East—অথবা Middle East দূরবর্ত্তী বা মধ্যবর্ত্তী প্রাচ্য এবং কতকগুলি দেশকে Farthest East—দূরতমবর্ত্তী প্রাচ্য বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কতকগুলি দেশকে আমরা বিনা বাক্য-ব্যয়ে পশ্চিম ও মহাপশ্চিম বিবেচনা করিয়া থাক। প্রাকৃতিক হিসাবে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর লোকেরা টোকিও নগরকে পাশ্চাত্যদেশীয় বিবেচনা করিতে বাধ্য। অথচ দেখিতেছি, এখানকার মহাপণ্ডিতেরাও জাপানীগণকে প্রাচ্যতম দেশের লোক বিবেচনা করে। দুনিয়ার পশ্চিমতম দেশের পশ্চিমে পূর্ব্বতম দেশ অবস্থিত হইল কি করিয়া? আবার জাপানীরা প্রাকৃতিক হিসাবে আমেরিকাকে সূর্য্যোদয়ের দেশ অর্থাৎ প্রাচ্য বিবেচনা করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহারাও ইয়াঙ্কি সমাজকে পাশ্চাত্য বিবেচনা করিতেছে। দুনিয়ার লোকেরা কি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম নির্ণয় করিতে জানে না?

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শব্দ দুইটা পারিভাষিক শব্দস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাকৃতিক ভূগোলের হিসাবে এই দুই শব্দে যাহা বুঝায় পারিভাষিক হিসাবে তাহা বুঝায় না। ভৌগোলিকের বিবেচনায় কোন দেশ সর্ব্বদা প্রাচ্য, এবং কোন দেশ সর্ব্বদা পাশ্চাত্য থাকিতে পারে না। একই জনপদ কোন দেশের পক্ষে পূর্ব্বে অবস্থিত কিন্তু অন্য দেশের পক্ষে তাহা পশ্চিমে অবস্থিত। অথচ পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করিলে প্রাচ্য শব্দে সর্ব্বদা সকল দেশের লোকই কতকগুলি জনপদ বুঝিয়া আসিতেছে। আফগানিস্থান হইতে তুরস্ক পর্য্যন্ত সকল দেশই ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্য—এবং চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম ও জাপান প্রাচ্য। কিন্তু পারিভাষিক ভাবে আমরা সমগ্র এসিয়াকেই প্রাচ্য বলিতেছি—জাপান হইতে তুরস্ক পর্য্যন্ত সকল দেশকেই ভারতবাসীরা প্রাচ্য বিবেচনা করে। তুরস্কের পশ্চিম হইতে ইয়োরোপের

আরম্ভ বিচার করা হয়—আমেরিকাকে ইয়োরোপেরই বিস্তৃত অংশ ধরা যায়। এই দুই ভূখণ্ডকে এক সঙ্গে "ইয়োরামেরিকা" বলা যাইতে পারে। সমগ্র এশিয়াবাসীর চিন্তায় এই দুই ভূখণ্ডের যে কোন অংশ পাশ্চাত্য নামে পরিচিত।

এইরূপ কৃত্রিম অর্থযুক্ত পারিভাষিক শব্দের উৎপত্তি কেন হইল? প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই ধরণের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইত না;—দুনিয়ার বড় বড় মহাদেশগুলিকে এইরূপে বিভক্ত করা হইত না। তখন ক্ষুদ্র গ্রীসের রাষ্ট্রপুঞ্জ তাহাদের বহির্ভূত সমাজকে মোটের উপর Barbarian বা বর্ব্বর বলিয়া জানিত। ইংরাজেরা বিদেশীয় লোক-জনকে Welsh বলিত, হিন্দুরা বিধর্ম্মীদিগকে ম্লেচ্ছ বা দস্যু বলিত, মুসলমানেরা অপর ধর্ম্মাশ্রয়ীদিগকে কাফের বলিত। আজকালকার প্রাচ্য পাশ্চাত্য ইত্যাদি শব্দ তখন সৃষ্ট হয় নাই। এই শব্দগুলি বর্ত্তমান যুগের ইয়োরামেরিকানেরা আবিষ্কার করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীটা বিশেষভাবে এই জাতীয় মানবেরই বিশ্ব-বাণিজ্য ও বিশ্ব-সাম্রাজ্যের যুগ। ইহারা নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশের নামকরণ করিয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্র ইয়োরামেরিকা—এই বিবেচনা করিয়া ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। এই বিস্তৃত ভূভাগের জনগণ যেন এক অখণ্ড সভ্যতা ও সমাজের অন্তর্গত—সুতরাং ইহার এক অঞ্চলের পক্ষে যাহা প্রাচ্য, সকল অঞ্চলের পক্ষেও তাহাই প্রাচ্য এইরূপ বিবেচিত হইতেছে। বিলাতী কবি কিপ্‌লিঙের

"East is East, and West is West,
The twain will never meet."

ইত্যাদি সুপরিচিত দোঁহাতে East এবং West এই পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইয়াঙ্কি নগরের নৈশ দৃশ্য

স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোয় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে রাত্রিকালে ষ্টীমারে ক্ষুদ্র উপসাগর পার হইতে হইয়াছিল। ষ্টীমারে বসিয়াই দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর ও বন্দরের নৈশ শোভা দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইয়াঙ্কিস্থানের প্রত্যেক নগরই রাত্রিকালে নন্দনপুরীতে পরিণত হয়। দেওয়ালীর উৎসব এই দেশে প্রতি রজনীতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, বলা যাইতে পারে। তড়িতের বাতী গৃহে গৃহে, রাস্তায় রাস্তায়, বাগানে বাগানে, নগরবাসীদিগের নয়ন ঝলসিয়া দেয়। বাতীগুলি একমাত্র আলোকদানের জন্যই তৈয়ারী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাস্তার সৌন্দর্য্য, উদ্যানের শোভা, হোটেল ও দোকানের আকর্ষণীশক্তি ইত্যাদি নানা উপায়ে বাড়াইয়া তুলিবার জন্যই বাতীগুলি বিশেষভাবে সাজান হইয়া থাকে। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার সময়ে এঞ্জিনীয়ারেরা আলোক-বিকীরণের প্রণালী বিশেষ দক্ষতার সহিত আলোচনা করেন। বাতী সাজাইবার বিদ্যাটা এদেশে একটা স্বতন্ত্র সাধনার সামগ্রী। কাজেই নিউইয়র্ক হইতে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক নগরেই আলোক-মালা একটা দেখিবার জিনিষ। রাত্রিকালে নগর পর্য্যটন একটা কার্য্য-বিশেষ। একমাত্র দিবাভাগে নগরাদি দেখিলে এদেশের অর্দ্ধাংশ দেখা হয় মাত্র।

দোকান-গৃহের মালিকেরা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য আলোকমালার অশেষবিধ বৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়া থাকেন। তড়িতের শক্তি ব্যবহার করিয়া আজকাল লোকেরা আলোকের ইচ্ছানুরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন, আকৃতি

পরিবর্ত্তন, স্থান পরিবর্ত্তন ইত্যাদি সাধন করিতে পারে। ইয়াঙ্কিরা পাকা ব্যবসায়ী—বিজ্ঞাপন-প্রচার ইহাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ। তড়িতের সাহায্যে আলোকমালার শোভা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে ইহারা যারপরনাই যত্নবান্। এক্ষণে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোয় বিশ্ববাসীর সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ক্যালিফর্ণিয়া রাষ্ট্র দুনিয়ার লোককে আহ্বান করিয়াছেন। কাজেই বিজ্ঞাপনের ছটা এখানে আজকাল চূড়ান্ত দেখিবারই কথা। কার্য্যেও তাহাই দেখিতেছি।

ষ্টীমার হইতে দেখিলাম—যে-ঘাটে নামিব তাহার মাথায় তড়িতের বাতী দ্বারা লেখা রহিয়াছে—"California invites World—Panama-Pacific Exposition, 1915." প্যানামা যোজকে খাল কাটা সম্পূর্ণ হইয়াছে—এক্ষণে প্রশান্ত মহাসাগর আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘটনা স্মরণীয় রাখিবার জন্য যুক্তরাজ্যের ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশ এক বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে জগতের সকল জাতিই তাঁহাদের নিজ নিজ উৎকর্ষ-বিজ্ঞাপক বস্তু প্রদর্শনীক্ষেত্রে পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ১৯১৫ সালের সারাবৎসর এই প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

ষ্টীমার হইতে সুবিস্তৃত প্রদর্শনীক্ষেত্রের সৌধসমূহের আলোকমালা দেখিতে পাইলাম। অট্টালিকাবলীর শিরোভাগ বিভিন্ন ধরণের—কোনটা গম্বুজের মত, কোনটা মন্দিরশীর্ষের মত, কোনটা গির্জ্জার মত ইত্যাদি। এই সকল আকৃতিবিশিষ্ট সৌধের "রোশনাই" সাগরবক্ষ হইতে যেন কোন্ একটা আলোকলোকের আভাস দিতেছে। বাতীর রংগুলি এবং অগণিত Search light-এর রেখাপাত সমগ্র নভোমণ্ডলকে অদ্ভুত রাগে রঞ্জিত করিয়াছে। মহানগরের উপরে মেঘশূন্য

নীল আকাশ, তাহাতে শুক্লপক্ষের চাঁদ—কিন্তু "স্থলভাগের দীপাবলী" চন্দ্র-কিরণকে নিতান্তই মলিন করিয়া তুলিয়াছে।

নগরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর নগর-শাসকেরা এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক রোশনাই সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্।

বিশ্ব-মেলা

এই বৎসর দুনিয়ার সকল জাতি স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো নগরে সম্মিলিত হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটা বিশ্বসম্মিলন ইয়াঙ্কিস্থানের আর এক নগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৪ সালের সেই মেলা সেণ্ট লুই নগরে আহূত হয়। এই নগর মিসিশিপি ও মিসৌরি নদীদ্বয়ের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। শিকাগোর ন্যায় ইহা মধ্যপশ্চিম জনপদের প্রধান নগর। এই দুই নগরকে কেন্দ্র করিয়াই ইয়াঙ্কিরা ক্রমশঃ মহাপশ্চিম প্রদেশে বাণিজ্যবিস্তার এবং বসতিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়। সেণ্ট লুইয়ের পূর্ব্বে শিকাগো নগরে বিশ্ব-মেলা বসিয়াছিল—সে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। সেই সম্মিলন উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ ইয়াঙ্কিস্থানে বেদান্ত-প্রচারের সুযোগ পান। প্রতি দশ বৎসরের মধ্যে জগতে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা ইত্যাদির উন্নতি অল্প সাধিত হয় না। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ বুঝিবার জন্যই এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়া থাকে। ইয়াঙ্কিরা বিশ বৎসরের ভিতর তিনবার এইরূপ বিশ্ব-মেলা আহ্বান করিল। ইয়াঙ্কিরা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শনী খুলিয়াছিল। সেই মেলা স্বাধীনতাপুরী ফিলাডেল্‌ফিয়ায় বসে। ইংরাজ হইতে স্বাধীনতা লাভের শতবর্ষ স্মরণীয় রাখিবার জন্য তাহারা এই আয়োজন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইয়াঙ্কিরা প্রথমে প্রাচ্য জনপদে, পরে মধ্য জনপদে সর্ব্বশেষে পশ্চিম জনপদে তাহাদের সম্মিলন-ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছে। তাহাদের ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্রম-বিকাশের ধারাও এইরূপই;—তাহারা পূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছে।

ফিলাডেল্‌ফিয়ার সম্মিলনের ফলে প্রাচ্য জনপদের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে পারিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে Civil war বাধে;—সেই গৃহবিবাদ ও দ্বন্দ্বের জের মিটাইয়া দিবার পক্ষে এই মেলা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। মধ্য-প্রদেশের মেলাদ্বয়ের প্রভাবে ইয়াঙ্কিস্থানের লোকেরা স্বদেশের বিস্তৃত জনপদসমূহের যথার্থ পরিচয় পাইল। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পর্য্যটন আরম্ভ হইল। মধ্য-প্রদেশের সুযোগ সুবিধাগুলি প্রাচ্য জনপদের লোকেরা জানিতে পারিল। ইয়াঙ্কিস্থানের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা জন্মিবার পক্ষে নানা উপায় সৃষ্ট হইল। বর্ত্তমান বিশ্ব-মেলার ফলে ইয়াঙ্কিরা তাহাদের স্বদেশকে সত্য ভাবে চিনিতে পারিবে। তাহাদের মহাপশ্চিম জনপদ যে কত বড়, ইহার অভ্যন্তরে যে কত প্রকার ধাতু রত্ন শস্য পশু লুক্কায়িত আছে, তাহা এইবার ইহারা যথার্থরূপে জনিতে পারিবে। পূর্ব্ব ও মধ্য-প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী এই বিশাল মহাদেশে পর্য্যটন করিতে আসিবে। এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল জনপদের নামমাত্র জানা ছিল, সেই সকল জনপদ এখন হইতে জীবন্ত সত্যরূপে ইয়াঙ্কিদের চিত্তে স্থান পাইবে। রেলকোম্পানিরা পর্য্যটকগণকে স্যান্‌ফ্রানসিস্কোয় আকৃষ্ট করিবার জন্য নানা প্রলোভন দেখাইতেছেন। তাঁহারা এক ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা দিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে অসংখ্য যাত্রী এই দিকে ঝুঁকিতেছে। স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো দেখার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যটকেরা মধ্যবর্ত্তী পল্লী নগরাদিতেও ভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইতেছেন।

ভারতবর্ষের নগরে নগরে কংগ্রেস আহূত হয়। তাহার ফলে ভারতবর্ষে বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, মারাঠী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি সকল প্রদেশবাসীর মধ্যে পরস্পরের ন্যূনাধিক পরিচয় সঙ্ঘটিত হইতে পারিয়াছে।

শিল্পসম্মিলন, সাহিত্যসম্মিলন, ধর্ম্মসম্মিলন, শিক্ষাসম্মিলন, ইত্যাদির সাহায্যেও এইরূপ দেশের পরিচয় সকলেই পাইয়া আসিতেছেন। এই-সকল অনুষ্ঠানের সাহায্যে আর কোন সুফল না ফলিলেও অন্ততঃ দেশ-ভ্রমণের সুযোগ ও প্রবৃত্তি সৃষ্ট হয়। দেশবাসীরা পরস্পর দেখাশুনা, মেলা-মেশা ও ভাববিনিময় এবং কর্ম্মবিনিময় করিতে পারে। তাহা ছাড়া তুলনাসাধন, আত্মসংশোধন এবং আত্মোন্নতির উপায়ও সহজেই উদ্ভাবিত হয়। নিজের মামুলি কর্ম্মপ্রণালীকেই আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিবার কুসংস্কার চলিয়া যায়।

প্রদর্শনী-ক্ষেত্র

উপসাগরের ধারে সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর প্রদর্শনী-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। প্রায় আড়াই মাইল দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত স্থানে একটি নাতি ক্ষুদ্র সুরম্য নগর দেখিতে পাইতেছি। এই নগরের ভিতর রাজপথ, উদ্যান, ফোয়ারা, প্রাসাদ, সৌধ, আলোকস্তম্ভ, নাচগৃহ, প্রমোদালয়, রেলওয়ে ইত্যাদি সবই আছে। সমগ্র প্রদর্শনী-নগর নির্ম্মাণ করিতে বহুকোটি টাকা খরচ হইয়াছে।—কিন্তু মেলা শেষ হইয়া গেলে নগর ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে। মেলার সকলপ্রকার খরচের জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা ১৫০,০০০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

দেড় টাকার টিকিট কিনিয়া প্রদর্শনীনগরে প্রবেশ করিলাম। ফটক হইতে প্রাঙ্গণে পড়িয়াই মনে হইল, যেন দিল্লীদরবারে উপস্থিত হইয়াছি। মহাভারত-বর্ণিত রাজসূয়-যজ্ঞের বিরাট আয়োজন চোখে পড়িতেছে। চারিদিকে মহোৎসবের লক্ষণ। পার্শ্বস্থিত কতকগুলি গৃহে নাচ, গান, বাজনা চলিতেছে—এদিকে ওদিকে সর্ব্বত্র লোকের ভিড়—অপূর্ব্ব নরনারীর সমাবেশ। সৌধসমূহ নানাবর্ণে বিভূষিত, আলোকস্তম্ভগুলির আকৃতি এবং বর্ণ নয়নরঞ্জক। বিচিত্র পতাকা, মূর্ত্তি, ফোয়ারা ইত্যাদির প্রভাবে সমস্ত প্রাঙ্গণ ও পথগুলি এক রমণীয় দৃশ্যের আধার হইয়াছে। কোন কোন স্থানে আমাদের দেশের বিবাহোৎসবের উল্লাস উচ্ছ্বাস বা 'যজ্ঞবাড়ীর' মহাসমারোহ দেখা যাইতেছে। মোটের উপর মনে হইতে লাগিল যে, দুনিয়ার নানাস্থান হইতে আনীত বস্তুগুলি না দেখিয়া কেবল প্রদর্শনীক্ষেত্রের সৌধ, সাজসরঞ্জাম,

৫৯৮ পৃষ্ঠা
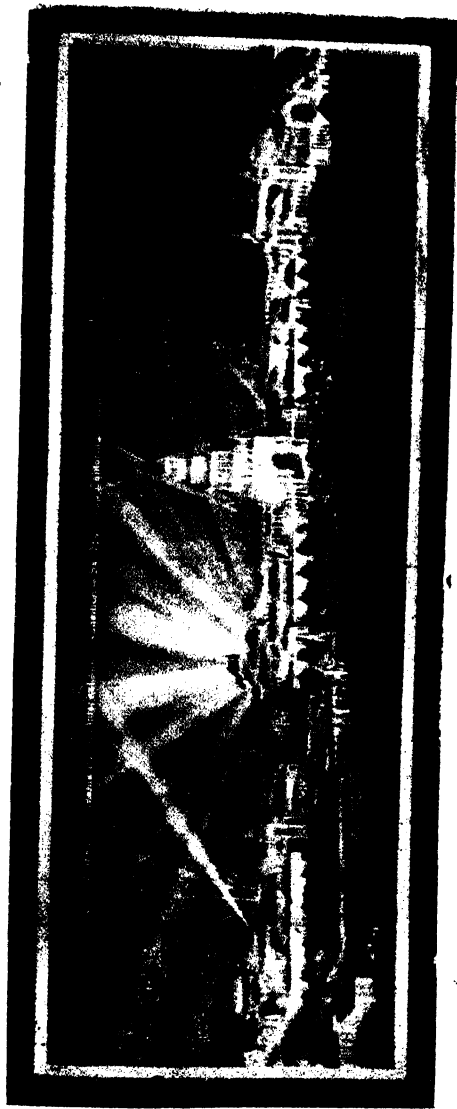
৪২। প্রদর্শনী-নগরের নৈশদৃশ্য।

India Press, Calcutta.

আসবাবপত্র, উদ্যান, ফোয়ারা, আলোক-স্তম্ভ ইত্যাদি দেখিয়া গেলেও এই বিরাট বিশ্বসম্মিলনে আসা সার্থক হইবে। প্রদর্শনীর বাহিরে ইয়াঙ্কিরা অত্যুচ্চশ্রেণীর স্বকুমার শিল্প, কলাজ্ঞান, সৌন্দর্য্যবোধ, বিজ্ঞান-শক্তি এবং সুশৃঙ্খলার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিশ্ব-মেলার বাহ্য অঙ্গগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিরই সর্ব্বপ্রথম দর্শন যোগ্য।

কি দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে, একটি গৃহ সকলেরই চোখে পড়ে। তাহার নাম "রত্ন-মন্দির" বা Tower of Jewels. দেখিতে ইহা হিন্দু-মন্দিরের মত—মন্দিরের "শিখর" ইহার বিশেষত্ব। জগন্নাথদেবের মন্দির অথবা রথের ন্যায় এই প্রাসাদটি কয়েক স্তরে বিভক্ত। সমস্ত প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের শোভা বৃদ্ধির জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ভিতরে প্রদর্শনযোগ্য কোন পদার্থ রক্ষিত হয় নাই। চুনী, মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, হীরা এবং অন্যান্য রত্নের বর্ণবিশিষ্ট কাচ-প্রিজম্ এই মন্দিরের গাত্রে খচিত দেখিতে পাইলাম। দিনে সূর্য্যের কিরণে মণিমালায় বিভূষিত এই সৌধ দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রায় ১৫০০০ ক্ষুদ্র-বৃহৎ রত্নসদৃশ উজ্জ্বল বস্তু এই সৌধ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাত্রিকালে ইহার গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া ওঠে। কারণ প্রায় দুই শত নানা রঙের আলোক নানা স্থান হইতে এই মন্দিরের উপর নিক্ষিপ্ত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। শুনিতে পাই উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সূর্য্যের কিরণ সপ্তবর্ণে বিভক্ত রামধনুর ন্যায় দেখায়। তাহাকে ইংরাজিতে বলে, Aurora Borealis। সেই রামধনু-সদৃশ আলোক-সন্নিপাতের আয়োজন প্রদর্শনীর কর্ত্তারা উদ্ভাবন করিয়াছেন। এইখানে রাত্রিকালের Aurora Borealis-এর অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের সৌধগুলির রচনা-রীতি নানারকমের। এক এক

ভবনের জন্য এক এক প্রকার নির্ম্মাণ-কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক কায়দা, মধ্যযুগের বাস্তু-পদ্ধতি, মুসলমানী রীতি, রেণাসাঁস-প্রণালী ইত্যাদি নানাপ্রকার গৃহনির্ম্মাণরীতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্যের ফলে চোখের আনন্দ বেশ জন্মে—গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে দৃশ্য পরিবর্ত্তন ও স্থান পরিবর্ত্তনে মন ক্লান্ত হইয়া পড়িবার অবসর পায় না। একঘেয়ে গৃহসজ্জা অথবা পথ-সমাবেশ দেখিতে হয় ত বিশেষ কষ্টকর হইত। প্রদর্শনী-নগরের এক স্থানে ফরাসী-রীতি, অপর এক স্থানে জাপানী-রীতি, কোন অংশে ওলন্দাজ বাস্তুবিদ্যার নিদর্শন—অন্যত্র হয়ত স্পেনের মুসলমানী কায়দা। এই বিশ্বমেলায় দুনিয়ার বিভিন্ন কারিগরী একত্র দেখিবার সুবিধা পাইলাম। দশ লক্ষ হইতে পনর লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত এক-একটা সৌধ-নির্ম্মাণে খরচ করা হইয়াছে।

কেবল গৃহনির্ম্মাণ-রীতি দেখিয়াই মুগ্ধ হইতেছি তাহা নহে। এখানে চিত্রকরগণের কারুকার্য্যও কম দেখিতেছি না। সৌধসমূহের সাজসজ্জায় চিত্রবিদ্যার প্রয়োগ বহুল পরিমাণে দেখিতেছি। স্থাপত্যশিল্পের পরিচয়ও প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের যে কোন অংশেই দেখিতে পাই। প্রত্যেক ভবনের প্রাচীর, কার্ণিশ, স্তম্ভ, ফটক ইত্যাদিতে নরনারীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ক্ষেত্রের ভিতরকার প্রত্যেক উদ্যানে ও প্রাঙ্গণে বহু উচ্চ শ্রেণীর ভাস্কর্য্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে জলের ফোয়ারা অবস্থিত—সেইগুলির প্রত্যেকটাই স্থপতিগণের কারিগরীর অপূর্ব্ব নিদর্শন।

আলোক-বিকীরণে, বর্ণবিন্যাসে ও ফোয়ারা-নির্ম্মাণে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিদ্যার চরম প্রয়োগ দেখিতেছি। গৃহনির্ম্মাণে এঞ্জিনীয়ারিংয়ের পরাকাষ্ঠা পাইতেছি। সুকুমার শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য, উদ্যান-রচনা ইত্যাদিও

৬৩। প্রদর্শনী-নগরের সৌধাবলী

এই প্রদর্শনী-নগরে বিশেষরূপই দেখিবার জিনিষ। এই সমুদয়ের সাজানগুছান কার্য্যেও উচ্চ অঙ্গের সৌন্দর্য্যজ্ঞান পরিস্ফুট রহিয়াছে। রাত্রিকালে কোন কোন দিন Fire-works বা আতসবাজীর খেলা দেখান হয়। হাওয়াই, তুবড়ী ইত্যাদির শেষ পরিণতি যেন তখন চোখের সম্মুখে প্রকটিত হয়। মনে হয়, বিজ্ঞান ও শিল্প উভয়ই যেন এক্ষেত্রে অবতাররূপে একত্র আবিভূ'ত হইয়া প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে এই নগর-রচনায় পরিচালিত করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মহাকুরুক্ষেত্রেও এই দুই অবতারের রাক্ষসী-লীলা দেখিতে পাই। সেই অবতারদ্বয়েরই অপর লীলা—শান্ত-মূর্ত্তি স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর এই মেলা-ক্ষেত্রে দেখিয়া লইলাম। সৌধসমূহের অভ্যন্তরে সংগৃহীত দ্রব্যনিচয় না দেখিলেও মনে দুঃখ থাকিবে না। বহির্ভাগেই সমগ্র বর্ত্তমান জগতের কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ধনশক্তি পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে।

প্রদর্শনী-নগরের সাধারণ সৌধসমূহের সংখ্যা বেশী নয়—কিন্তু তাহাদের আকৃতি সুবৃহৎ এবং রচনা-রীতি সৌন্দর্য্যের পরিপোষক। এই সৌধসমূহ ব্যতীত বহুসংখ্যক আমোদ-প্রমোদ-ভবন রহিয়াছে। এইগুলিতে চীনা, জাপানী, মিশরীয়, লোহিতাঙ্গ, মেক্সিকান, মেওরি ইত্যাদি নানাজাতীয় জনগণের পল্লীজীবন বুঝাইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সমুদয়ের নির্ম্মাণে ভিন্ন ভিন্ন "স্বদেশী" কায়দা অনুসৃত দেখিলাম। এগুলির ভিতর প্রবেশ করিলে বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর শিল্প, চিত্রকলা, দোকানহাট, নাচগান, ক্রীড়াকৌতুক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিতে পয়সা লাগে। যাইয়া অনেকক্ষণ সময় কাটান গেল। সহজে বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি আদব-কায়দা হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে ইহা বেশ ভাল উপায়।

এই সমুদয় কৌতুকগৃহ ব্যতীত আরও কতকগুলি অট্টালিকায়

প্রদর্শনী-ক্ষেত্র পরিপূর্ণ। তাহাদের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধশত। এইগুলির অর্দ্ধেক যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশের সকলপ্রকার প্রদর্শনযোগ্য বস্তু এইরূপ এক ভবনে সংগৃহীত রহিয়াছে। কালিফর্ণিয়া-রাষ্ট্রের প্রাসাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাপান, চীন, হলাণ্ড, তুরস্ক, আর্জেণ্টিনা, স্থইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রও ২০।২২টা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই প্রাদেশিক ও বিদেশীয় রাষ্ট্রভবনগুলির কোন কোনটা বিশেষভাবে দর্শনযোগ্য। অবশ্য এই সমুদয় দেশের প্রদর্শিত দ্রব্যনিচয় সাধারণ সৌধসমূহেই রক্ষিত হইয়াছে।

চীনাগৃহ-নির্ম্মাণের জন্য চীন হইতে কারিগর ও মিস্ত্রী আমদানী করা হইয়াছিল। এমন কি, বহু উপকরণ, তৈজসপত্র, উদ্যানরচনার সামগ্রীও চীন হইতে আনা হইয়াছে। জাপানী গৃহও এইরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্যামদেশীয় ভবন পুরাপুরি শ্যাম রাজ্যেই প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পরে ইহার বিভিন্ন অংশ টুকরা টুকরা করিয়া স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোয় পাঠান হইয়াছে। এইখানে শ্যামদেশীয় মিস্ত্রীরাই গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

এশিয়ার সকল দেশের পরিচয়ই এই বিশ্ব-মেলায় প্রচুর পরিমাণে পাইলাম। স্বতন্ত্র জাপানী ও স্বতন্ত্র চীনা ভবন ব্যতীত সাধারণ সৌধ-সমূহের প্রত্যেকটাতেই জাপান ও চীনের প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু ভারতবর্ষের চিহ্ন কোথাও দেখিলাম না। একজন পার্সী দোকানদার নিজ ব্যবসায়ের স্বার্থে কতকগুলি জিনিষ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন;— ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রতিনিধি নাই। খাদ্যদ্রব্য-বিভাগে, সাধারণ সৌধের ভিতর দেখিলাম, বিলাতী, ইয়াঙ্কি, ফরাসী, জার্ম্মাণ, তুরকী, চীনা, জাপানী, নিগ্রো, মেক্সিকান্ ইত্যাদি নানাজাতীয় রন্ধনপ্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। এই গৃহে পর্য্যটকেরা বিনা পয়সায় নানাবিধ খাদ্য
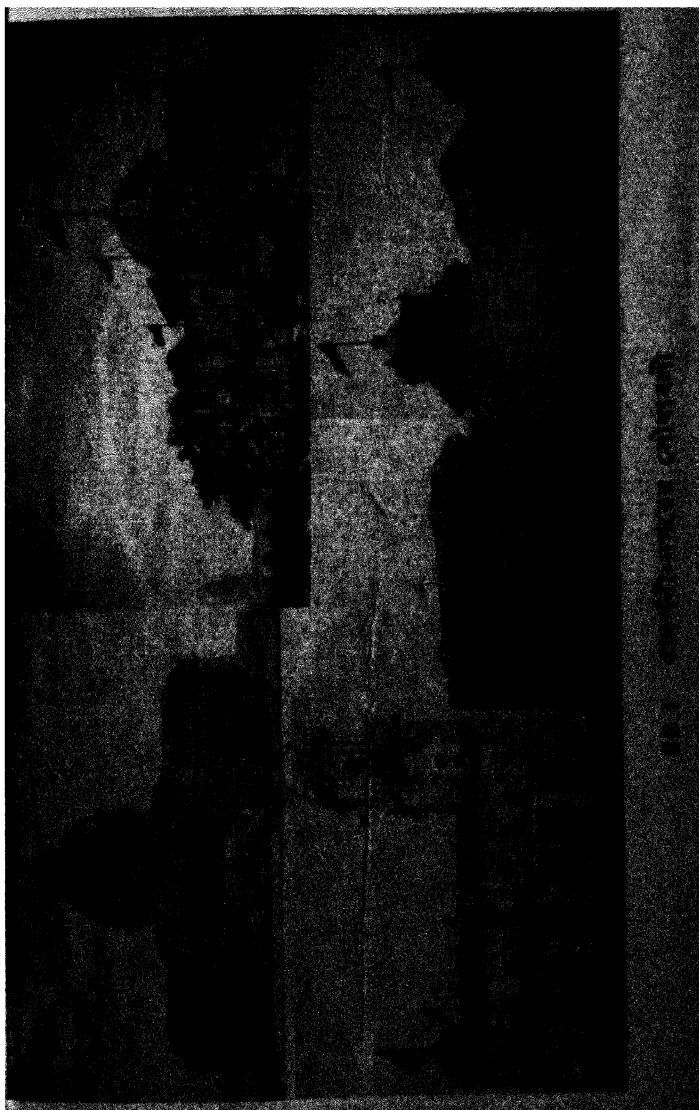
খাইতে পায়। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম, ময়দা রুটি বিস্কুটের এক ইয়াঙ্কি মহাজন প্রকাণ্ড মিঠাইয়ের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। তাহার এক প্রকোষ্ঠে একজন পাগড়ী-ধারী ভারতবাসী খাদ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধান করিতেছে। লুচি পকৌড়ি ইত্যাদি ভাজিয়া দর্শকগণকে উপহার দেওয়া ইহার কার্য্য। বিরাট বিশ্ব-মেলায় ভারতবর্ষের স্থান এইটুকু।

মোটরকারে নগর-ভ্রমণ

সেদিন Sightseeing Carএ বসিয়া ডেন্‌ভার নগর দেখিয়া লইয়াছি। আজ স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো দেখিতে বাহির হইলাম। যাতায়াতে প্রায় ৫০ মাইল হইবে—চারি ঘণ্টার পালা। মূল্য ৫৲। প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী ২৫।৩০ জন লোক বসিতে পারে। প্রদর্শক, আরোহীদিগের দিকে মুখ করিয়া, চালকের নিকট উপবেশন করে। তাহার মুখে একটা চোঙ্গা লাগান থাকে। ইহার ভিতর কথা বলিয়া প্রদর্শক সহজেই সকলের নিকটে নিজ বক্তব্য প্রচার করে।

স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো সহরের কয়েকটা রাস্তা পার হওয়া গেল। সহরটা সমুদ্রের সহিত সংলগ্ন পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এইরূপ সহর পূর্ব্বে আর দেখি নাই। দার্জ্জিলিং, শিমলা ইত্যাদি অঞ্চলে পাহাড় কাটিয়া সমতলভূমি প্রস্তুত করা হয়—তাহার উপর বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে; দূর হইতে সে গৃহগুলিকে সিঁড়ির স্তরবিন্যাসের অনুরূপ দেখায়। কিন্তু স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো নগরের জন্য পাহাড় কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই। তরঙ্গায়িত পর্ব্বতের পৃষ্ঠে, স্কন্ধে, শিরোভাগে এবং পাদদেশে গৃহাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজপথ, উদ্যান, সৌধ, আলোকস্তম্ভ সকলই এই অসমতল ভূমির উপর অবস্থিত। পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষরাজি যেরূপ দেখায়—স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো নগরের অট্টালিকাবলী ঠিক সেইরূপই দেখাইতেছে। যে কোন রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকিলে বুঝিব, একবার উঠিতেছি একবার নামিতেছি—আবার উঠিতেছি আবার নামিতেছি। এই কারণে গৃহগুলি তরঙ্গায়িত বোধ হয়—সমস্ত নগরটাই যেন গৃহের তরঙ্গস্বরূপ।

৬০৪ পৃষ্ঠা

৪৫। মেলাক্ষেত্রে জাপানী সৌধ
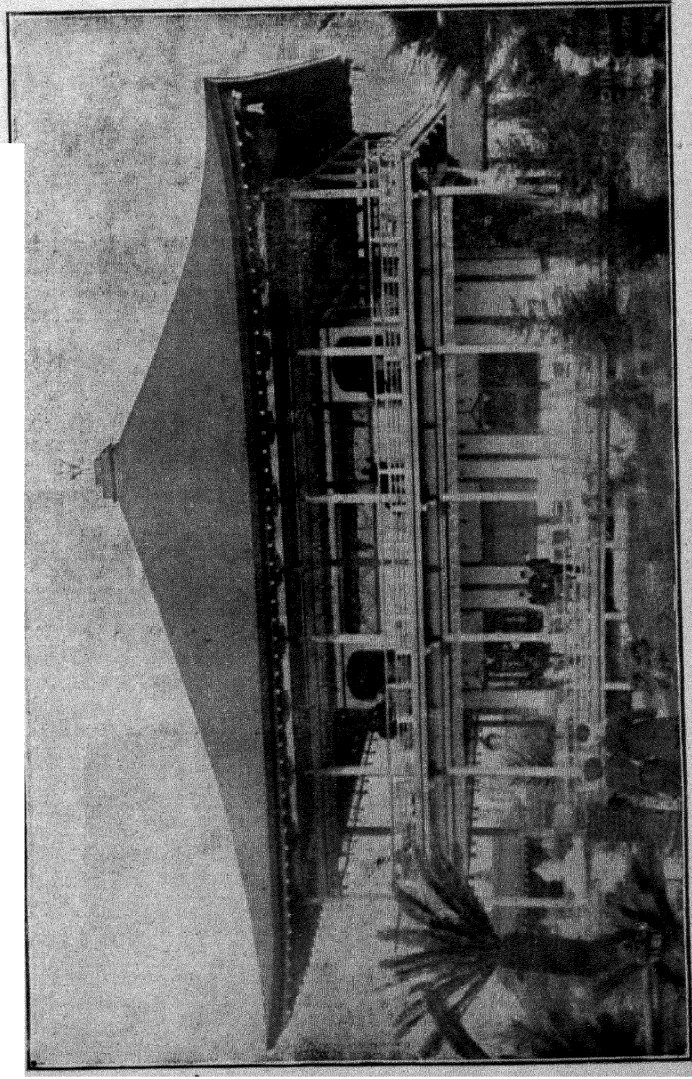
ডেন্‌ভার দেখিয়া স্বাস্থ্যকর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যময় নগরের একটা পরিচয় পাইয়াছিলাম। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো ডেন্‌ভার অপেক্ষা বৃহত্তর। ধনসম্পদের প্রভাবও এখানে বেশী কিন্তু শিকাগো নিউইয়র্ক অপেক্ষা এই নগর বেশী সুশ্রী ও স্বাস্থ্যকর বোধ হইতেছে। ইয়াঙ্কিরা এখানে নীল নভোমণ্ডল, উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ, অসমতল পার্ব্বত্যভূমি, বিচিত্র উদ্ভিদ্‌রাজি এবং সুনীল সিন্ধু প্রকৃতির দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে বিদ্যাবল ও ধনবল প্রয়োগপূর্ব্বক ইহারা দুনিয়ার পশ্চিমতম প্রদেশে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রাসাদপুরী দেখিবামাত্র প্রত্যেক ব্যক্তিই মুগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই।

মোটরকার উপসাগরের কিনারায় আসিল। এইখানে ষ্টিমারে চড়িলাম। সাত মাইল সমুদ্রের হাওয়া খাইতে খাইতে অপর পারে পৌঁছিলাম। উপসাগরের ভিতর দুএকখানা রণতরী দেখা গেল। বন্দর রক্ষা করিবার জন্য উহা প্রহরীর কার্য্য করে। ক্ষুদ্র দ্বীপও দুএকটা পথে পড়িল। একটাতে আলোকগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ডাঙায় নামিয়া আবার মোটরে বসা গেল। প্রদর্শক-কোম্পানীর ব্যবসায় সুবিস্তৃত—এপারে ওপারে সকল পারেই তাহাদের কার্য্যালয় আছে। গাড়ী ওক্‌ল্যাণ্ড সহরের ভিতর দিয়া চলিল। অত্যুচ্চ প্রাসাদ এবং প্রশস্ত রাজপথ ইয়াঙ্কিস্থানের সর্ব্বত্র দেখিয়াছি—পশ্চিমতম জনপদেও এই সমুদায় লক্ষ্য করিতেছি। ওক্‌ল্যাণ্ডে প্রস্ফুটিত ফুলের বাগান রাস্তার দুইধারে অনেক দেখিলাম। প্রত্যেক গৃহের সঙ্গেই ক্ষুদ্রবৃহৎ উদ্যান সংলগ্ন। সবুজ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদের শোভা কালিফর্ণিয়া প্রদেশের প্রারম্ভ হইতেই দেখিতে পাইয়াছি—ওক্‌ল্যাণ্ডেও তাহার প্রাচুর্য্য উপলব্ধি করিলাম। সহরের নিতান্ত ব্যবসায়-পাড়া ছাড়াইয়া আসিবার পর যেন কুঞ্জবনের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতে

লাগিল। নানাবর্ণের পুষ্পরাশি এই অঞ্চলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

ক্রমশঃ বার্কলে নগরের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। সুবিখ্যাত কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এই নগরে অবস্থিত। বিলাতের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ যেমন বিদ্যা-নগর, ইয়াঙ্কিস্থানের বার্কলেও সেইরূপ প্রধানতঃ ও মুখ্যতঃ বিদ্যা-নগর। এখানকার আবহাওয়ায় শিক্ষাপ্রচার ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠানের স্থান নাই।

ইয়াঙ্কিস্থানের প্রাচ্যতম প্রদেশে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ছাত্রসংখ্যা কলাম্বিয়ায় যত আমেরিকার অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত নয়। আজ ইয়াঙ্কিস্থানের পাশ্চাত্যতম প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত। ছাত্রসংখ্যা হিসাবে কলাম্বিয়ার পরেই বার্কলের বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু এখানকার বিদ্যালয় যেরূপ প্রাকৃতিক আবেষ্টনের ভিতর অবস্থিত, তাহার সঙ্গে কলম্বিয়ার তুলনা করিতে হইলে লজ্জাবোধ হয়। কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটের উপর সেনেট-হাউস, মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ইত্যাদির অবস্থান স্মরণ করিলেই নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মালগুদামসদৃশ্য ব্যারাক-গৃহগুলির চিত্র কল্পনা করিতে পারা যায়। বিলাতের লীডস্ ও ম্যাঞ্চেষ্টার, স্কট্ল্যাণ্ডের এডিনবরা এবং আয়র্লণ্ডের ডাবলিন—এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ও অবস্থান হিসাবে নিতান্তই অবজ্ঞেয়। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজগুলির কোন কোনটার নির্ম্মানকৌশল দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। কিন্তু মোটের উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে ইহারাও দুনিয়ার পশ্চিমতম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতপ্রভ। এমন রমণীয় স্থানে জগতের আর কোন বিদ্যামন্দির আছে কি না জানি না।

একটা পাহাড়ের পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা
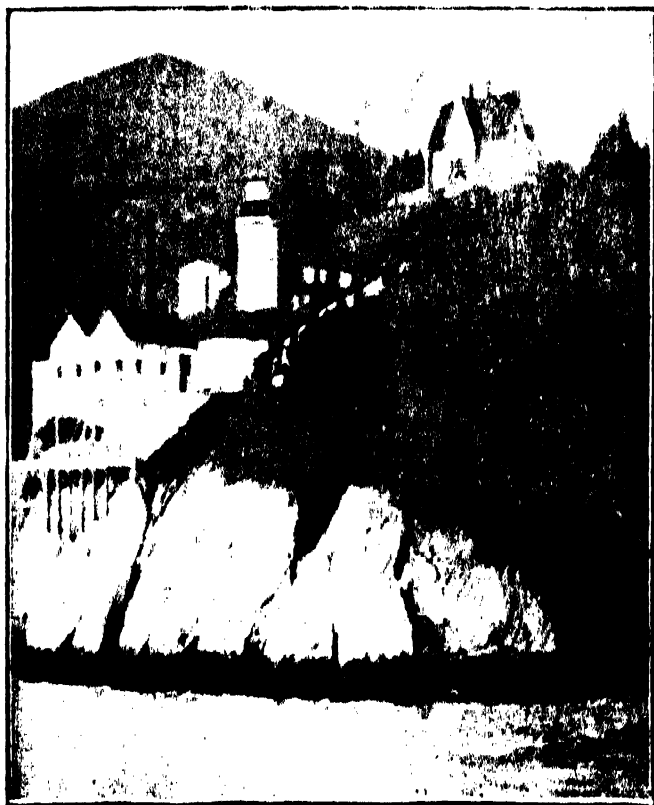
৪৬। দ্বীপের উপর আলোক-গৃহ

ভবন নির্ম্মিত। সৌধগুলি একটা সুবিস্তৃত উদ্যানের ভিতর স্থাপিত হইয়াছে মনে হয়। অন্যান্য স্থানে আগে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া পরে গাছপাতা বাগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এখানে প্রকৃতি-রচিত বাগানের অভ্যন্তরেই বিদ্যামন্দির তৈয়ারী হইয়াছে। পাহাড়ের শিরোভাগ আজ কুয়াশায় আচ্ছন্ন দেখিলাম—অতি বৃহদাকার বৃক্ষ এই পর্ব্বতকে নিবিড় ভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় সৌধ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের কটিদেশে উপস্থিত হইলাম। এইখানে তরুবরসমাবৃত নিভৃত স্থান দেখা গেল। প্রদর্শকের কথা অনুসারে গাড়ী হইতে নামিলাম। প্রাচীন গ্রীকেরা তাহাদের রঙ্গমঞ্চ যে প্রণালীতে প্রস্তুত করিত, কলিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রণালীতে একটা নাট্যমঞ্চ তৈয়ার করিয়াছেন। মঞ্চের উপরে কোন ছাদ নাই, পশ্চাতে কতকগুলি গৃহ, তাহার প্রাচীর মাত্র দেখা যায়। মঞ্চের সম্মুখে অর্দ্ধগোলাকৃতি স্থান—তাহার উপরেও কোন ছাদ নাই। এই স্থানে দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী উপবেশন করিতে পারে। শুনিলাম, এই "গ্রীক থিয়েটারে" যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় সভাপতি বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। নাট্যাভিনয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা এই মঞ্চ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বার্কলে নগরের অন্য দিকে যাওয়া গেল। চারিদিকে ফুলের বাগান ও ফলের বাগান। লাল, নীল, পীত, বেগুনী রংয়ের ফুল, সবুজ তৃণমণ্ডিত ভূমি এবং পত্রসমন্বিত সুবৃহৎ বৃক্ষরাজী সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি। ক্রমশঃ পর্ব্বতের উচ্চতর অংশে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই অঞ্চলের বাগান-বাড়িগুলি নিতান্তই প্রমোদভবন-স্বরূপ। অবশেষে ওক্‌ল্যাণ্ডের এক উদ্যানে আসিয়া গাড়ী থামিল। এইখানে গন্ধক-ঝরণা দেখিবার জিনিষ। এতক্ষণ নগরের বিভিন্ন

অংশই প্রাকৃতিক শোভায় পূর্ণ দেখিতেছিলাম, কাজেই এই উদ্যানের তরুলতা ফুলফল দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইলাম না। ইহার ভিতরে জাপানী রীতিতে নির্ম্মিত একটা চা-পানের গৃহ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এখানকার চিত্র-ভবন। এই ভবনে প্রায় পাঁচশত অত্যুচ্চ শ্রেণীর চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। রুষ, ফরাসী, জার্ম্মান, ওলন্দাজ, ইয়াঙ্কি, ইতালীয় ইত্যাদি সকল শিল্পীর কারুকার্য্য এই ভবনে দেখিতে পাইলাম। একমাত্র এই চিত্রগুলি দেখিবার জন্যই একবার এই উদ্যানে আসা উচিত। চিত্রগুলি বর্ণিত বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রদর্শককে চেষ্টিত দেখিলাম।

চিত্র-ভবন হইতে নূতন পথে ফেরি-ঘাটে উপস্থিত হওয়া গেল। ষ্টিমারে বসিয়া দেখিলাম, স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো হইতে হাজার হাজার নরনারী ষ্টিমারে পার হইয়া আসিতেছে। দিবাভাগে কর্ম্ম করিয়া ইহারা সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিতেছে। হাবড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনদ্বয়েও সন্ধ্যাকালে এই দৃশ্য দেখা যায়। ওকল্যাণ্ড ও বার্কলে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর উপনগর।

৪৭। ওক্‌ল্যাণ্ডের কিয়দংশ

ক্যালিফর্ণিয়ার সম্পদ

কি দিনে কি রাত্রে প্রদর্শনী-নগরের সৌধগুলি যতবার দেখিতেছি ততবারই মনে হইতেছে, যেন অগণিত তাজমহলের মেলা বসান হইয়াছে। প্রদর্শনীতে সাধারণতঃ যে সমুদায় দ্রব্য থাকা উচিত, গৃহসমূহের ভিতর সবই দেখিতে পাইলাম। তাহার তালিকা করিয়া লাভ নাই। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে দুনিয়ার কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগে যত প্রকার উন্নতি হইয়াছে, সে সকলই এখানে সংগৃহীত। প্রদর্শনীগুলি বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা মাপিবার এক প্রকার কল-বিশেষ।

দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদে বিরাট প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। যাহারা সেই প্রদর্শনী দেখিয়াছেন তাঁহাদের এই বিশ্ব-মেলা না দেখিলেও চলিতে পারে। প্রদর্শনীতে প্রদর্শনীতে পার্থক্য করা বড় কঠিন। প্রত্যেকটাতেই প্রায় এক ধরণের বস্তু দেখা যায়—কতকগুলি জিনিষ হয় ত একস্থানে বেশী, অন্য কতকগুলি অন্য একস্থানে বেশী। কাজেই যে কোন দুই প্রদর্শনীর প্রভেদ বুঝিতে হইলে বিশেষজ্ঞের ন্যায় প্রত্যেক বিভাগ তলাইয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু ওরূপ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিবার সময়, সুবিধা ও যোগ্যতা বহু লোকের নাই। স্বাধীনদেশের রাষ্ট্রকর্ত্তৃক বিচক্ষণ ধুরন্ধরেরা এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহারা নিজ নিজ বিভাগের সকল প্রকার খুঁটিনাটি বুঝিবার জন্য প্রদর্শনীতে বহুক্ষণ কাটাইয়া থাকেন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা সমাজের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার লোক

প্রদর্শনী দেখিয়া উপকৃত হন। যাঁহারা শিল্প, কৃষি, ব্যবসায়, বিদ্যালয় ইত্যাদির পরিচালক তাঁহারা নানাবিধ সংগৃহীত দ্রব্যের সাক্ষাতে আসিলে সহজেই ভবিষ্যতে লাভবান্ হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন।

স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর বিশ্বমেলায় এই দুই শ্রেণীর লোকই নানা দেশ হইতে আসিয়াছেন। ইয়াঙ্কিরাও প্রদর্শনীর নানা বিভাগ দেখিয়া নিজ নিজ অসম্পূর্ণতাগুলি সংশোধন করিবার প্রণালী চিন্তা করিতেছেন। ভারতবর্ষ হইতে এই ধরণের বিচক্ষণ লোক একজনও আসেন নাই। এমন কি, ভারতবর্ষে আজকাল ছোট-বড় যত প্রদর্শনী খোলা হয় সেগুলি দেখিয়া যথার্থরূপে শিক্ষালাভ করিবার জন্য কয়জন ভারতবাসী চেষ্টা করেন, জানি না। বোধ হয় ভারতীয় প্রদর্শনীসমূহ হইতে দেশীয় লোকের ভিতর যথোচিত শিক্ষাবিস্তার হয় না। বরং ইয়াঙ্কি, ইংরাজ, জার্ম্মানী ইত্যাদি বিদেশীয় ব্যবসায়ী ও পর্য্যটকেরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভারতীয় লোকজনের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ভবিষ্যতে দখল করিবার পন্থা বুঝিয়া লন। এলাহাবাদের বিরাট প্রদর্শনী হইতে ভারতবাসীর লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশী হইয়াছে মনে হইতেছে।

স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর এই মেলায় কালিফর্ণিয়া প্রদেশের ধাতু-রত্ন-পশু-সম্পদ বিশেষভাবেই সংগৃহীত হইবার কথা। যখন যে কেন্দ্রে বিশ্ব-সম্মিলন হয় তখন সেই কেন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তী জনপদই বিশ্বে সুপ্রচারিত হয়। এইবার ইয়াঙ্কিস্থানের পশ্চিম প্রদেশ এবং বিশেষভাবে ক্যালিফর্ণিয়া সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।

নেভাডা পর্ব্বতের শৃঙ্গেই রেলগাড়ী ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে চলিতেছে। তখন এই অঞ্চলের আকর-সম্পদ দেখিতে পাইলাম। ক্রমশঃ নিম্নতর

৬১০ পৃষ্ঠা

৪৮। গ্রীক থিয়েটার
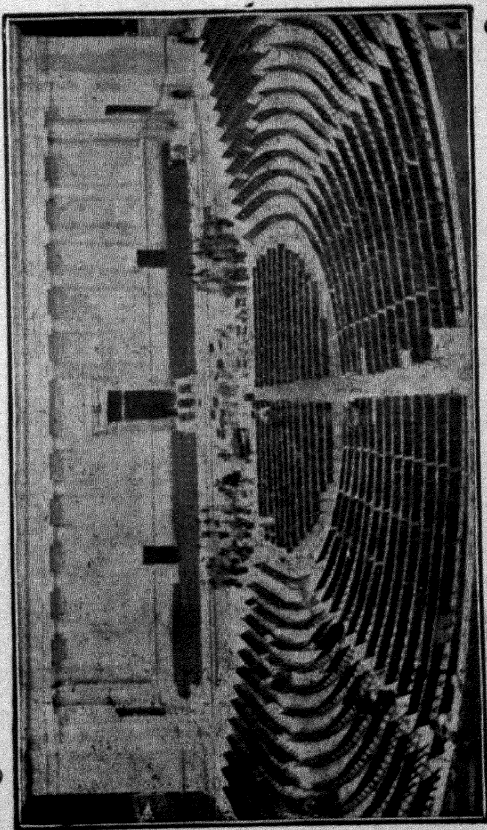
ভূমির উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছিল। তখন মনে হইতেছিল, বাঙ্গালা দেশের কথা আর সেই মিশরের কথা—

"এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

*　　*　　*　　*

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
সে যে পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখীর গানে জেগে।"

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ক্যালিফর্ণিয়াভূমির ফুল-বাগান, ফল-বাগান, কৃষিক্ষেত্র, পশু-চারণের মাঠ দুনিয়াবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? মাত্র ৪০।৫০ বৎসর হইল এই প্রদেশে বসতিস্থাপন যথার্থভাবে আরব্ধ হইয়াছে। আগামী ৫০ বৎসরের ভিতর এই ধনধান্য-পুষ্পভরা জনপদের সমৃদ্ধি কতগুণ বাড়িয়া যাইবে কে বলিতে পারে?

প্রদর্শনী-নগরের সুবৃহৎ ক্যালিফর্ণিয়াভবনে প্রবেশ করিয়া এই প্রদেশের সকল সম্পদ্ একত্র দেখিয়া লইলাম। লতাপাতা ফুলফল নদনদী পর্ব্বতসাগর ইত্যাদি বিভাগ হইতে উদ্ভাবিত ধনাগমের উপায়-সমূহ এই সৌধে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রচুর ধন-লাভের সুযোগ আছে, তাহা দর্শকগণকে বুঝাইবার জন্য নানা প্রকার বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা বিতরিত হইতেছে। কৃষিকার্য্য ও পশুপালন সম্বন্ধেই লোকজনের দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হইল। অশেষবিধ ফলমূল শাকসজীর নমুনা দেখিলাম। ফলমূল বহুকাল অবধি তাজা রাখিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলমূলের চাষে বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বন

করিয়া ক্যালিফর্ণিয়ায় লুথার বার্ব্বাঙ্ক প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীর নিদর্শনসমূহও দেখিতে পাওয়া গেল।

সোনার ক্যালিফর্ণিয়ায় ইয়োরোপের নানা স্থানের নানা সৌন্দর্য্য একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। "জমায়ে চাঁদের সুধা বিধি গড়েছিল তায়!" ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনায় এই প্রদেশের কৃষিসম্পদ্‌ও যথেষ্ট।

ভারতবর্ষের এক প্রদেশসম্বন্ধে আমরা প্রাকৃতিক শোভা ও কৃষি-সম্পদ নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া থাকি :—

"সবার—সবার হইতে মধুর
যাহার শস্য, যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে
গুঞ্জরি স্তব যাহার শ্রীর,
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে
সুরভিস্নিগ্ধ পবন ধীর!

মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!
ধুম্র যাহার তুঙ্গ শির!
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া
ভাসায় যাহার কানন-তীর!
মাধুরী বন্য কুসুমে জানিয়া
ঘুমায় অঙ্গে রমণী-শ্রীর;
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে
কে সম মেবার-সুন্দরীর।"

সুতরাং বাঙ্গালী ক্যালিফর্ণিয়ার গৌরব সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

৬১২ পৃষ্ঠা
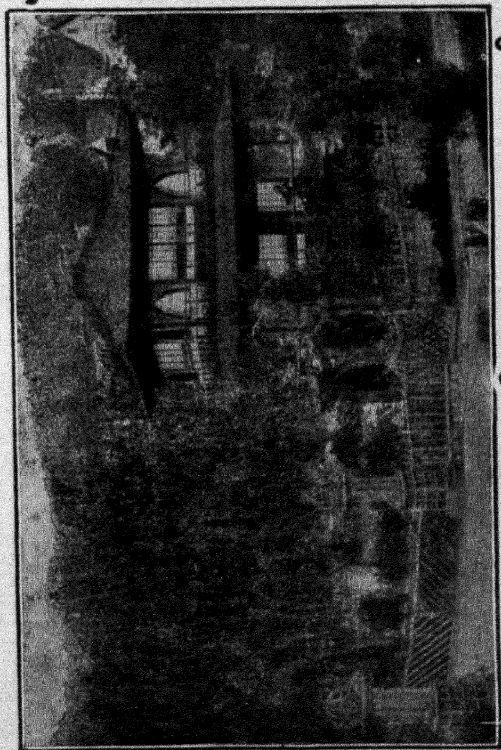
৪৯। পীড্‌মণ্ড বাগানে জাপানী চা-গৃহ

চীনা-টোলা

উত্তর ভারতের প্রায় সকল সহরেই একটা করিয়া বাঙ্গালী-টোলা আছে। কাশীর বাঙ্গালী-টোলা সুপ্রসিদ্ধ। আমেরিকার বড় বড় সহরে একটা করিয়া চীনা-টোলা দেখিতে পাই। নিউইয়র্ক, শিকাগো এবং স্যান্‌ফ্র্যানসিস্কোর চীনা-পাড়াগুলির নাম পর্য্যটকমাত্রেই শুনিতে পান।

মার্কিন দেশ দুনিয়ার বারোয়ারিতলা—ইয়োরোপ ও এশিয়া দুইদিক হইতেই এখানে লোক আসিয়া বাস করিতেছে। বলাবাহুল্য, পশ্চিম জনপদে এসিয়াবাসীর প্রভাবই বেশী। চীনা ও জাপানী নরনারীর সংখ্যা এই অঞ্চলে অত্যধিক—এমন কি কয়েক হাজার ভারতীয় শিখ এবং পাঞ্জাবীও এখানকার অধিবাসী। মার্কিনেরা ইয়োরোপীয় জনগণকে সাদরে গ্রহণ করিতে চাহে, কিন্তু "প্রাচ্য"-দেশীয় লোকেরা উপনিবেশ-স্থাপন আদৌ পছন্দ করে না। ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় যাহাতে লোক আসিতে না পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্র করিতেছেন। এমন কি, ভারতীয় ছাত্রগণের আগমন এই বিধানে যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ; সুতরাং ভারতবাসীর বিরুদ্ধে আইন জারি করিতে যাইয়া ইয়াঙ্কিদের কোন বাধা পাইতে হয় না। অধিকন্তু, ভারতীয় নরনারীর সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে অতিশয় অল্প—এই কারণে তাহাদের প্রভাবে ইয়াঙ্কিসমাজের সুফল কুফল বেশী ঘটে না। কিন্তু চীনা ও জাপানীদের লইয়া মার্কিনদের মহাবিপদ। জাপানকে অসন্তুষ্ট করা যুক্তরাষ্ট্রের নিতান্তই ইচ্ছাবিরুদ্ধ—জাপানের ক্ষমতায় ইয়াঙ্কিরা

সত্যসত্যই আশঙ্কিত, কাজেই জাপানীদের বিরুদ্ধে আইনজারি করিবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্বিত হইতে হয়। ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে বহু জাপানী বসতিস্থাপন করিয়া বসিয়াছে। ইহাদিগকে যেন তেন প্রকারেণ এখান হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য ক্যালিফর্ণিয়া-রাষ্ট্র অতিশয় চেষ্টিত। জাপানের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া লড়াই বাধিবার আশঙ্কাও কম নয়। কোন কোন ইয়াঙ্কির মুখে শুনিতে পাই—"জাপানীরা যদি ক্যালিফর্ণিয়া দখল করে, তাহা হইলে আমরা নেভাডা পর্ব্বতের পূর্ব্ব অঞ্চলে যাইয়া বাস করিব,—জাপানের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।" জাপানের সঙ্গে মার্কিনদের মন কষাকষি অত্যধিক চলিতেছে। ক্যালিফর্ণিয়া রাষ্ট্র দুএক স্থলে কিছু কাঁচা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা সাম্‌লাইয়া তুলিবার জন্য ফেডারাল রাষ্ট্র যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। যাহা হউক, ইয়াঙ্কিদের জাপান-বিভীষিকা যে কোন মুহূর্ত্তে একটা বিষম আকার ধারণ করিতে পারে। এই জন্যই আজকাল জাপানীতে ও ইয়াঙ্কিতে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সম্মিলন ইত্যাদির বহুবিধ অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। কারণ "সেটার যতই অভাব হবে, ততই সেটা বলতে হবে।"

ভারতবাসীর মা-বাপ নাই; কাজেই মার্কিন রাষ্ট্র এক কলমের খোঁচায় ভারতীয় সমস্যা সমাধান করিতে পারেন। চীন স্বাধীন বটে এবং আজকাল স্বরাজ বা প্রজাতন্ত্র-শাসনের পর হইতে চীনারা ইয়াঙ্কিদের মহাবন্ধু হইয়া পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু চীন অতি দুর্ব্বল—দুনিয়ার বাজার স্বরূপ—স্বাতন্ত্র্যহীন মেরুদণ্ডহীন "কোম্পানীর নাগড়া"। সেদিন পর্য্যন্ত মিশরের যে দুরবস্থা ছিল, তুরস্কের আজও যে দুরবস্থা রহিয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের যে দুরবস্থা ছিল, চীনের এখনও সেই দুরবস্থা। শক্তিহীন চীন-সমাজ রুশ, ইংরাজ, জার্ম্মাণ, জাপানী ও ইয়াঙ্কি এই পাঁচজাতির প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

কাজেই চীনদেশে আজকাল চীনাদের গলার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া কঠিন। চীনের হাটে কখনও ইংরাজের গলা, কখনও ইয়াঙ্কির গলা, কখনও জার্ম্মানের গলা শুনিতে পাই—চীনাদের গলা শুনিতে কখনও পাই কিনা সন্দেহ! এই হ-জ-ব-র-ল-য়ের ভিতর ইয়াঙ্কিরা নিজেদের প্রতিপত্তি কিছু বেশী রকমেই স্থাপিত করিয়া লইয়াছে। চীনারাও ইয়াঙ্কিদিগকে খুব ভালবাসে—ইয়াঙ্কি-সমাজকে সকল বিষয়েই ইহারা গুরু ও পথপ্রদর্শক এবং উদ্ধারকর্ত্তা বিবেচনা করিতেছে। ইয়াঙ্কিরা যুবক চীনের হৃদয়মধ্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ হিসাবে চীনাদের সঙ্গে ইয়াঙ্কিদের লেন্-দেন্ বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই চলিয়া থাকে। কিন্তু রক্তসংমিশ্রণ, শ্রমজীবি-সমস্যা, পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্যকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে ইয়াঙ্কিরা চীনা-দিগকেও ভারতীয় ও জাপানী হইতে পৃথক বিবেচনা করে না। এইজন্য চীনা নরনারীগণকে ইয়াঙ্কিস্থানে দলে দলে প্রবেশ করিতে না দিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বহুবিধ আইন আছে। ইয়াঙ্কিরা ভারতবাসীদের সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখে না—জাপানীদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু বিবেচনা করে—ও চীনাদিগকে বন্ধুভাবে আদর করে এবং তাহাদের পীঠে হাত বুলাইয়া কাজ হাসিল করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই তিন জাতীয় লোকের কোন ব্যক্তিকেই ইহারা মার্কিনদেশে বসতি-স্থাপনের জন্য আহ্বান করিতে চাহে না। সকল এসিয়াবাসীর উপরেই ইহাদের ঘৃণা অত্যধিক।

বর্ত্তমানে চীনা-টাউন বা চীনা-টোলা ইয়াঙ্কিস্থানের বড় বড় নগর-মাত্রেই আছে—বিগত ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের ভিতরে এইগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই এক্ষণে এগুলি কোন আইনের জোরে উঠাইয়া দেওয়া সহজ নয়। তবে ভবিষ্যতে যাহাতে চীনাদের আমদানী

কম হয়, তাহার জন্য বিশেষ কতকগুলি Immigration Rules প্রচারিত হইয়াছে।

কলিকাতার চীনা-বাজারে চীনারাই প্রধানতঃ এবং বিশেষভাবে মুচিগিরি করে। ছুতার-মিস্ত্রির কাজেও চীনাদিগকে আমারা দেখিতে পাই। আমেরিকার চীনাটোলাগুলি কেবলমাত্র ছুতারপাড়া বা মুচিপাড়া মাত্র নয়। এখানকার নগরের চীনাপাড়ায় অন্যান্য পাড়ার ন্যায় ধনীদরিদ্র, শিল্পী, দোকানদার, দর্জ্জী, হোটেলওয়ালা ব্যাঙ্কার, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই থাকে। নিউইয়র্ক, শিকাগো, স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো ইত্যাদি নগরে নিগ্রোপাড়া, ইহুদিপাড়া, জার্ম্মানপাড়া, পোলপাড়া, ইতালীপাড়া ইত্যাদি নানাজাতির বড় বড় পাড়া আছে। প্রত্যেক পাড়াতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের লোকই বাস করে। চীনাপাড়াতেও ঠিক সেইরূপ চীনাসমাজের সকল প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। চীনাদের মন্দির, হোটেল, নাচঘর, থিয়েটার, ব্যাঙ্ক, বিদ্যালয়, সভাসমিতি ইত্যাদি সকলেরই প্রতিষ্ঠান চীনাটোলায় আছে। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর চীনাটোলার অধিবাসীরা চীনা ভাষায় টেলিফোন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। এইজন্য টেলিফোন্-কোম্পানি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল কারণে পর্য্যটকেরা চীনা-টোলায় বেড়াইতে আসা একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য করে।

চীনা-টাউন দেখিবার জন্য নগর-প্রদর্শক-কোম্পানীর মোটরকারে বসা গেল। নৈশভোজনের পর বাহির হইলাম। মূল্য দিতে হইল তিন টাকা। যে গাড়ীতে বসিলাম, তাহার ভিতর প্রায় পঞ্চাশজন পুরুষ ও রমণী। এইরূপ গাড়ীভরা 'টুরিষ্টে'র সঙ্গে রাস্তায় অনেকবার দেখা হইল।
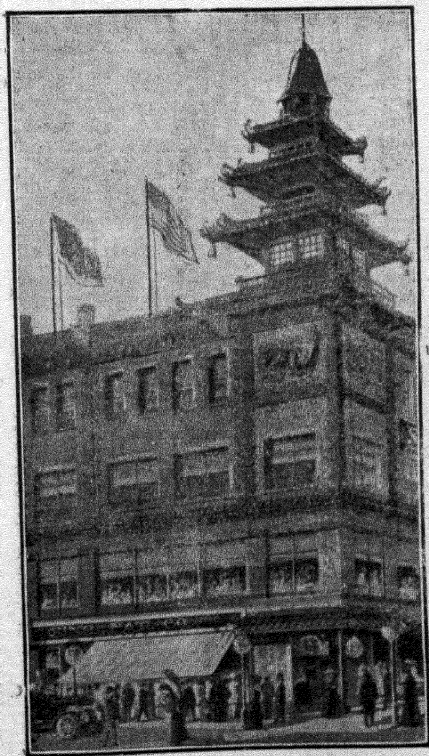
৫০। চীনা দোকান

নগর-প্রদর্শনী-কার্য্য এদেশের একটা বিশেষ ব্যবসায়। এজন্য কোম্পানী সকল প্রকার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া থাকে। কোন্ কোন্ বাড়ীতে যাইতে হইবে—কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে হইবে—কোন্ কোন্ পরিবারের পরিচয় দেওয়া হইবে—কোথায় কোন্ ব্যক্তি বক্তা ও প্রদর্শকের কার্য্য করিবেন—এই সকল বিষয়ই খাঁটি ব্যবসায়ের নিয়মে নির্দ্ধারিত করা হয়। পর্য্যটকেরা কোম্পানীর আশ্রয় লইয়া নগরস্থ কোন কোন জিনিষ অতি সহজে বুঝিতে পারেন। এমন কি ফ্যাক্টরী, বিদ্যালয়, সভাসমিতি ও কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দেখা সম্বন্ধেও প্রদর্শক-কোম্পানী সাহায্য করিয়া থাকে।

গাড়ী নগরের নানা নৈশ-দৃশ্যের ভিতর দিয়া এক চীনা-মন্দিরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। এই মন্দির দেখাইয়া বক্তা বলিলেন—"কয়েক বৎসর হইল চীনাদের মন্দির এই নগরের অন্যান্য অট্টালিকার সঙ্গে ভূমিসাৎ হইয়াছিল। ১৯০৬ সালের ভীষণ ভূমিকম্প ও অগ্নি-কাণ্ডের কথা মনে করুন। কিন্তু এই মন্দিরে ধনবান্ চীনাদের আসা-যাওয়া আছে। কাজেই অল্পকালের ভিতরই কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। চীন-দেশ হইতে সকল প্রকার মাল মসলা ও উপকরণ আনা হইয়াছিল।"

মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বক্তা বেশ সরসভাবে চীনাদের ধর্ম্ম, পূজা, দেব-দেবী, আচার-ব্যবহার, বিবাহ-পদ্ধতি ও শবসৎকার ইত্যাদি নানা বিষয়ের গল্প করিলেন। মন্দিরের ভিতরকার কারুকার্য্য, মূর্ত্তি, সিংহাসন ইত্যাদির ভিতর উচ্চ অঙ্গের শিল্পকর্ম্ম বিদ্যমান। বক্তৃতা হইতে দর্শকেরা তাহাও বুঝিতে পারিল। বর্ত্তমানে খ্রীষ্টানদের পক্ষে দেবতাপূজা, আরতি, দেবনিদ্রার প্রার্থনা ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

কাজেই চীনা-ধর্ম্মপ্রণালী ইহাদের নিকট অদ্ভুত বোধ হইল। আমি দেখিলাম, মূর্ত্তিপূজা যে যে দেশে আছে, সেই সকল দেশেই পূজা-প্রণালীও মোটের উপর একপ্রকার। ভারতীয় জনগণ চীনা-মন্দিরের আসবাব-অনুষ্ঠান ও রীতি-পদ্ধতিতে নিজেদের সুপরিচিত বস্তুই দেখিতে পাইবে। কাঁশর-ঘণ্টা বাজাইয়া চীনাপুরোহিত দেবতার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া থাকেন। দিবারাত্র আগুন জ্বালাইয়া আলোক-রক্ষা করা চীনারা বিশেষ আবশ্যক বোধ করে। শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা অশৌচের লক্ষণ বিবেচিত হয়। দেবতার "চালী"তে অসংখ্য মূর্ত্তি সংস্থাপিত দেখিলাম। চালী আগাগোড়া সোনার পাতে মোড়া। এই স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনের ভিতরে ও উপরে বহু স্বর্ণমূর্ত্তি দেখিয়া সাধারণ হিন্দুরা তাঁহাদিগকে সহজেই তেত্রিশকোটি দেবদেবীর অন্যতম বিবেচনা করিবে। বাস্তবিক পক্ষে মূর্ত্তিগুলির আকার যদি চীনাজাতির অনুরূপ না হইত, শিক্ষিত হিন্দুও তাহা হইলে এইরূপই বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতেন। অন্ততঃ যাঁহারা বহুদেবদেবীর মূর্ত্তিতে মঙ্গোলিয় জাতির আকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা চীনাধর্ম্মে হিন্দুপ্রভাব ও হিন্দুধর্ম্মে চীনা-প্রভাব বুঝিতে পারিবেন। মূর্ত্তিগঠনশিল্পে চীনা এবং হিন্দুর সাম্যও অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়।

মন্দির দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া যাইতে হইল। চীনাদের কয়েকটা বড় বড় দোকানে প্রবেশ করিলাম। এক চীনা-পরিবারের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজবে কাটান গেল। চীনা বালকবালিকারা আসিয়া গান শুনাইল। অবশেষে এক চীনাগৃহে আসিলাম। গান-বাজনা হইতে লাগিল। চীনাবালিকারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চা-পান করাইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই এক "পুরিয়া" চা উপহার পাইলাম।

বক্তা মাঝে মাঝে চীনের প্রজাতন্ত্রশাসন সম্বন্ধে The Great Republic of China বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইঁহার মুখে শুনিলাম—"চীনারা অত্যন্ত সাধু। ইহারা রসিদ না লইয়াই টাকা ধার দেয়। ইহাদের কথার দাম খুব বেশী।"

ঘণ্টাতিনেক আনন্দের সহিত কাটান গেল। দলের মধ্যে একজন ইয়াঙ্কি-রমণীর সঙ্গে আলাপ হইল। গৃহ নেব্রাস্কা-প্রদেশে। ইনি পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের কৃষিকার্য্য

আধুনিক জগতে কৃষিকর্ম্ম কলযন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত শিল্প-বিশেষ। সাধারণ শিল্প-কারখানার নিয়মেই কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য চলিয়া থাকে। ভূমিকর্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাজারের খাদ্যদ্রব্য ও প্রাকৃতিক উপকরণ সরবরাহ করা পর্য্যন্ত সকল কাজেই উচ্চতম বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিতে পাই। বিলাতে বিস্কুট-ফ্যাক্টরী দেখিয়া সামান্য সামান্য কার্য্যেও কলকারখানার আধিপত্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রেও তাহাই বেশ দেখিতে পাইতেছি। রেলে বসিয়া ভুট্টাভাজা, মুড়্‌কী, চীনা-বাদামভাজা, শুক্‌না মিষ্ট ডুমুর, কৌটায় সুরক্ষিত তাজা আনারস ও নাসপাতি এবং অন্যান্য বহুবিধ কৃষিজাত দ্রব্য পাইয়াছি। মনে হইতেছিল, এই সকল জিনিষ পরিষ্কার করিবার সময় শ্রম-লাঘবকারী যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছে—শেষ পর্য্যন্ত পুরিয়ার মধ্যে রাখিবার সময়েও কলের সাহায্যই লওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে লোকসংখ্যা অল্প হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বেশী—কারণ এক একটা কল বা যন্ত্র বহু ব্যক্তির কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতেছিলাম—ইয়াঙ্কিরা কি ক্রমশঃ চীন ও ভারতবর্ষের মুড়িমুড়কীর দোকানগুলিও দখল করিয়া ফেলিবে? এ ভয় নিতান্ত অমূলক বলিয়াও মনে হয় না।

প্রদর্শনী-নগরের কয়েকটা সৌধে প্রবেশ করিয়া আধুনিক কৃষি-কার্য্যের চরম নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। ফ্রান্সে মনে হইতেছিল—ফরাসীরা কৃষিজীবী জাতি, কি শিল্পী জাতি, কি ব্যবসায়ী জাতি, তাহা স্থির করা কঠিন। ইয়াঙ্কিস্থানের পশ্চিম অঞ্চল এবং এই প্রদর্শনী

দেখিয়াও ভাবিতেছি—মার্কিনদেশ কৃষিপ্রধান, কি শিল্পপ্রধান, কি বাণিজ্য-প্রধান তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। এখানে কৃষিসম্পদের চূড়ান্তই দেখিতেছি। ভারতভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধনধান্যপুষ্পে ভরা বিবেচনা করিতে এখন লজ্জাবোধ হয়। ভারতের কৃষিসম্পদ্ লইয়া বর্ত্তমান যুগে আর গৌরব করা চলে না। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষ যাহাই থাকুক না কেন, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ কৃষিকার্য্য হিসাবেও নিতান্তই অবজ্ঞেয়। কাজেই দশ-বিশ বৎসরের ভিতর ভারতবাসীর মুড়িমুড়্কী, চিড়ে, খৈ, আম, জাম, খেজুর, আলু ও কপিও বিদেশীয়েরা যোগাইতে থাকিবে, এরূপ আশঙ্কা করা পাগলামি বোধ হয় না।

বিগত ৫০।৭৫।১০০ বৎসরের মধ্যে কৃষিকার্য্যে এবং কৃষিবিজ্ঞানে যত পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০০০ বৎসরেও তত হয় নাই। এই অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কোনটাতেই ভারতবাসী সাহায্য করেন নাই; এবং করিবার সুযোগও পান নাই। কাজেই কৃষিজাত দ্রব্য সম্বন্ধেও ভারতবাসী ক্রমশঃ বিদেশীর উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইবেন।

আজকালকার কৃষক বলদের সাহায্যকারী মানবমাত্র নয়। তাহারা শিল্প-কারখানার মজুরের ন্যায় কলযন্ত্রের পরিচালক বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানসমূহের নিয়ন্তা। প্রদর্শনীর ক্যালিফর্ণিয়া-ভবন, কানাডাসৌধ, Horticulture-গৃহ ইত্যাদির ভিতর দেখিলাম, কৃষকদের সকল কার্য্যই উচ্চ অঙ্গের বিদ্যাবলের ফল। ভূমির উর্ব্বরতা নাই—তাহাতে আধুনিক কৃষক ভীত হয় না। সে রাসায়নিক উপকরণের সাহায্যে ভূমির উৎপাদনী শক্তি যথেচ্ছক্রমে বাড়াইয়া লইতেছে। উত্তাপ, আলোক, গ্রীষ্ম-বর্ষা, জলাভাব, জলপ্রপাত, জলাধিক্য ইত্যাদির কোনটা কৃষকের

কার্য্যেই কাজকাল অন্তরায় থাকিতে পারে না। বুদ্ধি বলে বর্ত্তমান যুগের কৃষক এই সমুদয় প্রাকৃতিক শক্তির ইচ্ছামত সদ্ব্যবহার করিতেছে। বীজ, অঙ্কুর, ফসল, ফল, মূল, পত্র, লতা ইত্যাদির আকার বাড়ান-কমান অথবা স্বাদ ও বর্ণ বদলান—এই সব কার্য্যও কৃষকেরা অতি সহজেই করিতে পারে। ছোট আলুকে বড় আলুতে পরিণত করা, সকণ্টক ও বিস্বাদ শাক-শব্জীকে নিষ্কণ্টক ও সুস্বাদু জাতিতে পরিণত করা এই সমুদয় কার্য্যে ইহারা সিদ্ধহস্ত। আজকালিকার উদ্ভিদ্-জগতে কৃষকেরা ঐন্দ্রজালিক ও যাদুকরের মত। তাহার পর বীজবপন হইতে শস্যকর্ত্তন পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই শতলোকের পরিবর্ত্তে একজন লোকের সাহায্য লওয়া হইতেছে। অল্পমাত্র মানবশ্রমে প্রচুর ফল পাওয়া যাইতেছে। অধিকন্তু কৃষিকার্য্য-সম্পর্কিত কোন দ্রব্যই বৃথা নষ্ট হয় না। কোন না কোন উপায়ে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহও নানাবিধ অর্থকর প্রণালীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাঠের কোন জিনিষই অনাবশ্যক বিবেচনায় ফেলা যায় না।

ভারতবর্ষে দেখা যায়, আম জাম কাঁঠাল গাছ একবার খারাপ হইতে থাকিলে সেগুলির আর উন্নতি হয় না। বৎসর বৎসর এই সমুদয়ের ফল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র, স্বাদহীন ও অল্পসংখ্যক হইতে থাকে। পাশ্চাত্য-দেশে প্রত্যেক বৃক্ষের উৎপাদনীশক্তি অশেষ উপায়ে বাড়াইবার ব্যবস্থা আছে। গাছের পাতাগুলি মাঝে মাঝে ধুইয়া পরিষ্কার করিবার জন্যই বহুবিধ কলের ব্যবহার হয়। জলের মধ্যে নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া মালীরা গাছের পাতায় সেই জল ছিটাইয়া দেয়। বৃক্ষের ব্যাধি নিরূপণপূর্ব্বক রাসায়নিক পদার্থ নির্ব্বাচন করা হয়—এবং বৃক্ষের আকার অনুসারে জল ছিটাইবার কল ব্যবহার করা হয়। "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ"-বিদ্যা হিন্দুর অপরিচিত
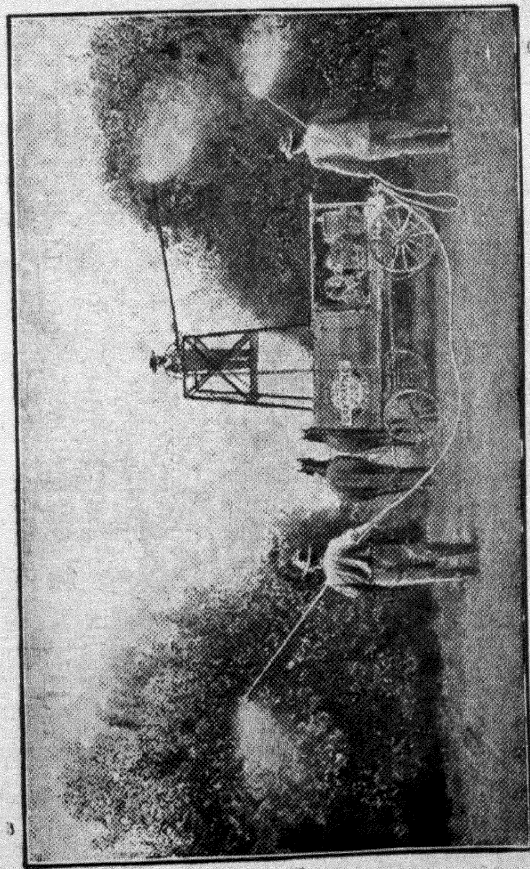
৫১। গাছে রাসায়নিক পদার্থ-মিশ্রিত জল ছিটান হইতেছে

নয়—কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তাহার ব্যবহার অত্যল্প হইতেছে—অধিকন্তু, নবীন বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার কিঞ্চিৎমাত্রও উন্নতি সাধিত হয় নাই।

কৃষিকার্য্যে ব্যবহারোপযোগী নানা কল এলাহাবাদের প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। স্যান্‌ফ্রানসিস্কোতেও অনেক দেখিলাম। লাঙ্গল ব্যবহার যেমন কৃষকমাত্রেরই অত্যাবশ্যক সেইরূপ নানাবিধ দমকল, জল ছিটাইবার কল, Force-Pump, Sproyer ইত্যাদির ব্যবহারও আজকাল অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়।

আলুর ক্ষেত্রে, তুলার জমিতে, ফল ফুলের বাগানে সর্ব্বত্রই এই সকল কলের ব্যবহার হইতেছে। বহুবর্ষজীবী প্রাচীন এল্‌ম্ তরুও এই সমুদয়ের প্রয়োগ-ফলে নবীন ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে এই সমুদয়ের ব্যবহারপ্রচলন নিতান্তই আবশ্যক। প্রাচীন বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থার সঙ্গে নবীন Horticulture-বিদ্যার সংযোগ-বিধান শীঘ্রই কর্ত্তব্য।

উন্নত লাঙ্গল ও সার সম্বন্ধে অনেকেরই অনেক কথা জানা আছে। কতকগুলি সামান্য সামান্য কার্য্যে কারিগরী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম! একটা কলের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছোট বড় মাঝারি নাসপাতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সাজান হইতেছে। কোন লোকের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। একটা ক্ষুদ্র কলে মুড়কী প্রস্তুত হইতেছে—গুড়ের সঙ্গে খৈ মিশাইবার জন্য কোন লোকের না বসিয়া থাকিলেও চলে। এমন কি, চীনাবাদামও কলে ভাজা হইতেছে। আগুনের তাপ এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, হঠাৎ খানিকটা বাদাম বেশী-ভাজা হইয়া যাইতে পারে না। কলের সাহায্যে বাদামগুলি আপনা-আপনিই যথাস্থান হইতে পড়িয়া নিয়ম-মত ভাজা হইয়া যথা-স্থানে জমা হয়। কলের সাহায্যে কিশমিশের বোঁটা ছাড়ান, খোসা

ছাড়ান, পরিষ্কার করাও দেখিলাম। প্রত্যেক স্থলেই পুরিয়া-বাঁধাও কলে হইয়া থাকে।

এই সব দেখিতেছি আর ভাবিতেছি—রজনীকান্তের সাধ

"যদি কুমড়োর মত চালে ধরে র'ত
পান্তোয়া শত শত
আর সরিষার মত হত মিহিদানা
বুঁদিয়া বুটের মত"—ইত্যাদি

একমাত্র মিষ্টান্ন সম্বন্ধেই মিটিয়াছে এমন নহে—মার্কিন দেশীয় লোকেরা উদ্ভিজ্জ বিষয়েও এইরূপ সাধ মিটাইতে সমর্থ। কৃষিক্ষেত্রে যাদুকরেরা অদ্ভুত ফল প্রদর্শন করিতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে সোরা উৎপন্ন হয়। এই সোরা সারের উপাদান। কিন্তু এখানে সোরা যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে আজকালকার কৃষকেরা হা হতোঽস্মি করিতে থাকিবে কি? বৈজ্ঞানিকেরা আশ্বাস দিয়াছেন—"কোন ভয় নাই।" কৃত্রিম উপায়ে বাতাস হইতে সোরা প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। সোরার প্রধান উপকরণ নাইট্রিক য়্যাসিড। এই য়্যাসিড প্রস্তুত করিবার জন্য খোলা আকাশ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হয়। তাহার সঙ্গে অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ বিধান করিলে সহজে নাইট্রিক য়্যাসিড তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়। কাজেই ভূমিতে সোরা না পাওয়া গেলেও কৃষকেরা বিব্রত হয় না। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর একজন বিজ্ঞান-সেবীর সহিত আলাপ হইল। ইনি বাতাস হইতে নাইট্রিক য়্যাসিড ও সোরা প্রস্তুত করিবার সস্তা ও সহজ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। এক দিন ইহার ল্যাবরেটরীতে যাইয়া কলগুলি দেখিয়া আসিলাম।

প্রকৃতির দাসত্ব স্বীকার না করিয়া প্রকৃতিকে দাসীতে পরিণত করা বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষকেরা অসাধ্য সাধন করিতেছে। বর্ত্তমান জগতের কৃষিকার্য্য প্রকৃতির খেয়ালের অধীন নয়—প্রাকৃতিক শক্তিগুলি মানবকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মরুভূমিতে সোনাফলান, আঁধার ঘরে চাঁদ ভাসান, বর্ষাকালে আমসত্ব শুকান, কাশী ধামে ভূমিকম্প ঘটান, পশ্চিমে সূর্য্য উঠান—এ সব কার্য্য বর্ত্তমান যুগেই সম্ভব।

শুনিতে পাই, কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞান প্রয়োগ জার্ম্মাণিতে চূড়ান্তরূপেই হইয়া থাকে। জার্ম্মাণ দেশের ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা নয়—অথচ এখানকার কৃষকেরা রুষিয়ার কৃষকগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইতেছে। জার্ম্মাণির ভূমি হইতে সস্তায় বেশী মাল উৎপন্ন হয়—কৃষকগণের লাভও বেশ থাকে। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণিতে পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ৬০ ভাগ বেশী গোধূম উৎপন্ন হইতেছে—অন্যান্য শস্যের উৎপত্তিও প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বাড়িয়াছে। অথচ কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ কিছুই বাড়ান হয় নাই এবং কৃষকদিগের সংখ্যাও পূর্ব্বের মত সমানই রহিয়াছে। এই শস্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ বিজ্ঞানের সাহায্য। বস্তুতঃ ইয়াঙ্কিদের ন্যায় জার্ম্মাণরাও শস্য "Manufacture" করিতেছে বলা যাইতে পারে। জুতা তৈয়ারী, জামা তৈয়ারী, কাপড় তৈয়ারী, টেবিল তৈয়ারী ও গ্লাস তৈয়ারী ইত্যাদি শিল্পের ন্যায় আলু, কপি, বীট-চিনি, গোধূম ইত্যাদি তৈয়ারীও জার্ম্মাণদেশে একটা শিল্পবিশেষ!—ইহাকে কৃষিকার্য্য বলা উচিত নয়। প্রচুর পরিমাণে সার ব্যবহার করিয়া কৃষকেরা সাধারণ ভূমির উপর একটা ইচ্ছানুরূপ কৃত্রিম ভূমি প্রস্তুত করিয়া লয়। এই কৃত্রিম ভূমির রাসায়নিক পদার্থসমূহই উদ্ভিজ্জের আকারে দেখা দেয়। এই জন্য উদ্ভিজ্জসমূহকে প্রাকৃতিক অথবা কৃষিজাত না বলিয়া শিল্পজাত বলা হইল।

লুথার বার্ব্বাঙ্ক ও আধুনিক বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ

বরাহমিহিরের "বৃহৎ সংহিতা" সুপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বকোষস্বরূপ। খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবাসীরা জগৎসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব ও তথ্য জানিত, তাহার অনেক কথাই বরাহমিহির ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঋতু-পরিবর্ত্তন হইতে উদ্ভিদের আকৃতি-পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত কোন বিষয়ই বাদ যায় নাই।

দণ্ডায়মান বৃক্ষকে লতায় রূপান্তরিত করিবার প্রণালী বরাহমিহিরের গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি। অম্লজানযুক্ত ফলের পরিবর্ত্তে মিষ্ট ফল-সৃষ্টির উপায়ও ইনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলের আঁস, আঁটি, খোসা ইত্যাদি বদলাইবার রীতিও বৃহৎ-সংহিতায় আলোচিত হইয়াছে। এই সকল পাঠ করিবার সময় হারুড্ (Harwood) প্রণীত New Creation in Plant-world নামক পুস্তক চোখে পড়ে। তাহাতে ক্যালিফর্ণিয়ার লুথার বার্ব্বাঙ্ক-প্রবর্ত্তিত নানাবিধ অদ্ভুত কৃষিকৌশল বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য আমার কোন ইংরাজী রচনায় বরাহমিহিরকে "The Luther Burbank of Hindu India" রূপে বর্ণনা করিয়াছি। বরাহমিহিরের সঙ্কেতগুলি দেখিলে মনে হইবে, তিনি কতকগুলি নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য ঐন্দ্রজালিকসুলভ প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন। বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা লুথার বার্ব্বাঙ্ককে বাস্তবিকই "Plant-wizard" বা উদ্ভিজ্জগতে যাদুকর বলিয়াই জানেন।

•প্রদর্শনীর Horticulture গৃহে লুথার বার্ব্বাঙ্কের উদ্ভাবিত কতকগুলি নূতন জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল উদ্ভিদ্ জগতে

আপনা-আপনি জন্মিতে পারে না সেইরূপ বহু উদ্ভিদ্ ইনি তৈয়ার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

নূতন নূতন উদ্ভিদ্ সৃষ্টি করা, নূতন ধরণের ফল-ফুল সৃষ্টি করা সকণ্টক উদ্ভিদ্‌কে নিষ্কণ্টক উদ্ভিদে রূপান্তরিত করা, রসের পরিবর্ত্তন করা, বীজের আকার বাড়ান বা কমান—ইত্যাদি কার্য্য প্রথমতঃ অসম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই সকল কার্য্যের জন্য অতি উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য বা দার্শনিকতার আবশ্যক হয় না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ বার্ব্বাঙ্ককে বিজ্ঞান-মহলের অন্যতম ধুরন্ধর বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা ইহাঁর পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়ের প্রশংসা করেন মাত্র। যে কোন কৃষক ও উদ্যান-পালকই, বার্ব্বাঙ্কের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়শীল হইলে, এইরূপ বিস্ময়জনক ফল দেখাইতে পারে। "কলম" করা, বীজনির্ব্বাচন করা ইত্যাদি কার্য্যে অন্য কোনরূপ অসাধারণ মনীষার প্রয়োজন হয় না।

লুথার বার্ব্বাঙ্ক প্রথমে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলু প্রস্তুত করিয়া মার্কিন দেশে প্রসিদ্ধ হন। সে আজ ১২।১৪ বৎসরের কথা। বার্ব্বাঙ্কের নামে সেই আলু আজকাল যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র প্রচলিত। উদ্ভিদ্‌সমূহকে কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই বার্ব্বাঙ্ক সর্ব্বপ্রথমে মনোনিবেশ করেন। এইদিকে কার্য্য করিতে করিতেই নানা বিষয়ে ইহাঁর দৃষ্টি খুলিয়া যায়। আধুনিক বৃক্ষায়ুর্ব্বেদে বার্ব্বাঙ্ককে দ্বিতীয় "চরক"রূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সেদিন ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপকের নিকট সংবাদ পাইলাম—বার্ব্বাঙ্কের গৃহ স্যান্‌ফ্র্যানসিস্কোর অতি সন্নিকটে। প্রায় ৫০ মাইল দূরে "স্যাণ্টা রোজা" বা "গোলাপ-নগর"। সেইখানে বার্ব্বাঙ্কের বাগান ও বাসস্থান।

গোলাপনগরে যাইয়া বার্ব্বাঙ্কের সহিত দেখা করিবার ব্যবস্থা করা গেল। একজন হিন্দু-হিতৈষিণী মার্কিন-রমণীর পত্রে জানিলাম—আজ-কাল স্যাণ্টারোজা নগরে Rose Carnival বা গোলাপ-উৎসব সুরু হইয়াছে। বার্ব্বাঙ্ক তাহাতেই বিশেষরূপে ব্যস্ত আছেন। অধিকন্তু স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর প্রদর্শনী-উপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদা লোকজনের সঙ্গে নানা কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয়। কাজেই দেখা করিবার অবসর না হইতেও পারে। কিন্তু একজন কর্ম্মচারীর সাহায্যে বাগান দেখিবার ব্যবস্থা হওয়া সহজ।

বাগান দেখিবার জন্য রেলে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে চলিলেন স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর বেদান্ত-ভবনের স্বামীজি। একজন ইয়াঙ্কি-রমণীর গৃহে মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। ইনি মার্কিনদেশীয় সম্ভ্রান্তবংশে জাত বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। কথাবার্ত্তায় জানিলাম, ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা ইংরাজের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। এজন্য ইনি "বিপ্লব-ললনা-সমিতি"র (Daughter of the American Revolution) সভ্য। বর্ত্তমান কালেও ইহাঁর আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রকর্ম্মচারী হইয়াছেন। ইহাঁর খুল্লতাত ওহায়ো প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। একটি আঙটি দেখাইয়া রমণী বলিলেন—"আমার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজবংশসম্ভূত ছিলেন। যখন তাঁহারা বিলাতে বাস করিতেন—অর্থাৎ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসিবার পূর্ব্বে—তাঁহাদেরই একজন ফরাসী-সম্রাটের নিকট হইতে এইটি উপহার পান।"

এই মার্কিন-রমণী কিছুকাল হইতে নানাবিধ অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনায় সময় কাটাইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। বিবেকানন্দের বেদান্তব্যাখ্যা, বাহামত, থিয়জফি, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি সকল বিষয়েই

ইঁহার "interest" (শুনিবার ও জানিবার ইচ্ছা) আছে। ইঁহার সঙ্গে আর একজন রমণী ছিলেন। ইনি স্পেনিশবংশে জাত। ক্যালিফর্ণিয়া দেশে স্পেনিশ জাতির বসতিই সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। স্যান্‌ফ্র্যান্‌-সিস্কোর স্যাণ্টা-রোজা ইত্যাদি নগরের নাম স্পেনিশ জাতীয় লোকেরই উদ্ভাবিত। এই রমণীর পূর্ব্বপুরুষগণ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলে আসিয়া প্রথম বাস করেন। সেই সময়ে ক্যালিফর্ণিয়ার সোণার খনি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। তাহার পূর্ব্বে এই প্রদেশে বেশী শ্বেতাঙ্গ নরনারীর বসতি ছিল না। এই রমণী গোলাপ-নগরের থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক—আনি বেসান্তের ভক্ত।

রমণীদ্বয় বার্ব্বাঙ্কের বাগান দেখিবার জন্য আমাদের সঙ্গে চলিলেন। বাগান দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম না। অতি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান—ইহার মধ্যে ছোট-বড় নানা ক্ষেত। এক-একটার ভিতর এক-এক প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। বার্ব্বাঙ্ক গৃহে ছিলেন না। তাঁহার সহকারী বাগানের সকল বিভাগ বুঝাইয়া দিলেন। গ্রন্থপাঠ করিয়া বার্ব্বাঙ্কের কৃষিকৌশল ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদজ্ঞতা যতটা জানিতাম, যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা অপেক্ষা বেশী-কিছু জ্ঞানলাভ করিলাম না।

একটা চেরি বৃক্ষে পাঁচশত চেরি ফল উৎপন্ন করা হইতেছে। একটা নাসপাতি বৃক্ষে একশত পঁচিশ জাতের নাসপাতি উৎপন্ন করা হইতেছে। প্রণালী অতি সরল। কতকগুলি নূতন বৃক্ষ হইতে শাখা আনিয়া মূল বৃক্ষের সঙ্গে কলম করা হয়। কতকগুলি সপুষ্পক চারা গাছ দেখিলাম। প্রদর্শক বলিলেন—"পূর্ব্বে এই সকল উদ্ভিদের ফুলগুলি ডাঁটার একধারে জন্মিত—তাহাতে পুষ্পের শোভা দেখা যাইত না। বার্ব্বাঙ্কের চেষ্টায় ফুল-গুলি ডাঁটার দুইধারে জন্মিতেছে। পূর্ব্বে মাত্র একবর্ণবিশিষ্ট ফুল জন্মিত—বার্ব্বাঙ্কের উদ্ভাবিত চারায় একসঙ্গে নানা রঙের ফুল ফুটিতেছে।"

একস্থানে কতকগুলি ক্যাক্‌টাস্ উদ্ভিদের স্তূপ দেখিলাম। প্রদর্শক বলিলেন—"ঐ দেখুন, বার্ব্বাঙ্কের অদ্ভুত কীর্ত্তি। কাঁটাহীন ক্যাক্‌টাস্ (Caktus) কেহ পূর্ব্বে দেখিয়াছেন কি ? কিন্তু দশ-বার-বৎসর-ব্যাপী অধ্যবসায়ের ফলে বার্ব্বাঙ্ক নিষ্কণ্টক ক্যাকৃটাস্ প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে ক্যাক্‌টাস্ দ্বারা জগতের কোন কার্য্য সাধিত হইত না। এক্ষণে এইগুলি খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। বার্ব্বাঙ্কের বাগান হইতে এই নিষ্কণ্টক ক্যাকৃটাসের চারা দুনিয়ার সর্ব্বত্র রপ্তানি হইতেছে।

বার্ব্বাঙ্কের বিশ্বাস ছিল, ক্যাকৃটাস্ উদ্ভিদের গাত্রে কণ্টকের উৎপত্তি নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী নয়। কাঁটাগুলি এই উদ্ভিদের ধ্বংসসাধনকারী জীবজন্তু হইতে আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বার্ব্বাঙ্ক ক্যাকৃটাস্ সমাজে যৌন-নির্ব্বাচন সুরু করেন। বহুলক্ষ নির্ব্বাচনের পর নিষ্কণ্টক জাতীয় ক্যাক্‌টাসের আবির্ভাব হইয়াছে।

বার্ব্বাঙ্কের বাসগৃহ এই বাগানের সম্মুখেই অবস্থিত। সংবাদ পাইলাম, ব্যবসায়ের জন্য বার্ব্বাঙ্কের অন্যান্য বহু ক্ষেত্র আছে। এখানে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চলে মাত্র। পর্য্যটকগণকে এই বাগান দেখান হয় ; কিন্তু ব্যবসায়-কেন্দ্রগুলি দেখান হয় না। বার্ব্বাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী অনুসারে ব্যবসায় চালাইবার জন্য এক বিরাট কোম্পানী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর নাম The Luther Burbank Society, কোম্পানীর বড় আফিস নিউইয়র্ক নগরে অবস্থিত। বার্ব্বাঙ্কের বৃক্ষায়ুর্ব্বেদতত্ত্ব সম্বন্ধে এই কোম্পানী কতকগুলি সচিত্র গ্রন্থও প্রকাশিত করিয়াছেন।

বার্ব্বাঙ্কের বাগান দেখা হইল। ইয়াঙ্কিরমণী বলিলেন, "চলুন, আপনাদিগকে আমার আবাদ দেখাইয়া আনি। সেখানে এ-দেশের

৬৩০ পৃষ্ঠা
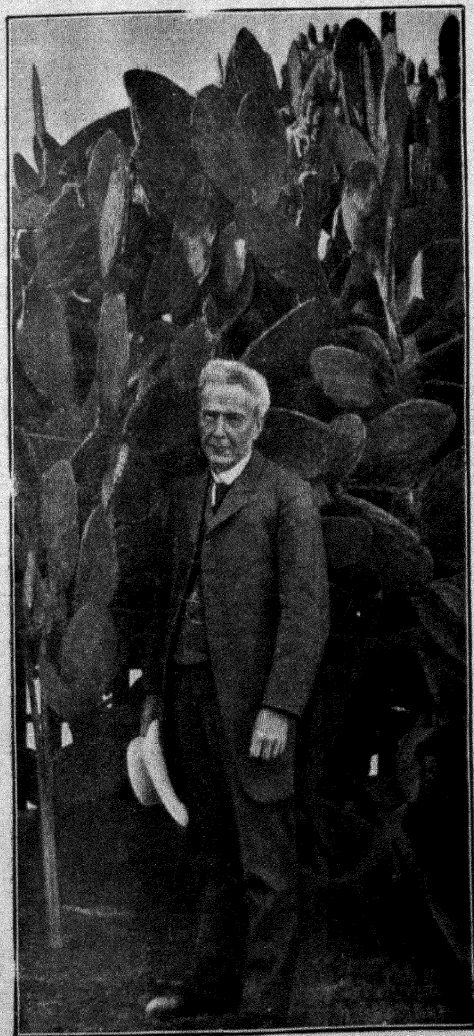
৫২। লুথার বার্ব্বাঙ্ক ও কণ্টকহীন ক্যাকটাস

অনেক কৃষিক্ষেত্র ও ফলের বাগান ইত্যাদি দেখিতে পাইবেন।" ইঁহার মোটরকারে বসিয়া ১০।১২ মাইল যাওয়া গেল। নির্জ্জন পল্লীপথ ও কৃষিভূমির পরিচয় পাইতে পাইতে অগ্রসর হইলাম। রাস্তায় একটা নগর-সদৃশ জনপদ চোখে পড়িল। নাম সেবাষ্টপল। রমণীদ্বয় বলিলেন —"এই অঞ্চল হইতে ইয়োরোপের নানাদেশে নাসপাতি রপ্তানি হয়। এ বৎসর যুদ্ধের জন্য রপ্তানি স্থগিত রহিয়াছে। ফলের বাগানওয়ালাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।"

খানিকক্ষণ সমতল ভূমিতে চলিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর পার্ব্বত্য ভূমিতে উঠিলাম। কোন কোন আবাদে মুরগী পোষা হইতেছে। সর্ব্বত্র ফলের বাগানই দেখিতে পাইতেছি। নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে সঙ্কীর্ণ পথের ভিতর দিয়া মোটর চালাইয়া অবশেষে যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। এই বাগানে কেবল নাশপাতি গাছ। শুনিলাম, এই সকল বাগানে জলসেচন করিতে হয় না। জমি চষিয়া দিতে হয় মাত্র। নাশপাতি গাছগুলিকে ছোট ছোট পেয়ারা গাছের মত দেখায়। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ অংশে এই বাগান অবস্থিত। এইখান হইতে দূরে স্যাণ্টা-রোজা নগর দেখিতে পাইতেছি। ইহার চারিদিকে নানাবিধ ফলের বাগান পাহাড়ের গায়ে সারি দিয়া নামিয়াছে। এই স্তরবিন্যস্ত বাগানগুলি হিমালয় প্রদেশের চা-বাগানের অনুরূপ। এখানকার সমগ্র অঞ্চলই সবুজতৃণপত্রমণ্ডিত। এক্ষণে পুষ্পের শোভা কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু সুশ্রী উদ্যানগুলি দেখিয়া দক্ষিণ ফ্রান্সের সুষমা স্মরণে আসিল।

দুধের ব্যবসায়

একদিন প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রায় বার ঘণ্টা কাটান গেল। চীন, জাপান, ফিলিপাইন, হাওয়াই, শ্যাম, তুরস্ক ইত্যাদি দেশীয় ভবনগুলি দেখিলাম। জাপানী বাগান, চা-গৃহ এবং প্রমোদালয় বিশেষরূপেই উল্লেখযোগ্য। স্যানফ্র্যানসিস্কো নগরের পাড়ায় পাড়ায় জাপানী প্রভাব দেখিতে পাই—প্রদর্শনীতেও জাপানীরা প্রভুত্ব করিতেছে। এখানে মার্কিনদের পরেই জাপানীদের জয়জয়কার দেখিতেছি।

ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েকজন ভারতবাসীর সঙ্গে দেখা হইল। কেহ কেহ পথশ্রান্ত পর্য্যটকগণকে গাড়ীতে বসাইয়া প্রদর্শনী দেখাইতেছে! এই উপায়ে তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জিত হয়। এই ধরণের ভারতীয় যুবক দুইজনমাত্র চোখে পড়িল। দর্শকমণ্ডলীর ভিতর দুইটি ভারতীয় বালিকার সঙ্গে আলাপ হইল। ইহারা আমেরিকাতেই বাস করিতেছে। ইহাদের সঙ্গে একটি অল্পবয়স্ক শিশুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটি কে?" বুঝিলাম—এই দুই ভগ্নী তাহাদের তিন ভাইয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে এখানে লেখাপড়া শিখিবার জন্য আসিয়াছে। এক্ষণে প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল ইহারা গৃহত্যাগী। দিল্লী নগরীর বণিকবংশে ইহাদের জন্ম। গৃহ হইতে কোন সাহায্য না লওয়া ইহাদের উদ্দেশ্য। পাঁচ হাজার টাকা লইয়া দেশ হইতে বাহির হইয়াছিল। অল্পকালের মধ্যে সে অর্থ নিঃশেষ হয়। তাহার পর হইতে বড় ভাইয়েরা দোকানে ও কৃষিক্ষেত্রে মজুরী করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। দৈনিক বেতন ইহারা ছয় টাকা করিয়া পায়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর ধনবিজ্ঞান শিক্ষা

৬০২ পৃষ্ঠা

৫৩। উত্তরাখণ্ডে হিন্দু-রাজার পরিবার
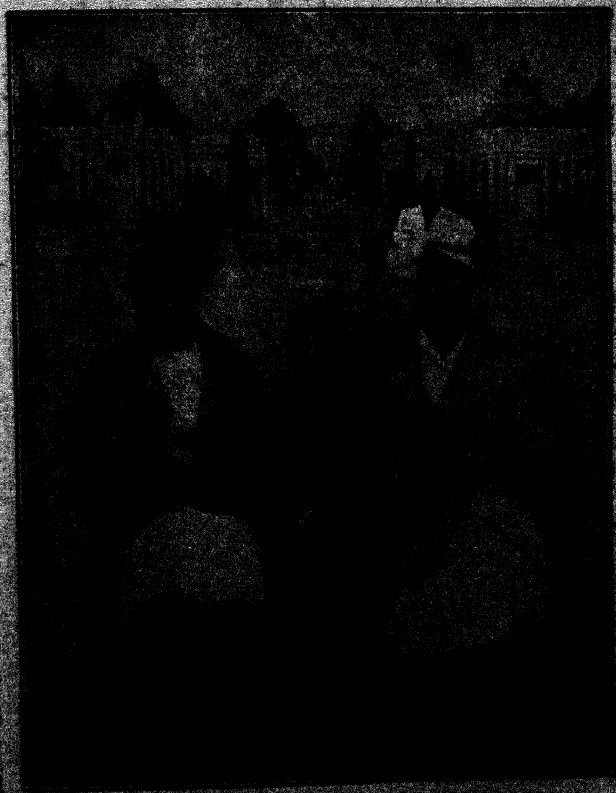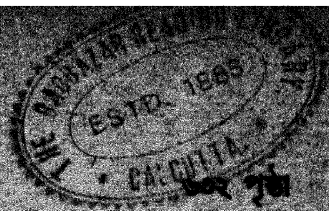
করিতে ছিল —অর্থাভাবে লেখাপড়া সম্প্রতি স্থগিত রহিয়াছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানে না। যখন ইহারা আমেরিকায় পদার্পণ করে তখন এই শিশুর বয়স ৫।৬ বৎসর মাত্র ছিল। কনিষ্ঠা ভগ্নীও হিন্দী কিম্বা উর্দ্দু জানে না। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ইহারা লেখাপড়া শিখিতেছে। উচ্চতম শিক্ষা না পাইয়া কেহই স্বদেশে ফিরিবে না। বালক-বালিকারা ইয়াঙ্কিদের মতই ইংরাজী বলে—ভারত-বর্ষের কোন কথাই জানে না। ইতালীয়, জার্ম্মাণ, পোল ইত্যাদি জাতীয় লোকেরা ইয়াঙ্কিস্থানে আসিয়া যেরূপ হয়, এই ভারতসন্তানগণকেও সেইরূপ বোধ হইল। মোটের উপর ইহাদের উৎসাহ, ভাবুকতা ও অসমসাহসিকতা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। ভারতীয় পুরুষ ও রমণী-গণের মধ্যে এই শ্রেণীর উদ্যম ও হটকারিতা এখনও অতি বিরল—কিন্তু অল্পকালের ভিতরই এই সকল গুণের আবির্ভাব আমাদের সমাজে হওয়া অত্যাবশ্যক।

পশুবিভাগে খানিকক্ষণ কাটাইলাম। ঘোড়া, খচ্চর, গো, বলদ, মেষ, ছাগল, শূকর, কুকুর, বিড়াল, এবং পাখী ইত্যাদি নানাবিধ জন্তু সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল পশু-পক্ষী এখানে বিক্রয় করাও হয়। তাহা ছাড়া, এইগুলি লইয়া নানা প্রকার বাজী খেলিবার বন্দোবস্ত আছে। কোন্ মুরগী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ডিম পাড়ে তাহারও পরীক্ষা চলিতেছে। এই প্রতিযোগিতার নাম "International Egg-laying contest"! অশ্বচালন, ঘোড়দৌড়, পোলো-প্রতিযোগিতা, কুকুরের লড়াই ইত্যাদি নানাবিধ খেলারও ব্যবস্থা আছে।

পশুশালার গাভী ও বলদগুলি একটা দুগ্ধব্যবসায়ী কোম্পানীর সম্পত্তি। এই কোম্পানীর প্রস্তুত দুধ স্যানফ্রানসিস্কোয় আসিয়া অবধি রোজ পান করিতেছি। এইজন্য ইহাদের গোয়াল-ঘরে

কিছুকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। আমরা গোসেবক গোপূজক জাতি, কিন্তু আমাদের গোমাতা ভারতমাতার ন্যায়ই জীর্ণশীর্ণ ও অস্থিকঙ্কাল-সার। মার্কিন দেশের গোখাদক জাতির গোশালা এবং গোধন দেখিবামাত্র আমাদের দুরবস্থা স্মরণ করিলাম। একমণ দেড়-মণ দুধ দেয় এরূপ গাভী এখানে অসংখ্য। অধিকন্তু, গাভীর জাতি-সংস্কার করিবার জন্য ইয়াঙ্কি বৈজ্ঞানিকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। উদ্ভিজ্জগতে বীজের উন্নতি, চারাগাছের উন্নতি, ফলের উন্নতি, ফুলের উন্নতি ক্রমাগত সাধিত হইতেছে। দুই-চারি-দশ বৎসরের ভিতর এক একটা উদ্ভিদের জাতি ও বংশ বদলাইয়া ফেলা হইতেছে। বীজনির্ব্বাচন ইত্যাদির প্রভাবে অতি নিম্নজাতীয় উদ্ভিদসমূহও উচ্চজাতীয় উদ্ভিদে পরিণত হইতেছে। এইরূপ নির্ব্বচন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া পশুপালকেরাও জীব-জগতে নূতন নূতন গুণ-রূপবিশিষ্ট বংশ ও জাতির সৃষ্টি করিতেছে। Breeding বা উদ্ভিদ পালন ও পশুপালন বর্ত্তমান যুগে হাতুড়ের কাজমাত্র নয়—উচ্চ অঙ্গের প্রাণি-বিজ্ঞানের নিয়ম প্রয়োগপূর্ব্বক করিৎকর্ম্মা লোকেরা উদ্ভিদ ও পশুর রূপান্তর ও গুণান্তর সাধন করিয়া থাকে। মানবজগতেও এই ধরণের গুণ-রূপ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের নাম Eagerist বা "বংশোন্নতি সাধক।" যাহা হউক পশুশালায় থাকিতে থাকিতে মার্কিন দেশের Breeding বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। এই বিদ্যা-সম্পর্কিত নানাবিধ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র এবং পুস্তিকাও সংগৃহীত হইয়াছে। কোনটা পক্ষী-সম্বন্ধীয়, কোনটা অশ্ব-সম্বন্ধীয়, কোনটা মুরগী-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি। এই রচনাগুলি খাঁটি বৈজ্ঞানিকের ভাষায় লিখিত নয়—সাধারণ কৃষক, পশুপালক এবং গ্রাম্য লোকেরা যাহাতে বংশোন্নতি, বিদ্যা সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্যই এই ধরণের রচনা প্রকাশিত হয়।

গোশালা দেখিয়া দুধের কারখানায় আসিলাম। এ কয়দিন লক্ষ্য করিতেছি—আধুনিক যুগের কৃষিকর্ম্ম একটা শিল্পবিশেষ। আজ দেখিলাম, আজকালকার গোয়ালাগিরিও কলযন্ত্রনিয়ন্ত্রিত কারবার-বিশেষ। সাধারণ কারখানায় আর দুধের কারখানায় কোন প্রভেদ নাই।

আমরা ভারতবর্ষে "গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধে"র বিজ্ঞাপন দেখিয়া থাকি। এই কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক স্যুইজর্ল্যাণ্ডে প্রস্তুত হয়। যাঁহারা চা-পানের জন্য অথবা শিশুদের জন্য এই দুগ্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—এই দুধের সঙ্গে চিনি এবং অন্যান্য পদার্থও মিশ্রিত আছে। গরম জলের সঙ্গে না মিশাইলে এই দুগ্ধ তরল হয় না। ইহা আঠাল, দেখিলে দুধ মনে হয় না। ইহার স্বাদও খাঁটি দুধ হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। কিন্তু মার্কিন দেশে কৌটায় বন্ধ করা একপ্রকার দুধ পান করিতেছি, তাহাতে দুগ্ধ ছাড়া আর কোন জিনিষ নাই—ইহার রং ও স্বাদ সবই খাঁটি গোদুগ্ধের মত। বস্তুতঃ গাভীর দুধ হইতে জল শুকাইয়া ফেলিলে দুধের যে অবস্থা হয়, এই দুধ সেই ধরণের। অথচ আগুনে জ্বাল দেওয়া ঘন দুধ, ক্ষীর বা রাবড়িও ইহাকে বলা উচিত নয়। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আসিয়া দুধের জল Evaporate বা শুকাইয়া ফেলিবার প্রণালী দেখিয়া লইলাম।

এই গৃহের কর্ত্তা যন্ত্রগুলির কার্য্য বুঝাইয়া দিলেন। যন্ত্রগুলি বিশেষ জটিল বোধ হইল না। আবার সেই ম্যাঞ্চেষ্টারের বিস্কুট-ফ্যাক্টরীর কথা মনে হইল। মাত্র ১৪।১৫টা স্বতন্ত্র কল। ইহাদের প্রথমটাতে গো-দুগ্ধ ঢালা হইতেছে—এখান হইতে আপনা-আপনিই দুধ পরবর্ত্তী কলে চালান হইতেছে। দুগ্ধ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন কলের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে অবশেষে বাজারে রাখিবার উপযোগী

কৌটা-বন্দী হইয়া পড়ে। এইরূপে হাজার হাজার কৌটা প্রতিদিন বাহির হইতেছে।

কলগুলির সাহায্যে দুগ্ধ সম্পূর্ণরূপেই নির্জ্জলা হইয়া যায়। কৌটাগুলিকেও তাড়িতের দ্বারা বিশেষরূপে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। কাজেই দুধের মধ্যে কোন প্রকার 'ব্যাসিলাই' বা স্বাস্থ্যহানিকর পদার্থ আসিতে পারে না। শত শত সহস্র সহস্র মাইল দূরেও এই সমুদয় দুগ্ধভরা কৌটা চালান দেওয়া চলে। বহুকাল পরে ব্যবহার করিলেও দুধের কোন দোষ দেখা যায় না। ভারতবর্ষে আমরা এখনও মামুলি প্রথায় দুধ দোহাইয়া থাকি—তাই এবেলার দুধ ওবেলা পর্য্যন্ত থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই বর্ত্তমান যুগের দুগ্ধ-ব্যবসায় আমাদের পক্ষে বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। আজকালকার কৃষকের ন্যায় গেয়ালারাও বস্তুতঃই শিল্পী ও কারিগর বা Manufacturer। ইহারা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় অসম্ভবও সম্ভব করিতেছে।

ছোট কৌটায় প্রায় এক পোয়া দুধ থাকে—মূল্য দশ পয়সা। দুধ এত ঘন যে জলের সঙ্গে না মিশাইয়া পান করা চলে না। অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুধ মিশাইয়া এক পেয়ালা পান করিলাম। মূল্য দিতে হইল না। কলিকাতায় পাঁচ আনা সেরের দুধ জ্বাল দিলে যেরূপ স্বাদ হয়, এই জলমিশ্রিত দুধের স্বাদ সেইরূপ মনে হইল। সুতরাং মার্কিনেরা অতি সস্তা দরেই দুধ Manufacture করিতেছে না কি? হায়, অল্পকালের ভিতরেই ইয়াঙ্কিরা ভারতের গোপজাতিকেও যে ব্যবসায়হীন করিয়া ফেলিবে দেখিতেছি। তবুও কি আমরা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য কিছু করিব না?

মার্কিনের জাপানী "ম্লেচ্ছ"

ইয়োরোপ ও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ জাতিপুঞ্জ এসিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ ব্যবসায়, শিল্প ও কার্য্য দখল করিয়া বসিয়াছেন। সমগ্র প্রাচ্য জনপদে শেতাঙ্গেরা মুখ্য ও গৌণ ভাবে প্রভুত্ব করিতেছেন। White peril বা "শ্বেতাঙ্গ-বিভীষিকা" একটা কল্পনামাত্র নয়। এসিয়া ও আফ্রিকার জনগণ ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া থাকে।

আজকাল ইয়োরোপে ও আমেরিকায় ঠিক একটা উন্টা সুরের কথা শুনা যায়। প্রতীচ্য জনপদের শ্বেতাঙ্গেরা কেহ কৃষ্ণাঙ্গ-বিভীষিকা দেখিতেছে, কেহ পীতাঙ্গ-বিভীষিকা দেখিতেছে, কেহ মুসলমান-বিভীষিকা দেখিতেছে! শ্বেতাঙ্গদিগের পরস্পরের ভিতরেও আবার এইরূপ বিভীষিকা দেখার বৈচিত্র্য আছে! ইয়াঙ্কিস্থানের শ্বেতাঙ্গেরা ইয়োরোপের শ্বেতাঙ্গসমাজকে দূরে রাখিতে চাহে। ইহাদের এই শ্বেতাঙ্গ-বিভীষিকার সূত্র মনুরোনীতি (Monroe Doctrine)। মার্কিন-দেশীয় লোকের দ্বিতীয় বিভীষিকার নাম Yellow peril বা পীতাঙ্গ-বিভীষিকা। পীতাঙ্গ জাপানের ক্রমিক উন্নতি দেখিয়া আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। জাপানীদের অভ্যুদয়ে চীনের পীত-জাতি এবং সমগ্র এসিয়ার লোক-সমাজ ক্রমেই নবভাবে অনু-প্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। কাজেই জাপানের উন্নতিতে বাধা দেওয়া মার্কিনের বিশেষ লক্ষ্য। ১৯১৩ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের "রেপ্রেজেণ্টেটিভ" গৃহে একজন সভ্য, ইয়াঙ্কিস্থানের পীতাঙ্গ-বিভীষিকা প্রচার করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিকট কল্পনা শ্বেতাঙ্গ-সমাজের মহলে মহলে সুপ্রচলিত। বিশেষতঃ ইয়াঙ্কিদের ভিতর ইহা একপ্রকার বদ্ধমূল। ইয়াঙ্কিসমাজে ইয়োরোপ-বিভীষিকা যতটা আছে তাহার অপেক্ষা এসিয়া-বিভীষিকা অনেক বেশী। পীতাঙ্গ-বিভীষিকা, প্রাচ্য-বিভীষিকা ইত্যাদি শব্দে ইহারা মোটের উপর জগতে এসিয়ার প্রভুত্ব বিস্তার বুঝিয়া থাকে। এই প্রভুত্ব বিস্তারে জাপানীরাই পথ-প্রবর্ত্তক—জাপানকে নবীন এসিয়া তাহার জন্মদাতা ও দীক্ষাগুরু বলিয়া বিবেচনা করে। এই কারণে জাপানের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতই মার্কিণ দেশে প্রাচ্য বিভীষিকার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সোজাসুজি জাপানী-বিভীষিকা বলিলেই ইয়াঙ্কদের মনের কথা যথাযথ বিবৃত হয়।

ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে আসিয়া দেখিতেছি—জাপানীদের প্রভাব মার্কিন দেশে নিতান্ত নগণ্য নয়। রেলে, দোকানে, বাজারে, রাস্তায়, হোটেলে, প্রদর্শনীতে সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই জাপানীরা ঘর জুড়িয়া বসিয়াছে। বিশ্ব-মেলার যে-কোন সৌধে প্রবেশ করিলেই জাপানের কীর্ত্তি দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া, জাপানী বাগান, জাপানী হোটেল, জাপানী কুস্তী-কছ্‌রত, জাপানী নাচ-গান-বাজনা, জাপানী যাদু ইত্যাদি প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের বিশেষ অঙ্গস্বরূপ। স্যান্‌ফ্র্যানসিস্কো সহরের বড় বড় মহাল্লার আগাগোড়া সবই জাপানী লোকজনে পরিপূর্ণ। জাপানী দোকান হোটেলের বিজ্ঞাপনপত্র এবং নাম ও বিবরণ জাপানী ভাষাতেই প্রচারিত হইয়া থাকে। জাপানী ব্যবসাদারেরা প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের নানারূপ সচিত্র পোষ্টকার্ড এবং চিত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে। এইগুলিতে ইংরাজী বিবরণের সঙ্গেসঙ্গে জাপানী বিবরণ দেওয়া আছে। ফলতঃ বুঝিতে পারিতেছি যে, মার্কিণের জাপানী সমস্যা সত্যসত্যই গুরুতর।

ভারতবাসীরা যাহাদিগকে পছন্দ করে না তাহাদিগকে "ম্লেচ্ছ"
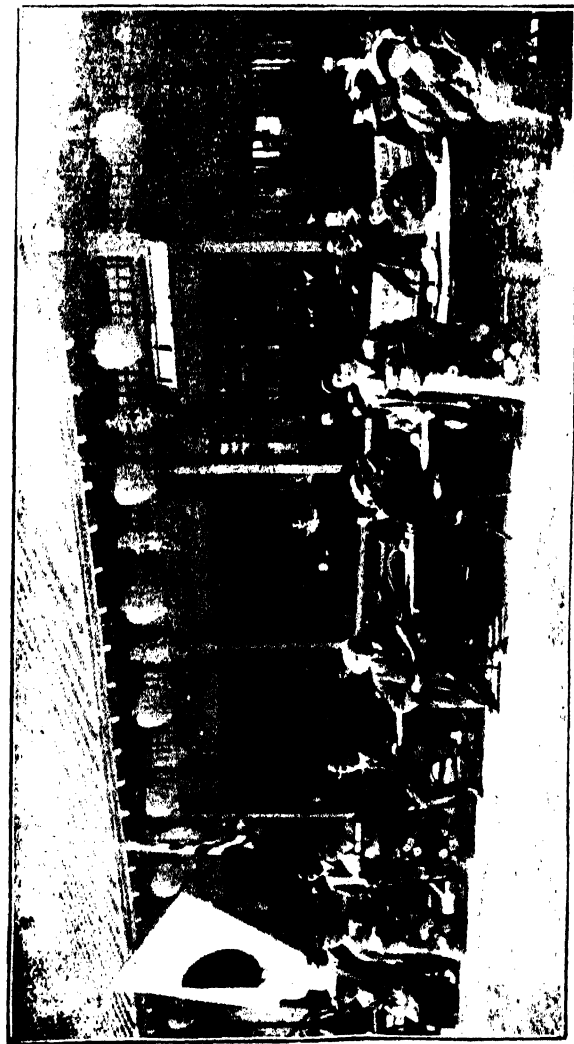
৫৪। জাপানী চা-গৃহ

বলিয়া থাকে। বর্জ্জনীয়, বহিস্কারযোগ্য সকল বস্তুই হিন্দু সমাজে ম্লেচ্ছ নামে পরিচিত। বর্জ্জনের কারণ যাহাই হউক না, ম্লেচ্ছ জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও ধর্ম্মনীতি সমস্তই অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। খৃষ্টানেরাও এইরূপ অখৃষ্টানদিগকে "হীদেন"। (heathen) বলিয়াছে। ইহাদের বিবেচনায় হিদেনেরা, দুশ্চরিত্র, বুদ্ধিহীন, নীতিহীন, ধর্ম্মহীন ও অসভ্য। আজকাল Asiatic বা "এসিয়াবাসী" শব্দটা ইয়োরোপীয় ও আমেরিকানদিগের নিকট "হিদেন" শব্দেরই নামান্তররূপে ব্যবহৃত হয়। ম্লেচ্ছ বলিলে হিন্দুরা যাহা বুঝে, কাফের বলিলে মুসলমানেরা যাহা বুঝে, "এসিয়াটিক" বলিলে প্রাচ্য-জগতের খৃষ্টান শ্বেতাঙ্গেরা ঠিক সেইরূপ বুঝে। অভিধানের ভিতর যতগুলি অকথ্য গালাগালি থাকিতে পারে, "এসিয়াটিক" শব্দে বর্ত্তমান যুগে ঠিক তাহা বুঝায়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে চীনাদিগকে ইয়াঙ্কিস্থান হইতে ম্লেচ্ছজ্ঞানে বহিষ্কার করিবার আইন প্রস্তাবিত হয়। সেই উপলক্ষে যুক্ত-দরবারের সভায় একজন সেনেটার বক্তৃতা করেন। তাহাতে "এসিয়াবাসী" শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি।

ম্লেচ্ছ চীনা, ম্লেচ্ছ জাপানী, ম্লেচ্ছ হিন্দুস্থানী সকলকেই ইয়াঙ্কিস্থান হইতে বহিষ্কার করা আবশ্যক। ইহা মার্কিন দেশের দ্বিতীয় মনরো-নীতি

চীনেরা বিরাট প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া বিদেশীয়গণকে স্বদেশের বাহিরে রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ম্লেচ্ছদেশের সঙ্গে ভারতবাসীর আদান-প্রদান অবরুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। ইয়াঙ্কিরাও এইরূপ বিদেশীয় বর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। দুনিয়ার প্রত্যেক দেশেই একটা করিয়া "চীনের প্রাচীর" দেখা যায়। সকল জাতিই প্রায় একই ধরণের যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিদেশীয়গণের

সঙ্গে স্বদেশীয় লোকজনের সংশ্রব বন্ধ করিতে চাহে। আজকাল ইয়াঙ্কিরা যে সকল যুক্তি দেখাইতেছে, প্রাচীন কালে চীনারা সেই যুক্তিই দেখাইত, মধ্য যুগে হিন্দুরাও ঠিক সেই যুক্তিই দেখাইত।

ইয়াঙ্কি-মতে জাপানীরা ধর্ম্মজ্ঞানহীন দুশ্চরিত্র জাতি। ইহাদের সমাজে পারিবারিক বন্ধন অতিশয় শিথিল। ইহাদের কথার কোন মূল্য নাই। ইহাদের সঙ্গে লেন-দেন করা বড় কঠিন।

জাপানী-সমাজে নাকি বারবনিতার সংখ্যা অতিশয় অধিক। জুয়া-খেলায় আসক্তিও জাপানীদের একটা বিশেষ দোষ।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আজকাল প্রায় ৭৫,০০০ হাজার জাপানী বাস করে। ইহাদের অধিকাংশই ক্যালিফর্ণিয়ার অধিবাসী। জাপানী ছাত্র, অধ্যাপক, পর্য্যটক, প্রচারক, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ইত্যাদি লোকের সংখ্যা বেশী নয়। ক্যালিফর্ণিয়ার শতকরা প্রায় ৯৫ জন জাপানী হয় কৃষক, না-হয় মজুর, না-হয় দাস-দাসী। এইখানেই ইয়াঙ্কিদের সঙ্গে জাপানীর বিশেষ বিরোধ।

মার্কিনের নরনারীগণ বলে যে, জাপানীরা নিতান্ত অল্পবেতনে কর্ম্ম-গ্রহণ করে। ইহারা অনাহার সহ্য করিয়াও কর্ম্ম করিতে পারে। দিনের ভিতর বহু ঘণ্টা খাটিবার জন্য ইহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এই সকল কারণে শ্বেতাঙ্গেরা ইহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে অপারগ। তাহার ফলে আমেরিকার লোক-জনের আর্থিক অবস্থা হীন হইবার সম্ভাবনা এবং বৈষয়িক ও সাংসারিক আদর্শেরও অবনতি ঘটিতে বাধ্য। ইহা নিবারণ করিবার জন্য জাপানী বহিষ্কার-নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক।

জাপানীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা জানে না বলিয়া একটা অপবাদ মার্কিন-সমাজে রটিয়াছে। ইহারা একবার যে গৃহে বাস করে সেই

গৃহে ভবিষ্যতে কোন শ্বেতাঙ্গ আসিতে চাহে না। এমন-কি সেই মহাল্লা হইতেও শ্বেতাঙ্গেরা সরিয়া পড়ে। কালে পাড়াটা খাঁটি জাপানী-টোলায় পরিণত হয়। ইহা আমেরিকার পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

জাপানী কৃষকদিগের একটা দোষ সর্ব্বত্র প্রচারিত। ইহারা নাকি ভূমি-কর্ষণ সম্বন্ধে প্রথম প্রথম বড় অমনোযোগী থাকে। তাহার ফলে ভূমির উৎপাদনী শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় শ্বেতাঙ্গ মালিকেরা ভূমি বেচিয়া ফেলে। তখন জাপানীরা ইহা ক্রয় করিয়া লয় এবং মনোযোগের সহিত ভূমির উন্নতিবিধান করে!

ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশের রাষ্ট্রকেন্দ্র স্যাক্রামেণ্টো নগরে। ইহার অতি সন্নিকটে ফ্লোরিণ নগর। কৃষিকার্য্যের জন্য এই অঞ্চল সুবিখ্যাত। এখানে জাপানীদের সংখ্যাও খুব বেশী। জাপানী-বিদ্বেষও এই অঞ্চলে অতি ঘোরতর আকারে দেখা দিয়াছে।

পরজাতি-বিদ্বেষ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিবার জন্য ইয়াঙ্কিস্থানের ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে আসা আবশ্যক। ইয়াঙ্কিদের নিগ্রোবিদ্বেষও বোধ হয় এতটা তীব্র নয়।

বিদেশে "আর্য্যসমাজ"

গুজরাতের স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত "আর্য্যসমাজ" ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এই "সমাজের" আদর্শ অনুসারে ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজসংস্কার পঞ্চনদেই বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হয়। ইঁহাদের প্রভাব যুক্তপ্রদেশেও বিস্তৃত হইতেছে। বাঙ্গালী, মারাঠা ও মান্দ্রাজী শিক্ষিত জনগণ ইঁহাদের কার্য্য-প্রণালী অবগত আছেন। আর্য্যসমাজের "গুরুকুল", য়্যাংগ্লো-বৈদিক কলেজ, বালিকাবিদ্যালয়, "শুদ্ধি"-বিধান, হিন্দী-প্রচার ইত্যাদি সম্বন্ধে ভারতবাসীর নিকট নূতন পরিচয় দিতে হয় না। ইঁহাদের কার্য্য-বিবরণ বাঙ্গালা, মারাঠি ইত্যাদি সকল প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। Modern Review, Indian Review, Vedic Magazine ইত্যাদি ইংরাজী মাসিক পত্রেও আর্য্যসমাজের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুই-এক জন ইংরাজ এবং ইয়াঙ্কি পর্য্যটক আর্য্যসমাজের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজ-কালকার দিনে বিদেশীর মুখে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতে থাকিলে দেশীয় সমাজের শীঘ্রই প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। আর্য্যসমাজও সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ কয়েকজন বিদেশী বন্ধু পাইয়াছেন।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা কেন্দ্রে বিবেকানন্দ-পন্থী "স্বামী"রা বেদান্তভবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দয়ানন্দপন্থীরা এখনও ভারতবর্ষের বাহিরে কোন কেন্দ্র স্থাপন করিতে অগ্রসর হন নাই বোধ হইল। যুক্ত-প্রদেশে স্বামী রামতীর্থের ভক্তসংখ্যা এক্ষণে অতি অল্প মাত্র। ভারত-বর্ষেই এখনও তাঁহার কীর্ত্তি সুপ্রচারিত হয় নাই। অল্প দিন হইল ৺লালা বৈজনাথ রায় বাহাদুরের উদ্যোগে হরিদ্বারে "রামাশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে।

ইহাই রামতীর্থ-পন্থীদিগের একমাত্র কেন্দ্র। বিদেশে ইহাঁদের অভিযান সুরু হইতে দেরী আছে।

লণ্ডনে থাকিতে দেখিয়াছিলাম, আর্য্যসমাজপন্থীরা একটা ধর্ম্ম-মন্দিরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে ইহাঁদের নিয়মিত রূপে যাওয়া-আসা আছে। অন্যান্য মতাবলম্বী ভারতীয় ছাত্রেরা, পর্য্যটক এবং ব্যবসায়ীগণও এই মন্দিরের উপাসনা-কার্য্যে যোগদান করিতেন। ইংলণ্ড-প্রবাসী আর্য্য-সমাজ-পন্থীদিগের উদ্যোগে অন্যান্য ভারতীয় উৎসবও বিলাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দয়ানন্দের জন্মতিথি, গুরুকুলপ্রতিষ্ঠা, য্যাংগ্লোবৈদিক কলেজ স্থাপন ইত্যাদি উপলক্ষে সভাসমিতি আহ্বান করা অথবা ভোজপানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল উৎসবে বিলাতের অধ্যাপক, পার্লামেণ্টসভ্য, সম্পাদক প্রভৃতিও যোগদান করেন। এই উপায়ে বিলাতী শিক্ষিত সমাজে আর্য্যসমাজের নাম প্রবেশ করিতেছে।

আমেরিকায় আসিয়া দেখি, কাশীর "নবজীবন"-সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবদেব শাস্ত্রী মহাশয় বৎসরকালাবধি ইয়াঙ্কিস্থানে নানাপ্রকার বক্তৃতা করিতেছেন। কেশবদেব আর্য্যসমাজের একজন করিৎকর্ম্মা প্রচারক। ইনি পঞ্চনদের শেষ প্রান্ত হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সকল প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং পাঞ্জাবী—ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বাস করেন কাশীতে—এবং বহু বাঙ্গালী কেজোলোকের সঙ্গে ইহাঁর বন্ধুত্ব আছে। কাজেই মার্কিনদেশে ইনি ভারতবর্ষের অনেক কথা প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। খৃষ্টান পাদ্রীরা সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের এবং বিশেষভাবে আর্য্যসমাজের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এইজন্য আর্য্যসমাজের সঙ্গে পাদ্রী মহাশয়গণের ঝগড়া লাগিয়াই আছে। আমেরিকায়ও কেশবদেবকে পাদ্রীগণের সঙ্গে যথেষ্ট বাক্‌যুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

বিলাতে এবং ইয়াঙ্কিস্থানে পাদ্রীরা ভারতবর্ষসম্বন্ধে মাঝে মাঝে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রধানত এইরূপ :—"ভারতবর্ষের নরনারীগণ অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য; ইহাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই—পারিবারিক জীবন অতিশয় নীতিহীন; জীবনের সকল কার্য্যে কুসংস্কারের আবরণ আছে। একমাত্র খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের ফলে ইহাদের যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি হইতেছে। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে ভারতবাসীরা মানুষ হইবে না। আমরা অশেষ স্বার্থত্যাগ করিয়া এই অধর্ম্ম ও কুধর্ম্মের দেশে বিদ্যা, নীতি ও ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছি। আপনারা যদি প্রকৃত খৃষ্টান হন, তাহা হইলে আমাদিগকে লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন।" এইরূপ বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রী-মহাশয়গণ ভারতবর্ষের নানাপ্রকার কুৎসিত চিত্র দেখাইয়া থাকেন। ইহাদের কোন-কোনটা হয়ত সত্য, কোন-কোনটা হয়ত কাল্পনিক। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া শ্রোতারা দয়ার্দ্র হইয়া পড়ে—যাহার নিকট টাকা-পয়সা আছে সে তাহা দিয়া পাদ্রীসমাজের সাহায্য করে। এই কারণে ভারতবর্ষের নীতিহীনতা, ধর্ম্মহীনতা, অসভ্যতা ইত্যাদির কাহিনী প্রচার করা পাদ্রীদিগের একটা ব্যবসায়বিশেষ! ভারতবর্ষের লোকেরা উচ্চশিক্ষিত, সচ্চরিত্র কিম্বা ধার্ম্মিক, এ-কথা সপ্রমাণ হইলে ইয়াঙ্কিরা অথবা ইয়োরোপীয়েরা পাদ্রী-প্রচারকগণকে সাহায্য করিবে কেন?

এইজন্যই দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের কোন লোক বিদেশে কোন তত্ত্ব প্রচারকরিতে আসিলেই, পাদ্রীরা প্রথম হইতেই তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। এইরূপ বাধা না দিলে যে তাঁহাদের "ভাত মারা" যাইবে! বিবেকানন্দ-পন্থীরা এ-কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেন। পাদ্রীরা যে কেবলমাত্র ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রতিকূল, তাহা নয়। সেদিন আইওয়া

নগরে ঐতিহাসিক শ্যামবগের কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সুধীন্দ্র নাথ বসুকে অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত করার বিরুদ্ধে পাদ্রী মহাত্মারাই অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারা রাষ্ট্রের নায়কগণকে লিখিয়া পাঠান, "যদি একজন হিন্দু আমাদের খৃষ্টানসমাজের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে পুত্রগণকে শিক্ষা দিবার ভার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে আমাদের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে। ভারতীয় হিন্দুরা আমাদিগকে আর ভয় ও সম্মান করিবে না। দেশীয় ইয়াঙ্কিরাও বুঝিবে, যে ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত লোক ইয়াঙ্কিস্থানে অধ্যাপক হইতে পারে, সেই ভারতবর্ষে আমাদের প্রচার-কার্য্য অনাবশ্যক। সুতরাং আমরা স্বদেশে অর্থসাহায্য পাইব না।"

কেশবদেব ইয়াঙ্কিস্থানের কতিপয় নগরে বক্তৃতা দিয়াছেন। দু-একখানা পুস্তকও ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশের কোন কলেজে উচ্চ অঙ্গের চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন। ইহা ব্যতীত আমেরিকার হিন্দুস্থান পরিষদের কার্য্যে ভারতীয় ছাত্রগণকে ইনি সাহায্য করিতেছেন—বর্ত্তমানে ইহাঁকে পরিষদের সভাপতির পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এবারকার বিশ্বমেলায় যাহাতে ভারতীয় দ্রব্য-নিচয় প্রদর্শিত হয় তাহার জন্য কেশবদেব কয়েক মাস যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। নানা কারণে শ্রম বিফল হইয়াছে। প্রদর্শনীতে ভারতের কথা প্রচারিত হইতে পারিল না। কিন্তু আগামী আগষ্ট মাসে "বিশ্ব-হিন্দুস্থানীপরিষদে"র সম্মিলন (International Hindusthanee Student's Convention) আহূত হইবে। সেই সময়ে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো-নগরে নানা সভা-সমিতি-সম্মিলন ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইবার কথা। তখন যাহাতে ভারতের কথা সুপ্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। কেশব-দেবের উৎসাহ এবং ভারতীয় ছাত্রগণের উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

কয়েকদিন হইল, "আর্য্যসমাজ" সম্বন্ধে একখানি সুলিখিত ইংরাজী গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহা বিলাতের লংম্যান্‌স্ গ্রীণ কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত। লেখক শ্রীযুক্ত লাজপত রায়। ইনি বিলাতে এবং আমেরিকায় পর্য্যটন ও বক্তৃতা করিতে আসিয়াছেন। লাজপত রায়ের নাম বিলাতের অনেক মহলেই পরিচিত ছিল—ইয়াঙ্কিস্থানেও এইবার ইনি পরিচিত হইলেন। কোথাও বৈদিকধর্ম্ম, কোথাও হিন্দুর নীতিজ্ঞান, কোথাও আর্য্যসমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজে বক্তৃতা করিবার সুযোগও ইঁহার জুটিয়াছিল। কতিপয় অধ্যাপক ইঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া বুঝা গেল। ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের প্রতি বিদেশীয় শিক্ষিত জনগণের শ্রদ্ধা-অনুরাগ যত বৃদ্ধি পায় ততই আমাদের মঙ্গল। এই সকল দেশের কাগজপত্রে কোন ব্যক্তির চিত্র প্রকাশিত হওয়া অতিশয় মামুলি কথা। সুতরাং কেশবদেব ও লাজপত রায় প্রভৃতির ফটোগ্রাফও বিভিন্ন দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণও মাঝে মাঝে মন্তব্যপ্রকাশ করিয়াছেন। এই উপায়েই বর্ত্তমান যুগে কার্য্যপ্রচার ও মতপ্রচার ইত্যাদি হইয়া থাকে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের এবং দুনিয়ার সকল ব্যক্তিই এইরূপে প্রচারিত হইয়াছেন। দুঃখের কথা—অধিকসংখ্যক ভারতীয় নরনারী দুনিয়ার বাজারে প্রচারিত হইতেছেন না। জগতে ভারতবর্ষের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক লাগিয়া যাউন। সহস্র সহস্র ভারতবাসীর চিত্র বিলাতী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশ, ইয়াঙ্কি, মেক্সিকান, ব্রেজিলিয়ান, চীনা ও জাপানী পত্রসমূহে প্রকাশিত হউক। দুনিয়ার রিপোর্টারগণ সহস্র সহস্র ভারতবাসীর মত ও কার্য্যের আলোচনা নানাপত্রে প্রকাশিত করিবার সুযোগ লাভ করুন।
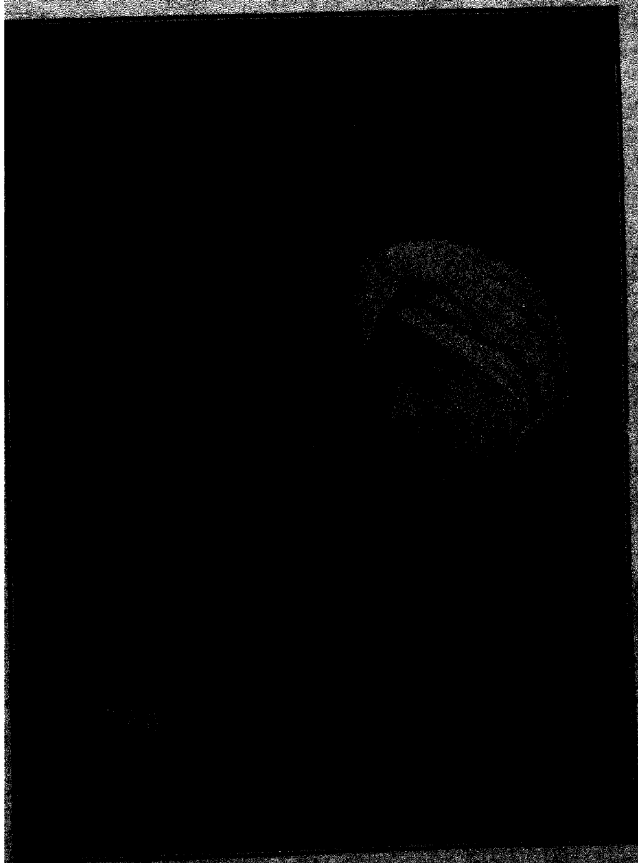
লাজপত রায়ের গ্রন্থ সচিত্র। এই গ্রন্থে বর্ণিত সকল তথ্য এবং চিত্রগুলি ভারতবাসীর সুপরিচিত। গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক সিড্‌নি ওয়েব।

সিড্‌নি ওয়েব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি এই ভূমিকায় তাঁহার নিজচোখে দেখা নানা বিষয়ের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'নবীন ভারতে'র উত্থান হয়। তাহার পর হইতে নানাদেশীয় বিলাতী পর্য্যটকগণ ভারতীয় নবযুগের চাক্ষুষ পরিচয় পাইবার জন্য ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে নেভিন্সন তাঁহার The New Spirit in India গ্রন্থে, র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড তাঁহার The Awakening of India গ্রন্থে এবং পাদ্রী য়্যাণ্ডস্‌ তাঁহার The Indian Renaissance গ্রন্থে আর্য্যসমাজের প্রশংসা করিয়াছেন। একমাত্র চিরল, তাঁহার The Unrest in India গ্রন্থে আর্য্যসমাজের সঙ্গেসঙ্গে 'নবীন ভারতে'র সকল প্রতিষ্ঠানকেই তিরস্কার করিয়াছেন।

লাজপত রায়ের ন্যায় বিচক্ষণ অন্যান্য লেখকগণের দ্বারা বর্ত্তমান ভারতের অনেক তথ্য ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান ও জাপানী ভাষায় প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। অবিলম্বে তাহা আরব্ধ হইবে বলিয়াও বিশ্বাস হইতেছে। বিদেশে অতীত ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, চিত্র, সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদির প্রচার কিছুকাল হইতে চলিতেছে। কিন্তু 'নবীন ভারতে'র কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর এবং অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনসমূহ এখনও জগতে প্রচারিত হয় নাই। লাজপত রায়ের গ্রন্থ 'নবীন ভারতে'র প্রচারকল্পে পথপ্রদর্শক।

লাজপত রায়ের গ্রন্থ দেখিয়া আর এক কথা মনে হইল। রাণাডে এবং রমেশচন্দ্র দত্তের পর আর কোন প্রবীন নেতৃস্থানীয় ভারত-সন্তান ভারতসম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ-রচনায় বিশেষভাবে অগ্রসর হন নাই।

লাজপত রায় তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া অনেকের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট করিলেন।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রবন্ধুগণ সকলেই সুলেখক। এমন-কি, সেনাপতি এবং অর্ণবযানাধ্যক্ষগণও তাঁহাদের বক্তৃতা মাসিকপত্র ও গ্রন্থাদিতে প্রচার করিয়া থাকেন। উড্রো উইলসন, মর্লে, বার্ণাড্‌ি ইত্যাদির নাম লেখক-মহলে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের জননায়কগণ প্রধানত বক্তৃতা দান করিয়া থাকেন। বক্তৃতাগুলি দৈবক্রমে দোকান-দারগণের খেয়ালমত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এমন-কি, গোখ্‌লে৭ বীজগণিত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন নাই। এই অবস্থায় লাজপত রায়ের দৃষ্টান্তে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। শুনিতেছি সুবক্তা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার ভারতীয় মহাসমিতি কংগ্রেসের ইতিহাস-প্রণয়ণে নিযুক্ত আছেন। অতএব বলিতে হইবে যে, দেশে অল্প অল্প সুবাতাস বহিয়াছে।

---

৬৪৮ পৃষ্ঠা

৫৩। আঙুরের ক্ষেতে হিন্দুস্থানী কৃষক
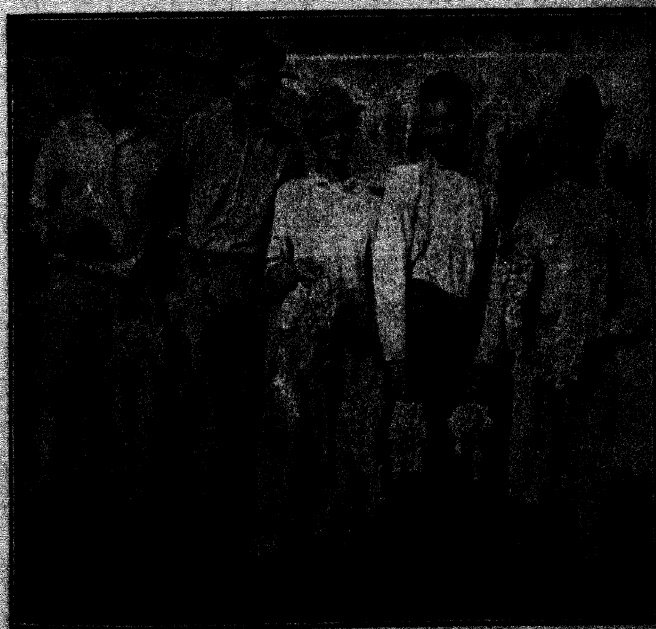
আমেরিকায় ভারতীয় শ্রমজীবী

ইয়াঙ্কিস্থানের মজুরেরা উচ্চহারে মজুরী পায়। মাসিক ৫০।৬০৲ টাকার কম মজুরী এ দেশে নাই বলিলেই চলে। চাকর, দ্বারবান, গাড়োওয়ান, কুলী, কৃষক ও কারখানার মজুর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীই স্বচ্ছলভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে। এই জন্য দুনিয়ার মজুরেরা আমেরিকায় আসিতে চাহে।

ক্যালিফর্ণিয়া অঞ্চলে শুনিতে পাই, বহুসংখ্যক ভারতীয় শ্রমজীবী কার্য্য করিতেছে। ইহাদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী। ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্তসাগরোপকূলে প্রায় ১২০০০ ভারতবাসী মজুরী করিয়া থাকে। নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহার ফলে ভারত-সন্তানগণ আর এদেশে আসিতে পারিবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি, জামেকা, ট্রিনিড্যাড, গায়েনা ইত্যাদি ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহে ভারতীয় শ্রমজীবীরা খাঁটি গোলামের সমান। তাহারা "দাস-খত" লিখিয়া ঐ সকল দেশে যায়। তাহাদের সম্বন্ধে কবির কথা বর্ণে বর্ণে সত্য—

> "নির্ব্বিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাঠিদের অত্যাচারে
> স্থান হারায়ে মান হারায়ে প্রবাসী আজ সাগর-পারে,
> কেউ বা করে দিন-মজুরী কেউ বা ক্ষুদ্র দোকানদার।"

এইরূপ চুক্তিবদ্ধ মজুর (Indentured Labourer) ইয়াঙ্কিস্থানে আসিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র এই ধরণের চুক্তির বিরোধী। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল লোক এদেশে আসিয়াছে তাহারা সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভাবে বুঝিয়াই আসিয়াছে।

একজনকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, আমেরিকায় ভারতবাসী আসিতে আরম্ভ করিল কি সূত্রে?" ইনি উত্তর করিলেন— "পাঞ্জাবের শিখেরা এই বিষয়ে পথ-প্রদর্শক। শিখগণ প্রথমে ব্রহ্মদেশে চাকরী করিতে আসে। ব্রহ্মদেশে থাকিতে থাকিতে তাহারা শিঙ্গাপুরের কথা শুনিতে পায়। শিঙ্গাপুরে ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা মজুরীর হার বেশী শুনিবামাত্র ইহারা ঐ অঞ্চলে অগ্রসর হইয়াছিল। যাহারা ব্রহ্মদেশে কার্য্য করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে একদল শিঙ্গাপুরে আসিল—পঞ্চনদ হইতে প্রথমেই কেহ শিঙ্গাপুরে আসিত কিনা সন্দেহ। অগ্রণী দল যখন দেখিল শিঙ্গাপুরে সত্য-সত্যই বেতনের হার বেশী, তখন তাহারা পাঞ্জাবে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণকে সংবাদ পাঠাইল। সঙ্গে সঙ্গে শিঙ্গাপুরের প্রবাসীগণের নিকট হইতে পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে টাকা পৌঁছিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পাঞ্জাবীরা ক্রমে শিঙ্গাপুরের দিকে ঝুঁকিল।

আবার কিছুকালের ভিতরেই শিঙ্গাপুরের ভারতবাসীরা চীনের খবর পাইতে থাকিল। হংকং, সাংহাই ইত্যাদি অঞ্চলে ইংরাজ ক্ষমতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-দাস ভারতবাসীরও প্রবেশপথ সহজ হইল। ইংরাজেরা শিখ ও পাঠান সৈন্য লইয়াই চীনে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন; এখনও ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশেরাই চীনের বৃটিশ-নগরে শান্তি রক্ষা করিতেছে। চীনারা এই কারণে ভারতবাসীর উপর অসন্তুষ্ট। যাহা হউক ভারতবাসীরা শিঙ্গাপুর কেন্দ্র হইতে চীন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র-স্থাপনের সুযোগ পাইল।"

কিন্তু ইয়াঙ্কিস্থানে ভারতবাসীর অভিযান ব্যাপারটা কিছু বিচিত্র বোধ হইতেছে। হয়ত কোন ইংরাজ-প্রভুর সঙ্গে শিখ বা পাঠান দাস কিম্বা প্রহরী ক্যানাডায় আসিয়া থাকিবে। এইরূপে নব ভূখণ্ডের সঙ্গে

৫৭। আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাসের প্রতীক
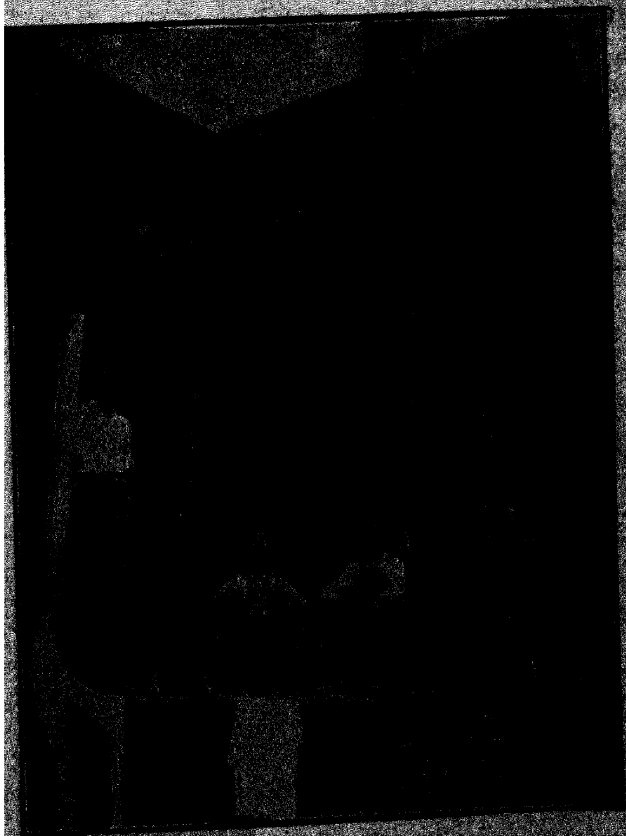
ভারতবর্ষের সংস্রব আরব্ধ হয়। পরে প্রশান্ত মহাসাগরোপকূলে কৃষকগণের উন্নত অবস্থা দেখিয়া ভারতবাসীরা দলে দলে চীন হইতে এখানে আসিতে প্রলুব্ধ হইয়াছে। ক্রমশঃ ভারতবর্ষ হইতেই শত শত লোক আমেরিকায় মজুরী করিতে আসিয়াছে।

শুনা যায়, আজকাল চীন, জাপান, সুমাত্রা, যব, মালয়, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ক্যালিফর্ণিয়া ও ক্যানাডা ইত্যাদি প্রদেশে প্রায় দেড় লক্ষ ভারতবাসীর অন্ন সংস্থান হইতেছে। ইহাদের বিষয় ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত লোকেরা এখন পর্য্যন্ত কোন সংবাদ রাখেন নাই। বিগত ১।২ বৎসরের ভিতর দাসখতে লেখা চুক্তির বিরুদ্ধে জননায়কগণ আন্দোলন তুলিয়াছেন। সেই উপলক্ষ্যে বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহে ভারতীয় প্রজার অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী—

"নেতা তাদের তরুর মত স্তব্ধ দৃঢ় দুঃখজিৎ
নিজের মাথায় বজ্র ধরেন বিজয় তাহার সুনিশ্চিত।"

ভারতবর্ষ হইতে গোখ্‌লে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন! কংগ্রেসে কয়েকবার এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করাও হইয়াছে। Modern Review, Indian Review ইত্যাদি পত্রে কোন কোন লেখক সমস্যাটা বুঝাইবার চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টা সত্যভাবে বুঝিবার জন্য এখনও দেশবাসী অগ্রসর হন নাই, বলিতে হইবে। এমন-কি ভারতবর্ষের বাহিরে ভারত-সন্তান কোথায় কতজন কি-ভাবে জীবন যাপন করে তাহাই জানিবার চেষ্টা করা হয় নাই। বর্ত্তমান যুগেও কুলীমজুরের দ্বারাই দুনিয়ার সর্ব্বত্র একটা বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহার আকার, পরিমাণ ও মূল্য বুঝিবার জন্য উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর শীঘ্র অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। গোখ্‌লে কয়েকদিনের জন্য মাত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। এত অল্প

সময়ের মধ্যে এই বিরাট কার্য্য সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। তাহার জন্ম বহুসংখ্যক উপযুক্ত লোকের জগতে বাহির হইয়া পড়া আবশ্যক। বৃহত্তর ভারতের কেন্দ্রগুলি বুঝিতে চেষ্টা করাই কয়েক জনের একমাত্র কার্য্য হউক।

ইয়াঙ্কিরা চীনাকে আমেরিকায় চাহে না, জাপানীকে চাহে না, ভারতবাসীকেও চাহে না। ইহারা ইয়াঙ্কিদিগের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে অসমর্থ। ভারতীয় মজুরদের মাথায় পাগ্‌ড়ী, হাতে বালা, কানে দুল, লম্বা চুল ইত্যাদির বিষম উৎপাত দেখিয়া ইয়াঙ্কিরা "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতেছে।
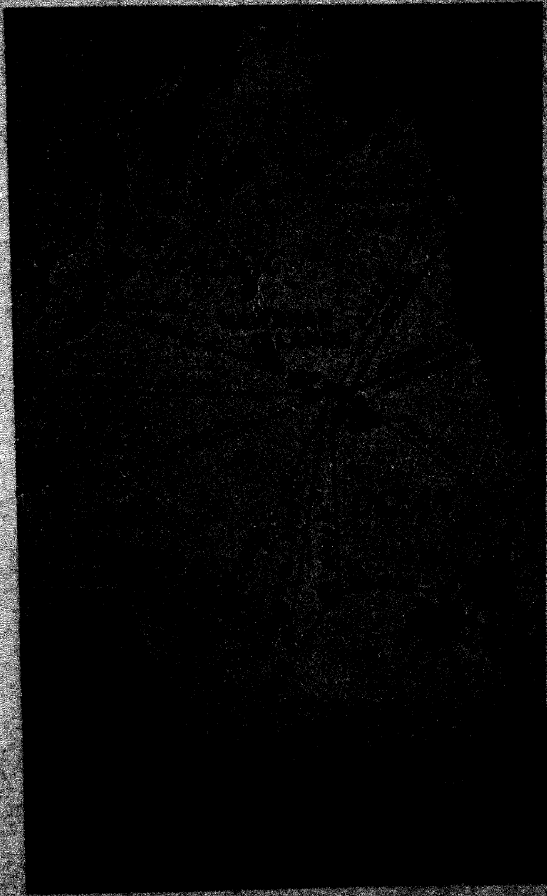
---

৮৫০ পৃষ্ঠা

৫৮। প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান

একাদশ অধ্যায়

ইয়াঙ্কিস্থানের "জের"

জাহাজবক্ষে পুনর্ব্বার

ইয়াঙ্কিস্থানের পশ্চিমতম প্রদেশ দেখা হইল। এইবার সমুদ্র পাড়ি দিবার ব্যবস্থা করিলাম। স্যানফ্র্যান্সিস্কো হইতে ২০০০ মাইল পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের ভিতর হাওয়াই দ্বীপ অবস্থিত। হওয়াইয়ের তামাক ও আনারস আমেরিকায় সুপ্রসিদ্ধ। এই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান নগরের নাম হনলুলু। ক্যালিফর্ণিয়া হইতে জাপান যাইতে হইলে হনলুলুতে জাহাজ আসে। কাজেই হনলুলুতে কয়েকদিন কাটাইবার মতলব করা গেল।

হাওয়াই আমেরিকা ও এসিয়ার মধ্যস্থলে, কিন্তু ইয়াঙ্কিরা হাওয়াইকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটা অর্দ্ধবিকশিত রাষ্ট্রের অধিকার প্রদান করিয়াছে। আমেরিকার বহু প্রদেশ-রাষ্ট্র পূরাপূরি রাষ্ট্র বিবেচিত হইবার পূর্ব্বে এইরূপ অর্দ্ধরাষ্ট্র বা "টেরিটরি" নামে অভিহিত হইত। হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ এইরূপ "টেরিটরি"। আমেরিকার সর্ব্বোত্তর পশ্চিম অঞ্চলে আলাস্কা প্রদেশ। এই প্রদেশ ইয়াঙ্কিস্থান হইতে বহুদূরে। এই প্রদেশকেও ইয়াঙ্কিরা যুক্ত-রাষ্ট্রের একটা "টেরিটরি" বা অর্দ্ধাধিকারপ্রাপ্ত-রাষ্ট্র বিবেচনা করে। সুতরাং স্যানফ্র্যান্সিস্কো হইতে যাত্রা করিয়া ইয়াঙ্কিস্থান ছাড়িয়াছি, বলা চলে না—বৃহত্তর ইয়াঙ্কিস্থানের এক অংশ দেখিতে

চলিয়াছি, বলিতে হইবে। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর পর হাওয়াই পর্য্যন্ত ইয়ঙ্কিস্থানের "জের" চলিতেছে।

যথাসময়ে জাহাজে চড়িলাম। ঠিক ছয় মাস পূর্ব্বে লিভারপুল হইতে নিউইয়র্ক আসিবার সময়ে শেষবার জাহাজে চড়িয়াছি। জাহাজে চলাফেরা করা আজকাল নিতান্ত ঘরোয়া ডালভাত খাওয়ার মত মামুলি কথা হইয়া পড়িয়াছে।

জাহাজের নাম "মাঞ্চুরিয়া"—মালিকেরা আমেরিকান। এই পথে আমেরিকান ও জাপানী দুই কোম্পানীর জাহাজ চলে। জাপানীরা কখনও আমেরিকান জাহাজে যাতায়াত করে না। তাহারা এবিষয়ে ঘোরতর স্বদেশী। আমাদের সঙ্গে একজনও জাপানী যাত্রী নাই। চীনা মোসাফের অনেক।

এই জাহাজের কুলী, নাবিক, খানসামা, বাবুরচি ইত্যাদি সবই চীনা দেখিতেছি। কালকাতায় বৃটিশইণ্ডিয়ান্ কোম্পানীর জাহাজে চাটগাঁর মুসলমানদিগকে নিযুক্ত করা হয়। ইয়াঙ্কিরাও সেইরূপ চীনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে। চীনারা তাহাদের স্বদেশী পোষাকে কাজকর্ম্ম করে—অবশ্য চীনে বিপ্লবের পর হইতে টিকি উঠিয়া গিয়াছে। জাহাজের কয়েকজন খালাসী আমাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি হিন্দু (অর্থাৎ ভারতবাসী)? হিন্দু ভাল, জাপান নো গুড" অর্থাৎ জাপানীরা বড় খারাপ। চীনা-সমস্যা ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে। এই গত সপ্তাহে যুদ্ধ বাধে বাধে হইয়াছিল। ইয়াঙ্কিরা, চীনাদের বন্ধু হইয়া জাপানের প্রতি ইহাদের বিদ্বেষ আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। দুর্ব্বল চীনের অধোগতির সীমা থাকিবে না।

জাহাজের সঙ্গীত-ভবনে প্রতিদিন দুই তিন বার যন্ত্রসঙ্গীত হয়। ফিলিপাইন-দ্বীপবাসী বাদকদল এই জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। ইয়াঙ্কিরা

তাহাদের বিজিত ফিলিপিনো জাতিকে সভ্য করিয়া তুলিতেছে—কালে স্বাধীন করিয়া দিবে। এই সকল গৌরবসূচক কার্য্যের বিজ্ঞাপন ইয়াঙ্কি-স্থানের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া থাকে। ফিলিপিনো বাদকদলের যন্ত্রসঙ্গীত নানা উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়। ফিলিপিনোরা বেহালা, তানপুরা, সারঙ্গ ইত্যাদি তারযুক্ত যন্ত্রের ব্যবহার বেশী করিয়া থাকে। সাধারণ পাশ্চাত্য "ব্যাণ্ডে" যে সকল সুর বাজান হয়, তাহা হইতে ফিলিপিনো ব্যাণ্ডের গৎ বহুল পরিমাণে স্বতন্ত্র বোধ হইল।

এই ছয় মাসের ভিতর একজনও ফিলিপিনোর সঙ্গে আলাপ হয় নাই। জাহাজে উঠিয়া অবধি এশিয়াবাসী যাত্রীদিগের চেহারা দেখিতে লাগিলাম। এক যুবককে দেখিয়া ভাবিলাম, "এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ফিলিপিনো।" জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, অনুমান ঠিক। কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এই যুবক একজন পাদ্রী; পাঁচ ছয় বৎসরকাল আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন। সিকাগোতে ইনি বেশী সময় কাটাইয়াছেন; এক্ষণে সস্ত্রীক হনলুলু যাইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বদেশে না ফিরিয়া হনলুলু যাত্রা করিয়াছেন যে?" তিনি বলিলেন—"হনলুলুতে প্রায় ১৫,০০০ ফিলিপিনো বাস করে। তাহাদের মধ্যে নানাবিধ প্রচারকার্য্য আবশ্যক। আমি ধর্ম্ম-প্রচারক এবং শিক্ষা-প্রচারক, দুই প্রকার প্রচারকের কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি। হনলুলুর ফিলিপিনো-সমাজে আমাকে কার্য্য করিতে হইবে।"

ফিলিপিনোরা প্রায় সকলেই খৃষ্টান। লোকসংখ্যা এক কোটি। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্পেন ইহাদের প্রভু ছিলেন; তাহার পর হইতে ইহারা ইয়াঙ্কি-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "ফিলিপিনোরা বিদেশী প্রভুদ্বয়ের মধ্যে কাহাকে বেশী ভালবাসে?" যুবক পাদ্রী বলিলেন—"ইয়াঙ্কিকে। স্পেনিশজাতি ফিলিপিনোদিগকে

খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু শিক্ষা, শিল্প, সভ্যতা ইত্যাদি কোন বিষয়ে তাহারা ফিলিপাইনবাসীদিগের উন্নতিসাধনে চেষ্টিত হয় নাই। ইয়াঙ্কিরা ফিলিপিনোদিগকে সত্যসত্যই 'মানুষ' করিয়া তুলিতেছেন। ইয়াঙ্কি-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া আমরা সকল বিষয়ে লাভবান হইয়াছি। আমাদের ধনসম্পদও বাড়িয়াছে।"

জাহাজে বসিয়া "তার" করা যায়, ডাকে চিঠি ফেলা যায়। একটা লাইব্রেরী আছে। তাহা ছাড়া একখানা দৈনিক-পত্র বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে তারহীন-বার্ত্তাবহের সাহায্যে ইউরোপীয়-মহাসমরের সংবাদ প্রকাশিত হয়। দু একটা গল্প-রসিকতা ইত্যাদিরও স্থান আছে।

চীনা সহযাত্রী

লাইব্রেরীতে বসিয়া 'Hawaiian Folk-Tales' অর্থাৎ "হাওয়াইয়ের রূপকথা" নামক পুস্তক পড়িতেছিলাম। আজ রবিবার; বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে যে, একজন সহযাত্রী পুরোহিত ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিবেন। যথাসময়ে লাইব্রেরী-গৃহ গির্জ্জায় পরিণত হইল। বক্তৃতা, সঙ্গীত, প্রার্থনা ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানই বাদ পড়িল না।

জাহাজের দৈনিক-পত্র কিরূপে সম্পাদিত হয়, নিম্নের বিজ্ঞাপন হইতে বুঝা যাইবে :—

"If enough 'ship-items' can be secured, a 'Special Social Edition' will be published during the voyage. The Editors would be very much pleased to have the assistance of every one in publishing this issue. If you have any joke, short-stories, poetry, or the results of any events happening a-board the ship, send it to the purser's office and we will publish it. Wanted : A daily reporter. Apply at once."

"প্যাসেঞ্জার স্ত্রীপুরুষগণের সম্বন্ধে রগড়ের সংবাদ পাইলে সাদরে গ্রহণ করিব। সকলগুলি মিলাইয়া একখানা আমোদ-প্রমোদ-মূলক সংস্করণ বাহির করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত দৈনিক সংস্করণে হাসিঠাট্টা, কবিতা, গল্পগুজব, রংতামাসা প্রকাশিত হইবে। আরোহিগণ জাহাজ-বাসের চিত্তাকর্ষক ঘটনা খাজাঞ্চির নিকট পাঠাইলে সুখী হইব। খেলাধূলার সংবাদও বাঞ্ছনীয়। শীঘ্রই একজন সংবাদদাতা (রিপোর্টার) চাই।"

মোসাফেরগণের ভিতর হইতে একব্যক্তি সংবাদাতাও নিযুক্ত হইয়া যাইবেন। পারিশ্রমিকও রীতিমত জুটিবে। সকল কাজই ব্যবসায়ের নিয়মে চলে। কাগজের নাম 'Ocean Wireless News' বা "সাগরের তারহীন টেলিগ্রাফের খবর"। দৈনিক মূল্য পাঁচ আনা। ইহাতে প্রতিদিন যুদ্ধের খবর বাহির হয়।

প্রথমশ্রেণীতে স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকাসমেত প্রায় ২০০ যাত্রী। অনেকেই হনলুলু পর্য্যন্ত যাইবেন—প্রায় সেই পরিমাণ লোক হংকং যাইতেছে। হংকং-যাত্রীরা চীন, শ্যাম, সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ ও ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশের যাত্রী। অন্যান্য মোসাফেরগণ জাপানের দুই তিনটা ষ্টেসনে ও ফিলিপাইনের ম্যানিলা-বন্দরে নামিবেন। একটা ভাল কার্ডের উপর প্রত্যেক মোসাফিরের নাম ছাপান হইয়াছে। বন্ধুবর্গের নিকট উপহার পাঠাইবার জন্য জাহাজ-কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অনুরোধ করিয়া গেল। ছবি-ছাপা, নাম-ছাপা, কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির-করা—ইত্যাদি কাজ পাশ্চাত্য-সমাজে অতি সাধারণ। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ইহাতে খুসী। আমরা ভারতবর্ষে এ সব জিনিষকে বহির্ম্মুখী ও নিতান্ত অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত।

এশিয়াবাসীর গায়ে মুখে কপালে যেন দুর্ব্বলতার ছাপ মারা রহিয়াছে। ভারতের নরনারীর ত কথাই নাই,—তথাকথিত স্বাধীন প্রজাতন্ত্রশাসনাবলম্বী চীনাজাতির লোকজনও দেখিতে নিতান্ত নিরীহ গো-বেচারা ভাল-মানুষ। আর ইয়োরামেরিকার জনগণ সকল বিষয়েই তেজস্বী, কর্ম্মঠ, গতিশীল। ইয়োরামেরিকানেরা দাঁড়াইয়া আছে অথবা দৌড়াইতেছে, এশিয়াবাসী বসিয়া আছে, অথবা ধূলায় শুইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। চেহারা, গতিভঙ্গী, চালচলন, কথাবার্ত্তা, উভয়েরই বিপরীত। জাপানীরা আজকাল এশিয়ার ইংরাজ বা জার্ম্মান বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু ইহাদিগকে দেখিলেও ইহারা যে এশিয়াবাসীর জ্ঞাতিকুটুম্ব, তাহা বুঝিতে দেরী হয় না। এশিয়ার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নরম উপাদানে গঠিত হইয়াছে, বলিতে হইবে।

জাহাজের চীনা-যাত্রীরা নিঃশব্দে, সাড়াশব্দ না করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। অন্যান্য মোসাফেরগণ পরস্পর মেলামেশা, বন্ধুত্ব, প্রণয় ইত্যাদি করিয়া লইতেছেন। চীনারা যে এশিয়াবাসী, সেই এশিয়াবাসী। যে সকল ইয়োরামেরিকান পুরুষের সঙ্গে কোন রমণী ছিল না তাহারা দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই এক একজন "সুইট হার্ট" বা "মিষ্টহৃদয়" অর্থাৎ সখী সংগ্রহ করিয়া লইল। যে সকল রমণীর সঙ্গে কোন পুরুষ ছিল না, তাহারাও এক একজন সঙ্গী বাছিয়া লইল। বেচারা চীনাদিগকে কেহই পুছে না। জাহাজের নাচগানে, আমোদপ্রমোদে, ক্রীড়াকৌতুকে, কিছুতেই চীনারা গা ঢালিতে পারিতেছে না। "ঈষ্ট ইজ ঈষ্ট য়্যাণ্ড ওয়েষ্ট ইজ ওয়েষ্ট" অর্থাৎ "পূর্ব্বে ও পশ্চিমে মিলন অসম্ভব"—কথাটার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে।

একজন চীনা-বণিকের সঙ্গে আলাপ হইল। চা-ব্যবসায় ইঁহার কার্য্য; চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, স্পেন, ইত্যাদি নানাদেশে তাঁহার কারবার চলিতেছে। এইজন্য সর্ব্বদা তিনি দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। ফরাসী, জার্ম্মান, স্পেনিস, ইংরাজী, জাপানী ও মাতৃভাষায় তাঁহার বেশ দখল আছে, সম্প্রতি বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিতেছেন।

আর একজন চীনাম্যান বিলাত ও আমেরিকার লৌহ-কারখানা পরিদর্শন করিয়া চীনে যাইতেছেন। ইনি বলিলেন—"মহাশয়, ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে জাতিভেদ—আর চীনের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ভাষাভেদ।" পরিচয়ে জানা গেল, ইনি চীনের একটা নামজাদা লৌহ-কারখানার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। ভারতবর্ষে সাকৃচিতে যেমন তাতার

কারবার চলিতেছে, চীনেও সেইরূপ ইয়াংসি নদীর ধারে হ্যাঙ্কাও নগরে একটা সুবৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে। হ্যাঙ্কাও নগর সমুদ্র হইতে প্রায় ৭০০ মাইল দূরে। এই কারখানায় ৩০১০ মজুর কর্ম্ম করে। তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় বিলাতে ছয় বৎসর মেটাল্যার্জ্জি বা ধাতুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। জার্ম্মানিতেও মাঝেমাঝে ইঁহার শিক্ষালাভের সুযোগ জুটিয়াছিল। এইরূপে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ওস্তাদ হ্যাঙ্কাও কারখানায় প্রায় ১২।১৪ জন আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই কারখানা চালাইবার মূলধন আসে কোথা হইতে?" তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—"মূলধন বিদেশী, প্রধানতঃ জাপানী।"

একজন চীনা-ছাত্র জাহাজে আছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছাত্র এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছে। গ্রীষ্মাবকাশ দেশে কাটাইয়া আবার যথাসময়ে নিউইয়র্কে ফিরিবে।

কতিপয় ইয়াঙ্কির সঙ্গে আলাপ হইল। একজন ওয়াসিংটন নগরের ব্যাঙ্কার—চীনে ব্যাঙ্কিং-কারবার খুলিবার সুযোগ বুঝিবার জন্য হংকং যাইতেছেন। একজন পত্রিকা-সম্পাদক, সপরিবারে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বাহির হইয়াছেন। ইনি বষ্টনের অধিবাসী—অধ্যাপক ল্যান্‌ম্যানের বন্ধু। ইঁহারা হনলুলুতে কিছুকাল কাটাইবেন।

জাহাজে একজন অধ্যাপক আছেন—ইনি মিশৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্রিকা-সম্পাদন বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইনি বলিলেন—"আমরা প্রত্যেকে সাত-বৎসরব্যাপী কার্য্যের পর এক বৎসর ছুটি পাই। আমি আমার অবকাশ জাপানে কাটাইব স্থির করিয়াছি। 'জাপান য়্যাডভার্টাইজার' কাগজের আফিসে কিছু কাজ করিবার ইচ্ছা আছে। সস্ত্রীক চলিয়াছি।"

একজন সিকাগোবাসী ভারতবর্ষে যাইতেছেন। ইনি বলিলেন,—

"আমি ধাতু রত্ন হীরা জহরতের অলঙ্কার-নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। নূতন নূতন ধরণের নক্সা, ছাঁচ ও 'ডিজাইন' প্রস্তুত করা আমার বিশেষত্ব। আমি প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতিগুলি বাজারে চালাইতেছি—নিতান্ত অনুকরণ করি না। আমার স্বচিন্তিত নূতন কায়দাও থাকে। মোটের উপর লোকেরা আমার কাজ পছন্দ করে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রাচীন শব্দে আপনি কি বুঝিতেছেন?" তিনি বলিলেন—"লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান, য়্যাজটেক্, মায়ান্ ইত্যাদি বুঝিতেছি। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ স্পেনিস্। আমার জন্ম জেব্যানিমা-খালের সমীপবর্ত্তী নিকারাগুয়া-জলপথে হইয়াছিল। সেই সূত্রে আমি মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন শিল্পরীতির প্রভাব লাভ করি। পরে শিকাগোতে আসিয়া বাস করিতেছি। আমি পুরাতনের সঙ্গে নূতন রীতি মিশাইয়া এক অভিনব বস্তুর সৃষ্টি করিতে পারিয়াছি। এইবার ভারতবর্ষ হইতে নূতন কতকগুলি রীতি আমদানি করিব।"

সাগরে সুখের নীড়

জাহাজখানা একটা আধুনিক নগর-বিশেষ। আরোহীরা অল্প-ব্যয়ে সকল প্রকার সুখভোগ করিবার সুযোগ পায়। বিলাস-সামগ্রীর অভাব এখানে একেবারেই নাই।

মদের দোকান সর্ব্বদাই খোলা রহিয়াছে। যাহার যখন যেরূপ প্রবৃত্তি, সে তখন সেইরূপ মদিরা সেবন করিয়া আসিতেছে। ধূমপানের জন্য একটা স্বতন্ত্র কামরা আছে। ধূমপানের ধূম এখানে এত বেশী যে, ঘরটা সর্ব্বদাই ধূমে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। দৈবক্রমে এক মিনিট গিয়া উপস্থিত হইলে, মাথা ধরিয়া যায়। তাসখেলা, দাবাখেলা ইত্যাদিও বেশ চলিতেছে।

ডেকের উপর একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই চৌবাচ্চায় প্রতিদিন জল ভরা হয়। যাত্রীরা ইচ্ছানুসারে সাঁতার কাটা অভ্যাস করিতেছে। "বেস্ বল" খেলার জন্য পরদাদ্বারা ডেক ঢাকা হইয়া গেল। এই খেলাটা ইয়াঙ্কিদের খাশ। প্রবীণ নবীন সকলেই এই খেলায় মত্ত।

নাচ, গান, বাজনায়ও জাহাজ মাতিয়া রহিয়াছে। ফিলিপিনো-বাদকেরা দিনে তিনবার করিয়া কনসার্ট বাজাইয়া থাকে। সঙ্গীত-গৃহে পিয়ানো বাজানো লাগিয়াই আছে। এতদ্ব্যতীত ডেকের উপর একটা অর্গ্যান হইতে আপনা আপনিই প্রসিদ্ধ গায়কগণের সুর বাহির হয়। ইহা এক প্রকার গ্রামোফোন-বিশেষ।

পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রী-পুরুষ প্রায় সকলেই নাচিতে পারে। কনসার্টে

কোন একটা সুর বাজিতে থাকিলে ইহারা অজ্ঞাতসারেই তালেতালে পা ফেলিতে ফেলিতে অগ্রসর হয়। যখন তখন, যে কোন অবস্থায়, ইহারা নাচিবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের দেশে চৈত্র-মাসে চড়কের ঢাকে কাটি পড়িবামাত্র ভক্তগণের পীঠ যেমন সুরসুর করিয়া উঠে, এদেশে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চরণও সেইরূপ বাজনা শুনিলেই সুরসুর করে।

নাচিবার জন্য জাহাজের কর্ম্মচারীরা বিশেষ ব্যবস্থাও করিয়া দেয়। পরদা-ঝুলান, চেয়ার-সাজান ইত্যাদি বিষয়ে খালাসীরা সাহায্য করে। এইরূপে নাচ-গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া জাহাজ কোম্পানীর নিজ কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। একজন করিয়া পুরুষ একজন করিয়া রমণীর সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করে। নাচের রীতি প্রায় সকলেই জানে। সুর বাজাইলেই জোড়া-জোড়া লোক নাচ সুরু করিয়া দেয়। যে রাত্রিতে নাচ হয়, সেই রাত্রিতে ২।৩ ঘণ্টা আমোদ-প্রমোদ চলে। নাচের পর মদ্য-গৃহে গমন এবং পানভোজন ইত্যাদির যথাবিধি ব্যবস্থা আছে। নৃত্য-ব্যাপারটা জাহাজে বন্ধুত্ব জমাইয়া তুলিবার প্রধানতম উপায়। যতদিন পর্য্যন্ত নাচের ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আরোহীরা বড়ই বিষণ্ণ ও দুঃখিত-ভাবে কাল কাটায়। নাচের প্রথম রাত্রির পর হইতে ইহারা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

খেলাধূলা, আরাম-ব্যায়াম, সুখ-স্বাস্থ্য ইত্যাদির সকল জিনিষই জাহাজে পাওয়া যায়। জাহাজে কয়েকদিন কাটাইতে পারা কলিকালে স্বর্গবাস-স্বরূপ। তবে দুনিয়ায় বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ বড় বেশী দেখা যায় না;—জাহাজে ত না যাইবারই কথা।

সিকাগোর ধাতুশিল্পী বলিতেছিলেন—"মহাশয়, জাহাজে চলাফেরা করা বড়ই বিপজ্জনক। পরিবারস্থ পুত্র-কন্যারা লোকজনের দৃষ্টান্তে কুপথ-গামী হইয়া পড়ে। যে সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন অভিভাবক নাই,

তাহাদের পক্ষে জাহাজে চলাফেরা আরও বিপজ্জনক। তাহারা নিজে হয় ত ভাল থাকিতে পারে ; কিন্তু আরোহীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব। যেন তেন প্রকারেণ তাহাদের সঙ্গে কথা বলা, তাহাদের কোন একটা কাজ করিয়া দেওয়া, 'মে আই হেল্‌প ইউ ?' অর্থাৎ 'আপনার কিছু চাই কি ?' বলা, স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করা, ইত্যাদি নানাচ্ছলে ইহারা এই সকল রমণীকে বিরক্ত করিয়া তোলে। ইহা নিবারণ করা একপ্রকার অসম্ভব।"

চীনারা জুয়াখেলায় ওস্তাদ। দুই তিনদিন দেখিলাম, চীনাছাত্রটি তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের ডেকে ঘনঘন আসা-যাওয়া করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ হইল। একদিন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম। দেখিলাম, চীনা খালাসী ও আরোহীরা মহা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আট দশটা টেবিলের উপর জুয়াখেলা চলিতেছে। সকলেই জুয়ার নেশায় বিভোর। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণী মজা দেখিতেছে, কেহ কেহ বা জুয়া খেলিতে লাগিয়া গিয়াছে। শুনিলাম, কোন কোন ইয়াঙ্কির ২।৩ হাজার টাকা লোকসান হইয়া গিয়াছে। চীনাদের জুয়ার আড্ডা দেখিবার জন্য দলে দলে যাত্রীরা তৃতীয়-শ্রেণীর ভিতর আসা-যাওয়া করিতেছে।

শ্বেতাঙ্গ-মহলেও জুয়াড়ী কম নাই। ধূমপানের গৃহে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা জুয়াখেলা সুরু করিয়া দিয়াছে। জুয়ার নেশা শীঘ্র ছাড়ে না। একবার যে মজিতেছে, সে আর নিষ্কৃতি পায় না। জাহাজের সর্ব্বত্রই যেন দেওয়ালীর জুয়ার হাট দেখিতে পাইতেছি।

নানা কথা

বৈশাখমাসে ভারত-মহাসাগর নীলবর্ণ প্রস্তরের মত দেখাইতেছিল; জ্যৈষ্ঠমাসে প্রশান্ত-মহাসাগরকে সেইরূপই দেখিতেছি। এযাত্রায় কোন আরোহীকে সমুদ্র-পীড়ায় অস্থির দেখিলাম না। বেশ গরম পড়িয়াছে। স্যানফ্র্যান্‌সিস্কোয় শীতবস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। দু'এক দিন জাহাজ চলিবার পর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ভাসিতেছি। শান্ত সুনীল লবণাম্বু, ফুরফুরে হাওয়া, রাত্রিকালে তারকারাজি ও চন্দ্র কিরণ—এই গেল বহিরাবেষ্টনের অবস্থা। আর জাহাজের ভিতর নাচ-গান, গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা-দেওয়া। সময় কাটিতেছে মন্দ না!

দু'একদিন জাহাজ হইতে হঠাৎ "বিপদসূচক বাঁশী" ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। আরোহীরা শশব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যে যেখানে ছিল, সেখান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে প্রধান ডেকের উপর হাজির। দেখিলাম, জাহাজের খালাসী ও কর্ম্মচারীরা সকলে সারি দিয়া ডেকের উপর দাঁড়াই গিয়াছে; কিন্তু কোন বিপদের লক্ষণ কোথাও নাই। বষ্টনের পত্রিকা-সম্পাদক বলিলেন—"মহাশয়, জাহাজে আগুন লাগিলে, অথবা অন্য কোনপ্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে আরোহীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জাহাজ-কোম্পানী দায়ী। এই নিমিত্ত খালাসী ও কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য। লোক-রক্ষাকার্য্যে পারদর্শী করিয়া তুলিবার জন্য ইহাদিগকে অভ্যস্ত করান হয়। দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে জাহাজের কাপ্তেন হঠাৎ "ডেঞ্জার সিগন্যাল" বাজাইয়া দেন। তাহা শুনিবামাত্র নাবিকেরা তাহাদের যথা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে কর্ম্ম করিতে লাগিয়া

যায়। এই দেখুন, প্রত্যেক জালিবোটের সম্মুখে ১২।১৪ জন করিয়া খালাসী দণ্ডায়মান। কেহ কেহ নৌকাটা উপর হইতে জলে ভাসাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। কেহ কেহ "লাইফসেভিং বেল্ট" বা জীবন-রক্ষক কোমর-বন্ধ লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যাহারা এই সকল কার্য্য পূর্ব্বে কখনও করে নাই, তাহাদিগকে নূতন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।"

ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় যোগ দিবার পূর্ব্বে উভয়-পক্ষীয় খেলোয়াড়েরা আপোষে অভ্যাস, "প্রাকৃটিস্" বা অনুশীলন করিয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বেও "মক্-ফাইট" বা কৃত্রিম-সংগ্রাম ইত্যাদি এই অভ্যাস তৈয়ারি করিবার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াঙ্কিস্থানের বড় বড় হোটেলে দেখিয়াছি, আগুন লাগিলে দাসদাসীরা কে কি কার্য্য করিবে, তাহা মাঝে মাঝে শিখান হইয়া থাকে। জাহাজেও এইরূপ "ফায়ার-ড্রিল" বা অগ্নি-ঘটিত বিপদকালের জন্য কর্ত্তব্য-শিক্ষা দেখিলাম। বিগত দুই দিন বৎসরের ভিতর জাহাজ-ডুবি দুর্ঘটনায় বহুলোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। এই জন্য জাহাজ-কোম্পানীগুলিকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। প্রত্যেক কামরায় বিছানার কাছে জীবন-রক্ষক কোমর-বন্ধ রহিয়াছে; কিন্তু ইহার ব্যবহার প্রায় কোন লোকই জানে না। ইহার ব্যবহার শিখাইবার ব্যবস্থাও কর্ম্মচারীরা করিয়াছেন।

জাহাজে অনেক পাদ্রী ও শিক্ষক চলিয়াছেন। কেহ চীনে যাইতেছেন —কেহ কোরিয়ায় যাইতেছেন, কেহ ম্যানিলায় যাইতেছেন—কেহ বা জাপানে যাইতেছেন। পাদ্রীদের মধ্যে চিকিৎসকই বেশী।

একজন দশবৎসর ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জে কার্য্য করিতেছেন—স্থানীয় ভাষা শিখিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে ব্রেজিলে প্রচারক ছিলেন। ইঁহার ভাই কালিম্পং পাহাড়ে সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহার নিকট

৬৬৬ পৃষ্ঠা

৫৯। হনলুলু নগরের বাস ভবন

শুনিলাম—"ফিলিপাইন-দ্বীপবাসীগণের মধ্যে একপ্রকার লোকসাহিত্য প্রচলিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাহিত্যের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।" ইনি স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী—কিন্তু ইনি আমেরিকার প্রেস্‌-বিটারিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের সংশ্রবে লোক-সেবা-কার্য্য করেন।

একজন ইংরাজ (ক্যানাডাবাসী) পাদ্রী-চিকিৎসকের পরিচয় পাইলাম। ইনি তিনবৎসর ধরিয়া কোরিয়াদেশে শিক্ষাপ্রচার ও ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। ইনি বলিলেন—"এতদিন আমরা কোরিয়া-বাসীদিগকে তাহাদের স্বদেশীভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইতেছিলাম। এক্ষণে কোরিয়ায় জাপানের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। জাপানীরা কোরিয়ার সর্ব্বত্র জাপানী-ভাষা প্রবর্ত্তন করিতেছে।"

ইয়াঙ্কিস্থানের পররাষ্ট্র-দৌত্যবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী যবদ্বীপে যাইতেছেন। ইনি একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন—'The Present Military Situation in the United States'; লেখক মেজর জেনার‍্যাল গ্রীন (Greene). মাত্র দুই তিন মাস হইল পুস্তকখানি বাহির হইয়াছে। ইনি নরম্যাল এঞ্জেল এবং য়্যাণ্ড্রু কার্ণেগী-প্রমুখ শান্তিবাদীদিগের প্রচারিত মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন—"যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের জন্য সজ্জিত না হইয়া থাকিলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে বাধ্য হইবেন।"

পাদ্রীরা জাহাজের লাইব্রেরী-গৃহে কতকগুলি পুস্তিকা ও রিপোর্ট বিলি করিয়া গেলেন। একটাতে দেখিলাম, এশিয়া ও আফ্রিকায় খৃষ্টানধর্ম্ম-প্রচারকগণের চেষ্টায় যে সমুদয় অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাদের তালিকা আছে। ভারতবর্ষের বিবরণে লিখিত রহিয়াছে যে, কলিকাতার রিপণ কলেজ, সিটি কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ

ইত্যাদি, এমন কি কাশীর সেণ্ট্র্যাল হিন্দু কলেজ এবং লাহোরের দয়ানন্দ য়্যাংগ্লোবেদিক-কলেজও খ্রীষ্টান প্রচারকগণের কৃতিত্বের সাক্ষী !!

ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের শিক্ষাবিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী এই জাহাজে আছেন। ইনি শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি দেশ হইতে নূতন জ্ঞান আহরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিতেছেন।

ইয়োরামেরিকানদের শারীরিক ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মানুষের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে, প্রত্যেকটারই চরম ভোগ করিতে ইহারা সুপটু। সকাল হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত ইহারা অবিরাম ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে। পানভোজনে ইহারা যেমন ওস্তাদ, ক্রীড়া কৌতুকে, সন্তরণে, নাচগানে এবং আমোদ-প্রমোদেও ইহারা তেমনই কর্ম্মক্ষম। কোন বিষয়েই অল্পে ইহাদের তুষ্টি হয় না। ইহারা দুইতিন ঘণ্টা ধরিয়া জলের ভিতরেই ডুবাডুবি করিতে থাকে। তাহার পূর্ব্বেই হয়ত দুইতিন ঘণ্টা ধরিয়া ইহারা লাফালাফি করিয়াছে—এবং তাহার পরেই হয়ত আবার অন্য কোন কাজে লাগিয়া যাইবে।

---

৬৮ পৃষ্ঠা

৬০। সমুদ্রতীরে নারিকেল গাছ
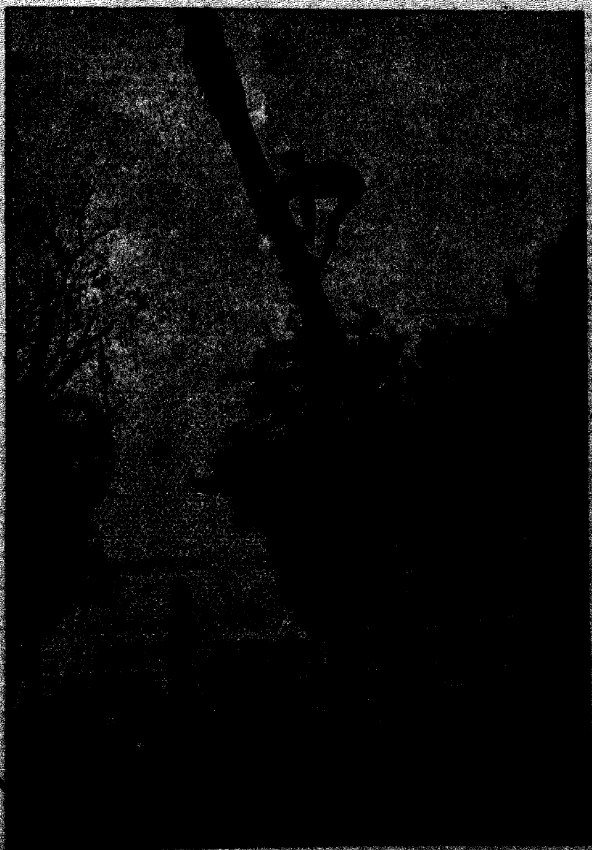
হনলুলুতে প্রথম রাত্রি

রোজ প্রায় ৩৫০ মাইল চলিয়া ছয়দিনে হনলুলু পৌছিলাম। বন্দরে পৌছিবার কয়েকঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই ওয়াহুদ্বীপের পাহাড়গুলি দেখা গেল। এডেনের পাহাড় যে ধরণের, এই পর্ব্বতশ্রেণীও সেই ধরণের। তরুহীন, লতাহীন, কৃষ্ণধূসর প্রস্তরস্তূপ—শিরোদেশে আগ্নেয়গিরির মুখের মত সুবিস্তৃত গহ্বর!

যতই দ্বীপের সমীপবর্ত্তী হইতে থাকিলাম, ততই সমুদ্রের জল নীলিমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবুজবর্ণ গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সময় জাহাজের আরোহীরা সকলে মিলিয়া আগ্রহের সহিত জলের দিকে তাকাইতে আরম্ভ করিল। ফিলিপাইনের শিক্ষা-পরিদর্শক ঊর্দ্ধশ্বাসে জাহাজের সম্মুখভাগে দৌড়াইতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য জাহাজের ধারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কতকগুলি শার্ক মাছ জাহাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জলের ভিতর দিয়া দৌড়িতেছে, আর বহু সংখ্যক ছোট মাছ উড়িয়া উড়িয়া সমুদ্রে চলাফেরা করিতেছে। ক্রমশঃ মাছের ঝাঁক অদৃশ্য হইয়া গেল। জাহাজ-ঘাটায় আসিয়া আমরা ঢুকিলাম। পঁচিশ ত্রিশজন হনলুলুবাসী দরিদ্র বালক জাহাজের নিকট সাঁতার কাটিতেছে। আরোহীদিগের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাহারা এইরূপ করিতেছে। আরোহীরা উপর হইতে দুয়ানি সিকি দোয়ানি ইত্যাদি সমুদ্রে ফেলিতে লাগিল। ভিক্ষুকেরা জলে ডুবিয়া সেইগুলি অন্বেষণ করিতে থাকিল। একটা পয়সাও খোওয়া গেল না, দেখিলাম।

লোকজনের চেহারা দেখিয়াই বুঝিতেছি—ইয়োরামেরিকান্-জাতির দেশ ইহা নয়। মার্সেল হইতে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো পর্য্যন্ত যে সকল নরনারী দেখিয়াছি, তাহাদের হইতে ইহারা স্বতন্ত্র। মিশরের আলেক্-জান্দ্রিয়ায় যে জাতি বাস করে, ইহাদিগকে তাহাদেরই জাতি বিবেচনা করা চলিতে পারে—অবশ্য দূর সম্পর্কের জাতি। মিশরীয়েরা দীর্ঘাকৃতি, হনলুলুবাসীরা খানিকটা হ্রস্বাকৃতি—প্রথম দৃষ্টিতেই এই প্রভেদ মনে হইবে। এখানকার লোকদিগের গায়ের রং মোটের উপর ভারত-বাসির গায়ের রংয়ের মত বলা যায়—কিন্তু মুখের গঠন অনেকটা জাপানী ধরণের।—এশিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

দুইতিনদিন হইতেই জাহাজে অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। আজ সমস্ত দিন গ্রীষ্মে আধপোড়া হইয়া গিয়াছি। শীতের পোষাকই এখনও পরা রহিয়াছে! হনলুলু ঠিক কলিকাতা ও বোম্বাই নগরদ্বয়ের সঙ্গে এক রেখার উপর অবস্থিত। কাজেই জ্যৈষ্ঠমাসের কলিকাতা বোম্বাই, বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগর—সবই প্রশান্তমহাসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জে বিদ্যমান। গ্রীষ্মাবর্ত্তের (টরিড জোন) গাছপালাও জাহাজ হইতে দেখিতে পাইলাম।

নামিয়া দেখি—একটা চলনসই ছোটখাট নগর গড়িয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশের উদ্ভিদ্‌সমূহ সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। 'তমালতালীবনরাজিনীলা অভাতিবেলা লবণাম্বুরাশিঃ'—ইত্যাদি বর্ণনা ওয়াহুদ্বীপের সাগরকূল-সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম। হোটেলটা যেন কুঞ্জবনের ভিতর অবস্থিত। আম, জাম নারিকেল, কলা, খেজুর, বট, ইত্যাদি নানাপ্রকার গাছের বাগানে গৃহখানি ঢাকা

৬৭০ পৃষ্ঠা

৬১। আনারসের ক্ষেত
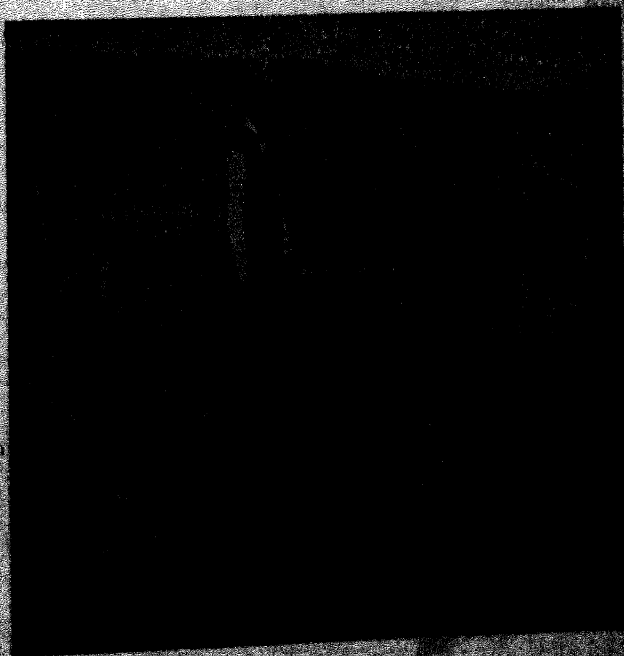
পড়িয়াছে। রাস্তায় আসিতে আসিতে দেখিলাম, দোকানে আম্রফল সাজান রহিয়াছে।

ইয়াঙ্কিস্থানে থাকিবার সময়ে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের আনারসের কথা শুনিয়াছি—এবারকার বিশ্বমেলায় এখানকার আনারস প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শিতও হইয়াছে। হোটেলের পথে আনারস বিস্তর দেখিলাম। নৈশ-ভোজনের সময়ে শুনিলাম—"আমের দিন প্রায় চলিয়া গেল। আর কয়েকদিন পরে আম পাওয়া যাইবে না। আজকাল যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহার অধিকাংশই পোকায় ভরা।" হোটেলে আজ পেঁপেফল ছিল। এত বড় ও এত মিষ্ট পেঁপে জীবনে কখনও খাই নাই। এই ফলের ইংরাজী নামও পেঁপে।

রাত্রিকালে নগর দেখিতে বাহির হইলাম। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জকে "ইয়াঙ্কিস্থানের জের" বলিয়াছি। সত্য কথা—ইহা জাপানের জের। স্থানীয় লোকজন ছাড়া এখানে জাপানীদের অস্তিত্বই বেশী বুঝিতে পারিতেছি। জাপানীরা দোকানে, বাজারে, ট্রামে, রাস্তায়, সর্ব্বত্রই বিরাজমান। সকলেই তাহাদের স্বদেশী-পোষাকই ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা প্রায় সকলেই খ্রীষ্টান এবং কোটপ্যাণ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে। এখানে শ্বেতাঙ্গদের মহল্লা ভারতীয় নগরসমূহের শ্বেতাঙ্গ-মহল্লারই অনুরূপ। জাপানীরা এখানকার লোকজনের সঙ্গে যেরূপ ভাবে মিশিতে সমর্থ, শ্বেতাঙ্গেরা সেরূপ ভাবে কখনই সমর্থ নয়। হাওয়াইকে বৃহত্তর জাপানেরই এক অংশ বিবেচনা করিলে দোষ হইবে না।

ট্রামে আটদশ মাইল ঘুরিলাম। কণ্ডক্টার ও মোটরম্যান দুই জনই ইয়াঙ্কি। খালি পায়ে অথবা চটিজুতা পায়ে এবং মাথায় টুপি না দিয়া বহুলোক চলাফেরা করিতেছে। রাস্তায় আলোকমালার শোভা নাই।

প্রাসাদতুল্য দোকানগৃহ, হোটেলগৃহ ইত্যাদিও দেখিতেছি না,—নিতান্তই "নিঝুমের পালা"!

মশার উপদ্রব যথেষ্ট। টেবিলের উপরে পিঁপড়া চলাফেরা করিতেছে। মিশরের হোটেলে মশারি ব্যবহার করিয়াছি—আর আজ হনলুলুতে ব্যবহার করিতেছি। এশিয়ার পশ্চিমসীমা ও পূর্ব্বসীমা একই ধরণের।

৬৭২ পৃষ্ঠা

৬২। ভাগবতী মুখার্জী

ওয়াহু হইতে হাওয়াই

সকালে উঠিয়া দেখি, ভারতীয় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তপন আকাশে বিরাজ করিতেছেন। বাগানে চম্পকবৃক্ষ হইতে ফুলের গন্ধ ঘরের ভিতরেও পাইতেছি। বহুদিন পরে অনাবদ্ধ প্রকৃতির স্বাধীন বিকাশ দেখিতে পাওয়া গেল। মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছে। বোম্বাই কিম্বা পুরীতে যাঁহারা সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেক বৃক্ষে তাজা সবুজ-পাতা গজাইয়াছে—কোন কোন আমগাছে এখনও কাঁচা আম ঝুলিতেছে—সুদীর্ঘ নারিকেলগাছ হইতে মাঝে মাঝে এক একটা ফল মাটিতে পড়িতেছে। বাগানের ভিতর কতকগুলি পাতাবাহারের গাছ দেখিলাম—এগুলি আমাদের দেশীয় গাছ অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর। একপ্রকার নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ গাছে সুরক্তিম ফুল ফুটিয়াছে। বোধ হয় ইহা আমাদের "কৃষ্ণচূড়া"। দূর হইতে কুসুমিত শিমুলগাছ যেরূপ দেখায়, এই গাছ সেইরূপ দেখাইতেছে। ফুলে গন্ধ নাই—নাম পঁয়সিয়ানা (Poinciana) ; সপুষ্প বৃক্ষ দেখিলেই মনে হইবে, যেন গাছে আগুন লাগিয়াছে। জবা, করবী এবং অন্যান্য সুপরিচিত ফুলগাছও দেখিতে পাইলাম। বাগানের ভিতর একটা ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। তাহাতে পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। হোটেলের চতুঃসীমার বাহিরেই ধানের ক্ষেত। দেখিবামাত্র মনে হইল—"ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা-ক্ষেতে কি দেখেছি মধুর হাসি!" অনতিদূরে পাহাড়। বাগানের ভিতর কোন কোন বৃক্ষের শাখায় তোতাপাখী, ক্যানারি পাখী ইত্যাদির খাঁচা ঝুলিতেছে। আটটা নয়টা বাজিতে বাজিতে সূর্য্যতাপ অসহ্য

হইয়া উঠিল। কোথায় নিউইয়র্ক, সিকাগো, স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো, আর কোথায় ওয়াহুদ্বীপ ও হনলুলু!

মোটরকারে সহরের নানাস্থান দেখিয়া তিনটার সময় জাহাজে চড়িলাম। এই জাহাজে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের একটা হইতে অপরটায় যাওয়া-আসা করিতে হয়। জাহাজকোম্পানীর নাম ইণ্টার-আইল্যাণ্ড (বা আন্তর্দ্বীপ) ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী। সাধারণতঃ, বড় বড় পাঁচটা দ্বীপে এই কোম্পানীর জাহাজ চলিয়া থাকে।

২৫০ মাইলের সফরে বাহির হওয়া গেল। কোম্পানীকে দিলাম ১০৫৲। শনিবার বিকাল তিনটায় বাহির হইয়া মঙ্গলবার সকাল আটটায় ফিরিতে পারিব। পথখরচ, খাওয়ার খরচ সবই এই টাকার ভিতর ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

জাহাজের নাম 'মনাকিয়া' (Mauna Kea). মনাকিয়া একটা পর্ব্বতের নাম;—হাওয়াই দ্বীপে ইহা অবস্থিত—উচ্চতা প্রায় ১২০০০ ফিট। এই পাহাড়ের নামানুসারে জাহাজের নাম রাখা হইয়াছে। জাহাজের মালিক আমেরিকান, খালাসী বাবুরচি এবং খান্‌সামা সকলেই জাপানী।

খানাবিভাগের এক কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আপনি কি ভারতবাসী?" "আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী"। বুঝা গেল এই ব্যক্তি পর্ত্তুগীজসন্তান—নাগপুরে এখন ইঁহার পরিবারস্থ লোকজন রহিয়াছে। ইনি একজন বাঙ্গালী মুসলমানের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে হনলুলুতে কার্য্য করিতেছেন। বহুকাল পরে স্বদেশী-লোকের সাক্ষাৎ পাইয়া পর্ত্তুগীজ মন খুলিয়া অনেক গল্প করিলেন। ভারতবর্ষের নামে ইঁহার সত্যসত্যই একটা মমতার স্মৃতি জাগিতেছে।

ইয়াঙ্কিস্থানের ফেডারাল-কেন্দ্র ওয়াশিংটন-নগরে একজন রেপ্রেজেন্টেটিভ বলিয়াছিলেন—"মহাশয়, আমরা শীঘ্রই ইয়াঙ্কিসাম্রাজ্যের দ্বীপপুঞ্জে বাহির হইব।" হনলুলুতে পৌঁছিয়া শুনিলাম, যুক্তরাষ্ট্রীয়-কংগ্রেসের কর্ত্তারা প্রায় দুই সপ্তাহকাল হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জে কাটাইয়া আমেরিকায় ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বীপবাসিগণ যারপরনাই আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সহরে সহরে ছোটলাট, বড়লাট, কমিশনার ইত্যাদির আগমনে যেরূপ উৎসব-আমোদ অনুষ্ঠিত হয়, ইয়াঙ্কির রাষ্ট্রনায়কগণের আগমনে প্রায় সেইরূপই হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজ বলিলেন—"মহাশয়, কয়েকদিন পূর্ব্বে কংগ্রেসের দল আমাদের এই জাহাজে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ দেখিয়া গিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের জন্য এই জাহাজখানা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাঁহাদের খরচপত্র তাঁহরাা নিজেই দিয়াছিলেন কি ?" পর্ত্তুগীজ বলিল—"হাওয়াই-টেরিটারির গবর্মেণ্ট হইতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। এইজন্য দৈনিক ৩০০০৲ খরচ হইত। কংগ্রেস-ওয়ালাদের দলে স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধবসহ প্রায় ১৫০ জন লোক ছিল।"

ওয়াহুদ্বীপ ছাড়িবার পর ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে মাওই দ্বীপে পৌঁছিলাম। এই দ্বীপও আগ্নেয় পর্ব্বতসমূহেরই উপাদানে গঠিত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্র আগ্নেয়গিরির প্রভাব বিদ্যমান। এই সকল পর্ব্বতে আজকাল অগ্ন্যুদ্গম প্রায়ই হয় না। কিন্তু হাওয়াই দ্বীপের একটা পর্ব্বতে জ্বলন্ত ধাতু ও প্রস্তরের গহ্বর দেখা যায়। এই গহ্বর দেখিবার জন্যই বাহির হইয়াছি।

মাওই দ্বীপে নামিলাম না। শুনা গেল, এইখানে এক চিনির কলে একজন ভারতীয় উচ্চশিক্ষিত এঞ্জিনীয়ার কর্ম্ম করিতেছেন। ইঁহার গৃহ উড়িষ্যা দেশে। আমেরিকায় ইঁহার শিক্ষালাভ হইয়াছে।

সকালে সাড়ে-ছয়টায় হাওয়াই দ্বীপে পৌঁছিলাম। বন্দরের নাম হিলো। এই নগর হনলুলু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। নানা উপায়ে ইহাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর প্রদর্শনীতে দেখিয়াছি, ক্যানাডা, ক্যালিফর্ণিয়া ইত্যাদি জনপদে, কৃষক, শ্রমজীবি ইত্যাদি জনগণকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত বহুপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নবীন ও উদীয়মান প্রদেশের উন্নতি এইরূপ সচেষ্ট প্রয়াসেই সাধিত হয়। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেও এখানকার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য "হাওয়াই-প্রোমোশন-কমিটি" উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

হিলো বন্দরেও নারিকেলের সারি দেখা গেল। জাহাজ হইতে নামিয়াই মোটর-কারে বসিলাম। সাতজন আরোহী—চালক জাপানী। হিলো নগরের কোথাও যাওয়া হইল না। দুই একটা রাস্তা মাত্র দেখান হইল। প্রদর্শক-কোম্পানীর উপর প্রোমোশন-কমিটি এইজন্য বিশেষ বিরক্ত। পর্য্যটকগণকে অন্ততঃ একবেলা হিলো নগরে কাটাইবার পরামর্শ দিবার জন্য কমিটি প্রদর্শক-কোম্পানীকে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করা যায়, ক্রমশঃ তাহাদের অনুরোধ অনুসারে কার্য্য হইবে। তাহা হইলে হিলো বন্দরে ভাল হোটেল, দোকান, বাসগৃহ, রাস্তাঘাট ইত্যাদির উন্নতি দ্রুত সাধিত হইবে।

হিলো সহরের সকল অঞ্চলেই স্থানীয় লোকজনের ভিতর জাপানীর সংখ্যা বেশী দেখিলাম। খাঁটি হাওয়াইসন্তান চোখে পড়িল না বলিলেই চলে। জাপানী-ভাষার বিজ্ঞাপন প্রায় প্রত্যেক দোকানেই দেখিতেছি—জাপানী বালকবালিকারাই রাস্তায় চলাফেরা করিতেছে। হিলো একটা জাপানী-নগর।

আকাশে, কিছু কিছু মেঘ আছে—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও মাঝে মাঝে পড়িতেছে। বাদলার দিনে বাঙ্গালা-দেশের মফঃস্বল যেরূপ, হিলো সেইরূপ বোধ হইল। প্রথমে নগরের নিকটে একটা জলপ্রপাত দেখিলাম। তাহার পর নগর ছাড়াইয়া চলিলাম।

মোটরে একজন ইয়াঙ্কি রমণী রহিয়াছেন। ইনি যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলাইনা প্রদেশে বাস করেন। ইনি কিউবাদ্বীপে অনেকবার

যাওয়া-আসা করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাওয়াই-দ্বীপ-পুঞ্জে ও কিউবা দ্বীপে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য নাই কি ?" রমণী বলিলেন —"প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্বাস্থ্য, জলবায়ু ইত্যাদি প্রায় একপ্রকার। কিন্তু কিউবার লোকজন অপেক্ষা হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণকে বেশী করিতকর্ম্মা বোধ হইতেছে। বোধ হয় জাপানী ও চীনা-জনগণের উপনিবেশ এখানে আছে বলিয়া উন্নতি বেশী দেখিতেছি।" গাড়ীতে একজন কিউবাবাসী ইয়াঙ্কি-এঞ্জিনিয়ার এবং একজন হনলুলুবাসী ইয়াঙ্কি সেনাপতি চলিয়াছেন। নানাপ্রকার গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হওয়া গেল।

এই পথে অজস্র পেয়ারাগাছ চোখে পড়িল। এতদ্ব্যতীত ইক্ষুক্ষেত্রও এই অঞ্চলের একটা বিশেষত্ব। যোজনব্যাপী প্রান্তরে এক মাত্র আখের চাষই হইতেছে। ইক্ষুদণ্ডগুলি বেশ সতেজ ও হৃষ্টপুষ্ট দেখাইতেছে। কিন্তু সাধারণ-কৃষিকার্য্য একপ্রকার নাই বলিলেই চলে; এমন কি, সমুদ্রের কিনারা ছাড়িয়া যাইবার পর আখের ক্ষেতও আর দেখিতে পাইলাম না; চারিদিকে বনজঙ্গল মাত্র বিরাজ করিতেছে। এই নিবিড় বনপথের ভিতর দিয়া মোটর চলিল। আগ্নেয়গিরির "লাভা"-প্রস্তরদ্বারা মোটরের রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানসেবীর পক্ষে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ মূল্যবান। আগ্নেয়-গিরির আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থান বুঝিবার জন্য দ্বীপগুলি ভূতত্ত্ববিদের ল্যাবরেটরীস্বরূপ। অধিকন্তু উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানবিদ্‌গণের পক্ষেও এই স্থান যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। সমুদ্রের কূল হইতে ত্রিশ মাইল আসিলাম। ক্রমশঃ ঊর্দ্ধভূমিতে উঠিয়াছি—শেষ পর্য্যন্ত ৪০০০ ফিট উচ্চ সমতলে পৌছান গেল। শিলিগুড়ি হইতে কার্সিয়াঙ্গে, অথবা কাঠগুদাম হইতে অল্-মোড়ায় উপস্থিত হইলাম। এই পরিমাণ ঊর্দ্ধভূমিতে উঠিতে থাকিলে

৬৭৮ পৃষ্ঠা

৬৫। হাওয়াই দ্বীপের পর্ণকুটীর

৬৮০ পৃষ্ঠা
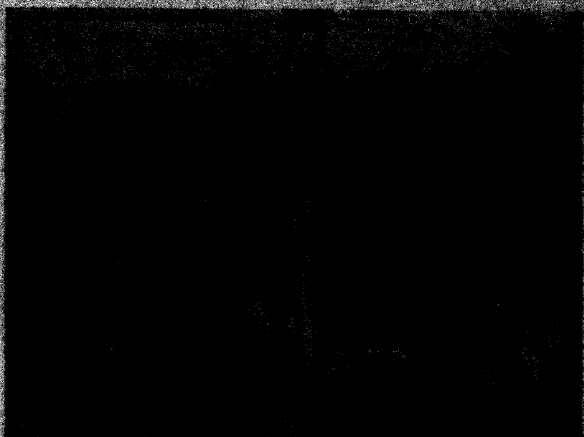
স্বভাবতঃই নূতন নূতন উদ্ভিদের পরিচয় পাওয়া যায়। মোটরে বসিয়া তাহা বেশ বুঝিলাম। হাওয়াই দ্বীপে উদ্ভিদ্‌রাশির বৈচিত্র্য সৃষ্ট হইবার অন্যবিধ কারণও আছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পার্ব্বত্য-উপকরণ আগ্নেয়গিরিজ লাভা হইতে ভূমির উপর পতিত হইয়াছে। তাহার ফলে অল্প পরিমাণ স্থানের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভূমি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। এই কারণে সামান্য সামান্য ব্যবধানেই বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই এই দৃশ্য দেখিতে লালায়িত হইবেন, সন্দেহ নাই।

যথাস্থানে আসিয়া হোটেলের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলাম। হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের বৃক্ষাদি সম্বন্ধে একখানা সুবৃৎ সচিত্রগ্রন্থ চোখে পড়িল। নাম 'The Indigenous Trees of the Hawaiian Islands' by J. F Rock. গ্রন্থকার বলিয়াছেন :—

"Naturally, an island like Hawaii still in process of formation, represents widely-ranging districts: Ancient lava-flows, deserts, dense tropical rain-forests, dry or mixed forests, new lava-flows bare of any vegetation, Alpine zones, and almost any climate from dry desert heat to the most humid air of the rain-forest, from tropical heat to ice and almost perpetual snow at the summit of the mountains. From a phylogeographic stand-point, the island of Howaii offers the most interesting field in the Pacific. All these various districts with their peculiar climates support many interesting types of plant-coverings."

অর্থাৎ "এই দ্বীপের ভূমি নানা প্রকার উপাদানে গঠিত। এখানকার জল বায়ুও এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকার। অধিকন্তু শীত গ্রীষ্মের তারতম্যও যথেষ্ট। কোথাও বা অত্যুষ্ণ জনপদ—আবার কোথাও বা চিরতুষার দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা মরুসদৃশ শুকনা ডাঙ্গা—কোথাও বা স্যাঁতস্যাঁতে বনময় প্রদেশ। এই কারণে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য এই ক্ষুদ্রাকৃতি দ্বীপে যত দেখিতে পাই অন্য কোন সুবৃহৎ ভূখণ্ডে তত না পাইবার কথা।"

হোটেল পর্য্যন্ত আসিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নজরে পড়িল ফার্ণ উদ্ভিদ্। হিমালয়-পর্ব্বতের নাতি উচ্চ-প্রদেশে বহুবিধ fernএর জন্ম হয়। তিন্-ধারিয়া, কার্সিয়াঙ্গ, দার্জ্জিলিঙ্গ ও কালিম্পঙ্গে নানাজাতীয় ফার্ণ দেখা যায়।

পথে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী অতিক্রম করিয়াছি। ঐ সকল পল্লীতে জাপানীদের গৃহই দেখিতে পাইলাম। হোটেলের খান্‌সামারা সকলেই জাপানী। এখানকার পরিদর্শক গ্রীক মালিক অবশ্য ইয়াঙ্কি। গৃহের নাম—"ভল্ক্যানো হাউস।"

কংগ্রেসের ধুরন্ধরগণ এই হোটেলেই আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র মন্তব্য-বহিতে দেখিলাম। কামরায় বসিয়াই তিন মাইল দূরে আগ্নেয়গিরি-গহ্বরের শ্বেতবাষ্প ও ধূম দেখিতে পাইতেছি। হোটেল হইতে প্রায় ৪।৫ শত ফিট নিম্নে এই ক্রেটার (crater) বা গহ্বর,—অল্প দূরেই উচ্চ পাহাড়। নাম 'মনালোয়া'; উচ্চতা ১৩৫০০ ফিট। মনাকিয়া পাহাড় এখান হইতে দেখা যায়। তাহার উচ্চতা ১৪০০০ ফিট। প্রশান্ত-মহাসাগরে ইহাই উচ্চতম পর্ব্বত।

প্রশান্ত-মহাসাগরের "জ্বালামুখী"

এতদিন ভূতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে আগ্নেয়-গিরির চিত্র দেখিয়াছি। তাহা হইতে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পিরামিডাকৃতি পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে ধূম, বাষ্প, অগ্নি, প্রস্তর, ধাতু ইত্যাদি নির্গত হয়। ভাবিয়াছিলাম, এইরূপ উচ্চ পর্ব্বতের শিরোভাগ হইতেই গলান "লাভা" বা গিরিজ-পদার্থসমূহের উদ্‌গীরণ দেখিতে পাইব। কিন্তু যথাস্থানে আসিয়া কিছু নিরাশ হইলাম। মনে পড়ে, বৃন্দাবন হইতে ত্রিশ মাইল দূরে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত দেখিতে গিয়াছিলাম। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি, পাহাড়-পর্ব্বতের নামগন্ধও নাই, এমন কি রাত্রিকালে কোন উচ্চভূমিও দেখিতে পাইলাম না। পাণ্ডামহাশয় বলিলেন—"এই সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসুন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দেখিতে পাইবেন!" আজ ভল্‌ক্যানো-হাউসে পৌঁছিয়া সেই কথাই মনে পড়িতেছে; কারণ আগ্নেয়গিরি আমার পাদদেশে! এই পর্ব্বত দেখিবার জন্য প্রায় ৩০০।৪০০ ফিট নিম্নে নামিতে হইবে। হোটেল অগ্ন্যুদ্‌গমের ক্রেটার বা গহ্বর হইতে উচ্চতর ভূমিতে অবস্থিত। ঘরে বসিয়া বুঝিতেছি, যেন একটা প্রকাণ্ড অল্লোচ্চ মাঠের একস্থান হইতে শ্বেত-বাষ্প উড়িয়া আসিতেছে। বোধ হয় প্রান্তরের জনগণ গাছপাতা পোড়াইতেছে!

হোটেলের বাগানে দাঁড়াইয়া আর একটা পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। ইহাকে পাহাড় বলিয়া সম্মান করিতে ইচ্ছা হয়। ইহার উচ্চতা মন্দ নয়, ত্রিকূটাকার শৃঙ্গও আছে। এই পর্ব্বতের মাথা হইতে যদি শ্বেত ধূম ও বাষ্প ইত্যাদি বাহির হইত, তাহা হইলে সত্যসত্যই আগ্নেয়গিরি দেখার

সাধ মিটিত। শুনিলাম, এই পাহাড়েরও একটা শৃঙ্গ হইতে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুদ্‌গম থাকে হইয়া। আট দশ বৎসর পর একবার করিয়া এই শৃঙ্গ আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়। এই বৎসর হইবার সম্ভাবনা করা যাইতেছে। কিন্তু এখনও কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। এক্ষণে ঐস্থানে গেলে গিরিশৃঙ্গের ভিতর নীরব, শান্ত, বাষ্পহীন, ধূমহীন গহ্বর মাত্র দেখা যাইবে। কাজেই ঐ পাহাড়ে উঠিয়া লাভ নাই। নিকটবর্ত্তী প্রান্তর-সদৃশ পাহাড়ের অগ্নিকাণ্ড দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মোটর-কারে বসিলাম। হোটেলের অনতি-দূরে একটা বাগান। ইহার ভিতর বহুসংখ্যক কূপ-সদৃশ গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া গেল। গভীরতা ১৫।২০ ফিট মাত্র। ভিতরে জল নাই। কিন্তু কূপগুলির প্রাচীর বেশ বাঁধান। এই জনপদের সর্ব্বত্র জমাট "লাভা"-প্রস্তরের টুকরা অথবা চাপ দেখিতে পাই। কূপগুলির প্রাচীরও এইরূপ লাভাদ্বারা গঠিত। প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই বাগানে দেখিবার বস্তু কি আছে?" উত্তর পাইলাম—"এই গর্ত্তগুলি।" এই গুলির নাম ট্রী-মোল্ডস্ (Tree Moulds) বা গাছের ছাঁচ। যাঁহারা সোনারূপা গলান অথবা অন্যবিধ ধাতু ঢালাইয়ের কাজ দেখিয়াছেন, তাঁহারা মোল্ড বা ছাঁচের ব্যবহার জানেন। কিন্তু এই সমস্ত বৃক্ষ-ছাঁচের অর্থ কি?

প্রদর্শক বলিলেন—"ঐ যে অদূরে উচ্চ মনালোয়া পর্ব্বত দেখিতেছেন, উহা আগাগোড়া আগ্নেয়পর্ব্বত ছিল। সে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। এক্ষণে কখনও কখনও একটিমাত্র শৃঙ্গে অগ্নি-গহ্বর ও অগ্নি-হ্রদ সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহাহউক, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঐ পর্ব্বতের তরল অগ্নিময় লাভা এই সকল মাঠে বাগানে গড়াইয়া পড়িত। এইরূপ অগ্নিকাণ্ডের ফলে বৃক্ষসমূহ ভস্মে পরিণত হইয়াছে। বৃক্ষগুলির গুঁড়ি

৬৮২ পৃষ্ঠা

৬৮৪ পৃষ্ঠা

৬৭। আগ্নেয়গিরির হোটেল

৬৮। জমাট লাভার প্রান্তর
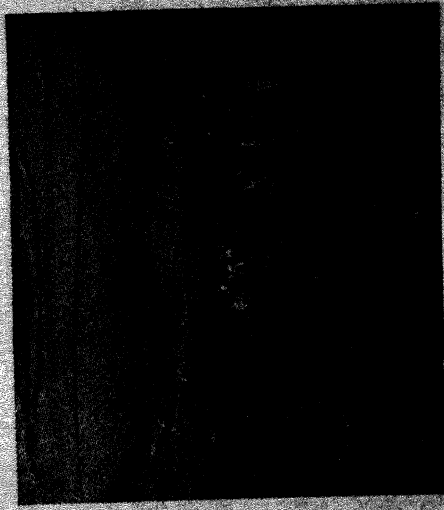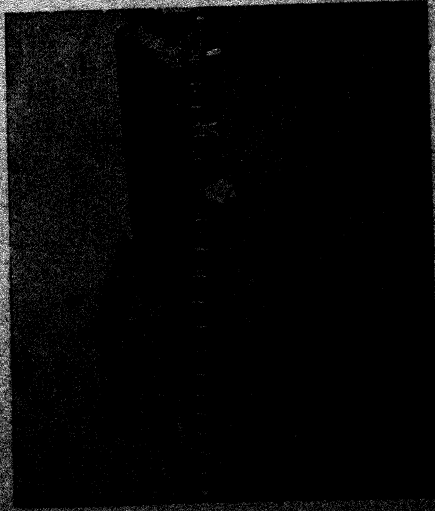
যতখানি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ছিল ততখানি আজকাল কূপে পরিণত দেখিতেছেন। সেই লাভা বাঁধিয়া কূপগুলির প্রাচীর-গঠন করিয়াছে। একমাত্র এই দৃশ্য দেখিবার জন্যই ভূতত্ত্ববিদেরা এই অঞ্চলে আসিলে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার সার্থক হইবে।"

হোটেলের পশ্চাতেই গন্ধক-পর্ব্বত। নিকটে যাইয়া দেখি, অল্প-বিস্তৃত ভূমিখণ্ড গন্ধক-শিলায় সমাবৃত রহিয়াছে। গন্ধকচূর্ণ, গন্ধকস্তূপ ইত্যাদি স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বোধ হয় গন্ধকের লেশও নাই। এখানকার সর্ব্বত্র-বিরাজিত লাভারাশির উপরে গন্ধকের আবরণ পড়িয়াছে। নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ গর্ত্ত এবং সঙ্কীর্ণ ও বিস্তীর্ণ খালের ভিতর দিয়া শ্বেত ও পীত ধূম বাহির হইতেছে। এই ধূম গন্ধকের গুঁড়া সঙ্গে লইয়া উত্থিত হয়। কোন কোন স্থানে সূচ্যাকৃতি গন্ধক পর্ব্বতগাত্রে লাগিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্র গন্ধকের গন্ধ পাইতেছি। গন্ধকের ধূমে নিকটবর্ত্তী উদ্ভিদ্‌রাশির পত্রাবলী বর্ণহীন হইয়া গিয়াছে। মিশরের আসোয়ান পল্লীতে গ্রাণাইট-পর্ব্বত ও গ্রাণাইট-ধূলি দেখিয়াছিলাম। গন্ধকের বাষ্পে স্নান করিবার ব্যবস্থা আছে। হোটেলের কর্ত্তারা তাহার এক আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন ; মূল্য দিতে হয় দেড় টাকা।

এইবার মোটরকার ছাড়িয়া পদব্রজে কিছু "য়্যাড্‌ভেঞ্চার" বা অভিযান করিতে বাহির হইলাম। সঙ্গে চলিলেন কিউবার এঞ্জিনিয়ার এবং হনলুলুর সেনাপতি। হোটেল হইতে খাড়া প্রায় ৫০০ ফিট নামিয়া গেলাম। পার্ব্বত্য বনজঙ্গলের ভিতর পথ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রায় পনর মিনিট হাঁটিয়া জমাট-লাভার মাঠে উপস্থিত হইলাম। এই মাঠ হইতে চারিদিকে তাকাইয়া দেখি, এক সুবিশাল গর্ত্তের ভিতর রহিয়াছি। এই গর্ত্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫।৬ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ২।৩ মাইল। প্রায় ৪০০।৫০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতগাত্র এই গর্ত্তের প্রাচীর-স্বরূপ।

"লাভার"-মাঠে তরুলতা কিছুই নাই। কৃষ্ণবর্ণ পোড়া-কয়লা অথবা ঝামার চাপ পড়িয়া রহিয়াছে। উপরে ধূলাবালু কিছুই নাই। সুবিস্তৃত লাভা-প্রান্তরকে যোজনব্যাপী কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের ন্যায় বোধ হইতেছে; অথবা কৃষ্ণধূসর হস্তী বসিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, এই লাভা-ময়দান সেইরূপ দেখাইতেছে। এই সকল সমতল প্রান্তরের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। কোন স্থানে বোধ হইল যেন একটা সুবৃহৎ তরুবর আগাগোড়া লাভা-প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। কোথাও বা গিরিজ-পদার্থ স্তরবিন্যস্ত-সোপান পরম্পরার আকার গ্রহণ করিয়াছে। দ্রবীভূত উষ্ণপদার্থসমূহ শীতল হইবার সময় বিচিত্ররূপধারী হইয়া রহিয়াছে। লাভাময়দানের বিচিত্র রূপ দেখিতে দেখিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম। বুঝা গেল, খানিকটা উর্দ্ধভূমিতে উঠিয়াছি। এই স্থান হোটেল হইতে বহুনিম্নে নয়। লাভা-প্রান্তরের পাদদেশ হইতে শিরোভাগ প্রায় ২০০।৩০০ ফিট উচ্চ।

ক্রমশঃ বাষ্প ও ধূমের রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। ছোট বড় নানা দিক হইতে শ্বেত বাষ্প বাহির হইতেছে। দেখিতে দেখিতে বাষ্পমণ্ডলে ঢাকা পড়িয়া গেলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লাভা-ময়দানের উচ্চতম স্থানে উপস্থিত হওয়া গেল। এইখানেই বিরাট গহ্বরের কিনারা। গহ্বর হইতে অবিরাম শ্বেতধূম নির্গত হইতেছে। ইহার ভিতর তলদেশে টগ্‌বগ্‌ ও ছপাস্ ছপাস্ শব্দ শুনিতে পাই-তেছি; কিন্তু অগ্নিশিখা দেখিতে পাইতেছি না।

হনলুলুর সেনাপতি বলিলেন—"মহাশয়, হাওয়াই-দ্বীপ যুক্ত-রাজ্যের অধীন হইবার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি এই আগ্নেয়-গিরি প্রথম দেখি। তখন আমি গহ্বরের এত নিকটে আসিতে পারি নাই। কারণ তখন গহ্বর ছাপাইয়া উঠিয়া দ্রবীভূত উষ্ণ লাভা বাহির হইত। লাভার স্রোত বহুদূর হইতেই দেখিয়াছিলাম।

ক্রমশঃ আগ্নেয়গিরির শক্তি কমিয়া আসিয়াছে। আজকাল এই অগ্নিকুণ্ডের তরলরক্তিম পদার্থসমূহ ক্রেটার ভেদ করিয়া উঠে না। তবে মাঝে মাঝে গহ্বরের অল্প নীচেই গিরিবরের আগ্নেয়লীলা দেখিতে পাই। এক্ষণে প্রায় ৫০০।৬০০ ফিট নিম্নে অগ্নিকুপের রক্তোষ্ণ জল ফুটিতেছে।"

গন্ধকময় ধুমের গন্ধে হাঁচি কাসি ইত্যাদি ভোগ করিতে হইল। গহ্বরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলাম। একস্থানে ক্ষুদ্র কাষ্ঠগৃহ নির্ম্মিত রহিয়াছে। ইহাতে বষ্টনের "ম্যাসাচুষেট্‌স্ অব্ টেক্‌নল্যাজি" ভূতত্ত্ববিভাগ, পরীক্ষাগৃহ ও যন্ত্রগৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন। একটা মোটা লোহার তার গহ্বরের এক কিনারা হইতে অপর কিনারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে। ইহাতে শিশি ঝুলাইয়া গহ্বরের নিম্নতম প্রদেশ হইতে বাষ্প গ্যাস ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। শুনিলাম, এইরূপে সংগৃহীত গ্যাসের বোতল ওয়াশিংটন নগরের বিজ্ঞানালয়ে পাঠান হইয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তিনচারিটা মটর-কারে বহু সংখ্যক টুরিষ্ট গহ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। একদল ইতালীয় সঙ্গীত-কোম্পানীর সঙ্গে অনেক গায়িকা আসিয়াছেন। পুরুষেরা ইহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন—"খবরদার বাষ্প ও ধূম হইতে বহুদূরে থাকিবে। গলার আওয়াজ নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।"

আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে থাকিলে অগ্নিকূপের তলভাগে তাণ্ডবলীলা কিছু কিছু দেখিতে পাইলাম। এক এক বার পলকের জন্য বিদ্যুৎ-রেখার মত তরল আগুনের চমক দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রকাণ্ড কড়া বা গামলার ভিতর দ্রবীভূত লাল লাভা নৃত্য করিতে লাগিল। লীডস্, ম্যাঞ্চেষ্টার ইত্যাদি নগরের বড় বড় লৌহ-কারখানায় গলান ধাতুর নদী দেখিয়াছি। সেইরূপ শত শত নদীর সমবায়ে এই অগ্নিকাণ্ড

গঠিত। হাওয়াই-বাসীরা এই অগ্নিকুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে "পিলি" নাম দিয়াছে। আমাদের "জ্বালামুখী" এই ধরণের।

রাত্রিকালে হোটেলে ফিরিলাম। মোটর-কার হইতে একটা নীরব, শীতল আগ্নেয়-গহ্বর দেখিতে পাইলাম। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠিয়াছে। চন্দ্র অস্ত যাইবার পর শয়ন-গৃহ হইতে বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখি—

"মহা অগ্নি জ্বলিল রে,
আকাশের অনন্ত হৃদয়,
অগ্নি, অগ্নি,অগ্নি, শুধু অগ্নিময়, ।"

দিবাভাগে যেখানে শ্বেত-বাষ্পরাশি দেখা যাইতেছিল, অন্ধকাররাত্রে সেখানে আকাশস্পর্শী অগ্নিস্তম্ভ দেখিতে পাইতেছি। অগ্নিশিখা অত ঊর্দ্ধে উঠে নাই। গহ্বরতলের তরল-লাভার প্রভাবে সমস্ত আকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে।

রাত্রি এখন একটা ;—সম্মুখে বিকট শ্মশানের চিতা ধূধূ করিতেছে, আশে-পাশে সম্মুখে-দূরে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। গৃহের আলো মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। দেড়মাইল দূরে অন্ধকারভেদী ভয়ঙ্কর অগ্নিস্তম্ভ! গুণগুণ করিয়া গান ধরিয়া দিলাম—

"শ্মশান ভালবাসিস্ বলে' শ্মশান করেছি হৃদি ;
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি বলে' নিরবধি।"

বর্ত্তমান-যুগের ধর্ম্মজ্ঞান

কিলাওয়া (Kilauea) পাহাড় বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। কাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বহুলোক এখানে আরাম করিতে আসে। "ভল্‌ক্যানো-হাউসে" কয়েকজন স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হইল। এই হোটেলের নিকট আর একটিমাত্র গৃহ আছে। ইহা অবজার্ভেটরী বা পর্য্যবেক্ষণালয়। আগ্নেয়গিরি-সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহের জন্য এই বিজ্ঞানমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-পরিষদের নাম "হাওয়াইয়ের আগ্নেয়গিরি-পরীক্ষা-সমিতি।" ইয়াঙ্কিস্থানের ম্যাস্যাচুসেটস্ প্রদেশের কয়েকজন বিজ্ঞানসেবীর চেষ্টায় এবং স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে এই ল্যাবরেটরীর সূত্রপাত হইয়াছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একজন ভূতত্ত্ববিৎ এই গৃহের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মাত্র দুই তিন বৎসর হইল এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে।

কিলাওয়া পাহাড় দুই শ্রেণীর লোকের পক্ষে তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ। (১) স্বাস্থ্যান্বেষী ধনবান্ ব্যক্তিগণ সময় কাটাইবার জন্য এখানে আসেন। (২) বিজ্ঞানসেবী পণ্ডিতগণ ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য এখানে আসেন। এই অঞ্চলের আকরে কোন প্রকার মূল্যবান্ ধাতু উৎপন্ন হয় কিনা, তাহা দেখিবার জন্যও ব্যবসায়ী ও শিল্প-ধুরন্ধর ব্যক্তিগণের সমাগম এই স্থানে হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগে এই ধরণের তীর্থক্ষেত্রই দুনিয়ায় স্থাপিত হইয়াছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মানবজাতি নূতন ধরণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মন্দির-মঠে অলৌকিক দেবতত্ত্ব প্রচারিত

হইত। উপাসনা, প্রার্থনা, আরতি, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি এই সকল মন্দিরের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি ছিল। আজকাল সেই সকল মন্দির আছে সত্য; এবং সেই ধরণের নূতন মন্দিরাদি সর্ব্বত্রই তৈয়ারিও হয় সত্য; কিন্তু সেই সমুদয় হইতে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছে। সেগুলিতে কোন প্রাণ দেখা যায় না। বর্ত্তমান যুগে মানবের প্রকৃত জীবন অন্য রকমের মন্দিরে দেখিতে পাই। মানবাত্মা এক্ষণে বিজ্ঞান-গৃহে, লাইব্রেরীতে, মিউজিয়ামে, পর্য্যবেক্ষণালয়ে শিল্প-কারখানায় এবং বিদ্যালয়ে আনন্দ উপভোগ করে। এই সমুদয় ভবনই বর্ত্তমানযুগের যথার্থ মন্দির। এই সমুদয় প্রতিষ্ঠান যে সকল স্থানে রহিয়াছে, সেই সমুদয় স্থানই বর্ত্তমান মানবের তীর্থক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। মানুষের উৎসাহ, তেজ, শক্তি, ভাবুকতা, জীবনবত্তা এই সকল নূতন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান-গঠনে সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করে। দেবতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, স্বর্গনরকতত্ত্ব ইত্যাদির আলোচনায় মানুষ আজকাল সময় কাটাইতে চাহে না। তাহার শক্তি, ভক্তি, বুদ্ধি, সবই এক অভিনব ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে। যাঁহারা এই নূতন ছাঁচে-ঢালা ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহারা বর্ত্তমান মানবকে অধর্ম্মী বা ধর্ম্মহীন বিবেচনা করিতে পারেন।

ইয়োরামেরিকায় ত এইরূপ দেখিতেছি। বর্ত্তমান ভারতে কি দেখিতে পাই? বর্ত্তমান ভারতবাসী স্বাধীন ভাবে জীবনী-শক্তির কোন লক্ষণ দেখাইতে পারিয়াছেন কি? সত্য, কথা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারত তাহার স্বকীয় সন্তানের কোন গৌরবসূচক কার্য্য বা চিন্তা প্রকটিত করে নাই। বর্ত্তমান ইয়োরামেরিকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির নকল আমাদের দেশে কিছু কিছু প্রবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। নবযুগের অভিনব ধর্ম্ম ভারতে অল্পমাত্র আমদানি হইয়াছে—ভারতবাসী স্বয়ং কোন জীবনী-

শক্তির নূতন পরিচয় দিতে পারে নাই। যতটুকু দিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য নয় বলিলে বিশেষ দোষ হইবে না। কাজেই আমাদের বিজ্ঞান-মন্দির, শিল্পশালা, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয়, অনুসন্ধান-সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি নিতান্তই অবজ্ঞেয়। দুনিয়ায় ইহাদের কোন প্রভাব নাই। বর্ত্তমান জগতে আমাদের কোন স্থান নাই। আমরা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যথার্থ নাস্তিক, ম্লেচ্ছ, শূদ্র ও চণ্ডাল। জগতের লোক আমাদিগকে ধর্ম্মহীন ও অস্পৃশ্য বিবেচনা করে।

প্রাকৃতিক-শক্তিপুঞ্জ যেখানে বিশিষ্ট আকারে দেখা দেয়, বর্ত্তমান ইয়োরামেরিকানেরা সেখানে কল, যন্ত্র, কারখানা, হোটেল, পার্ক, স্বাস্থ্য-নিবাস ইত্যাদি স্থাপন করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবাসী সেখানে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিত। বর্ত্তমানযুগের ভারতবাসী সেখানে কি করিবে? তাহা ত এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। কেন না আধুনিক ভারতের কোন লোক স্বাধীনভাবে কোন কাজ করে না। করিলে ভাল মন্দ বুঝা যাইত। যাহাহউক, প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবাসীর ধর্ম্মজ্ঞান হইতে "চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য", "জ্বালামুখী-মাহাত্ম্য", "সীতাকুণ্ড-মাহাত্ম্য" ইত্যাদির উদ্ভব হইয়াছিল। যেখানে দুই প্রবল স্রোতস্বতীর সঙ্গমস্থল, সেখানে হিন্দুরা তীর্থরাজ 'প্রয়াগ' স্থাপন করিয়াছিল। যেখানে তরঙ্গায়িত উচ্চভূমির পার্শ্বে গঙ্গা উজান বহিতেছে, সেখানে হিন্দুরা মহাদেবের ত্রিশূলের উপর কাশী স্থাপন করিয়াছিল। নদী, সমুদ্র, পাহাড়, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, প্রাকৃতিক অগ্নিশিখা, স্বাস্থ্যকর স্থান,—ইত্যাদির কোথাও বা হরিদ্বার, কোথাও বা পুরী-দ্বারকা, কোথাও বা দেওঘর, অমরকণ্টক, কাঞ্চী, মথুরা স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে সমগ্র ভারতবর্ষেই হিন্দুর জ্ঞানে তীর্থস্থান—হয় বুদ্ধদেবের সমাধিস্থান, না হয় আদ্যাশক্তির পীঠস্থান। এই গেল পুরাতন ভারতের কথা।

বর্ত্তমান-যুগের ভারতবাসী এই ধরণের তীর্থস্থান নূতন একটাও গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। এমন কি, এক্ষণে আমরা প্রাচীন কেন্দ্র-সমূহেও প্রকৃত আস্থা-স্থাপন করি না। এদিকে ইয়োরামেরিকান-প্রবর্ত্তিত নব নব তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠায়ও আমরা যৎপরোনাস্তি পশ্চাৎপদ। এই জন্যই বলিতে হয়, ভারতবর্ষ মরিয়া গিয়াছে এবং এই মৃত-ভারতে প্রাচীন বা নবীন কোন প্রকার ধর্ম্মই নাই। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ধর্ম্মহীন জাতি ভারতবাসী। গভীরভাবে বুঝিলে দেখিব—বর্ত্তমান ইয়োরামেরিকায় ধর্ম্মজ্ঞান যথেষ্ট প্রবল;—একমাত্র বর্ত্তমান ভারতেই ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব। সুতরাং তথাকথিত মামুলি আধ্যাত্মিকতার বড়াই করা আধুনিক ভারত-বাসীর পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। যে সমাজে জীবন নাই—সেই সমাজে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান-ভারতে প্রাচীন-জীবনের খোলসমাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার যথার্থ বেগ ও ধারা নাই। আর নবীন-জীবনের বেগ এবং ধারাও বর্ত্তমান-ভারতে বিশেষ প্রকটিত নয়; বিদেশ হইতে তাহার সামান্য মাত্র এখানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা অন্য কোন জাতির ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছে কি? মরা বাসি ও পচা ভারতে তাজা জীবনের ধর্ম্ম কোন দিন দেখা দিবে কি?

ভূমিকম্প-বিজ্ঞান

পর্য্যবেক্ষণালয়ের তত্ত্বাবধায়ককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই সকল দ্বীপপুঞ্জের পর্ব্বতে শিল্পোপকরণরূপে ব্যবহারযোগ্য ধাতু পাওয়া যায় কি ?" তিনি উত্তর করিলেন—"নিতান্ত অল্প—এক প্রকার না বলিলেই চলে। আকর খুঁড়িবার খরচ পোষাইবে না। এইজন্য মাইনিং ধাতু খনন-কার্য্য, ধাতুক্রিয়া, ধাতুশোধন, মেট্যালার্জ্জি ইত্যাদির কারখানা হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জে আদৌ নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহা হইলে আপনারা কি একমাত্র আগ্নেয়গিরির লীলা বুঝিবার জন্য এইস্থানে বিজ্ঞানমন্দির স্থাপন করিয়াছেন ? আগ্নেয়গিরি-পরীক্ষাসমিতি, ম্যাসাচুষেটস্ ইন্‌ষ্টিটিউট এবং কার্নেগী ইন্‌ষ্টিটিউটের পণ্ডিতগণের কার্য্য-বিবরণী ও অনুসন্ধানফল প্রকাশিত হইয়াছে কি ?" তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—"আমাদের হস্তে এখনও প্রচুর পরিমাণে তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। পৃথিবীর কম্পন-গণনাই বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র কার্য্য।"

এই বলিয়া তত্ত্বাবধায়ক তাঁহার পর্য্যবেক্ষণালয়ের নিম্নতলস্থ গৃহে লইয়া গেলেন। ভূমিকম্প মাপিবার কয়েকটা ক্ষুদ্র বৃহৎ যন্ত্র এইখানে দেখিতে পাইলাম। যন্ত্রের নাম "সীস্‌মোগ্রাফ" (Seismograph). যন্ত্রগুলি ঘরের লাভা-মেজের সঙ্গে গাঁথা। ভূমির সামান্যমাত্র নড়ন চড়ন হইলেই যন্ত্রদ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়। তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—"বিগত দুই বৎসরে সর্ব্বসমেত ৭০০ বার ভূমিকম্প এই অঞ্চলে হইয়াছে। যন্ত্রের সাহায্য না পাইলে আমরা সেইগুলির অধিকাংশই বুঝিতে পারিতাম না।"

ভূমিকম্প-বিজ্ঞানের এক্ষণে শৈশবাবস্থা চলিতেছে। জর্ম্মানেরা এই বিদ্যায় অগ্রণী। তাঁহাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি একজন রুশ-বৈজ্ঞানিক নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহার সাহায্যে পৃথিবীর কোন্ দিকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্বে দিক্ বুঝিতে পারা যাইত না—কেবল দূরত্বমাত্র অনুসরণ করা যাইত।

তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—"১৯০৫ সালে ভারতের শিম্‌লাপাহাড়ে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহা টোকিওর পর্য্যবেক্ষণালয়ে জানিতে পারা গিয়াছিল। কিন্তু সেখানকার বৈজ্ঞানিকেরা দূরত্বমাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন—পৃথিবীর কোন্ দিক্ হইতে তরঙ্গ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ধরিতে পারেন নাই। এক্ষণে রুশ-যন্ত্রের সাহায্যে তাহাও পারি।"

পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপ আছে, একথা সকলেই জানে। তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—"কিন্তু এই তাপের ফলে ভূগর্ভস্থিত পদার্থসমূহ গলিয়া তরল ভাবে রহিয়াছে, কি শক্ত ভাবেই আছে, তাহা সুনিশ্চিত রূপে বলা কঠিন। এতদিন বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত উষ্ণপদার্থসমূহ দ্রবীভূত। কিন্তু ভূমিকম্পের সময়ে যে প্রণালীতে কম্পন পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়, তাহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরল পদার্থ থাকিলে কম্পনের রেখা ও রীতি অন্য ধরণের হইত। এই কারণে কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন—প্রচুর উত্তাপ সত্ত্বেও ভূগর্ভের পদার্থসমূহ দ্রবীভূত হয় নাই।"

যথাসময়ে ফার্ণ-সমাবৃত-পথে জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। হাওয়াই-সন্তানগণ এবং জাপানীরা ষ্টেসনে আত্মীয়-স্বজনকে বিদায় দিতেছে। ফুলের মালা ব্যবহার করা এদেশে একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দেখিতেছি। জাপানীরা অনেকটা হিন্দু-কায়দায় মাথা ঝুঁকাইয়া লোকজনের অভিবাদন

করে। মাদুর, চাটাই, সতরঞ্চি ইত্যাদি বিছাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর জাপানী আরোহীরা জাহাজের নিম্নতম ডেকে বসিয়া আছে। আমরা ভারতবর্ষে এইরূপেই ষ্টীমারে চলাফেরা করি। তিনচারিঘণ্টা পর্য্যন্ত জাহাজ দ্বীপের পার্শ্ব দিয়া চলিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। যেন পদ্মার উপর নৌকা চালাইয়া সান্ধ্য-সমীরণ উপভোগ করিতেছি।

চিনির কল

হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা দুইলক্ষ মাত্র। বাঙ্গালাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলায় ইহার চারিগুণ লোক। গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভূমি, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি অনেকটা এক ধরণের। সুতরাং আশা করা যায়, বঙ্গীয় জেলার ধনসম্পদ শ্রীসমৃদ্ধি চারিগুণ হইবে।

হনলুলু ও হিলো নগরদ্বয় দেখিয়া বিপরীত বোধ হইতেছে। ইয়াঙ্কিস্থানের কোন নগরের সঙ্গে এই দুই নগরের তুলনা চলে না। কিন্তু আধুনিক ভারতের যে কোন নগরের অপেক্ষা এই নগরদ্বয় অধিকতর সমৃদ্ধিসম্পন্ন মনে হইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি কয়েকটা রাজধানীর কথা ছাড়িয়া দিলাম।

দুইলক্ষ নরনারীর ভিতর ত্রিশহাজার বালকবালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই দৃশ্য ভারতবর্ষে দেখিতে পাইব না। স্থানীয় জনগণের আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। দারিদ্র্য এই সমাজে নাই। চীনা ও জাপানীজাতীয় লোকের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। তাহারা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে—স্বদেশে তাহাদের অবস্থা সুখকর ছিল না।

"The Industrial Condition of Women and Girls in Honolulu" অর্থাৎ "নারী মজুরদিগের আর্থিক অবস্থা" নামক পুস্তকে নিউইয়র্কের Frances Blascoer বলিতেছেন :—

"Work-rooms are not over-crowded ; the air and light are always good ; there is no high-speed machinery ;

no processes dangerous to life and limb are unguarded ; fines and penalties are unknown ; shop-girls work only eight hours a day, have an annual vacation with full-pay for two weeks in most shops and of at least one week in all ; clerks, stenographers and teachers may well feel that they have found here their earthly paradise both as regards hours and salaries."

অর্থাৎ "কারখানার ঘরগুলি বেশ ফাঁকা। লোকের ঘেঁশাঘেঁশি হয় না। কল কব্জার বাহুল্য নাই। শ্রমজীবীরা আয়েসে কাজ কর্ম্ম করিতে পারে। দৈনিক আট ঘণ্টা মাত্র কাজ। প্রায় কারখানায় বৎসরে দুই সপ্তাহ ছুটি। ছুটির সময়েও বেতন দেওয়া হয়। বর্ত্তমান কালে হাওয়াইয়ের কারখানাগুলি কুলী-কেরাণী-শিক্ষকগণের নন্দনকানন আর কি!"

হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ সুবিশাল প্রশান্ত-মহাসাগরের কেন্দ্রস্থলে ধূলিকণা মাত্র। কয়েক বৎসরের ভিতর এখানে সকল বিষয়ে যারপরনাই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইয়াঙ্কিস্থানের মধ্য-পশ্চিম এবং মহাপশ্চিম জনপদসমূহ ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে টেরিটারিমাত্র ছিল। হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ এক্ষণে সেই ধরণের টেরিটারি—কালে পূর্ণাধিকারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, আশা আছে।

হাওয়াইয়ের আদিমবাসিগণের সংখ্যা বর্ত্তমানে অতি অল্প—সমগ্র লোকসংখ্যার চতুর্থাংশ মাত্র। ইহাদের নিজস্ব কিছু নাই—ইহারা ইংরাজী ভাষাকেই মাতৃভাষা বিবেচনা করিতে শিখিয়াছে। অন্যান্য সকল বিষয়ে ইহারা খাঁটি ইয়াঙ্কি-আদর্শে গড়িয়া উঠিতেছে। জাতীয়তা, স্বদেশী, প্রাচীন গৌরবের অভিমান ইত্যাদি মনোভাব হাওয়াই-সন্তান-গণের চিত্তে স্থান পায় না। আমেরিকার লোহিতাঙ্গ-ইণ্ডিয়ানদিগের

যে অবস্থা, হাওয়াই-সন্তানগণেরও সেই অবস্থা। ইহারা ইয়াঙ্কিদিগকে বিদেশীয় বিজেতা জ্ঞান করে না—ইয়াঙ্কিরাও হাওয়াই-বাসিগণকে বিজিত জাতি বিবেচনা করে না। ইয়াঙ্কি-সমাজ বিস্তৃত হইতে হইতে প্রশান্ত-মহাসাগর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। সেই বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদিমজাতিপুঞ্জ ন্যূনাধিক পরিমাণে ইয়াঙ্কি-সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়াছে। সেইরূপ সম্প্রতি ইয়াঙ্কি-সমাজ হাওয়াই-দ্বীপ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে—হাওয়াই-সন্তানগণ প্রাচীন ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি-নীতি বর্জ্জন করিয়া খৃষ্টান ইয়াঙ্কি-সভ্যতা গ্রহণ করিতেছে। সুতরাং আদর্শের দ্বন্দ্ব, ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব, ভাষার দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

হাওয়াই-দ্বীপ-পুঞ্জের যত গোলমাল জাপানীদের লইয়া। তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক। খাঁটি হাওয়াই-সন্তান অপেক্ষা জাপানী-ঔপনিবেশিক-গণের সংখ্যা বেশী। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ব্যবসায়ে, শিল্পে, সকল বিভাগেই জাপানীরা এখানে উন্নত। ইহারা তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম, স্বদেশী সভ্যতা ইত্যাদি বর্জ্জন করিতে চাহে না। হাওয়াই-দ্বীপ-পুঞ্জকে ইয়াঙ্কিস্থানের প্রকৃত অঙ্গে পরিণত করিবার পথে জাপানীদের স্বদেশী-আন্দোলনও প্রকাণ্ড অন্তরায়। এই কারণে জাপানীদিগকে কোন উপায়ে এখান হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলে ইয়াঙ্কিরা বাঁচিয়া যায়; কিন্তু এই বহিষ্কার সহজসাধ্য নহে।

একজন ভারতীয় যুবকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইহার গৃহ সিন্ধুদেশে;—বয়স ১৯।২০ মাত্র। হনলুলু নগরে একটিমাত্র ভারতীয় বণিকের দোকান আছে। এই যুবক তাহার তত্ত্বাবধায়ক। বিগত সাত বৎসর হইতে সে ভারতবর্ষের বাহিরে আছে। শ্যামদেশের ব্যঙ্কক নগরে প্রায় পাঁচ বৎসর ছিল। তাহার পর ফিলিপাইন্-দ্বীপের ম্যানিলা নগরে কিছুকাল কাটাইয়াছে। চীন এবং জাপানের কোন কোন নগরও

পৃষ্ঠা ৬৯৬
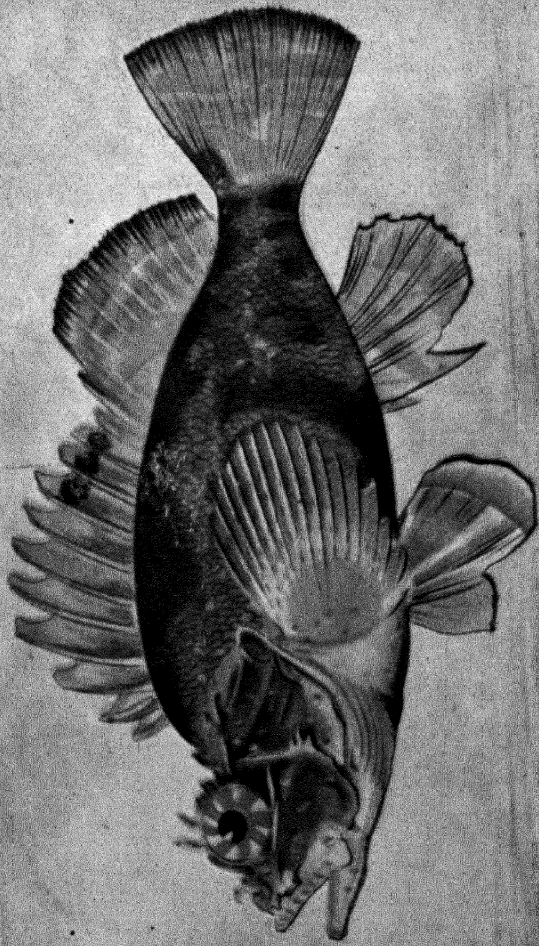
৭১। হাওয়াই সাগরের রঙ্গিন মাছ

India Press Calcutta.

ইহার দেখা আছে। হনলুলুতে এই যুবক দোকানে কার্য্য করে—শ্যাম এবং ফিলিপাইনেও এইরূপ দোকানেই কার্য্য করিত। ব্যবসাদারের সন্তান, অল্প বয়স হইতে ব্যবসায়েই লাগিয়া আছে—দোকানদারী-বুদ্ধি মন্দ নাই। ইহার দোকানে চীনা, জাপানী, ফিলিপিনো, কোরিয়ান, এবং জাভানী পদার্থ রহিয়াছে। ভারতীয় দ্রব্যও দেখিলাম। কিন্তু যুবক বলিল—"ভারতীয় দ্রব্যের কাট্তি ইয়াঙ্কিমহলে অতি অল্প। ইয়াঙ্কিদিগকে তিনচারি দিন বক্তৃতা দ্বারা না বুঝাইলে ইহারা ভারতীয় পদার্থ ক্রয় করিতে চাহে না। কিন্তু চীনা, জাপানী এবং প্রাচ্য-এশিয়ার অন্যান্য স্থানের জিনিষ ইয়াঙ্কিরা ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র।"

যুবক কয়েকমাস পরে আমেরিকায় দোকান খুলিতে যাইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কত মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করিবে, স্থির করিয়াছ?" যুবক বলিল—"বোধ হয় ১৫০০৲ টাকার বেশী নয়।" আমি বলিলাম—"তোমার খাওয়া-থাকার খরচই ত মাসে পড়িবে প্রায় ৩০০৲।" সে বলিল—"আমি এই কয় বৎসর বাহিরে থাকিয়া ইয়াঙ্কিদের ধরণ-ধারণ বুঝিয়া লইয়াছি। আমি চীন, জাপান, ফিলিপাইন, যবদ্বীপ, ও ভারতবর্ষ হইতে এমন জিনিষ আমদানি করিব, যাহা বিক্রয় করিবার জন্য একদিনও বসিয়া থাকিতে হইবে না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দোকান-ভাড়া দিয়া জিনিষ রাখিতে পারিবে কি? বিজ্ঞাপনের জোর তুমি পাইবে কোথা হইতে?" যুবক বলিল—"আমি কোন বিখ্যাত দোকানের একটা আলমারি ও একটা টেবিলমাত্র ভাড়া করিয়া লইব। আমার জিনিষগুলি এত বিচিত্র ও নূতন বোধ হইবে যে, দোকানে যে কোন লোক আসিলেই তাহার দৃষ্টি আমার আলমারির দিকে পড়িবে। কাজেই নিজে দোকান-ভাড়া করিয়া বিজ্ঞাপন-প্রচার করা অপেক্ষা বড় দোকানের একটা কোণ ভাড়া লওয়াই অধিকতর লাভজনক। এই

উপায়ে তিনচারি মাসের মধ্যেই আমি ১৫০০৲ টাকার মূলধন হইতে প্রচুর অর্থসংগ্রহ করিতে পারিব।"

এই নগরের 'ইয়ঙ্গ মেন্‌স্ ক্রীশ্চিয়ান য়্যাসোসিয়েশন্' বেশ ভাল জায়গায় অবস্থিত। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এই প্রতিষ্ঠানের জয়জয়কার। এখানে যুবক-খৃষ্টান-সমিতির ভবনে একটা হোটেল আছে। সহরের অন্যান্য হোটেল, রেস্তরাঁ ইত্যাদির নিয়মে এই হোটেল পরিচালিত হয়। কয়েকদিন এখানে আহার করা গেল। হাওয়াইয়ের খাঁটী স্বদেশী-জনগণ সকলেই খৃষ্টান।

অসহ্য গরম পড়িয়াছে—এই কয়দিনে শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছে। দিনে ঘুরিয়া বেড়াইবার সাধ্য নাই। বিলাতে ও আমেরিকায় যত খাটিতে পারা গিয়াছে, এখানে তাহার চারিভাগের একভাগও পারা অসম্ভব; এমন কি মাথাধরাও সুরু হইয়াছে। এক বৎসরমাত্র শীতপ্রধান দেশে থাকিবার ফলেই এই অবস্থা!

আখের চাষ এবং চিনির কারখানা—এই দুই বিষয়ে হাওয়াই প্রসিদ্ধ। এখানকার সংবাদপত্রের ব্যবসায়-বিভাগে এই দুই কারবার সম্বন্ধেই আলোচনা বেশী হইয়া থাকে।

একটা চিনির কল দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। মোটর-কারের আশ্রয় লইতে হইল। সহর পার হইয়া সেনানিবাসে উপস্থিত হইলাম। সহরের উচ্চতম স্থানে 'ব্যারাক'গুলি অবস্থিত। ভারতবর্ষে গোরাসৈন্য-দের যেমন দেখায়, খাকীপরা ইয়াঙ্কি-সৈন্যগণকেও সেইরূপ দেখাইল। ইয়াঙ্কিরা ব্যবসায়ী-জাতি—ইহাদিগকে রণবেশে সজ্জিত দেখিলে কথঞ্চিৎ বিস্মিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের ইংরাজসৈন্য দেখিবার পর বিলাত দেখিলে সেইরূপ বিস্ময়ই মনে জাগে। কারণ বিলাতের জনসাধারণকে দেখিলে নিতান্ত নিরীহ, শান্তশিষ্ট, ভালমানুষ বলিয়া বোধ হয়। একই
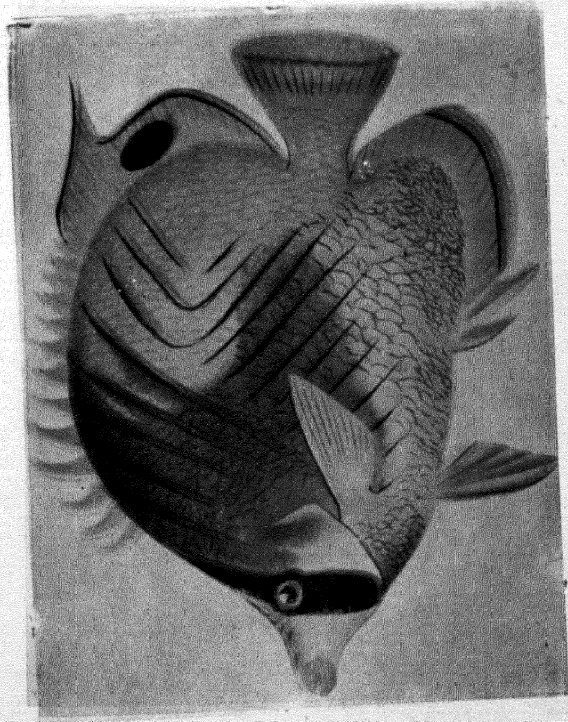
৭২। হাওয়াই সাগরের রঙ্গীন মাছ

India Press.

জাতি ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টনে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করে। এমন কি, চেহারার ভিতর বিশেষ কোন প্রকার উগ্রতা বা প্রচণ্ডতা না থাকিলেও বিজিত-জাতিকে স্বভাবতই যমদূতের মত ভয় করিয়া চলিতে বাধ্য।

সেনানিবাস অতিক্রম করিয়া মোটর পাহাড়ের অপর দিকে নামিতে লাগিল। সুবিস্তীর্ণ ইক্ষুক্ষেত্র চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। এই সকলের ভিতর দিয়া ছোট ছোট রেলপথ বিস্তৃত। কোন ক্ষেতের ইক্ষুপত্রগুলিতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে; পাতাগুলি জ্বলিয়া গেলে দণ্ডসমূহ সংগ্রহ করা হইবে। কোথাও বা রেলগাড়ীর উপর ইক্ষুদণ্ডগুলি বোঝাই করা হইতেছে। এই অঞ্চলে বর্ষার জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; এইজন্য জলাভাব হয় না। কিন্তু অন্য প্রদেশে বৃষ্টি অল্প; সেখানে কৃত্রিম উপায়ে জল তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আখের চাষ সম্বন্ধে কর্ম্মকর্ত্তারা বিশেষ উন্নত প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন। ইক্ষুদণ্ডগুলি যাহাতে সতেজ, স্বাস্থ্যপূর্ণ ও ব্যাধিহীনরূপে গড়িয়া উঠে, তাহার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ যত্নবান। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া ইক্ষু-ক্ষেত্রের মালিকেরা হনলুলুতে একটা "একস্‌পেরিমেণ্ট্যাল ষ্টেশন বা পরীক্ষাক্ষেত্র" স্থাপন করিয়াছেন।

খানিকক্ষণ পরে চিনির কারখানায় উপস্থিত হইলাম। সহর হইতে শুনিয়া আসিয়াছিলাম, কারখানা দেখাইতে কর্ত্তাদের আপত্তি নাই। এই কারখানার এঞ্জিনিয়ার ও তত্ত্বাবধায়ক চিনি-বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী। তিনি বহুদিন হইতে এই কার্য্যে লাগিয়া আছেন। বীট হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার জর্ম্মাণ-রীতিও তাঁহার জানা আছে।

তত্ত্বাবধায়ক প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের কি করা হয়?" যত জায়গায় কল কারখানা দেখিতে গিয়াছি, প্রত্যেক জায়গারই ম্যানেজার বা কর্ম্মকর্ত্তা সর্ব্বপ্রথম এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এই কারবার

সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কতটা, এবং এখানকার কাজকর্ম্ম দেখিয়া আমি নিজে লাভবান্ হইবার কৌশল খুঁজিতেছি কি না—ইহা জানাই কর্ত্তাদের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক ব্যবসায়েই 'ট্রেড্-সিক্রেট' বা গুপ্ত-বিদ্যা আছে। সেইগুলি আগন্তুকমাত্রকেই কেহ বলিয়া দিতে ইচ্ছুক নন। কাজেই দর্শকগণের ব্যবসায়, কাজকর্ম্ম ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্বন্ধে সংবাদ লওয়া ম্যানেজার-দিগের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে ইঁহাদের দায়িত্ব-স্খলন হইবে।

ওস্তাদ মহাশয়কে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম—আমি নেহাৎ "টুরিষ্ট" মাত্র—ঘুরিয়া ফিরিয়া সময় কাটাইতেছি। কোন শিল্প বা ব্যবসায়ের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই। চিনির কল কেন, কোন কল বা যন্ত্রের কোন তত্ত্বই জানি না। নিরক্ষর ব্যক্তির মিউজিয়াম দেখা, আর আমার পক্ষে কলকারখানা দেখা, একই শ্রেণীর অন্তর্গত। তত্ত্বাব-ধায়ক আশ্বস্ত হইয়া কারখানা দেখাইতে বাহির হইলেন। অবশ্য জানাই আছে যে, —কারখানার সকল স্থান এবং সকল কার্য্যপ্রণালী ইনি কোনমতেই দেখাইবেন না। যেগুলি সকলেই জানে এবং যেগুলি নূতন লোকে জানিয়া গেলেও কোন ক্ষতি হইবে না—ইনি কেবল মাত্র সেই-গুলিই দেখাইবেন। অন্যান্য কলকারখানা দেখিতে যাইয়া এইরূপ অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছি।

একটি গৃহে দেখিলাম, গাড়ী হইতে ইক্ষুদণ্ডগুলি নামান হইতেছে ;—কোন লোক নাই—উপরে বিচিত্র কপিকলের সাহায্যে এগুলি গাড়ী হইতে নিম্নে ফেলা হইতেছে। দণ্ডগুলি যেখানে পড়িতেছে, সেইখানে বেশীক্ষণ থাকিতেছে না ; কারণ তাহা সর্ব্বদা চলিতেছে—ইক্ষুদণ্ডসমূহ তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। কিয়দ্দূরে যাইয়া এগুলি কলে কাটা হইয়া যাইতেছে। তাহার খানিকপরে এইগুলি পেষা হইতেছে। প্রথম পেষা, দ্বিতীয় পেষা ও তৃতীয় পেষা সম্পূর্ণ করিবার কলও পরপর বসান

৭০০ পৃষ্ঠা

৭৩। হাওয়াই সাগরের রঙ্গীন মাছ

India Press.
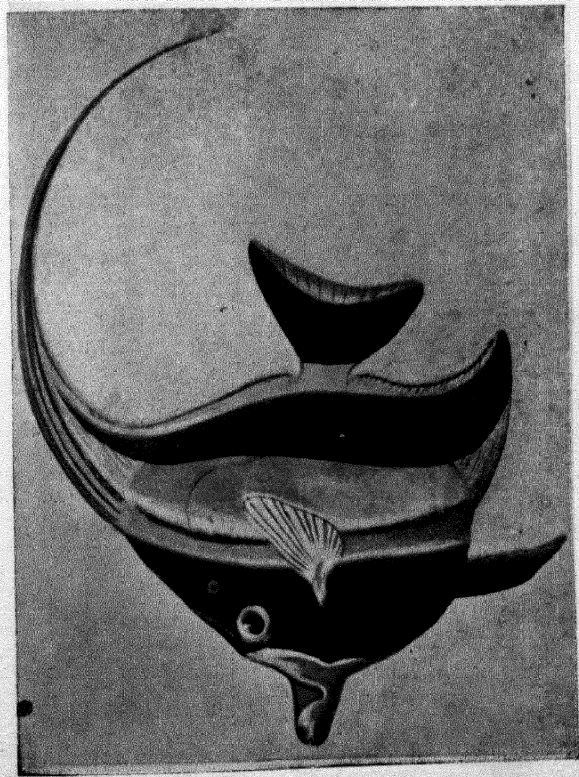
আছে; সঙ্গে সঙ্গে আখের রস সংগ্রহ করিবার জন্য নর্দ্দমা ও চৌবাচ্চা যথাস্থানে লাগান রহিয়াছে। কাজেই ইক্ষুদণ্ডগুলি নামান হইতে আরম্ভ করিয়া রস জমাইয়া রাখা পর্য্যন্ত কোন স্তরেই মানুষের পরিশ্রম আবশ্যক হয় না। অল্পসময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক ইক্ষুদণ্ড পেষা হইয়া যাইতেছে। এমন ভাবে নিংড়াইয়া রস বাহির করা হয় যে, এক ফোঁটা রস পর্য্যন্ত ছোবড়ার ভিতর থাকে না। ছোবড়াগুলিতে হাত দিয়া দেখিলাম, যেন রৌদ্রতপ্ত করাতের গুঁড়ি হাতে লইয়াছি। ছোবড়াগুলি ফেলিবার জন্যও কোন শ্রমজীবীর প্রয়োজন নাই। কলের সাহায্যে আপনা-আপনিই এগুলি যথাস্থানে পাঠান হইতেছে। শুনিলাম, এই ছোবড়া এঞ্জিনে জ্বালান হইয়া থাকে।

রস প্রস্তুত করা হইয়া গেলে পর, ছাঁকিবার ব্যবস্থা করা হয়। চুনের ভাটি এবং জীবজন্তুর দগ্ধঅস্থিপূর্ণ ভাটির ভিতর রস চালান করা হইয়া থাকে। এই ভাটিগুলির ভিতর দিয়া আসিলে রস পরিষ্কার হইয়া যায়। তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—"কি মহাশয়, আপনারা ভারতবর্ষে ত হাড়ের কয়লায় ফিল্টারকরা চিনির বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন করিয়াছেন? আন্দোলন কতদূর অগ্রসর হইল?"

এইবার কতকগুলি হাঁড়ি দেখিলাম—কলে ঘুরিতেছে। তাহার ভিতর শ্বেতবর্ণ চিনি জমা হইতেছে। এই চিনি চতুষ্কোণ পিণ্ডের আকারে অথবা চূর্ণিত আকারে বাজারে পাঠান হয়। একটা কলে দেখিলাম, যথানির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাল বস্তার ভিতর ভরা হইতেছে—বস্তার মুখ শেলাই করিবার জন্যও কল আছে। তাহার পর এই বস্তাগুলি গুদামঘরে পাঠাইবার জন্য আর একটা কল দেখা গেল।

সমস্ত কারখানার ভিতর মাত্র ৮০ জন লোক কর্ম্ম করে। জাপানীদের সংখ্যা বেশী দেখিলাম। ফিলিপিনো এবং হাওয়াই-সন্তান কয়েকজন

মাত্র। এই কলের কাজ বৎসরে সাতমাস হয়, পাঁচমাস বন্ধ থাকে। মালিকদিগের নিজ ভূমিতেই ইক্ষুদণ্ডের চাষ হয়। আবাদে ২০০০ হাজার লোক খাটে। মালিকেরা সকলেই ইয়াঙ্কি—স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোনগরে ইহাদের বড় আফিস। তত্ত্বাবধায়ক জার্ম্মাণ—তাঁহার সহকারী ফরাসী।

হাওয়াই-অঞ্চলে প্রশান্ত-মহাসাগর নানাজাতীয় মৎস্যের জন্য বিখ্যাত। এবারকার বিশ্বমেলায় হাওয়াই-ভবনে বিচিত্র রামধনুবর্ণ-সমন্বিত মৎস্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শুনিলাম, প্রত্যেক জাহাজে হনলুলু হইতে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোয় মাছ চালান করা হয়।

হাওয়াই-সন্তানগণ বেশ পাকা জেলে। ইহাদের মাছধরিবার রীতি আদিম ধরণের। ভারতীয় ধীবরগণের জালবুনা ও জালফেলা এইরূপই। আজকাল জাপানীরা মাছের ব্যবসায় হইতে হাওয়াই-সন্তানগণকে হটাইয়া দিতেছে। বিদেশীয় ঔপনিবেশিকগণ হাওয়াই-বাসীদিগের "ভাত মারিতেছে।" এই নিমিত্ত একটা "দেশী-বিদেশী" সমস্যা এখানে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। ইয়াঙ্কিরা জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিয়া চীনা ঔপনিবেশিক চায়। এশিয়াবাসীগণের মধ্যে চীনারা আজকাল ইয়াঙ্কিদের "সুয়োরাণী", জাপানীরা "দুয়ো"—আর ভারতবাসীরা নিতান্ত অজ্ঞাত-কুলশীল!

হনলুলুতে মাছ ধরিবার জন্য বহু শ্বেতাঙ্গ আসিয়া থাকে। ছিপ দিয়া মাছধরা, জালে মাছধরা, নৌকাবক্ষ বা জাহাজবক্ষ হইতে বন্দুকের গুলি করা ইহাদের বিশেষ সখ। পাশ্চাত্যদেশে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ এবং ক্রীড়াকৌতুকের মধ্যে মাছধরা উন্নত স্থান অধিকার করে। মাছ-শিকারীরা অন্যান্য শিকারী ও খেলোয়াড়দের ন্যায় সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়।

হনলুলুতে একটা "য়্যাকোয়ারিয়াম" (Aquarium) জলভবন বা

মৎস্যভবন আছে। নিউইয়র্কেও এইরূপ একটা দেখিয়াছি। তাহাকেও জলজন্তুর সংগ্রহালয় বলা চলে। এখানে সে বিরাট ব্যবস্থা নাই, কেবলমাত্র হাওয়াই-সাগরের নানাবর্ণে চিত্রিত নানারূপী মৎস্যের নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। প্রায় ৪০০ জাতীয় রঙ্গিন মাছ দেখিলাম। অনেক জাতিই মানুষের খাদ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

পলিনেশিয়া ও ভারতবর্ষ

হাওয়াই সন্তানগণ এক্ষণে সকল বিষয়ে ইয়োরামেরিকান সমাজের অন্তর্গত। তাহাদের প্রাচীন বেশভূষা, রীতিনীতি, ধর্ম্ম, ভাষা, আহার-বিহার সবই লুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনজীবনের পারম্পর্য্য রক্ষা করিবার জন্যও কোন আগ্রহ নাই। সুতরাং হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া খাঁটি স্বদেশী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বুঝিবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। একটা অর্দ্ধ-সভ্য অথবা অসভ্য জাতি উন্নত জাতির সংস্পর্শে থাকিয়া কি উপায়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, একমাত্র তাহা লক্ষ্য করাই আবশ্যক। পর্য্যটকেরা সাধারণতঃ আর কিছু দেখেন না।

তবে এই সকল দ্বীপে অনেক প্রকার তথ্য অবগত হওয়া যায়। যাঁহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অথবা মানববিজ্ঞানের সেবক, তাঁহারা এই সমুদয় জনপদে বহুবিধ মূল্যবান্ তথ্য পাইবেন। প্রথমতঃ, ভৌগোলিক অবস্থান, ঋতু-পরিবর্ত্তন, সমুদ্রের স্রোত, বায়ুর গতি, ইত্যাদি লক্ষ্য করিবার একটা প্রধান স্থানরূপে এই সকল দেশ আদৃত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, বিচিত্র ভূমি, ধাতু, মৃত্তিকা, প্রবাল ইত্যাদির পরিচয় পাইবার জন্য ভূতত্ত্ববিদেরা দ্বীপসমূহে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। প্রশান্ত-মহাসাগরের এই দ্বীপসমূহের সঙ্গে এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশদ্বয়ের কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝিবার সুযোগ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ ভারত-মহাসাগর ও প্রশান্ত-মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশস্থ অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম মাত্র। এই গুলি এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে

সোপানস্বরূপ। এই কথা বুঝিতে পারিলে জীব-জগতের গতিবিধি নিরূপণ সম্বন্ধেও অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ ও জন্তু এই সকল দেশে বৈজ্ঞানিকগণের চোখে পড়ে। এই সমুদয় দেখিলে পৃথিবীর প্রাণিমণ্ডলের ক্রমবিকাশ ও ধারা বুঝিবার পথ পরিষ্কার হয়। চতুর্থতঃ, দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন নরনারীদিগের আকৃতি, শারীরিক গঠন, ভাষা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ-পরিচালনা, রাষ্ট্র-শাসন, শিল্পকার্য্য, নৌচালন, কৃষি ইত্যাদি আলোচনা করিলে আদিম যুগের মানবসম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই কারণে নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই সকল স্থানকে নিজেদের ল্যাবরেটরী বিবেচনা করেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ মালয়েশিয়া, মাইক্রনেশিয়া, অষ্ট্রেলেশিয়া ও পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে প্রায়ই পর্য্যটন করিতে আসেন। এই চারিটি দ্বীপপুঞ্জের সমবেত নাম ওশিয়ানিয়া (Oceanea). হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ পলিনেশিয়া-পুঞ্জের অন্তর্গত।

এই দ্বীপগুলি ইংরাজ, ওলন্দাজ, ইয়াঙ্কি, জার্ম্মাণ, ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ-রাষ্ট্রসমূহের অধীন। আমেরিকায় লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানদিগের যে অবস্থা, এই সকল দ্বীপের আদিমবাসিগণের অবস্থাও সেইরূপ। ইহাদের প্রাচীন রীতিনীতি ও জীবন-প্রবাহের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্র ইয়োরামেরিকান সভ্যতার প্রবর্ত্তন হইতেছে। এই সমুদয়ের কোথাও স্বদেশী আন্দোলন, জাতীয়তার প্রচেষ্টা, বিদ্রোহ, সিডিশন ইত্যাদি দেখা দেয় কি না জানা নাই। তবে প্রভুগণের ভিতর পরস্পর বিরোধ থাকার ফলে স্থানীয় জনগণের মাঝে মাঝে ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদি কয়েকটা দ্বীপের অবস্থা কিছু স্বতন্ত্র। এই স্থানের জনগণ প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন এখনও বহন করে।

নৃতত্ত্ববিদ্গণ এই সমুদয় জনপদের নরনারীদিগকে তাঁহাদের

পরীক্ষার বস্তুমাত্র বিবেচনা করেন। ইহাদের প্রাচীন জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের কৌতূহল অত্যধিক; কারণ প্রাচীন জীবনের নিদর্শন শীঘ্রই বর্ত্তমান খৃষ্টীয়-সভ্যতার প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাহা হইলে আদিম ও অসভ্য এবং অর্দ্ধসভ্য মানবের পরিচয় জগতের কোথাও পাওয়া যাইবে না।

এই সকল দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানে মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে। হনলুলুতেও একটা আছে, ইহার নাম Museum of Polynesian Ethnology and Natural History. এই সংগ্রহালয়ে কয়েকঘণ্টা কাটান গেল। প্রধানতঃ হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ, এবং গৌণভাবে প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের জীবজন্তু, উদ্ভিদ্, ধাতু, ধর্ম্মজীবন, কৃষিকার্য্য, যুদ্ধসজ্জা, বেশভূষা, ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

'মিউজিয়ামের' তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলাপ হইল; নাম ব্রিগহাম। ইনি পঞ্চাশ বৎসর হইতে পলিনেশিয়ার নৃতত্ত্ব, লোকসাহিত্য, ভূতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনা করিতেছেন। ইনি হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাধ্যাপক য়্যাগাসিজের ছাত্র ছিলেন। য়্যাগাসিজ যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক-অভিযানে বাহির হন, ইনি তখন পলি-নেশিয়ায় আসেন। প্রথমতঃ, ভূতত্ত্বে ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে ইহাঁর অনুসন্ধান চালিত হইয়াছিল। পদার্থবিদ্যা, জীবজন্তু ও তরুলতা হইতে ক্রমশঃ নৃতত্ত্বে আসিয়া ঠেকিয়াছেন। ইনি কয়েকবার পৃথিবীর "সংগ্রহালয়"-সমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি একবার জগৎ-ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের নাম 'Report of a Journey around the World to study matters relating to Museums : 1912'.

হনলুলুতে একটা ঐতিহাসিক-অনুসন্ধান-সমিতি আছে। তাহার

নাম হাওয়াইয়ান হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি। এই সমিতির একজন কর্ম্ম-কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ হইল। নাম ওয়েষ্টারভেল্ট। ইনি একজন পাদ্রী; বহুকালাবধি পলিনেশিয়ার লোক-সাহিত্য আলোচনা করিতে-ছেন। ইঁহার বিশ্বাস, প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মমতের সঙ্গে পলিনেশিয়ার ধর্ম্ম-মতের সংযোগ আছে। "Legends of Mani—a Demigod of Polynesia" অর্থাৎ "মনি-দেবের কাহিনী" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ওয়েষ্টারভেল্ট বলিতেছেন :—

"Several hints of Hindoo-connection are found in the Mani legends. The Polynesians not only ascribed human-attributes to all animal-life with which they were acquainted, but also carried the idea of an alligator or dragon with them, wherever they went.

The Polynesians also had the idea of a double-soul inhabiting the body. This is carried out in the ghost-legends more fully than in Mani stories, and yet 'the spirit separate from the spirit which never forsakes man,' according to Polynesian ideas, was a part of the Mani birth-legends. This spirit, which can be separated or charmed away from the body by incantations, was called the 'hau.' * *

How much these things aid in proving a Hindoo or rather Indian origin for the Polynesians is uncertain, but at least they are of interest along the lines of race-origin."

অর্থাৎ "হিন্দুসমাজে প্রচলিত নানা উপকথার ধুয়া পলিনেশিয়ার উপকথায় পাইয়া থাকি। প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপবাসিগণ ইতরজীবজন্তু সম্বন্ধে অনেক সময়ে মানবীয় প্রকৃতি আরোপ করিয়া থাকে। অনেক ভূতপেত্নীর গল্পে হিন্দু ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভূতছাড়ান, ওঝার কৃতিত্ব ইত্যাদি হিন্দুদের মত ইহারাও বিশ্বাস করে। এই সকল তথ্যে ভারতবর্ষের সঙ্গে পলিনেশিয়ার লেনদেন সপ্রমান করা চলে কিনা জানি না। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এদিকে অনুসন্ধান চালাইতে পারেন।"

পলিনেশিয়ায় সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। তাহার মধ্যে এক মত অনুসারে উত্তর ভারতের জাতিপুঞ্জ এই দ্বীপ-পুঞ্জের জনগণের পূর্ব্বপুরুষ। ভারতবর্ষে আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে সেই সকল জাতীয় লোক ব্রহ্মদেশ, মালয় ইত্যাদি স্থান অতিক্রম করিয়া ইণ্ডোনেশিয়া (Indonesia) বা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন করে। তাহার পর পলিনেশিয়ায় আগমন হয়। হনলুলুর ঐতিহাসিক-পরিষদের এক সভায় প্রত্নতত্ত্ববিৎ আলেকজাণ্ডার (Alexander) একটি প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে পলিনেশিয়ার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধের নাম 'The Origin of the Polynesian Race.' প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"The late J. R. Logan, the historian Fornander, Mr. S. Percy Smith and others who have made a special study of the subject, agree in the opinion, that the remote ancestors of these people emigrated from Northern India before it was invaded by the Aryan-race. The opinion is founded on resemblances in physical appearances and customs between them and the

aborigines of that region, such as the Todas, Bhotiyas and other hill tribes. The evidence of language, however, is entirely wanting."

অর্থাৎ "ভারতে আর্য্যসভ্যতা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে কয়েক দল লোক পলিনেশিয়ায় আসিয়াছিল। টোডা, ভুটিয়া এবং অন্যান্য ভারতীয় পাহাড়ী জাতির আকৃতি, আচার ও রীতি-নীতি আজকালকার প্রশান্ত-মহাসাগরীয়গণের আকৃতি, আচার ইত্যাদির অনুরূপ। কিন্তু ভাষার তরফ হইতে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্য, সামীপ্য বা সংযোগ, বিনিময় ও লেনদেন সপ্রমাণ করা অসম্ভব।"

"Mr. Logan's view was as follows:—A survey of the character and distribution of the Gangetic, Ultra-Indian and Polynesian people renders it certain that the same Himalayo-Polynesian race was at one time spread over the Gangetic basin and Ultra-India"

অর্থাৎ "ভারতীয় গঙ্গামাতৃক জনপদের এবং বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নৃতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, গোড়ায় দুই অঞ্চলের নরনারী একরূপ ছিল। হিমালয় ও প্রশান্ত-মহাসাগরের পলিনেশিয়া-দ্বীপপুঞ্জ প্রাচীন কালে একই জাতির বাসভূমি ছিল।"

উত্তর ভারত হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন—সেখান হইতে পলিনেশিয়ায় বসতি-বিস্তার। এই সোপান বা ধারার সাক্ষ্যস্বরূপ আলেক্জাণ্ডার দেখাইতেছেন :—

"It is certain that, it was from Indonesia that the principal food-plants of the Pacific, the bread-fruit, the

banana, the taro, the ohia or jambo, sugar-cane etc. were brought by the early emigrants."

অর্থাৎ "আজকাল প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে কলা, লেবু, আখ, এবং অন্যান্য আহার্য্য উদ্ভিদের চাষ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। এই সমুদয় নিশ্চয় ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে এখানে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। প্রাচীন কালের জনগণ ইণ্ডোনেশিয়ায় এই চাষে অভ্যস্ত হইয়া পরে পলিনেশিয়ায় উহা আমদানি করিয়াছে।"

লেখকের মতে যবদ্বীপে হিন্দু-সভ্যতা বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে এখান হইতে পলিনেশিয়ান-জাতি হাওয়াই-অঞ্চলে আসিয়াছে। এই জন্য হাওয়াই-সন্তানগণের ভাষায় সংস্কৃতের কোন প্রভাব নাই। এই অঞ্চলে বাস করিবার সময়েই হয়ত তাহারা নৌচালন-বিদ্যা শিখিয়াছিল :—

"It was probably during their long stay in the East- Indian Archipelago that the ancestors of the Polynesians developed that skill in navigation and fondness for maritime adventure, that have characterised them ever since."

অর্থাৎ "আজও পলিনেশিয়াবাসিগণ সামুদ্রিক অভিযানে পারদর্শী। সাগরের সঙ্গে খেলা করিতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বোধ হয় ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেই প্রথম অভ্যস্ত হয়।"

দ্বাদশ অধ্যায়

আমেরিকায় পুনর্ব্বার

ফের্ মোসাফির

জুলাই মাসে (১৯১৬) শাংহাই ছাড়িয়াছিলাম। জাপানে আসিয়া কাটাইয়াছি তিন মাস। নবেম্বরে পৌঁছি স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোয়। শেষ পর্য্যন্ত আজ ৮ই এপ্রিল (১৯১৭) কেম্ব্রিজে (ম্যাসাচুষেট্‌স্) বসবাস করা যাইতেছে। ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে (১৯১৪) এই দিনে স্বদেশ ছাড়িয়াছি।

দুইবার জাপান দেখা হইল। দ্বিতীয়বার আমেরিকা দেখা হইতেছে। কিন্তু মোসাফিরী চালের "দেশ দেখা"র পালা শাংহাইয়ে থাকিতে থাকিতেই শেষ হইয়াছে। চীনে প্রায় এক বৎসর কাটিয়াছিল। এই এক বৎসরের জীবন পর্য্যটকের জীবন নয়। উহা খাঁটি প্রবাসীর জীবন। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রবাসই চলিতেছে। কাজেই "পর্য্যটকের ডায়েরি" আর চলিতে পারে কিনা সন্দেহ। "প্রবাসী ভারত সন্তানের খাতা" সুরু হইল বলিলেই বোধ হয় শোভা পাইবে।

জুন মাসের (১৯১৬) প্রথম সপ্তাহে য়ুয়ান্-শী-কাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তখন হইতে চীনে স্বরাজপক্ষীয় বিপ্লববাদীরা কর্ত্তা। চীনাদের ঘরোয়া লড়াই কিছু দিনের জন্য থামিল।

চীনের ইতিহাস ও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা কথা গ্রন্থাকারে

লিখিবার ইচ্ছা ছিল। সামান্য মাত্র লিখিবার সময় ও সুযোগ জুটিয়াছে। "চীনা সভ্যতার অ আ ক খ" ঐ লেখাটুকুর নাম।

বহুদিন পরে আম খাওয়া গিয়াছিল। ম্যানিলা (ফিলিপিন) হইতে শাংহাইয়ে আম আমদানি হয়। আমাদের ল্যাংড়া আমেরই এইগুলি জুড়িদার। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে চীনেও বাঙ্গালারই গুমোট্ গরম, ঝম্ ঝম্ বর্ষা, আর মাঝে মাঝে মেঘের ডাক।

চীনা কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে-ছিলাম। অনুবাদ যখন সুরু করি, তখন জানিতাম, গদ্যেই অনুবাদ করা যাইবে। অথচ খানিকদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, অনুবাদটা পদ্যের আকারে হইয়া গিয়াছে। ব্যাপার মন্দ নয়! একাকী মুচ্‌কে হাসিয়া সকল অনুবাদই "কবিতা"য় করিয়া ফেলিলাম। এই গুলাকে কবিতা বলা উচিত কিনা অন্য কথা।

ক্রমশঃ, রাস্তায় হাঁটিতেছি,—নদীর ধারে,—নিজেরই এক রচনা পদ্যের আকারে মাথায় আসিল। আসুক্,—"বাতিক্" অথবা নেশাও চাগিল। কতকগুলা চতুর্দ্দশপদী লেখা হইয়া গেল। পারিভাষিক হিসাবে যেগুলিকে "সনেট" বলে এ সব সেই শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। এইগুলি লিখিতে লিখিতে ভাবিলাম—মিশর, বিলাত, আমেরিকা, জাপান ও চীন বেড়াইতে বেড়াইতে যাহা কিছু দেখিয়াছি শুনিয়াছি সে সব কথা এই ধরণে লিখিলে মন্দ কি? কাজেই "বর্ত্তমান জগতে"র দৃশ্য ও ঘটনাগুলি "দুনিয়ার ডাক" রূপে কবিতায় অথবা ঐ জাতীয় রচনার আকারে দেখা দিবে।

চীন ছাড়ার দৃশ্য এই :—

"শ্রাবণের মেঘে ছাওয়া চীনের আকাশ আজ,
পূর্ণিমার ভরা চাঁদ প'রেছে মলিন সাজ।"

প্রথমবার জাপানের কিয়োতো পর্য্যন্ত দেখা হইয়াছিল। কিয়োতোর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল রেলে বসিয়াই সারিয়াছিলাম। এইজন্য এ যাত্রায় এই অঞ্চলটা দেখিয়া লইলাম। এই দিক্‌কার নামজাদা স্থানের নাম মিয়াজিমা।

"পাইন-ঢাকা পাহাড়ের পায়ে দেউল্ ভাস্‌ছে সাগরে যেথায়,
এসেছি "নিপ্পন" "শিকফের" মাঝে "দেউল্-দ্বীপ" সেই মিয়াজিমায়।"

প্রথমবারে হাকোনে-হ্রদ দেখা হয় নাই। এই হ্রদ কিয়োতো হইতে উত্তর-পূর্ব্বে—তোকিওর নিকটে। এইখান হইতে ফুজি-পাহাড় খুব ভাল দেখা যায়। হাকোনেতে আসা গেল।

"আড়াই হাজার ফিট্ পাহাড়ের কোলে হাসে নির্ম্মল সরোবর,
আল্‌মোড়ার পথে ভীমতাল হ্রদ সাজায় যেমন ভারত-গিরিবর।"

মেঘের দৌরাত্ম্যে ফুজি পাহাড় দেখা গেল না। কয়েক দিন পরে তোকিওতে আড্ডা গাড়িলাম।

লোক-জনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ একদম বন্ধ, কেবল লেখাপড়া। খাঁটি নির্জ্জন বাস—বই মাত্র সাথী—কাজেই ডায়েরিতে বা খাতায় লিখিবার কথা কিছুই নাই।

কবিতা লেখা চলিতেছে। এই গুলার নাম হইবে "অসাধ্য সাধন।"

জাপানী কবিতার অনুবাদও করা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাউনিঙ্, শেলী, ওয়ার্ডসোয়ার্থ ইত্যাদিও বাঙ্গালায় আসিল। এই অনুবাদ-কবিতাগুলি "দুনিয়া আমার" নামে প্রচারিত হইবে।

এক বৎসর পূর্ব্বে জাপান দেখিয়া গিয়াছি। তখন জাপানীরা ভারত সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে উৎসুক বুঝিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের এইরূপ খেয়াল ছিল না। এ যাত্রায় বুঝিলাম, ইহাদের সমাজে ভারতবর্ষ লইয়া একটা মস্ত আলোড়ন হইয়া গিয়াছে।

দুইজন ভারতবাসী নাকি জাপানে বসিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। জাপানের ইংরাজ-প্রতিনিধি এই দুইজনকে জাপান হইতে নির্ব্বাসিত করাইবার ব্যবস্থা করেন। জাপান-সরকার ইংরাজের মিত্র-রাষ্ট্র। কাজেই ইংরাজের অনুরোধ বা ইচ্ছা অবজ্ঞা করা চলিতে পারে না। অথচ জাপানী জনসাধারণ এবং খবরের কাগজওয়ালারা ইহাতে জাপান-সরকারের উপর মহা খাপ্পা। তাহাদের বিশ্বাস, এইরূপে ইংরাজের কথা অনুসারে কাজ করিয়া জাপান-রাষ্ট্র ইংল্যণ্ডের গোলাম হইয়া পড়িতেছে। যাহা হউক—জাপানী পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া ভারতীয় ষড়যন্ত্রকারীরা পলাইয়া গিয়াছে। এদিকে জাপানী সংবাদ পত্রে জাপান-সরকারের গোলামী সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ চলিতেই থাকিল। মোটের উপর জাপানীরা ভারতীয় আন্দোলনের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে দেখিলাম।

রবি বাবু জাপানে বক্তৃতাদি করিয়া আমেরিকায় গেলেন। তাঁহার ইংরাজী বুঝিবার লোক জাপানে বেশী নাই। অনুবাদে বোধ হয় জাপানী ঝী চাকর হইতে মন্ত্রী পর্য্যন্ত সকলেই কিছু না কিছু ভারতীয় তথ্য পাইয়াছে। প্রত্যেক দেশেই নানা মুনির নানা মত। কাজেই জাপানীসমাজেও রবি বাবুর উপদেশ সম্বন্ধে নানা সমালোচনা চলিবারই কথা। কেজো লোকেরা বলিতেছেন—"দুনিয়ার ভিতর একটা কবর আছে। সেই কবরটার নাম ভারতবর্ষ। ঐ কবর হইতে প্রাণের কোন তত্ত্ব বাহির হইতে পারে কি? জাপানীরা জ্যান্ত জাত্—কবরের বাণী শুনিতে রাজি নয়। রবি বাবুর উপদেশ ভারতবর্ষেই বিরাজ করুক।" ইত্যাদি।

জাপান ছাড়িতেছি আর ভাবিতেছি :—

"আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি"—
তাহ'লে প্রাণটা আমার আকাশের মতন রয় কি জগৎ ভরি'।

আমেরিকা হইতে জাপানে আসিবার সময় প্রশান্ত সাগর সত্য সত্যই প্রশান্ত দেখিয়াছিলাম। এই দ্বিতীয়বার প্রশান্ত পাড়ি দিবার সময় দেখিতেছি ঠিক উল্টা,—

"গ্রীষ্মের সমতল প্রান্তর নয় প্রশান্ত হেমন্তে,
হাওয়ার ঝাপ্‌টায় উর্ম্মিশীর্ষ দেখা দেয় শুভ্র দন্তে।"

ভারতবাসীর পক্ষে আমেরিকায় আসা ক্রমশঃ অসম্ভব হইতে চলিল। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদিগকে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোয় নিতান্ত নাকাল হইতে হয়। যে কোন অছিলায় বন্দরের কর্ত্তারা ভারতবাসীর আমেরিকায় নামা বন্ধ করিতে পারে।

বার্কলিতে কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ পাওয়া গিয়াছিল। এ যাত্রায় বক্তৃতা করিতে আর আপত্তি নাই। পরে নিউইয়র্কের পথে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনচারটা বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। শিকাগোতে নামিয়া "ফিল্ড মিউজিয়ামের" নৃতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ করিলাম। ইনি বার্টহোল্ড লাওফার। চীনে থাকিবার সময় ইহাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলী পাঠ করা গিয়াছে।

অবশেষে নিউইয়র্কে দুই মাস কাটাইয়া এক্ষণে কেম্ব্রিজে স্থিতি। কাজের মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যলয়ের গ্রন্থ-শালায় কেতাব ঘাঁটা। নিউ-ইয়র্কে ছিল চিত্রশালায় এবং আর্ট-মিউজিয়ামে গতিবিধি। কয়েক দিন হইল নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছি। সেখানকার অধ্যাপক ডুয়ী (দর্শন), সেলিগ্‌ম্যান্ (ধন-বিজ্ঞান) এবং ডানিং (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) নানা বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন।

কেম্ব্রিজ, ম্যাসাচুষেট্‌স্, ৮ই এপ্রিল, ১৯১৭।

হার্ভার্ডে ফরাসী সেনাপতি

আজ হার্ভার্ডে মহাধুম। বষ্টন-কেম্ব্রিজ ভরিয়াই হৈহৈ রৈরৈ। ফরাসী সেনাপতি জোফ্ (Joffre) কে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আজ সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন।

সেদিন শিক্ষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক মুর্ বলিতেছিলেন—"আজকাল প্রত্যেক আমেরিকাবাসীর হৃদয়েই একটা বিশেষ আনন্দের লক্ষণ দেখিতে পাইবেন। ফরাসী সেনাপতিরা একয়দিন যুক্তরাষ্ট্রের অতিথি। তাঁহাদিগকে আমাদের প্রত্যেক সহর হইতে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা হইতেছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জোফ্‌কে এল্ এল্ ডি উপাধি দিলেন, আমরাও এল্ এল্ ডি দিব। ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া এবং অন্যান্য নগরের লোকেরাও ফরাসী সেনাপতিগণকে পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত। সকলেই আমরা চরম সম্মান দেখাইতে উদ্‌গ্রীব। আমেরিকার ইতিহাসে এমন দিন আর আসে নাই।"

কাল হার্ভার্ড লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বলিতেছিলেন—"ফরাসীরা আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনে সাহায্য করিয়াছিল। সে প্রায় ১৪০ বৎসরের কথা। সেইঋণ আমরা ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতা দেখাইবার সুযোগ এতদিনে একবারও জুটে নাই। আজ ফরাসীরা নিজে যাচিয়া আমাদের সাহায্য ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। কাজেই এযাত্রায় আমরা আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিব। ফরাসী রিপাব্লিকের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে আমেরিকা ধনজন লইয়া অগ্রসর হইবে।"

এপ্রিল মাসে আমেরিকা জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার পর হইতে আমেরিকার সহরে সহরে লড়াইয়ের বাজনা বাজিয়াছে। কলেজে কলেজে পল্টন বাছাই সুরু হইয়াছে। বিগত ৩।৪ সপ্তাহ ধরিয়া হার্ভার্ডের ঘরে বাহিরে মাঠে ঘাটে কেবল খাকিপরা ছাত্র দেখিতে পাই। যখন তখন ব্যাণ্ড বাজে। স্কুলঘরে মাষ্টারেরা একপ্রকার খালি বেঞ্চের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন। কুচ্ কাওয়াজে সকলকে অভ্যস্ত করানো হইতেছে। এমন কি, খাশ ফরাসী রিপাব্লিক হার্ভার্ডের পল্টনকে শিখাইবার জন্য প্যারি হইতে তিনজন পাকা কাপ্তেন পাঠাইয়াছেন। কাজেই একয়দিন হার্ভার্ড গুলজার।

ইয়াঙ্কিরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে বটে—কিন্তু লড়াই সম্বন্ধে ইহারা নিতান্ত ঢিমে তেতালা। ব্যাপার বুঝিয়া ইংরাজ পররাষ্ট্রসচিব ব্যালফোর্ এবং ফরাসী ধুরন্ধর জোফ্ আমেরিকায় আসিয়া হাজির। ইহাঁরা আমেরিকাকে তাতাইয়া তুলিতেছেন। নানা স্থানে ইহাঁদের বক্তৃতা চলিতেছে। সার মর্ম্ম এই :—"(১) জাহাজ চাই হাজার হাজার, (২) সৈন্য চাই লাখ্ লাখ, (৩) টাকা চাই কোটি কোটি। তবে আমরা গোটা দুনিয়ার দুস্মন জার্ম্মানিকে ধ্বংশ করিতে পারিব। তাহা না হইলে সোনার বিলাত রসাতলে যাইবে আর স্বাধীনতার পীঠস্থান ফ্রান্স লণ্ড ভণ্ড হইবে।"

ইয়াঙ্কিরা বেশ তাতিয়া উঠিতেছে। লোহা লক্কড়, টাকা পয়সা, পল্টন সবই গুছানো হইতেছে। প্রদেশে প্রদেশে নরনারীরা নিজ নিজ ঘরের বাগানে তরিতরকারির ব্যবস্থা করিতেছে। ভারি রকমের লড়াই সুরু হইলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা। ইয়োরোপে যুদ্ধের ফলাফল দেখিয়া ইয়াঙ্কিরা শেয়ানা হইয়াছে। এমন কি, আমার বাড়ীওয়ালীও খন্তা, কোদাল, খুরপী লইয়া ফুলবাগানে শাক শব্জী বুনিতে

আরম্ভ করিয়া দিল। লড়াই এইবার ঘরের কোনে আসিয়া উপস্থিত দেখিতেছি!

ব্যালফোর ওয়াশিংটনের গোরস্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন,—"ওয়াশিংটন অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ সন্তান। ওয়াশিংটন দুনিয়ার সকল স্বাধীনতাসেবকের পূজনীয়। এইরূপ বীর পৃথিবীতে আর জন্মেন নাই।" বলা বাহুল্য, এই ওয়াশিংটনই ইংরাজকে হারাইয়া ইয়াঙ্কিস্থানকে স্বাধীন করিয়াছিল। তাহার পর ইংরাজে ইয়াঙ্কিতে শত্রুতা কোন দিনই কমে নাই। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের পর ১৮১২ সালে দ্বিতীয় লড়াই হয়। পরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া লড়াই বাধে। সেই সময়েও ইংরাজ ইয়াঙ্কিস্থানকে দুই টুকরা করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাহা সত্বেও ১৯১৭ সালে ওয়াশিংটন ইংরাজসন্তান কর্তৃক ঋষি বিবেচিত হইলেন। দুনিয়ার দস্তুর এই। আজ হইতে ইয়াঙ্কি-স্বাধীনতার ইতিহাস নূতন প্রণালীতে ব্যাখ্যা করা হইবে।

বষ্টন-কেম্ব্রিজে ব্যাল্‌ফোর আসেন নাই। এই অঞ্চলে আইরিশ জাতীয় লোকের বসবাস অত্যধিক। আইরিশেরা ইংরাজের উপর চিরকালই নারাজ। সম্প্রতি "হোমরুল" না পাওয়ায় ইহারা আরও চটিয়াছে। কাজেই ইংরাজসন্তান এ পথ মাড়াইলেন না।

ফরাসীরা আসিয়াছেন। জোফ্‌কে যথেষ্ট খাতির করা হইল। সন্ধ্যাকালে "ষ্টেডিয়ামে"র বিরাট মাঠে "প্যারেড্" দেখান হইল। ব্যাণ্ডের গৎ "মার্সেইয়ে"। প্রেসিডেণ্ট লোয়েন্ সর্ব্বত্রই অগ্রণী। ফরাসী পতাকা, ইয়াঙ্কি পতাকা এবং হার্ভার্ড পতাকার জয়জয়কার।

১২ মে, ১৯১৭, কেম্ব্রিজ, ম্যাস্।

ভারতের দশ মাস

সাত মাসের "ভারতবর্ষ," ছয় মাসের "গৃহস্থ," দশ মাসের "প্রবাসী," এবং পাঁচ মাসের "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" প্রায় এক সঙ্গে চোখে পড়িল। মোটের উপর বুঝিতেছি যে, ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্রের প্রভাবে ভারতীয় চিন্তা বিশেষ বদলায় নাই। প্রায় তিন বৎসর হইল লড়াই সুরু হইয়াছে। এই তিন বৎসরে গোটা দুনিয়া যার-পর-নাই বদলাইয়াছে, পরে আরও বদলাইবে। বস্তুতঃ, যুদ্ধ থামিলে পর ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে দুনিয়া কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতেই লোকের কষ্ট হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে চিন্তার আন্দোলন এবং কর্ম্মের আন্দোলন কতখানি অগ্রসর হইল, হইতেছে বা হইবে?

যদি কেবল ভারতবর্ষের পূর্ব্বাপর অবস্থা দেখি, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষও বসিয়া নাই। ভারতের সকল বিভাগেই তোলাপাড়া হইয়া যাইতেছে। ১৯০৫ সালের পূর্ব্বেকার ৫০ বৎসর ভারতবাসীর চিন্তা ও কর্ম্ম সাদাসিধা ভাবে চলিয়াছিল। তাহার তুলনায় ১৯০৫ হইতে ১৯১৪ সালের মধ্যে একটা বিপ্লব সাধিত হইয়াছে, বলা চলিতে পারে। আবার ১৯১৪ সালের পর ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্রের আওতায় ভারতেও নানা প্রকার ওলট্ পালট্ লক্ষ্য করা যাইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, গোটা দুনিয়া যে হিসাবে বদলাইতেছে, তাহার তুলনায় ভারত মুল্লুক কতটা বদলাইল? এই অঙ্কপাতের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। জগতের কেহই বসিয়া নাই—সর্ব্বত্রই বিপ্লব চলিতেছে—সেই সঙ্গে ভারতে ভাঙ্গাগড়া হইল কতখানি?

যুবক ভারত আমাদের পণ্ডিতগণের নিকট অন্ততঃ নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রবন্ধ, পুস্তিকা বা গ্রন্থ আশা করিয়াছিল:—

(১) ভারতের ও এশিয়ার ইতিহাস।

(২) ১৮৭০ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত দুনিয়ার রাষ্ট্র-সমস্যা।

(৩) আন্তর্জ্জাতিক বিধিব্যবস্থা (ইন্টার্ ন্যাশন্যাল্ ল)।

(৪) ষ্টিম এঞ্জিনের প্রবর্ত্তন হইতে জেপেলিন আবিষ্কার পর্য্যন্ত একশত বৎসরের উদ্ভাবিত সকল প্রকার যন্ত্র এবং কল-কারখানার বিবরণ।

(৫) দেকার্ত্তে, লাইব্‌নিট্‌জ্ এবং নিউটনের আমল হইতে রেডিয়াম আবিষ্কার পর্য্যন্ত আড়াইশত বৎসরের খাঁটি বিজ্ঞানের নির্দ্ধারিত সূত্র-সমূহ।

এই পাঁচ দফা তথ্যগুলি ভারতবাসীর মাথায় থাকিলে ভারতবর্ষে খাঁটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জমিন্ প্রস্তুত হইবে। তাহার পূর্ব্বে নয়। আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১৯০৫ সালেও ভারতে দেখা দেন নাই। ১৯১৪ সালের লড়াইয়ের হিড়িকে এই বিদ্যা ভারতে প্রথম পৌঁছিবে আশা ছিল। হয়ত পৌঁছিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ধনবিজ্ঞানের উদয়ও স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবাসীর সাহিত্যে কোন চিহ্ন দেখিতেছি না—বোধ হয় সকলেরই মগজের ভিতর নয়া চিন্তাগুলি গিজির গিজির করিতেছে।

এই সকল বিষয়ে অল্পবিস্তর লেখা এমন কিছু কঠিন নয়। অধ্যাপক মহাশয়েরাত সহজেই পারেন—বি এ, এম এ, ক্লাশের ছাত্রেরাও পারেন। আড়াই বৎসরের ভিতর অন্ততঃ ১০০টা প্রবন্ধ নানা মাসিকে বাহির হইতে পারিত। এই সকল তথ্যের আলোচনাই মাসিক সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ হইতে পারিত। তাহা ত দেখিতেছি না। আমাদের

ছুট কচ্ছপের দৌড়! পৃথিবী হুহু করিয়া ছুটিতেছে। এই ছুট-দৌড়কে সব সময়ে "উন্নতি" না বলিলেও "গতি" ত বলিতেই হইবে। ভারতবর্ষ ছুটিতেছে নিশ্চয়। কিন্তু এই ছুটা দুনিয়ার ছুটার তুলনায় বসিয়া থাকারই সামিল। খরগোশ না ঘুম মারিলে কচ্ছপের আর জিতিবার সম্ভাবনা নাই! অথবা যদি অসম্ভবও সম্ভব হয়। কবি শিখাইয়াছেন —"মুহূর্ত্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে।"

যখন লড়াই বাধে তখন বিলাতে ছিলাম। কোন কোন বন্ধুকে তখন বলিয়াছিলাম,—"ইয়োরোপীয় লড়ায়ের ফলে ভারতবাসীর চিন্তার ধারা হইতে অস্পষ্ট গোঁজামিল গুলা দূরীভূত হইবে। যুদ্ধটা বুঝিবার জন্য দেশের নরনারী ইয়োরোপের ইতিহাসটা তলাইয়া মজাইয়া বুঝিতে বাধ্য হইবে। এই ইতিহাস-চর্চ্চাই ভারতে নবযুগ আনিবে।"

ভারতবর্ষে এখনও ইতিহাস-চর্চ্চা সুরু হয় নাই। ইতিহাস নামে বিগত দশ বৎসর ধরিয়া ভারতে যাহা চলিতেছে তাহা ইতিহাস নয়, উহা প্রত্নতত্ত্ব। প্রত্নতত্ত্ব না থাকিলে ইতিহাসের জন্ম হইতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস না থাকিলেও প্রত্নতত্ত্ব থাকিতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের কাঠাম এবং মাল-মশ্‌লা। কোন এক প্রত্নতত্ত্ব হইতে আট দশ প্রকার বিভিন্ন ইতিহাস রচিত হইতে পারে। কারণ প্রত্নতত্ত্বের ব্যাখ্যার নাম ইতিহাস। প্রত্নতত্ত্বে যিনি পণ্ডিত, তিনি প্রত্নতত্ত্বের ব্যাখ্যায়ও পণ্ডিত হইবেন, এমন কোন কথা নাই। আবার প্রত্নতত্ত্বের ব্যাখ্যায় যিনি ওস্তাদ, তিনি প্রত্নতত্ত্বের অ আ ক খ-ও হয়ত না জানিতে পারেন। প্রত্নতত্ত্বে মতভেদ হওয়া অসম্ভব, কিন্তু ইতিহাসে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষে এই ব্যাখ্যা-কার্য্য এক প্রকার চলেই না বলা যায়। সবেমাত্র প্রত্নতত্ত্ব সুরু হইয়াছে। কিন্তু ইয়োরোপীয়

পণ্ডিতেরা এই ব্যাখ্যা-কার্য্যেই ওস্তাদ। বস্তুতঃ, তাঁহারা এশিয়া, ইয়োরোপ এবং গোটা দুনিয়া সম্বন্ধে নানা প্রকার ব্যাখ্যা বাজারে প্রচার করিয়াছেন। আমরা সেই ব্যাখ্যাগুলিরই খবর রাখি। তাঁহাদের প্রত্নতত্ত্বের কাঠামগুলি আমাদের নজরে সাধারণতঃ আসে না। তাঁহারা যে বস্তুকে ইতিহাস বলিয়া চালান আমরা সেইগুলি মুখস্থ করিয়া মরি মাত্র। গোলামীর চূড়ান্ত।

এই মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোকেরা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের রচনা অনেক পড়িয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় কোন রচনাই সরস ভাবে বুঝা হয় নাই। এই যুদ্ধে ইতিহাসের একটা জ্যান্ত ল্যাবরেটরী পাওয়া যাইবে ভাবিয়াছিলাম। তাহার সঙ্গে মিলাইয়া ভারতবাসীরা জগতের ইতিহাস বুঝিতে চেষ্টা করিবেন ভাবিয়াছিলাম। তাহার ফলে ভারতীয় চিন্তা-পদ্ধতিরই এক আমূল পরিবর্ত্তন আশা করিয়াছিলাম।

এই পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ এখনও দেখিতে পাইতেছি না। মাসিক পত্রের কোন প্রবন্ধে তাহার বিশেষ চিহ্ন নাই। বিজ্ঞাপনেও কোন প্রকার গ্রন্থের নাম দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পরিবর্ত্তনের জন্য হয়ত সময় কিছু লাগিবে। অথবা যাঁহারা এই চিন্তা-সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী তাঁহারা এখনও কলম ধরেন নাই। মোটের উপর বুঝা গেল যে, যাঁহারা বিগত দশ বৎসর ধরিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেছেন তাঁহারা এই পরীক্ষায় ফেল মারিয়াছেন। তাঁহারা ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্রের উপদেশ ভারতীয় পাণ্ডিত্য-সাগরে ছড়াইয়া দিতে পারিলেন না।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত ইয়োরোপে (এবং ভারতবর্ষে এখনও) শঙ্করভাষ্যের টিপ্পনী এবং উপনিষৎ ও গীতার অনুবাদ লেখা হয়। কোন পণ্ডিতেরই মাথায় স্বাধীন চিন্তা নাই।

কাজেই ভারতবর্ষে দর্শন চর্চ্চা হয় না। আমাদের দেশে একজনও দার্শনিক নাই। দর্শনাভিমানী হিন্দুর বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া মরা উচিত।

আমাদের কলেজে ডিফারেন্‌শ্যাল ক্যালকুলাস, জ্যোতিষ এবং উচ্চতর গণিতের নানা বিভাগ শিখান হয় সত্য। কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে আমাদের কেহ কোন "অনুসন্ধান" করিতেছেন কিনা দেশের লোক জানে না। গণেশ প্রসাদ ও রমণ কোন কোন বিভাগে নাম করিতেছেন শুনিতে পাই। আর, বহুদিন হইতেই কলিকাতার "ম্যাথ-মেটিক্যাল বুলেটিন" পত্র চলিতেছে সত্য কথা। কিন্তু সোজাসোজি স্বীকার করা উচিত যে, ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে গণিতের অনুশীলন হয় না। একমাত্র মল্লিক মহাশয়ের নাম ভারতের বাহিরে কখন কখনও শুনা যায়। মারাঠা পরাঞ্জপে বোধ হয় কোন দিন কিছু করেন নাই!

প্রাণবিজ্ঞানের নানা বিভাগ সম্বন্ধেও অনেক কথা আমাদের দেশের লোকের পেটে পড়িয়াছে। অধিকন্তু, নব্য চিকিৎসা-বিদ্যায় অনেক ভারত-সন্তানই কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল দিকেও ভারতবাসী কোন প্রকার মৌলিক গবেষণা করিতেছেন কি? বোধ হয় না। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার পরিচয় ত নাইই। না থাকিবারই কথা। ইংরাজী বা জার্ম্মাণ বা ফরাসীতে প্রচারিত বৈজ্ঞানিক পত্রাদিতেও তাহার কোন চিহ্ন নাই। থাকিলেও এত কম যে নিতান্ত বিশেষজ্ঞ ছাড়া আর কেহ তাহার খবর পায় না।

জগদীশ চন্দ্র "বোস্‌-ইন্‌ষ্টিটিউট" স্থাপন করিতেছেন। হয়ত কালে এই কেন্দ্র হইতে তড়িৎ-বিজ্ঞান এবং জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা স্বাধীন অনুসন্ধান বাহির হইতে পারিবে।

একমাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন সার্থক হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি।

কেন না রসায়ন-বিদ্যাটা ভারতবাসীর (অন্ততঃ বাঙ্গালীর) রপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে রসায়নের ঘর একদম খালি সন্দেহ নাই—কিন্তু বিদ্যাটা বাঙ্গালা দেশে স্থায়ী ঘর করিয়া বসিয়াছে। কারণ এদিকে স্বাধীন ভাবে মাথা খেলাইবার লোক দেখা দিয়াছেন। ইয়োরামেরিকার পরিষৎ পত্রিকাদিতে বাঙ্গালীর গবেষণা মাঝে মাঝে বা প্রায়ই বাহির হইয়া থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব নানা মাসিক পত্রে প্রচারিত হইতেছে। অধিকন্তু দু' একখানা স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক পত্রও চলিতেছে। কিন্তু ভারতবাসীর প্রতিদিনকার চিন্তার প্রবাহে বিজ্ঞান-বিদ্যার ধারা খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। ১৮১৫ সালের পূর্ব্বে দুনিয়া এ সম্বন্ধে যে অবস্থায় ছিল, আজ ১৯১৭ সালেও ভারতবর্ষ প্রায় সেই অবস্থায় আছে। ভারতীয় দশমাসের ২৭ খানা মাসিক পত্র এক সঙ্গে পাইয়া এই কথাটা বারে বারে মনে হইতেছে। কি কবি, কি সমালোচক, কি সম্পাদক, কি দার্শনিক, কি গল্পলেখক, কি ঐতিহাসিক—ভারতের কেহই যেন বিজ্ঞানগুলির প্রাথমিক কথাও কখনও শুনেন নাই! কিছু অত্যুক্তি করা হইল—কিন্তু ব্যাপার অনেকটা এইরূপ।

সুলিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কোন কোন মাসিকে দেখিয়াছি। একটার কথা মনে পড়িতেছে। সেটা শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় লিখিত "সূর্য্য-সংবাদ"। "ভারতবর্ষে" বাহির হইয়াছিল। এই ধরণের সাহিত্য-পদবাচ্য বৈজ্ঞানিক রচনা বিগত দশ বৎসরের ভিতর অনেক বাহির হইয়াছে। এইগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা শীঘ্রই আবশ্যক। বোধ হয় ৫।৬ হাজার টাকা খরচ করিলেই এই কাজ নিষ্পন্ন হইতে পারে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ একদম নাই। বোধ হয়

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" "সবে ধন নীলমণি"। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "আমাদের জ্যোতিষী" পুরাণা বিজ্ঞানের ইতিহাস। উহা বিজ্ঞান-গ্রন্থ নয়। বাঙ্গালী নিজ সাহিত্যের বড়াই সর্ব্বত্র করিতেছেন। আমার বিবেচনায় আমাদের মাথা হেঁট্ করিয়া চলাই উচিত। দুনিয়ার অলিতে গলিতে—বাঙ্গলারও পল্লীতে পল্লীতে "ইভলিউশন" শব্দটা আজকাল প্রচলিত। এমন কি এই বিষয়েও বাঙ্গালা সাহিত্যে একখানা "বই" নাই! হয়ত মাসিক পত্রে প্রবন্ধ থাকিতে পারে। ইহা কি বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় না লজ্জার কথা?

রবি বাবুর নোবেল প্রাইজ পাইবার পর বাঙ্গালায় যেন কবিতার দুর্ভিক্ষই লাগিয়াছে। তবে তিনি নিজে "ফাল্গুণী" লিখিয়াছেন। কাগজে দেখিতেছি, চোখে দেখি নাই। ইহা হয়ত তাঁহার নিজ জীবনের নব ফাল্গুন বা নবীন যৌবন। কিন্তু গোটা ভারতের অথবা বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ফাল্গুনের বসন্ত আসিতেছে কি? আসিতেছে আশা করি, অন্ততঃ ইচ্ছা করি যে আসুক। কিন্তু এই দশমাসের রচনায় তাহার চিহ্ন পাইলাম না।

দুই খানা মহাকাব্যের ইঙ্গিত পাইতেছি। "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর "পৃথ্বীরাজ" সমালোচিত হইয়াছে। এই কবি দেশের বৃত্তান্ত ফুটাইতে চিরকালই সিদ্ধহস্ত। কিন্তু দেশের বিবরণ দিতে পারিলেই অথবা স্বদেশ-প্রেম জাগাইতে পারিলেই উচ্চ শ্রেণীর কবি হওয়া যায় না। এই কারণে গ্যে'টের সমসাময়িক জার্ম্মাণ কবিবর শিলার অমর হইতে পারেন নাই। এই কারণেই বাঙ্গালী শিলার দ্বিজেন্দ্রলালও অমর হইতে পারিবেন না।

অধিকন্তু "পৃথ্বীরাজে"র লেখক প্রাচীন ভারতের ইতিহাসটাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর চোখেই দেখিয়াছেন বুঝিতেছি। ১৯০৫ সালের পর

ঐতিহাসিক চর্চ্চার (অথবা প্রত্নতত্ত্ব-চর্চ্চার) ফলে নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। "পৃথ্বীরাজে"র কবি সেগুলি বাদ দেন নাই দেখিতেছি। কিন্তু মোটের উপর দেখিলাম, তাঁহার "ইতিহাস-বিজ্ঞান" এবং "রাষ্ট্র-বিজ্ঞান" (অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্বের ব্যাখ্যা) ১৯০৫ সালের আগেকার যুগেরই মাল। বোধ হয় তিনি যুবক ভারতের চোখে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ এবং রাষ্ট্র বুঝিতে অভ্যস্ত নন। যাহা হউক, এই গ্রন্থের কল্পনায় কবিবর বাঙ্গালার কবি-সংসারে একটা গভীরতর এবং দৃঢ়তর চিন্তার রেখাপাত করিয়াছেন।

তিনি গদ্যে যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা গ্রন্থের সঙ্গে না জুড়িয়া দিলেই পাঠকগণের উপকার হইত। তাহা হইলে আমরা যাহার যেরূপ খুসী মহাকাব্যটা হইতে জীবন গঠন করিতে সুযোগ পাইতাম। তাঁহার ভূমিকার চাপে পাঠকের কল্পনা ঢাকা পড়িবে—অধিকন্তু তাঁহার নিজের কল্পনারও দৌড় বুঝিতে কষ্ট হইবে।

কবিতাটা নিজেইত প্রাচীন ইতিহাসের সরস ব্যাখ্যা। তাহার উপর একটা গদ্য ব্যাখ্যা চড়াইয়া ক্ষতি হইয়াছে—কোন লাভ হয় নাই। তাঁহার যাহা বক্তব্য আমরা কবিতা হইতে নিংড়াইয়া লইব। কবি স্বয়ং সমালোচক সাজিয়া তাঁহার কাব্যের সুবিচারের পথে অন্তরায় হইয়াছেন। ইহা দুঃখের কথা।

"পৃথ্বীরাজের এবং তাঁহার সঙ্গে হিন্দু স্বাধীনতার পতন এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়"। কিন্তু এই বিষয়টা বুঝাইতে যাইয়া ১৯০৫ সালের পূর্ব্বেকার ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক, বক্তা, গল্পলেখক, কবি এবং সম্পাদক যে কথা বলিয়াছেন ১৯১৬ সালের কবিও প্রায় সেই কথাই বলিলেন। এই জন্যই "পৃথ্বীরাজ" ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা। ভারতবর্ষের বহু নরনারী এখনও ঊনবিংশ শতাব্দীতে রহিয়াছেন। তাঁহাদের মনমাফিক কথাই

কবিবর জোগাইলেন। বিংশশতাব্দীর যুবক ভারত কি এই যুগের মহাকাব্য লিখিবে? ইহাতে আছে মাত্র তিন কথা :—(১) ধর্ম্ম-সংস্কার, (২) সমাজ-সংস্কার, (৩) কংগ্রেসের রাষ্ট্র-নীতি—অর্থাৎ "ভারতীয় ঐক্য।" এই তিনটা তত্ত্বের ভিতর যতখানি দর্শন আছে তাহা বহুদিন হইল ভারতবাসীর হজম হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সেই দর্শনকে আজকাল আমরা "সেকেলে" এবং বাতিলই বিবেচনা করিয়া থাকি। যুবক ভারতে নূতন দর্শন আসিয়াছে যে। সেই দর্শনের অনুযায়ী মহাকাব্যও একদিন লিখিত হইবে। ইতিমধ্যে ভূমিকাটা বাদ দিয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে "পৃথ্বীরাজ" পঠিত হউক।

যাঁহারা প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে কাব্য বা উপন্যাস লিখিতে চাহেন, তাঁহারা আগে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং ধন-বিজ্ঞান আয়ত্ত করুন। সেই সঙ্গে নব্য এবং প্রাচীন ইয়োরোপের "ইতিহাস" দখলে আনুন। তাহার পর প্রাচীন ভারতের সন-তারিখ-সমন্বিত "প্রত্নতত্ত্ব"-নির্দ্ধারিত নিরেট তথ্যগুলি মাথায় রাখুন। তারপর কোনদিন "জ্যান্ত" স্বাধীন হিন্দুধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাস বা কাহিনী বা ছড়া বা নভেল বা যা হ'ক কিছু লিখিবার ক্ষমতা জন্মিবে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের খবর না রাখিয়া "ইতিহাস" চর্চ্চা করিতে বসা বিড়ম্বনা মাত্র। ইতিমধ্যে যাহা পাইতেছি তাহাই লাভ। "পৃথ্বীরাজ" একটা "এক্সপেরিমেণ্ট" স্বরূপ আদরণীয়—ইহা পথপ্রদর্শক। এই পথে চলিবার জন্য যুবক বাঙ্গালার কবিগণ প্রলুব্ধ হউন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের মাপে মৌর্য্য, গুপ্ত ও পালের ভারত বুঝিতে চেষ্টা করিলে "পৃথ্বীরাজে"র কবির মতন জীবনা-শক্তির কেন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে।

দ্বিতীয় মহাকাব্যের নাম "বীর-কুমার-সম্ভব"। লেখক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। "উপাসনা"য় মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা পড়িলাম।

ভাষার জোর এবং বর্ণনার ক্ষমতা দেখিতেছি। আলোচ্য বিষয় বুঝা গেল না।

মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ধারাবাহিক সমালোচনা "ভারতবর্ষে" চলিতেছে। "গৃহস্থে" "সংস্কৃত নাটকে প্রাচীন ভারতের পরিচয়" পাইলাম। সাহিত্য-সমালোচনাটাও বাঙ্গালায় দাঁড়াইতে চলিল। "সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব" বইটা অর্ডার দিয়াও পাইলাম না। বাঙ্গালায় বোধ হয় এই ধরণের গ্রন্থ অদ্বিতীয়।

বাঙ্গালীকে সেনাবিভাগে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালী পল্টনও বোধ হয় তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। "গৃহস্থে" শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন বাঙ্গালী সৈন্যদিগকে বলিতেছেনঃ—"জাতির কলঙ্ক মোচনের জন্য, স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য তোমরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়াছ!" বোধ হয় কোন বাঙ্গালী সৈন্যই পণ্ডিত মহাশয়ের অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষের "মতে"র অপেক্ষা করে নাই। সুতরাং এ অবস্থায় তর্করত্ন মহাশয়ের "মত" দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়ের ইজ্জৎ যাইবারই সম্ভাবনা এবং হাস্যাস্পদ হইবার কথা।

পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—"তোমরা শত্রুগণের দর্প দম্ভ চূর্ণ করিয়া বাধাবাতের আশঙ্কা দূরীভূত করিয়া যখন দেশে ফিরিবে তখন ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবস্থাপককে তোমাদের কৃতকার্য্য শ্রবণ করাইবে, উদ্দেশ্য শ্রবণ করাইবে, তখন সকলেই বুঝিবেন তোমাদের পুণ্যের তুলনায় পাপ অল্প, তাহার প্রায়শ্চিত্তও অধিক নহে। তোমরা শাস্ত্র-গৌরব রক্ষার্থ সেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে, সমাজ তোমাদিগকে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবেন।"

পণ্ডিত মহাশয়, আর কেন? খোলাখুলি স্বীকার করিলেই ভাল

হইত যে, "আমরা পণ্ডিতসমাজ বর্ত্তমান জগতের মাপ কাঠিতে নিতান্তই নগণ্য এবং ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়াছি। ভবিষ্যতের জন্য কর্ত্তব্য বুঝিবার এবং বুঝাইবার ক্ষমতা ত নাইই, এমন কি, আমরা বর্ত্তমানের অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতেও নিতান্ত অপটু। সমস্ত দুনিয়া আমাদের অজ্ঞতা এবং বেকুবি তুচ্ছ করিতেছে। কাজেই আমরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নির্জ্জীব অস্থি পঞ্জর বিশেষ। হে যুবক সম্প্রদায়, তোমরাই আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের ফোয়ারায় স্নান করিবার সুযোগ পাইয়াছ। তোমরাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবস্থাপক হইবার অধিকারী। আমরা নিজ ইচ্ছায় পেন্সন লইতেছি অথবা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতেছি। তোমরা এথন হইতে বর্ত্তমান ভারতের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিতে চাও আমরা সাদরে তাহাই গ্রহণ করিব। 'পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।' ইহাই ভারতীয় ঋষিগণের বাণী। সেই বাণী অনুসারে আমরা পরাজয় স্বীকার করিতেছি। তোমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া আমাদিগকে যাহা শুনাইবে তাহাতেই আমরা কৃতার্থ হইব। পুরাণা ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে নানাপ্রকার দণ্ড, প্রায়শ্চিত্ত বা পুণ্য ও কীর্ত্তির বিধান ছিল। আজ হইতে সেই সব বিলুপ্ত হইবে। তোমরা নব জীবনের যে সকল নব ধর্ম্মশাস্ত্র কায়েম করিতেছ সেইগুলি অনুসারে নূতন পাপ ও নূতন পুণ্যের মাপকাঠি তৈয়ারি হউক। সাবেক আমলের প্রায়শ্চিত্তের দৌরাত্ম্যে আজ হইতে তোমাদিগকে আর ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না। বরং যদি পার, আমাদের বুড়া হাড়েও প্রাণ সঞ্চার করিয়া দাও।"

বস্তুতঃ, আজকাল প্রায়শ্চিত্তের ভয়ে অথবা অন্য কোন প্রকার সামাজিক শাস্তির চাপে পড়িয়া কোন বাঙ্গালীই নিজকে বিব্রত ভাবেন না। সমুদ্র-যাত্রা অর্থাৎ বিদেশ-গমন আজকাল কোন শাস্ত্রবিশেষের

প্রভাবে বাধা পাইতেছে না। যদি কোন বাধা থাকে, তাহা অর্থের অভাব। কাজেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজকে গালি দিবার কোন প্রয়োজন নাই। লাখ লাখ টাকা খরচের ব্যবস্থা করা হউক, হাজার হাজার মুচি ব্রাহ্মণ তাঁতী চাড়াল এখনই সাগরে তরী ভাসাইবে দেখিতে পাইব।

তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন :—'প্রায়শ্চিত্তও অধিক নহে।" আর কয়েক বৎসর পরে তিনি নিজেই বলিবেন :—"প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনই নাই।"

এই সময়ে একটা কাজ করিলে বড় উপকার হয়। একশত নামজাদা পণ্ডিত মহাশয়ের দলকে জাহাজে বসাইয়া দুনিয়া প্রদক্ষিণ করাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একখানা জাপানী জাহাজ ভাড়া করা যাইতে পারে—তাহাতে ব্রাহ্মণের রান্নাবাড়ীর ব্যবস্থাও চলিবে। তামা তুলসী গঙ্গাজল কোষাকুষী সবই জাহাজে থাকিবে। এই জাহাজের সওয়ারি হইয়া পণ্ডিতগণ সকল দেশের বড় বড় বন্দরে কয়েক সপ্তাহ কাটাইতে পারেন। তাহাতে প্রত্যেক দেশের আদব কায়দা, পাণ্ডিত্য, চরিত্র, ধর্ম্মানুষ্ঠান স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ জুটিবে। এইরূপে বৎসর খানেক সমুদ্রের হাওয়া খাইয়া স্বদেশে ফিরিলে সকলের চোখ ফুটিবে। ভারতবর্ষ যে আজকাল কোন বিষয়েই "সকল দেশের সেরা" নয় এই জ্ঞানটা বদ্ধমূল হইবে। হিন্দুসমাজের বাহিরেও লক্ষ লক্ষ ঋষি, সাধু ও সতী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন—একথা বুঝিতে বাকি থাকিবে না। অধিকন্তু বর্ত্তমান ভারত যে দুনিয়ার নরক স্থানীয় এই কথাটাও স্পষ্ট হইবে। বস্তুতঃ, মিশর, তুরস্ক, পারস্য, ভারত ও চীন—গোটা এশিয়াই জীবনলীলা সংবরণ করিতে চলিয়াছে—এই ধারণা সকলেরই মগজে বসিবে। তাহার পর, "জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ" বিশ্লেষণ করিবার জন্য "নারায়ণে"র প্রবন্ধটা না পড়িলেও

চলিবে। লেখক এশিয়াবাসীর অন্তিমদশা চমৎকার ধরিয়াছেন। দুঃখের কথা, এশিয়াকে বাঁচান অসাধ্য।

আমাদের দেশে আজকাল "ঠোঁট-কাটা" সমালোচনা সুরু হইয়াছে। চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া বেহায়ার মত কেহ কেহ মত প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সুলক্ষণ। "ঢাক ঢাক গুড়্ গুড়্" বেশী কাল বজায় রাখা ঠিক নয়।

"প্রবাসী" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক-নিয়োগ সমালোচনা করিয়া বলিতেছেন :—

"সুতরাং দেখা যাইতেছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস একা দীনেশ বাবুই জানেন, এবং তিনি এ বিষয়ে সমস্ত জ্ঞানের আধার, এবং এবিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অফুরন্ত, বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের সকল যুগেরই সম্বন্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক ও অন্যবিধ জ্ঞান প্রত্যেক বাঙ্গালী অপেক্ষা বেশী!"

দীনেশ বাবুর উপর ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য এইরূপ লেখা হয় নাই। "প্রবাসী" সাহিত্য এবং ভাষার ইতিহাস-রচনার যুক্তি-সঙ্গত উন্নত আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। "প্রবাসী" বলিতেছেন :—

"বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করিতে হইলে সংস্কৃত ছাড়া, হিন্দী, বিহারী, ওড়িয়া, মারাঠী, ফারসী, আসামী প্রভৃতি ভাষার সহিত পরিচয় থাকা দরকার। তা ছাড়া ভাষা-বিজ্ঞানে দখল থাকা চাই।"

অধিকন্তু, বলা উচিত যে, ভাষাতত্ত্বে পাণ্ডিত্য থাকিলেই সাহিত্যে পাণ্ডিত্য আছে এরূপ বুঝা যায় না। অথবা, পুরাণা পুঁথি ঘাঁটিয়া সাহিত্যের ইতিহাসের একটা খসড়া প্রস্তুত করিতে পারিলেই সাহিত্যে রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না; ইত্যাদি।

"প্রবাসী" কয়েকজন যোগ্যতর লোকের নামও করিয়াছেন। এই সমালোচনার সুরে বুঝিতেছি যে, বাঙ্গালীর লোক-বল বাড়িয়াছে। নানাক্ষেত্রে দুএকজন করিয়া বিশেষজ্ঞের উদ্ভব হইয়াছে। কাজেই কোন এক ধুরন্ধরের শাগ্‌রেতি করিয়া আমরা সারা জীবন কাটাইতে চাই না। "সব-জান্‌তা" লোকের পাল্লা যে যুগে দেখা যায় সে যুগটা জাতির শৈশবাবস্থা। আমরা বোধ হয় সেই শৈশবাবস্থা কাটাইয়া উঠিতেছি। তবে বড় ধীরে ধীরে এই যা দুঃখ!

"ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন:—"সম্প্রতি আমাদের দেশে দানবীর রাজামহারাজার কৃপায় যে সকল বৃহদাকার ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 'পৃথিবীর ইতিহাস' অন্যতম। আশা করি, এই বাঙ্গালাদেশেও এমন আনাড়ি কেহ নাই যিনি এই গ্রন্থগুলিকে বিশেষজ্ঞের লিখিত বলিয়া ভ্রম করিবেন।"

এক্ষেত্রেও লেখক ব্যক্তিগত আক্রোশের পরিচয় দেন নাই। তিনি আদর্শ ঐতিহাসিকের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "যিনি জগতের সাধারণ ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত হইতে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করেন নাই, বর্ত্তমান কালে যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইয়োরোপে ইতিহাস-শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহার মূল নীতির বিষয়ে যিনি সম্যক্ অভিজ্ঞ নহেন, এবং ঐ সমুদয় মূল নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাথমিক আদি উপকরণগুলির সাহায্যে যিনি ইতিহাস গঠন ও পঠনে যত্নবান হইয়া ইতিহাস চর্চ্চাকে জীবনের অন্যতম ব্রতরূপে অবলম্বন করেন নাই, তাঁহাকে কখনও ইতিহাস-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বলা যায় না।" এই বর্ণনা অনুসারে রমেশ বাবু কয়েকজন বাঙ্গালী ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-বিশেষজ্ঞের নাম করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, "নিরন্ত

পাদপে দেশে এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে", অথবা "নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল"। রমেশ বাবু গলার আওয়াজটা কিছু চড়াইয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার চড়া সুর বজায় রাখিয়াই এই টিপ্পনী করা গেল।

রমেশ বাবু যেরূপ আদর্শ ঐতিহাসিকের বিবরণ দিয়াছেন তাহার উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষে এক প্রকার নাই। ভারতবর্ষে বসিয়া কোন ভারত-সন্তান প্রথম শ্রেণীর ভারতেতিহাস লিখিতে পারিবেন না। অন্যান্য বিদ্যার মতন ইতিহাস-বিদ্যার ল্যাবরেটরীও আজকাল ইয়োরামেরিকার ভিতর রহিয়াছে। অধিকন্তু, ভারতীয় ইতিহাসের কোন বিভাগে বিশেষজ্ঞ হইতে হইলে দুনিয়ার অন্যান্য বহুবিষয়ে বেশ চলনসই জ্ঞান থাকা আবশ্যক। রমেশ বাবু সকল কথা খুলিয়া বলেন নাই। সেই অভিজ্ঞতা বা সেই জ্ঞানও ভারতবর্ষে অর্জ্জিত হইতে পারে না। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলাম। বস্তুতঃ, ভারত খানাকে বুঝিতে হইলে, সকল দিক হইতেই, কিছু কাল ভারতের বাহিরে আড্ডা গাড়া আবশ্যক।

একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। রমেশ বাবু দশ জন বাঙ্গালার নাম করিয়াছেন। ইহাঁদের এক জনও বোধ হয় জার্ম্মাণ কিম্বা ফরাসী ভাষা জানেন না। এক জনও গ্রীক জানেন না। যিনি গ্রীক ও ল্যাটিন জানেন না তিনি প্রাচীন ভারতের দাম কষিতে অসমর্থ। এক জনও বোধ হয় নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অপর কোন ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা জানেন না। এইরূপ গণ্ডা গণ্ডা তরফ হইতে সমালোচনা চলিতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সঙ্গে টক্কর দেওয়া মুখের কথা নয়। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান জগতের বিদ্যার বাজারে ভারত-সন্তানের পক্ষে বিশেষজ্ঞের পদ দাবী করা বড় কঠিন। অনেক কাঠ

খড় এবং নূন তেল খরচ করার ফলে ইয়োরামেরিকায় নামজাদা বিশেষজ্ঞের উদ্ভব হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। হতভাগ্য ভারত-সন্তানকে পাকা পণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য কাহার মাথা ব্যথা পড়িয়াছে? যাহা হউক, আমরা "খোকা হাঁটে পা পা, স্বরে অ, স্বরে আ" করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছি। রমেশ বাবু যাঁহাদিগকে বিশেষজ্ঞের আসনে বসাইয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে সেই আসন হইতে নামাইতেছি না। কাজেই তাঁহারা আমার উপর চটিবেন না।

তবে রমেশ বাবুর আদর্শ হইতে বুঝা গেল যে, বাঙ্গালী আজকাল "যেন তেন প্রকারেণ" "নমো নমো" করিয়া সংক্ষেপে কাজ সারিতে চাহেন না। আমাদের সুর চড়িয়াছে—আমরা আশ্‌মানের চাঁদ ধরিতে প্রয়াসী হইয়াছি। কিন্তু নিরেট কাজের কথা এই যে, যদি উচ্চশিক্ষিত ভারতসন্তানের উপর টাকা খরচ করা যায় তাহা হইলে অল্প কালের ভিতরেই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ ইয়োরামেরিকার যে-কোন পণ্ডিতকে "চিট্" করিয়া দিতে পারিবেন।

আর একটা কথা বুঝা গেল যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে পণ্ডিত না হইলে স্বদেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার এক্তিয়ার কাহারও থাকিবে না। এই বিষয়ে যিনি যত অগ্রণী তিনি স্বদেশ সম্বন্ধে তত বেশী সমজদার হইতে পারিবেন। এই কথাটা স্পষ্ট ভাবে সকলের কাণে প্রবেশ করা আবশ্যক। "হ'তে চাও স্বদেশী, ত আগে হও বিদেশী"—এই ভাবে সূত্র প্রচার করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, ১৯০৫ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতে "স্বদেশী" নামে যাহা কিছু চালান হইয়াছে তাহার শতকরা ৯৯ অংশই বিদেশী। "জাতীয় শিক্ষার" আন্দোলনেরও গোড়ার কথা ছিল নব্য বিদ্যা-কলার

বিকিরণ। কেবল তাহাই নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতেও আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি, করিয়াছি, শিখিয়াছি, শিখাইয়াছি তাহাও সবই প্রায় বিদেশী। এই বিদেশী মাল আমরা মনের মতন এবং প্রচুর পরিমাণে পাই না বলিয়াই আমরা দুঃখিত। বর্ত্তমান যুগে বিদ্যার এক কণাও ভারতবর্ষে বা এশিয়ার কুত্রাপি নাই। বর্ত্তমান কালে বিদ্যা বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, উহা ইয়োরামেরিকার একচেটিয়া মাল। এ বিষয়ে গোঁজা মিল রাখা বেকুবি। একমাত্র বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের আমদানির উপরেই স্বদেশী আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করিতেছে। স্বদেশ-সেবা হিসাবে এই আধুনিক বিদ্যা প্রচারের জন্যই পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালা স্থাপন প্রধান কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, ভারতের পুরাণা নিজস্ব যে সকল বিদ্যা অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য আছে বর্ত্তমান যুগে সেইগুলার যদি কোন দাম থাকে সেই সবকে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে হইবে না। সেই গুলিরও খবর রাখা এবং খতিয়ান করা আবশ্যক, সন্দেহ নাই।

"ভারতবর্ষে" মাঝে মাঝে হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী ইত্যাদি প্রাদেশিক সাহিত্যের বিবরণ বাহির হয়। এই সকল বৃত্তান্ত পড়িয়া বাঙ্গালীর উপকার হইবার কথা। নিষ্কর্ম্মা কূপমণ্ডূক যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা আর "মেড়ো", "উড়ে" ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক শব্দ ব্যবহার করিবেন না। ভারতবর্ষের নানা স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ বাহির হইতেছে। ইহাতেও বাঙ্গালীর চরিত্র উদার হইবে, বলা বাহুল্য। দুঃখের কথা, আজও আমরা বাঙ্গালাদেশে গোটা দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে একদম অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা আর কতদিন চলিবে?

"প্রবাসী"তে "পঞ্চশস্য" ছোট অক্ষরে ছাপা হয়। হয়ত পাঠকেরা এই অংশকে বর্জ্জনীয় বিবেচনা করিতে পারেন। সত্য কথা, এই

অংশে যে ধরণের তথ্য বাহির হইতেছে সেই ধরণের তথ্য প্রচারের জন্যই স্বতন্ত্র মাসিক পত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। এই সকল বিষয়ে লেখক, পাঠক, গ্রন্থ, প্রকাশক এবং দোকানদার যত বাড়িবে, ভারতবাসীর চোখ ও মাথা তত বেশী খুলিবে। ভারতবর্ষের অলিতে গলিতে বর্ত্তমান জগতের নবনব চিন্তা ও কর্ম্মরাশির পরিচয় সংক্রামিত হওয়া আবশ্যক। তাহার জন্য গোটা দুনিয়ার চুম্বক প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা চাই। "পঞ্চশস্যে" তাহার কথঞ্চিৎ চলিতেছে।

বিংশশতাব্দীর ষোল বৎসরের ভিতরই যতগুলি কল-যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে তাহার তালিকা দেখিলেই স্তম্ভিত হইতে হয়। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও গোটা দুনিয়ার গতি দ্রুত সাধিত হইতেছে। ভারতবর্ষও এই দৌড়ে যোগ দিয়াছে সত্য। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে, দুনিয়ার ভিতর যুবক ভারতের সুযোগ যে পরিমাণে বাড়িতেছে, বাধা বিঘ্নও তাহার অনেক গুণ বেশী জমিতেছে।

কেম্ব্রিজ, ম্যাস্, ১৩-৫-১৭

জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা

ইংরাজি ভাষা জানা থাকিলে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে দুনিয়া "দেখা" হয় না। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র মাত্র দেখা চলে—জগতের অন্যান্য অংশে কাণার মতন ঘুরিতে হয়। চোখ খুলিয়া দুনিয়ায় বেড়াইতে হইলে জার্ম্মাণ এবং ফরাসী ভাষায়ও দখল থাকা আবশ্যক। পারস্যে, মিশরে, জাপানে এবং চীনেও এই দুই ভাষা বিশেষ কাজে লাগে। একমাত্র ইংরাজি সম্বল থাকিলে এই সকল দেশের ইট কাঠ চূণ সুরকি গাছগাছড়ার বেশী আর কিছু নজরে পড়ে না। ইহাদের উচ্চশিক্ষিত নরনারীর চিন্তা বুঝিতে পারা যায় না। অধিকন্তু, এই সকল দেশ সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থাদির শতকরা পঁচাত্তর অংশ অ-দেখা থাকে।

এই ত গেল দেশ-পর্য্যটনের সুবিধা অসুবিধা। পণ্ডিত-মহলে পর্য্যটন করিতে হইলেও জার্ম্মাণ এবং ফরাসী ভাষা জানা থাকা আবশ্যক। বিদ্যা বিষয়ক দুই চারিটা কথাবার্ত্তা হইবার পরই পণ্ডিতেরা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন—"মহাশয়ের জার্ম্মাণ বা ফরাসী গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস আছে কি?" যদি জবাব দেওয়া হয়, "আজ্ঞে না", তৎক্ষণাৎ দর কমিয়া গেল। হয়ত আলোচ্য বিষয়ে এই দুই ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থের নজির তুলিবার প্রয়োজনই নাই। কিন্তু যেই কোন পণ্ডিত শুনিলেন, তুমি ফরাসী ও জার্ম্মাণ বা ইহাদের অন্ততঃ একটা জাননা তৎক্ষণাৎ তুমি পচিয়া যাইবে। তুমি অন্য কোন বিদ্যায় যতই ধুরন্ধর হওনা কেন তোমার দাম কোন মতেই তৃতীয় শ্রেণীর উপর উঠিবে না। এই দুই ভাষা

জানা না থাকিলে পণ্ডিত-মহলে কথা বলিতে যাওয়া হাস্যাস্পদ বিবেচিত হইবে।

ভারতবর্ষে এই কথাটা বিশেষ প্রচারিত নয়। এই কারণে ফরাসী ও জার্ম্মাণ জানা ভরতবাসীর সংখ্যা আঙ্গুলে গুণা যায়। ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ—শুধু বাঙ্গালা দেশের কথাই ধরা যাউক। আজকাল বোধ হয় কালকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ও জার্ম্মাণ পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। হয়ত কেহ কেহ শিখিতেছেন, শিখিয়াছেন এবং শিখিবেন। আর, কোন কোন বিজ্ঞানসেবী বা প্রত্নতাত্ত্বিক বা দর্শনাধ্যায়ী বা গল্প-লেখক হয়ত স্বচেষ্টায়ই এই দুই ভাষার কোন কোনটা আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর, উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর পেটে এই দুই ভাষা এখনও পড়ে নাই বলা চলে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর সেরা পণ্ডিতগণও দুনিয়ায় তৃতীয় শ্রেণীর লোক মাত্র।

নূতন ভাষা শিখিতে হইলে প্রথম প্রথম একসঙ্গে কিছু বেশী সময় দেওয়া আবশ্যক। এত সময় পাই কোথায়? এই সন্দেহ আমাদের অনেকেরই আছে—আমারও ছিল। যাহা হউক, এযাত্রায় জাপান হইতে আমেরিকায় নামিবা মাত্রই জার্ম্মাণে হাতে খড়ির ব্যবস্থা করিলাম। আদানুন খাইয়া লাগা যাহাকে বলে! বিদ্যা এখনও বিশেষ কিছু হয় নাই। তবে "কত ধানে কত চাল" বুঝিতে পারিয়াছি। ছয় মাসের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিতেছি। বিদেশী ভাষা দখল করা একটা কিছু ভয়ানক কাণ্ড নয়। বাঙ্গালী সহজেই ফরাসী এবং জার্ম্মাণ বা অন্যান্য ভাষা দখল করিতে পারিবেন। আমাদের যাঁহারা এই দুই ভাষা জানেন তাঁহারা বেশী দিন আর "চালে" চলিতে পারিবেন না। শীঘ্রই বহু বাঙ্গালী এই দুইটা দখল করিয়া বসিবে।

১১ ডিসেম্বর (১৯১৬) হাতে খড়ি। জার্ম্মাণেরা ইংরাজি (রোমাণ)

অক্ষরে বই ছাপে না। তাহাদের এক স্বতন্ত্র হরপ্। অধিকন্তু, হাতের লেখার হরপ্ আবার সেই হরপ্ হইতে স্বতন্ত্র। (ইংরাজিতেও হাতের লেখার হরপ্ ছাপার হরপ্ হইতে স্বতন্ত্র)। কাজেই জার্ম্মাণ ভাষায় বর্ণ-পরিচয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ফরাসীরা ইংরাজি হরপই ব্যবহার করে। কাজেই ফরাসী ভাষায় বর্ণপরিচয় দরকার হয় না। ফলতঃ কয়েক ঘণ্টা সময় বাঁচে। জার্ম্মাণ হাতের লেখা রপ্ত না করিলেও চলিত। কিন্তু "অধিকন্তু ন দোষায়"। প্রতিদিন "হস্তলিপি" অভ্যাস করিয়া লইলাম। হস্তাক্ষরের খাতা বৃহদাকার হইয়া পড়িল। তখনও ভাষায় প্রবেশ করি নাই। হস্তাক্ষরটা ভাষাশিক্ষার আনুষঙ্গিক বিবেচনা করিতেছি না—এটা ফাও মাত্র।

কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া দেখিতেছি, জার্ম্মাণ ভাষা দখল করিতে ঠিক লাগিয়াছে পাঁচ সপ্তাহ (২০ জানুয়ারি হইতে ২৬ ফেব্রুয়ারি)। প্রতিদিন গড়ে দুই ঘণ্টা খরচ। পুস্তকের নাম "Lehrbuch der Dentschen Sprache". লেখকের নাম Spanhood. প্রকাশক Heath and Co., New York. এই বই আমেরিকার স্কুলে ও কলেজে ব্যবহার করা হয়। পৃষ্ঠা ২৪০। স্কুলের ছাত্রেরা এক বৎসরে এই বইয়ের অধিকাংশ শেষ করে। কলেজের ছাত্রেরা দুই বা আড়াই মাসের ভিতর গোটা বই পড়িয়া ফেলে। আমার পাঁচ সপ্তাহ আর ইহাদের দুই বা আড়াই মাস বোধ হয় পরিমাণে এক—কারণ ইহারা সপ্তাহের প্রতিদিনই জার্ম্মাণ পড়ে না। অধ্যাপকের ৩০।৩৫ বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা বাড়ীতে ৩০।৩৫ ঘণ্টা খরচ করে। মোটের উপর ৭০ ঘণ্টা লাগা উচিত। ইহার কমে চলিতে পারে কিনা সন্দেহ।

পাঁচ সপ্তাহে বিদ্যা কতটা হইল? জার্ম্মাণ ভাষায় যতগুলি নিয়ম থাকিতে পারে সবগুলিই জানা হইয়া গেল। সূত্র মুখস্থ নয়!

বাক্য রচনা, জার্ম্মাণ হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ, ইংরাজি হইতে জার্ম্মাণে অনুবাদ—এই হইল শিক্ষা-প্রণালী। শব্দরূপ এবং ধাতুরূপ অবান্তর ভাবে জানা হইয়া গেল। অর্থাৎ "ঋজুপাঠ" (১, ২, ৩ ভাগ) এবং "হিতোপদেশ" কণ্ঠস্থ হইল। অবশ্য জার্ম্মাণ ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের চতুর্থাংশ মাত্র। যাহারা সংস্কৃত জানে তাহাদের কাছে জার্ম্মাণ ব্যাকরণ মুড়ি মুড়কীর মতন সোজা। শুনিতে পাই, জার্ম্মাণ নাকি ইয়োরোপের সব চেয়ে কঠিন ভাষা (বোধ হয় রুশ বাদে)। তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষা যাহাদের দখলে আছে তাহারা ইয়োরোপের সকল ভাষাই "হেসে খেলে" বশে আনিতে পারিবে।

পাঁচ সপ্তাহে "জার্ম্মাণ শিক্ষা প্রথম ভাগ" সাঙ্গ করিয়া একখানা আলগা কেতাবের ইংরাজি বাক্যসমূহ জার্ম্মাণে তর্জ্জমা সুরু করিলাম। সেইরূপ তর্জ্জমা আজও করিতেছি। অধিকন্তু একখানা জার্ম্মাণ বই পড়িয়া ফেলিলাম :—"Gruss aus Dentschland." লেখক Holywarth. প্রকাশক হীথ্ কোম্পানী। বইটা "হিতোপদেশ" বা "কথামালা"র সামিল। ১২১ পৃষ্ঠা শেষ করিলাম দুই সপ্তাহে। তাহার পর হইতেই নিজকে "জার্ম্মাণ-জান্তা" বিবেচনা করিতেছি! অতএব সাত সপ্তাহে জার্ম্মাণ শিখিয়াছি বলিতে হইবে। কোন অধ্যাপকের সাহায্য আবশ্যক হয় নাই—স্কুলে যাওয়া আসা করিতে হয় নাই। দুইখানা বই কিনিতে এবং একখানা অভিধান কিনিতে প্রায় ১৪৲ খরচ হইয়াছে ; তাহা ছাড়া জার্ম্মাণ শিখিতে এক আধলাও লাগিল না।

এই পর্য্যন্ত বিদ্যার পরই Das Chitralaksana গ্রন্থের ইংরাজি তর্জ্জমা সুরু করিয়াছি। ১৭ এপ্রিল হইতে আজ ১১ জুন ৪৯ দিন (রবিবার বাদ দিতে হইয়াছে অন্যান্য কাজের হিড়িকে) প্রতিদিন ৪০,৪৫ মিনিটের বেশী সময় দিতে পারি নাই। মোটের উপর ৩৬

ঘণ্টায় ৬০০ লাইন অনুবাদ করিয়াছি। এই অংশ অনুবাদকের ভূমিকার অন্তর্গত,—এখনও মূলে আসি নাই।

বইখানা সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদের জার্ম্মাণ অনুবাদ। অনুবাদকের নাম বার্ট হোল্‌ড্ লাওফার। চিত্রকলা সম্বন্ধে অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত বাজারে বাহির হয় নাই (শুক্রনীতির কিয়দংশ ছাড়া)। কাজেই "চিত্র-লক্ষণ" গ্রন্থ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

যদি আজ কেহ জিজ্ঞাসা করেন:—"জার্ম্মাণ ভাষায় কথা বলিতে অথবা কথা শুনিয়া বুঝিতে পার?" জবাব দিব—"না"। "জার্ম্মাণ ভাষায় চিঠি লিখিতে পার?" "পারি। কিন্তু প্রত্যেক লাইনেই হয়ত দুই একটা ভুল থাকিবেই।" "ইংরাজি হইতে জার্ম্মাণে অনুবাদ করিতে পার?" "পারি—কিন্তু যাহা লিখিব তাহার মানে হয়ত অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না!" "জার্ম্মাণ চিত্র-লক্ষণের অনুবাদে কয় গণ্ডা ভুল করিয়াছ?" "ভুল করিয়াছি অনেক—কিন্তু বেশী না! কারণ আগাগোড়া মানে বুঝিতে পারিয়াছি—আর কি চাই?"

বস্তুতঃ, জার্ম্মাণ লিখিতে ও বলিতে যত ভুল হইতেছে তাহার তুলনায় জার্ম্মাণ বই বুঝিতে কিছুই ভুল হইতেছে না বলিব। অবশ্য অভিধান সর্ব্বদাই সঙ্গে আছে। ইংরাজি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরাজি রচনায় যতগুলি ভুল করিয়াছিলাম। আজ জার্ম্মাণ রচনায় ততগুলি ভুল করিতেছি। কিন্তু ইংরাজি স্কুলের এল্, এ, বি, এ, ক্লাশে যত কঠিন বই পড়ান হয়, ঠিক তত কঠিন বইই আজ জার্ম্মাণে বুঝিতেছি। একখানা জার্ম্মাণ গানের বই ঘাঁটিতে সাহসী হইয়াছি। এমন কি ব্লুন্‌শলির "রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ইতিহাস," গ্যেটের গদ্য রচনা এবং শিলারের নাটক পর্য্যন্তও ধাওয়া করিতেছি!

আরও মজার কথা। ইতিমধ্যে ফরাসীও ধরিলাম। আজ দশ

দিন। আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি "ফরাসী শিক্ষা প্রথমভাগ" শেষ করিব। পৃষ্ঠা ১২৮। পুস্তকের নাম "French Grammar"। লেখক দুই জন Fraser and Squair। প্রকাশক হীথ্ কোম্পানী।

দশ দিনের এক এক ঘণ্টা ফরাসী শিক্ষার ফলে বুঝিতেছি যে, জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই Sylvain Levi প্রণীত Le Theatre Indien তর্জ্জমা সুরু করিতে পারিব। হার্ভার্ড লাইব্রেরী হইতে বই আনাইয়া রাখিয়াছি। পাতা উল্টাইতেও আরম্ভ করা গিয়াছে। বইখানা ভারতবাসীর সুপরিচিত।

তাহা হইলে প্রত্যেক উচ্চ-শিক্ষিত ইংরাজি-জানা বাঙ্গালী জার্ম্মাণ এবং ফরাসী জানিবে না কেন?

কেহ কেহ বলিতে পারেন:—"তোমার দৃষ্টান্ত এখনও সন্তোষজনক নয়। তুমি গাছে কাঁঠাল দেখিয়াই গোঁপে তেল লাগাইতেছ। আগে ভাষা দুইটা ভাল করিয়া শিখিয়া লও, তাহার পর মত প্রচার করিও"। জবাব দিব:—যত গুড় তত মিষ্টি। সময় বেশী দিতে পারিলে ভুলের সংখ্যা ক্রমশঃ কম হইবে। ইত্যাদি। সম্প্রতি সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ঘড়ির কাঁটা দেখিয়া কাজ কর্ম্ম চালাইতে হইতেছে। নূতন ভাষার নিয়মগুলি "হজম" করিতে কিছু অবসর বা অবকাশ চাই। তাহাও জুটিতেছে না।

কেম্ব্রিজ, ম্যাস্, ১১-৬-১৭

আমেরিকায় কনভোকেশন্

এই এক সপ্তাহ হার্ভার্ডে "মহোচ্ছোব"-যোগ। বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ফলও বাহির হইয়াছে। আজ উপাধি-বিতরণ। এই কাণ্ডকে বিলাতী রীতি অনুসারে কন্‌ভোকেশন বলা হয় না। ইহার খাশ্ ইয়াঙ্কি নাম "কমেন্সমেণ্ট" বা আরম্ভ। বোধ হয় ইহার ভারতীয় পারিভাষিক হইবে "সমাবর্ত্তন" অর্থাৎ ব্রহ্ম-চর্য্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমে পদার্পণ (বা সংসারারম্ভ বা নবজীবনের সূত্রপাত)।

কাল হইতে এখানে গরমের ছুটি সুরু হইবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে যখন গরমের ছুটির পর কলেজ খুলিতে থাকে ইয়াঙ্কিস্থানে তখন তিন মাসের জন্য গরমের ছুটি আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যেই মহা গরম পড়িয়াছে। যাহা কলিকাতা, তাঁহা শাঁহাই, তাঁহা তোকিও, তাঁহা বষ্টন! জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস দুনিয়ার সর্ব্বত্রই প্রায় এক প্রকার,—গুমোট—মেঘ—ঝড়—বৃষ্টি!

বিলাতে দেখিয়াছিলাম, লীড্‌সের কন্‌ভোকেশন—আমেরিকায় দেখি-তেছি হার্ভার্ডের। দুইটা দুই জাতীয় বস্তু—এক ধরণের উৎসব নয়। ভারতবর্ষের কন্‌ভোকেশনগুলা আবার এই দুইটা হইতে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে কন্‌ভোকেশনের অর্থ (১) কয়েকটা লম্বা চৌড়া বক্তৃতা-বর্ষণ, (২) ছাত্রগণের সার্টিফিকেট-লাভ, (৩) গাউন-পরা কর্ম্মকর্ত্তাদের মিছিল। হার্ভার্ডে বক্তৃতা একদম নাই। লীড্‌সেও বোধ হয় বিশেষ ছিল না। কাগজের সার্টিফিকেট-লাভ এই উৎসবের অতি গৌণ অঙ্গ মাত্র। উৎসবটাকেই নানা দিক হইতে জাঁকাইয়া তোলা হয়। আর

কর্ম্মকর্ত্তাদের কর্ত্তামি ছোঁড়াদের মহোৎসবে তলাইয়া যায়। আমোদ-প্রমোদের নানান রূপ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। নাচগানের বাণে পাশফেলের কথা একদম ডুব মারে। লীড্‌স্ অপেক্ষা হার্ভার্ডে আমোদ-প্রমোদের মাত্রা বেশী দেখিতেছি। বস্তুতঃ এত বেশী যে, এখানে দুই দিনের কমে কন্‌ভোকেশন শেষ হয় না। একদিন পূরাপূরি আমোদ-প্রমোদে কাটে—আর একদিন মামুলি উপাধি বিতরণ-কাণ্ড।

(ক)

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী-বিভাগ পুরুষ-বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে পরিচালিত হয়। মেয়ে-কলেজের নাম র‍্যাড্‌ক্লিফ্ কলেজ। এই কলেজের ছাত্রীদেরও দুইদিন লাগে। কাজেই হার্ভার্ডে মোটের উপর চারদিনে কন্‌ভোকেশন সমাপ্ত হয়। সাধারণতঃ জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই তিথিগুলা পড়ে। সমগ্র ম্যাস'চুষেটস্ প্রদেশে, বস্তুতঃ, গোটা নিউ-ইংলাণ্ড মুল্লুকেই এই তিথি-চতুষ্টয় প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর মনে থাকে। আমরা হরিহরছত্রের মেলা, অর্দ্ধোদয়-যোগ, বারুণী-স্নান, কুম্ভ-মেলা ইত্যাদি যে ভাবে মনে রাখি এদেশের লোকেরা হার্ভার্ডের এই দিনকয়টা ঠিক সেই ভাবে মনে রাখে। হার্ভার্ডের কন্‌ভোকেশনকে "জাতীয় উৎসব" বলিলে দোষ হইবে না।

আমোদ-প্রমোদের দিনটাকে "ক্লাস-ডে" বলা হয়। ১৯১৭ সালে যাহারা পাশ হইল তাহাদিগকে ১৯১৭ সালের "ক্লাস্" বলে। এই ক্লাস যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে সেই দিনের নাম "ক্লাস-ডে"। বিদায়োপলক্ষেই নানাপ্রকার মহোচ্ছোবের ব্যবস্থা।

সর্ব্বপ্রথমে আসিল র‍্যাড্‌ক্লিফ-কলেজের ক্লাস-ডে। এই বৎসর কলেজের সকল শ্রেণীতে প্রায় ৬০০ ছাত্রী। উপাধি পাইল শতাধিক।

ইহাদের নৈশ উৎসবের জন্য টিকেট পাওয়া গিয়াছিল। চার ঘণ্টা কাটান গেল।

বাঙ্গালী ডাক্তার প্রমথনাথ রায় প্রায় ২৫।৩০ বৎসর হইতে বষ্টনে বসবাস করিতেছেন। ইনি স্কটল্যাণ্ডের গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়া স্কচ্‌ রমণীকে বিবাহ করেন। বাড়ী বীরভূম জেলায়। এক্ষণে আমেরিকায় চিরপ্রবাসী, বেশ পশার আছে, টাকাও করিয়াছেন। ইঁহার দুই কন্যা র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজের ছাত্রী। ছোটজন কয়েক বৎসর হইল বি, এ, উপাধি পাইয়াছে। দুইজনের চেহারায় ভারতীয় কোন লক্ষণ নাই, যদিও ডাক্তার সাহেব স্বয়ং সাধারণ বাঙ্গালী। তবে মেয়েদের চোখের পাতাগুলা কিছু কাল।

ডাক্তার-পত্নী এবং ডাক্তার-বেটীদের সঙ্গে র‍্যাড্‌ক্লিফের ক্লাস্‌-ডে দেখা গেল। পাশ-করা ছাত্রীরা তাহাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেছে। এইজন্য তাহাদিগকে কোন কোন গৃহের কোন কোন অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কলেজের সঙ্গীত-সমাজ কোন ভবনের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া গান করিল। উপাধিপ্রাপ্তারা উঠানে দাঁড়াইয়া গাহিল। গান করিতে করিতে ঘরগুলি প্রদক্ষিণ করাও হইল। বাহিরে ব্যাণ্ড্‌ বাজিতেছে— অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ। হাজার খানেক চীনা লণ্ঠনের ভিতর বিজুলী বাতী জ্বলিতেছে। প্রকাণ্ড টেবিলে কেক বিস্কুট, কুল্‌পী বরফ (আইস্‌ ক্রীম্‌), ষ্ট্রবেরি ইত্যাদি কটোরাভরা সাজান। হাসি ঠাট্টা পাশ-করা ছাত্রীদের, আর "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।"

রাত্রি দশটার সময়ে দুইটা বড় ঘরে নাচ সুরু হইল। যে কোন যুবক যে কোন যুবতীকে লইয়া নাচিতে অধিকারী। আর বাজনার সুর এমন যে, নাচ ঘরে প্রবেশ করিলে পা আপনা-আপনিই সুর্‌ সুর্‌

করে। যত জায়গায় নাচের বাজনা শুনিয়াছি সকল জায়গায়ই এই প্রকার। অধিকন্তু, নাচটা বোধ হয় এমন কিছু কঠিনও নয়। আধ ঘণ্টা অভ্যাস করিলে হয়ত নাচ রপ্ত হইতে পারে। ডাক্তার-বেটীরা কোন ছোক্‌রা খুজিয়া পাইল না—বেচারাদের বড় দুঃখিত দেখিলাম। কয়েক জোড়া মেয়ে বিনা পুরুষেই নাচিতেছে। আমি বলিলাম—"তোমরাও দুই বোন এই রকমই নাচনা কেন ?" ইহারা তাহাতে রাজি নয়। দুই তিন জোড়া নিগ্রো যুবক-যুবতীকেও নাচে মত্ত দেখিলাম। আড়াই ঘণ্টা নাচ চলিল।

সাদা চামড়া যদি সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বা কারণ বিবেচিত হয়, তাহা হইলে বষ্টন-কেম্ব্রিজের মেয়েরা সুন্দরী বটে। আর তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী ও ভারতীয় স্ত্রীজাতির বিশেষ লজ্জিত বা দুঃখিত হইবার কারণ নাই। দুশ' পাঁচশ ইয়াঙ্কি রমণীর ভিতর সুন্দর চেহারা খুজিয়া বাহির করিতে হইলেও বেশ একটু মেহানৎ করিতে হয়। অত মেহানৎ করিয়া ঢুঁড়িলে ভারতেও বহুৎ সুন্দরী মিলে ! বস্তুতঃ, পৃথিবীতে বোধ হয় স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতিই সৌন্দর্য্যে এবং বুদ্ধিমত্তার বাহ্য লক্ষণে শ্রেষ্ঠ। সকল দেশেই এইরূপ দেখিতেছি। মেয়েরা পুরুষ দেখিয়া বেশী মজে কি পুরুষেরা মেয়ে দেখিয়া বেশী মজে তাহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এখনও হয় নাই। ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ চিত্ত-বিজ্ঞানের (এক্‌স্‌-পেরিমেণ্টাল সাইকলজি) অন্তর্গত। এই আলোচনার জন্য নানা উপকরণ ও তথ্য নানা দিক হইতে সংগৃহীত হইতেছে।

(খ)

র‍্যাড্‌ক্লিফ অপেক্ষা হার্ভার্ডের (পুরুষ) ক্লাস-ডে উৎসব বেশী জমকালো। সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত "দিবসব্যাপী উৎসব"। মঙ্গলাচরণ, প্রার্থনা, ভজন ইত্যাদি অনুষ্ঠানেরও ত্রুটি নাই।

প্রধানতঃ তিন জায়গায় আমোদ-প্রমোদ। সবগুলি দেখিতে খরচ হইল ৯৲। কলেজের উঠান প্রকাণ্ড। তাহার ভিতর ২৩।২৪ টা বড় বড় অট্টালিকা। কোন কোনটা আকারে প্রায় প্রেসীডেন্সী কলেজের সমান। ঘরগুলির ফাঁকে ফাঁকে মাঠ। দু' একটা ঘর ছাত্রাবাস—আর আর গুলা পাঠশালা। এই সকল মাঠে লোকজনের বসিবার স্থান দেওয়া হইয়াছে। শুনা গেল, প্রত্যেক বৎসর নাকি প্রায় এক লক্ষ নরনারীর সমাগম হয়। আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল, ৩০,০০০ উপস্থিত। উঠান (বা মাঠগুলা) এত বড় যে ব্যাণ্ড বাজাইবার জন্য তিন ধারে তিনটা আড্ডা প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

এই উঠানের ভিতর যতগুলি অট্টালিকা, উঠানের বাহিরে রাস্তার অপর পারে আরও এতগুলা অট্টালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামিল। তাহা ছাড়া ছাত্রদের বসবাসের ঘর আলাদা আছে। অধিকন্তু, ছাত্রেরা যে কোন বাড়ীওয়ালীর ঘরেও থাকিতে অনুমতি পায়। কারণ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজের মতন "রেসিডেন্শ্যাল" প্রতিষ্ঠান নয়। ছাত্রেরা বসবাস সম্বন্ধে স্বাধীন। যাহা হউক উঠানের বাহিরে দুই ঘরে নৈশ-নাচের ব্যবস্থা হইয়াছে। দিনের ভিতর এদিকে আর কোন কাণ্ড নাই।

কলেজ হইতে কিছুদূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ। এই মাঠের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু "ষ্টেডিয়াম" বা খোলা রঙ্গমঞ্চ। এই গ্যালারীতে বোধ হয় ৫০,০০০ লোক বসিতে পারে। ষ্টেডিয়ামের উৎসব কাণ্ড হার্ভার্ডের নানা বিশেষত্বের এক প্রধান বিশেষত্ব।

এখানকার অট্টালিকাগুলির সংখ্যা বা আয়তন দেখিয়া বাঙ্গালীর ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, শিবপুরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এবং মেডিক্যাল কলেজ ও আর্টস্কুল,

আর মিউজিয়াম যদি এক জায়গায় জড় করা যায় তাহা হইলে হার্ভার্ড কাণা হইয়া যাইবে।

বেলা দুইটার সময় মিছিল তৈয়ারি হইতে থাকিল। ১৯১৭ সালে যাহারা ডিগ্রি পাইবে তাহারা এক দল বাঁধিল। ইহাদের গতিবিধি স্বতন্ত্র। ইহারা উঠানের চারিদিকে শোভাযাত্রায় বাহির হইল। হার্ভার্ড যখন প্রথম স্থাপিত হয় (১৬৩৬ খৃঃ অঃ) তখন এখানে একটা এল্‌ম্ গাছ ছিল। গাছটা মরিয়া গিয়াছে—কেবল কাণ্ডের কিয়দংশ কোন মতে বাঁচাইয়া (বা খাড়া করাইয়া) রাখা হইয়াছে। এই এল্‌ম্-তলায় ১৯১৭ সালের ক্লাস একটা কি করিল। বাহিরের লোক সেখানে যাইতে পারিল না। জায়গাটা পরদায় ঘেরা। বাহির হইতে শুনিলাম, একজন বক্তৃতা করিতেছে—আর সকলে হাসির রোল তুলিতেছে। বোধ হয় মাষ্টারদের লইয়া হাসি ঠাট্টা চলিতেছে।

হার্ভার্ডে বি, এ পাশ করিতে চার বৎসর লাগে। সুতরাং এক সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে চার ক্লাস থাকে। ক্লাসগুলার নাম প্রথম বার্ষিক, দ্বিতীয় বার্ষিক, তৃতীয় বার্ষিক ও চতুর্থ বার্ষিক নয়। ইহাদের নামকরণ ইয়াঙ্কিদের খাশ আবিষ্কার। আমাদের হিসাবে আজ যাহারা "চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র" তাহারা ইয়াঙ্কি হিসাবে "১৯১৭ সালের ক্লাস।" তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা "১৯১৮ সালের ক্লাস"—কারণ ইহারা ১৯১৮ সালে বি, এ, পাশ করিবে। সেইরূপ দ্বিতীয় বার্ষিকের নাম "১৯১৯ ক্লাস", এবং সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর নাম "১৯২০ ক্লাস"।

এই তিন ক্লাস পর পর তিন মিছিল প্রস্তুত করিল। প্রথম দলপতির হাতে প্রকাণ্ড নিশানে লেখা ১৯১৮, দ্বিতীয় দলপতির হাতে ১৯১৯, তৃতীয়ের হাতে ১৯২০। ইহারা সাধারণ পোষাক-পরা, তবে আজকাল অনেকের পোষাকই সৈনিক বা নাবিকের। তাহারা

হার্ভার্ড-সেনাবিভাগে যোগ দিয়াছে। ১৯১৭ ক্লাস সাধারণতঃ গাউন ও হুড্-পরা। তবে বিনা গাউনেও কয়েক জন দেখা গেল।

হার্ভার্ডের পুরাতন গ্র্যাজুয়েট আসিয়াছেন অনেক; তাঁহারা সকলে মিলিয়া আর একটা মিছিল প্রস্তুত করিলেন। ১৮৬৫ সালে অর্থাৎ ৫২ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা বি, এ পাশ করিয়াছেন তাঁহারাও কেহ কেহ শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হাজির। বুড়াদের ফুর্ত্তি দেখিতেই বিশেষ মজা। একজন থুরথুরে বুড়া (বোধ হয় ম্যাসাচুষেট্‌সের কোন নামজাদা লোক) ১৮৬৫ সালের নিশান হাতে লইয়া গোটা মিছিলের অগ্রণী হইলেন। ১৮৬৫ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত "পুরাতন ছাত্রে"র দলপতি হইলেন একজন প্রবীণ লোক। তাঁহার হুকুমে শোভাযাত্রা উঠান ছাড়িয়া ষ্টেডিয়ামে চলিল। প্রথমেই ব্যাণ্ড,—সুর বাজিতেছে লড়াইয়ের; অন্যান্য বৎসর হার্ভার্ডের উৎসবে স্কুল-কলেজের গৎ বাজান হইয়া থাকে। এই বৎসর মাঠে যতগুলি সুর শুনিতেছি তাহার প্রায় সব গুলিই হয় ইয়াঙ্কিদের জাতীয় সঙ্গীত, না হয় ফরাসী মার্সেইয়ে ইত্যাদি।

১৮৬৫ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত এক লম্বা মিছিল; কেবল ১৯১৭ চলিল আলাদা। বস্তুতঃ ১৯১৭ ক্লাসের আনন্দোৎসবে আর আর সকলে (অতীত এবং ভবিষ্যৎ) অতিথি মাত্র এবং যেন অনেকটা সাক্ষী স্বরূপ। এই হিসাবে হার্ভার্ডের ক্লাস-ডে উৎসব অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান। পৃথিবীর আর কোথাও বোধ হয় এরূপ আনন্দমিলন হয় না।

এই বৎসর ষ্টেডিয়ামে দর্শকসংখ্যা কম—বোধ হয় ১০ হাজার মাত্র হইবে। অতীত এবং ভবিষ্য হার্ভার্ড (১৮৬৫-১৯২০) প্রথমে ষ্টেডিয়ামের মাঠে প্রবেশ করিল। গ্যালারীর দর্শকমণ্ডলী টুপি খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ষ্টেডিয়ামে আসিল ১৯১৭ সাল। ইহাদের জন্য সকলে মিলিয়া জয়ধ্বনি করিল। বিশেষতঃ, ১৮৬৫ হইতে

১৯১৬ সালের হার্ভার্ড ইহাদিগকে বেশী খাতির দেখাইলেন। বোধ হয় অভিপ্রায় এই যে, "হে ১৯১৭ ক্লাস আজ হইতে আমাদের সঙ্গে তোমাদের এক পংক্তিতে ভোজন। তোমরা আমাদের গোত্রের অন্তর্গত হইলে।" নূতন বউ ঘরে আসিলে তাহার হাতের রান্না স্বজাতি ও কুটুম্ববর্গকে খাওয়ান নাকি আমাদের একটা রীতি আছে শুনিয়াছি। ১৯১৭ ক্লাসকে লইয়া পুরাতন হার্ভার্ডের সম্বর্দ্ধনা ও খাতির দেখান অনেকটা সেই ধরণের ব্যাপার।

১৯১৭ ক্লাসের গায়ক দল গাহিল :—

Johnny Harvard

Oh, here's to Johnny Harvard !
Fill him up a full glass ;
Fill him up a glass to his name and fame,
And at the same time don't forget his true love :
Fill her up a bumper to the brim.

Then drink, drink, drink, drink,
Pass the wine cup free ;
Drink, drink, drink, drink, jolly boys are we.
Free from care and despair,
What care we ?
Here's to wine divine, that brings us jollity.

Oh, here's to Johnny Harvard !

....

We never drink, 'tis very clear,
Because the "fiz" is very dear ;

But roll us in a keg of beer,
And watch us, wink, wink, wink,
Then drink, drink, drink, drink.
....
Drink, drink, drink, drink drink, drink,
Drink, drink, drink, drink, drink, drink,
Drink, drink, drink, drink, drink.
Drink, drink, drink, yes drink.

অবশ্য মদ পানের কোন ব্যবস্থাই দেখিলাম না। বস্তুতঃ মদের কাণ্ড হার্ভার্ডের ছাত্রমহলে বোধ হয় কিছু কম। আমেরিকার সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই মাতলামি বা "ওষুধের ডোজে মদ পান" অনেকটা বিরল। এ বিষয়ে বিলাতী ছাত্রেরা ইয়াঙ্কিদের উল্টা। খানা ঘরে, উৎসবে ও নাচগানে ইংরাজেরা মদের ভাটি উজাড় করিয়া দেয়। "বিদেশে আসিলে মদ খাইতে হয়" একথা কোন আমেরিকাবাসী ভারতসন্তান বলিতে পারিবে না। ভারতবাসী এতকাল ধরিয়া বিলাতকেই একমাত্র "বিদেশ" বিবেচনা করিয়াছেন। এইজন্য বিলাতে পদার্পণ করিবামাত্রই ভারতীয় যুবক "গোলাপী নেশা" ধরিয়া থাকেন।

ইংরাজেরা মদ খায় সত্য—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহারা জীবনের নানা কর্ম্মক্ষেত্রে অত্যুচ্চ শ্রেণীর ক্ষমতা দেখাইয়া থাকে। কিন্তু ভারতের স্বদেশী ব্যারিষ্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বিলাত হইতে লইয়া গিয়াছেন প্রধানতঃ মদের নেশা! চিন্তাক্ষেত্রে বা কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাঁরা নামজাদা হইতে পারিয়াছেন কি? এক রমেশচন্দ্র দত্ত ছাড়া ভারতমাতা ভারতবাসীর স্মরণযোগ্য কয়জন "বিলাত-ফের্‌তা" প্রসব করিয়াছেন? "স্বদেশী আন্দোলনে"র কর্ম্মকাণ্ডে এবং কংগ্রেসের বক্তৃতাক্ষেত্রে কয়েকজন ব্যারিষ্টার

ভারতের নানা প্রদেশে স্বজাতীয়গণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে পঞ্চাশবৎসরব্যাপী মাত্‌লামির প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। আমাদের বিলাত-ফের্‌তা ব্যারিষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট, অধ্যাপক, ডাক্তার ও এঞ্জিনিয়ারগণ স্বদেশের জন্য অনেক গৌরবজনক কাজ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি কম ছিল না—কিন্তু তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান বোধ হয় মদের নেশায় ডুবিয়া গিয়াছিল! এই যা দুঃখ। এইজন্য তাঁহাদের ক্ষমতার শতাংশও সৎকার্য্যে লাগিতে পারে নাই।

লাহোর, রাওলপিণ্ডি ইত্যাদি সহরে দেখিয়াছি রাস্তার ও ঘরের নরনারী জয়ধ্বনি করিত—"জয় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কি জয়!" বাঙ্গালীর মুখে শুনা যায়—"জয় মা কালী কল্‌কাত্তাওয়ালী।" শিখেরা বলে—"ও আঃ গুরুজী কি ফতে!" এই ধরণের ডাক বা বোল আমেরিকার প্রত্যেক কলেজেই আছে। এই ডাককে "কলেজ ইয়েল্ (College yell) বা "কলেজ চিয়ার" বলে। এই ধরণের ডাক জাপানীরা আমেরিকা হইতে আমদানি করিয়াছে। বিলাতের বোধ হয় কোথাও নাই। ভারতবর্ষেও নাই।

বিলাতে এবং বর্ত্তমান ভারতে জয়ধ্বনির রব মোটের উপর সকল ক্ষেত্রেই প্রায় একরূপ:—"হিপ্ হিপ্ হুরে!" ষ্টেডিয়ামে ১৮৬৫—১৯১৬ ক্লাসের দলপতি প্রথমে পুরাতন গ্র্যাজুয়েটদের ডাক পড়াইলেন। সুর বা গৎ এই:—"গ্রাজুয়েট—হার্ভার্ড—হার্ভার্ড—হার্ভার্ড—ও আঃ—ও আঃ—ও আঃ—ও আঃ—ও আঃ—ও আঃ"। "ও আঃ" তিনবার, ছয়বার, নয়বার, এমন কি বার বারও চলিতে পারে। দলপতি সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং সজোরে ডাইনে বাঁয়ে বলিলেন "এক, দুই, তিন"। অমনি পুরাতন গ্র্যাজুয়েটের দল হইতে তাঁহাদের ডাক আকাশ ফাটাইতে লাগিল। অনেকটা ডাকাতের ডাকের আওয়াজ।

এই ধরণের ডাক ১৯১৮, ১৯১৯ এবং ১৯২০ ক্লাসও আলগা আলগা করিল। তাহার পর ১৯১৭ ক্লাসের দলপতির ইঙ্গিত অনুসারে কতকগুলি ডাক উঠিল। প্রথম "১৯১৭—হার্ভার্ড—হার্ভার্ড—হার্ভার্ড—ও আঃ—ও আঃ—ও আঃ," তাহার পর—"হকি ক্লাব—হার্ভার্ড—হার্ভার্ড—হার্ভার্ড—ও আঃ—ও আঃ—ও আঃ—হকি"। এইরূপে প্রত্যেক ক্লাবের নামে জয়ধ্বনি করা হইল, যথা সঙ্গীত, বেস্‌বল্, নৌকা ইত্যাদি। তাহার পর হইল প্রেসিডেণ্টের নামে—"লোয়েল—হার্ভার্ড—হার্ভার্ড—হার্ভার্ড—ও আঃ—ও আঃ—ও আঃ—লোয়েল।" বাঙ্গালায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় এইরূপ রবই উঠিত—"জয় সুরেন্দ্রনাথের জয়।" লোয়েল দাঁড়াইয়া টুপি তুলিলেন। পরে ১৯১৭-দলপতিই গোটা হার্ভার্ডের নামে ডাক তুলিল—তাহাতে সকল মিছিলের সকল লোকই যোগ দিল।

১৯১৭-দলপতি বোধ হয় রগড় করিবার জন্য সমবেত নারীমণ্ডলীর নামে একবার ডাক তুলিল—"লেডিজ্—হার্ভার্ড—হার্ভার্ড—হার্ভার্ড—ও আঃ—ও আঃ—ও আঃ—লেডিজ্"। পুরাতন গ্র্যাজুয়েটের দলপতি বুঝিলেন—"তাই ত, ১৯১৭ সাল একটা নূতন কিছু করিয়া ফেলিল।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মিছিলের সম্মুখে গিয়া বলিলেন—"আমরা মহিলাদের নামে তিন তিরেক্কে নয়বার ও আঃ ও আঃ করিব।" এই বলিবামাত্র ডাক উঠিল—"লেডিজ—হার্ভার্ড (৯)—ও আঃ (৯)—লেডিজ।" প্রত্যেক ডাকের সময়েই গ্যালারীর দর্শকমণ্ডলী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯১৭ গায়কদল গান ধরিল :—

Fair Harvard

Farewell! thy sons to thy jubilee throng,

And with blessings surrender thee o'er,
By these festival rites, from the age that is past,
To the age that is waiting before.
Oh relic and type of our ancestors' worth
That has long kept their memory warm.
First Flower of their wilderness! star of their night,
Calm rising thro' change and thro' storm.
Farewell! be thy destinies onward and bright!
To thy children the lesson still give—
With freedom to think, and with patience to bear,
And for right ever bravely to live.
Let not moss-covered error moor thee at its side,
As the world on truth's current glides by;
Be the herald of light, and the bearer of love
Till the stock of the Puritans die.

এইবার সুরু হইল পুষ্পবৃষ্টি। গ্যালারী হইতে মাঠের মিছিল-গুলির উপর, আর মাঠ হইতে উর্দ্ধে গ্যালারীর দর্শকমণ্ডলীর উপর। এ এক গোলাবর্ষণ কাণ্ড বা তুমুল পুষ্পযুদ্ধ।

নানা রঙের কাগজ কাটিয়া সরু সূতার বাণ্ডিলের মত বাণ্ডিল তৈয়ারি করা হইয়াছে। এই বাণ্ডিলগুলি ছুঁড়িয়া মারিতে গেলেই লম্বা সূতা বাহির হইয়া পড়ে। গ্যালারীর উপর দিকে আমাদের মাথার নিকট কতকগুলি তার খাটান ছিল। কাগজের সূতা এত ছোড়াছুড়ি হইল যে, তারে ঠেকিয়া কাগজের সূতার চালা তৈয়ারি হইল। নানা রঙিন

কাগজের ছাউনির নীচে যেন বসিয়া আছি বোধ হইতেছে। তাহা ছাড়া, রঙিন কাগজের টুকরায় ভরা বাণ্ডিল ছুঁড়িয়া মাঠের লোকজনকে মারিতে লাগিলাম। ঠিক যেন রংবেরঙের খৈ ছিটান হইতেছে। ইহা এক প্রকার "আচার লাজৈরিব পৌরকন্যাঃ" এর দৃশ্য। কয়েকজন কেম্ব্রিজের বাসিন্দা বলাবলি করিতেছে:—"এরূপ ভীষণ লড়াই ষ্টেডিয়ামে আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।"

সন্ধ্যার পর কলেজের মাঠগুলি লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য চীনা লণ্ঠনের ভিতর বিজুলী বাতী জ্বলিতেছে। এই বাতীগুলা ছাড়া মাঠ বা অট্টালিকা সাজাইবার আর কোন ব্যবস্থা নাই। শীতকালে মাঠের গাছগুলা যেমন ন্যাড়া ও মরা, বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের আরম্ভে এইগুলা তেমন সবুজ ও তাজা। প্রকৃতি স্বয়ংই হার্ভার্ডের উঠান সাজাইয়া রাখিয়াছে। গোটা ময়দান ঘাসের মখমলে মোড়া। গাছগুলার ডালে ডালে পাতা রোজই এক আধটু করিয়া বাড়িতেছে। এমন কি, বিগত দুই তিন সপ্তাহ মাঠের ভিতর গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া হাওয়াও খাইয়াছি। প্রায় প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালেই আইভি উদ্ভিদ্‌ লতাইয়া উঠিয়াছে। আইভি পাতায় গোটা দেওয়ালই সবুজবর্ণে ছাওয়া। কাজেই উৎসবের জন্য সাজসজ্জার খরচ অতি অল্প।

প্রকাণ্ড লাইব্রেরীর সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া কলেজের সঙ্গীত-সমাজ কয়েকটা গান গাহিল। ব্যাণ্ডে নানা প্রকার জাতীয় সঙ্গীত একটার পর একটা চলিতেছে। রাত্রি আট টার পর উঠানের বাহিরে দুই ঘরে নাচ হইল। একটার নাম "মেমোরিয়াল্‌ হল্‌," অপরটার নাম "ব্যায়াম-ভবন।" এই নাচ আর র‍্যাডক্লিফের নাচ একই বস্তু। কয়েক জোড়া নিগ্রো যুবকযুবতীও শ্বেতাঙ্গমহলের নাচে যোগ দিয়াছে।

এক সঙ্গে জমা হইয়া স্ফূর্তি করা মানুষ মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ কাজ।

ভারতবর্ষের লোক বা হিন্দু জাতি অত্যধিক গভীর এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ নাই। তবে বর্ত্তমান ভারতের স্কুল-কলেজে হাসি-ঠাট্টা আমোদ-প্রমোদ বা নাচ-গান-বাজনা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার জন্য ভারতীয় চরিত্র বা সমাজ বা ধর্ম্মকে তিরস্কার করা অনাবশ্যক অথবা ভারতীয় শিশু এবং যুবাকে "অতি-বৃদ্ধ" বা রসজ্ঞানহীন বা অকালপক বিবেচনা করা অজ্ঞতার পরিচয়। ভারতবর্ষে যতদিন প্রাণ ছিল ততদিন নাচ-গান-রসিকতা সবই ছিল। সেই পুরাণা প্রাণবত্তার লক্ষণ আজও অনেক বৈঠকে, বারোয়ারীতলায়, মিছিলে, মেলায় পাওয়া যায়। তবে সেই যুগের দরবারও আর নাই, কিম্বা তক্ষশীলা, নালন্দা ও বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ও আজ নাই। কাজেই সেই যুগের ভারতীয় বিদ্যামন্দিরে বা রাষ্ট্রমণ্ডলে আমোদ-প্রমোদ কি আকার গ্রহণ করিত তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা কোথায়?

(গ)

কাল হইয়াছে র‍্যাড্‌ক্লিফের উপাধি-বিতরণ। দেখিতে যাওয়া হয় নাই। আজ হার্ভার্ডের উপাধি-বিতরণ। লীড্‌সে উপাধি-বিতরণের সময়ে ছাত্রেরা উপাধিপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদিগকে ঠাট্টা করে। স্বয়ং সভাপতি এবং অধ্যাপকগণও ইহাদের টিটকারি এড়াইতে পারে নাই। নানা প্রকার গণ্ডগোল এবং হৈ চৈ করিয়া রগড় করাই লীড্‌সের ছাত্রদের রীতি দেখিয়াছি। হার্ভার্ডে উপাধি-বিতরণের ঘরে ছাত্রদের তাণ্ডব কিছুই নাই। ইহারা অনেকটা আগাগোড়াই শান্ত ঠাণ্ডা ভাল মানুষ।

দর্শনাধ্যাপক হকিং বলিতেছিলেন :—"মহাশয়, আপনার জন্য কমেন্সমেন্টের টিকেট সংগ্রহ করিতেছিলাম। কমেন্সমেন্ট-বিভাগের কর্ত্তা বলিলেন, আপনি গাউন পরিয়া আসিলে মিছিলে যোগ দিতে পারেন।" তাহাই করা গেল। গাউন ভাড়া লাগিল ৫৲।

জেলার শাসনকর্ত্তা, প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তা, কলেজের নানা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা, হার্ভার্ডের অধ্যাপক ইত্যাদির স্থান শোভাযাত্রায় ত থাকিবারই কথা। অধিকন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার বাহিরে যে সকল স্কুল-কলেজ বষ্টন-কেম্ব্রিজে আছে তাহাদের কর্ত্তারাও মিছিলে যোগ দিতে অধিকারী। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন গ্র্যাজুয়েটগণের স্থানও শোভাযাত্রায় আছে। ইহাই বিশেষত্ব।

প্রথমেই চলিল ব্যাণ্ড। মিছিলের অগ্রণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টও নন, অথবা ম্যাসাচুষেট্‌স্‌-রাষ্ট্রের শাসন-কর্ত্তাও নন। কমেন্সমেণ্ট উপলক্ষে যাঁহারা বক্তৃতা করিবেন তাঁহারা। তাঁহাদের পর চলিলেন যাঁহারা উপাধি পাইবেন তাঁহারা অর্থাৎ ১৯১৭ ক্লাস। তাহাদের পর প্রেসিডেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ। তাঁহাদের পর রাষ্ট্রশাসক এবং তাঁহার দলবল। তাঁহাদের পর কলেজের নানা বিভাগের কর্ত্তা এবং অধ্যাপকগণ। তাঁহাদের পর নিমন্ত্রিত ফরাসী সেনাপতি ও তাঁহার দলবল। তাঁহাদের পর দাঁড়াইতে হইল আমাকে এবং আর একজন অভ্যাগতকে। প্রত্যেক লাইনে মাত্র দুই জনের স্থান। কাজেই মিছিল অত্যধিক লম্বা। পুরাতন গ্র্যাজুয়েটদের স্থান সবশেষে। তাঁহাদের আগে আরও অনেকের স্থান।

প্রত্যেক বৎসর এই বিপুল প্রোসেশন কলেজের মাঠ হইতে রাস্তা দিয়া ষ্টেডিয়ামের খোলা রঙ্গালয়ে যাইয়া থাকে। এই বৎসর অতদূরে যাওয়া হইল না। প্রোসেশনও আর আর বারকার মত লম্বা হয় নাই। কলেজ-প্রাঙ্গণের বাহিরে অতি নিকটেই মেমোরিয়্যাল হলের থিয়েটার। সেই থিয়েটারে সকলে চলিলাম। থিয়েটারের মাঠে প্রবেশ করিবা মাত্র ১৯১৭ ক্লাস দুই ধারে লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইল। তাহারা

এই ভাবে থাকিয়া মিছিলের অবশিষ্ট অংশের সম্বৰ্দ্ধনা করিল। অন্যান্য সকলে যথাস্থানে বসিলে পর ১৯১৭ ক্লাস ঘরে আসিয়া বসিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট কমেন্সমেণ্ট-উৎসবের কর্ত্তা,—প্রদেশের গভর্ণর নন। প্রথমে হইল ল্যাটিন ভাষায় মঙ্গলাচরণসূচক গান। তাহার পর প্রদেশ-রাষ্ট্রের সমর-বিভাগের কর্ত্তা সম্মুখে আসিয়া তাঁহার লাঠি দিয়া মঞ্চের উপর ঘা মারিলেন। উহা আমাদের নকীবের ডাক বিশেষ। তাহার পর কার্য্যারম্ভ। প্রথমেই পাদ্রীর ধর্ম্ম-বক্তৃতা। এইটা শুনিয়া আমার নিকটস্থ অধ্যাপকবর্গ বলাবলি করিতে লাগিলেন— "অনর্থক সময় নষ্ট। বড় বেশী সময় গেল"।

এই বার হইল পর পর চারিটা বক্তৃতা :—

(১) ১৯১৭ সালের এ, এ, উপাধিপ্রাপ্ত এক ছোক্‌রা ল্যাটিন ভাষায় বক্তৃতা করিল। বক্তৃতাটা কয়জনে বুঝিলেন জানি না, কিন্তু ল্যাটিন ভাষা ইংরাজি, জার্ম্মাণ, ও বাঙ্গালা ভাষার চেয়ে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বোধ হইল। সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে বক্তৃতা শুনা থাকিলে হয়ত বলিতাম, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা ওজস্বিতায় সমান।

(২) ১৯১৭ সালের এ, বি, উপাধিপ্রাপ্ত এক ছোক্‌রা বক্তৃতা করিল, "আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষাবিস্তার" সম্বন্ধে। পৃথিবী হইতে যুদ্ধকাণ্ড নির্ব্বাসিত করিবার কথা আলোচ্য বিষয়।

(৩) ১৯১৭ সালের এ, এম, উপাধিপ্রাপ্ত একজন বক্তৃতা করিল, "বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাপদ্ধতি" সম্বন্ধে। শিক্ষার বিধানে অত্যধিক শাসন ও সংযমের বিরুদ্ধে ইনি বেশ গরম গরম কথা শুনাইয়া দিলেন। এতদিন কেবল বুড়াদের "অভিজ্ঞতার" দোহাই দিয়া যুবাদিগকে চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক্ষণে যৌবনের "অনভিজ্ঞতা"কেও সম্মান করা আবশ্যক। অধ্যাপকগণ বুঝিলেন, ইহা আমেরিকার

বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। ইয়াঙ্কিরা মুখে মুখে স্বরাজ, ডেমোক্রেসী, রিপাব্লিক, স্বায়ত্তশাসন যত আওড়াইয়া থাকেন প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ তত করেন না। যুবক আমেরিকা বলিল :—"বর্ত্তমান যুগ ইহা সহ্য করিবে না"।

(৪) ১৯১৭ সালের এস্, জে, ডি (আইন-বিজ্ঞানের ডাক্তার) উপাধিপ্রাপ্ত একজন প্রৌঢ় (এই উপাধি ৩৫।৪০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে প্রায় কেহ পায় না) বক্তৃত করিলেন। আলোচ্য বিষয়—"আইনের সহায্যে শ্রমজীবীদিগের স্বার্থরক্ষার আবশ্যকতা"। এতদিন ধরিয়া ধনীমহাজনদিগের স্বার্থেই রাষ্ট্রসভায় আইন জারি করা হইয়াছে। এই অন্যায় আর বেশী কাল থাকিতে দেওয়া চলিবে না। ধনীর বিপক্ষে এবং দরিদ্রের স্বপক্ষে আইন গঠণ করিবার জন্য রাষ্ট্রকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, যাহারা এই ঘরে আসিয়াছে কাগজের সার্টি-ফিকেট পাইতে তাহারাই সকলকে বক্তৃতা শুনাইল। এই ধরণের উপাধি-বিতরণ কাণ্ড দুনিয়ার আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় কিনা জানি না। কলিকাতার সেনেট হাউসে লাটসাহেব এবং ভাইস চ্যান্সেলারের সম্মুখে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ বৎসরের এক বাঙ্গালী ছোক্‌রা বক্তৃতা করিতেছে—এই দৃশ্য বাঙ্গালীর পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব কি?

বক্তৃতাগুলির পরে হইল ল্যাটিন গান। পরে উপাধি-বিতরণ। সার্টিফিকেটগুলি প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়া দেওয়া হইল না। সাহিত্য-বিভাগের কর্ত্তা প্রেসিডেণ্টকে জানাইলেন—"আমি ৪৫১ জনকে এ, বি, উপাধির উপযুক্তরূপে আপনার নিকট দাঁড় করাইতেছি"। কয়েকজন আসিয়া দাঁড়াইল। প্রেসিডেণ্ট এই দলকে মোটের উপর বলিয়া দিলেন—"তোমাদিগকে এই উপাধি প্রদান করিলাম"। এইরূপে

অন্যান্য বিভাগের কর্ত্তারাও তাঁহাদের "অধিকারী" ছাত্রদের সংখ্যা বলিলেন, এবং একে একে প্রত্যেক দলকে প্রেসিডেণ্ট পূর্ব্বোক্তরূপ বলিলেন। এই বৎসর উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ১২৫০। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাসে এবং সকল বিভাগে ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ৫০০০।

প্রেসিডেণ্ট প্রত্যেক দলকে বাঁধিগৎ বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে এই উপাধি প্রদান করিলাম"। এই বাঁধিগৎ ছাড়াও তাঁহার মুখে প্রত্যেক দল সম্বন্ধেই দুএকটা বিশেষ কথা বাহির হইল। ভারতবর্ষে এই বাঁধিগতের সঙ্গে আর একটা বাঁধিগৎ আছে—"আশাকরি তোমরা এই উপাধির উপযুক্ত অধিকারী থাকিবে।"

হার্ভার্ডের প্রেসিডেণ্ট লোয়েল প্রত্যেক উপাধি সম্বন্ধে নূতন নূতন বুথ্‌নি ঝাড়িলেন। ইহাও এখানকার কন্‌ভোকেশনের বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য তথ্য। তালিকাকারে লোয়েলের কথা দেখাইতেছি :—

উপাধি	লোয়েলের বুথ্‌নি
১। এ, বি	... (১) তোমাদিগকে "শিক্ষিত" সমাজের অন্তর্গত করিলাম।
২। এ, এ	... (২) তোমাদিগকেও "শিক্ষিত" সমাজের অন্তর্গত করিলাম।
৩। এ, এম্	... (৩) তোমরা বিদ্যার্জ্জনে অনেক দূর "অগ্রসর" হইয়াছ।
৪। পি, এইচ্, ডি	... (৪) তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি উচ্চ আশা পোষণ করিতেছি। তোমাদিগকে "জগতের সনাতন পণ্ডিত সভায়" আসন দিতেছি।

৫। বি, এস্, সি	... (৫)	তোমরা মাইনিং এবং এঞ্জিনিয়ারিঙের কার্য্যে প্রবেশ করিবার জন্য সুশিক্ষিত হইয়াছ।
৬। এম্, এস্ সি, ডি, এস্ সি	... (৬)	তোমরা প্রকৃতির নিয়মগুলি দখল করিয়া "মানব জাতির নানা অভাব পুরণ" করিতে প্রস্তুত হইয়াছ।
৭। কৃষি-কলেজের এম্, এ, ডাক্তার	... (৭)	মানুষের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্ ও পশু-জীবন সম্বন্ধে "স্বাধীন অনুসন্ধান" চালাইবার উপযুক্ত হইয়াছ।
৮। বাস্তুবিদ্যায় এ, বি,	... (৮)	"নূতন বস্তু সৃষ্টি" করিবার কল-কৌশল দখলে আনিয়াছ।
৯। ব্যবসায়ে এ, এম্	... (৯)	"ধনোৎপাদন, বিনিময় এবং বাণিজ্য" সম্বন্ধে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছ।
১০। দাঁতের ডাক্তার	... (১০)	চিকিৎ-সাব্যবসায়ের এই বিভাগে কার্য্য করিবার এবং স্বাধীন অনুসন্ধান চালাইবার উপযুক্ত হইয়াছ।
১১। আয়ুর্ব্বেদের ডাক্তার	... (১১)	মানবের হিতসাধনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছ।
১২। আইনের বি, এ, ডাক্তার	... (১২)	সম্মানজনক আই-নব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে অধিকারী হইয়াছ।

১৩। ধর্ম্মশিক্ষায়
এ, বি } ... (১৩) পবিত্র পৌরোহিত্যের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ।
এ, এম্

কয়েকজন দেশী ও বিদেশী নামজাদা লোককে অনারারি উপাধি প্রদান করা হইল। তাঁহাদের মধ্যে হার্ভার্ডের ফরাসী সমর-শিক্ষক একজন। ইহাঁর নাম হইবা মাত্র সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল—এবং ঘন ঘন করতালি পড়িতে লাগিল। ফরাসী জাতিকে সম্মান দেখাইতে ইয়াঙ্কিরা লালায়িত।

আড়াই ঘণ্টায় সকল কার্য্য শেষ হইল। প্রেসিডেণ্ট কোন বক্তৃতা করিলেন না। একটার সময়ে পুরাতন গ্র্যাজুয়েটদের আয়োজনে সকলের "মিষ্টিমুখ" করা হইল।

বিকালে কলেজ-প্রাঙ্গণের এক সাময়িক মঞ্চে অনারারি উপাধি-প্রাপ্তদিগের মধ্যে দু একজন দু' চার কথা বলিলেন। প্রেসিডেণ্ট গতবর্ষে প্রাপ্ত দানের তালিকা দিলেন। ছাত্রেরা মিছিল করিয়া মঞ্চের সকলকে অভিবাদন করিল।

কেম্ব্রিজ, ম্যাস, ২১ জুন ১৯১৭

গ্রীষ্ম-বিদ্যালয়

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই গরম। আমেরিকায় কোন কোন দিন তাপের মাত্রা ১০২ ডিগ্রি। খবরের কাগজে একবার দেখা গেল, বোম্বাই সহরে যে তারিখে ৯২ ডিগ্রি গরম ছিল, সেই দিন বষ্টন সহরেও ঠিক ৯২ ডিগ্রি। তবে আমাদের দেশে গরমের মাত্রা বজায় থাকে কয়েক মাস,—এখানে কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ মাত্র। কিন্তু গরম বা গুমোট্ ভারতেও যেরূপ অসহ্য এখানেও সেইরূপ। এখানকার লোকেরা গরমের দিন ১৫।২০ গ্লাস জল টানে। ঘরগুলা আগুণের কুণ্ড হইয়া উঠে। সকাল আটটার পর হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ঘরে বসিয়া থাকা অসাধ্য; বেলা একটার পর হইতেই তাপের পরিমাণ যার-পর-নাই বাড়িয়া যায়। সমস্ত দিন গাছতলায় বা ঘরের ছজ্বাতলায় কাটাইতে হয়। মাঠের ঘাশে শুইয়া অনেকে রাত্রি কাটায়। সন্ধ্যার পর বড় সহরের গলিতে গলিতে নরনারী বালকবালিকা আধান্যাংটা ভাবে বসিয়া জটলা করে। এমন কি, রাস্তায় খাটিয়া পাড়িয়া গড়াগড়ি দিবার রেওয়াজও আছে। তাহা হইলে গরম প্রাচ্যদেশের লোকেরা স্বরাজ, ডেমোক্রেসী, রিপাব্লিক ইত্যাদি হজম করিতে অপারগ হইবে কেন?

গরমের ছুটিতে কেম্ব্রিজের রাস্তাঘাট জনহীন। খুব অল্প সংখ্যক লোকের গতিবিধি দেখা যায়। ইহারা প্রধানতঃ গ্রীষ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। গ্রীষ্মকালে ছয় সপ্তাহ স্কুল চালান ইয়াঙ্কিদের এক দস্তুর। এবিষয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পথপ্রদর্শক। এই সময়ে সাধারণ কলেজের

কাজ বন্ধ থাকে। অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যে প্রায় কেহই গ্রীষ্ম-বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে যোগদান করেন না। এই ছয় সপ্তাহের কাজের জন্য কোন কোন অধ্যাপককে অতিরিক্ত ভাবে বাহাল করা হয়। বাহিরের কলেজ হইতেও অনেক অধ্যাপক আমদানি করা হয়। যে সকল ছাত্র কলেজের নিয়মিত কাজ যথাসময়ে সারিতে পারে নাই তাহারা ইচ্ছা করিলে গ্রীষ্মবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারে। অথবা যাহারা ৩।৪ বৎসরের লেখাপড়া দুই তিন বৎসরে সারিতে চাহে তাহারা গ্রীষ্ম-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। প্রধানতঃ বাহিরের ছাত্রেরাই গ্রীষ্মবিদ্যালয়ে যোগদান করে। এই ছাত্রগণের ভিতর শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যাই বেশী। ম্যাসাচুযেট্‌স্ প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন সহর হইতে এবং ম্যাসাচুযেট্‌স্ প্রদেশের বাহির হইতেও এই সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধির উপযুক্ত বিদ্যাপ্রচারই এই ছয় সপ্তাহের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যায়াম ইত্যাদি কোন বিভাগই বাদ যায় না। গড়ে ৩০ বক্তৃতায় এক একটা বিদ্যা সারা হয়। প্রত্যেক ক্লাশে উপস্থিত হইবার মূল্য ৬০৲। কোন এক বক্তৃতার জন্য ৬০৲ দিলে কোন দ্বিতীয় বিষয়ের জন্য দিতে হয় ৩০৲। ল্যাবরেটরীতে কাজ করিবার খরচ আলাদা। যে সকল শিক্ষক নানা স্থান হইতে গ্রীষ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র হইয়া আসেন তাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে খরচ পান। কাজেই স্বার্থত্যাগ করিয়া অনশনে থাকিয়া এদেশে কাহাকেও উচ্চশিক্ষায় অনুরাগ দেখাইতে হয় না। পেট কাঁদাইয়া ও স্বাস্থ্যের মাথা খাইয়া দেশ-সেবা, বিজ্ঞান-চর্চ্চা বা জ্ঞানানুশীলন বিলাতেও নাই, জাপানেও দেখি নাই—আমেরিকায়ও নাই।

ভারতবর্ষে আমরা যে ধরণের স্বার্থত্যাগে বা স্বার্থত্যাগের বক্তৃতায় অভ্যস্ত সে ধরণের স্বার্থত্যাগ দুনিয়ার কোথাও আছে কিনা জানি না। ঐরূপ স্বার্থত্যাগে কোন দেশ বড় হইতে পারে না, কোন বড় কাজ সিদ্ধ হইতে পারে না, কোন বহু-কাল-ব্যাপী প্রয়াস সফল হইতে পারে না। আমরা যাহাকে স্বার্থত্যাগ বলি তাহা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। যাহা হউক, হতভাগ্য জাতি মাত্রকে এইরূপ অনশন, স্বাস্থ্যভঙ্গ, অকালমৃত্যু ও আত্মহত্যার ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর কিনা স্বতন্ত্র কথা। অধিকন্তু, কোন দেশের বেশী লোক স্ত্রীপুত্র কাঁদাইয়া নিজে না খাইয়া শ্রমসাধ্য কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে না। দুই চারিজন লোকের পক্ষে হয়ত ইহা সম্ভব।

অন্যান্য লোকেরা স্বার্থত্যাগ শব্দটা মুখে আওড়াইয়া আপন মনে সুখী থাকে। ক্রমশঃ অতিসামান্য কাজকেও অত্যুচ্চ চরিত্রবত্তার লক্ষণরূপে প্রচার করিবার অভ্যাস সমাজে দেখা দেয়। ভারতে এই বুজরুকি আজকাল বেশ চলিতেছে—চলিতে বাধ্য। ইহা ভারতবাসীর মজ্জাগত দোষ নয়। অভাবে স্বভাব নষ্ট হইবে না কেন? যথার্থ বড় কাজ করিতে নুণ তেল কাঠ খড় আবশ্যক। তাহা ভারতসন্তানকে জোগাইবে কে? তাহা যোগাইবার লোক যখন এক প্রকার নাই তখন আমরা "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" হইবই, আর সঙ্গে সঙ্গে "আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ" হইতে থাকিব।

প্রতি বৎসর হার্ভার্ডের গ্রীষ্মবিদ্যালয়ে হাজার খানেক ছাত্রের আমদানি হয়। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময়ে প্রায় ৫।৬ হাজার ছাত্র জুটে। এই বৎসর হার্ভার্ডে উপস্থিত মাত্র ৬০০ এর ও কম। অধিকাংশই ছাত্রী। ছাত্রীদের মধ্যেও অধিকাংশই

অবিবাহিতা চিরকুমারী। শুদ্ধ কথায় ইহাদিগকে "ওল্ড মেড্" বলা হয়। ইয়াঙ্কি বালকবালিকাদের শিক্ষাবিধানের ভার প্রধানতঃ এই ওল্ড্ মেড্দের হাতে রহিয়াছে।

(ক) সঙ্গীত-বিদ্যা

গ্রীষ্মবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া গেল। "সঙ্গীতে"র ছাত্র হইলাম। আমার আলোচ্য বিষয়ের নাম "মিউজিক্যাল এ্যাপ্রিসিয়েশন" অর্থাৎ "সঙ্গীত সমালোচনা" বা "সঙ্গীতের সমজদারি"। আর দুইটা ক্লাশে বসিবার টিকেট লইলাম। অধ্যাপনা-প্রণালী দেখিবার ইচ্ছায়। একটা দর্শন-বিভাগে অপরটা ইতিহাস-বিভাগে। প্রথম ক্লাশের আলোচ্য বিষয় "জেম্‌স্ এবং ব্যর্গ্সোঁ"। দ্বিতীয় ক্লাশের আলোচ্য বিষয় "বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ঐতিহাসিক তথ্য।" সর্ব্বসমেত মূল্য দিতে হইল ১০০৲। সঙ্গীত সম্বন্ধে গ্রন্থাদি কিনিতে লাগিল ১০০৲। "আর্কিটেক্‌চার" অর্থাৎ "বাস্তু-বিদ্যা"র ক্লাশেও ভর্ত্তি হইবার ইচ্ছা ছিল। সময়াভাবে ঘটিয়া উঠিল না।

সঙ্গীতের "সমজদার" হইতে চলিয়াছি—অথচ এই বিদ্যার অ, আ, ক, খ,-ও জানা নাই! আমার ক্লাশের দুই ছাত্রী পিয়ানো বাজনা শিখাইয়া পয়সা রোজগার করে। বাল্যকাল হইতে ইহাদের হাত তৈয়ারি। রোজগারের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য (এবং হার্ভার্ডের সার্টিফিকেট কাছে রাখিবার জন্য) ইহারা কলেজে আসিয়াছে। ছাত্রদের ভিতর কয়েকজন দুই তিন বৎসর সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছে। কেহ কেহ বেহালা বাজাইতে পারে। অধিকন্তু, সকলেই পাঠশালায় পড়িবার সময়েই এই বিদ্যার অ, আ, ক, খ, বিনা মূল্যে শিখিয়াছে। বিশেষতঃ, মায়ের পেট হইতে পড়িয়াই ইহারা নিজেদের সঙ্গীত কানে

শুনিয়া আসিতেছে। সুরের ভাল মন্দ ইহারা সহজেই ধরিতে পারে।

আমাদের কোন ছাত্রবৃত্তি-ক্লাশের ছাত্রের নিকট যদি ইংরাজি "জুলিয়াস্ সীজার" বা জার্ম্মাণ "ভিল্‌হেল্‌ম্ টেল্" বা ল্যাটিন "ঈনীড্" বা সংস্কৃত "রঘুবংশ" পড়া যায়, তাহা হইলে সে কতটা বুঝিতে পারে? ইংরাজি বর্ণমালা জানা নাই, ইংরাজি ভাষার ব্যাকরণ জানা নাই, ইংরাজি পদ বা বাক্য কানে শুনা নাই, অথচ শেক্‌সপীয়ারীয় নাটকের সমালোচনা ইংরাজিতে বুঝিতে হইবে! ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমার মত ভারতবাসীর পক্ষে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সমজ্‌দার হওয়া সম্ভব। বস্তুতঃ ক্লাশে উপস্থিত হওয়া মাত্র সার হইবার গতিক। অথচ কলেজে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ ঘাঁটিবার অভ্যাস ছিল।

কাজেই ঘরে এক মাষ্টার নিযুক্ত করিলাম। হার্ভার্ডের একছাত্র এই বৎসর আইন-বিভাগে "ডাক্তার" হইয়াছেন। ইনি সঙ্গীতেও ওস্তাদ। বেহালা ও পিয়ানো দুইই ইহাঁর সমান বশে। বহু ছাত্রকে ইনি সঙ্গীত শিখাইয়াছেন। ১৫।১৬ বৎসর বয়স হইতেই বড় বড় আসরে বাজাইবার সুযোগও ইহাঁর জুটিয়াছে। এতদ্ব্যতীত হার্ভার্ডের সঙ্গীত-বিদ্যালয়েও ইনি ছাত্র ছিলেন। ইনি আমার বাড়ীওয়ালীর ঘরে আমার সঙ্গে এক টেবিলে আহার করেন। এই যুবকের শাগরেত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য ভাবিলাম। ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষ ওলন্দাজ জাতীয়। নাম ফ্রেড্‌রিক ডিস্‌মুভিয়ার। মাসিক দিতে হয় ৭৫৲। পিয়ানো ভাড়া মাসিক ১০৲। কথঞ্চিৎ উচ্চতর গণিতশাস্ত্রে অথবা চিত্তবিজ্ঞান-বিদ্যায় প্রবেশ করিবার সময় যতটা মাথা দরকার হইয়াছিল, আজ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রবেশদ্বারে ততটা মাথা লাগিতেছে। সঙ্গীতবিদ্যা

একটা খাঁটি বিদ্যা—ঠিক অঙ্ক কষার সামিল। অন্যান্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব দখলে আনিতে যত মেহনৎ হয় সঙ্গীতের তত্ত্ব দখলে আনিতেও ঠিক তত মেহনৎ হইতেছে। জার্ম্মাণী এবং ফরাসী ভাষা সবে সুরু করিয়াছি। এই দুই নূতন ভাষায় প্রবেশ করিতে এত মেহনৎ লাগে নাই বা মাথা খাটাইতে হয় নাই। বস্তুতঃ, মাথা খাটান কাহাকে বলে স্কুল কলেজ ছাড়িবার পর এক প্রকার ভুলিয়া যাওয়া গিয়াছিল। বিগত দশবার বৎসর বিদ্যারাজ্যের নানা দিকেই নজর দিতে হইয়াছে—কিন্তু অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য কোন বস্তু চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এতদিন পরে একটা সত্যসত্যই দুর্ব্বোধ্য বা কঠিন বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি। একমাত্র এই কথা হইতেই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সঙ্গীতের উন্নত ও জটিল অবস্থা আন্দাজ করিতে হইবে। অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীত এক ধরণের, পাশ্চাত্য সঙ্গীত আর এক ধরণের। এই কারণেও ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্য সঙ্গীত কঠিন হইবারই কথা। কিন্তু ভারত-সন্তানের পক্ষে ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যাও কঠিন নয় কি?

গলা সাধা বা গান গাওয়া সোজা কি কঠিন, সে কথা বলা হইতেছে না। পিয়ানো বা বেহালা বাজান সোজা কি কঠিন, সে কথাও বলা হইতেছে না। কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীতের ভিতর কতখানি বিজ্ঞান, বিদ্যা, তত্ত্ব বা থিয়রি আছে, তাহাই আমার আলোচ্য বিষয়। এই সম্বন্ধে সাহিত্য বুঝিবার ক্ষমতা লাভ করা সম্প্রতি আমার উদ্দেশ্য। এই জন্য পিয়ানোয় হাত সাধা কিছু আবশ্যক। তাহাও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। কিন্তু এক্ষণে বাজনা গৌণ মাত্র। গলা তৈয়ারি করিতে বা বাজনায় হাত পাকাইতে যত সময়ের দরকার গান বা বাজনার মর্ম্ম বুঝিতে তাহার দশমাংশ সময়ও দরকার হয় না। কম সময়ে যাহা সম্ভব কেবল সেই দিকেই নজর দেওয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের খাঁটি সমজদার হইতে হইলে দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ তিন বৎসর কাটান আবশ্যক। বলা বাহুল্য, অত সময় দিতে আমি অসমর্থ। কাজেই সঙ্গীত-চর্চ্চায় বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যাইবে না। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের যথার্থ কদর বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে ও প্রচার করিতে হইলে ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইবে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বর্ত্তমান পরিণত অবস্থা না বুঝিলে এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইতিহাস দখলে না রাখিলে কোন ভারতসন্তান ভারতীয় সঙ্গীতের পূর্ব্বাপর অবস্থা বুঝিতে পারিবেন না। আর বিজ্ঞানের কোন্ স্তরে আমাদের সঙ্গীত অবস্থিত তাহার সুবিচারও হইবে না। ভারতীয় সঙ্গীতকে ভবিষ্যতে কোন্ পথে চালাইতে হইবে তাহাও কেহ বলিতে পারিবেন না।

নিউটন এবং ম্যাক্‌সোয়েলের গণিত দখলে না আসলে আমরা আর্য্যভট্টের দৌড় কতখানি বুঝিতে পারি না। বেকেরেলের রেডিও অ্যাক্টিভিটি—কি বস্তু না জানিলে কণাদের পরমাণুতত্ত্বে কতটুকু বিজ্ঞান আছে বুঝিতে পারি না। বর্ত্তমান চিকিৎসা-শাস্ত্রের অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা না জানিলে বিজ্ঞানে চরক চক্রপাণির স্থান বুঝিতে পারি না। ঠিক সেইরূপ বাখ্, বেঠোবেন, শোপাঁ, ভাগ্নার ইত্যাদির সঙ্গীত রপ্ত না করিতে পারিলে "ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র," "সঙ্গীত রত্নাকর," দামোদর, "শ্রুতি"-তত্ত্ব, তানসেন, খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদির ওজন করিতে আমরা অসমর্থ থাকিব। চোখ কান বুজিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের দর্শন হজম করিয়াছি, ডারুইনের গ্রন্থ মুখস্থ করিয়াছি, অস্ত্র-চিকিৎসায় অভ্যস্ত হইয়াছি, বেলুন এরোপ্লেনের অঙ্ক কষিতেছি, ফিজিয়লজি পড়িতেছি, প্রাণ-বিজ্ঞান আলোচনা করিতেছি, ব্রাউনিং ঘাঁটিতেছি, ভুণ্টের চিত্ত-বিজ্ঞান বুঝিতেছি। ইহাতে লাভই হইয়াছে—লোকসান

কিছুই হয় নাই। ঠিক সেইরূপ ভাল ছেলের মতন কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়া ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত-বিদ্যায় পণ্ডিত হইতে হইবে। এই বিজ্ঞানে ভারতসন্তানকে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আমাদের ছাত্রেরা বিদেশে আসিয়া বায়োলজিষ্ট হইতেছে, রাসায়নিক হইতেছে, এঞ্জিনীয়ার হইতেছে, আকরতত্ত্ববিৎ হইতেছে। আমাদের ছাত্রেরা বিদেশী সঙ্গীতবিজ্ঞানের "ডাক্তার" হইবে না কেন? যত শীঘ্র এই দিকে আন্দোলন সুরু হয় ততই মঙ্গল।

সঙ্গীত-বিদ্যা কঠিন বলিতেছি। বস্তুতঃ, দুনিয়ায় কঠিন কিছুই নয়। সাধারণতঃ আমাদের বিশ্বাস—"সঙ্গীত আবার বিদ্যা তাহার জন্য আবার পরিশ্রম! পান চিবাইতে চিবাইতে আখড়ায় গিয়া বসিলেই ওস্তাদ না হয় সমজদার হওয়া যায়।" এই বিশ্বাস বা সংস্কার আমাদের শিক্ষিত মহল হইতে তাড়ান আবশ্যক। উচ্চশিক্ষিত সমাজে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হইবা মাত্র এইরূপ অজ্ঞতাসূচক সংস্কার আর থাকিবে না। বিজ্ঞান, দর্শন বা গণিত যতটা সোজা বা কঠিন, সঙ্গীত ঠিক ততটা সোজা বা কঠিন রূপে বিবেচিত হইবে।

বর্ত্তমান ভারতের আখ্‌ড়ায় আখ্‌ড়ায় গান বাজনার আয়োজন আছে। ওস্তাদজীর সহবাসে শাগরেতগণও ওস্তাদ হইয়া উঠেন। কিন্তু গায়ক বা বাদক হইলেই সঙ্গীতের "বিজ্ঞান" দখলে আসে না। কান, গলা বা হাত তৈয়ারী হইলেই সঙ্গীতের তত্ত্ব বুঝা হইল না। আমাদের দেশে এই তত্ত্ব বা থিয়রী বুঝাইবার ব্যবস্থা কোথাও বোধ হয় নাই।

ভারতীয় সঙ্গীতের ভিতর কতটুকু বিজ্ঞান আছে তাহার আলোচনা ভারতবর্ষে একপ্রকার হয় না বলিলেই চলে। শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের গ্রন্থাবলী এ হিসাবে উল্লেখযোগ্যই নয়। এই বিষয়ে যাহা কিছু

উল্লেখযোগ্য রচনা আছে, তাহার অধিকাংশই বিদেশীর লেখা। কিছু দিন হইল মারাঠা পণ্ডিত কৃষ্ণজী বল্লাল দেবল ভারতীয় সঙ্গীতের "শ্রুতি"-তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহা বুঝিবার লোক ভারতবর্ষে কয়জন আছেন জানি না। Fox-Strangway একখানা বই লিখিয়াছেন। নাম "The Music of Hindostan"। তাঁহার পূর্ব্বে Clements একখানা বই লিখিয়াছেন। নাম "Introduction to the Study of Indian Music"। আমাদের কয়জন উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক অথবা সঙ্গীতের ওস্তাদ বা সমজদার এই দুইখানা গ্রন্থ আগাগোড়া বুঝিতে পারিবেন? সত্যকথা, ভারতীয় সঙ্গীতের তত্ত্বাংশ বুঝিবার লোক ভারতসমাজে নাই বলা যাইতে পারে। এই অবস্থা আর কতদিন চলিবে?

(খ) পর্য্যটন ও আমোদ-প্রমোদ

গুমোটের পর বজ্রের ডাক, বিজুলীর চমক, ঝড় আর জল বৃষ্টি আমরা ভারতে পাই। চীনে এবং জাপানেও এইরূপ দেখিয়াছি। আমেরিকায়ও প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এই সব জুটিতেছে। দুই তিন দিন উপরাউপরি চড়া গরম চলিলেই মাঠের ঘাশ পুড়িয়া লালছে মারিতে থাকে।

গ্রীষ্ম-বিদ্যালয়ের নানা বিভাগ হইতে নানা স্থানে পর্য্যটনের ব্যবস্থা করা হয়। খরচপত্র ছাত্রদের নিজ নিজ। বোধ হয় ছয় সপ্তাহে এইরূপ শফর হইল ১৫।২০ বার। কোন দিন ঐতিহাসিকতথ্যপূর্ণ জনপদে, কোন দিন মিউজিয়ামে, কোন দিন সমাজ-সেবার কেন্দ্রে ইত্যাদি। কয়েকটা শফরে যোগদান করা গেল।

সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপকের সঙ্গে একদিন গেলাম "ফীব্‌ল্‌-মাইণ্ডেড্‌"

বা "ডিফেক্‌টিভ" বালকবালিকাদের বিদ্যালয়ে। আধ্‌-পাগলা, অপূর্ণ-মস্তিষ্ক, কাণ্ডজ্ঞানহীন বা নেহাৎ বেকুব ছাত্র ছাত্রীদের যথোচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

একদিন গেলাম হুইটিয়ার কবির (১৮০৭-৯২) বাস্তুভিটা ও কবর দেখিতে। মোটরে যাওয়া আসা হইল প্রায় ৮০ মাইল। সঙ্গী একজন সুইডিশ যুবক এবং তিন নারী।

একদিন বষ্টন মিউজিয়ামের প্রাচীন গ্রীক মূর্ত্তি দেখিবার আয়োজন হইল। দর্শক সকলেই নারী দুই তিন জন বাদে।

দর্শনবিভাগের এক পাদ্রী-ছাত্রের সঙ্গে তাঁহার পার্ব্বত্য পল্লীভবনে বেড়াইতে গেলাম। মোটর তাঁহার নিজের। দুই দিনে সাড়ে তিন শত মাইল ঘুরাফিরা গেল। পাহাড়ে ও উপত্যকায় চক্‌চকে বাঁধান সরকারী পথ। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের পথে গ্রীষ্মে ধূলা, বর্ষায় কাদা। গোটা আমেরিকাই মোটরে বেড়ান যায়। পাদ্রী মহাশয় মোটরে ১৫,০০০ মাইল আমেরিকা দেখিয়াছেন।

একদিন সমুদ্রে সাঁতার কাটিবার জন্য দুই ঘণ্টা ধরিয়া ট্রামে যাওয়া গেল। সঙ্গী সুইডিশ যুবক। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি, সাঁতার কাটিবার ঘাট নাই। পাহাড়ে জলের ঢেউ দেখিয়া ফিরিলাম।

গ্রীষ্ম-বিদ্যালয় খোলা হইবার দুই তিন দিন পরে প্রেসিডেণ্ট লোয়েলের সঙ্গে সকল ছাত্র ছাত্রীর করমর্দ্দনের অনুষ্ঠান হইল। করমর্দ্দনের পর নাচের পালা এবং মিষ্টিমুখ। দর্শন-ক্লাশের এক ছাত্রী বলিলেন, "এস, তোমাকে নাচ শেখাই।" লোভটা সম্প্রতি সংবরণ করিলাম।

সপ্তাহে একদিন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়ামগৃহে নাচের ব্যবস্থা। মজলিশে প্রবেশ করিতে খরচ বার আনা। সঙ্গীত-ক্লাশের তিন ছাত্রী বলিল "এস, তোমাকে নাচ শেখাই।" ভাবিলাম, "বার বার এই বার।

মনে আর খেদ থাকে কেন?" নাচ-ঘরের পাশেই একটা বারান্দা আছে। সেখানে বেশী লোক যাওয়া আসা করে না। আমার ভুল বা বেকুবি লোকের নজরে পড়িবে না। কাজেই দুর্গা বলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িলাম। নাচ শিখিলাম "ওয়ান্ ষ্টেপ," "ওয়াল্ট্স্," এবং "ফকস্ ট্রট্"। এই তিন রীতিই আজকাল এসব দেশের আসরে প্রচলিত। একটুকু তলাইয়া বুঝিবার জন্য ব্যায়ামবিদ্যালয়ের নৃত্য-বিভাগে ভর্ত্তি হওয়া গেল। আধ ঘণ্টা করিয়া ছয় দিন শেখা গেল। মূল্য ১৫৲। নৃত্য-কলার পুস্তকাদিও ঘাঁটা যাইতেছে। নাচা অতি সোজা। তবে এখনও আসরে নামিয়া দলের ভিতর নাচিতে সাহস হইল না।

একদিন ব্যায়াম-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের কছরত দেখান হইল। ব্যায়াম-শিক্ষা হার্ভার্ডের আয়োজনে ক্রমশঃ অন্যান্য উচ্চশিক্ষার সমান আসনে উঠিতেছে। বায়োলজি এবং চিকিৎসা-বিভাগের সামিল করিয়া এই বিভাগ গড়িয়া তোলা হইতেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতন এই বিদ্যাও চারি বৎসরে সম্পূর্ণ করা হয়। নানা বিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক এবং ব্যায়াম-শিক্ষয়িত্রী গ্রীষ্ম-বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষাবিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

পুরুষ এবং নারীর জন্য প্রায় এক প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিতেছি। সকলেই এক সঙ্গে শিখিয়াও থাকে। কছরত, হাঁটা, ডন, লাঠিখেলা মুগুর ভাঁজা ছোরা খেলা, নাচ, দৌড়, জিম্‌নাষ্টিকস্, কোন বিষয়ে প্রভেদ নাই। অধ্যাপকেরা সকলেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের এম্, ডি উপাধিধারী। অ্যান্থ্রপমেট্রি, অ্যানাটমি, ফিজিয়লজি, হিষ্টলজি, ইত্যাদি বিদ্যা শিখান হয়। সাধারণ কলেজের মতন এই কলেজেও ল্যাবরেটরিতে কাজ করার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আছে। অন্যান্য বিভাগের মতন ব্যায়ামবিভাগেও ছাত্রের ভিতর পুরুষ অপেক্ষা যুবতী ও প্রৌঢ়ার সংখ্যা বেশী।

ইতিহাসবিভাগে একদিন ফরাসী সেনাপতি ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তিন সপ্তাহে কতখানি ফরাসী শিখিয়াছি পরীক্ষা করিবার জন্য বক্তৃতায় উপস্থিত হইলাম। একটা শব্দও কানে ধরিতে পারিলাম না! অথচ বই পড়িয়া বুঝিতে পারি।

"সাহিত্য-পাঠ" নামক এক প্রকার অনুষ্ঠানে ইয়াঙ্কির নরনারীর ঝোঁক খুব বেশী। "সাহিত্য-পাঠক" নামক এক প্রকার ব্যবসায়ী ইয়াঙ্কিমহলে নামজাদা। ইহাঁরা নাটক, নভেল, কাব্য, গল্প ইত্যাদি সাহিত্য-পাঠ করিয়া সভার লোকজনকে আপ্যায়িত করেন। এই ধরণের সাহিত্য-পাঠের মজলিশে শ্রোতার সংখ্যা যথেষ্ট দেখা যায়। অনেক সময়ে কবি, নাট্যকার বা গল্পলেখক নিজেরাই নিজেদের রচনা পাঠ করিয়া টাকা রোজগার করেন। গ্রীষ্মবিদ্যালয়ে এই ধরণের সাহিত্য-পাঠ প্রায় ১০।১৫ দিন হইল। কোন দিন আইরিশ সাহিত্য হইতে নমুনা উদ্ধৃত করিয়া এক পাঠক বক্তৃতা করিলেন, কোন দিন অস্কার ওয়াইল্ডের এক নাটক পঠিত হইল, কোন দিন ডিকেন্সের নভেল, কোন দিন শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক ইত্যাদি। আমেরিকায় কাব্য, সাহিত্য, ইত্যাদির সভায় নারী জাতিই এক মাত্র শ্রোতা বা দর্শক বলা যাইতে পারে। হাসি ঠাট্টা, রং তামাসা এবং হাল্কা সহজবোধ্য চিন্তার ফোঁড়ন এই সব যে সাহিত্যে থাকে সেই সাহিত্যের আদরই বেশী। ঘণ্টা দুএক কাল হাসিয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া "ওল্ড্ মেড্" প্রৌঢ়া এবং যুবতীরা ঘরে ফিরিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা সুপ্রচলিত হইলে "সাহিত্য-পাঠে"র আয়োজন আবশ্যক হইবে। কাব্য, নাটক, নভেলের কাটতি বাড়িবে এবং বিদূষকের ভাঁড়ামি বিংশশতাব্দীর উপযোগী ভাবে নবরূপে দেখা দিবে। তখন ভারতের নরনারী সাহিত্যে হাস্যরস আস্বাদ করিবার প্রচুর মশলা পাইবেন। লেখক, পাঠক, শ্রোতা সকলেই

সরসভাবে সময় কাটাইবার নয়া নয়া ফন্দী আবিষ্কার করিতে থাকিবেন।

(গ) সঙ্গীতের প্রশ্নপত্র

ক্লাশে ৩০ ঘণ্টা কাটাইলাম। তাহা ছাড়া ৮ ঘণ্টা জনসাধারণের জন্য খোলা সভায় সঙ্গীত চর্চ্চা হইল। এই গেল ছয় সপ্তাহের গ্রীষ্ম-বিদ্যালয়ের কথা। এই সময়ের ভিতর ঘরে ডিস্‌ভিয়ারের সঙ্গে কাটাই-লাম ২৬ ঘণ্টা। তাহার মধ্যে প্রায় ১০ ঘণ্টা পিয়ানোয় হাত (এবং কানও কথঞ্চিৎ) সাধিয়াছি। অবশিষ্ট ১৬ ঘণ্টা করিয়াছি ডিস্‌-ভিয়ারের শাগ্‌রেতি। এই ১৬ ঘণ্টায়ই সঙ্গীতে হাতে খড়ি হইয়াছে বলিতে হইবে। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে যদি এই ১৬ ঘণ্টার বিদ্যা মাথায় থাকিত তাহা হইলে স্কুলের ৩৮ ঘণ্টায় সত্য সত্যই লাভবান্ হই-তাম। বোধ হয় অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীর মতনই আমিও ৬০৲ টাকা সুদে আসলে উসুল করিয়া লইতে পারিতাম। তবে পাশ্চাত্য কানের অভাবে অনেক জিনিষই ধরিতে অসমর্থ থাকিতাম সন্দেহ নাই।

তথাপি ৩৮ ঘণ্টায় লাভ হইয়াছে অনেক। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে বিখ্যাত "কম্পোজার" বা সঙ্গীত-রচয়িতাদের সম্বন্ধে অতি ভাসাভাসা জ্ঞান ছিল। সে জ্ঞানও প্রধানতঃ ঐতিহাসিক মাত্র। তাঁহাদের জীবনচরিত পড়িবার সময় কখনও খাঁটি সঙ্গীতবিষয়ক আলোচনাগুলি বুঝিতে পারিতাম না। স্কুলে বসিয়া পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সর্ব্ববিখ্যাত সুর-গুলির প্রায় সবই শুনিতে পাইলাম। বস্তুতঃ, এই ৩৮ ঘণ্টা কেবল সুরের সাগরে সাঁতার কাটিয়াছি। সঙ্গীতশাস্ত্রের হোমার, ভার্জ্জিল, কালিদাস, দান্তে, সেক্সপীয়ার, গ্যে'টে সকলেই এখন আমার সুপরিচিত লোক। প্রত্যেক ওস্তাদের একাধিক রচনার নাম ও বিবরণ আজ খেলার সাথী।

কিন্তু স্বরগুলির মূর্ত্তি কানে ভাসিতে বহুকাল আবশ্যক। অন্যান্য ছাত্রেরা যথার্থ সমালোচনার রীতিও হস্তগত করিতে পারিল। কারণ তাহারা স্বরের মূর্ত্তিগুলি সহজেই বাছাই করিতে পারে। আমি সমালোচনার প্রণালীটা বুঝিয়া রাখিলাম মাত্র, দখলে আনিতে পারিলাম না। অবশ্য পারিভাষিক শব্দগুলা সবই এক প্রকার বশে আসিয়াছে। ঐ সকল শব্দ সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেও হয়ত পারি। কিন্তু সঙ্গীতের স্বর যতক্ষণ কানে ধরিতে না পারিতেছি ততক্ষণ বিদ্যাটা শব্দগতই থাকিবে —বস্তুগত হইয়া উঠিবে না। ধরা যাউক, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে— "ওয়াটার শব্দের অর্থ কি?" জবাব দিব "জল," কিন্তু ওয়াটার বা জলে যে তৃষ্ণা নিবারণ হয় তাহা বলিতে পারিব না। এই অবস্থায় যদি কেহ বলে যে, আমি ইংরাজি জানি, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, সঙ্গীত-বিদ্যায়ও আমার অধিকার জন্মিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থাদি কথঞ্চিৎ সরসভাবে বুঝিতে পারিতেছি। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন কোন অধ্যায়ের হয়ত আধাআধি বাদ দিতে হইত। আজ সেই সকল অধ্যায়ের দশমাংশও বাদ দিই না। ইহাই মস্ত লাভ।

কিন্তু এই লাভটা একমাত্র স্কুলের প্রভাবে পাইয়াছি, বলিতে পারি না। বস্তুতঃ, ঘরে ডিমুভিয়ারের অধ্যাপনা না জুটিলে স্কুলের ৩৮ ঘণ্টায় বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না। স্কুলে অধ্যাপক মহাশয় স্বরগুলি পিয়ানোতে বাজাইতেন—ছাত্রদের হাতে থাকিত স্বরের কেতাব। কানে স্বর শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে কেতাবের চিহ্নগুলি মিলাইতে হইবে। তাহার পর চিহ্নগুলি দেখিয়া স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। আমি না পারি কানে স্বর ধরিতে—না জানি চিহ্নগুলা পড়িতে। কেবল মাঝে মাঝে স্বর শুনিয়া মনে হয়—"বাহবা, এই ধরণের একটা কিছু ভারতীয় সঙ্গীতে আনা চাই।"

অতএব ঘরে বসিয়া সর্ব্বপ্রথমে শিখিতে হইল "নোটেশন" বা স্বরলিপি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরলিপি সরল বস্তু নয়। ইহা একদম স্বতন্ত্র ভাষা। এই ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান বালক বালিকারা পাঠশালায় লাভ করিয়া থাকে। অবশ্য উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বিষয়ক স্বরলিপি স্বতন্ত্র ভাবে শিখিতে হয়। বর্ণ পরিচয় হইলেই শব্দ পড়িবার ক্ষমতা জন্মে না। তাহার জন্যও স্বতন্ত্র সাধনা আবশ্যক। যাহা হউক, এ সব এমন কিছু মারাত্মক কঠিন নয়। সঙ্গীত যে "পড়িতে" হয়, এই তথ্যটা সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে নূতন এই যা।

দ্বিতীয়তঃ, শিখিতে হইল "হার্ম্মণি"। ভারতবাসীরা চোদ্দ পুরুষে সঙ্গীতের এই তত্ত্ব কখন জানেন না। অথচ এই তত্ত্বই বিগত আড়াইশত বৎসরের পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ভিত্তি। এই বস্তু চোখে না পড়িয়া এবং কানে না শুনিয়া সঙ্গীত-বিদ্যায় কাহারও প্রবেশ হইতেই পারে না। আমাদের গানের সুরে ("মেলডি"তে) হার্ম্মণি জুড়িলে কেমন শুনায় তাহার একস্‌পেরিমেণ্ট করিবার দিন আসে নাই কি?

এই দুই বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান সবে মাত্র লাভ করিয়াছি এমন সময়ে আজ হইল স্কুল-শেষ এবং পরীক্ষা। প্রশ্নপত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বলা বাহুল্য, পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার ধৃষ্টতা করিলাম না। দাঁড়াইয়া ফেল মারা, লজ্জার কথা ত বটেই।

A two page summary of the significance of Bach's "Prelude from the IIIrd English Suite" as to the principles discussed and demonstrated in this class.

এখন হইতে তিন মাস পরে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারিব কিনা সন্দেহ। মিস্ ডিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—"হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজির অধ্যাপক এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারিবেন কি?" ইনি

বলিলেন—"তিনি এই জিনিষটার নামও হয়ত শুনেন নাই।" অর্থাৎ আমেরিকার যে কোন উচ্চশিক্ষিত বা পণ্ডিত বা নামজাদা লোক এই ধরণের সঙ্গীত সমালোচনায় অসমর্থ। সঙ্গীত-বিদ্যা যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই এই প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

এই প্রশ্নের একটা চলনসই ভারতীয় সংস্করণ করা যাউক। "আওয়ে বসন্ত পিয়া অবহুঁ নাহি আওয়ে…" ইত্যাদি গানটার সুর স্বরলিপিতে লেখা হইবে। গানের শব্দগুলা থাকিবে না। বাঙ্গালা অক্ষরে সা, রে, গা, মা-ও লেখা থাকিবে না। ছাত্রের সম্মুখে সাঙ্কেতিক চিহ্নের ভাষায় সুরটা রাখিয়া দেওয়া হইবে। প্রশ্ন :—"চিহ্নগুলার পরস্পর সম্বন্ধ বাহির কর। প্রথমটার পর দ্বিতীয়টা কেন বসান হইয়াছে? না বসাইলে কি হইত? আস্থায়ীটার সুরু কোথায়? যথাস্থানে ইহার শেষ হইয়াছে কি? "সমে" ফিরিবার জন্য কোন্ কোন্ কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে?" ইত্যাদি।

এইখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, বাখের "স্যুইট"টা গানের সুর নয়। ইহা যন্ত্রসঙ্গীত। দ্বিতীয়তঃ, আস্থায়ী, সঞ্চারি, সম ইত্যাদি বস্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে নাই। তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরলিপি জটিল ও বিচিত্র। সূর্য্যের সঙ্গে জোনাকির তুলনা করিয়া বাখের সামনে ভারতীয় গীতের সুরটা ধরা হইল মাত্র।

The beginning of a work unknown to the classs will be played. Of the composers studied during the session, which one or ones may have written it, and which not? Justify your opinion first by general comment on the passages; second by comment on the composers (not less

than five) whom you mention. কান তৈয়ারি হইবার পূর্ব্বে এই প্রশ্নে হাত দেওয়া অসাধ্য। ইয়োরোপীয়ান্ বা ইয়াঙ্কিরাও বিশেষ আলোচনার পরই এই প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দিতে পারিবে।

Copy each of the following items, and define, describe or identify : (a) Parsifal, (b) Sarabande, (c) D. C. al Fine, (d) The great Bach and his most famous son (e) Schón'berg, (f) Opus, (g) Return, (h) Scherzo, (i) Eroica, (j) Detail-work. এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি। কয়েকটা প্রশ্ন এইরূপ :—"ঢিমে তেতালা কাহাকে বলে? ভৈরোঁ কি? টপ্পা কি? প্রসাদী সুর কি প্রকার?" প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে গাহিয়া নয় বা বাজাইয়া নয়,—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়। কয়জন ভারতবাসী ভারতীয় প্রশ্নগুলির এইরূপ জবাব দিতে পারেন? সঙ্গীতের ওস্তাদ মহাশয়গণও বোধ হয় পারেন না। বস্তুতঃ, ভারতে এই বিষয়ে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রচারিত না হইলে এই সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া অসম্ভব।

If you were selecting about fifteen works as the beginning of library of rolls or records for player—piano or phonographs in a high school, what works would you choose, and why? Of the works studied during the session, which would you reject and why? এই প্রশ্ন সহজেই বোধগম্য।

What do you understand to be included in the term "Development by change of colour"? এইটা খাঁটি সঙ্গীত-বিজ্ঞানের প্রশ্ন। ভাসা ভাসা জবাব দিতে পারি। কানের সঙ্গে বস্তু-পরিচয় হইবার পূর্ব্বে আসল জবাব দিতে অসমর্থ। এই প্রশ্নের ভারতীয়

সংস্করণ করা যায় না। কারণ ভারতীয় সঙ্গীতে এই শব্দের অর্থগত বস্তু নাই। অথবা দেশী সঙ্গীতে যথোচিত জ্ঞান থাকিলে কেহ কেহ হয়ত ইহার অনুরূপ একটা প্রশ্ন সাজাইতে পারিবেন। ভারতীয় সঙ্গীতে অতটা অধিকার আমার নাই, বলাই বাহুল্য।

Some one says : "The instructor told us either that the symphony came from the overture, or that the overture came from the Symphony,—I don't remember which." Make the correct statement, and give a brief account of the development, historically, of each of the individual forms apart from the other. ভারতীয় সঙ্গীতে ইহার অনুরূপ কোন তথ্য নাই। এই প্রশ্নটার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে আজ কঠিন নয়।

Name three composers : first one who died in poverty, second, one who was held in great esteem during his life ; third, one whose career was passed chiefly outside his native land. For what are these composers now, respectively, famous ? এইটা ঐতিহাসিক প্রশ্ন—ছেলে খেলা।

Give as full a statement or description as you can, of the means and devices employed by a composer to give symmetry or orderliness to a composition. অধ্যাপকের বক্তৃতা হইতে নোট লইয়াছি। কাজেই সেই বুখনিগুলি আওড়াইতে পারি—কিন্তু বুকে হাত দিয়া বলিতে হইলে বলিব, এই প্রশ্নের জবাব দিতে এখনও অনেক দেরী।

"At this point, however, a confusion may arise from the fact that the term 'Sonata' is used in two senses." State the nature of the confusion, and explain it away. এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি।

On page 205 of "Music and Life" by T. W. Surette, one finds the following statement : "Symphonic themes, in contradistinction to themes for songs or short pianoforte pieces or dances, should be inconclusive ; they are valuable for what they presage rather than for what they state, and they should indicate their own destiny." Regard this quotation as a text for discussion, explanation, elaboration. Argue for or against it, or partly both. Supply by inference from it, other things that the author may have been saying in the same connection. এতদূর অগ্রসর হই নাই।

এই ছয় সপ্তাহের স্কুলে দুইখানা টেক্সট বুক ব্যবহৃত হইল :—

1. The appreciation of Music—T. W. Suretta and D. G. Mason ($ 1-50).
2. The "Appreciation" Pianoforte Album (Musical Examples for use with the appreciation of music). ($ 1-00)

দুইখানারই প্রকাশক Novello & Co., New York, এই বই দুইটা পড়িবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দুইখানা বই পড়া আবশ্যক (কলেজে পড়ান হইয়া থাকে) :—

1. Modern Harmony in its theory and practice—A. Foote and W. R. Spalding ($ 1-50. A. P Schmidt, New York)
2. Musical Form—E. Prout (Augener Ld., London)

এই দুইখানারও পূর্ব্বে নোটেশন, স্কেল্ ইত্যাদি জানা আবশ্যক। তাহার জন্য পড়া যাইতে পারে :—

Rudiments of Musical Knowledge—C. W. Pearce (50 Cents, G. Schirmer, Boston).

এই পুথির আলোচ্য বিষয়ে কলেজের অধ্যাপক বক্তৃতা করেন না। ছাত্রেরা এতটুকু জানে ধরিয়া লওয়া হয়। ডিমুভিয়ারের কাছে শেষোক্ত তিনখানা বইয়ের আলোচ্য কথা কিছু কিছু জানিয়াছি। এক্ষণে পাঁচখানা বইই একসঙ্গে পড়া যাইতেছে। বোধ হয় ছয় সপ্তাহে শেষ হইবে। তখন প্রশ্নপত্রের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিব, আশা করি। কিন্তু এত শীঘ্র কান তৈয়ারি হইবে কি? গ্রামোফোন কিনিয়া সুরগুলি শুনিতে থাকিলে কিছু উপকার হইতে পারে। এই পাঁচখানা বইই পারিভাষিক শব্দে ভরা। জনসাধারণের দন্তস্ফুট করিবার জো নাই। কয়েকখানা কথঞ্চিৎ সহজবোধ্য গ্রন্থের নাম করিতেছি। এইগুলি ভাল করিয়া ঘাঁটিতেও সঙ্গীত-বিদ্যায় দখল চাই।

1. The Book of Musical Knowledge—A. Elson ($ 3-50. Houghton Mifflin Co., Boston).

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ছোট খাটো বিশ্বকোষস্বরূপ এই গ্রন্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে পারিভাষিক শব্দের আড়ম্বর বেশী নাই। জনসাধারণের জন্য এই বই লেখা।

2. Short History of Music—Unter Steiner (translated from the German b · Very), New York.

3. History of Music—W. S. Pratt (G. Schirmer & Co., Boston).

এই ধরণের আরও অনেক গ্রন্থ নাড়া চাড়া করিয়া আসিতেছি। হয়ত কোনদিন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অ আ ক খ সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় কেতাব লিখিতে পারি। তখন এই সকল এবং অন্যান্য গ্রন্থের সার মর্ম্ম সহজেই বাঙ্গালীর পাতে পড়িবে।

ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিখিতেই হইবে। এই জন্য কলেজে, থিয়েটারে, সাহিত্য-সম্মিলনে, বৈঠকে, কন্‌সার্টপার্টিতে বিখ্যাত "কম্পোজার"দের রচনা জনগণকে শুনাইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিশেষতঃ, উচ্চশিক্ষিত ভারত-সন্তানের কান এই উপায়ে তৈয়ারি হইতে থাকুক। তাহা হইলে সহজেই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তত্ত্বাংশে প্রবেশ করিতে পারিবে। তখন ভারতীয় সঙ্গীতেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পথ পরিষ্কার হইতে থাকিবে।

কেম্ব্রিজ, ম্যাস, ১০ আগষ্ট, ১৯১৭।

প্রেসিডেণ্ট ষ্ট্যান্‌লি হল

ষ্ট্যান্‌লি হলের সঙ্গে দেখা হইল। দুই তিন বৎসর চিঠি পত্র চলিয়াছে মাত্র। এইবার চাক্ষুষ আলাপ। ষ্ট্যান্‌লি হল ভারতবর্ষে সুপরিচিত। শিক্ষাবিজ্ঞান এবং চিত্তবিজ্ঞান এই দুই বিভাগে ইনি আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা নামজাদা পণ্ডিত।

গ্রীষ্মের পূর্ব্বে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইনি একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি:—"My own line of work in psychology began in the study of very general problems of human nature, but I count it an advance that in the last twenty five years my interest has grown to be more and more that in differential or individual psychology. I want a psychology that is inductively based on a very comprehensive and detailed study of countless individuals (as Frendianism rests its interest on not less than fifty thousand carefully analyzed cases)."

বিগত পাঁচিশ বৎসর ধরিয়া হল চিত্তবিজ্ঞানের এক নূতন বিভাগে গবেষণা করিতেছেন। এই গবেষণার ফলসমূহ এখন গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রে কয়েকটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে মাত্র। গ্রন্থ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল।
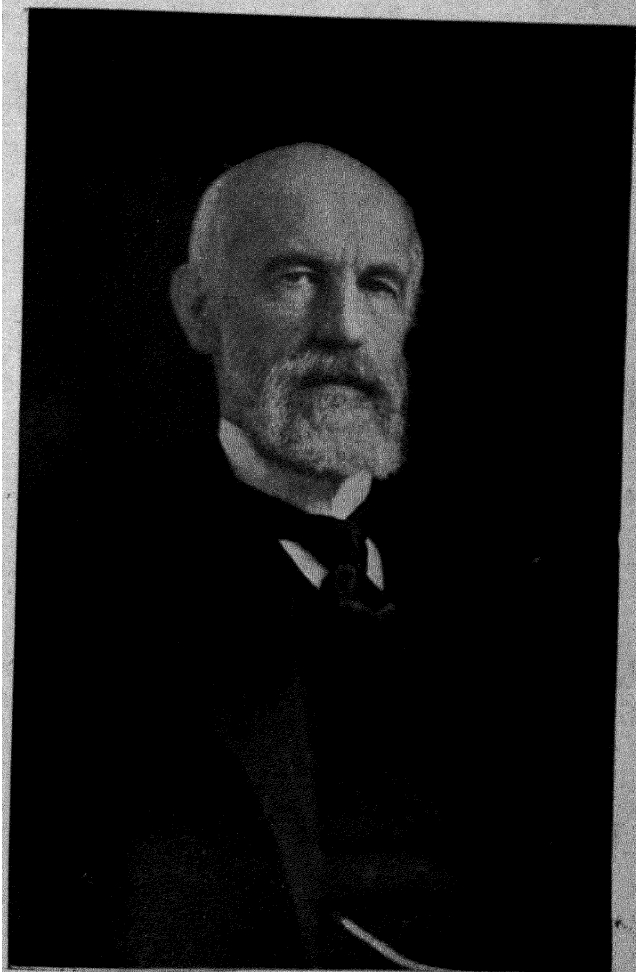
৭৪। দার্শনিক ষ্ট্যান্‌লি হল্‌

ভারতবাসী দার্শনিক জাতি বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ভারতবাসীর সমান মাথাহীন জাতি সভ্যপদবাচ্য জগতে আর নাই। কাজেই চিত্তবিজ্ঞানের কত বিভাগ আছে, তাহার আবার কত শাখা কতদিকে গজাইতেছে তাহার পরিচয় মোটের উপর আমাদের সমাজে নাই। আমাদের যাঁহারা বিদেশী ভাষায় গ্রন্থাদি পড়িয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্য কম বেশী কিছু না কিছু জানেন। কিন্তু তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আবিষ্কার মুখস্থ করিয়া আওড়ান মাত্র। অন্যান্য লোকত এ সম্বন্ধে খাঁটি অজ্ঞ থাকিতেই বাধ্য।

চিত্ত শব্দে এতদিন পর্য্যন্ত দুনিয়ার যে কোন লোকের চিত্ত ধরিয়া লওয়া হইত। ক্রমশঃ দেখা গিয়াছে যে, রোগীর চিত্ত সুস্থের চিত্ত হইতে পৃথক্, বুড়ার চিত্ত জোয়ানের চিত্ত হইতে পৃথক্, পাগলের চিত্ত স্বাভাবিকের চিত্ত হইতে পৃথক্, শিশুর চিত্ত প্রৌঢ়ের চিত্ত হইতে পৃথক্, পুরুষের চিত্ত স্ত্রীর চিত্ত হইতে পৃথক্, মনিবের চিত্ত দাসের চিত্ত হইতে পৃথক্ ইত্যাদি। এই পার্থক্যগুলির আলোচনা বিশদরূপে হওয়া আবশ্যক। সেই সমুদয় বিশদ আলোচনার উপর দাঁড়াইয়া বৈজ্ঞানিকেরা চিত্ত সম্বন্ধে যে সমুদয় সাধারণ নিয়ম প্রচার করিবেন সেই গুলিই যথার্থ চিত্ত-বিজ্ঞানের সামিল হইবে। এখন পর্য্যন্ত সাধারণতঃ যে সমুদয় গ্রন্থ দেখা যায় তাহাতে এই পার্থক্যসমূহের মূল্য যথোচিতভাবে প্রদান করা হয় না। কোন কোন গ্রন্থে এই গুলির ইঙ্গিত করা হইয়া থাকে মাত্র। ভবিষ্যতের চিত্ত-বিজ্ঞান গ্রন্থে এই সমুদয়ের যথেষ্ট পরিচয়ই থাকিবে। ষ্ট্যান্‌লি হল সেই ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের অন্যতম পথপ্রদর্শক। ইঁহার নাম বিলাতে এবং জার্ম্মানিতেও আছে।

হল বলিলেন:—"সম্প্রতি আমি 'ইমোশন'গুলার বিশ্লেষণে নিযুক্ত আছি।" ক্রোধ, ক্ষমা, দয়া, সহানুভূতি, হিংসা, ঘৃণা, ভালবাসা, ইত্যাদি

বস্তুগুলা ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। এমন কি একই বয়সে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়ও ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। সুতরাং কোন্ বস্তুটা ক্রোধ, কোন্ বস্তুটা দয়া, কোন্ বস্তুটা ভালবাসা, কোন্ বস্তুটা ঘৃণা তাহা এক কথায় বিবৃত করা চলে না। চুরি করিয়া, খুন করিয়া, টাকা লুটিয়া, দাঙ্গা করিয়া বা অপরের মানহানি করিয়া কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইল। আদালতের বিচারে তাহার জেল হইল। চিত্ত-বিজ্ঞানের ভবিষ্য-বাদীরা বলিবেনঃ—"বিচারক মহাশয়, তুমি যাহাকে অপরাধী সাব্যস্থ করিতেছ, আমি তাহাকে একদম নির্দ্দোষী বুঝিতেছি। আমি ইহার সকল অঙ্গ, সকল ইন্দ্রিয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। ইহাকে প্রকৃতিস্থ স্বাভাবিক মানুষ বলা চলে না। ইহার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহার সুযোগ ছিল না বলিয়া এই ব্যক্তি বে-আইনি কিছু করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব আসামীকে দোষী বলি কি করিয়া?"

এই ধরণের আলোচনায় জার্ম্মাণ ডাক্তার ফ্রয়ড্ একজন নামজাদা লোক। হলের চিঠিতে এই ফ্রয়ডের নামই আছে। বলা বাহুল্য, এই চিত্ত-বিজ্ঞান শরীর-বিজ্ঞানের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে গ্রথিত। আর, এই চিত্ত-বিজ্ঞানের প্রভাবে শিক্ষা-বিধান, রাষ্ট্র-শাসন, সমাজ-সংস্কার বিচার-বিধি, বিজ্ঞাপন-প্রচার, পাপ পুণ্যের আলোচনা সবই নবরূপে দেখা দিতেছে।

হল-লিখিত কয়েকটা প্রবন্ধের নাম করিলে এই নব্য চিত্ত-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় খানিকটা স্পষ্ট হইবে।

১। শৈশবের অসত্য (Children's lies).

২। সমাধি, ধ্যান, "দশায় পড়া" ইত্যাদি (Ecstasy and trance).

৩। আত্মা (Modern methods in the study of the Soul).

৪। ভয় (A study on fears).

৫। হাসি ঠাট্টা, রং তামাসা ইত্যাদি (The psychology of tickling, laughing, and the Comic).

৬। ক্রোধ (A study of anger).

৭। শারীরিক দণ্ড (Corporal punishments).

৮। দয়া (Pity).

৯। শিশুর ধর্ম্মজ্ঞান (The religious content of Child Mind).

১০। মেঘ সম্বন্ধে শিশু ও যুবকের ধারণা (How children and youth think and feel about clouds).

১১। চাঁদ সম্বন্ধে কল্পনা (Note on Moon fancies).

১২। শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে শিশুদের জ্ঞান (Children's ideas of fire, heat, frost and cold).

১৩। সলজ্জতা (Showing off and bashfulness as phases of self consciousness).

১৪। কর্ত্তব্যবোধ, স্বাস্থ্য ও সম্মান।

ফ্রয়ড্‌ প্রধানতঃ চিকিৎসক। হল প্রধানতঃ শিক্ষক। কাজেই ফ্রয়ডের আলোচ্য বিষয় কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হইবারই কথা। ইনি স্বপ্ন, তন্দ্রা, ইচ্ছা, ভাবা, স্মৃতি, ভ্রান্তি ইত্যাদির বিশ্লেষণ করিয়া স্ত্রী পুরুষের যথার্থ চরিত্র এবং জীবনবৃত্তান্ত বাহির করেন এবং তদনুসারে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল ইনি ষ্ট্যান্‌লি হলের ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।

ফ্রয়ডের চিত্তবিজ্ঞান সংক্ষেপে বুঝিবার জন্য Holt প্রণীত The Frendian wish গ্রন্থ পড়া উচিত। ইচ্ছার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করা কর্ত্তব্য। এই জন্য ফ্রয়ডের "Interpretation of Dreams" না পড়িলে চলে না। Brill এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। ফ্রয়ড জার্ম্মাণ। স্বপ্নবিষয়ক গ্রন্থখানা সুবৃহৎ। এই গ্রন্থের জন্যই ফ্রয়ড বিখ্যাত। ইহাঁর "Psychopathology of every day life" গ্রন্থ পড়িলে নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহাঁর বক্তব্য বুঝা যাইবে। ইনি সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রীজাতির নানাপ্রকার ব্যাধির (বিশেষতঃ মৃগী, মূর্চ্ছা ইত্যাদি) আলোচনায় দৃষ্টি দিয়াছিলেন। সেই আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইতে ইনি মানবজীবনে জননেন্দ্রিয়ের প্রভাব সম্বন্ধে মত প্রচার করেন। সেই মত "Three contributions to Sexual Theory" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকেরা ফ্রয়ডকে এই লিঙ্গ-তত্ত্ব বা যোনিবিজ্ঞান এবং "যৌবনধর্ম্ম" ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া জানে। বস্তুতঃ, ফ্রয়ডকে "চিত্ত-বিশ্লেষণ," "সাব্-কন্‌শাস্" (বা চাপা আকাঙ্ক্ষা)এর বিশ্লেষণ এবং "রুদ্ধ" হৃদয়ের বিশ্লেষণের প্রবর্ত্তক বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। এই জন্যই চিত্ত-বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইনি চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবেন।

হল এবং ফ্রয়ড্ চিত্ত-বিজ্ঞানের দুই নূতন শাখা খুলিতেছেন। ইহাঁরা দুই জনেই "পরীক্ষা-সিদ্ধ" চিত্তবিজ্ঞান বিদ্যার পূজারি। আবার এই পরীক্ষাসিদ্ধ চিত্তবিজ্ঞানও বেশীদিনের পুরাতন বিদ্যা নয়। হল এই নূতন বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এইটা বোধ হয় ইংরাজি ভাষায় একমাত্র গ্রন্থ। এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্যাল সাইকলজি বিদ্যার জন্য এবং যৌবন বুঝিতে হইলে ষ্ট্যান্‌লি হলের "The Founders of Modern Psychology" পড়িতে হইবে। সাধারণতঃ

দর্শন সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ যেখানে আসিয়া শেষ হয়, হল প্রায় সেইখান হইতে এই গ্রন্থের স্থরু ধরিয়াছেন। দার্শনিক চিন্তার ক্রম-বিকাশের শেষ স্তর এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পক্ষে হলের এই বই যত কাজে লাগিয়াছে বোধ হয় তাঁহার অন্য কোন বই তত কাজে আসে নাই। নবীন চিত্তবিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক সকলেই জার্ম্মাণ। তাঁহাদের রচনা জার্ম্মাণ ভাষায়ই লিখিত, বলা বাহুল্য। সেই দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ প্রণালীবদ্ধভাবে কোন ইংরাজী গ্রন্থে পাওয়া সুকঠিন। বস্তুতঃ, হলের এই বই বহুকাল পর্য্যন্ত দর্শনাধ্যায়ীর টেক্সট্‌-বুক থাকিবে। ইহাতে ছয় জন দার্শনিকের জীবনবৃত্তান্ত এবং মত ও আলোচনা-প্রণালী চিত্তাকর্ষকভাবে বিবৃত হইয়াছে :—(১) সেলার (১৮১৪-১৯০৮), (২) লট্‌স্ (১৮১৭-৮১), (৩) ফেক্‌নার (১৮০১-৮৭), (৪) হার্ট-ম্যান (১৮৪২-১৯০৬), (৫) হেল্‌ম হোল্‌ট্‌জ্ (১৮২১-৯৪)। লোকেরা ইহাঁকে দার্শনিক না বলিয়া বৈজ্ঞানিকই বলিবে। (৬) ভুণ্ট্ (১৮৩২-)।

ষ্ট্যান্‌লি হল জার্ম্মাণিতে দুইবারে ছয় বৎসর কাটাইয়াছেন। ইনি হার্টম্যান এবং ফেক্‌নারের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। হেল্‌ম হোল্‌ট্‌সের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সুযোগ পাইয়াছিলেন, এবং ভুণ্টের শাগ্‌রেতিও করিয়াছেন। মোটের উপর, জগতের লোক ভুণ্টকেই পরীক্ষাসিদ্ধ চিত্তবিজ্ঞানের জন্মদাতা বলিয়া থাকে। তিনি এখনও জীবিত। জগতের যতস্থানে এই বিদ্যার জন্য ল্যাবরেটরি খোলা হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সকলগুলার প্রবর্ত্তকই ভুণ্টের শিষ্য অথবা প্রশিষ্য। ইয়াঙ্কিদের ভিতর ষ্ট্যান্‌লি হল ভুণ্টের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য, এবং ইনিই আমেরিকায় চিত্তবিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রথম ল্যাবরেটরি খোলেন। তখনও ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। হল জন্‌স্ হপ্‌কিন্‌স্

বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সপেরিমেণ্ট্যাল সাইকলজির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বিদ্যার ব্যবস্থা আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে। বস্তুতঃ, পরীক্ষাসিদ্ধ চিত্তবিজ্ঞানের তথ্য এবং তত্ত্ব বাদ দিয়া কোন ইয়াঙ্কি অধ্যাপকই দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাও করেন না, গ্রন্থও লিখেন না। এই সকল কারণে ষ্ট্যান্‌লি হল ইয়াঙ্কি দার্শনিক মহলের বৃদ্ধ মনু স্বরূপ পূজা পাইয়া থাকেন।

হলের বয়স এক্ষণে ৭১ বৎসর। শিক্ষা-প্রণালী এবং চিত্তবিজ্ঞান ছাড়া ইনি অন্য কোন বিষয়ে সাধারণতঃ প্রবন্ধ বা গ্রন্থাদি রচনা করেন না। কিন্তু ইঁহার আলোচনা-প্রণালী এত বহুমুখী যে, দুনিয়ার সকল বিদ্যাই ইঁহাকে ঘাঁটিতে হয়। এই বিশ্বগ্রাসী কাজের জন্য ইনি যথোচিত শিক্ষালাভও করিয়াছিলেন। এই শিক্ষালাভের জন্য সুযোগ এবং খরচপত্রও জুটিয়াছিল। বিদ্যা কখনও রাস্তায় কুড়াইয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য রাস্তায় কুড়াইয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা ফেলিয়া দেওয়া মূর্খতা। তবে একমাত্র কুড়িয়ে পাওয়া বিদ্যার উপর নির্ভর করিলে সকলকে ভারতবাসীর দুরবস্থায় পড়িতে হইবে।

নুন, তেল, কাঠ, খড়, সময়, মেহানত ইত্যাদি খরচ না করিলে দুনিয়ার উপর দাগ রাখিয়া যাওয়া অসম্ভব। বৰ্ত্তমান যুগের ভারত-সন্তানের জন্য সেই সুবিধা ভগবান ত সৃষ্টি করেনই নাই, মানুষেরাও নেহাৎ অল্পই সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইতেছে। কাজেই বর্ত্তমান জগতে কোন ভারতসন্তান যথার্থ "বিশেষজ্ঞ" বা বিদ্যারাজ্যের কর্ণধাররূপে পরিচিত হইতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয় না। দেখা যাউক ভারত-বাসীর মতিগতি ফিরে কি না।

আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষালাভের পর হল জার্ম্মানি যান। তিন বৎসর কাটাইয়া দেশে ফিরেন। আমেরিকায় কিছুকাল শিক্ষকতা

করিয়া দ্বিতীয়বার জার্ম্মাণি যান। এইবারও তিন বৎসর কাটে। এই ছয় বৎসরে ইনি শিখিয়াছিলেন :—ধর্ম্মতত্ত্ব, অ্যারিষ্টটল-সংহিতা, বাইবেলের দর্শন, তর্কবিজ্ঞান, নব্য চিত্তবিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, অস্থি-বিজ্ঞান, চিকিৎসা, নৃতত্ত্ব, ইত্যাদি। এই সকল বিদ্যায় যাঁহারা আজকালকার দিনে সর্ব্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত বিবেচিত হইয়া থাকেন তাঁহাদেরই ইনি শিষ্য ছিলেন।

ভারতবর্ষে ষ্ট্যান্‌লি হল শিক্ষা-বিজ্ঞানের ওস্তাদরূপে পরিচিত। আমেরিকায়ও মোটের উপর লোকেরা ইঁহাকে শিক্ষাতত্ত্ববিৎই বলিয়া থাকে। Educational Problems নামক প্রকাণ্ড দুইখানা গ্রন্থে ইঁহার বড় বড় চব্বিশটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেতাবে গরু হারাইলেও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কোন লোক বোধ হয় সকল প্রবন্ধ পড়িয়া উঠিতে পারে না। তবে যে কোন একটা পড়িতে সুরু করিলেই অন্যান্যগুলার আভাষ কথঞ্চিৎ পাওয়া যাইবে। আল্‌গা আল্‌গা প্রবন্ধের গ্রন্থ এইরূপই হইয়া থাকে। এই ধরণের প্রবন্ধসমষ্টি আর একখানা কেতাবে পাই। নাম Aspects of Child Life and Education. ষ্ট্যান্‌লি হল শিশুজীবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অন্যতম প্রবর্ত্তক।

কিন্তু হলের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম "Adolescence" বা "যৌবন"। প্রকাণ্ড দুইখণ্ডে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ইহাই এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার এক মাত্র প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ ছিল। মাস কয়েক হইল "Jesus the Christ in the light of Psychology" বাহির হইয়াছে। এইটাও সুবৃহৎ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহা যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে পাদ্রী সাহেবদের বক্তৃতাসমষ্টি নয়। ইহা একখানা খাঁটি সমাজ-বিজ্ঞানের গ্রন্থ। যে কোন জাতির লোকেরা এই গ্রন্থের আলোচনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ

ধর্ম্মের সুব্যাখ্যা প্রচার করিতে পারেন। হল নিজেও খৃষ্টধর্ম্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মের যথাসম্ভব নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বিশ্লেষণটা শরীর-বিজ্ঞান এবং পরীক্ষাসিদ্ধ চিত্তবিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক। ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় এই গ্রন্থ যুগান্তর সৃষ্টি করিবে।

হলের রচনা এবং লিপিকৌশল অতি চমৎকার। সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অধ্যাপক মহাশয়গণ কাঠখোট্টা নীরসভাবে গ্রন্থাদি লিখিয়া থাকেন। হলের লেখা ঠিক উল্টা। একদম নভেল বা বক্তৃতা বা কবিতা বা কথাবার্ত্তার সরস প্রণালীতে ইনি কঠিন কঠিন কথা বলিয়া যাইতে পারেন। ইঁহার "যৌবন" এবং "যীশু" গ্রন্থদ্বয় ইংরাজী ভাষায় গদ্য-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ষ্ট্যান্‌লি হলকে লোকেরা নানাদিক দিয়া জানে। সকল দিকেই ইঁহার কীর্ত্তি অন্ততঃ ইয়াঙ্কি সমাজে অদ্বিতীয়। ইঁহাকে কর্ম্মবীর বিবেচনা করিয়াও আমেরিকান জাতি গৌরবান্বিত হয়। হল ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা এবং আজ পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট। মাত্র ৩০ বৎসর হইল এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। অথচ আমেরিকায় এমন কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক নাই যিনি ক্লার্কের নাম শুনেন নাই। ইহার ছাত্রসংখ্যা মাত্র ১৫০।২০০। ইহার শিক্ষক মাত্র ২০।২৫। ইহার বাড়ী ঘর আস্‌বাব পত্র সবই দেখিতেছি মামুলি ধরণের। এক মাত্র ষ্ট্যান্‌লি হলের নামে এই বিদ্যালয়ের কীর্ত্তি গোটা আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিলাত, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণিতেও ক্লার্কের নাম আছে। অথচ ঐ সকল দেশে হার্ভার্ড, ইয়েল এবং কলাম্বিয়া ছাড়া অন্য কোন ইয়াঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আছে কিনা সন্দেহ।

ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, বা বি, এস্‌সি পড়ান হয় না। এক মাত্র গ্র্যাজুয়েটদের উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য ইহার উৎপত্তি। হল

বলিলেন :—"আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অধ্যাপক তৈয়ারি করাই আমার একমাত্র কার্য্য। প্রত্যেক বৎসর যত ছাত্র বাহির হয় তাহারা সকলেই তৎক্ষণাৎ চাকুরি পায়। এই বৎসর যুদ্ধের হাঙ্গামায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ টাকা বাঁচাইতেছেন বা টাকা পাইতেছেন না। কাজেই নূতন অধ্যাপক-নিয়োগ প্রায়ই হইতেছে না। এই কারণে আমার কয়েকজন পাকা ছাত্র চাকুরি না পাইয়া বেকার বসিয়া আছে।"

উষ্টার, ম্যাস, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।

আমেরিকায় অন্ন-সংস্থান

কম্‌-সে-কম্ কত টাকায় ইয়াঙ্কিরা মাস চালাইতে পারে? মার্কিন মুলুকে কয়েক বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল। আলোচনাটা প্রধানতঃ কুলী-মজুর-শ্রমজীবীদের জীবনযাত্রার তরফ হইতে করা হইয়াছে। ফেডার‍্যাল দরবারের শ্রমজীবী-বিভাগের মাসিক পত্রে (Monthly Review of the United States Bureau of Labour, October, 1915) নানা অনুসন্ধান ও গবেষণার সিদ্ধান্ত দেখিতে পাইতেছি। প্রকাশ যে, বার্ষিক ৮৪০ ডলার (অর্থাৎ ২৫২০ টাকা)এর কমে এখানকার শ্বেতাঙ্গ মজুর জীবন ধারণ করিতে পারে না। এই হিসাবে প্রত্যেক মজুরকে তাহার স্ত্রী এবং এক পুত্র ও এক কন্যা অর্থাৎ চারজনের অন্নদাতা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই মোসাবিদা করা হইয়াছিল আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিবার প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে। তখনও ঘরভাড়া এবং খাইখরচ অনেকটা সস্তা ছিল। সম্প্রতি মূল্য বৃদ্ধির জোয়ার সুরু হইয়াছে। এখন ৮৪০ ডলারের স্থানে ১০০০ ডলার ধরিলে পুরাণা মোসাবিদার তাৎপর্য্য রক্ষা হইতে পারে।

এই গেল একদম "নিম্নতম" শ্রেণীর কথা। মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত "ভদ্রলোক"দের অবস্থা কিরূপ? ফ্যাক্টরি, কারখানা, ব্যাঙ্ক, ঔষধালয় ইত্যাদির কেরাণী, স্কুল-মাষ্টার, উদীয়মান চিত্রকর বা গল্পলেখক, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জুনিয়ার বা সহকারী অধ্যাপক, ডাক্তার ও অ্যাটর্ণির এ্যাপ্রেন্টিশ এবং অন্যান্য মস্তিষ্কজীবীদের কথা বলিতেছি। কিছুদিন হইল মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ জন সহকারী অধ্যাপকের

পারিবারিক অবস্থা সমালোচনা করা হইয়াছিল। জানা যায় যে, তিনজন ছাড়া আর সকলে দারিদ্র্য-সীমার নিম্নে অবস্থিত অর্থাৎ ইঁহারা কোন মতে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন। থিয়েটারে যাওয়া বা সভাসমিতির সভ্য হওয়া বা কেতাব খরিদ করা, এমন কি মাসিক কাগজের চাঁদা দেওয়া তাঁহাদের অবস্থায় কুলায় না। ইঁহাদের মাসিক বেতন ১০০ হইতে ১৫০ ডলারের ভিতর গণ্ডীবদ্ধ। মাসিক যাঁহারা ২০০ ডলার রোজগার করেন শিক্ষা-ব্যবসায়ে তাঁহাদিগকে স্বচ্ছল অবস্থার লোক বলা হয়। এক ব্যক্তি শিকাগো সহরে মাসিক ১৫০ ডলার কামাইয়া থাকেন। ইনি সংবাদপত্রের কাজে নিযুক্ত। ইঁহার একটি কন্যা জন্মিয়াছে। তাঁহার ভগ্নী বলিতেছেন—"দাদা মহা বিব্রত। তবে তাঁহার স্ত্রী অতি হিসাবী, এই যা রক্ষা।" মোটের উপর এ-দেশী ভদ্রলোকের ধারণা যে, "ভদ্রপাড়ায়" কামরা লইয়া তিন বেলা রেষ্টর‍্যাণ্টে খাইয়া এবং শীত গ্রীষ্মে টুপি জুতা ও সুট বদলাইয়া ইজ্জদ রক্ষা করিতে হইলে, জন প্রতি মাসিক ৭৫ ডলারের কমে চলে না। অতএব কোন ব্যক্তি যদি বিবাহ করে তাহার পূর্ব্বে অন্ততঃ ১৫০ ডলারের সংস্থান থাকা চাই। কিন্তু ১৫০ ডলার রোজগার করা নবীন যুবাদের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য। তাহা সত্ত্বেও অনেকে বিবাহ করিতে ছাড়ে না।

কয়েকজন ছোকরা উকীল, শিল্পী ও অধ্যাপকের যুক্তি এইরূপ :—"আরে ভায়া, একলা থাকিতে যত খরচ, বিয়ে করলেও প্রায় সেই খরচ। ডবল খরচ নয়। খরচ কমিবার প্রধান কারণ এই যে, ঘর ভাড়া ডবল দিতে হয় না। এক ঘরেই দুইজনের চলিয়া যায়। বরং ৩।৪ কামরা-ওয়ালা একটা এ্যাপার্টমেণ্ট ৪০ ডলারে ভাড়া করিলে স্বাধীন গৃহস্থ হইতে পারি। তখন স্ত্রী-স্বামীর ডবল রেষ্টর‍্যাণ্ট খরচ কমিয়া আসে। স্ত্রী ঘরে রান্না করিলে একজনের রেষ্টর‍্যাণ্ট খরচেই প্রায় দুইজনের খোরাকী

চলিয়া যায়। মোটের উপর ১০০ ডলারে গৃহস্থালী নির্ব্বাহ হয়। ভয় কেবল যদি সন্তান জন্মে। তা আজকালকার শিক্ষিত মহলে জন্ম-নিবারণ (বার্থ-কণ্ট্রোল) অতি সহজেই সুসাধিত হইতেছে।" ১০০ ডলারে পরিবার চলে বটে। কিন্তু পোষাক, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য নূতন সংস্থান করা আবশ্যক। কাজেই প্রথম বৎসর দেড় দুয়েকের ভিতর হাতে হাজার খানেক ডলার জমাইয়া এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছোকরারা বিবাহ করিতে অগ্রসর হয়। ছোকরা মহলে দেখিতেছি ১০০।১২৫ ডলার মাসিক বেতন এক প্রকার "বরাতের কথা"! সপ্তাহে ২০, ২৫, ৩০, ৪০ ডলার সাধারণ গ্র্যাজুয়েট বা ভদ্রলোকের বেতনের হার।

যুদ্ধের ফলে কুলী মজুরদের মজুরি যারপর নাই বাড়িয়াছে। দৈনিক ১০ ডলারও কেহ কেহ রোজগার করে। বিপদে পড়িয়াছেন "ভদ্রলোক"! লেখাপড়াসংক্রান্ত সকল ব্যবসাতেই টাকার খাঁকৃতি। মস্তিষ্কজীবীদের মধ্যে একমাত্র বিজ্ঞান-ব্যবসায়ীর (এঞ্জিনীয়ার, কেমিষ্ট, চিকিৎসক ইত্যাদি) বাজার দর চড়িয়াছে। এই সুযোগে এমন কি ভারত-সন্তানেরাও মাসিক ১৫০।১৬০।২০০ ডলার রোজগার করিতেছে। যে সকল ছাত্র ধার করিয়া অনাহারে থাকিয়া নব্যশিল্প শিক্ষা করিয়াছিল তাহাদের কপাল ফলিয়াছে। জিনিষপত্রের দাম বাড়া সত্ত্বেও আজ তাহারা ছাত্রাবস্থার দেনা শোধ দিয়া স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতেছে।

আমরা ভারতবর্ষে বসিয়া শুনি, আমেরিকায় টাকা পড়িয়া আছে। লুটিয়া নিতে পারিলেই হয়। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। কিন্তু কাল চামড়ার লোকের পক্ষে কথাটা মিথ্যা। চেহারা দেখিবামাত্র কুলীর সর্দ্দার, বা ফ্যাক্টরির ম্যানেজার বা দোকানের পরিদর্শক, বা সংবাদপত্রের

সম্পাদক "কাজ নাই" বলিয়া জবাব দিতে অভ্যস্ত। কৃষ্ণাঙ্গ আমরা যখন সভাসমিতিতে নিমন্ত্রিত হই অথবা রমণী-ক্লাবে চা পান করি, অথবা প্রকাশ্য স্থলে গলাবাজির সুযোগ পাই, তখন অবশ্য "হিন্দু" বলিয়া আমরা সম্মান পাইয়া থাকি। কিন্তু যেই রাস্তায় বাহির হইলাম তৎক্ষণাৎ ভারতবাসী আর নিগ্রো এক জানোয়ার। রাস্তা দিয়া কুকুর হাঁটিয়া গেলে মানুষ যেমন সাধারণতঃ সেদিকে দৃষ্টি দেয় না, আমেরিকার রাস্তায় নিগ্রোদেরও সেই অবস্থা। ভারতসন্তানের অবস্থা ঠিক তাই। এই সম্বন্ধে সন্দেহ রাখা মূখ্খুমি।

পঞ্চাশটা বাড়ীতে ঘর খুঁজিতে গেলে হয়ত একটা বা দুইটাতে ঘর পাওয়া যাইবে। তাহাও অনেক বচসা বক্তৃতার পর।—"দেখ্‌ছ না, আমার লম্বা চুল?" (টুপি তুলিয়া মাথা দেখাইতে হয়), "জান না আমি বিদেশী? আমার দেশ সাত সমুদ্র তের নদীর পারে" ইত্যাদি। রেষ্ট-র‍্যাণ্টে খাইতে যাইবার পূর্ব্বে দশবার ভাবিতে হয়, "খাইতে পাইব কিনা"। হয়ত ৮।১০টা রেষ্টর‍্যাণ্টের তাড়া খাইয়া কোন একটাতে বা টেবিল চেয়ার জুটিল। কিন্তু যেই ভারতসন্তান আসন গ্রহণ করিলেন—তৎক্ষণাৎ অন্যান্য চেয়ারের লোক উঠিয়া গেল। ঘরভরা লোকের মধ্যে কানাঘুষা চলিতে লাগিল। পরে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া গেলেন—"কি কর্‌ব মশায়? আমরা ত রাজিই আছি। খরিদদারেরা নারাজ। অতএব আপনি পথ দেখুন।" অনেক সময়ে শ্বেতাঙ্গ বন্ধুরা ভারতবাসীকে হোটেলে লইয়া গিয়া বিব্রত হন। নাপিতের দোকানে চুল ছাঁটাইতে যাওয়া আরও বিষম কর্ম্মভোগ। ভারত-সন্তান সাহস করিয়া কোন বড় নাপিতের দোকানে ঢুকিতে পারে না। থিয়েটারেও গলা-ধাক্কা খাইবার সম্ভাবনা। এই অবস্থায় মনুষ্যত্ব রক্ষা করা যায় কিনা ভুক্তভোগী মাত্র বুঝিতে পারেন। বস্তুতঃ, প্রত্যেক ভারতসন্তানই আমে-

রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ-নির্য্যাতন মর্ম্মে মর্ম্মে ভুগিয়াছেন। এই গেল প্রতিদিনকার ঘৃণ্য জীবন।

মাঝে মাঝে হয়ত কোন প্রসিদ্ধ হোটেলে কোন নামজাদা লোকের সঙ্গে দেখা করিতে অথবা আহার করিতে যাইতে হইল। হোটেলের ফটকে পৌছিবামাত্রই দ্বারোয়ান বলিলেন—"হাঁটো হিঁয়াসে। এখানে তোমার কি কাজ? এই হোটেলে তোমার কোন কাজ থাকিতেই পারে না।" অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর দ্বারোয়ান পথ দেখাইয়া দেয় বটে—কিন্তু সেই পথ একমাত্র ঝী চাকর খান্সামা এবং নিগ্রোজাতীয় যে-কোন লোকের যাওয়া-আসার পথ। হয়ত কোন মতে সোজা "ভদ্র" রাস্তায়ই ফটক পার হইয়া হোটেলে ঢুকা গেল। তৎক্ষণাৎ হোটেলের কেরাণী ও কর্ম্মচারীর জবাবদীহি হইতে হইবে। অনেক বচসার পর ঠিক হইল, "আচ্ছা লোকটাকে অমুকের ঘরে লইয়া যাও"। হোটেলগুলা সাধারণতঃ ১০।১৫।২০ তলা। তড়িতের কলে উঠা-নামা করিতে হয়। যেই কলের (এলিভেটর) কাছে উপস্থিত হইলে, কল-চালক হয়ত বলিবে—"এই এলিভেটর তোমার জন্য নয়।" আট দশ মিনিট দাঁড়াইয়া ভ্যারাণ্ডা ভাজিতে থাক। ইতিমধ্যে কলটা বহুবার উঠানামা করিতে থাকিল—কত লোক উঠিল কত লোক নামিল। দুর্ভাগ্য ভারতসন্তানকে ঝী চাকরদের কলে উঠানামা করিতে হইবে! সে কল স্বতন্ত্র। এদিকে ম্যানেজারের সঙ্গে আবার বাদানুবাদ। ম্যানেজার ফোন্ করিয়া খবর লইলেন, হোটেল-বাসী শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি কোন কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে দেখা করিবেন কি না। জবাব হয়ত আসিল—"নিশ্চয়। ইহাঁকে উপরে পাঠাইয়া দাও।" অবশেষে শ্বেতাঙ্গদের খাশ এলিভেটরে ১০।১২ তলার ঘরে যাইয়া বন্ধুর সঙ্গে মোলাকাত। বিপদ আবার ফিরিবার সময়। অনেক

ক্ষেত্রে এলিভেটরে নামিতেই পারা যায় না। বারতলা সিঁড়ি হাটিয়া পদব্রজে ফিরিতে হয়। ইহার নাম আমেরিকায় হিন্দুজীবন। ভারতে ভারতবাসীর দুঃখ কষ্ট বেশী কি ইয়াঙ্কিস্থানে ভারতপ্রবাসীর দুঃখ কষ্ট বেশী? যে-কোন রক্তমাংসের মানুষ সহজেই জবাব দিতে পারিবেন।

যদি পয়সা খরচ করিয়া প্রথম হইতেই কোন বড় হোটেলে কামরা লওয়া যায় তাহা হইলে দৈনিক জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ অনেকটা এড়ান যায়। কিন্তু রাস্তায় বাহির হইয়া চলাফিরার সময় অথবা রেলগাড়ীতে মোসাফিরি করিবার সময় অথবা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার সময় ঝকমারি সহ্য করিতেই হইবে। যদি বেশী পয়সা না থাকে, এবং এক সহরেই কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর থাকিতে হয়, তাহা হইলে সস্তায় এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করিয়া স্বহস্তে অথবা সপরিবারে রান্নাবাড়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহাতেও অনেকটা বিনা উদ্বেগে, অপমানে মেজাজ গরম না করিয়া শরীর ধারণ করা যায়। কিন্তু যদি অন্ততঃ মাসিক ১০০ ডলার খরচ করিবার ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট পশুজীবনমাত্র চালান সম্ভব। এই পশুজীবনই প্রত্যেক আমেরিকা-প্রবাসী ভারতসন্তানের ভাগ্যে জুটিতেছে।

এই অবস্থায় ইয়াঙ্কিসমাজে "হিন্দু"রা টাকা রোজগার করিবে কি করিয়া? একমাত্র পথ কুলীগিরি। পঞ্জাবের শিখ চাষীরা এই উপায়ে ক্যালিফর্ণিয়া অঞ্চলে অন্ন-সংস্থান করিতেছিল। কিন্তু এই পথও মারা গিয়াছে ; ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফেডারাল রাষ্ট্র আইন জারি করিয়াছেন। তাহার বিধানে কোন ভারতসন্তান কুলী বা মজুর বা চাষীভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। বিগত ৫।৭ বৎসর

ধরিয়া আমাদের ছাত্রেরা কখন কখন অর্থাভাব হইলে শ্বেতাঙ্গ পরিবারে থালা বাটি মাজিয়া অথবা আঙ্গুর ক্ষেতে খাটিয়া কিছু টাকা রোজগার করিত। এখন হইতে কোন ভারতীয় ছাত্র এই ধরণে "শ্রমজীবীর" কার্য্য করিতে পারিবে না। কোন ভারতসন্তান যদি স্বাবলম্বী হইতে চাহে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শ্রমজীবী সম্পর্কিত আইন অনুসারে আমেরিকা হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। সুতরাং নিম্নতম শারীরিক পরিশ্রমের ব্যবসা ভারতসন্তানের পক্ষে রুদ্ধ।

উচ্চ অঙ্গের কোন পথ খোলা আছে কি? আইনতঃ সকল পথই খোলা। উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় মস্তিষ্কজীবীর বিরুদ্ধে কোন আইন নাই। নাচিয়া, গাহিয়া, ছবি আঁকিয়া, গল্প করিয়া, রং তামাসা দেখাইয়া, গল্প লিখিয়া, প্রবন্ধ ছাপিয়া, বক্তৃতা করিয়া, ছাত্র পড়াইয়া, দোকান খুলিয়া, টাকা খাটাইয়া, ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া, ডাক্তার হইয়া অথবা কাগজওয়ালাদের আফিসে বসিয়া শত শত উপায়েই ভারতসন্তান এদেশে অন্ন-সংস্থান করিতে "অধিকারী"। কিন্তু আইনের কথা এক, সমাজের কথা আর। সমাজে যে আমরা অস্পৃশ্য, আমাদের জল "চলে" নয়। যে আফিসে ৫০০।৭০০ শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনী কাজ করে সেখানে একজন কালা আদমিকে বসায় কি করিয়া? হ'লই বা কালা আদমি মহা বুদ্ধিমান্। যে কলেজের বিজ্ঞান-গৃহে ১০০।১৫০ ছাত্র ছাত্রী রসায়ন চর্চ্চা করিতেছে সেখানে একজন অ-শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক বা ল্যাবরেটরি এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট বাহাল করা যায় কি? চণ্ডালের সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিক লেন দেন কখনও সম্ভবপর নয়। খুব জোর কালে-ভদ্রে একদিন হয়ত জগন্নাথক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ গা ঘেঁশাঘেঁশি চলিতে পারে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্ক, আফিস, স্কুল-কলেজ, ফ্যাক্টরী, ইত্যাদি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোন ভারতসন্তানের "চাকুরী" পাওয়া দুঃসাধ্য। "চাকুরী" শব্দের অর্থ দিনের

পর দিন কর্ম্মক্ষেত্রে যাওয়া আসা করা, প্রতিদিন পাঁচ সাত ঘণ্টা করিয়া অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কাটান, এবং যথাসময়ে মাস মাস বেতন আদায় করা। এই প্রণালীতে নিয়মিতরূপে জীবনযাপন ভারতপ্রবাসীর কপালে ঘটিবে না। নিতান্ত উচ্চতম কোন বিশেষ কাজের জন্য হয়ত কোন ভারতসন্তান কখনও বা নিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ বিশিষ্ট নিয়োগকে ভারতবাসীর "আয়ের পথ" বিবেচনা করা উচিত নয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের হিড়িকে এখানকার বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রচালিত কারখানাগুলিতে বহুলোকের ডাক পড়িয়াছে। এই সুযোগে ঘটনাচক্রে চামড়ার দোষ সত্ত্বেও ৫।৭ জন ভারতবাসী রাসায়নিক, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদির পদ পাইতেছেন। এই পদগুলা সম্মানসূচক এবং কৃতিত্বেরও পরিচায়ক। হয়ত ভবিষ্যতেও এই ধরণের দুই চারি দশটা "চাকুরী" টেক্‌নিক্যাল বিদ্যাওয়ালা হিন্দুর ভাগ্যে জুটিবে। বস্তুতঃ, আমেরিকায় অন্নসংস্থান করিতে হইলে টেক্‌নিক্যাল লাইনে মস্তিষ্ক খাটাইতে পারা আবশ্যক।

অন্যান্য লাইনের মস্তিষ্কজীবীদের অবস্থা কিরূপ? আমাদের দেশের লোকেরা খবর রাখেন যে, একজন ভারতসন্তান আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি করিতেছেন। এই চাকুরীটি যে কি বস্তু সেই ভারতসন্তান ছাড়া বোধ হয় আর কেহ তাহা বুঝিবে না। এই চাকুরীতে মাসিক বেতন কত? দুনিয়ায় এবং এমন কি আমেরিকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজার-দরই বা কতখানি? যে পদে তিনি "অধ্যাপক" সেই পদের ইজ্জদই বা ইয়াঙ্কি সমাজে কিরূপ? অধিকন্তু, ৫।৭ বৎসর ধরিয়া কোন চক্ষুলজ্জাওয়ালা মানুষ একই পদে একই বেতনে লাগিয়া থাকিতে পারে কি না তাহাও সেই ভারতসন্তান মহাশয়ই সদাসর্ব্বদা মরমে বুঝিতেছেন। আর যদি

কোন ব্যক্তি আন্দাজে ধারণা করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি এই "আমেরিকায় ভারতীয় অধ্যাপকের" অবস্থা বুঝিয়া হয়ত বা নির্জ্জনে হাসিবেন অথবা লজ্জিত হইবেন। যাহা হউক, অধ্যাপক মহাশয় খাইয়া বাঁচিয়া আছেন, কিছু টাকাও জমাইয়াছেন, আর শ্বেতাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের গুরুগিরি ত করিতেছেন। ইহাই সুখের কথা। কিন্তু তাহাতে প্রবাসী ভারতসন্তানের "আয়ের পথ" ত দেখিতে পাইতেছি না।

তথাপি এ কথা সত্য যে, ৫।৭ জন ভারতসন্তান আমেরিকায় অন্ন-সংস্থান করিতেছেন। পার্শী, গুজরাতী এবং বাঙ্গালী মুসলমান কয়েক-জন এদেশে মহাজনী বা দোকানদারী করিয়া লাভবান হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। টাকা খাটাইয়া স্বাধীন ব্যবসা চালাইতে পারিলে লাভবান না হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। টেক্‌নিক্যাল লাইনের বাহিরে যাঁহারা মস্তিষ্ক খাটাইয়া থাকেন তাঁহাদের কথা বলিতেছি।

প্রথমতঃ, বিবেকানন্দের শিষ্য বা প্রশিষ্যগণ। ইঁহারা কেহই না খাইয়া নাই। বরং সকলেই অতি সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করিতে-ছেন। ইহা ভারতবাসীর সৌভাগ্যের কথা। ইহার এক মাত্র কারণ এই যে, বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্ম্ম আমেরিকায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সংসারিক হিসাবে "বেদান্ত সোসাইটি"র আর মার নাই। প্রত্যেক রবিবার অন্যান্য খ্রীষ্টান গির্জ্জার সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত সোসাইটি গুলার বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে বাহির হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইয়াঙ্কি নরনারী ভারতীয় ধর্ম্মকে খোলাখুলি নিজেদের সমাজে সাদরে স্থান দিয়াছে। ধর্ম্ম-প্রচার আমেরিকায় ব্যবসা বিশেষ। খৃষ্ট-প্রচারকদের প্রণালীতে বেদান্ত-প্রচারকগণ দক্ষতার সহিত কাজ চালাইতে পারিলে ভারতের প্রতি আমেরিকার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়াইতে পারিবেন। যাঁহারা

ভারতে বসিয়া বেদান্ত-ভবনসমূহের নিন্দা করেন তাঁহারা হয় ভ্রান্ত না হয় হিংসুক। তবে তথাকথিত ধর্ম্মের দাম বর্ত্তমানজগতে কতটুকু সে কথা আলাদা।

যাহা হউক, ধর্ম্ম-প্রচার ভারতবর্ষের মতন মার্কিন মুল্লুকেও লাভজনক এবং সম্মানজনক ব্যবসা। ভারতের হিন্দুমুসলমান মন্দির-মসজিদে বেদকোরাণে যত টাকা খরচ করিয়া থাকেন, ইয়াঙ্কিস্থানের নরনারীও গির্জ্জায় বাইবেলে ততটাকা খরচ ত করেনই—বরং ইহাঁরা ধনশালী বলিয়া আমাদের তুলনায় অনেক বেশীই খরচ করেন।

ধর্ম্মপ্রচার ছাড়া হিন্দুর অন্নসংস্থান হওয়া সম্ভব বক্তৃতায় বা প্রবন্ধ রচনায়। কিন্তু আমেরিকার সাপ্তাহিক, মাসিক বা দৈনিক পত্র ঘাঁটিয়া দেখি, ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে কোন ভারতসন্তানের লেখা বোধ হয় কোন কাগজে ছাপা হয় নাই। বিগত ৩।৪ বৎসরে মোটের উপর বোধ হয় ১৩।১৪ টা ছোট বড় মাঝারি রচনা বাহির হইয়াছে। এই গুলার কোনটাতে টাকা পাওয়া যায়, কোনটাতে যায় না। সকল গুলিই কোন এক ব্যক্তির লেখা নয়। অতএব প্রবন্ধ রচনা দ্বারা ভারতসন্তান আমেরিকায় জীবন ধারণ করিতে পারে কিনা সহজেই অনুমাণ করা যাইতে পারে। বাকি রহিল বক্তৃতা। আমেরিকার যেখানে যেখানে "হিন্দু" বাস করিতেছেন সেই খানেই প্রতিবৎসর ২।৪।১০ টা "হিন্দু" বক্তৃতার সুযোগ ঘটে সন্দেহ নাই। সকল বক্তৃতায়ই পয়সা পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, শ্রোতারাও কোন এক ব্যক্তির ব্যাখ্যান দু এক বারের বেশী শুনিতে ইচ্ছা করে না। কাজেই যতটুকু অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকুক না কেন তাহাও একাধিক হিন্দুর ভিতর ভাগাভাগি হইবার কথা।

আমেরিকায় বক্তৃতার ব্যবস্থা মোটের উপর ত্রিবিধি। এই তিন

ধরণের বক্তৃতা-প্রণালীর কোনটাই ভারতসন্তান ঘাঁটিতে ছাড়েন নাই। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি।

প্রথমতঃ, আমাদের যুক্তপ্রদেশের আর্য্যসমাজী কবিরাজ কেশবদেব শাস্ত্রীর কথা ধরা যাউক। ইনি ক্যালিফর্ণিয়া হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিতে করিতে আসিয়াছেন। আসিয়া পৌছিতে দুইবৎসর লাগিয়াছে। অদ্ভুত অধ্যবসায়। এই দুই বৎসরের খাই খরচ এবং রেলভাড়ার অনেকটা ইনি বক্তৃতা দ্বারাই সংগ্রহ করিয়াছেন শুনিতে পাই। কম বাহাদুরীর কথা নয়। ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ব্যবসায়ের প্রণালী কিরূপ?" ইনি বলিলেন, "আমি সাধারণতঃ থিয়জফিক্যাল সোসাইটিগুলি পাকড়াও করি। থিয়জফিষ্টরাই আমার একমাত্র মক্কেল বলা যাইতে পারে। এক সহর হইতে অন্য সহরে যাইবার পূর্ব্বে আমি আমার বিজ্ঞাপন সেই সহরের সেক্রেটারির নিকট পাঠাই। সেক্রেটারি মহাশয়া দুই তিনটা তারিখ ঠিক করিয়া দেন। ঐ ঐ তারিখে অমুক বিষয়ে বক্তৃতা হইবে, এইরূপ কার্ডও ছাপান হয়। যথা সময়ে আমি বক্তৃতা করি। বিজ্ঞাপনের কার্ডে লেখা থাকে, 'বক্তৃতান্তে দান সংগ্রহ'। এই ধরণে আমেরিকার প্রত্যেক গির্জ্জাঘরে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। কেহ একটা আনি, কেহ বা দোয়ানি, কেহ বা সিকি, কেহ বা এক পয়সা সংগ্রাহকের রেকাবিতে দান করে। কোন বক্তৃতায় ৫, কোন বক্তৃতায় ১০, কোন বক্তৃতায় ২৫ ডলার আমদানি হয়। এই টাকা হইতে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির ঘর ও আলো ভাড়া চুকাইয়া দিই। অধিকন্তু, বিজ্ঞাপনাদি ছাপিবার খরচও এই টাকা হইতে বহন করি।" ইহাতে আয় কত হয় আন্দাজ করা যাইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং কখনও নৈরাশ্যসূচক পত্র লিখেন নাই। "বক্তৃতান্তে দান সংগ্রহ"-প্রণালীর সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের আর এক পন্থা

আছে। ইনি ২।৩ খানা পুস্তক ছাপিয়াছেন। একটার দাম ১০ সেণ্ট, একটার দাম ২৫ সেণ্ট, একটার দাম ৩৫ সেণ্ট। বক্তৃতার ঘরে খোলা টেবিলের উপর বইগুলা সাজান থাকে। বক্তৃতার আগে ও পরে বই বিক্রি হয়। স্বাবলম্বী মস্তিষ্কজীবী হিসাবে কেশবদেব আমাদের এক জন পুরুষ সন্দেহ নাই। তবে এইরূপ পুরুষকার কয়জনের হাড়ে কুলায়?

বক্তৃতার দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন বাঙ্গালী সুধীন্দ্র নাথ বসু। আমেরিকায় গ্রীষ্মকালে লোকশিক্ষা প্রচারের জন্য এক প্রকার ব্যবসায় আছে। এই ব্যবসায়ের পরিচালক ও কর্ম্মকর্ত্তারা গান বাজনা, নাচ, বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা লোকরঞ্জনের নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই আয়োজনের প্রতিষ্ঠানকে শটাকোয়া (chantanqua) বলা হয়। এই ধরণের অনেক শটাকোয়া আছে। সুধীন্দ্র বসুকে এক শটাকোয়া ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপ বাছিয়া লইয়াছেন। বোধ হয় দুই বৎসর বা তিন বৎসর গ্রীষ্মকালের কয়েকদিন সুধীন্দ্রের ডাক পড়িয়াছে। ধনাগম মন্দ হয় নাই। প্রত্যেক বক্তৃতার জন্য মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে। বক্তৃতার সময়ে বোধ হয় ইনি চাপকান ও শামলা ব্যবহার করেন।

বক্তৃতার তৃতীয় প্রণালীই সাধারণ্যে প্রচলিত। বক্তৃতা আমেরিকার একটা খাঁটি ব্যবসায়ের সামগ্রী। বক্তৃতা জোগাড় করা, বক্তা ঢুরিয়া আনা এবং বক্তাদের জন্য শ্রোতা বা সভা বা ক্লাব ঠিক করিয়া দেওয়া অনেক কোম্পানীর কার্য্য। এই সকল কোম্পানীর খাতায় বক্তারা নাম লিখাইয়া থাকেন। অবশ্য কোম্পানীগুলির ভিতর ছোট বড় বামুন শূদ্র তফাৎ আছে। যে কোন কোম্পানীই যে কোন বক্তার ম্যানেজার হইতে চাহে না। আবার বক্তারাও যে-সে কোম্পানীর

সংস্রবে আসিতে নারাজ। যাহা হউক, কোন কোম্পানী কোন বক্তাকে গ্রহণ করিলে পর, কোম্পানী হইতে বিজ্ঞাপন ছাপান হয়। বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানী কর্ত্তৃকই নানা ক্লাবে কলেজে পাঠান হইয়া থাকে। এই সকল কাজের খরচ বক্তাদের বহন করিতে হয়। অবশেষে বক্তৃতা জুটিলে পর, বক্তৃতালব্ধ টাকার শতকরা ২৫।৩০ অংশ কোম্পানীর প্রাপ্য। এই ধরণের এক কোম্পানীই রবিবাবুর বক্তৃতা ম্যানেজার ছিল। সেই কোম্পানীই এক্ষণে দুএকজন ভারতীয় বক্তার ম্যানেজারি করিতেছে। লালা লাজপত রায় তাঁহাদের অন্যতম

রায় মহাশয় বলিতেছেন—"কোম্পানী আমার নিকট হইতে বিজ্ঞাপন ছাপিবার টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে। বিজ্ঞাপন ছাপাও হইয়াছে। কিন্তু একটা বক্তৃতাও জুটাইতে পারে নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহা হইলে আপনি যে মাঝে মাঝে বক্তৃতা করিতে যান সে কার উদ্যোগে?" উত্তর—"নিজ চেষ্টায় ঐ গুলা সংগ্রহ হইয়াছে —অথবা দৈবক্রমে জুটিয়াছে।"

রবিবাবু ১৯১৬ সালে আমেরিকা হইতে টাকা লুটিয়া লইয়া গিয়াছেন দেখিয়া বোধ হয় অনেক ভারতবসীর বিশ্বাস জন্মিয়াছে—"তবে বুঝি আমেরিকায় সোনার গাছ আছে। ডালপালা ঝাঁকিলেই টাকা পকেটস্থ হয়।" কিন্তু রবিবাবুর বক্তৃতায় লোক হইত কেন?—বক্তৃতা শুনিবার জন্য নয়, ভারততত্ত্বে মজিবার জন্যও নয়,—নোবেল প্রাইজ-পাওয়া কালা আদমির চেহারা দেখিবার জন্য। নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে "গীতাঞ্জলি" লণ্ডনে ছাপা হইয়াছিল। সেই সংস্করণ ছাপিবার জন্য কোন বিলাতী প্রকাশক হাজির হইয়াছিল কি? উহা পাঠ করিবার জন্য বা কোন সমাজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া ছিল কি? নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে (বোধ হয় এক বৎসর পূর্ব্বে।) রবিববু আমেরিকায়

আসিয়াছিলেন। তখন ঘরের পাশের লোকেও রবিবাবুর ছায়া স্পর্শ করে নাই। বলা বাহুল্য, রবিবাবু তখন এখানে একজন মামুলি "হিন্দু" মাত্র বিবেচিত হইতেন। বাঙ্গালীরা তাঁহাকে যত বড়ই বিবেচনা করুন না কেন, ইয়াঙ্কিরা তাঁহাকে প্রাচ্যের এক কালা আদমিই সমঝিয়াছিল। মার্কিণের চিন্তায় কোন ভারতসন্তান আজও সাধারণ কালা আদমি ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই নোবেল প্রাইজের মার্কামারা স্যর রবীন্দ্র নাথ ভারতবাসী মাত্রের পক্ষে কৃতকার্য্যতার দৃষ্টান্ত হইতে পারেন না।

লাজপত রায়ের অবস্থা দেখিলেই কথাটা বেশ বুঝিতে পারি। ভারতের নামজাদা করিৎকর্ম্মা লোক হিসাবে ইনি সর্ব্ব প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। যদি ৫।৭ জন মাত্র ভারতবাসীর নাম একসঙ্গে করা আবশ্যক হয় তাহা হইলেও লাজপত রায়ের নাম মুখে আনিতেই হইবে (নানা মতভেদ সত্ত্বেও)। কিন্তু ইনি ১৯১৬ সালের জুলাই হইতে ১৯১৭ সালের জুলাই পর্য্যন্ত তের মাসে প্রবন্ধ লিখিতে পরিয়াছেন মাত্র ৯টা। এইগুলি ছাপা হইয়াছে দৈনিকে ও সাপ্তাহিকে। একটাও মাসিকে নয়। প্রবন্ধ রচনায় ধনাগম হইয়াছে ১৯০ ডলার। এই সময়ের ভিতর বক্তৃতা জুটিয়াছে ৩০ টা। বক্তৃতাগুলির মূল্য ৭০০ ডলার। বক্তৃতা করিতে যাইবার জন্য রেল ভাড়া পাইয়াছেন সর্ব্বসমেত ১৭৫ ডলার অর্থাৎ ১৩ মাসে মোট আমদানি হইয়াছে ১০৬৫ ডলার। আমার বিবেচনায় কালা আদমির পক্ষে এই আয় সফলতার চরম নিদর্শন। কিন্তু রেল ভাড়া বাদে হাতে থাকে ৮৯০ ডলার। ইহাতে ১৩ মাসের ভরণ-পোষণ চলে কি? বিশেষ কথা এই যে, ১৯১৭ সালের জুলাইয়ের পর আজ পর্য্যন্ত লাজপত রায় একটা বক্তৃতাও পান নাই, এবং ইহাঁর কোন প্রবন্ধও কোন কাগজে বাহির হয় নাই। আমেরিকা ইতিমধ্যে

ইংরাজের স্বপক্ষে জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে লড়িতে লাগিয়াছে। লাজপত রায়ের যদি এই অবস্থা হয় তাহা হইলে রামা শ্যামার দশা কিরূপ? অতএব আমেরিকায় অন্নসংস্থান সহজ সমঝিয়া যুবক ভারত দেশত্যাগী হইও না। প্রবাসে থাকিবার যদি অন্য প্রেরণা থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

নিউইয়র্ক
১১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

সমাপ্ত
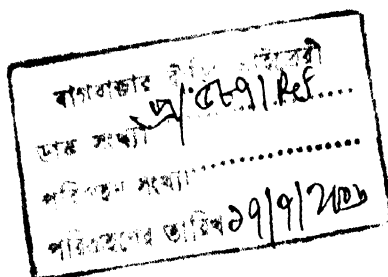
গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী

১। **বিশ্ব-শক্তি**—সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'গৃহস্থে' প্রকাশিত আলোচনা ও প্রবন্ধাবলী হইতে সঙ্কলিত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

২। **রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী**—কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার বিস্তৃত সমালোচনা। মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা

৩। **শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম** (দ্বিতীয় সংস্করণ)—কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নির্গত শিক্ষাষ্টকের মূল, টীকা, পদ্যানুবাদ, ভাবার্থ প্রভৃতি সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা।

৪। **কমলা**—ধর্ম্মমূলক গার্হস্থ্য উপন্যাস। গীতার উপদেশানুযায়ী চরিত্রগঠন ও তাহার পরিনাম। স্ত্রী কন্যার হাতে দিবার উপযুক্ত পুস্তক। মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

৫। **পাগল**—মহাপুরুষমুখে উপন্যাসের ভাষায় উপনিষদের সনাতন তত্ত্বকথার অভিনব বিবৃতি। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে উপাদেয়। মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

স্বনামধন্য কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ প্রণীত

৬। **নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর**—(তৃতীয় সংস্করণ)

(টেক্স্ট্‌বুক কমিটী কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে মনোনীত)।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রচারক বুকার ওয়াসিংটনের আত্মজীবন-চরিতের বঙ্গানুবাদ। সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে কেমন করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে দেশের উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারা যায়, প্রকৃত কর্ম্মবীর হইতে হইলে কিরূপে জীবন-যাত্রাপ্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, ইঁহার আত্ম-জীবন-চরিত তাহার জলন্ত উদাহরণ। সুন্দর শিল্কে বাঁধাই—মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

Amrita Bazar Patrika—"It furnishes delightful and stimulating reading. A distinct acquisition to the Bengalee literature."

Bengalee—"Every Bengalee who wants to serve his mother-land ought to carefully read and reread it."

বাঙ্গালী—"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর'কে আমাদেরই 'কর্ম্মবীর' বলিয়া মনে হয়। * * * আমাদের দেশে এখন এই শ্রেণীর জীবন-চরিত যত বেশী পঠিত হয়, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।"

নায়ক—"অনুবাদ প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দরভাবে হইয়াছে।"

সাহিত্য—"কোনও বাঙ্গালী যেন 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' পড়িতে না ভুলেন।"

রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র এম, এ বাহাদুর বলেন—"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' সময়োপযোগী হইয়াছে ও ইহার উদ্দেশ্যও অতি সাধু। অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতা শত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সঙ্কল্পসিদ্ধি লাভ করে, এই গ্রন্থবর্ণিত মহাপুরুষ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"

উক্তগ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

বর্ত্তমান জগৎ—বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব ও অভিনব ভ্রমণ-কাহিনী। সুবৃহৎ পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত। বিদেশে অনেকেই গিয়াছেন, এবং ভ্রমণ-কাহিনী অনেকই লেখেন কিন্তু বিনয়বাবুর মত এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেশকে দেখিয়া ও বুঝিয়া তাহার কাহিনী কেহই এ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমাদের দেশের সহিত তুলনা করিয়া অন্যান্য দেশের প্রত্যেক খুটিনাটি বিষয়টির আলোচনা পর্য্যন্ত ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস, সমাজ-চিন্তা, শিক্ষা-সমস্যা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির কথা জানিতে পারিবেন। এক কথায় দেশকে ভিতর ও বাহির দিয়া জানিতে হইলে, যাহা জানিবার প্রয়োজন হয় তাহা এই গ্রন্থে আছে।

৭। প্রথম ভাগ—মিশর। (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ইহাতে মিশরের পুরাকাহিনী, আচার ব্যবহার, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। বহু ছবি সমন্বিত সুন্দর বাধাই—মূল্য ২৲।

৮। দ্বিতীয় ভাগ—ইংরাজের জন্মভূমি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ইহাতে ইংলণ্ড, স্কট্ল্যাণ্ড ও আয়র্লণ্ডের কথা আছে। আর আছে গ্রেটব্রিটেনের ধীমান পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষত্বমূলক আলোচনাসমূহ, ইংরাজের দেশের কথা, তাঁহাদের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও সমাজতত্ত্বের কথা, তাঁহাদের গবেষণামূলক আবিষ্কারের বার্ত্তা—এক কথায় যাহা জানিলে দেশ ও জাতিকে জানা যায়—বর্ত্তমানে তাহাই সুন্দর সংযতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ, সচিত্র, মনোরঞ্জন বাঁধাই, প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠা—মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

৯। তৃতীয় ভাগ—বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (দ্বিতীয় সংস্করণ)
গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের এরূপ বিস্তৃত আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম। ইহার প্রতি পত্রে লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইবেন; গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদে অনেক ভাবিবার কথা আছে। লেখক বিলাতে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১২৫ পৃষ্ঠা। ৮ খানি হাফটোন চিত্র সম্বলিত সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা।

১০। চতুর্থ ভাগ—ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ
বহুজ্ঞাতব্যতথ্যোপরিপূর্ণ। ইহাতে আমেরিকার আদিম অধিবাসী 'রেড্ ইণ্ডিয়ান'দের কথা, উপনিবেশিকদের পূর্ব্বাপর ইতিহাস, বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রের গঠন, সামাজিক আচার ব্যবহার, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ আছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, শিল্প বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির পন্থা দেখাইয়া দেওয়া আছে। এমন তুলনামূলক শিক্ষা[illegible] ইতিহাস এদেশে এই প্রথম। বহু চিত্র সুশোভিত ৮৫০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ পুস্তক। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৬৲ টাকা।

১১। পঞ্চম ভাগ—নবীন এশিয়ার জন্মদাতা—জাপান (যন্ত্রস্থ)।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

১২। কুল-পুরোহিত—ইহাতে কুল-পুরোহিত, একঘরে, বারবেলা, সজিহারা, রাঙ্গাকাপড়ের মূল্য প্রভৃতি ১৫টি গল্প আছে। ইহা অধুনাতন বিলাতী গল্পের অনুবাদ বা বিলাতী চিত্র নয়। বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী সমাজের প্রাণের কথা, সুখ দুঃখের কথা, সংসারের বাস্তব ছবি। খাঁটি দেশী চিত্র। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৷৹।

১৩। পরাজয়—এদেশে একটা প্রবাদ আছে—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।" কিন্তু স্নেহ বা ভালবাসার কাছে এ প্রবাদ যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এই উপন্যাসে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা একখানি খাঁটি গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৷৹।

১৪। পরাধীন—পরান্ন-পালিত যুবক ক্ষেত্রনাথের প্রতিপালক দাদামহাশয়ের স্নেহপাশ ছেদনের চেষ্টা, বৃদ্ধ ঘোষাল মহাশয়ের বাহ্য কঠোরতার অন্তরালে স্নেহমন্দাকিনীর স্বচ্ছধারা, দুর্গাদেবীর মাতৃস্নেহ, মনোরমার গভীর আত্মত্যাগ—যেন স্বর্গ রাজ্যের ঘটনা, পড়িতে পড়িতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, অশ্রুভারে দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া আইসে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

১৫। মতিভ্রম—নূতন ধরণের সামাজিক উপন্যাস। ভালবাসার আদর্শ, মনুষ্যত্বের আদর্শ, বন্ধুত্বের আদর্শ—প্রিয়জনকে উপহার দিবার, পড়িবার,—পড়াইবার উপযুক্ত উপন্যাস। মনোরম বাঁধাই মূল্য ১৷৹ মাত্র।

বংশপরম্পরায়
সৌন্দর্য্য রক্ষা—